হলদে গোলাপ

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস

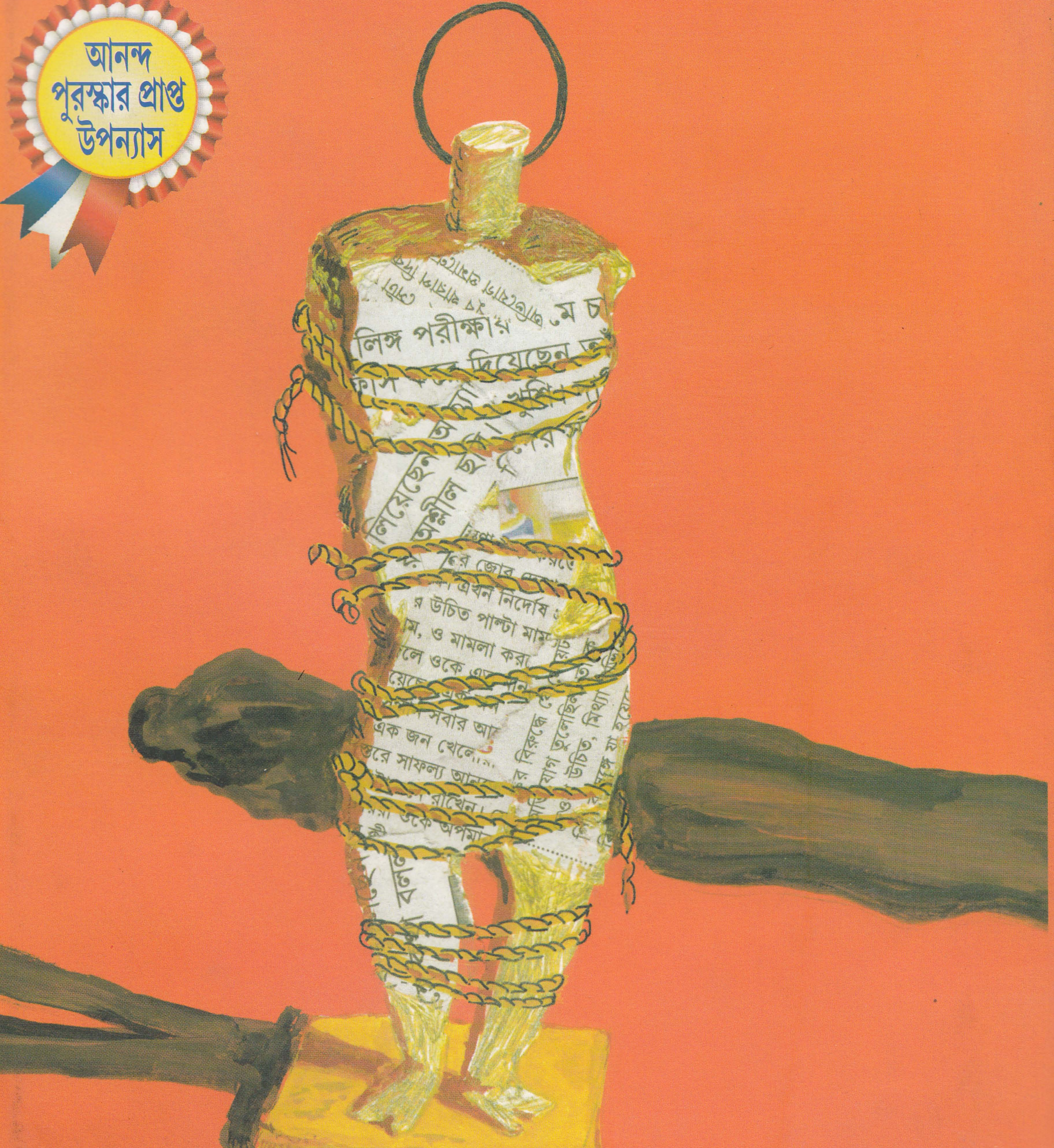

সমাজের শরীর ও শরীরের সমাজতত্ত্ব নিয়ে এক দুঃসাহসিক উপন্যাস এই *হলদে গোলাপ*। ২০১২-১৩ সাল জুড়ে প্রয়াত ঋতুপর্ণ ঘোষ সম্পাদিত *রোববার*-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালে পাঠকসমাজ আলোড়িত হয়—যা খুব কম উপন্যাসের ক্ষেত্রেই ঘটে। কাহিনি বয়নে মানুষের লিঙ্গ পরিচয়ের সমস্যা তুলে আনতে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে খুঁড়েছেন ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শারীর বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, জিনেটিক্স, মিথ-পুরাণ... । এক বিশিষ্ট সমালোচক বলেছিলেন 'স্বপ্নময়ের গল্প আমাদের শেকড় খোঁজার কোদাল।' ওই উক্তিটির কথা মনে পড়বে উপন্যাসটি পড়তে পড়তে। এই উপন্যাসটি আসলে এক সংকট-সঙ্কুল মানুষের অনুভূতিগুলি চিত্রিত হয়েছে আশ্চর্য মায়াময় দক্ষতায়। কাহিনির পরতে পরতে মিশে আছে বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলি।

শুধু বাংলা সাহিত্য কেন, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এর আগে এভাবে কোনও উপন্যাস লেখা হয়নি।

ISBN : 978-81-295-2318-1

হলদে গোলাপ

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

HOLDE GOLAP
A Bengali Novel By SWAPNAMOY CHAKRABORTY
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330/2219 7920, Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ 500.00

ISBN : 978-81-295-2318-1

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৫, মাঘ ১৪২১

প্রচ্ছদ : গৌতম সেনগুপ্ত

[লেসলি থর্নটনের একটি ভাস্কর্য অনুসরণে]

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৫০০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শ্রদ্ধা, মুগ্ধ ভালোবাসায়
অগ্রজ সাহিত্যিক
বুদ্ধদেব গুহকে

এই লেখকের আরও বই

উপন্যাস

চতুষ্পাঠী
নবমপর্ব
বাস্তুকনা
চলো দুবাই
কম্পিউটার গেম্‌স্‌
অবন্তীনগর
যে জীবন ফড়িঙের
নাটা দা
কান্ত কবি
পরবাসী

গল্প সংকলন

ভূমিসূত্র
অষ্টচরণ ষেলে হাঁটু
ভিডিও ভগবান নকুলদাদা
হার্সিগরুর উল্টো বাচ্চা
গিরিবালা, কৃষ্ণা ও আরও কয়েকজন
ব্লু সিডি ও অন্যান্য গল্প
যন্তর মন্তর
আমার সময় আমার গল্প
দশটি গল্প
পঞ্চাশটি গল্প
শ্রেষ্ঠ গল্প
সেরা পঞ্চাশ
স্বনির্বাচিত স্বপ্নময়
অনুগল্প সংগ্রহ

প্রবন্ধ সংকলন

আলাপ বিলাপ

প্রাসঙ্গিক কথা

ছোটবেলা থেকেই তথাকথিত 'মেয়েলি ছেলেদের' অপমানিত হতে দেখেছি সমাজের নানা ক্ষেত্রে। ওদের কষ্ট পাওয়া উপলব্ধি করেছি। মানুষের লিঙ্গ পরিচয় এবং লৈঙ্গিক আচরণের আলোছায়া বুঝতে চেষ্টা করেছি। ১৯৯৪/৯৫ থেকে এ বিষয়ে অল্প বিস্তর তথ্য সংগ্রহ করতে থাকি, কিছু ক্ষেত্রে সমীক্ষাও। উপন্যাস লেখার কথা ভাবিনি। ২০১০ সাল নাগাদ কোনও এক অনুষ্ঠানে প্রয়াত ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে এ বিষয়ে সামান্য কিছু বাক্যালাপ হয়। বছরখানেক পরে অভাবনীয়ভাবেই ওঁর সম্পাদিত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই বিষয় নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার প্রস্তাব পাই। এর আগে আমাকে কেউ কোথাও ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে বলেননি।

এই পটভূমিটুকু বলা দরকার ছিল মনে হয়। ওঁকে আর কৃতজ্ঞতা জানানোর উপায় নেই, তবে অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়-সহ 'টিম রোববার'কে কৃতজ্ঞতা জানাই, আমার বিচ্ছিরি হাতের লেখাকে ওঁরা ছাপার অক্ষরে পরিবর্তিত করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞ 'রূপান্তরিত' অধ্যাপিকা মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও। তিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা অকপটে জানিয়েছেন আমাকে। তাঁর মাধ্যমেই পরিচিত হতে পেরেছিলাম আরও কয়েকজন রূপান্তরকামী মানুষের সঙ্গে।

আমার এই কাজটা অনেকটা সহজ করে দিয়েছেন অজয় মজুমদার এবং নিলয় বসু। ১৯৯৭ সালে ওঁরা বাংলা ভাষায় 'হিজড়া' সম্পর্কিত একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন।

প্লাস্টিক সার্জন ডাক্তার কলিন রায় আমাকে সময় দিয়েছেন, ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের বায়োলজিকাল অ্যানথ্রোপলজির অধ্যাপক ডাঃ পরশমণি দাশগুপ্ত কয়েকটি বইপত্রের প্রয়োজনীয় হদিশ দিয়েছেন, ই.এন.টি-র বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইন্দ্রনীল সেন ওঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, এরকম আরও অনেকের সাহায্য নিয়েই এই লেখা।

সাহায্য নিয়েছি বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং উইকিপিডিয়ার। বহু কবির কবিতার অংশ ব্যবহার করেছি। কবিদের কাছে তো ঋণী হয়েই আছি জীবনভর।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

তুমি নারী নিউটন-ফেল আকর্ষকরণী
তুমি নারী আলফা বিটা গামা গামিনী
তুমি নারী চুমি তব নিশিতি যাপনি
তুমি মম সিগ্ধ প্রতিমা
তুমি স্তনদ্বয়ে মণ্ডিতা
তুমি মম পুষ্প রূপিণী
তুমি আকাশের চন্দ্রের সমা
তুমি মম হৃদয় মহিমা
তুমি রহিমা, তুমি গরিমা
তুমি মম হৃদয়ের ঝিমঝিমা।
কিন্তু তুমি সত্যিই কি নারী?

কবি ছদ্মনামে লিখেছেন। সাক্ষর-প্রেমার্থ কবি। ঠিকানা কাব্যনীড়। গ্রাম ও পোঃ ভাতার, জেলা বর্ধমান। চিঠিটা অনিকেতের টেবিলে। ওর টেবিলে অনেক চিঠিই আসে। কারণ অনিকেত আকাশবাণীর স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ের প্রযোজক। শ্রোতারা নানা বিষয় নিয়ে চিঠি লেখেন। প্রশ্নোত্তরের আসরও আছে। নানা বিষয়ের প্রশ্ন পাঠান শ্রোতারা।

এই চিঠিটা ডিরেক্টরের নামে এসেছে, কিন্তু যাঁরা বাছাবাছি করে বিভিন্ন বিভাগে পাঠান, তাঁরা সাহিত্য বিভাগে না পাঠিয়ে বিজ্ঞান বিভাগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। কারণটা বোধহয় প্রথম দু'লাইন। নিউটন এবং আলফা বিটা গামা শব্দগুলো ওখানেই অবস্থান করেছে। কবিতাটা পড়ে মজা পায় অনিকেত। তুমি রহিমা...তুমি গরিমা...। রহিমা ব্যাপারটা কী? তুমি মম হৃদয়ের ঝিমঝিমা। আহা। কিন্তু শেষ লাইনটা অমোঘ। কিন্তু তুমি সত্যিই কি নারী?

তবে কে ওই কবির 'তুমি'? যাকে একটু সন্দেহ হচ্ছে প্রেমার্থ কবির? কবির সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হত।

এরকম অনেক 'ভাল হত' চাপা পড়ে যায় কাজের চাপে। লোকজন নেই। বহু কাজ সামলাতে হয়। লেপ্রসি মিশন রে, রক্তদান শিবির রে, এইড্স এইচ আইভি রে...।

হ্যাঁ, আইভি কেও সামলাতে হয় বইকি। কতদিন বলেছে চলো অনিকেতদা, বাইকে করে তোমাকে পৌঁছে দিই। আইভি বাইক চালায়, আবার বক্সার। মহিলা বক্সিং-এর ন্যাশনাল প্লেয়ার। স্পোর্টস দপ্তরটা আইভি দ্যাখে।

প্রযোজকদের সরকারি ভাষায় বলে প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ। সংক্ষেপে পেক্স। নিজেরা নিজেদের বলে পেকু। অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করা আর পরিকল্পিত অনুষ্ঠানগুলোকে কার্যকরী করাই ওর কাজ। ওকে বিজ্ঞান আর স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলো দেখতে হয়।

এখানে টেলিভিশন এসেছিল ১৯৭৫ সালে। '৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে মধ্যবিত্তদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় টেলিভিশন। প্রথমে ছিল শুধুই সরকারি টেলিভিশন-দূরদর্শন। এখন তো কত শত চ্যানেল। গ্রামেও পৌঁছে গিয়েছে কেব্‌ল। আকাশবাণীর অবস্থা জলসাঘরের বিশ্বম্ভরের মতো। ঝুলপড়া ঝাড়বাতি আছে। কিন্তু আলো জ্বলে না। সেই আগেকার মতো শিশুমহল-মহিলামহল-গল্পদাদুর আসর-শুক্রবারের নাটক সবই হয়, কিন্তু সেই জৌলুস নেই। নেই নেই করেও এখনও কিছু শ্রোতা আছেন। অধিকাংশই গ্রামের। শহরের কিছু বয়স্ক মানুষ আছেন, যাঁরা অভ্যাসবশত রেডিও শ্রোতা।

এই আখ্যানের শুরু ১৯৯৫ সালে। তখনও এতগুলো চ্যানেল বাজারে দাপাদাপি শুরু করেনি। টিনএজারদের জন্য ম্যাগাজিন চালু হয়নি—যেখানে 'ছোটদের বাৎসায়ন' টাইপের কিশোর উপযোগী সেকস টিপস থাকে। সিনেমা থিয়েটারের সংলাপে খিস্তি চালু হয়নি, ভূমি-চন্দ্রবিন্দু-ফসিল আসেনি। আকাশবাণীর তখনও বেশ কিছু নিয়মিত শ্রোতা রয়েছে, যদিও শতকরা ৯৫ ভাগই গ্রাম-গঞ্জের শ্রোতা। পশ্চিমবাংলার অনেক গ্রামেই এখনও বিদ্যুৎ নেই। '৯৫ সালে তো আরও ছিল না। যেখানে বিদ্যুৎ গিয়েছে, সেখানেও সবার ঘরে টেলিভিশন নেই। টেলিভিশন থাকলেও কেব্‌ল পৌঁছয়নি। ক'জনই বা ডিশ অ্যান্টেনা কিনে নানারকম চ্যানেল আঁকশি দিয়ে ধরতে পারত। ফলত, নেই-নেই করেও শ্রোতা আছে। সম্প্রচারে ঘড়ঘড় শব্দ সত্ত্বেও কিছু মানুষের বিনোদন ও জিজ্ঞাসা নিরসনের উপায় রেডিও।

১৯৯৫ সালের কোনও একদিনে অনিকেতের টেবিলে অনেক চিঠি। 'প্রেমার্থ কবি'-র চিঠিটা ব্যাগে রাখল। অনিকেতের একটা হবি আছে, পাগলের চিঠি জমানো। ওই ফাইলে ঢুকে যাবে এটা। ওই ফাইলে রাজ্যপালের কাছে কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লেখা বা সুচিত্রা সেন-কে লেখা চিঠি আছে। কপি টু স্টেশন ডিরেক্টর। সহকর্মীরা সবাই জানে অনিকেতের পাগলা-ফাইল আছে। তাই এ ধরনের চিঠিগুলো শেষ পর্যন্ত অনিকেতের কাছেই যায়। কেউ মুখ্যমন্ত্রীকে লিখছে ওকে চক্রান্ত করে নোবেল প্রাইজটা দেওয়া হচ্ছে না, কেউ লিখছে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার যন্ত্র আবিষ্কার করতে চায়, কেউ লিখছে সুসংবাদ। সুসংবাদ! আমি যদিও পুরুষ, তবুও গর্ভধারণ করিয়াছি। আমার এখন সাত মাস চলিতেছে। চালতার আচার খাইতেছি...।

প্রেমার্থ কবি-র চিঠিটা ব্যাগে পোরার পর বাকি চিঠিগুলো খুলতে থাকে অনিকেত। নানা ধরনের চিঠি। বাতব্যাধি নিয়া একদিন বিস্তারিত আলোচনা প্রচার করুন, পাইখানা কষিয়া গেলে ঢ্যাড়স খাইলে কি উপকার হয়? পেটের গ্যাস কয় প্রকার? কচু খাইলে কি সুগার বৃদ্ধি হয়?—

ইত্যাদি নানারকম প্রশ্ন-সংবলিত চিঠি। এর ভিতর একটা চিঠি একটু অনরকম। বানান অবিকৃত রেখে পুরো চিঠিটাই উদ্ধৃত করছি'

মাননীয় মহাশয়, আমি এক গ্রামের ছেলে। দশম শ্রেণির ছাত্র। আপনাদের স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান শুনি। কত সমস্যার কি সুন্দর উত্তর দিয়া দেন। এখন আমি আমার এক গোপন সমস্যার কথা বলি। রাত্রে প্রায়ই আমার প্যানিসের দ্বার দিয়া শরীরের সারমশলা নির্গত হইয়া যায়। কিছুতেই চেক করিতে পারি না। খারাপ-খারাপ স্বপ্নও দেখি। ভয়ে কোনও কোনও দিন রাত্রে ঘুমাই না। কি রূপে উদ্ধার পাইব? আগে হস্তমোচন করিতাম। ওই কু-অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছি। এখন রাত্রে শুইবার আগে রবারের গার্ডার দিয়া প্যানিস আটকাইয়া রাখি। তা সত্ত্বেও ওই পদার্থ নির্গত হইয়া যায়। রবার দিয়া আটকানোর ফলে ওই অঙ্গ ফুলিয়া যায়, খুব বেথাও হয়। কী মুশকিলে পড়িলাম, আমার পড়াশোনা করিতে ইচ্ছা করে না। আমাকে উদ্ধার করুন।

এই ধরনের আরও চিঠিপত্র আসে। প্রথম দিকে এসব ফেলে দিত অনিকেত, কিছুদিন যাবৎ বিন-এ না-ফেলে অন্য একটা ফাইলে জমিয়ে রাখছে। নানা ধরনের সমস্যা। ছেলেরাই বেশি লিখছে, কিশোর কিংবা সদ্য-যুবার সংখ্যা বেশ ভালই।

অনিকেত কিছুদিন ধরেই ভাবছিল কিশোর-কিশোরীদের নিজস্ব সমস্যা নিয়ে একটা আলাদা ধারাবাহিক করা যায় কি না, যা একান্তই ওদের সমস্যা। যার উত্তর ওরা পায় না। পাড়ার দাদা-দিদিদের কাছ থেকে ভুল উত্তর পায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো তুলতেই পারে না। অনিকেত একদিন কেন্দ্র-অধিকর্তাকে প্রস্তাব দেয় কিশোর-কিশোরীদের নিজস্ব সমস্যা নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করলে কেমন হয়? কেন্দ্র-অধিকর্তা বললেন—ওদের নিজস্ব সমস্যা মানে? অনিকেত ব্যাখ্যা করে—যেমন ধরুন স্যর, কোনও কিশোর লিখছে, ও মাস্টারবেট করে, ফলে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, অথচ মাস্টারবেট না-করেও পারছে না। এখন ও কী করবে? কেউ লিখছে গোঁফ বেরুচ্ছে বলে লজ্জা করছে। ঠোঁটের ওপরে চুন লেপে দিচ্ছে যেন গোঁফ না বের হয়। গোঁফ বেরনো মানেই তো বড় হয়ে গেল। বড় হতে ওর ভাল লাগে না। কেউ লিখছে বাসে-ট্রেনে দাঁড়ালেই ওদের পিছনে কোনও বয়স্ক পুরুষ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। পেছনে চাপ দিচ্ছে। এক ধরনের আনক্যানি ফিলিং হচ্ছে। কোনও কিশোরী মেয়ে লিখছে মেনস্ট্রুয়েশনের সময় যে ব্লিডিং হয়, এতে তো শরীরের রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে, তা হলে শরীরের কী কী ক্ষতি হতে পারে...

কেন্দ্র-অধিকর্তা থামিয়ে দেন। ঠিকাছে ঠিকাছে...। এরকম অশ্লীল প্রোগ্রাম রেডিওতে করার কথা কী ভাবে ভাবছেন? তা কি হয় নাকি? এখান থেকে মহালয়া হয়। বীরেন ভদ্র-বাণীকুমার-পঙ্কজ মল্লিক-ভিজি যোগ-লীলা মজুমদাররা এখানে কাজ করে গিয়েছেন। এখান থেকে 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী', 'পথের দাবী', 'আনন্দমঠ' হয়। এসব অশ্লীল প্রোগ্রাম রেডিওতে হয় না কি?

অনিকেত তো যতটা সম্ভব যৌনতা-বাচক শব্দগুলোকে ইংরেজিতেই বলেছিল। হস্তমৈথুন না বলে মাস্টারবেট, মাসিক না বলে মেনস্ট্রুয়েশন এরকম। ব্লাড না বলে রক্ত-ও বলেছে। রক্ত তো নিরীহ শব্দ। যদি পুংলিঙ্গ বলার দরকার হত তা হলে পেনিস বলত। যৌনতাবাচক শব্দগুলোকে বাংলায় বললে ভদ্রলোকের কানে অশ্লীল লাগে, কিন্তু ইংরেজিতে বললে অনেকটাই মেরামত হয়ে যায়। বাঙালি মধ্যবিত্তরা ডাক্তারদের কাছে গিয়ে পেটের ওপরকার সমস্যা হলে বাংলাতেই বলে। যেমন বুক ধড়ফড় করে, চোখ কটকট করে, কান ভোঁ-ভোঁ করে, মাথা ব্যথা করে। আবার হাঁটুর তলাকার সমস্যাগুলোও বাংলায় বলতে দোষ নেই। ঝামেলা হয়

পেলভিক রিজিওন-এর শব্দ এবং সমস্যাগুলো বলার সময়। পায়খানা পরিষ্কার হচ্ছে না বলতে গেলে ভদ্রোচিত বাক্য হল বাথরুম ক্লিয়ার হচ্ছে না। এখন হাগু-র বদলে পটি কথাটার আমদানি হয়েছে। ভদ্রলোক অর্শ কিংবা ফিসচুলা রোগীদের বড় সমস্যা। কুঁচকিতে দাদ হলেও মুশকিল। কুঁচকির ইংরেজি জানা থাকে না।

অনিকেত স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে যায় না। তবু একবার বলে—স্যর, শরীর নিয়ে সবরকম প্রোগ্রামই তো করছি—বেস্ট ফিডিং, কন্ট্রাসেপটিভ, এড্‌স, এসবও তো করছি। অশ্লীল তো কেউ বলছে না...

বস বললেন, আরে উই মাস্ট ডু দোজ প্রোগ্রাম। বিকজ উই আর ইনস্ট্রাকটেড ফ্রম ডেল্‌হি। এড্‌স নিয়ে করা এক জিনিস আর মাস্টারবেশন নিয়ে রেডিওতে টক-দেওয়া অন্য জিনিস। আপনি মাস্টারবেশন সম্পর্কে কী বলবেন? অনিকেত বলল—স্যর, কিন্তু ভুল ধারণা বাজারে আছে, যেমন ৮০ ফোঁটা রক্ত থেকে এক ফোঁটা সিমেন তৈরি হয়। ওসব বেরিয়ে যাওয়া মানে শরীরের সার পদার্থ চলে যাওয়া। এসব তো ভুল ধারণা...।

—তাহলে কি আপনি রেডিওতে বলবেন—ছেলেরা, তোমরা যত খুশি মাস্টারবেট করো, ওতে শরীরের কিচ্ছু ক্ষতি হয় না...।

—না, ঠিক তা নয় স্যর...।

—ঠিকাছে।

বসদের মুখের 'ঠিক আছে' মানে কিচ্ছু ঠিক নেই। এই ঠিক আছে-র মানে হল তুমি এবার যেতে পারো। অনিকেত চলে যায়।

ওর কী যায় আসে? প্রোগ্রামটা না-করলেও যা মাইনে পাবে, করলে তো আর বেশি কিছু মাইনেপত্তর পাবে না, উল্টে খাটাখাটনি বাড়বে। ঠিকাছে, যেমন চলছে, চলুক।

স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গে অনিকেতের ওই যে কথাবার্তার কথা বললাম, তখন স্কুল-টুলে সেক্স এডুকেশন নিয়ে কিছু ভাবার কথা কল্পনাই করা যেত না। এড্‌স রোগটার কথা সবে শোনা যাচ্ছে। সমকামীদের সম্পর্কে কোনওরকম আলোচনাই পত্রপত্রিকায় হত না। এনজিও-দেরও যৌনশিক্ষা-টিক্ষা নিয়ে কোনওরকম কাজ করার কথা মাথাতেই আসত না। কিশোর-কিশোরীদের জন্য আলাদা পত্রপত্রিকা দু-একটা ছিল। যেমন 'কিশোর ভারতী'। ওই সব পত্রিকায় ছাপা হত অ্যাডভেঞ্চার, মহাপুরুষদের জীবনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনি, যোগব্যায়াম—এইসব। ওই সময় মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু মেয়েরা তখনও রাস্তায় টাইট গেঞ্জি আর চামড়া আঁকড়ে ধরা নিম্নাঙ্গের পোশাক পরে কলেজে যেত না। কলেজে সালোয়ার-কামিজই চলত, কখনও জিন্‌স এবং শার্ট। টেলিভিশনে হুইস্‌পার জাতীয় স্যানিটারি ন্যাপকিনের বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে। নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েরাও ঋতুকালীন মা-মাসিদের ন্যাকড়া অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, পয়সা বেশি লাগলেও। ফলে প্যান্টির ব্যবহার এসেছে। ঋতুকালীন অবস্থা ছাড়াও প্যান্টি ব্যবহৃত হতে লাগল। ৭০ বা ৮০-র দশকেও শাড়িপরা মহিলারা প্যান্টি পরতেন না। বাড়িতে বাচ্চা এলে হিজড়েরা চলে আসত। হিজড়েদের ভাবা হত এরা জন্ম থেকেই না-পুরুষ না-মহিলা। ভাবা হত এরা ঈশ্বরের ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট। অনিকেত যে স্টেশন ডিরেক্টরের কাছে ওই প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল, তাঁর বয়েস তখন চুয়ান্ন। রিটায়ার করতে আর ক'বছর বাকি,

তা ছাড়া উনি স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজের শিষ্য।

তাঁরও ভাগ্য ভাল, অনিকেতেরও ভাগ্য ভাল, উনি প্রোমোশন পেয়ে দিল্লি চলে গেলেন।

একনজ নতুন স্টেশন ডিরেক্টর এলেন। তিনি প্রায় অনিকেতেরই বয়সি। একটা সময় কলকাতায় কাজ করতেন। অনিকেত এখন যা কাজ করে, উনিও তাই করতেন। পাকেচক্রে কিংবা ভাগ্যবলে উনিই স্টেশন ডিরেক্টর। অনিকেতের সঙ্গে কিছুটা ভাবসাবও ছিল। ওঁর নাম সুমিত চক্রবর্তী।

ইতিমধ্যে আরও কিছু চিঠিপত্র জড়ো হয়েছে, এবং ওগুলো ফাইল-বন্দিও করা হয়েছে। এইসব চিঠিপত্র তো ফাইল-বন্দি করার মতো কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয়। সবই ফেলে দেওয়া হয়। শুধু চিঠিপত্র কেন, কত সব অমূল্য নথিপত্রও নষ্ট হয়ে যায় বা নষ্ট করে ফেলা হয়। আকাশবাণী-তে কে না এসেছেন! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্টুডিওতে এসে কোনও দিন অংশগ্রহণ করেননি ঠিকই, ওঁর কবিতা পাঠ কালিম্পং-এ রেকর্ড করা হয়েছিল। কিন্তু নজরুল ইসলাম দীর্ঘকাল আকাশবাণী-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, গজেন মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীহাররঞ্জন রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, শিবরাম চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, অম্লান দত্ত, প্রমথনাথ বিশী, পরিমল গোস্বামী...কে নয়? তাঁরা যা পাঠ করেছিলেন বা যে-বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দিতে হত, তার একটা পাণ্ডুলিপি জমা দিতে হত। সেই মূল পাণ্ডুলিপি প্রোগ্রাম ফাইলে রাখা হত বা এখনও হয়। উদ্দেশ্য হল, যদি কোনও কারণে যান্ত্রিক গন্ডগোলে রেকর্ড করা অনুষ্ঠান ব্যাহত হয়, তখন ঘোষক নিজেই পড়ে দেবেন। কিংবা যদি কোনও বিতর্ক হয়, ওই পাণ্ডুলিপিটাই প্রমাণ হিসেবে থাকে। সম্প্রচারের দিন একটি ফাইল ডিউটি রুমে জমা দেওয়া হয়। ওই ফাইলে থাকে সারাদিনের অনুষ্ঠান সূচি, বিভিন্ন ঘোষণা, নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা, চিঠিপত্রের উত্তর, আবহাওয়ার খবর, আলু-পেঁয়াজ-আনাজের বাজারদর, এবং সেই সঙ্গেই গাঁথা থাকতে পারে অমলেন্দু দে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, বুদ্ধদেব গুহ, সুধীর চক্রবর্তীর পাণ্ডুলিপি। এইভাবেই গাঁথা থাকত জীবনানন্দ দাশের কবিতা, সুনীতিকুমারের প্রবন্ধ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প। সম্প্রচারের পর ওই প্রোগ্রাম ফাইল একটা জায়গায় ডাঁই করে রাখা হয়। মাস তিনেক পরে এগুলো কাজ মিটে যাওয়া বাজে কাগজ হিসেবে নষ্ট করে দেওয়া হয়। আলু-পেঁয়াজের দর আর বিকাশ সিংহের বক্তৃতা একইভাবে ধাপার মাঠে ঢ্যাড়স ফলায়। যদি সুকুমার সেন-সুনীতিকুমার-নীহাররঞ্জন রায় হারিয়ে যেতে পারেন, তো খোলাপোতার নিবারণ সর্দার কিংবা হিঙ্গলগঞ্জের আব্দুল সুকুরের চিঠিও থাকার কথা নয়।

কিন্তু বেশ কয়েকটা চিঠি জমিয়ে রেখেছিল অনিকেত। কয়েকটা চিঠি সঙ্গে করে সুমিত চক্রবর্তীর ঘরে গেল স্টেশন ডিরেক্টর হলেও ওঁকে সুমিতদা সম্বোধন করে অনিকেত।

বলল সুমিতদা, একটা প্রোপোজাল নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। প্রোপোজালটা দেব। তার আগে কয়েকটা চিঠি পড়াতে চাই।

প্রথমে নিরীহ চিঠিটা ধরায়।

ছন্দা রাণী মণ্ডলের লেখা একটা পোস্ট কার্ড, গ্রাম রাজধরপুর, পোঃ ভট্টবাটি, জেলা মুর্শিদাবাদ।

মাননীয় মহাশয়, আমার বয়স একুশ বৎসর। মাধ্যমিক পাশ দিয়া আর কিছু করি না,

বাড়িতে মায়ের সঙ্গে গৃহস্থালী কাজ করি। আমি বাড়ির বোঝা। কারণ গায়ের রং কালো। কিন্তু আমার মা আমার মতো কালো নয়। বাবাও খুব কালো নয়। কিন্তু আমি খুব কালো। পাত্রপক্ষ আমাকে কিছুতেই পছন্দ করিতেছে না। কেহ বলিয়াছিল কাঁচা দুধ মাখিলে রং ফরসা হয়। গোপনে নিজেদের গরুর দুধ মাখিয়াছি। কিছু লাভ হয় নাই। কি করিলে গায়ের রং ফরসা হইবে দয়া করিয়া জানাইয়া দিবেন। আমার মাঝেমাঝে মনে হয় এ জীবন রাখিব না। ফলিডল খাইয়া মরিব। আমাকে আপনারা মরিতে দিবেন না কি বাঁচাইবার চেষ্টা করিবেন। একটু ফরসা হইবার উপায় জানাইয়া দিন।

স্টেশন ডিরেক্টর সুমিতবাবু বললেন পড়লাম। কী করতে চান?

অনিকেত বলল বলছি, সুমিতদা, আর একটা চিঠি পড়ে নিন, তারপর বলছি।

চিঠিটা একটা ইনল্যান্ডে। প্রেরকের নাম-ঠিকানা ইংরেজিতে লেখা। ডি. কে মাহাতো। ভিলেজ কালাঝোরি, পোস্ট অফিস সোলাঝোরি, জেলা-পুরুলিয়া।

শ্রদ্ধেয় অনিকেতদা, ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আপনার প্রশ্নোত্তরের অনুষ্ঠানগুলো নিয়মিত শুনে থাকি। খুব ভাল লাগে। ডাক্তারবাবুকে দিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া করাবেন। আমার নাম আর গ্রামের নাম উল্লেখ করবেন না, শুধু বলবেন পুরুলিয়া থেকে ডি. কে। আমি ঠিকই বুঝে নেব। আমি ২৩ বছরে পা দিয়েছি। উচ্চতায় সাড়ে পাঁচ ফুট। আমি বি.এ পাশ। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের পরীক্ষা দিয়াছি। আমার সমস্যার কথা বলি। আমার লিঙ্গ মুণ্ডটি চামড়ায় ঢাকা। যখন উত্থিত হয়, তখনও চামড়ায় আবৃত থাকে। আমার ঠাকুরদাদার লিঙ্গ আমি দেখেছি। শিথিল অবস্থাতেও লিঙ্গর মুখ মুক্ত থাকে। আমার বন্ধু-বান্ধবরাও বলেছে লিঙ্গ মুণ্ড চামড়ায় ঢাকা থাকা পৌরুষের লক্ষণ নয়। যদি এটা বংশানুক্রমিক হয় তবে আমার ঠাকুরদাদার লিঙ্গটি তো চামড়ায় আবৃত নয়। আমার পিতার কেমন ছিল আমি জানি না। কারণ শৈশবেই আমি পিতৃহারা হয়েছি। কি করলে লিঙ্গমুণ্ড পরিপূর্ণ মুক্ত করা যায়? হাত দিয়ে টেনে মুক্ত করার চেষ্টা করলে চামড়ায় ভীষণ টান লাগে এবং যন্ত্রণা হয়। একবার জোর করে টেনে ছিলাম, তখন রক্তপাত হয়েছে। এ নিয়ে আমার খুব চিন্তা হয়। বন্ধুরা বলেছে আমি বিয়ের পর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে পারব না। তার মানে জীবনের একটি অধ্যায় থেকে আমাকে বঞ্চিত হতে হবে। দু-তিনবার ব্লেড নিয়ে কেটে চামড়া ছাড়াতে গিয়েছি। আমার এক বন্ধু বলেছিল একটু খানি কেটে দিলেই চামড়াটা ছেড়ে দিবে। কিন্তু একটুখানি কাটিলেই যন্ত্রণায় আর পারি নাই। প্রচুর রক্তপাত হতে শুরু করল, তখন চুন আর চিনি দিয়েছি। তারপর আবার প্রবল জ্বালা। রক্ত বন্ধ হলেও এখনও স্থানটি ফুলিয়া আছে প্রস্রাব করিতে গেলে জ্বালা করে। লজ্জায় হাসপাতালে যেতে পারি না। ওখানে প্রকাশ্যে বের করে দেখাতে হবে। এবার আমি কী করব? আমাকে বাঁচান। আমার সমস্যার সমাধান করে দিন। আর একটা কথা বলি। আমার একটি প্রেমিকা আছে। শরীরের নয়, হৃদয়ের। প্রণাম অন্তে ডি. কে।

পুনশ্চ : ডিম খেলে কি বেশি স্বপ্নদোষ হয়? ডিম খাওয়া বন্ধ করে দিলে কি স্বপ্নদোষ বন্ধ হবে?

—আপনি এসব চিঠিপত্র জমিয়ে রেখেছেন? লোকে ভাববে আপনি পারভারটেড। ডেট তো দেখছি ছ'মাস আগেকার।

—আপনিও একথা বলছেন সুমিতদা?

—আর কেউ বলেছে বুঝি?

আমাদের আগের স্টেশন ডিরেক্টরের কাছে প্রোপোজালটা এনেছিলাম, উনি এককথায় খারিজ করে দিয়েছিলেন।

সুমিত চক্রবর্তী বললেন—এটা সামলাতে পারবেন তো? অনিকেত বলল প্রোপোজালটা অ্যাপ্রুভ করে দিন আগে, তারপর দেখি কী করে এগোন যায়। একটা অ্যাডভাইসরি বোর্ডও করে নেওয়া যাবে। সাইকোলজিস্ট, গাইনকলজিস্ট, শিক্ষাবিদ, স্যোসিওলজিস্ট, এঁরা সব থাকবেন...

সুমিত চক্রবর্তী বললেন—ওরা তো কফি খাবে, মিটিং ফি নেবে আর বাকতাল্লা দেবে। যা করার আপনাকেই করতে হবে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই ধরনের একটা ঝামেলাওলা প্রোগ্রাম করার কথা আপনার মাথায় এল কী করে?

অনিকেত বলল—ওই তো, নানা ধরনের চিঠিপত্র, জিজ্ঞাসা...। দেখুন, আমরা কৃষি সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিই, কখন কী সার, পোকা মারার বিষ কীভাবে দেব, মহিলা মহলে বলি শুক্তোয় কী ফোড়ন দেব, চোখের তলার কালি কমাতে গেলে কী করতে হবে—এসব তো বলি। সংগীত শিক্ষার আসরে সুর তাল লয় সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিই, ছাত্রছাত্রীদের ক্যারিয়ার সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিই। মেঘ কেন ডাকে, পিলে কেন চমকায় এসবও তো বলি। শরীর-স্বাস্থ্য বিষয়ে গ্যাস অম্বল বুক ধুকপুকের বাইরে যেতে পারি না?

সুমিত চক্রবর্তী বললেন—যেতে পারি না এমন নয়, কিন্তু, যাইনি কখনও। আমাদের নাটকের সংলাপে শালা শব্দটা ইউজ হয়? আমরা তো কেটে দিই। তেভাগা আন্দোলনের ওপর লেখা একটা নাটকের সংলাপে ছিল এক চাষিকে পুলিশ জিজ্ঞাসা করছে, তোর ছেলে কোথায়? চাষি বলেছিল, হাগতে গিয়েছে। ড্রামা প্রডিউসার ওটা কেটে বাহ্য ত্যাগ করতে গিয়েছে করেছিলেন। কত গান আমরা বাজাতে পারি না। যে সব চিঠির নমুনা দেখালেন, জানি না কী করে ওসব সামলাবেন। কিন্তু এটাও বুঝি আপনি যা বলছেন, ভুল বলছেন না। কিন্তু এটা সরকারি চাকরি কিনা, এখানে আবেগের কোনও জায়গা নেই। আমাদের অফিসের রিটায়ার করা লোকরা একটা ক্লাব করেছে। অবকাশ নাম, ওদের একটা সুভেনিরে পড়ছিলাম একটা ঘটনা। শুনবেন? সময় আছে?

এ যে দেখি উল্টো। অনিকেত কোথায় ওর বসকে বলবে আমি আপনার সময় নষ্ট করছি না তো স্যর?

এসডি বললেন—বেশ ইন্টারেস্টিং একটা লেখা। অজয় দাশগুপ্ত নামে একজন অ্যানাউনসার ছিলেন, তাঁরই লেখা এটা। তখন এক বছরের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হত, কন্ট্রাক্ট রিনিউ হত।

একদিন তিনি রবিবারের দুপুরে অনুরোধের আসর চালাচ্ছিলেন। সন্ধ্যা মুখার্জির গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু চালিয়ে দিয়ে একটু টয়লেটে গেলেন। গানটায় ইন্দ্রধনুর নু-তে গিয়ে একটা অদ্ভুত গলা কাঁপানোর কাজ আছে। রেকর্ডটা ট্রাকব্যাক করছিল একটা মোক্ষম জায়গায়। নু তে গিয়ে। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা কত অশ্লীল। পাক্কা এক-দেড় মিনিট ধরে নু তে

ট্র্যাকব্যাক করল। ভাবুন কী অশ্লীল। অজয়বাবুর কন্ট্র্যাক্ট রিনিউ হল না। চাকরিটা গেল। যদি বন্দেমাতরমেও ট্র্যাকব্যাক করত, বারবার তরমতরম হত, তা হলে কিন্তু চাকরি যেত না।

সুতরাং যা করবেন, ভেবে করবেন। আমার চাকরিটা অন্তত বাঁচাবেন।

প্রোপোজালটা রেখে যান।

একটা মিটিং বসেছে।

প্রথমে অনুষ্ঠানটার একটা নাম ঠিক করা হবে। তারপর ঠিক হবে, ধারাবাহিকটা কীভাবে এগোবে। কী কী বিষয় থাকবে। সপ্তাহে, একদিন করে, এক বছর ধরে চলবে। মানে বাহান্নটা পর্ব।

অনিকেত কতগুলো নাম সামনে রাখল।

চৌকাঠ।

সন্ধিকাল।

বয়ঃসন্ধি।

জীবন যেরকম।

সন্ধিক্ষণ।

মনোবিদ দেবলীনা সান্যাল আছেন, ডাক্তার বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় আছেন, গায়নোকলজিস্ট ভারতী বসু মজুমদার আছেন, সমাজতাত্ত্বিক মালা ভদ্র আছেন। একজন সাহিত্যিককেও রাখা হয়েছিল।

সাহিত্যিক বললেন—'গোপন কথাটি রবে না গোপনে' নামটা কেমন হয়?

মনোবিদ বললেন—আবার রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনছেন কেন? তা ছাড়া এত কাব্যিক নাম দরকার কী? একদম স্ট্রেটকাট নাম রাখুন।

সাহিত্যিক বললেন—তাহলে ওই রবীন্দ্রসংগীতটা দিয়ে প্রতিদিন অনুষ্ঠানটা শুরু করা যেত আর কী!

সমাজতাত্ত্বিক বললেন, চৌকাঠ নামটা মন্দ নয়। একটা ফেজ থেকে একটা নতুন ফেজ-এ যাচ্ছে। স্টেশন ডিরেক্টর বললেন, আমার মনে হয় 'সন্ধিক্ষণ' নামটাই থাকুক।

সবাই ঘাড় নাড়ল। স্টেশন ডিরেক্টরের ওপর তো কথা চলে না।

এবার কী কী বিষয় রাখা যায় বলুন আপনারা। মনোবিদ দেবলীনা সান্যাল বললেন—অ্যাডোলেসেন্‌স সাইকোলজি খুব ইম্পর্ট্যান্ট। সাইকোলজি-র দিকটা তো রাখতেই হবে। এসময় ওরা নিজেদের শিশুও ভাবতে পারে না, আবার অ্যাডাল্টও ভাবতে পারে না। একটা আইডেনটিটি ক্রাইসিস তৈরি হয়। অনেকের বাইপোলার সিনড্রোম তৈরি হয়, হাইপোকনড্রিয়াসিস হয়ে যেতে পারে, অ্যাংজাইটি তো আছেই, কেউ কেউ খুব মেলানকলিক

হয়ে যায়। ফাংশনাল মেন্টাল ইলনেস ব্যাপারটাতে জোর দিতে হবে।

ডাক্তার বিষ্ণু মুখার্জি বললেন—শরীর ব্যাপারটাকে তো জানাতে হবে। শুধু মনের কথা বললেই কী হবে? হরমোনের কাজ, কেন গোঁফ ওঠে, কেন স্তন তৈরি হয়, কেন এবং কীভাবে স্পার্ম তৈরি হয়, এসব বলা দরকার তো। রিপ্রোডাকশন সিস্টেম-টাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার।

গায়নোকলজিস্ট বললেন—এখন ভীষণ অ্যাবোর্শন হচ্ছে। রাস্তায়-রাস্তায় হ্যান্ডবিল সাঁটা-তিন মিনিটেই বিনা কষ্টে গর্ভপাত। গর্ভপাত ব্যাপারটা মোটেই ভাল নয়, এই বয়সেই সেটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সমাজবিদ বললেন—তা হলে কি কন্ট্রাসেপশনও শেখানো উচিত? আপনি কী বলেন? স্টেশন ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলেন মালা ভদ্র। স্টেশন ডিরেক্টর বললেন—টিনএজারদের কন্ট্রাসেপশন শেখানোর পরিস্থিতি আমাদের দেশে তৈরি হয়নি এখনও। তা হলে তো ফোরপ্লেও শেখাতে হয়...।

অনিকেত এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। অনিকেত বলল, আমি কয়েকটা ঘটনা বলি। একদম সত্যি ঘটনা। একটি ছেলে, বছর ষোলো-সতেরো বয়েস। খুব ভাল ফুটবল খেলে। ওদের গ্রামের জুনিয়র টিম ওকে ছাড়া ভাবাই যায় না। হঠাৎ ও খেলাধুলো বন্ধ করে দিল। মাঠেই যায় না। খেলার সঙ্গীদের দেখলেই এড়িয়ে চলে। ওদের কোচ একদিন ছেলেটার কাছে গেল, দেখল ছেলেটা কীরকম মনমরা। মুষড়ে আছে। জিগ্যেস করল, কী হয়েছে তোর? খেলতে যাস না কেন? ছেলেটা কিছুই বলছিল না। অনেকবার জিগ্যেস করার পর বলল, আমি আর মাঠে যাচ্ছি না, আমি খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছি, আমার দ্বারা আর খেলা হবে না।

কেন খেলা হবে না তোর, তুই তো খুব ভাল খেলিস।

ছেলেটা মাথা নিচু করে আছে।

কোচ বললেন, কিছু কি লুকোতে চাস? আমার কাছে বলে ফ্যাল। নিঃসংকোচে বলে ফ্যাল।

ছেলেটা মাথা নিচু করে বলল—আমার খুব স্বপ্নদোষ হয়। আমি খুব দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। কোচ তখন ছেলেটার পিঠে হাত রাখল। ওই কোচই আমাকে ঘটনাটা বলেছে আর কী, সে বোঝাল ফালতু ভয় পাচ্ছিস তুই, জলের ট্যাঙ্কি ওভারফ্লো করে না বুঝি? যে-শুক্রটা তোর তৈরি হচ্ছে, যেখানে তৈরি হয়, সেই অঙ্গটার নাম বলেছিল কোচ, প্রচলিত স্ল্যাং-এ, সেই শুক্রটা একটা থলিতে এক ধরনের তরলের মধ্যে জমা থাকে। ওই তরল পদার্থটা বেশি হয়ে গেলেই ট্যাঙ্কি ওভারফ্লো করে পাইপ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এরকম সবার হয়। আমারও হত, এখনও হয়। এ নিয়ে একদম দুশ্চিন্তা করবি না।

ছেলেটা তারপর থেকে আবার মাঠে আসছে।

সাহিত্যিক বললেন—আরে এটাকে ডায়লগ বসিয়ে নাটক করে নিন না কেন? নাটকের মধ্যে দিয়ে তো খুব ভাল করে বলা যায়।

স্টেশন ডিরেক্টর বললেন, ইট্স আ গুড আইডিয়া। অনিকেত বলল, আর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। ফাল্গুন মাসে হাড়োয়াতে একটা মেলা হয়। গোরাচাঁদের মেলা। গোরাচাঁদ একজন পির ছিলেন। ওখানে বিরাট মেলা বসে ১২ ফাল্গুন। ওখানে একটা জায়গায় খুব ভিড়। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যাই। একটা লোক মাদুলি বিক্রি করছে। স্বপ্নদোষের মাদুলি। এই ধরনের লোকেরা খুব ভাল-ভাল কথা বলতে পারে। খুব কনভিন্সিং কথাবার্তা বলে। ও

বলছে স্বপ্নদোষের ফলে কী ভয়ানক বিপদ হয়। জীবন শেষ হয়ে যায়। তিলে-তিলে জীবন শেষ হয়ে যায়। টিবি পর্যন্ত হতে পারে। ছেলেটা একটা জনমজুর। মেলায় এসেছিল একটা জামা কিনবে বলে। ওর জামা কেনা হল না। একান্ন টাকা দিয়ে একটা মাদুলি কিনে নিল। অনেক সো কল্ড বৈদ্যরাজের হ্যান্ডবিল দেখেছি। আপনারাও নিশ্চয়ই দেখেছেন। ওরা লেখে জলে নামলে পেচ্ছাপের বেগ পাওয়াটা নাকি খুব খারাপ। এটা যৌন-রোগের পূর্বাভাস। এটা তো অনেকেরই হয়। ওই সব হ্যান্ডবিলের কথা বিশ্বাস করে বহু লোক মিছিমিছি টাকা খরচ করে। বৈদ্যরাজরা বলে লিঙ্গ বাঁকা একটা খুব খারাপ রোগ। প্রথমে একটুখানি বাঁকা, পরে আরও বেঁকে যাবে...এরকম কত যে ভুল ধারণা আছে, কী বলব...। আর একটা হার্ড রিয়েলিটি হ'ল গ্রামের নব্যসাক্ষর-রা অ-আ-ক-খ-র পর যে রিডিং ম্যাটিরিয়াল পায়, তা হ'ল ভোটের পোস্টার আর এইসব হ্যান্ডবিল সরি, বিষয় থেকে সরে যাচ্ছি...।

সমাজতাত্ত্বিক মালা ভদ্র বললেন—আরে, সবই তো ছেলেদের প্রবলেম বলছেন। মেয়েদেরও তো কত প্রবলেম, কত ভুল ধারণা। গাইনি ভারতী বসু মজুমদার বললেন—রেডিও গ্রামের মানুষই বেশি শোনে, তাই তো? গ্রামের মেয়েরা মেন্‌সট্রুয়েশনাল হাইজিন নিয়ে একদম অ্যাওয়্যার নয়। টিভি-তে তো এত স্যানিটারি ন্যাপকিনের বিজ্ঞাপন। গরিব মানুষরা কিনতে পারে? ভাবতেই পারে না, এর জন্য মাসে তিরিশ-চল্লিশ টাকা খরচ করার কথা। ওরা স্রেফ ন্যাকড়া ব্যবহার করে। কিন্তু ন্যাকড়া তো শাড়ি থেকেই আসে। ক'টাই বা শাড়ি? ছেঁড়া শাড়িও তো পরতে হয় যতদিন সম্ভব পরা যায়। সুতরাং ওই ন্যাকড়া রিসাইকেল করতে হয়। রক্তে ভেজা ন্যাকড়া ফেলে দিতে পারে না। ধুয়ে আবার ব্যবহার করে। কিন্তু শুকোবে কোথায়? পুরুষের চোখের আড়ালে শুকোতে হয়। এটা যেন অপরাধ, এটা যেন অন্যায়। এই স্ত্রী-রক্ত অপবিত্র, অশুচি। ঝোপেঝাড়ে ছায়ায় শুকোতে দেয়। ভাল করে শুকোয় না। হয়তো দু'সেট ন্যাকড়া আছে, ভাল করে না শুকোনোর আগেই পরে নেয়। ভেজা অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়। কত কেস পেতাম, যখন গ্রামের হাসপাতালে কাজ করতাম। সেটা অবশ্য কুড়ি বছর আগেকার কথা, কিন্তু অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি সেটা বুঝলাম যখন মেডিকেল টিম নিয়ে সুন্দরবনে গেলাম কিছুদিন আগে একটা এনজিও-র কাজে। এখনও মাসে দু'বার করে যাই। একইরকম অবস্থা। বলি, খটখটে রোদ্দুরে শুকোতে দাও না কেন? ঘোমটা টেনে, জিভ বের করে ওইসব মেয়ে বলে, এ মা, কী লজ্জা, ব্যাটাছেলেরা দেখে ফেলবে না...মালা ভদ্র বললেন—সত্যিই এসব নিয়ে কখনও মিডিয়া কাজ করেনি। সরকারি প্রচারও কিছু নেই। আর একটা ব্যাপার দেখুন, নিজেদের শরীরের ওপর এই আধুনিক প্রজন্মের কোনও 'সে' নেই। সবই মিডিয়া-নিয়ন্ত্রিত। মিডিয়া বলে দিচ্ছে তোমাদের শরীর কেমন হবে। কোনও বিজ্ঞাপন বলছে, অমুক তেল ব্যবহার করো, তাতে তোমাদের ব্রেস্ট বাড়বে। ব্রেস্ট ছোট থাকা খুব খারাপ। নারীই হলে না তুমি। আবার মিডিয়াই বলছে জিরো ফিগারই হল আইডিয়াল। রোগা হও। স্তন ছোট রাখো। ছোটখাটো ফিগারের মেয়েরাই হল সুন্দরী। মেয়েরা ডায়েটিং করছে। কিচ্ছু খাচ্ছে না। দুর্বল হয়ে পড়ছে। খবরকাগজে কিছুদিন আগে একটা খবর বেরিয়েছিল—একটা বস্তাবন্দি কিশোরীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। তদন্তে যেটা উঠে এল সেটা ভয়ংকর ব্যাপার। ওই মেয়েটার বয়স বছর কুড়ি। মেয়েটার স্তন ছোট ছিল। কোথায় একটা বিজ্ঞাপনে দেখেছিল কী একটা তেল মালিশ করলে

স্তন বড় হয়ে যায়। একটা ওষুধের দোকানে গিয়ে ওই তেল কিনতে গিয়েছিল। ওখানকার দোকানদার ওকে বলেছিল, নিজে-নিজে মাসাজ করলে কিছু লাভ নেই, মাসাজের একটা কৌশল আছে। ছেলেটা, যাকে বলে, মেয়েটাকে পটায়। ছেলেটা মাসাজ করার নাম করে নিয়মিত মেয়েটাকে ইউজ করতে থাকে। মেয়েটা প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ে। তারপর একটা [illegible]কে দিয়ে অ্যাবোর্ট করাতে গিয়ে মেয়েটাকে মেরে ফ্যালে। তারপর বডিটা...

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে হরিমতি নামের এক দশ বছরের বালিকা খুন হয়। পরিকল্পনা মাফিক খুন নয়, স্ত্রী-র কাজ করতে গিয়ে মেয়েটি মারা যায়। দশ বছরের বালিকার সঙ্গে স্ত্রী-সংসর্গ করতে গিয়ে তার স্বামীদেবতা মেয়েটিকে বলাৎকার করে মেরে ফেলেছিল। সে সময়ের পত্রপত্রিকায় খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল। কিছুটা হইচইও হয়েছিল। জনৈক বিভূতিভূষণ শর্মা বঙ্গবাসী পত্রিকায় চিঠি লিখেছিলেন, এই মৃত্যু দুঃখজনক হইলেও শাস্ত্রীয়। কারণ শাস্ত্রানুযায়ী, প্রত্যেক স্বামীরই কর্তব্য রজোদর্শনের পর গর্ভাধান করা।

হরিমতির স্বামীর সাজা হওয়া তো দূরস্থান, কোনও সামাজিক নিন্দাও হয়নি। হরিমতির বাড়ির লোকরাও এটা একটা দুর্ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিল। এই ক্রান্তীয় অঞ্চলে দশ বছরের বালিকার রজোদর্শন তো হতেই পারে। এবং দশবিধ সংস্কারের মতো গর্ভাধানও গুরুত্বপূর্ণ বটে-ই, আর হরিমতির স্বামীও শুভদিনেই শুভকর্মটি সমাধা করতে গিয়েছিলেন।

তবে ওই ঘটনায় ইংরেজ শাসকরা সহবাস সম্মতি আইন প্রণয়ন করে বিয়ের ন্যূনতম বয়স ধার্য করতে চেয়েছিলেন বারো বছর। সম্রাট আকবরও ১৫৮০ সালে মেয়েদের বিয়ের বয়স চোদ্দো বছর করে দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রবল বিরোধিতায় পিছিয়ে যান। ব্রিটিশ-রাজের প্রস্তাবিত ওই আইনের প্রতিবাদে ১৮৯১ সালে কলকাতায় যে-জনসভাটি হয়েছিল, সেটাই কলকাতায় প্রথম প্রকাশ্য জনসভা। বিদ্যাসাগর মশাই অল্প কিছুদিন আগে দেহ রেখেছেন। ওই প্রতিবাদ সভা তিনি দেখেননি। তবে সহবাস সম্মতি আইন প্রণয়নে বিদ্যাসাগরের প্ররোচনা এবং চেষ্টা ছিল। বিদ্যাসাগর আগেই বলেছিলেন সহবাস সম্মতির ন্যূনতম বয়স বারো বছর ধার্য হলেও, স্বামীর অত্যাচার থেকে স্ত্রী-জাতিকে রক্ষা করা যাবে না। এ দেশে কন্যারা কম বয়সেই ঋতুমতী হয়, কিন্তু ঋতুমতী হলেও ওদের অঙ্গ সকল তখনও সুগঠিত হয় না। সন্তান ধারণের উপযোগী হয় না। তিনি আকবরের আইনটিকে আবার ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এতটা সাহসী হয়নি। মৌলবাদী চাপের কাছে নতিস্বীকার করেছিল।

কিছুদিন আগে দক্ষিণ এশিয়ার কিশোর-কিশোরীদের সমস্যা নিয়ে দিল্লিতে একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল রাষ্ট্রপুঞ্জ। ওই আলোচনা সভায় কিশোর-কিশোরীদেরও হাজির করা হয়েছিল। সম্মেলনের পর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে ভারতে, প্রতি পাঁচজনে একজন কিশোরী মা হতে বাধ্য হয় ধর্ষিতা হয়ে। অবশ্য, স্বামীর দ্বারা ধর্ষণ ও এর মধ্যে ধরা আছে। ওই নাবালিকারা তখনও ঠিকমতো জানতেই পারেনি—যৌনতা কী বস্তু। শ্রীলঙ্কা ছাড়া অন্যান্য দেশের কিশোর-কিশোরীরা জানিয়েছে, তাদের শরীর ঘিরে যেসব প্রশ্ন জাগে, তার উত্তর তারা শিক্ষক বা অভিভাবকদের কাছ থেকে পায় না। একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রীলঙ্কা। ওদেশের স্কুলেই এ-বিষয়ে দরকারি কিছু তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়।

সম্প্রতি ভারতের ছ'টি মেট্রো শহরের সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, যৌনকর্মীদের আঠাশ

শতাংশের বয়েস আঠারোর কম। এবং ১৯৯৩ সালের একটা সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে সাড়ে পঁচিশ লক্ষ বিবাহিতা কিশোরী এবং সোয়া এগারো লক্ষ বিবাহিত কিশোর রয়েছে, যাদের বয়স দশ থেকে চোদ্দোর মধ্যে। পনেরো থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যে দাম্পত্য শুরু করে দিয়েছে এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ কিশোর-কিশোরী। এরা অনেকেই নিজেদের শরীর জানে না, অঙ্গগুলোর কাজ জানে না, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নিয়ম জানে না।

এরকম কোনও সমীক্ষার খবর আমাদের জানা নেই, যা থেকে আমরা বুঝতে পারব—সারা দেশে কত গর্ভপাত হয়, কতজনকে গর্ভপাত করতে বাধ্য করাতে হয়, তার মধ্যে বিবাহিতা এবং অবিবাহিতার সংখ্যা কত, গর্ভপাতকালীন মৃত্যুর সংখ্যাই বা কত—এগুলো জানার কোনও উপায় নেই।

সম্প্রতি বাঁকুড়ায় একটি ওষুধের দোকানের ভিতরে গর্ভপাতের সময় বর্ণালী গড়াই নামে এক কিশোরীর মৃত্যুর ঘটনা কাগজে বেরিয়েছে। অপর একটি ওষুধের দোকানের হিসেবের গোপন খাতা থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে যে, তিন মাসে পঁচাশিটি গর্ভপাত ঘটানো হয়েছিল—তার মানে ওইসব চোরা কুঠুরিগুলো কোনওদিন খালি থাকেনি।

এরকম চোরাকুঠুরি ছেয়ে যাচ্ছে গ্রামে, মফস্সলে। পাঁচ মিনিটে সাকশান পদ্ধতিতে বন্ধ ঋতু নিয়মিত করা হয়—লাল ত্রিকোণ আঁকা এরকম সব মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রের মহা সমারোহ আলুর আড়তের পিছনে, সারের দোকানের পাশে, বকুল গাছের নীচে নকুল দাসের কোয়াক চেম্বারে। এসব জায়গায় যাদের যেতে হচ্ছে, তাদের একটা বড় অংশই কমবয়সি কন্যা। শরীর এবং প্রজনন-সংক্রান্ত এদের অজ্ঞানতার সুযোগ নেয় একদিকে কিছু শরীর-লোভী পুরুষ, অন্যদিকে ওই গর্ভপাতের ক্লিনিকগুলো। যারা ফিসফিস কোরাসে বলেছিল ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। শুধু গর্ভপাত ক্লিনিকগুলোই নয়, প্রচুর 'বৈদ্যরাজের' দেখাও পাওয়া যায় হাটে বাজারে, যারা কিশোর বয়সের স্বাভাবিক ঘটনাগুলোর বিকৃত ব্যাখ্যা করে ব্যবসা করে থাকে।

আসলে, ঠিক তথ্যগুলোকে ঠিক ভাবে সরবরাহ করা হয় না বলেই আমরা অনেক অসম্পূর্ণতা নিয়ে বড় হই। পাড়ার ডেঁপো দাদা বা স্কুলের পাকা বাবুদের কাছ থেকে আমরা যে শরীর-শিক্ষা লাভ করি, তা প্রায়শই ভুল। আমরা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকেই চিনি না। একটি শিশু, সে কোথা থেকে এল, এই স্বাভাবিক প্রশ্নের কত রকমের উত্তর শোনে। হাসপাতাল থেকে কেনা হয়েছে, ভগবান দিয়ে গিয়েছে, পরি এসে রেখে গিয়েছে। এরকম আরও। শিশুরা ঠিকই বোঝে এগুলো মিথ্যে। বাবা-মা-কে মিথ্যেবাদী ভাবতে শেখে। শিশুরাও তো বিশ্বপ্রকৃতি দেখে। মানুষের যেমন বাচ্চা হয়, কুকুর, বেড়াল, গরু, ছাগলেরও বাচ্চা হয়। ওদের বাচ্চার জন্য তো ছাগলের মা-কে হাসপাতালে যেতে হয় না, ভগবানও দিয়ে যায় না। এক্ষেত্রে অবশ্য গ্রাম শহরের কিছুটা পার্থক্য আছে। গ্রামের শিশুরা প্রকৃতির কাছাকাছি থাকে বলে প্রকৃতিই তাদের পাঠ দেয়। কিন্তু সুস্থভাবে স্বাস্থ্য শেখানো সম্ভব। যৌন স্বাস্থ্যও তো স্বাস্থ্যের মধ্যেই পড়ে।

ছেলেমেয়েরা জানতে চায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেই সেমিনারে মহারাষ্ট্রের একটি মেয়ে বলেছিল—বড়রা তো অনেক কিছুই নিষেধ করে। নিষেধের কারণ বলে না। কারণ বলে না, তাই নিষেধ শুনি না। সবকিছু ঠিক মতো বুঝতে পারলে আমরাই ঠিক করতে পারব কীসে বিপদ, কতটা বিপদ, কেন বিপদ। সাবধান হব। একই রকম কথা শ্রীলঙ্কার নয়নতারা

কক্ষপতির। নয়নতারা বলেছিল আমাদের জানতে দাও, নইলে জোর করে জানব। হয়তো ভুল জানব, কিন্তু জানাটাকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। বড়রা আমাদের পথ দেখাও, নইলে নিজেরাই পথ ঠিক করে নেব, হয়তো সেটা ভুল পথ হবে।

আমরা কী করে জানব এবং জানাব তা আমাদের ভাবতে হবে।

হরিমতির মতো ঘটনা আজকাল কমে গেলেও বর্ণালি গড়াই-রা তো ভুগছে। মুশকিল হচ্ছে, এখন বিদ্যাসাগরের মতো কেউ নেই। তা বলে কি অবস্থার পরিবর্তন হবে না?

এই যে একটা প্রতিবেদন লেখা হল, তার মধ্যে স্বয়ং এই লেখক কি অনেকটাই যেন প্রকট হয়ে গেল? লেখক নিজস্ব মন্তব্য করে ফেলল। হয়তো অন্যভাবেও বলা যেত। কিন্তু আমাদের অনেক আখ্যানেই দেখা গিয়েছে লেখক স্বয়ং নিজস্ব মন্তব্য করে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই তো আমরা এই ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছি। এই আখ্যানে অনিকেত নামে একটা চরিত্র রাখা হয়েছে। এই লেখক এবং অনিকেত তো এক ব্যক্তি নয়, ওরা দু'জন আলাদা। লেখাটা তো উত্তমপুরুষেও করা যেত, তা হলে তাঁর চোখের আড়ালে কিছু দেখানো যেত না, ফলে অনিকেত থাকতনা। সুতরাং অনিকেতেই ফিরে আসি।

ওই মিটিংটার পর অনিকেত ভাবতে থাকে অনুষ্ঠানটাকে কীভাবে আস্তে-আস্তে এগিয়ে নেওয়া যায়। আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার এই ঘটনাটা ১৯৯৫ সালের। তখনও পশ্চিমবাংলার স্কুলে জীবনশৈলী জাতীয় পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ২০০৭ সাল নাগাদ অ্যাডোলেসেন্স্ এডুকেশন জাতীয় একটা পাঠ্যক্রম চালু হয়, কিন্তু বেশিরভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা এটা ভাল ভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। এখন ও-পাঠ উঠেই গিয়েছে। তবে যৌনশিক্ষা নিয়ে লেগে পড়েছে বেশ কিছু এনজিও। টিনএজারদের টার্গেট করে কিছু পত্রিকাও বেরিয়ে গিয়েছে। বাজারে উচ্চমধ্যবিত্তদের মধ্যে খাচ্ছেও। কিন্তু তখন, ১৯৯৫-এ, অনিকেতের সহকর্মীরা বলছে—কী ব্যাপার, আপনি নাকি ছেলেমেয়েদের পাকাবার জন্য প্রোগ্রাম ফেঁদেছেন? একজন সিনিয়র দাদা বললেন, রেডিওটা এবার সত্যিই উঠে যাবে। একজন সিনিয়র দিদি বললেন, অনিকেতের সন্তান নেই কিনা, তাই অন্যদের বাচ্চাদের নিয়ে মাথাব্যথা নেই। পাকাচ্ছে।

অনিকেতের নিজের বাচ্চা নেই। ভেবেছিল হবে, অনিকেতের স্ত্রী শুক্লা-র মনে একটা গভীর দুঃখ আছে। এখন এই বর্তমানে, মুখে-মুখে ফেরা গানটা—'যেটা ছিল না ছিল না সেটা না পাওয়াই থাক/সব পেলে নষ্ট জীবন' শুক্লা শুনে বলে : ঢং। ওই গানটা ওকে শুশ্রূষা দেয়নি। একটা রবীন্দ্রসংগীত, যেটা খুব একটা শোনা যায় না, সেই গানটা কোথায় শুনেছিল কে জানে—ওটা গুনগুন করত—'অনেকদিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে/মৌনবীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে।'

আরও কিছু-কিছু গান করত—'বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি', কিংবা 'নাই যদি বা এলে তুমি'—এইসব। এসব তো মনখারাপের গান। এগুলো কি ব্যথার মলম? রবীন্দ্রনাথ যত রকমের ব্যাথার মলম তৈরি করেছিলেন?

অনিকেত চেষ্টা করেছে। নিজের পরীক্ষাটাও করিয়েছিল। শুক্লারও। দেখা গেল

ফ্যালোপিয়ান টিউবে সিস্ট। টিউমার অপারেশন হল, কিছুদিন পর আবার গজাল। কিছুদিন পরে ওভারির ওপরেও সিস্ট। অপারেশন। এরপর ওভারিতে টিউমার আবার। ডাক্তাররা বললেন, দু'টো ওভারিই ফেলে দিন। কতবার কাটাছেঁড়া করবেন? তা ছাড়া বারবার টিউমার হলে ক্যান্সারের সম্ভাবনাও থেকে যায়।

অগত্যা ছেঁটে ফেলতে হল ওভারি দু'টো। ওভারি চলে যাওয়া মানেই ইস্ট্রোজেনের জোগান কমে যাওয়া, যার ফলে ক্যালসিয়াম মেটাবলিজ্‌ম-এর ব্যাঘাত, হাড় ক্ষয়ে যাওয়া, হাঁটুব্যথা, খিটখিটে হয়ে যাওয়া...। এরই মধ্যে শুক্লা 'সেই ভাল সেই ভাল' গাইলে অনিকেত তার ওপর দিয়ে শ্যামল মিত্রের 'যাক যা গেছে তা যাক' গেয়ে ফেলেছিল। শুক্লা তখন তিন-চারটে শব্দ ছুড়ে দিয়েছিল মুখের ভিতর থেকে। 'নিষ্ঠুর, ভীষণ নিষ্ঠুর তুমি। বাজে।' সঙ্গে ছলকানো মৃদু থুতু। অনিকেত তখন 'যাব্বাবা'-টাও বলতে পারল না। মনে-মনে বলল ওটা। ও তো সান্ত্বনাই দিতে চেয়েছিল। শ্যামল মিত্রের গানে কি সান্ত্বনা হয় না? আসলে ওটাও হাইপো-ইস্ট্রোজেনের এফেক্ট। কথায়-কথায় রেগে যাওয়া, খিটমিট করা, এসব তো হবেই।

কিছু-কিছু বাজে ঘটনা ঘটতে থাকল। অনিকেত-এর ভাগ্নির বিয়েতে গিয়েছিল। কোনও একটা মেয়েলি অনুষ্ঠানে পাঁচ এয়ো-র দরকার হয়। অনিকেতের বোন শুক্লাকে ডাকল। তখন অনিকেতের বোনের শাশুড়ি কানে-কানে কিছু বলল ওর বউমাকে। অনিকেতের বোন তখন শুক্লাকে বলল, থাক গো, তোমায় কুলো ধরতে হবে না। শুক্লা থপথপ করে পিছনের দিকের একটা চেয়ারে বসে পড়ল। কিছু মুখে দিল না। শুক্লা অনিকেতকে বলেছিল কেন ওরা আমাকে কুলো ধরতে বারণ করল বলো তো!

—কেন!

—আমি বাঁজা বলে...।

অনিকেত বলেছিল—ছি ছি, এরকম ভাবছ কেন? অসুখের ওপর কি কারও হাত থাকে? কত লোকের তো গলব্লাডার ফেলে দিতে হয়...

—গলব্লাডার ফেলে দিলে বাঁজা হয় না। ওভারি ফেলে দিলে হয়।

—না, তাই বলে 'বাঁজা' শব্দটা বলছ কেন?

—তবে কী বলব? সন্তানধারণে অক্ষমা? অন্ধকে অন্ধ বলিও না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না...তুমি কি সেই থিওরি দিচ্ছ নাকি? একদিন শুক্লা বলল—আচ্ছা, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয়, লিভারও নাকি ট্রান্সপ্লান্ট হয়, ওভারি হয় না?

অনিকেত হাল্কা ইয়ার্কি করার চেষ্টা করে। বলে, তোমার যদি কিডনি খারাপ হয়, সেটা নয় আমি দেব, কিন্তু আমার তো ওভারি নেই, তবে, যেটা আছে সেটা যদি তোমায় দিয়ে দিই, আমি তো বাপ হতে পারব না।

শুক্লা বলেছিল, ধুর, তুমি কেন, কত তো বউ আছে, একটা-দু'টো বাচ্চা হওয়ার পর অপারেশন করে নিয়েছে। ওদের তো ওভারি আছে। দিতে পারে না? টাকা দেব, টাকা দিয়ে কিনে নেব, যেমন ধরো দুলালের মা। ও তো বিধবা। ওর তো আর বাচ্চা হবে না। যদি ওকে টাকা দিয়ে ওর ওভারি নেওয়া যেত... অবশ্য ওর ওটাও তো অ্যাদ্দিনে শুকিয়ে গেছে...।

না গো, সেটা হয় না...। অনিকেত বলেছিল। অন্যের তাজা ওভারিও ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা যায়

না। একটা ডিম্বাণু পুরো বংশধারাটা বহন করে কিনা...। অনিকেত শুক্লার মাথায় হাত রেখেছিল।

কতদিন পর 'গো' বলেছিল অনিকেত। হ্যাঁগো, ওগো-র কথা হচ্ছে না; ওই যে 'না গো' বলেছিল, ওর মধ্যে অসহায়তা আর সহমর্মিতা বোধহয় চন্দন বাটার মত মিশে গিয়েছিল। নইলে শুক্লা অকস্মাৎ অনিকেতের বুকে মাথা রাখবে কেন? উল্টোদিকে আয়না ছিল। অনিকেত দেখছিল শুক্লার গাল বেয়ে জল পড়ছে। দেবী চৌধুরাণীর ওই জায়গাটা মনে পড়ল—ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া-সুঝিয়া আ ছি ছি, আ ছি ছি, ধিক ব্রজেশ্বর যেখানে জল গড়াইয়া আসিতেছিল, সেইখানে চুম্বন করিলেন।

শুক্লা কাক-কে খেতে দেয় তিনবেলা। কাকেদের সঙ্গে কথাও বলে। কাকগুলো সবই তো একরকম দেখতে হয়। শুক্লা বোধহয় কয়েকটা কাক-কে আলাদা করতে পারে। নইলে কেনই বা বলবে—'অ্যাই, তুই বড্ড হ্যাংলা, তুই তো একটু আগে খেয়ে গেলি, তোর দাদাকে পাঠিয়ে দে।'

শুক্লার কাক-প্রীতি দেখে পাখির হাট থেকে খাঁচায় ভরা ময়না কিনে এনেছিল অনিকেত। শুক্লা পাখি দেখেই রেগে গেল। বলল, ছিঃ পাখি দিয়ে ভোলাচ্ছ আমায়!

মনে-মনে আবার 'যাব্বাবা' বলে অনিকেত। ওর ভালর জন্যই তো আনতে গিয়েছিল পাখি। এতদিন বিবাহিত জীবনযাপন করার পরও ওর বউকে চিনতে পারল না অনিকেত। ও মিনমিন করে বলেছিল—কাক ভালবাস কিনা, তাই একটা ময়না এনেছিলাম...

খাঁচার পাখি এনেছ আমার জন্য? কীরকম তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল শুক্লা। তারপর খাঁচার দরজাটা খুলে দিল।

ময়নাটা খাঁচা থেকে বের হল। দু'পা এগোল। একবার ডানা ঝাপ্টাল, তারপর আবার গুটিগুটি করে খাঁচার ভিতরে ঢুকে গেল।

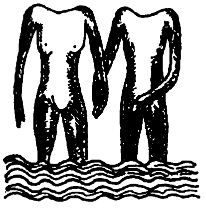

দুলালের মা যখন বিধবা হয়, দুলালের বয়স তখন তিন, আর দুলালের মায়ের বয়স উনিশ। দুলালের মায়ের একটা নাম আছে, থাকারই কথা। কারণ ওর একটা রেশন কার্ড আছে। রেশন কার্ডে তো দুলালের মা লেখা থাকে না। দুলালের মায়ের একটা ভোটার কার্ডও আছে। সেখানে নিশ্চয়ই ওর নাম, স্বামীর নাম লেখা আছে। ভোটার কার্ডে চন্দ্রবিন্দু থাকে না।

দুলালের মা অনিকেতদের বাড়িতে কাজ করে কুড়ি বছর ধরে। অনিকেতের বিয়েতে মশলা বেটেছে, মাছ কুটেছে, উলু দিয়েছে। অনিকেতের বাবার সেবা করেছে, অনিকেতের মায়ের পায়ে আলতা পরিয়ে দিয়েছে। আবার ওই পায়েরই ছাপ তুলেছে সাদা কাগজে। অনিকেতকে বলেছে ভাল করে রেকে দাও দাদাবাবু, মায়ের পদচিহ্ন।

দুলালের মা একদিন শুক্লাকে বলেছিল অল্প বয়সে বেধবা হয়েছি—তা কী করব, কপালে নেকা ছিল, কিন্তু আমার নারী জন্মো সাত্থক। পেটে তো ধরিচি, দুলাল তো হয়েছে। দুলালকে তো পেইচি। কিন্তু দুলালের মা এখন দুলালকে দেখাতে পারবে না। কারণ দুলাল নেই। দুলাল নিরুদ্দেশ। আট বছর হয়ে গেল। কেউ বলেছে, দুলালকে দেখলাম সাগর মেলায়, সাধু হয়ে গিয়েছে। কেউ বলল, স্মাগলিং করতে বাংলাদেশে গিয়েছিল, সেখানে ওরা আটকে রেখেছে। দুলাল কাঁচা-আনাজের ব্যবসা করত। চাষিদের কাছ থেকে মাল কিনে হাটে বেচত। দুলালের 'সাইকিল' ছিল না। অনিকেতের বাবা দুলালকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছিল।

দুলালের মা কাজে আসার সময় মাঝে-মাঝেই হাতে ধরে লাউটা-মুলোটা নিয়ে আসত। একেবারে শিশিরে-ভেজা ফুলকপিও এনেছে দুলালের মা। ওই কাজটা ভাল লাগত না দুলালের। লস খেত। কাঁচা-আনাজের ব্যবসা ছেড়ে আলতা-সিঁদুর-নেলপালিশ-পাউডার বেচত গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে, সাইকেল সাজিয়ে।

এই মুকুন্দপুরে অনিকেতদের বহুদিনের বাস। এই অঞ্চলে মাহিষ্য বারুজীবী ছাড়াও ক্যাওট জাতের লোক ছিল প্রচুর, কিছু সর্দারও ছিল। এধারে নাকি নীল চাষ হত এককালে। নীল চাষের জন্য বাইরে থেকে লোক আমদানি করা হয়েছিল। মুকুন্দপুরের কাছেই একটা গ্রাম আছে, গ্রামটির নাম উইলার হাট। ওটা বোধহয় উইলিয়াম নামে কোন নীলকরের নাম থেকে এসেছে। নীল চাষ কবে শেষ, উইলিয়াম রয়ে গিয়েছে! যখন কাঁকুড়গাছির কাছ দিয়ে বাস যায় কন্ডাক্টর রত্না-রত্না করে চেঁচায়। অনেকে টিকিট কাটার সময় কন্ডাক্টরকে বলে 'রত্না'। আসলে ওখানে অনেক আগে রত্না কেবিন বলে একটা চায়ের দোকান ছিল। রত্না কেবিন উঠে গিয়েছে কবে, রত্না রয়ে গিয়েছে। মুকুন্দপুরে এখন বিরাট একটা হাসপাতাল। রংবাহারি বাড়ি আর অ্যাপার্টমেন্ট। এইসব বাড়িগুলোরও বাহারি বাহারি নাম। মোনালিসা, কারুবাসনা, মায়ামৃদঙ্গ, লাপিস লাজুলি...। আশপাশের এলাকাগুলোর নাম শুঁড়া, পুরকুড়িয়া, বকচোরা, হোগলিয়া...। গরুর হাটে একটা শিশুউদ্যান হয়েছে। পোস্টার পড়ে—গরুর হাটের শিশুউদ্যানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ওইসব পুরকুড়িয়া, হোগালিয়াতেও এখন ফ্ল্যাটের চাষ। লাউলতায় ছাওয়া পুরনো খড়ের ঘরও দু'-একটা আছে। ছিটকালিকাপুরে বিরাট একটা সরকারি বাড়ি হয়েছে—লোক সংস্কৃতি কেন্দ্র। পোস্টারে, হোর্ডিং-এ ওরা লেখে লোকোগ্রাম। লিখুকগে। লোকমুখে ওটা ছিটকলগেপুর। ওই ছিটকলগেপুরের পাশের রাস্তা দিয়ে আরও মিনিট দশেক হাঁটার পর জমিটা নিচু হয়ে যায়। বর্ষায় জল জমে। ওখানে ফ্ল্যাটের চাষ শুরু হয়নি। কপি, মূলো, পালংয়ের চাষ হয় শীতে। নাবাল জমি পেরিয়ে একটা গ্রাম। গ্রামটা প্রাচীনই হবে, নইলে ওখানে একটা মাজার রয়েছে কেন? একটা পিরের মাজার। একটা বটগাছের ছায়ায় একা-একা ঝিমোয় একটা মাজার। মাজারের লাল ইটগুলো বেরিয়ে পড়েছে, ইটের ফাঁকে শেকড় বসিয়েছে আর একটা বটগাছ। লাল-লাল ইটের ফাঁকে-ফাঁকে সবুজ-সবুজ শেওলা। শেওলার মধ্যেই তো ইতিহাস। এই পিরের নাম নাকি খাজাই পির। ধূপ-ধুনো পড়ে না, কেউ চাদর দেয় না, কেউ আতর ঢালে না, ফুল দেয় না। অযত্নে পড়ে থাকে পিরের ওই মাজার। বটগাছের ডালে অল্প কিছু ঢিল বাঁধা। মনস্কামনাগুলো বাতাসে দোলে। বছরে একবার কারা সব আসে। ফুল দেয়। ঢিল বাঁধে। চাদরও কেউ-কেউ দেয়, কিন্তু গাঁয়ের কেউ-না-কেউ সেই চাদর তুলে নিয়ে যায়। গ্রামটির নামও পিরের নামে। খাজাইতলা। ওই খাজাইতলা গ্রামেই দুলালের মা

থাকে। ওখান থেকে মুকুন্দপুরে আসতে হেঁটে আধ ঘণ্টা মতো লাগে। মাঝখানের নাবাল জমিটার জন্য ঠিকঠাক রাস্তা তৈরি হতে পারেনি। ভ্যানে যেতে গেলে বেশ কিছুটা ঘুরে যেতে হয়। চার কিলোমিটারের মতো দূরত্ব হয়ে যায়। দুলালের মা যখন না-বলে, না-কয়ে কামাই করেছে, খোঁজ নেওয়ার জন্য অনিকেত ওর গাঁয়ে গিয়েছে বার দুয়েক। একবার গিয়ে দেখল জ্বর, আর একবার গিয়ে দেখল দুলালের মা মাথা চাপড়াচ্ছে, কারণ কে নাকি খবর দিয়েছিল লগার মাঠে বাঁওড়ের ধারে একটা ব্যাটা ছেলের বডি পাওয়া গিয়েছে, তার মাথা নেই। হাতে চৌকো মাদুলি। চৌকো মাদুলি শুনেই দুলালের মা অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফেরার পর বলে দুলালের কাছে নিয়ে চলো। গাঁয়ের লোকরা নিয়ে যায়। লগার মাঠ ওখান থেকে আধঘণ্টার পথ। সঙ্গে দুলালের ছেলেটাকেও নিয়ে যায়। গায়ের লোকেরা দুলালের বউকে বলে, কি গো, সোয়ামীর বডি দেখে চিনতে পারবে তো? বউ চুপ ছিল। দুলালের মা নাকি তখন বলেছিল, চলো, আমাকেই নিয়ে চলো। আমি ঠিক চিনতে পারব। নিজের ছেলেকে চিনতে পারব না?

গাঁয়ের লোকেরা বলল—ও যে দুলাল, তার কোনও ঠিক নেই, খালি চৌকো মাদুলিখানা আছে। দুলালের মা বলেছিল ওকে আমি চিনব নে? খালি কি মাদুলি? ওর সর্বাঙ্গ চিনি। ছোটবেলা থেকে বড় কল্লাম, নিজের ব্যাটাকে দেখে বুঝব না?

দুলালের বউ যায়নি। দুলালের ছেলেটাকেও সঙ্গে নেয়নি, দুলালের মা-ই গিয়েছিল। সেই মুণ্ডহীন দেহটা ওই বাঁওড়ের ধারে ছিল না। থানায় চলে গিয়েছিল। সেদিন আর থানায় যাওয়া হয়নি। পরদিন মর্গে। থানার পুলিশরাই গাড়ি হাঁকিয়ে মর্গে নিয়ে গিয়েছিল দুলালের মা-কে। বডি দেখে দুলালের মা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ অপেক্ষা করেছিল জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত। চোখে-মুখে জল ছিটিয়েছিল পুলিশ। জ্ঞান হওয়ার পর আবার লাশের কাছে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। দুলালের মা খুব জোরে মাথা নড়ে বলেছিল জানি না, জানি না, জানি না গো। পুলিশ বলেছিল জানি না বললে হবে না। হয় বলো ও তোমার ছেলে, নইলে বলো ও তোমার ছেলে নয়।

দুলালের মা বলেছিল—না, ও আমার ছেলে নয়। অনিকেত যখন গেল, দেখল দুলালের মা মাথা চাপড়াচ্ছে; আর 'দুলাল, আমার দুলাল রে' বলে সুর করে কেঁদে চলেছে। শহরের মানুষ সুর করে কাঁদে না। আবেগকে প্রশ্রয় না-দেওয়াটাই শহুরেপনা। অনিকেতকে দেখে ওর কান্না বেড়ে গেল। একটা ছোট ছেলে চুপচাপ বসে আছে দুলালের মায়ের পাশে। ওর চোখে জল নেই। দুলালের মা অনিকেতকে বলল, কী সব্বোনাশ হয়ে গেল দাদাবাবু গো...। আমার দুলালকে কারা মেরে ফেলেছে...।

দুলালের বউ খুন্তি হাতে সামনে এল। খুন্তির মাথায় কিছু লেগে আছে, ওখান থেকে ধোঁয়া উঠছে। দুলালের বউ বলল—তবে যে পুলিশকে বললে ও তোমার ব্যাটা নয়! এখন তবে কাঁদচো কেন?

দুলালের মা কান্না থামিয়ে ওর দিকে কটমট করে তাকাল। সব্বনাশী, ভাতার খাকি, নজ্জা নেই, প্যাঁজ-রসুন দে ক্যাংড়া রাধচিস... ঢং দেকাচ্চিস্...

ক্যাংড়া খাব না তো কি খাব? দুধকলা? কোত্থেকে খাব। ক্যাংড়া তো বিলে-বাদাড়ে ধরি। তুই খা। সাধ করে খা। আমি খাবনে...।

ইশশ্ তুমিও তো বেধ্‌বা। মাছ-ডিম-প্যাঁজ-রসুন যখন যা পাও খাও। এখন আবার কী হল?

ঢং দেখে বাঁচিনে। ঢং আমার নাকি, ঢং তো তোমার। পুলিশকে বলে এলে ও তোমার ব্যাটা নয়, এখন পা ছড়িয়ে কাঁদচো...।

অনিকেতের দিকে তাকায় দুলালের মা। বলে, আচ্ছা, আপনিই বলুন দাদাবাবু, যদি বলতাম ওটাই আমার দুলাল, তা হলে তো সব শেষ হয়ে যেত। এরপর তো কথাই চলত না আর। এখন যেমন ভাবি দুলু ফিরবে। ঠিক ওর মায়ের কাছে ফিরবে, সেটা তো আর ভাবতে পাত্তুম না। সে আশা তো কবরে দিতুম, তাই জন্য তো বলেছি ও আমার দুলাল নয়কো।

তবে কি ওই দেহটাই দুলাল? দুলালের মা কি সেটাই ভাবছে? অনিকেত এ নিয়ে আর কিছু বলতে পারে না। দুলালের ছেলেটাকে দেখতে থাকে। বাচ্চা ছেলেটার হাতে একবাটি মুড়ি। মুড়িগুলো একটা-একটা করে মাটিতে সাজিয়েছে। একটা ফুল বানিয়েছে, একটা-একটা করে মুড়ি সাজিয়ে লিখেছে-বাবা। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এল, মুড়ির ফুল, আর মুড়ির অক্ষরগুলো এলোমেলো করে দিল।

নিজের বাবাকে কতটুকু দেখেছে ওই বালক? দুলাল যখন হারিয়ে যায় তখন ও দু'বছরের শিশু। দুলালের মা ওর নাতিটাকে সঙ্গে নিয়ে আসত মাঝে-মাঝে! অনিকেতের মা ওই বাচ্চাটাকে বলত, হাত ঘুরোলে নাড়ু দেব, নইলে নাড়ু কোথায় পাব...। বাচ্চাটা হাত ঘোরাত। আর সত্যিকারের নাড়ুই পেয়ে যেত বাচ্চাটা। নাড়ু বানাত অনিকেতের মা। নাড়ু না-থাকলে লাড্ডু, কিংবা অন্য কোনও কিছু। বাচ্চাটা একটু সুখাদ্য পাক, এই আশাটা সঙ্গে নিয়েই বাচ্চাটাকে এত দূর নিয়ে আসা। বাচ্চাটা একটু বড় হয়ে যাওয়ার পর দুলালের মা ওকে সঙ্গে করে এতটা পথ আনতে পারত না। কিন্তু অনিকেতের মা মাঝে-মাঝেই এটা-ওটা দুলালের মা-কে দিয়ে বলত, তোমার নাতিকে দিও। পুজোয় নাতির জামা কেনার জন্যও টাকা দিত। অনিকেত এবং শুভ্রা দুলালের মা-কে মাসিই ডাকে। 'মাসি' শব্দটা বাঙালি মনের অবচেতনে যেভাবে গেঁথে থেকে যেরকম ছবি তৈরি করে, দুলালের মা সেরকমই ছবি। পা ছড়িয়ে গল্প করা, পান চিবুতে-চিবুতে একটু-আধটু ঘোষবাড়ির বউ সম্পর্কে মন্তব্য—'বয়স হলে কী হবে, খুকিপনা যায় না।' কিংবা টিভি দেখতে-দেখতে কোনও দজ্জাল বউয়ের মন্তব্য শুনে বলা— 'আ মোলো যা'। মাঝে-মাঝে অনিকেতের জামা-কাপড়ও কেচে দিত ওই মাসি, কিন্তু জাঙ্গিয়া কাচতে দিত না। ওর মা-কেও ওটা কাচতে দিত না অনিকেত। ওই ছোট্ট পোশাকটা বড়দের কাছে গোপন রাখতে হয়।—এটাই শিখেছে অনিকেত। কিশোরবেলায় ওর বাবা এসব কিনে দেওয়ার কথা ভাবেনি। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে, তার সঙ্গে ড্রয়ার থেকে মায়ের পয়সা চুরি করে একটা জাঙ্গিয়া কিনেছিল। জাঙ্গিয়ার দোকানের কাউন্টারে—একটা জাঙ্গিয়া দিন বলেই একগাদা খুচরো পয়সা ঢেলে দিয়েছিল বলে দোকানদার একটু যেন অবাক হয়েছিল, তারপর একটু মুচকি হেসে বলেছিল, হুঁ, বুঝেছি। তোমার তো?

মেঝের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়িয়েছিল অনিকেত।

সাইজ জানো না, তাই তো?

আবার মাথা নাড়াল।

কাগজে মুড়ে দিয়েছিল একটা সাদা রং-এর।

ওটাকে প্যান্টের ভাঁজের মধ্যে লুকিয়ে রাখত অনিকেত।

তখন তো হাফ প্যান্ট।

পরপর অনেকদিন পরল। ব্যবহার করলে তো নোংরা হবেই। তারপর কেচে শুকনো। কোথায় শুকোবে ও? কী যে সমস্যা! টেবিলের পিছনে একটা জায়গা আবিষ্কার করেছিল ও। রোদ্দুর ঢোকার কোনও গল্পই নেই ওখানে। ভেজা-ভেজা অন্তর্বাসটাই আবার পরতে হত। এভাবে পরতে-পরতে উরুসন্ধিতে চুলকানি। তারপর বন্ধুদের পরামর্শে ঢোল কোম্পানির মলম। কী জ্বালাপোড়া! এভাবে এক-দেড় বছর। তারপর হঠাৎ বিপ্লবমনস্ক হয়ে যাওয়া। বেশ করেছি তারে মেলেছি, মেলবই তো। এরকম মানসিক বল সঞ্চয় করে প্রকাশ্যে রোদ্দুরে জাঙ্গিয়া মেলে দেওয়া। শুকিয়ে গেলে মা ঘরে তুলে আনতেন। মা কখনও ওটাকে জাঙ্গিয়া বলতেন না, বলতেন শর্টপ্যান্ট।

সে যাক। যা গেছে তা যাক। এ জন্যই তো এইসব প্রোগ্রাম করা। 'সন্ধিক্ষণ'।

কথা হচ্ছিল দুলালের মা নিয়ে।

দুলালের মা একদিন এসে জানাল দুলাল ঘরে ফেরেনি।

অনিকেতের মা বলেছিল, ঠিকই ফিরবে। দ্যাখো গে কোথায় যাত্রাটাত্রা করতে গিয়েছে।

দুলাল যাত্রা করত, সেটা অনিকেতের মা জানত। আর এটাও জানত, দুলাল মেয়েদের রোল করতে পটু। ব্যবসায়ী সমিতি প্রতিবছর অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন করে, ওখানে যাত্রাও হয়। ওরা নিজেরাই যাত্রা করে। দুলাল নাকি যশোদা করেছিল। একবার শচীমাতা-ও করেছিল। অনিকেতের মা একবার দেখতে গিয়েছিল। খুব সুখ্যাতি করেছিল দুলালের। দুলালের মা বলেছিল ছেলের খুব বিষ্ণুপ্রিয়া করার ইচ্ছে ছিল, শচীমাতা দিয়েছে বলে খুব মনখারাপ।

দুলাল ফিরল না। দুলালের মা বলল—আমার দুলাল আমাকেই শচীমাতা করে দিয়ে কোথায় চলে গেল! অনিকেতের মা বলেছিল বউ-বাচ্চা ফেলে কোথায় যাবে ও, পাখির মতো ঠিকই বাসায় ফিরবে। দেখোগে শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়েছে। বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছে?

ও ঝগড়া কী করবে? ও তো মিনমিনে। মুখ তো করে ওর বউ। বউয়ের বড্ড চোপা।

তবে দেখো, ঠিকই ফিরবে।

কিন্তু দুলাল আর ফিরল না।

দুলালের মা আশায়-আশায় পথ চেয়ে থাকত, প্রতিদিনই সকালে উঠে ভাবত আজ দুলাল এসে বলবে, ফিরে এলাম গো মা...।

আস্তে-আস্তে নিত্যদিনের কলমি শাকে, কুড়নো কাঁকড়ায়, হাঁটুর ব্যথায়, দুলালের শোক ফিকে হয়ে গেল। এরকমই হয়।

দুলাল হারিয়ে যাওয়ার এক বছরের মধ্যেই দুলালের মা একদিন জানাল বউটা ভেগেছে।

বউ চলে গিয়েছে? বলো কী? বাচ্চাটা?

পাষাণী মাগি। তিন বছরের বাচ্চাটাকে ফেলে ভেগে গেল গা।

কোথায় গেল।

কে জানে কোন ব্যাটাছেলের সঙ্গে গেল, স্বভাব-চরিত্তির তো ভাল ছিল না, অনেকের সঙ্গেই ঢলানি ছিল। দুলাল থাকতেই ওসব করত। দুলাল আমার ওসব নিয়ে কিচ্ছুটি কইত না। আমিই বরং একটু-আধটু কইতাম। নাতিটার জন্য কষ্ট হচ্ছে গো দিদি। কেবল মা-মা করছে। শুক্লা তখন 'আহা রে' শব্দটা উচ্চারণ করে ফেলেছিল। ওই 'আহা রে' শব্দটার মধ্যে এমন কী

ছিল কে জানে, দুলালের মা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, এবং বাসন মাজা আঁশটে কাপড়েই শুক্লাকে জড়িয়ে ধরল। শুক্লা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল না। এটা একটু আশ্চর্যই বটে। কারণ শুক্লার একটু পয়-পরিষ্কার বাতিক আছে। অনিকেতের মায়ের চেয়েও বেশি। বাইরে থেকে ঘরে এলে বাথরুমে গিয়ে হাত-পা-টা ধুতেই হয়। জামায় চড়াই পাখি পটি করলেও পুরো জামাটা ধুয়ে দেবে। আঁকড়ে ধরা দুলালের মা-কে ছাড়াল না শুক্লা। শুক্লার চোখেও জল দেখতে পেল অনিকেত।

মানুষের শরীর থেকে কত কিছু সিক্রেয়েশন হয়। বাইরে, ভিতরে। আমাদের রাগ, অনুরাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা, আক্রোশ, ক্রোধ সব কিছুর জন্যই দায়ী রক্তের ভিতরে গোপনে মিশতে থাকা অন্তঃস্রাবী তরল। অ্যাড্রিনালিন, এন্ড্রোজেন, ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন, থাইরকসিন কত কী। ওগুলো আমরা দেখতে পাই না। দেখতে পাই বহিঃস্রাব। মল, মূত্র, সর্দি, বীর্য, চোখের জল। এই চোখের জলের অপর নাম অশ্রু। আহা অশ্রু। এই অশ্রুধারার বড় মাহাত্ম্য। মানুষকে শুদ্ধ করে। অশ্রুবিন্দু-সমৃদ্ধ শুক্লার গণ্ডদেশটিকে প্রভূত মমতায় অবলোকন করছিল অনিকেত। চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল। শুক্লা একটু পরেই দুলালের মায়ের বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল, কিন্তু গালের দু'পাশে অশ্রুবিন্দু লেগে ছিল।

শুক্লার ঘোমটা-টোমটা নেই। প্রফুল্ল-র মুখে ঘোমটা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরানী উপন্যাসের প্রফুল্ল-র কথাই বলছি। সেকালের মেয়েরা একালের মতো নহে। ধিক একাল। তা সে ঘোমটাটুকু প্রফুল্লকে ধরিয়া বসাইবার সময় খুলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিল প্রফুল্ল কাঁদিতেছে।

ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া—আ ছি ছি। বাইশ বয়সই ধিক। ব্রজেশ্বর না-ভাবিয়া না-চিন্তিয়া যেখানে বড় ডবডবে চোখের নীচে দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল—সেই স্থানে আ ছি ছি ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুম্বন করিলেন।

অনিকেত শুক্লাকে বলেছিল, এসো। ঘরে এসো। একালের ছেলেরা সেকালের মতো নহে। মায়ের সামনেই শুক্লার পিঠে হাত দিয়ে ঘরে নিয়ে গেল অনিকেত। ধিক একাল! ঘরে গিয়ে অনিকেত ব্রজেশ্বর হয়ে গেল।

শুক্লার কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে অনিকেত বলল, দত্তক নেবে, দত্তক?

শুক্লা মাথা নাড়াল।

না, দুলালের ওই ছেলেটার কথা বলছি না, অন্য কোথাও থেকে, মাদার টেরিজা-র...

শুক্লা বলল, না, দেরি হয়ে গিয়েছে...। অনিকেত বলল, কীই বা এমন বয়স হয়েছে, আমরা এখনও অনেকদিন বাঁচব।'

শুক্লা তবুও মাথা নাড়ল নিষেধের। ওদিকে পাশের বারান্দায় দুলালের মা ঘ্যানোর ঘ্যানোর করেই চলেছে—সারাদিন বাইরে থাকি, বাচ্চাটাকে দেখার কেউ নেই গো। কী করে পারলি তুই? নিজের বাচ্চা, কত মায়ের একটা বাচ্চা নেই, একটা বাচ্চার জন্য হা-পিত্যেশ করে মরছে, মাদুলি বাঁধছে, হত্যে দিচ্ছে, অথচ তুই তোর পেটে-ধরা বাচ্চাটাকে এমনি করলি, বাচ্চাটাকে তো তুই নিজে পেটে ধরেছিলি, অন্য কেউ তো তোর ঘরে বাচ্চাটাকে গুঁজে দিয়ে যায়নি...

অনিকেত বেশ বুঝতে পারছিল বাচ্চাটাকে এখানেই গুঁজে দিতে চায় দুলালের মা। অনিকেতের এতে খুব একটা সায় নেই। দুলালের তো বাচ্চা, এদের আইকিউ কত আর ভাল

হবে? যতই ভাল মাস্টার রেখে পড়াও না কেন, যতই নিউট্রিশন দাও না কেন, আইকিউ-টাই হচ্ছে আসল। দুলালকে তো দেখেছে অনিকেত, কেমন ম্যাদামারা চেহারা, পুতুপুতু ভাব। পাউডার পমেটম বেচে, বরং টমেটম বেচলেও একটু কথা ছিল। স্মার্ট হত। ওরই তো জিন। ওকে মানুষ করা নিয়ে প্রবলেম আছে। এবার প্রশ্ন উঠতেই পারে, মাদার টেরিজা কিংবা অন্য কোনও ডিগনিটিওলা সংস্থা নিলেই যে আইকিউ ভাল হবে তার কোনও মানে আছে?

না। কোনও মানে নেই, ভ্যান হুসেন বা অ্যাডিডাস থেকে পোশাক কিনলে ঠকার ভয় নেই—মধ্যবিত্তরা এরকমই ভাবে, কিন্তু শিশু দেখে তো বোঝার কোনও উপায় নেই, কারণ সব শিশুই সুন্দর। শিশুরা মাতৃক্রোড়ে না-থেকেও সুন্দর। ওইসব কুচুমুচু শিশুদের পেডিগ্রি জানার কোনও ব্যবস্থা নেই, সুতরাং কিছুটা ভাগ্যর ওপরই ছেড়ে দিতে হয়। লটারির মতো। কিন্তু এখানে তো পেডিগ্রি-টা জানা হয়েই গিয়েছে। দুলালের বাচ্চা। কী করে ভাল হবে?

ওইসব হোম-টোম থেকেও দিব্যি ব্রিলিয়ান্ট বাচ্চা পাওয়া যায়। অনিকেতের মামাতো ভাই বিকাশ তো পেয়েছিল। বাচ্চাটাকে নিয়ে বড় গর্ব বিকাশের।

বিকাশ অনিকেতেরই বয়সি। বন্ধুরই মতো। ও এজি বেঙ্গলে কাজ করে, অনিকেতের অফিসের কাছেই ওর অফিস। ওর সঙ্গে মাঝে-মধ্যেই দেখা হয়, গল্পগাছা হয়, একসঙ্গে দোসা-টোসা খাওয়া হয়।

ও ওর দত্তক-পুত্র সম্পর্কে খুব গর্বিত ছিল। বাচ্চাটার বুদ্ধির প্রশংসা করত খুব। বাচ্চাটার নাম রাখা নিয়ে খুব সমস্যায় পড়েছিল। ওর নাম রাখতে চেয়েছিল আইনস্টাইন। বিকাশের মা-বাবা এবং বিকাশের স্ত্রীও খুব আপত্তি করেছিল। বলেছিল বাঙালির ছেলের এরকম নাম হয় না কি? ওকে ডাকতে খুব অসুবিধে হবে। বিকাশ বলেছিল—হওয়ালেই হয়। বাংলাদেশের তো একজন বিখ্যাত কবির নাম স্ট্যালিন। বাঙালিদের ঘরের প্রচুর মেয়ের নাম আছে ম্যাডোনা, মিনার্ভা, মোনালিসা। আইনস্টাইন হলে ক্ষতি কী? বিকাশের বাবা একটু পঞ্জিকাপ্রেমী। শুভদিন দেখে দত্তকের কাগজপত্র তৈরি করিয়েছিলেন। যেহেতু বাচ্চাটা ছিল কুড়িয়ে পাওয়া, জন্মদিন সঠিক জানা সম্ভব নয়, দত্তক রেজিস্ট্রির দিনটাই জন্মদিন ভেবে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী ওর নামের আদ্যাক্ষর হওয়া উচিত ছিল 'স' কিংবা 'ন' দিয়ে। বিকাশের বাবা বলেছিলেন সায়েন্টিস্টের নামেই যদি নাম রাখবে, তা হলে সত্যেন রাখো। আমাদের সত্যেন বোস কম কী? বিকাশের বালিগঞ্জী স্ত্রী-র আপত্তি ছিল। সত্যেন বসু বড় বিজ্ঞানী হতে পারেন, কিন্তু নামটা বড় 'কমন' নাম। এই নাম রাখা নিয়ে বড় চিন্তায় পড়েছিল বিকাশ। অনিকেতের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করত। বাবার পঞ্জিকা-মনস্কতা, নিজের বিজ্ঞান-মনস্কতা, স্ত্রী-র বালিগঞ্জী-মনস্কতার সমন্বয়-সাধন নিয়ে বড্ড ঝামেলায় পড়েছিল। 'র' হলেও একটা সমাধান ছিল। রামন রাখতে পারত হয়তো, বেঙ্কটরামনের নামে। কিন্তু রামন-টা দ্রুত রমণ হয়ে যেত। বিশেষত ইংরিজি বানানে। রমণ মানেটা তো সুবিধের নয়, যদিও রাধারমণ বাঙালি দিব্যি মেনে নিয়েছে। তখন কথায়-কথায় ইন্টারনেট সার্চ করার চল ছিল না। জেনারেল নলেজ বইতে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের নাম দেখতে-দেখতে নীল্‌স বোর নামটা পছন্দ হল। যিনি প্রোটন-নিউট্রন-কে ঘিরে ইলেকট্রন কীভাবে ঘোরে সেটা আবিষ্কার করেছিলেন। 'বোর' অংশটা বাদ গেল। নীল নাম রাখা হল। আদ্যাক্ষর দন্ত্য ন। সবার সাধ মিটল। বিকাশ এরপর প্রায়ই নীলের বিভিন্ন কীর্তি, বুদ্ধি, অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি টীকা-টিপ্পনী, ব্যাখ্যা, সরলার্থ, ভাবসম্প্রসারণ-সহ বর্ণনা করত।

যেমন : বুঝলি, নীল এমন সাহসী যে বোম-পটকার শব্দতেও চমকায় না। কালীপুজোর সময় এত আওয়াজ, চমকাল না একদম। অন্যান্য বাচ্চা তো চমকে যায়। আসলে বুঝলি, ওকে কালীপুজোর আগেই ট্রেন করেছি। ওর কাছে কাগজের ঠোঙা ফাটিয়ে ওকে ইমিউন করে দিয়েছি। এবং ও এত ইন্টেলিজেন্ট যে, সহজে ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে।

নীল আর একটু বড় হলে বিকাশ বলল—বুঝলি, নীলের গায়ে মশা বসেছিল, ও চাপড়ে মশাটা মেরে দিল। ওর হাতে রক্ত লেগে গেল। নীলের ইন্টেলিজেন্ট লেভেলটা বোঝ, আমাকে জিজ্ঞাসা করল—বাবা, এটা কি আমার রক্ত? আমি বললাম হ্যাঁ নীল, তোমার রক্ত। মশার পেটে ছিল। নীল তখন জিগ্যেস করল—তা হলে মশার রক্ত কোথায় গেল?

আর একটু বড় হল যখন, বিকাশ বলল, কী জবাব দিই বলত? নীল জিগ্যেস করছে—বাবা, তোমার গায়ের গন্ধ কেন আমার ভাল লাগে না, কিন্তু মায়ের গন্ধটা কী যে ভাল লাগে...।

এসব অনেক পুরনো কথা, কিন্তু হারানো নয়। মায়ের গন্ধ-র জন্য বুকের ভিতরটা রিনরিন করে উঠল অনিকেতের। রান্নাঘরের গন্ধ, ঠাকুরঘরের গন্ধ, নারকোল তেলের গন্ধ মিলেমিশে—মায়ের গন্ধ। আর ফিরে পাবে না।

'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠানটা শুরু হয়ে গেল কলকাতা বেতারে। প্রথম কয়েকটা পর্ব প্রচারিত হল। যা ভয় পেয়েছিল, তেমন কিছু হল না। গালাগাল দেওয়া কোনও চিঠিপত্র পেল না এখনও। অবশ্য প্রথম দিকে তো অনেকটাই নিরামিষ ব্যাপার ছিল। বিবর্তন, কোষ, ক্রোমোজোম... প্রজনন থেকেই ব্যাপারটা অন্যদিকে মোড় নিল। অনিকেত গোটা ধারাবাহিকটা এই ভাবে সাজিয়েছিল—

জীব জগতের বিবর্তন।

কোষ, ক্রোমোজোম, জিন ইত্যাদি।

প্রজনন প্রক্রিয়ার বিবর্তন। মানে এককোষী জীবের প্রজনন থেকে বহুকোষী জীবের প্রজননের ধারাবাহিকতা।

মানব দেহ ও প্রজনন অঙ্গ।

ডিম্বাণু, শুক্র, বীর্য, ঋতু ইত্যাদি।

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক যৌনতা।

যৌনতা সম্পর্কিত কুসংস্কার।

গর্ভপাত ও এর কুফল।

যৌন স্বাস্থ্যবিধি।

শুধু কথায় নয়, মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট নাটক রাখা হবে, এরকম পরিকল্পনা ছিল।

ওই যে ফুটবল খেলোয়াড় কিশোরটি, যে স্বপ্নদোষের কারণে খেলা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল,

কিংবা সেই কিশোরীটি, যে বিজ্ঞাপনের মোহে দোকানে গিয়ে নারীসুষমার মালিশ কিনতে গিয়ে ধর্ষিতা হয়েছিল, ওই সব গল্প তো নাটকীয়। ওখানে নাটকের প্রয়োগ করাই যায়। সেই ছেলেগুলোর কথা কি এই ধারাবাহিকের আওতায় আসবে, যারা মেয়েদের মতো সাজুগুজু করতে ভালবাসে? ওসব পরে ভাবা যাবে'খন। প্রতিটি পর্বের পর চিঠিপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। শ্রোতারা চিঠিতে প্রশ্ন করবে, সেই চিঠিপত্রের উত্তর দেবেন বিশেষজ্ঞরা।

এইভাবেই চলছিল। বস বলেছিল, ঠিকঠাকই তো হচ্ছে, চালিয়ে যান।

সনৎ ব্যানার্জি নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন, অনিকেতের সহকর্মী। খুব ফিচেল। এরকম ফিচেল লোক সব অফিসেই দু'-একজন থাকে। ওর ফিচলেমির দু'-একটু নমুনা দেওয়া যেতে পারে। এক মহিলা লাইব্রেরিয়ানকে ও বলল—এই, আমাকে দিবি? এত বেঁধে-ছেদে যত্ন করে রেখেছিস, আমাকে একবারের জন্য দেখা...না। তুই কী ভাবছিস? আমি তো মহিষাসুরমর্দিনীর অরিজিনাল টেপটার কথা বলছিলাম...।

কিংবা কথাটা একটু জড়িয়ে, আলগা উচ্চারণে কোনও সিনিয়র অফিসারকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—বাঁড়বাড়িতে লাস্ট কবে গিয়েছিলেন স্যর? স্যর বিস্ময় নিয়ে তাকাতেই বলল, বলছিলাম স্যর লাইব্রেরিতে লাস্ট কবে গিয়েছিলেন?

সেই সনৎ ব্যানার্জি একদিন অনিকেতের ঘরে গেল। বলল, শোন, তোকে একটা বুদ্ধির প্রশ্ন করি।

একটা গাঁয়ে একটা লোক আমগাছের তলায় ছায়ায় বসে-বসে রেডিও শুনছিল। গাছে তখনও আম পাকেনি। কচি কচি কাঁচা আম। হঠাৎ লোকটা দেখল ঝপঝপ করে আম পড়ছে। এবার বল দেখি এরকম কেন হল?

অনিকেত মাথা চুলকোচ্ছিল। সনৎদা বলল, পারলি না তো...কেশের পরীক্ষা দিয়ে তোরা চাকরি পেয়েছিলি।

'কেশের' সনৎদার নিজস্ব গলাগাল-বাচক শব্দ। 'কেশ' মানে চুল। 'চুল' বোঝাতে সনৎদা বিশেষ অঞ্চলের চুলের কথাই বোঝাতে চাইছেন।

অনিকেত বলল, দমকা বাতাস উঠেছিল হঠাৎ...সনৎদা বলল—ওই আমগাছের তলায় বসে লোকটা রেডিওতে তোদের 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠান শুনছিল। আমগুলো তাতেই পেকে পড়ে গিয়েছে।

কয়েকজন পুরনো দিনের অ্যানাউন্সার ছিলেন। যাঁরা কাজী সব্যসাচীর সঙ্গে কাজ করেছেন, বিকাশ রায় বা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কাজ করেছেন, যাঁরা নিজেদের রেডিও-র স্বর্ণযুগের সোনাভাঙা গুঁড়ো মনে করেন, ওঁদেরও কেউ-কেউ বললেন—এ সব কী হচ্ছে অনিকেত, মানুষের কতকগুলো গোপন ব্যাপার আছে। মানুষই নিজের কতকগুলো অঙ্গ ঢেকে রাখে। জন্তুরা রাখে না। তুমি ঢাকনা উঠিয়ে দিচ্ছ। ঠিক হচ্ছে না বোধ হয়। কিন্তু স্পোর্টস ন্যাখে যে-মেয়েটা, আইভি রায়, যে বাইক চালিয়ে অফিসে আসে, মাঝে-মধ্যে সিগারেটও খায়, ও বলল, কনগ্র্যাট্স অনিকেতদা, তুমি যে এ জিনিস করতে পারবে, ভাবিনি! তুমি কিন্তু হেবি মিচকে আছ।

বাইক-আরোহিতা আইভি'র সঙ্গে দু-একবার রাস্তায় দেখা হয়েছিল। বাইকে লিফ্ট দিতে চেয়েছিল আইভি। অনিকেত এড়িয়ে গিয়েছিল। ও ভেবেছিল, এতে ওর পৌরুষ চোট খাবে।

লোকেরা প্যাঁক দেবে। ছেলেরা বাইক চালায়, মেয়েরা পিছনের সিটে বসে ছেলেটাকে পেঁচিয়ে রাখে—এটাই তো নিয়ম। আইভি চালাবে, অনিকেত পিছনে বসবে—এটা ঠিক মেনে নিতে পারা যায় না। মেয়েরা পেয়ারা খাওয়ার বায়না করবে, ছেলেরা লাফিয়ে লাফিয়ে পেড়ে দেবে, এটাই তো নিয়ম। একবার অফিস পিকনিকে গিয়ে আইভি বলল, কে কে পেয়ারা খাবেন...পেড়ে দিচ্ছি। একটা টিপি মতোও ছিল। পাথর ফেলে নকল পাহাড় বানানো হয়েছে। কয়েক জন উঠতে গেল। আইভি বলল, ম্যায় ভি যায়েঙ্গে। 'যাউঙ্গি' বলল না কিন্তু। ও তো হিন্দিটা ভালই জানে। আইভি জিজ্ঞাসা করল—কত দূর যাবে অনিকেতদা?

কীসে কদ্দুর?

ওই প্রোগ্রামটায়?—একটা চোখ মারল আইভি।

—দেখি কদ্দুর যাওয়া যায়!

বিকাশের সঙ্গে দেখা হল টাউন হল-এর সামনে জিলিপিওলার ঠেলাগাড়ির পাশে। গরম-গরম জিলিপি পাওয়া যায়। পাশেই রুটি-তরকারি, সঙ্গে কাঁচালঙ্কা-পেঁয়াজ। লঙ্কা কামড়ে খুব ঝাল লাগলেই জিলিপি মারো। ডায়াবিটিস মিষ্টিও পাওয়া যায়। কচুরি-শিঙাড়া যেমন আছে, হজমি শরবতও আছে। ওখানে বিকাশ জিলিপি খেতে-খেতে বলল, শোন, তোর সঙ্গে কথা আছে।

অনিকেত বিকাশকে একটু এড়িয়েই চলতে চায়। কারণ মাঝে মাঝেই বোরিং মনে হয়। সুযোগ পেলেই ও নীলকীর্তন করে। নীল হাঁ করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে, নীল কল খুলে জলের শব্দ শোনে—এইসব বলে—কানের কাছে ফিসফিস করে বলে—বলা যায় না ওর বাপ হয়তো কবি ছিল, কিংবা ও ফটাফট যোগ করে দিচ্ছে, বিয়োগও শিখে গিয়েছে। কেটলির জল যখন ফুটতে থাকে ও অবাক হয়ে বাষ্প দেখে। জেম্‌স ওয়াটও এরকম দেখতে-দেখতে স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন।

বিকাশ বলল—ছেলেটা বুঝলি, এঁচোড়ে পাকা হয়ে গিয়েছে।

অনিকেত কিছু বলল না।

আচ্ছা, তুই নাকি ছেলেমেয়েদের পাকানোর জন্য রেডিওতে কী একটা করছিস...বউ বলছিল।

বিকাশ বলল, শোন, নীলের পাকামো শোন। ওকে স্কুল থেকে আনতে গিয়েছি, ব্যাটা হঠাৎ বলে কী জানিস? বলে, বাবা, ওই মেয়েটার না, গোগো হচ্ছে। একটা মেয়ের দিকে আঙুল দেখায়। দেখি মেয়েটার বুকে একটা গুটলি মতো হয়েছে। বুঝলাম ওটাকেই ও গোগো বলছে। এসব ওকে কে শোনাল বল তো? ক্লাসেই শিখেছে।

তখন তুই কী বললি?

অনিকেত জিগ্যেস করল।

বিকাশ বলল—তখন আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। মেয়েটা ওর ক্লাসেও পড়ে না। ফোর-ফাইভে পড়ে হয়তো। জিগ্যেস করলাম, ওটার নাম 'গোগো' তোমায় কে বলেছে? নীল বলল, কেউ বলেনি। আমি জানি। ওর মায়ের জিনিসটাকে ও তো দুদু-ই বলত নিশ্চয়ই। ওটা যে দুদু নয়, সেই তফাতটা ব্যাটাচ্ছেলে বুঝে ফেলেছে। 'গোগো' শব্দটা ওরই আবিষ্কার।

অনিকেত বলল, বাঃ!

আরে এখানে কি শেষ হয়ে গেল নাকি? এরপর কী বলল শোন...বলছে বাবা, সব মেয়েরই তো গোগো হয়?

তুই কী বললি তখন? অনিকেত জিগ্যেস করে।

বললাম, হ্যাঁ হয়। ভাবলাম ব্যাপারটা মিটল। নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ—বাবা, ওই মেয়েটা তো মেয়ে, আর আমার মা-ও মেয়ে। তাই তো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই।

তা হলে ওই মেয়েটা যখন বড় হবে, ওর গোগোও বড় হবে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই।

যখন সিক্স-এ পড়বে, আরও বড়, যখন সেভেন-এ পড়বে আরও বড়?

তখন আমি কী ভাবলাম জানিস?

কৌতূহলটা মিটিয়ে দেওয়া উচিত। ব্যাপারটা চেপে যেতেই পারতাম, কিন্তু সেটা করলাম না।

বললাম—ঠিকই বলেছ।

ও বলল, তা হলে বুঝেছি, মেয়েরা যত বড় হয়, গোগোও তত বড় হয়।

তখন আমি বললাম, তার কোনও মানে নেই সোনা, তোমার মায়ের চেয়ে তোমার দিদা কত বড়। তা হলে তো তোমার দিদার গোগো বিরা-আ-আট বড় হয়ে যেত। তা কি হয়? আসলে তো গোগো-র ভিতরেই দুদু তৈরি হয়, তুমি যখন ছোট ছিলে, তোমার মায়ের গোগো থেকে তুমি দুদু খেতে। কোথায় থাকবে ওই মিল্ক? এম আই এল কে মিল্ক। মিল্ক মানে দুদু। বুঝলি না? এই সুযোগে ইংরেজিটাও একটু ঝালিয়ে দিলাম, এবং ওকে জানিয়েও দিলাম যে তুমি তোমার মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়েছ।

হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল বিকাশ। আসলে তো বাচ্চাটা ওর মায়ের দুধ পায়নি কখনও। আর প্রকৃতিটাও এমন, গর্ভধারণ না-করলে দুধ তৈরি হয় না।

গম্ভীর গলাতেই বিকাশ বলল—বাবা হিসেবে ঠিক করেছি না? বাবাত্ব আক্রান্ত বিকাশ বলে।

বিকাশ প্রকৃত বাবা নয়, কিন্তু যথাসম্ভব বাবা হতে চায়। আপ্রাণ বাবা হতে চায়।

অনিকেত ঘাড় নাড়ল। সম্মতির।

বিকাশ বলল, ব্যাটাচ্ছেলেটা সহজে ছাড়ল না। এমন একটা প্রশ্ন করল মাইরি এর কী উত্তর দেব বুঝে পেলাম না। আর প্রশ্নও আসে বটে। জিগ্যেস করল—বাবা, তা হলে এতজন মেয়ে, সবার গোগোতেই দুদু আছে, এত দুদু কারা খায়?

তুই তখন কী বললি? অনিকেত জিজ্ঞাসা করে।

বিকাশ বলল, ভাবলাম বলি—এসব বড় হয়ে বুঝবে। কিন্তু ভাবলাম এভাবে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। বললাম, সব সময় কি দুধ তৈরি হয়? যখন বাচ্চারা ছোট থাকে, দাঁত ওঠে না, ভাত খেতে পারে না, তখন ওরা মায়ের দুধ খায়। বাচ্চারা যখন বড় হয়ে যায়, তখন তো আর দুধ খেতে হয় না, ভাত-টাত খায়। তখন আর ওদের বুকে দুধ তৈরি হয় না।

অনিকেতও লক্ষ করল—বিকাশ এই পর্যায়ে দুদু বলল না, দুধ বলল। গোগো বলল না। বুক বলল।

বিকাশ বলল কেমন জবাবটা দিয়েছি বল?

অনিকেত বিকাশের পিতৃগর্ব অনুভব করল।

অনিকেত বলল, দারুণ বলেছিস তো বিকাশ, একদম এক্সপার্টের মতো বলেছিস।

বাপ হওয়ার ইন্টারভিউতে পাস করে যাব, বল?

হুঁ। অনিকেত মাথা নাড়ে।

আমার বউ হলে এভাবে বলতে পারত না।

অনিকেত মন্তব্য করে না।

বিকাশ বলে কেসটা এখনও শেষ হয়নি। নেক্সট কোয়েশ্চেনটা শোন, বলছে আমি তো ভাত খেতে পারি, রুটি খেতে পারি চিবিয়ে-চিবিয়ে। তা হলে আমাকে দুধ খেতে বলো কেন তোমরা?

বললাম, দুধ খেলে শরীরে শক্তি হয়, তাই।

নেক্সট কোয়েশ্চেন—তা হলে আমি কার দুধ খাই?

কেন, গরুর দুধ?

গরুর দুধ? ছেলেটা চিন্তায় পড়ে। জিগ্যেস করল, গরুর বাচ্চারা তা হলে কী খায়?

কী যে মুশকিলে পড়লাম মাইরি, কী বলি? উত্তর তো একটা দিতেই হবে। বললাম, গরুর অনেক দুধ হয়। গরুর বাচ্চারা খেয়েও অনেকটা বেশি থাকে তো, তাই মানুষের বাচ্চাদের খেতে দেওয়া হয়।

ও জিগ্যেস করল, প্যাকেটের মধ্যে গরুর দুধ তা হলে কীভাবে আসে?—একদম খাপে খাপ প্রশ্ন।

শুনেছি, আইআইটি-আইআইএম-এ কোনও সাবজেক্টের প্রশ্নের উত্তর লেখার চেয়েও জোর দেওয়া হয়, প্রশ্ন তৈরি করার ওপর। ব্যাটাচ্ছেলের প্রশ্নগুলো দ্যাখ একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে...। প্যাকেটে দুধ কীভাবে আসে? আসলে তো ওরা গরু-ছাগলের বাচ্চাকে দুধ খেতে দেখেনি!

যখন ওর স্কুলে অ্যাডমিশন টেস্ট দেওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম, জিগ্যেস করেছিল, মাছ কোথায় থাকে? বলেছিল, ঝোলে। তারপর বাড়িতে একটা অ্যাকোয়ারিয়াম এনেছি। ভাবছি, একদিন একটা খাটাল দেখাতে নিয়ে যাব। সব দেখা ভাল। গোবর-টোবর দেখবে...। এরা তো কোনও দিন ঘুঁটে দেখল না।

অনিকেত বলে—খাটালে নিয়ে গোবর দেখাবি! বেশ, বলবি ওগুলো হল গরুর পটি। কিন্তু তখন যদি কোনও গরু পাল খায়—কী বলবি তুই বিকাশ?

বিকাশ হা-হা করে হাসে। বলে, বলব খেলা করছে।

অনিকেত ভাবে, যদি ওর নিজের ছেলে হত, আর জন্মরহস্য জিগ্যেস করত, ও কী বলত? নিজের শৈশবের কথা মনে হয়। ভাড়া বাড়ি, বহু ভাড়াটে।

দেখেছে শিখার মা, ডলির মা-রা হাসপাতালে যায়, তারপর হাসপাতাল থেকে একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে বাড়ি ফেরে। নিজের মা-কেও হাসপাতালে যেতে দেখেছে, এবং হাসপাতাল থেকে কাঁথা জড়িয়ে ভাই নিয়ে এসেছে, বোন নিয়ে এসেছে। তার মানে হাসপাতালে ছোট বাচ্চা পাওয়া যায়। বড় পিসিমাকেও বলতে শুনেছি, তোর মা হাসপাতালে যাবে, গিয়ে একটা

ভই কিনে নিয়ে আসবে। এরপর, মনে আছে, একটা জিনিস খেয়াল করল, হাসপাতালে যাওয়ার আগে পেট-টা উঁচু হয়ে থাকে, হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে পেট-টা ঠিক হয়ে যায়। এছাড়া পিসিমা ঠাকুমাদের মুখে 'পোয়াতি' শব্দটা খুব শোনা যেত। 'পোয়াতি' শব্দের মানেটাও বুঝে গেল, মানে পেটে বাচ্চা আছে। তার মানে হাসপাতাল থেকে বাচ্চা কিনে আনার ব্যাপারটা মিথ্যে। পেটের মধ্যেই বাচ্চা থাকে।

একদিন শিখার মা, ডলির মা'দের দুপুরের আড্ডায় ছোট অনিকেত জিগ্যেস করে হাসপাতালে ছোট্ট বাচ্চারা কীভাবে আসে গো কাকি? ডলির মা বলে ভগবানের দূত এসে দিয়ে যায়। শিখার মা বলল, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, তা হলেই ভগবানের দূত আসে।

অনিকেত বলল, মেজপিসি যে বলেছিল হাসপাতাল থেকে বাচ্চা কিনে আনতে হয়?

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। মেজপিসি তখন ছিল না। অনিকেতের মা সামলে দিল। বলল, ভগবানের দূত যদি না রেখে যায়, তখন কিনেই আনতে হয়।

অনিকেত তখন বলেই ফেলেছিল—তা হলে যে ঠাকুমা বলে সন্ধ্যাবেলা পেটে বাচ্চা লইয়া ছাদে যাইও না বউমা, তারপর হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে তোমাদের পেট ছোট হয়ে যায় কেন?

শিখার মা, ডলির মা-রা অনিকেতের মা-কে বলেছিল—ও মা, তোমার ছেলেটা কী পাকা গো... অনিকেতের মা বলেছিল, যা, তুই এখান থেকে যা...।

অনিকেত জবাব পায়নি। মনে হয়েছিল, এর মধ্যে একটা গোপন ব্যাপার আছে।

অনিকেতদের বাড়ির একতলার সিঁড়ির তলায় একটা নেড়ি কুকুর থাকত। ওর চারটে বাচ্চা হল ওকে কিন্তু হাসপাতালে যেতে হল না, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিল কি না—কে জানে? কিন্তু মেজপিসি, মা ওরা কি সবাই মিথ্যে বলেছে? তা হলে কি ভগবান চারটে বাচ্চা কোলে নিয়ে এ বাড়ির সিঁড়ির তলাতেই এসেছিলেন! মানুষের ভগবান আর কুকুরের ভগবান কি এক?

এদিকে ট্যাংরা মাছ, বেলে মাছ এসব মাছের পেটের ভিতরে কী সুন্দর ডিম! ডিম খেতে কী ভাল লাগে। মাছের পেটের ভিতরে ডিম কেন হয়? মুরগিরও ডিম হয়। একটা খেলনা দিয়েছিল অনিকেতের বাবা। প্লাস্টিকের মুরগি। মুরগিটার পেটে চাপ দিলেই টুক করে একটা গোল ডিম পেটের তলার ফুটো দিয়ে বের হয়ে যায়। সোনার ডিম-পাড়া হাঁসের গল্পও পড়েছিল অনিকেত। ডিম তা দিলে বাচ্চা হয়। অনিকেত বুঝে যায়, ডিম বা বাচ্চাকে ভগবান বহন করে আনে না।

অনিকেতের ছোট পিসিমণির বিয়ে হল। কিছুদিন পরই ছোট পিসিমণির পেট উঁচু হয়ে যাওয়া লক্ষ করেছিল অনিকেত।

মনের ভিতরে প্রশ্ন বুড়বুড়ি কাটে—বিয়ে হওয়ার সঙ্গে বাচ্চা হওয়ার কী সম্পর্ক? এই সব প্রশ্ন যখন মাথায়, স্কুলে তখন ফাইভ-সিক্স। পড়ানো হচ্ছে পরাগমিলন। পুংকেশর, গর্ভমুণ্ড, ডিম্বাশয়...। প্রশ্ন আসে, গাছের বীজ তৈরির জন্য যদি পুং-রেণু দরকার হয়, তা হলে প্রাণীদের জন্যও কি পুরুষ-রেণু দরকার? দরকারই যদি হয়, তবে পুরুষ-রেণু কী? পুরুষ-রেণু থাকে কোথায়? তবে কি এমন জায়গায় থাকে যেটা আমরা ঢেকে রাখি? কাকে জিগ্যেস করবে

অনিকেত? গুরুজনদের এসব জিগ্যেস করলে হয়তো কান মুলে দেবে। রাস্তার কুকুরদের গায়ে চাপাচাপি দেখেছিল অনিকেত। আগে ভাবত মারামারি। পরে বুঝল মারামারি নয়, মারামারি হলে পাড়ার ছেলেরা এরকম হাসাহাসি করে কেন? ক্লাস সিক্স-এ পড়ার সময় অসীম নামে একটা ছেলে অনিকেতকে ওই রহস্য বোঝায়। কুকুররা যেটা করে তাকে কী বলে, জানিয়েছিল অসীম। চার অক্ষরের ওই শব্দটা স্কুলের পেচ্ছাপখানায় দেখেছে লেখা থকে। অসীম বলেছিল সবাই এটা করে। এভাবেই বাচ্চা হয়। ছেলেদের ওই জায়গাটা থেকে মশলা বের হয়, সেই মশলা মেয়েদের ওখানে দিয়ে ঢুকে যায়। তারপর বাচ্চা হয়।

ওই মশলা-টাই তা হলে পুং-রেণু?

জন্মরহস্যের ওই ব্যাপারটা জেনে ফেলে ভীষণ শক পেয়েছিল অনিকেত, আজ মনে পড়ে। মনে-মনে ভেবেছে এরকম না হলেই ভাল হত। সবার বাবা-মা ওইরকম করে করুক, অনিকেতের বাবা-মা করে না। কিন্তু তা কী করে হবে? নিয়ম তো একটাই। ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ—এটার তো নড়চড় হয় না। কোনও ত্রিভুজে কোণগুলোর সমষ্টি তিন সমকোণ হতে পারে না।

কতদিন বাবা-মা'র সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারেনি অনিকেত। মা যখন কোনও কারণে অনিকেতকে বকাবকি করত, অনিকেত বিড়বিড় করত,

মা না ঘা
বাবা না ঢ্যাবা

কিছু দিন পরে অনিকেত বুঝেছিল, ওর আবার ভাইবোন হবে। ও বলছিল—মা না ঘা, বাবা না ঢ্যাবা। তারপর সুর করে বলেছিল, এক কড়া পোয়া গণ্ডা...দুই কড়া আধ গণ্ডা...তিন কড়া পৌনে গণ্ডা...চার কড়ায় এক গণ্ডা। মায়ের চোখে জলের ধারা দেখেছিল।

বিকাশের ওই বেশি আই-কিউ'ওলা বাচ্চা এখনও প্রশ্ন করেনি—আমি এলাম কোথা থেকে?

'ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে' কবিতায় থাকতে পারে, এর ব্যাখ্যা-ভাব সম্প্রসারণও হতে পারে। যদিও এই লাইনটার ব্যাখ্যা-ভাব সম্প্রসারণ হয় না। স্কুলের পাঠ্যবইয়ে এই কবিতাটা নেই। এড়িয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কবিতার ওই ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে-র কোনও উত্তর হতে পারে না। অনিকেতের যদি সন্তান থাকত, এই প্রশ্নটাই যদি করত, কী উত্তর দিত অনিকেত? মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা-টত্রিকা যে সব আছে, সেখানে সাজগোজ-ফেসিয়াল ইত্যাদির সঙ্গে এসব সমস্যাও থাকে, সে রকম একটা পত্রিকায় দেখেছিল—সন্তানের দুষ্টু প্রশ্ন—মায়ের মিষ্টি উত্তর—এই হেডিং-এ প্রশ্নের উত্তরটা হল—আমি আর তোমার বাবা মিলে তোমাকে চেয়েছিলাম, তাই তুমি আমার পেটের ভিতরে এসেছিলে।

পরের দুষ্টু প্রশ্ন—তা হলে আমি কী করে তোমার পেটের ভিতর থেকে বাইরে এলাম?

মিষ্টি উত্তর—ডাক্তারবাবু পেট কেটে বের করে দিয়েছে।

এবার বিশেষজ্ঞার উপদেশ—আপনাদের অনেকেরই তো আজকাল সিজার হয়। পেটের সেলাইয়ের হালকা দাগটাও দেখিয়ে দিতে পারেন।

অনিকেত ভাবে, আহা রে, বিকাশের বউ কী বলবে? ওর পেটে তো সেলাইয়ের দাগ নেই। ওর তো সহজ সত্যি কথা স্টকেই ছিল, 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি' থেকে তোমায় এনেছি। কিন্তু

এই গূঢ় সমাচারটা তো ওকে দেওয়া যাবে না।

দুষ্টু প্রশ্নের মিষ্টি উত্তরে এরকম অনেক প্রশ্নের জবাবই ছিল। কিন্তু অনিকেতের মাথায় আরও কিছু দুষ্টু প্রশ্ন এল। অনিকেত যেন শিশু।

মিষ্টি উত্তর দেওয়া মা-কে প্রশ্ন করছে অনিকেত।

অনিকেত—কী করে বাইরে এলাম মা?

মিষ্টি মা—কেন, ডাক্তার বাবু পেট কেটে অপারেশন করে আমার কোলে তুলে দিল...ছোনামণি—।

অনিকেত—তা হলে ছাগলের মা কী করে ডাক্তারের কাছে যায়?

মিষ্টি মা—ছাগল তো মানুষ না, ছাগলের ডাক্তারের কাছে যেতে হয় না। পেট থেকে পিছন দিয়েই বাইরে চলে আসে। কীভাবে পটি করো তুমি?

অনিকেত—পেচোন দিয়ে, হি, হি।

মিষ্টি মা—ঠিক বলেছ। ছাগলের বাচ্চাও সেভাবে মায়ের পেট থেকে বাইরে পৃথিবীতে আসে।

অনিকেত—তা হলে আমি যখন একদম ছোট্ট-ও-ও ছিলাম। ভীষণ ছোট্ট-ও-ও, তখন কি তোমার পেটের ভিতরে তোমার হাগুর মধ্যে ছিলাম মা?

মিষ্টি মা-র ধৈর্যচ্যুতি হল। বলল, বেশি পাকা! জানি না—যা।

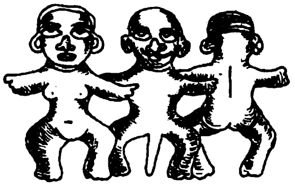

গোপালদা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। জিপগাড়িতে সকালের অ্যানাউন্সার আনতে যাওয়ার পথে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মেরেছে গাড়ি। দুর্ঘটনা।

এই দুর্ঘটনার কয়েকটি অভিঘাত হল—

১. জিপগাড়িটার কাচ ভাঙল, সামনের দিকটা তুবড়ে গেল।

২. পুলিশ কেস হল।

৩. সকালের অ্যানাউন্সার-কে ঠিক সময়ে আনা গেল না।

৪. ফলে ডিউটি অফিসার অবাঙালি ছেলে খালকোকেই সকালের সম্প্রচার জ্ঞাপন করতে হল।

৫. গোপালদা আহত হল। ওর কপালে কাচ আর গিয়ার স্ট্যান্ড-টা তলপেটে ঢুকে গেল।

গোপালদা অনেক পুরনো ড্রাইভার। ওর কাছে অনেক পুরনো কথা শোনা যায়। নজরুল ইসলামের জন্য একটা পিক ফেলার ডিবে থাকত, ইন্দুবালা'কে আদর করে নানী ডাকতেন, গাড়িতে কাজীদা আর ইন্দুবালা-র ডুয়েট শুনেছে, কমলা ঝরিয়াকেও বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে এই গোপালদা। ঘরে যাওয়ার আগে মুড়ি আর ফুলুরি কিনতে পাঠাতেন কমলা ঝরিয়া। ফুলুরি ঠান্ডা

বলে একবার গোপালদা কমলা ঝরিয়াকে জিগ্যেস করেছিলেন—দিদিন, ফুলুরি একদম ঠান্ডা! উনি বলেছিলেন, ঠান্ডাই ভাল। বেশি মুড়ি খাওয়া যাবে না, আর ঠান্ডা ফুলুরিতে অম্বল হবে, তাতে খিদে আরও মরে যাবে। কৃষ্ণমূর্তি নামে এক সাহেবের কথা শুনেছি গোপালদার কাছে, যিনি নাকি স্টেশন ডিরেক্টর ছিলেন, এবং গান-পাগলা। ল্যান্ডমাস্টার গাড়ির পিছনের সিটে বসে গুনগুন করে গান গাইতেন। একবার রাস্তায় কতগুলো হিজড়ে নাচাগানা করছিল। কৃষ্ণমূর্তি গাড়িটা থামাতে বললেন। ওখানে দাঁড়িয়ে শুনলেন। একজন হিজড়ের গলাটা খুব পছন্দ হয়েছিল। ওকে রেডিও-তে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু ও বলল, ও একা যাবে না, গেলে সবাই যাবে। ওরা ৬/৭ জন ছিল। গাড়িতে এত কি জায়গা হয়?...

দুর্ঘটনার ফলে গোপালদার আহত হওয়ার ব্যাপারটা সবার শেষে রেখেছি, যদি সম্প্রচার শুরু হতে এক মিনিটও দেরি হত, তা হলে দুর্ঘটনার অভিঘাত হিসেবে দেরিটাই এক নম্বরে যেত। কিন্তু খালকো ঠিক সামলে দিয়েছিল। ফেডার-টা তুলে 'বন্দেমাতরম্' বলাটা সহজ। তারপরই তো আসল কেদ্দানি। ক্রিস্টোফার খালকো একজন খ্রিস্টান আদিবাসী। ওরাওঁ। অনুপস্থিতিতে ও আগেও দু-একবার ঘোষকের কাজ করেছে। কিউ শিট ইংরেজিতে লেখা থাকে। ওটা দেখে পড়তে গিয়ে লোকগীতি গায়ক শাসন গাইনকে 'শ্মশান গাইন' বলেছে। শশাঙ্ক দে-কে বলেছে 'শ্মশান্-কো' দে। ওই জন্য খালকোর নামই হয়ে গেল 'শ্মশান্-কো'। ঠিক পাঁচটা তিপ্পান্ন মিনিটে সিগনেচার টিউন বেজেছে, পঞ্চান্ন-য় 'বন্দেমাতরম্' বলে খালকো ওপেনিং করে দিয়েছে। যাক, সিচুয়েশন সেভ্ড। নইলে গোপালদার জন্য কী কেলেঙ্কারিটাই না হত!

গোপালদার চোখে ছানি। ওকে রাত্তিরের ডিউটি থেকে 'অফ' করে দেওয়া হয়েছে বহুদিন। কিছুতেই ছানিটা কাটাবে না। ও যা গল্প বলে, তাতে তো ওর বয়স সত্তর ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তখনও 'রিটায়ার' করেনি। বয়সে কত জল-মেশানো কে জানে? বলে তো যুদ্ধের সময় ঢুকেছিল। ওর বয়স তখনই আঠারো।

হাসপাতালে একদিন গোপালদাকে দেখতে গেল অনিকেত, আরও কয়েকজন। সঙ্গে আইভি-ও ছিল।

গোপালদা'কে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছিল। সবাইকে দেখে মুখে একটু হাসি ফুটল। আস্তে, মৃদু স্বরে বলল, শেষ দেখা দেখে নিলুম আপনাদের, বাঁচব না। অনিকেত বলল—বাঁচবেন না কেন, কিছু হয়নি আপনার। গোপালদা বলল আমার ছোট ছেলেটা চাকরি পায়নি। ড্রাইভারি শিখেছে, বড় স্যরকে বলে আমার জায়গায় ঢুকিয়ে দেবেন। আমি চললুম।

কেন আজে-বাজে কথা বলছেন? আপনার কিচ্ছু হয়নি।

কী হয়েছে শুনবেন? ওঁকে একটু দূরে যেতে বলুন... আইভি-র দিকে তাকালেন গোপালদা।

আইভি একটু দূরে গেল। অনিকেত ছাড়াও আরও দু'জন পুরুষ ছিল।

গোপালদা বললেন, যা হয়ে গেল আমার, সেটা মেয়েছেলের সামনে বলা যায় না। তাই ওঁকে সরে যেতে বললুম।

একজন বলল—কোনও দরকার ছিল না। ও তো ব্যাটাছেলেই। বাইক চালায়, সিগারেট খায়, প্যান্ট-শার্ট পরে...!

গোপালদা মিনমিন স্বরে বললেন—সে যাই হোক, দাঁড়িয়ে পেরেস্বাব করতে পারেন না উনি, তাই ওঁর সামনে বলা যায় না। এটিকেট বলে একটা কথা আছে। মরার আগেও সেটা ভুলতে পারব নাকো। ড্রাইভার হতে পারি, কিন্তু মিত্তির বংশের ছেলে।

'মরব' 'মরব' করছেন কেন? ছোটখাটো চোট লাগলে কেউ মারা যায় না কি?—একজন বলে।

—যেখানে ব্যাটাছেলের প্রাণ থাকে, সেটাই তো কেটে বাদ দিয়ে দেবে বলছে।

—কোথায় ব্যাটাছেলের প্রাণ থাকে আবার!

—তাও জানেন না। অণ্ড থলিতে।

—ওটা বাদ দিতে যাবে কেন খামোকা?

—আমার তো হাইড্রোসিল ছিল, ঢোলা প্যান্ট পরতুম বলে হয়তো বুঝতে পারতেন না। গাড়ির গিয়ারের ডান্ডাটা তো ওখানেই মেরেছে, ওটা নাকি বার্স্ট করে গিয়েছে। ডাক্তার বলেছে ওটা কেটে ফেলতে হবে।

অনিকেত বলল, ধুর, যদি বাদ দিতেই হয়, তো হবে, কী হবে তাতে? লোকের অ্যাপেনডিক্স, টনসিল, গলব্লাডার বাদ দিচ্ছে না?

ওগুলো আর এটা এক হল? ব্যাটাছেলের তো এখানেই প্রাণ...।

এখন বেশি বুঝিয়ে লাভ নেই, অনিকেত ভাবে। শুধু ফেরার সময় বলে আসে, কিচ্ছু ভাববেন না গোপালদা, ওটা বাদ গেলেও কিস্‌সু হবে না। দিব্যি থাকবেন। গোপালদা বলেন, বাঁচলেও ওটা কি বেঁচে থাকা? ব্যাটাছেলের আসল জিনিসটাই চলে গেল...।

অনিকেত বলে—আপনি তো আর বাবা হতে যাচ্ছেন না এখন আর? কী হবে ওটা দিয়ে? ফালতু ঝামেলা...। আপনি হাসপাতাল থেকে ফিরে চোখের ছানিটা কাটিয়ে নেবেন, ব্যস, আবার গাড়ি চালাবেন।

আইভি সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বলল—সব কথা শুনেছি। ওই ঝোলাটার জন্য শালা তোমাদের যত রং। ভাবছ কী? আমার তো ওই বস্তুটা নেই, তাই বলে কি কমতি আছি না কি? পারবে এরকম?—বলে দু'টো-তিনটে করে সিঁড়ির ধাপ ছেড়ে-ছেড়ে লাফিয়ে থেমে যায়। সবার আগে নেমে ও ওর শার্টের কলার-টা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বেশ বুঝতে পারে অনিকেত, আইভি মনে-মনে পুরুষ হতে চায়। কিন্তু প্রকৃতি ওকে পুরুষ করেনি। এজন্য কিছু-কিছু পুরুষালি কাজ করে।

পুরুষালি কাজ আর মেয়েলি কাজের কি কোনও সংজ্ঞা হয়? সংজ্ঞা নেই। সমাজ মোটামুটি ভাবে বলে দেয়। ছেলেরাই হুটোপুটি করবে, মারপিট করবে, জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটবে, ঘুড়ি ওড়াবে, লাট্টু ঘোরাবে, খিস্তি দেবে, সাইকেল কিংবা বাইক চালাবে; আর মেয়েরা ছোটবেলায় রান্নাবাটি খেলবে, পুতুল খেলবে, জোরে কথা বলবে না, পাড়া বেড়াবে না, পুকুরে ডুব দিয়েই গায়ে গামছা জড়িয়ে মাথা নিচু করে ঘরে চলে আসবে। এসব যারা করে তারা লক্ষ্মী মেয়ে। যারা পাড়া বেড়ায়, উঁচু গলায় কথা বলে, তারা গেছো মেয়ে—যেমন রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ী। কিন্তু মৃন্ময়ীও লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে যায়, যখন ওর মনে প্রেমের উন্মেষ হয়। প্রথম মহিলা পাইলট দূর্বা ব্যানার্জি রেডিও-তে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন 'মহিলা মহল'-এ। বেলা দে ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন। অনিকেত অবাক হয়ে দেখছিল প্যান্টের ভিতরে শার্ট-গোঁজা দূর্বা

ব্যানার্জিকে। ১৯৮২-'৮৩ সালের কথা। বেলাদি জিগ্যেস করেছিলেন—দূর্বা, তুমি যে আকাশে প্লেন ওড়াও, তোমার হেঁশেল দেখে কে?

দূর্বা ব্যানার্জি রাগ করেননি। বলেছিলেন, হ্যাঁ, সেটা তো হয়ে ওঠে না। অন্যরাই তো দেখে, আমি তো দেখতে পারি না ওটা...।

মানে, বেলাদির মতো সে-সময়ের 'আধুনিকা' মহিলারও মনে হয়নি একজন পাইলটকে হেঁশেল-সম্পর্কিত প্রশ্ন করার কোনও মানে হয় না। দূর্বা ব্যানার্জিও হেঁশেল সামলানোর প্রশ্ন শুনে ভুরু কোঁচকাননি। যেন ওটাই নিয়ম। আমাদের প্রথম মহিলা-ডাক্তার কাদম্বিনী দেবী ডাক্তারি পাশ করেও চিকিৎসা করতে পারেননি এদেশে। মেয়েরা ডাক্তারি করবে, তা আবার হয় না কি? বিলেতে গেলেন। আরও পড়াশোনা করলেন। তারপর দেশে ফিরে এসে ডাফরিন হাসপাতালে যোগ দিলেন। কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। মেয়েরা ডাক্তারি করতে পারে মেনে নিয়েছি এখন, মেয়ে ফুটবলার, ক্রিকেটার, বক্সারও মেনে নিয়েছি আস্তে-আস্তে। কিন্তু সে-সময়ের মহিলা ক্রিকেট ক্যাপ্টেন শ্রীরূপা ব্যানার্জিকে ক্রিকেটের সঙ্গে-সঙ্গে লাউ-চিংড়িটাও দেখতে হয়েছিল, ঘরের পর্দা খাটানোর ব্যবস্থা, বিছানা পাতা, এবং দশমীতে সিঁদুর খেলা সবই করতে হয়েছে হয়তো।

হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় আইভি বলছিল, বাই ডিফল্ট মেয়ে হয়ে জন্মেছি, মানে আপনারা আমাকে মেয়ে বলছেন, কারণ আমার বুকটা উঁচু, আর ওই ঝোলাটা নেই, এই জন্যই আমি গঙ্গার পাড়ে বসে তেল মেখে স্নান করতে পারি না, ভীষণ ইচ্ছে করলেও পারি না। রাত্তিরের শহরটা একা-একা ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করে। আপনাদের কাছে সুন্দরবন ভ্রমণের গল্প শুনেছি, ঝাড়খালি না কোথায় কোন চাষির ঢেঁকি-ঘরে খড়ের বিছানায় রাত কাটিয়েছেন। আমি শুধু গল্পটাই শুনেছি। আমারও তো ইচ্ছে হয়, ভীষণ ইচ্ছে হয়। পারি না। বৃষ্টিতেও ভিজতে পারি না, শালা সেঁটে যায়। এ জন্যই তো মোটা জামা পরি। আপনার ওই প্রোগ্রামে এসব কথা থাকবে তো? অনিকেত মাথা নাড়ে।

গোপালবাবুর চোট-লাগা জায়গাটায় শেষ পর্যন্ত শল্যচিকিৎসাই হল, কিন্তু গোপালবাবু অপারেশন টেবিলেই মারা গেলেন। গন্ডগোলটা হয়েছিল অ্যানাসথেসিয়া নিয়ে। কম বেশি কিছু একটা হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান আর ফেরেনি। শেষ পর্যন্ত গোপালবাবুর তত্ত্বটাই যেন প্রমাণিত হয়ে গেল। যে, পুরুষের অণ্ডকোষেই প্রাণ থাকে। ইস্, গোপালবাবু জানতে পারলে খুব খুশি হতেন!

গোপালবাবুর প্রসঙ্গ অবতারণার কারণ একটি ডাকে-আসা চিঠি। 'সন্ধিক্ষণ'-এর কোনও এক শ্রোতার নিরীহ প্রশ্ন।

পুরুষের অণ্ডকোষেই কি প্রাণ থাকে?

এরকম আরও অনেকের অনেক প্রশ্ন জমা আছে—অনিকেতের কাছে। হিংটিংছট প্রশ্ন সব।

গরিবের মেয়েরা তো দুধ খেতে পারে না। দুধ কেন, কোনও ভাল খাবারই খেতে পারে না। অথচ কী করে ওদের শরীরে দুধের মতো পুষ্টিকর সামগ্রী তৈরি হয়? আমরা কেন মাড়ভাত থেকে দুধ তৈরি করতে পারি না?

আপনারা বলে থাকেন রক্তদান মহান দান। মহিলারা কি রক্তদান করতে পারে? মহিলাদের বিশেষ করে জিগ্যেস করার কারণ, আমি একজন মহিলা। আমাদের প্রতি মাসে রক্তস্রাব হয়।

শরীর থেকেই তো রক্ত যায়। এর পরও কি রক্ত-দান করা যায়?

আমাদের দেশের ছেলেরা ফরসা মেয়ে পছন্দ করে। যখনই বিয়ের সম্বন্ধ আসে, প্রথমেই জিগ্যেস করে পাত্রী ফরসা তো? এবার আমার প্রশ্ন কেন এরূপ পছন্দ? ডারউইন-এর তত্ত্ব অনুযায়ী কি ইহাকে ব্যাখ্যা করা যায়? আফ্রিকার অনেক দেশে সবাই কালো। আমাদের দেশের মতো কেহ কালো কেহ ফরসা নাই। এবার প্রশ্ন করি, কালো ছেলেরাও কি ওই দেশে নিজেদের দেশের পাত্রী অপেক্ষা মেম-পাত্রী পছন্দ করে? কিংবা যে-দেশে সবাই সাদা, তাহারা কি কালো পছন্দ করে? যত দূর জানি, সাহেবরা কালো পছন্দ করে না। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ জানিতে ইচ্ছা করি।

আর একটা চিঠি :

হে আকাশবাণী, উত্তর দাও, উত্তর দাও মোরে
প্রজাপতি কেন ছন্দে ছন্দে ওড়ে
নারীর বক্ষে দুগ্ধের লাগি স্তন
পুরুষের বুকে কেন তবে উহা স্তনের মতন?
পুরুষের বুকে দুগ্ধ হয় না কেন তবে প্রয়োজন?
পুরুষের বুক কৈশোরকালে ফুলিয়া ফুলিয়া যায়
তার পরে কেন আর নাহি বাড়ে হায়?
পুরুষের মুখে গোঁফ-দাড়ি হয়, নারীর মুখে হয় না
গোঁফ-দাড়ি তবে বিধাতার দেওয়া পুরুষের মুখে গয়না?
পুঁটি মাছের পুচ্ছে কেন এক ফোঁটা কালো দাগ?
তোতা পাখির বুকের তলায় জড়িয়েছে লাল ফাগ।
বুলবুলিটির মাথার ওপরে কিবা প্রয়োজন ঝুঁটি?
কত রঙে কত গন্ধে কেন ফুলগুলি উঠে ফুটি?
সৌন্দর্য সৃষ্টির তরে সবই বিধাতা রচন?
নাকি ইহার পিছনে আছে সৃষ্টির প্রয়োজন?
আমি এক গ্রাম্য কবি, জানিবারে চাই।
আমাকে ত্বরা করি উত্তর দাও ভাই।

এই কাব্যপত্র লিখেছেন প্রেমার্থ কবি। কাব্য নীড়। ভাতার। সেই পত্রদাতা। যিনি নারী সম্পর্কে লিখেছিলেন—তুমি মম হৃদয়ের ঝিমঝিমা। সেই চিঠিটার প্রথম লাইনে ছিল—'তুমি নারী নিউটন ফেল আকর্ষকরণী।' এই কবি তো মহা মুশকিলে ফেলে দিল। এসব তো কঠিন দার্শনিক প্রশ্ন। শুধু নিউটন ফেল কেন, ডারউইন-মর্গান-পাভলভ এমনকী চার্লস ডকিন্স-ও ফেল। ইচ্ছে হয়, ওই প্রেমার্থ কবির সঙ্গে গিয়ে একদিন দেখা করে আসে। এটা নিশ্চয়ই ওর ছদ্মনাম। ওর আসল নাম হয়তো হারাধন রানা, কিংবা কানাই সামন্ত বা ওরকম কোনও সাধারণ নাম। হয়তো বেকার, বাড়ির গঞ্জনা সহ্য করে। কবিতার পোকা ঢুকে আছে মনে। কবিতা-ব্যাকটেরিয়ার কোনও অ্যান্টিবায়োটিক নেই। কবিতা লেখে, পত্রপত্রিকায় হয়তো ডাকে পাঠায়। দু'টো-একটা ছাপা হলে ফুল্লকুসুমিত হয়। এইসব মানুষগুলোর মনে কত গূঢ় প্রশ্ন।

কী উত্তর দেবে ও? উত্তর মেলে না।

সৃষ্টি বড় বিচিত্র। তল পাওয়া যায় না। অনিকেতের তো উপদেষ্টামণ্ডলী আছে। বিশেষজ্ঞরা আছেন। ওঁরাও তো ভ্রমেন বিস্ময়ে। সবই সৌন্দর্য সৃষ্টি? না কি জাগতিক প্রয়োজন? মধুর, তোমার শেষ যে না পাই।

আমি এক গ্রাম্য কবি, জানিবারে চাই
আমাকে ত্বরা করি উত্তর দাও ভাই।

'ভাই' শব্দটা শুধু অন্ত্যমিলের জন্যই? না কি অন্তর থেকে আসা?

কিন্তু কী উত্তর দেবে! প্রথম দিনের সূর্যও প্রশ্ন করেছিল নতুন-সৃষ্টি-হওয়া বিশ্বকে—কে তুমি? উত্তর মেলেনি। অনিকেত তো চুনোপুঁটির চাইতেও চুনো।

ও কী করবে? প্রেমার্থ কবি তো 'ভাই' বলে ডেকেছে। কেরোসিন শিখা মাটির প্রদীপকে ভাই বলে ডেকেছিল। কেরোসিন শিখা বলেছিল—ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে। অনিকেত পাবলিক মিডিয়ায় কাজ করে। ও তো বলতে পারে না, ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে।

একবার কী মুশকিলেই না পড়েছিল অনিকেত। একটা চিঠি পেয়েছিল অনিকেত। একটি উস্কোখুস্কো কিশোর রিসেপশনে দাঁড়িয়েছিল চিঠিটা হাতে নিয়ে। ছেলেটাকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। অনিকেতকে সামনে পেয়ে রিসেপশন থেকে বলে, ছেলেটি আপনার হাতেই দেবে বলছে, রিসেপশনে রাখতে বললাম, রাখল না। ছেলেটা বলল, বাবা বলেছে যেভাবেই হোক চিঠিটা আপনাকেই দিতে। তাই দাঁড়িয়ে আছি।

অনিকেত দেখল ছেলেটির হাতে একটি খাম। খামের ওপরে লেখা 'অতি জরুরি'।

অনিকেত জিগ্যেস করল, তোমার বাবার কী নাম?

ছেলেটি বলল, উদয় বিশ্বাস।

ওই নামে কাউকে অনিকেত চেনে না।

চিঠিটা খুলল। চিঠিটা এরকম : আমার নাম শ্রীউদয় বিশ্বাস। আমার নিবাস বাগনান। গতকাল পিজি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। আমার বেড নং অমুক। আমার অপারেশন হবে। আপনাকে আমার দরকার। অবশ্যই আগামীকাল আমার কাছে একবার আসবেন। আপনি না-এলে আমার খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। যত কাজই থাক আগামীকাল অবশ্যই আসবেন...।

কী অপারেশন হবে তোমার বাবার? অনিকেত জিগ্যেস করে।

বাইপাস।

তোমার বাবা কী করেন?

ইস্কুলের মাস্টার।

তবে তো টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করুন বলবে না।

কী ব্যাপার বুঝতে পারে না। পরদিন ওই বেড নম্বর খুঁজে অনিকেত একটা বেডের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আপনি কি উদয়বাবু?

লোকটা ব্যস্ত হয়ে শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসে।

আপনি নিশ্চয়ই অনিকেত বসু। গলাটা শুনেই চিনতে পেরেছি। কত দিনের পরিচিত গলা। আপনার গলায় কত কী শুনেছি। জোরে ছোটার জুতো, নিমকি কেন খাস্তা হয়, রাতের ফুল সাদা কেন, ইয়েতি রহস্য...। রোজ কলকাতাতে 'জানা অজানা' আমি শুনবই—যতই কাজ থাক।

যেদিন ছেলে পড়াই, ওই পাঁচ মিনিট রেডিও-টা খুলে রাখি। আমিও শুনি, ওরাও শোনে। গত মঙ্গলবার 'লেজের আমি লে[illegible] তুমি'-টা অসাধারণ। শান্তনু ঘোষ বলেছিলেন। কিন্তু আপনার 'চীজ কি চিজ' অনবদ্য। নামটাও দেন দারুণ। চীজ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না আগে। তা ছাড়া মাস দু'য়েক আগে অন্বেষা-য় সাপের ওঝা-র সঙ্গে আপনার ইন্টারভিউটা...।

বাব্বা! ইনি তো রেডিও-র পোকা! এরকম কিছু মানুষ আছেন ভাগ্যিস, তাই চাকরিটা বজায় আছে। অনিকেত বলে—আপনি এত রেডিও শোনেন?

—না না, রেডিও-র সব কিছু শুনি না। গান-ফান, নাটক-ফাটক শুনি না। শুধু সায়েন্স-এর প্রোগ্রাম শুনি।

একটা নতুন এবং আশ্চর্য কথা শুনল অনিকেত। গান-ফান। নাটক-ফাটক। বলে কী! রেডিও-র যাবতীয় জনপ্রিয়তা গান আর নাটকের জন্যই তো...।

উদয়বাবু বললেন—আমি নিজে কেমিস্ট্রি-র টিচার। গান-টান অত বুঝি না। নাটক শোনার সময় নেই। তাই বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানগুলোই শুনি। আপনি আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। ভাল আছেন?

অনিকেত অবাক হয়।

বলে, এবার বলুন কী জন্য আমাকে ডেকেছেন? উদয়বাবু চারদিক তাকিয়ে নিলেন ভাল করে। উদয়বাবুর সবুজ চাদর বিছানো বিছানার একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন হলুদ শাড়ি পরা এক মহিলা। ওঁর কপালে ও সিঁথিতে অনেকটা জ্যাবজেবে সিঁদুর। মাথার কাছে একটি ফ্রক-পরা মেয়ে, অন্য পাশে সেই ছেলেটা। অনিকেত বোঝে উদয়বাবুর পরিবার।

উদয়বাবু ওঁর পরিবারের সবাইকে বলেন—তোমরা একটু বাইরে যাও, অনিকেতবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকারি কথা আছে।

কী এমন দরকারি কথা যে আমাদের সামনে বলা যায় না?

উদয়বাবুর স্ত্রী কিছুটা উষ্মা কিছুটা আশ্চর্য হওয়া মিশিয়ে বললেন।

উদয়বাবু বললেন—প্রাইভেট কথা, তোমরা প্লিজ সবাই একটু বাইরে যাও। পাঁচ মিনিট, মাত্র পাঁচ মিনিট।

ওঁরা চলে গেলে উদয় বিশ্বাস বললেন, অনিকেতবাবু, আপনাকে বিশ্বাস করে একটা কাগজ দেব, কাগজটার মর্যাদা রাখবেন কিন্তু।

কাগজ?

অনিকেত ঘাবড়ে যায়।

হ্যাঁ। কাগজ। আমার শেষ ইচ্ছা।

উইল-টুইল। লোকটার মাথা ঠিকঠাক তো?

উদয় বিশ্বাস বললেন—আমার তো বাইপাস অপারেশন হবে, বাঁচব কি মরব ঠিক নেই, যদি মরে যাই তা হলে আমায় যেন পুড়িয়ে নষ্ট না করা হয়। রেডিও-তে দেহদান, রক্তদান, চক্ষুদান এসব নিয়ে তো কত আলোচনা হয়। ব্রজ রায় মশাই সেদিন কী সুন্দর বললেন। ওটা শুনেই আমি একটা অঙ্গীকার-পত্র আনিয়ে নিয়েছি। ওটা ফিল-আপ করে সই করে দিয়েছি। বলা তো যায় না, বাইপাস অপারেশন। ওপেন হার্ট। ওই জন্যই কাগজটা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। যদি না মরি, তা হলে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলবেন, আর যদি মরেই যাই তা হলে আপনাকে

দায়িত্ব নিতে হবে যেন আমাকে পুড়িয়ে ফেলা না হয়। আমার বউকে বোঝাতে হবে—যেমন আপনারা রেডিও-তে বোঝান। মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই আই ব্যাঙ্কে খবর দিয়ে চোখটা সংগ্রহ করাতে হবে, তারপর বডি-টা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি ছাত্রদের ব্যবহার করার জন্য দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি আপনাকে বউ-ছেলেমেয়ের সামনে বললাম না কেন জানেন? ওরা ঘাবড়ে যেত। আমি তো ওদের বোঝাচ্ছি এই অপারেশনটা কিস্‌সু নয়, সিম্পল অপারেশন, এর মধ্যেই যদি দেহদানের অঙ্গীকার-পত্র নিয়ে কথা বলি, ওরা ভাববে তা হলে হয়তো মরেই যাব। তা ছাড়া যদি না-মরি, যতদিন বেঁচে থাকব বউ ঘ্যানঘ্যান করবে—তুমি তোমার ওই ছাইপাঁশ কাগজ ছিঁড়ে ফেল, কেন ওইসব করেছ, সবার থেকে আলাদা হতে চাও, তাই না? আমার স্ত্রী একটু কুসংস্কারগ্রস্ত কিনা...অনিকেত বলে এই গুরুভার আমাকে দিচ্ছেন কেন? আপনার কোনও বন্ধুবান্ধবকে বললেই তো ভাল হত।

উদয়বাবু কয়েক মুহূর্ত অনিকেতের চোখের দিকে চেয়ে থাকলেন। যেন খুব আশ্চর্য হয়েছেন। তারপর বললেন—এ কী? আপনি যে সবসময় বলেন—শ্রোতাবন্ধু-উ-উ। খুব তো বন্ধু ডাকেন। সেটা কি মিথ্যে? 'বন্ধু' ডাকেন বলেই তো আপনাকে বন্ধু ভাবছি। বন্ধুকেই তো এই ভারটা নিতে বলছি।

কী আতান্তরে পড়ল অনিকেত। শ্রোতাবন্ধু বলাতেই এই বিপদ?

রেডিও-তে তো হামেশাই বন্ধু ডাকতে হয়। শ্রোতাবন্ধু তো একটা লব্‌জ। একটা জার্গন। একটা অভ্যাস। এই হামেশা উচ্চারিত শব্দটাকে কেউ এভাবে গ্রহণ করবে ভাবা যায়?

তা হলে সম্প্রচারে কী বলে সম্বোধন করা উচিত? সভা-সমিতিতে যেভাবে সম্বোধন করা হয়—বন্ধুগণ, সুধীবৃন্দ, কমরেডস, সবই তো জার্গন।

ভাই-ও তো ডাক হয়। চাষিভাইদের বলছি, শ্রমিকভাইদের বলছি এসব।

একজন কৃষক চিঠি লিখেছিলেন—আমাদের তো চাষিভাই বলেন। বিভিন্ন সময়ে কুমোরভাই, কামারভাই-ও বলেন। এটা অন্তরঙ্গতা, না কি অবজ্ঞা? আপনারা কি ডাক্তারভাই, উকিলভাই, ইঞ্জিনিয়ার ভাই, শিক্ষকভাই বলতে পারেন? তা হলে খামোকা আমাদের 'ভাই' ডাকা কেন?

এরকম তো সমস্যা আছেই। হরদম বলা হয়। মা-বোনদের বলছি। কই, বাবা-ভাইদের বলছি তো বলা হয় না...।

উদয় বিশ্বাসের অপারেশনের দিন হাসপাতালে শেষ পর্যন্ত গিয়েছিল অনিকেত। সব ঠিকঠাক ছিল। দু'দিন পরে দেখা করেছিল অনিকেত। উদয় বিশ্বাসের মুখে লজ্জা জড়ানো প্রসন্নতা। এ-যাত্রায় ওটা হল না। বেঁচে গেলাম। 'বেঁচে গেলাম' বলার পর একটা অদ্ভুত হাসি। ওটা যুদ্ধ জয়ের আনন্দ।

দেহদান আন্দোলনকে প্রশ্রয় দিয়ে আরও একবার বিপদে পড়তে হয়েছিল অনিকেতকে। মেদিনীপুর জেলার সবং থেকে এক ভদ্রলোক তাঁর মুমূর্ষু মা-কে নিয়ে কলকাতা এলেন। কলকাতায় থাকার জায়গা নেই। মা-কে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে উনি হোটেলে থাকতে লাগলেন। ওই ভদ্রলোক 'বিজ্ঞান আন্দোলন' করেন। চরম নাস্তিক। বাড়িতে ওঁর বাবা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, প্রতিদিন নারায়ণ পুজো করতেন। ওঁর বাবার মৃত্যুর পর নারায়ণ শিলা দিয়ে আদা-রসুন থেঁতো করে মুরগির মাংস রান্না করেছিলেন। ওঁর মা-কে কলকাতায় আনার উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যুর

সঙ্গে-সঙ্গেই মায়ের দেহটা দান করে দেবেন। মা-কে দিয়ে অঙ্গীকার-পত্রে টিপ সই করিয়ে রেখেছিলেন। ওই ভদ্রলোকের নাম নারায়ণ পণ্ডা। কিন্তু নারায়ণবাবুর মা কিছুতেই মরছিলেন না। স্যালাইন-অক্সিজেন নিয়েও বেঁচেছিলেন। ভদ্রলোকটির চিকিৎসা খরচ ছাড়াও হোটেল-ভাড়া গুনতে হচ্ছিল। সেই ভদ্রলোক অনিকেতের কাছে এসেছিলেন, বলেছিলেন হোটেল-ভাড়া গুনতে হচ্ছে, বিনে পয়সায় বা কম পয়সায় থাকার কোনও উপায় করে দেওয়া যায় কি না। উনি বলেছিলেন, আপনাদের কথায় মায়ের দেহটা দান করব ঠিক করলাম, এখন আপনারা আমায় না দেখলে...।

অনিকেত ওর এক বাউন্ডুলে বন্ধুর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

কিন্তু নারায়ণবাবুর মা শেষ পর্যন্ত সে-যাত্রায় মরলেন না। অনিকেত একদিন হাসপাতালে গিয়েছিল। ওঁর মায়ের নাক থেকে ততদিনে অক্সিজেনের নল খোলা হয়ে গিয়েছে। ওই বৃদ্ধা বলেছিলেন—কী করে যাই বাবা বলো, এই খ্যাপা ছেলেটা বে-থা করলে না, আমি ছাড়া কে দেখবে বলো...।

এত কথা এল 'ভাই' প্রসঙ্গে। প্রেমার্থ কবি 'ভাই' সম্বোধন করেছে। ওই ভাই শব্দটা নেহাত 'চাই' শব্দটার সঙ্গে অন্ত্যমিলের প্রয়োজনে। তবুও তো আন্তরিক ভাবে উত্তর চেয়েছে। বিশ্বাস করেই চেয়েছে। গ্রামের মানুষ এখনও রেডিওকে বিশ্বাস করে। ভাবে রেডিও মিথ্যে বলে না। রেডিও-র সঙ্গে ঘড়ি মেলায়।

একদিন প্রেমার্থ কবি-র সঙ্গে দেখা করতে পারলে ভাল হয়।

পরের চিঠিটার দিকে হাত বাড়ায় অনিকেত।

সনৎ ব্যানার্জি অনিকেতের ঘরে ঢুকলেন। দুষ্টুমি-ভরা মুখ। অনিকেত তখন চিঠিপত্র দেখছিল। সনৎ ব্যানার্জি অনিকেতের হাতটা টেনে নিজের নাকের সামনে নিয়ে শুঁকলেন। বললেন, ইঃ, কী বিচ্ছিরি গন্ধ, অনেক্ষণ ধরে নোংরা ঘাঁটছিস তো, বাড়ি যাওয়ার আগে ভাল করে হাত ধুয়ে যাস। নইলে বউ প্যাঁদাবে।

অনিকেত বলে, তুমি যে খিস্তি করো তাতে?

সনৎ ব্যানার্জি বলেন, করি, কিন্তু বাড়ি যাওয়ার আগে মুখশুদ্ধি করে যাই।

কীভাবে মুখশুদ্ধি করো?

একটু মাল খেয়ে নি, যদি না-হয় কড়া চা খেয়ে ঘরে ঢুকি।—দেখি তোর নোংরা নোংরা চিঠিগুলো দেখি।

জোরে-জোরে পড়তে লাগলেন একটা। ঘরে অন্য একজন এসে যাওয়াতে থেমে গেলেন সনৎদা। বলেন, কী যে হল দেশটার... নিজেদের গোপন কথা সব ওপেন করে দিচ্ছে...।

যিনি ঘরে ঢুকলেন, তাঁর নাম ভারতী বসু মজুমদার। গাইনো। এই টিমে আছেন। প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন।

তিনি বললেন—আমার একটা সাজেশন আছে অনিকেত। যারা চিঠি লিখছে, বেছে-বেছে তাদের কয়েকজনকে স্টুডিওতে নিয়ে এসো। ওদের সঙ্গে ইন্টার‍্যাক্ট করা যায়।

অনিকেত বলে, ওরা এলেও সামনাসামনি এসব বলতে পারবে? মনে হয় না। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না বলে চিঠি দিচ্ছে।

ভারতীদি বললেন—চিঠি দিয়ে আনিয়েই দ্যাখো না কী হয়!

অনিকেত বলল, ভাবা যাবে।

অনিকেত চিঠিগুলোর গোছা ভারতীদির হাতে তুলে দেয়। বলে, আপনি দেখে নিন কোনগুলোর উত্তর দেবেন। ইতিমধ্যে ডাক্তার বিষ্ণু মুখার্জিও এসে গেলেন। ওঁরও আসার কথা ছিল।

বিষ্ণু মুখার্জি চিঠিগুলো দেখতে-দেখতে বললেন—আমার নিজের ছোটবেলাটা মনে পড়ছে। এই সব প্রশ্ন আমার মনেও উঁকি দিত। মাছির মতো ভনভন করত। মাছিগুলোকে উড়িয়ে দিতাম, আবার ভনভন করত...।

বিষ্ণু মুখার্জি একটা চিঠি মেলে ধরলেন। বললেন—এটা তো আমার বিরুদ্ধেই কমপ্লেন দেখছি...।

পুরুলিয়া থেকে আসা একটা চিঠি :

'আপনাদের অনুষ্ঠান শুনে বিস্মিত হলাম। ডাক্তার বিষ্ণু মুখার্জি বলেছেন স্বপ্নদোষ স্বাভাবিক ব্যাপার। পরিমিত হস্তমৈথুনও স্বাভাবিক ব্যাপার। কী করে একজন ডাক্তার হয়ে এমন কথা বললেন তিনি? ছিঃ। বীর্য হল শরীরের সার-পদার্থ। নীলমণি দাসের 'যোগব্যায়াম' বইতে এ কথা লেখা আছে। রক্ত থেকে মাংস তৈরি হয়, মাংস থেকে হাড়, হাড় থেকে মজ্জা, এবং মজ্জা থেকে শুক্র। ইহা তো বিজ্ঞান। এক ফোঁটা বীর্য = ৮০ ফোঁটা রক্ত। মুনিঋষিরা বলে গিয়েছেন। আমি এই কুঅভ্যাস থেকে বিরত থাকার জন্য নিয়মিত গোমুখাসন করি, সত্ত্বযোগ বড়ি খাই, বেলপাতার রস খাই, তবুও পাপকাজ করে ফেলি, তখন হাতে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিই, যেন ভবিষ্যতে এই কাজ না-করি। আমার দাদুকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। তিনি বিবাহের আগে কঠোর ব্রহ্মচারী ছিলেন। আমার দাদু এক সাধুর শিষ্য ছিলেন। সাধুর অনেক গুণই দাদু পেয়েছিলেন। দাদু বলেছেন, স্বপ্নদোষ পুরোপুরি আটকানো যায় না, কিন্তু ব্রহ্মচারীর স্বপ্নদোষ হলে সেই বীর্যের হবে পুষ্প-গন্ধ। যাই হোক, আমি অনুরোধ করছি সঠিক কথা বলুন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিপথে চালিত করার পিছনে আপনাদের কোনও স্বার্থ কাজ করছে?'

এটার উত্তর দেবেন বিষ্ণুবাবু?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই...

কী বলবেন?

ঠিক বলে দেব। বলব, গোমুখাসন ভাল। ঠিকমতো যোগাসন করা খুব ভাল। বেলপাতার রস খেতে যেও না, হাতে ছ্যাঁকা দিও না। নিজের ক্ষতি কোরো না। মন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দর বই পড়ো, খেলাধুলো করো—ওসব চিন্তা যত কম করা যায় ততই ভাল—এইসব বলব। এই তো আর একটা চিঠি আছে আমার সাপোর্টে।

চিঠিটা অনিকেতই বেছেছিল। লেখক হিঙ্গলগঞ্জের শওকত আলি।

'আমি কৈশোর থেকে যথেচ্ছভাবে জীবনটা নষ্ট করেছি। আমার হস্তমৈথুনের কুঅভ্যাস ছিল। দিনে-দিনে রোগা হয়ে যেতাম, স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে লাগল। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েও, ওই পাপকাজ থেকে নিরস্ত হতে পারিনি। দুই বৎসর আগে ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করব, কিন্তু সফল হতে পারিনি। আমি ডিপ্রেশনের পেশেন্ট হয়ে পড়লাম। বিএসসি-তে ভর্তি হয়েও পড়াশোনা ছেড়ে দিলাম। সেদিন 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠানটা শুনলাম। ডাঃ বিষ্ণু মুখার্জি বললেন—এসব খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বপ্নদোষ কোনও দোষ নয়। প্রত্যেক পুরুষেরই হয়, মহাপুরুষেরও হয়। যারা ভাবে স্মৃতিশক্তি কমে যাচ্ছে, সেটা অপরাধবোধ থেকে হয়। শরীরের দুর্বলতাও অপরাধবোধ থেকে হয়। শুনে মনে বল পেলাম। রেডিও মিথ্যা বলে না। আশীর্বাদ করুন যেন আবার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারি। আমার এই চিঠি লেখা সম্ভব হত না, যদি তখন আত্মহত্যা করতে গিয়ে সফল হতাম।'

বিষ্ণুবাবু গোটা দশেক চিঠি বেছে নিলেন।

ভারতীদি'রও বাছা হয়ে গিয়েছে। এবার স্টুডিওতে রেকর্ডিং-এর জন্য যাবেন ওঁরা। অনিকেতের বুক ধুকপুক করে।

ভারতীদি চিঠিগুলো অনিকেতকে দিয়ে বললেন—একবার দেখে নাও।

ভারতী বসু মজুমদার একজন সিনিয়ার গাইনি। অনিকেতের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। কখনও আপনি করে বলেন, কখনও তুমি। অনিকেত বলেছে, তুমি করেই বলবে।

ভারতীদি'র বাছা চিঠিগুলো পড়তে গিয়ে অনিকেতের ধুকপুকানি আরও বেড়ে যায়। কীসব চিঠি? একটা মেয়ে তো যা-তা লিখেছে। ইস। অনিকেতের নিজেরও খারাপ লাগে। এসব নিয়ে আলোচনা চালালে চাকরিটা থাকবে তো? ওই চিঠিটি ভারতীদিকে ফেরত দিয়ে অনিকেত বলে—এটারও উত্তর দেবেন?

ও মা! কেন দেব না? ছেলেদের বেলায় এন্টারটেন করার, আর মেয়েদের বেলায় করব না, এ কেমন বিচার? অনিকেত আর কিছু বলে না তখন।

বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না—এই কনসেপ্ট-টা খুব ভাল লাগে তোমাদের, তাই না? মেয়েরা তো এখন তবু নিজেদের কথা বলছে, বলতে পারছে। জানতে পারছে অন্তত। এতদিন তো জানাতেও পারত না। এখন প্রতিবাদও করছে কখনও।

চাকদার এই মেয়েটার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে, ওর বাড়িওলাটার সঙ্গে একটু দেখা করা যায়? আচ্ছা করে কড়কে দিতাম...বলেই বললেন—তা কতজনকে কড়কাব? সারা দেশ জুড়েই তো এই অবস্থা।

যে-চিঠিটা নিয়ে কথা হচ্ছে, সেটা এরকম :

'আমি আপনাদের অনুষ্ঠান শুনি। আমি আমার একটি সমস্যার কথা বলতে চাই। আমার বাবা একটি কাপড়ের দোকানের কর্মচারী, মালিকের বাড়িতেই আমরা ভাড়া থাকি। আমার ছোট দুই ভাই আছে। আমার বয়স ১৭, আমি দশম শ্রেণিতে পড়ি। আমাদের টানাটানির সংসার। বাড়িওলার বাড়িতে ভালমন্দ রান্না হলে মাঝে-মাঝে ডেকে খাওয়ায়। আমাদের বাড়ি ভাড়াও বাকি থাকে। আমাদের বাড়িওলার কিছু একটা অসুখ হয়েছে। পা ফুলে যায় মাঝে-মাঝে, পেটও ফুলে যায়, ভেলোরে নিয়ে গিয়েছিল। ওঁকে আমি দাদু ডাকি। দাদু একদিন

আমাকে ডাকলেন, তারপর বললেন, একমাত্র তুই আমাকে বাঁচাতে পারিস, তোর কাছেই আমার প্রাণ, আগে বল তুই আমাকে বাঁচাবি কি না...। তারপর কুপ্রস্তাব দিলেন। এখন আমি কী করব? আমাদের ৫/৬ মাসের ঘরভাড়া বাকি। যদি আমাদের উনি উঠিয়ে দেন, যদি বাবাকে বলেন আজ থেকে তোমাকে আর দরকার নেই, তখন আমি কী করব? আমার ভীষণ ভয় করছে।'

হঠাৎই একটা ফ্ল্যাশব্যাক অনিকেতের মনে। কয়েক মুহূর্তের জন্য পিছনে যায়, কিন্তু কোনও-কোনও সময় মুহূর্তটাই অনেক লম্বা হয়ে যায়। সময় নাকি ইলাস্টিক। সময় নিজের প্রয়োজনে লম্বা হয়, ছোট হয়।

অনিকেতের একজন পিসেমশাই ছিলেন। বড় পিসেমশাই। একসময়ে মিলিটারিতে চাকরি করতেন তিনি। ওঁর কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যখন হেরে গেল, তখন জাপানের দখল নিতে ব্রিটিশের পক্ষ হয়ে জাপান গিয়েছিলেন। ওঁর বাড়িতে মিলিটারি পোশাক-পরা একটা ছবি ছিল। কিন্তু অনিকেত কখনও মিলিটারি পিসেমশাইকে দেখেনি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই বড় পিসেমশাইকে দেখেছে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে দাড়ি। পরনে ধুতি, গায়ে নামাবলি। কপালে তিলক। পুজো করেন নানা জায়গায়। অনিকেতকে খুব ভালবাসতেন। আইসক্রিম খাওয়ার পয়সা দিতেন, পুজোর সময় ফুচকা খাওয়ার পয়সা দিতেন। অনিকেতদের বাড়ির কাছাকাছি একটা টিনের চালার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। ওই বাড়িটা ছিল লম্বা। পাশাপাশি অনেকগুলো ঘর। সেই ঘরগুলোতে আরও সব ভাড়াটে।

সেই বড় পিসেমশাইয়ের গলায় ক্যান্সার ধরা পড়ল। চোয়ালের তলায় গলার ওপর একটা মাংসপিণ্ড। চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসাপাতালে দেওয়া হয়েছে, কাজ হয়নি। অনিকেতের বাবা ছুটোছুটি করছে হাসপাতালে। অপারেশন করতে হবে। আবার ভর্তি হবে হাসপাতালে। বড় পিসিমা কান্নাকাটি করছে। বলছে, সব সময় যে লোকটা ঠাকুর-দেবতা নিয়ে থাকে, সেই লোকটার কেন এই রোগ হল? ভগবানের এ কেমন বিচার?

হাসপাতালে ভর্তির দিন ঠিক হল। কয়েকদিনের মধ্যেই ভর্তি হতে হবে। বড় পিসিমা ছোটকাকুকে নিয়ে সক্কালবেলা চলে গিয়েছে তারকেশ্বরের মন্দিরে। সারাদিন হত্যে দিয়ে সন্ধেবেলা ফিরবে। মা বড় পিসেমশাইয়ের জন্য গলা-ভাত করেছে, মাছের ঝোলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে ভাত। শিঙিমাছের কাঁটা বেছে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। বড় পিসেমশাই চামচ দিয়ে খেয়ে নেবে। মা টিফিন বাটিটা অনিকেতের হাতে দিয়ে বলল বড় পিসেমশাইকে দিয়ে আয়। খাবার সময় সামনে বসে থাকিস। দরকার হলে, খাইয়ে দিস। অনিকেতের তখন ক্লাস টেন চলছে।

বাটিটা নিয়ে ও-বাড়ি যায় অনিকেত। তখন দুপুর বারোটার মতো হবে। দেখল, ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। এই অসুস্থ লোকটা দুপুরবেলায় গেল কোথায়? অনিকেত কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। একবার ভাবে পাশের কোনও ভাড়াটের কাছে রেখে যাবে। পাশেই এক কম্পাউন্ডারের ঘর। ওদের সঙ্গে বড় পিসেমশাইদের বেশ ভাব। কম্পাউন্ডারের একটা মেয়ে আছে, মঞ্জু। মঞ্জু অনিকেতেরই বয়সি। যদিও নাইন-এ পড়ে। ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয়, বলেনি কখনও, কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে ভাব করার ইচ্ছেও ছিল অনিকেতের। মেয়েটার সঙ্গে মাঝে-মাঝেই চোখাচোখি হয়, মেয়েটার চোখের ভাষাতেও কিছু একটা বোঝে

অনিকেত। কিন্তু তেমন কথা হয়নি। মেয়েটা স্বপ্নে এসেছে একাধিকবার। স্বপ্নের পাপে। স্বপ্নের দোষে। স্বপ্ন ভেঙে গেলে লজ্জা পেয়েছে, ভেজা-লজ্জা। অনিকেত একবার ভাবে মঞ্জুদের ঘরেই গিয়ে দিয়ে আসবে বাটিটা। মঞ্জু থাকলে ও যদি নেয়, বেশ হয়। হাতে যদি হাত লেগে যায়, বেশ হয়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, থাক গে। আর একটু দেখি। এক্ষুনি আসবে। অসুস্থ লোকটা যাবে কোথায়? আরও মিনিট পাঁচেক ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে অনিকেত। গরম লাগছে। গরমের ছুটি চলছে। ঘরের ভিতর থেকে ফ্যান ঘোরার খটখট শব্দ আসছে। ফ্যান-টা অফ করেনি যখন—এক্ষুনি আসবে। আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা। উনি আসেন না। বাড়িটার ডানদিকে একটা বালির গাদা। এক চুন-বালির কারবারি ওখানে বালি ডাঁই করে রাখে। মাঝে-মাঝে বালির লরি এসে ওখানে বালি ফেলে যায়, আবার ওই বালি বস্তায় পুরে খুচরো বিক্রি হয়। ছোটবেলায় বালির গাদায় হুটোপুটি করেছে অনিকেত। ওই বালির গাদার পাশে একটা জানলা আছে। অনিকেত ভাবে, ওই জানালা দিয়ে বাটিটা রেখে যাবে। ঘরে ফিরে এসে ঠিক দেখবে। হয়তো বড় পিসেমশাই কোনও মন্দিরে গিয়েছেন কষ্ট করে, প্রার্থনা করতে। অনিকেত বালির গাদায় নেমে যায়। জানালাটা বন্ধ। জানালায় ধাক্কা দেয়, জানালা খুলে যায়। এক বিচ্ছিরি দৃশ্য। অনিকেত বাটিটা ছুড়ে দেয়। পালিয়ে যায়। মেঝেতে একটা ধাতব আর্তনাদ শোনে অনিকেত।

এই বড় পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আর কোনওদিন কথা বলেনি অনিকেত। ঘেন্না করেছে। বাতাসে থুথু ছিটিয়ে বলেছে, এই থুথু বড় পিসেমশাইয়ের গায়ে পড়ুক। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর দেখতে গিয়েছে, কিন্তু কথা বলেনি। বড় পিসেমশাই একদিন খুব মৃদুস্বরে অনিকেতের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তোকে একটা কথা জানানোর ছিল...। কিন্তু সেই কথা আর জানাতে পারেননি উনি। ওঁর কথা বন্ধ হয়ে যায়। অনিকেত দেখতে গেলে ওর ঠোঁটটা তিরতির করে কাঁপত, গলার উঁচু হয়ে ফুলে থাকা বিচ্ছিরি অর্বুদটার পাশ দিয়ে গ্রাম্যরাস্তাটার মতো বয়ে যাওয়া নীল শিরাটার কম্পনে কোনও সাংকেতিক বার্তাও হয়তো থাকত।

অপারেশনের পর চারদিন বেঁচেছিলেন উনি। বাড়িতে দেহটা আনা হয়েছিল। পিসিমারা তো কাঁদবেই, মা-ও, কিন্তু মঞ্জু কেন কাঁদছিল? মঞ্জুর ওপর খুব ঘেন্না হয়েছিল। শুধু মঞ্জু কেন, মেয়েদের ওপরই কেমন যেন ঘেন্না জন্মে গিয়েছিল। নিজের বোনদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করল অনিকেত। খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল।

অনিকেত ততদিনে অনেক কিছু জেনে গিয়েছে। বুঝে গিয়েছে। একসময় ওর নিজের মা-বাবার ওপর একটা বিরাগ জন্মেছিল, পরে সেটা মিটে যায়। ও বুঝতে শিখেছিল, পৃথিবীর এটাই নিয়ম। এগুলো প্রকৃতিরই নিয়ম। কিন্তু বৃদ্ধ এক ক্যান্সার রোগীর সঙ্গে কোনও কিশোরীর দৈহিক ব্যাপার তো প্রকৃতির নিয়ম হতে পারে না।

তা হলে কি হাবুলের কথাই ঠিক? ভানুদার কথাই কি ঠিক? ওইসব চটি বইগুলোর গপ্পোগুলিই কি সত্যি? হাবুল এইট-এ একবার ফেল করেছিল, টেন-এও একবার। হাবুল মাঝে-মাঝেই ইস্কুলে আসত না, বলত বউদি ডেকেছিল। সব বর্ণনা দিত। ও বলেছে, মেয়েরাই বেশি হিট্টু হয়। ভানুদা বলেছিল, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে যোলো গুণ বেশি মজা পায়। এসব নাকি 'কোকশাস্ত্র'-তে লেখা আছে। চটি-চটি বইগুলোতেও কত সব কাণ্ডকারখানার বর্ণনা থাকে।

অনিকেত ভাবত—ওসব মিথ্যে, বাজে কথা। হাবুল, ভানুদা সবাই গুলবাজ। কিন্তু

সেদিনের ঘটনাটা অনিকেতের চিন্তাভাবনা কীরকম ওলটপালট করে দিল। বড় পিসেমশাইয়ের মতো একটা বৃদ্ধ, ক্যান্সার রোগীর কাছে কী করে নিজেকে সমর্পণ করতে পারল মঞ্জু? রুচিতে বাধল না? শরীরের খিদে কি এত বেশি মেয়েদের?

হয়তো সব মেয়ের নয়, হয়তো মঞ্জুরই খুব খিদে। মঞ্জুর যদি বেশি খিদে হয়, তা হলে অনিকেত নিজে অ্যাকশনে নয় কেন?

এরপর অনিকেত কয়েকবার মঞ্জুকে স্বপ্নে পেয়েছে। একদম অরণ্যদেবের ডায়না-র মতন করে। একদম 'সঙ্গম' সিনেমার বৈজয়ন্তীমালার মতো করে ক্যা করু রাম মুঝে বুড্ঢা মিল গয়া...। অনিকেত বলছে, বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহি...। মঞ্জু বলেছে হোগা...হোগা...হোগা...।

ওসব তো স্বপ্নে। দিনের বেলাতেও শত কাজে মঞ্জুচিন্তা। জ্যামিতির এক্সট্রার মধ্যে মঞ্জু, ইংরেজি প্রেসির মধ্যে মঞ্জু, সমাস-কারক-বিভক্তিতে মঞ্জু। এই নয় যে মঞ্জুকে খুব ভালবেসে ফেলেছে অনিকেত, ব্যাপারটা হল মঞ্জুকে ঠিকঠাক স্পর্শ করতে হবে। পূর্ণ নারী কখনও দেখেনি। কুমোরটুলিতেই দেখেছে, কিংবা চটি বইয়ের ছবিতে। একবার মঞ্জুকে চাই। কী বলবে? কী করে বলবে? বড় পিসেমশাই কীভাবে বলেছিল?

বড় পিসেমশাইয়ের মৃত্যুর পর বড় পিসিমা একাই থাকত ও-বাড়ি। অনিকেত মাঝে-মাঝে যেত। অনিকেতকে দেখলে মঞ্জু ও-ঘরে ঢুকত না। রাস্তাঘাটেও একা পেল না। একা পেলে কী জিজ্ঞাসা করত অনিকেত নিজেও জানে না। কিন্তু হ্যাবড়া-জ্যাবড়া অ্যালজেবরা আলু-কুমড়োর পচা লাবড়ার ওপর ভনরভনর মাছির মতো মঞ্জুচিন্তা ওর টেন থেকে ইলেভেন-এর রেজাল্ট খারাপ করল।

কিন্তু ইলেভেন-এ ভাল করতেই হবে। ওই চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য হস্তমৈথুন। কিন্তু ওটা করার পর মনে হতে লাগল, স্মৃতিশক্তি কমে যাচ্ছে। স্মৃতিশক্তি কমে গেলে কী করে ভাল রেজাল্ট হবে? একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। মঞ্জু কেস-টা মিটে গেলেই একদম পুরোদমে পড়ালেখা শুরু করে দেবে।

এরকম অবস্থায় অনিকেতদের বাড়িতেই পেয়ে যায় মঞ্জুকে। ওদের বাড়ির এক ভাড়াটে প্রভাতবাবুর ক্লাস ফাইভ-এর মেয়েকে পড়াচ্ছে মঞ্জু।

অনিকেতের সঙ্গে মঞ্জুর সামনাসামনি দেখা হয়ে গেলেও অনিকেত মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে অ্যাকশনটা ভুল হয়ে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে হবে।

অনিকেত লক্ষ করে মঞ্জুর আসা-যাওয়া। পড়িয়ে ফিরছে মঞ্জু। অনিকেত বেড়ালের মতো পিছু নেয়। মঞ্জু 'নিঝুম সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখিরা' সুরটা গুনগুন করতে-করতে নামছে। এবার কি পেছন থেকে জড়িয়ে ধরবে? কেউ নেই। পা টিপে-টিপে অনিকেত পিছনে। সময় চলে যাচ্ছে। সিঁড়ির তলার কলঘরে ঢুকল। কলঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল ও। সময় ঝরঝর করে পড়ে যাচ্ছে কল থেকে। ছিটকিনি খোলার শব্দটা যেন যাত্রাপালার ঝনন্‌ন্‌। দরজাটা একটু খুলতেই কলঘরের ভিতরে গলে গেল অনিকেত। দরজার ছিটকিনিটা দিয়ে দিল।

মঞ্জু বলল, কী ব্যাপার, কী ব্যাপার? অনিকেত বলল কিছু নয়। হাতটা থাবার মতো মঞ্জুর বুকের দিকে...।

মঞ্জু এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিল। বলল—ছিঃ!

এত জোরে বলল, যে থুথু ছিটাল। চিৎকার করে উঠল।

বলল, আপনি না ভদ্রবাড়ির ছেলে! লজ্জা নেই। লজ্জা নেই? এ কী করছেন, অ্যাঁ? ও আর বলতেই পারল না—বড় পিসেমশাই তা হলে কীভাবে...

অনিকেত দরজা খুলে বেরিয়ে যায় দ্রুত। সোজা রাস্তায়। মাথা নিচু করে রাস্তায় চলতে থাকে। ওর সারা গায়ে অন্ধকার লেপ্টে রয়েছে। রাস্তার আলোটা যেন ওর পাপে ফিউজ হয়ে গেল। মঞ্জু তো কখনও 'আপনি' বলেনি, আজ আপনি বলল। 'ছিঃ' শব্দটা মাছির মতো অনিকেতের সঙ্গে ঘুরছে। মঞ্জু কি ওর মা-কে বলে দেবে? তারপর ওর মা কি বড় পিসিকে বলে দেবে? কী হবে তা হলে?

উঃ! মেয়েরা কী অদ্ভুত চরিত্রের হয়। কিছুই মেলাতে পারে না। যে একজন গলায় টিউমার-ঝোলা অসুস্থ বৃদ্ধকে শরীর খুলে দিতে পারে, সে ওর মতো একটা ছেলেকে এভাবে ফুটিয়ে দিল।

এই অপমানটা অনিকেতের জীবনের একটা ট্রমা। সব সময় মনে হত, ও একটা চরম অন্যায় করেছে। রাস্তায় মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হোক ও চাইত না। খবরের কাগজে 'শ্লীলতাহানি' শব্দটা দেখলেই ওর বুকে ধক করে বাজত। মনে হত এই পাপে, এই দোষে অনিকেতও দোষী। 'বলাৎকার' শব্দটাও একইরকম ভাবে মুখ ভ্যাংচাত অনিকেতকে। বড় পিসির বাড়ি যাওয়া কমিয়ে দিল অনিকেত, পাছে মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। মাঝে-মধ্যে মঞ্জুর সামনাসামনি পড়ে গেলে, অনিকেত মাথা নিচু করত যেন চোখাচোখি না-হয়। বড় পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কেন ও এরকম কাজ করেছিল সেই প্রশ্নের উত্তর অজানা রয়ে গেল। জানার কোনও উপায় নেই।

মঞ্জু কি ওর মা-কে বলেছিল কিছু? নইলে কেন মঞ্জুর মা-ও অনিকেতের সঙ্গে কথা বলত না?

ঘটনাটা একটা কালো দাগের মতোই অনিকেতের জীবনে রয়ে গেল। মেয়েদের এড়িয়ে চলত। কোনওরকম ভাবেই ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করত না।

পড়াশোনাতে ভালই ছিল মঞ্জু। অনিকেতের সঙ্গে আর কথা হয়নি কোনও। মঞ্জু কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তারপর ওর বিয়েও হয়ে যায়। বিয়ে হওয়াতে অনিকেত ভেবেছিল, যাক, বাঁচা গেল, রাস্তাঘাটে দেখা হয়ে যাওয়ার অস্বস্তিটা আর হবে না।

কিছুদিন পর ওই বাড়িটা ভাঙা হল। ওখানে একটা পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে। বাড়িটার নাম এখন 'কুসুম কানন'। ওই ফ্ল্যাটের পাশ দিয়ে হাঁটলে কাননের কুসুমকলির ছোট-ছোট কাঁটা আজও খোঁচা মারে এই বয়সেও। মঞ্জু হারিয়ে গিয়েছে, কিন্তু কালো দাগ বা ক্ষতচিহ্ন রয়ে গিয়েছে আজও। রহস্যটাও রয়ে গিয়েছে। কেন ওই বৃদ্ধকে ভালবাসা দিল, যেটা অনিকেত পেল না।

এই যে চাকদা-র পত্রলেখিকা, তাকে এক অসুস্থ বৃদ্ধ আহ্বান করছে। মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলছে। বলছে তুই আমার প্রাণ। মেয়েটি কি শেষ পর্যন্ত...। কিন্তু এখানে ওই বৃদ্ধটি হল বাড়িওলা, মেয়েটির বাবার চাকরিদাতা...। ফলে আরোপিত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু মঞ্জুর ক্ষেত্রে তো ওরকম কিছু ছিল না, তবে কেন? কিছু কি লোভ দেখিয়েছিল বড় পিসেমশাই? টাকাপয়সা? তবে কি নেহাত টাকার জোরে? দাদাঠাকুরের একটা কথা ছিল, পৃথিবীটা কার

বশ? পৃথিবী টাকার বশ। তার মানে টাকার বিনিময়ে মঞ্জু ওই কাজ করতে রাজি হয়েছিল? কে জানে!

ফ্ল্যাশব্যাক শেষ করে ফিরে এসেছি সেই চিঠিতে। অনিকেত জিগ্যেস করল, কী বলবেন চাকদা-র ওই মেয়েটিকে।

ভারতীদি বললেন—বলব প্ররোচনায় পা দিও না। ওরা সব বাজে লোক। বলব, ভাল করে পড়াশোনা করে স্বাবলম্বী শুধু নয়, পরিত্রাতা হও। বাবাকেও সাহায্য করো। মনে জোর আনো... এইসব বলব। ঠিক বলে দেব, এই লোকগুলো। পারভার্টেড। বুঝিয়ে বলে দেব।

হুঁ। মৃদু মাথা নাড়ায় অনিকেত। ওঁরা স্টুডিওতে ঢোকেন।

অনিকেত নিজে বলল না, কিন্তু ওর মনে হল ওর বউ শুক্লা-র দরকার ছিল এই মুহূর্তে, যে মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলবে দুর্গা-দুর্গা।

শুক্লা বলল, ছি ছি, কী সব প্রোগ্রাম করছ, দুলালের মা বলছিল। খুব বাজে, নোংরা।

—দুলালের মা রেডিও শোনে না কি? কী করে শুনবে? সকালবেলা তো ও কাজে থাকে।

—ও শুনবে কেন? ও অন্যের বাড়িও কাজ করে তো, না কি?

—কী বলছিল দুলালের মা?

—পাশের বাড়ির যূথিকারা বলাবলি করছিল, এ-বাড়ির লোকটার এই বয়সেই ভীমরতি হয়েছে।

'রতি' শব্দটা শুনেই অনিকেতের মনটা কয়েক মুহূর্তের জন্য এধার-ওধার হয়ে গেল। যা সব ঘটছে, ওর মধ্যে এই শব্দগুলো অন্য ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। কোথায় যেন পড়েছিল ভীমরতি-র সঙ্গে রতি-র কোনও সম্পর্ক নেই। ভীমের মতো রতি করেন যিনি—এরকম ব্যাসবাক্য-সহ বহুব্রীহি সমাস এটা নয়। এই শব্দটা এসেছে সংস্কৃত 'ভ্রমতি' থেকে। মানে 'ভ্রম' করা। ভুলভাল হয়ে যাওয়া আর কী। বুড়ো বয়সে অনেকেরই সোডিয়াম-পটাসিয়ামের গণ্ডগোল হয়, তখন ভুলভাল বকে। শুক্লা বলল—এমন সব কথাবার্তা নাকি বলেছ, যা মুখেও আনা যায় না। তোমার গলা তো সবাই চেনে, তোমার মুখে ওসব বাজে কথা শুনে ওরা অবাক। ওরা বলেছে কী করে ভদ্রলোক ওসব কথা মুখে আনতে পারলেন?

এসব নিয়ে শুক্লার সঙ্গে অনিকেতের খুব একটা আলোচনা হয়নি আগে। অফিসে কিছু মজার ব্যাপার-স্যাপার হলে বউকে হয়তো বলে, যেমন অ্যানাউন্সার বাসবীদি শাড়িতে একটা প্রজাপতি ক্লিপ লাগিয়ে এসেছিল, হাঁটলেই প্রজাপতিটার ডানা দু'টো নড়ে, কিংবা পীড়িত পুরুষপতি পরিষদ থেকে এক ভদ্রলোক দেখা করে বলেছেন, উনি পত্নীদের অত্যাচার মোকাবিলায় পতিদের কর্তব্য-বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিতে চান, তার ব্যবস্থা করা যায় কি না—এই ধরনের অফিসের কথা হয়, কিন্তু কী-কী অনুষ্ঠান হচ্ছে, না-হচ্ছে—এ নিয়ে শুক্লার সঙ্গে

কোনও পরামর্শ সাধারণত করে না।

—কী বলেছিলে তুমি বলো তো? ওরা কেন এরকম বলছে?

অনিকেত মাথা চুলকোয়। বলে, কী আবার বলব, রেডিও-তে কি খারাপ কথা বলা যায় নাকি?

—তবে যে ওরা বলছে?

—রাখো তো ওদের ন্যাকামি...

—দাঁড়াও, আমি শুনব। কবে যেন হয়? রোববার, সকাল আটটা-য়, তাই না?

অনিকেত মনে-মনে ভাবে—এই রে... ভারতীদি আর ডা. মুখার্জি যেটা রেকর্ড করে গেলেন—সেই এপিসোডটাই তো আগামী রবিবার আছে।

শুক্লার বিয়েতে ওর বাবা ওকে একটা ডায়েরি উপহার দিয়েছিলেন, সেই ডায়েরি-ভর্তি বাণী। মানে, ভাল-ভাল কথা। গীতা, উপনিষদ, বাইবেল, জাতক—এসব বই থেকে নেওয়া, তা ছাড়া প্লেটো, সক্রেটিস, শেক্সপিয়র, শংকরাচার্য, চাণক্য, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রাধাকৃষ্ণণ—এঁদের উদ্ধৃতি। শুক্লার বাবা বলেছিলেন, রোজই দুই-এক পাতা করে পড়তে। শুক্লা তাই করে থাকে। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানিনৈনং দহতি পাবকং... অস্ত্র দিয়া আত্মাকে কাটা যায় না, আগুন ইহাকে পোড়াইতে পারে না, বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না, জল ইহাকে সিক্ত করিতে পারে না... শুক্লা এসব পড়ে কী আনন্দ পায়? কিংবা, জাহাজ যে-দিকে থাক না কেন, কম্পাসের কাঁটা উত্তরেই থাকে, তাই জাহাজের দিক ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ভগবানের দিকে থাকে, তার কোনও ভয় থাকে না। শুক্লা অনিকেতকে বলেছে, তুমিও তো রোজ দু-এক পাতা পড়তে পারো, মনটা তো ভাল থাকে এতে।

অনিকেতেরও একটা ডায়েরি আছে। ওটাও উদ্ধৃতি লেখার ডায়েরি। আগে ওটা কবিতা লেখার ডায়েরিই ছিল। কবিতা লেখার চেষ্টা করত। বুঝেছিল হচ্ছে না। অনিকেত ব্যর্থ কবি,—ও জানে, জেনেও গিয়েছে। ব্যর্থ কবিদের কবিতা লেখার খাতায় পরবর্তীকালে উষ্মা মন্তব্য পূর্ণ স্বগতোক্তি লেখা হয়ে থাকে। অনিকেত তা করেনি। অন্যের কিছু ভালোলাগা কবিতার লাইন টুকে রেখেছে। মানে—টুকে রেখেছিল, এখন এই অভ্যাসটাও নেই। সেখানে নানারকম উদ্ধৃতি আছে। শিবরাম চক্রবর্তী সৈয়দ মুজতবা আলি যেমন আছেন, সুভাষ-নীরেন্দ্রনাথ-শঙ্খ-সুনীল থেকে জয়-মৃদুল-জয়দেব বসু-রাহুল-চৈতালী-জামালও আছেন। যেমন—মাটির ভিতরে জমে অন্ধকার মাটি নিজে আর জানে না ফসল/তোমার চোখের জলে ভরে ওঠে/ছোট ছোট ফল। কিংবা—লেজে ভর দিয়ে দাঁড়াইনি চাঁদ খাবো বলে... এইসব।

শুক্লাকে মাঝে-মাঝে শুনিয়েছে এইসব। ও বলেছে, তুমি যদি পারো ল্যাজে ভর দিয়ে দাঁড়াও, আমার ল্যাজ নেই, চাঁদ খাবারও ইচ্ছে নেই।

—'সারাটা জীবন একটা গরম কড়াইয়ের উপর নেচে গেলাম'—এই লাইনটা পড়ে বলল—এটা ডায়েরিতে টুকে রেখেছ? কী আনন্দ দিচ্ছে তোমাকে কথাটা? জাস্ট এর সঙ্গে কম্পেয়ার করো, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত... যা আমার ডায়েরিতে আছে...।

—তুমি বুঝবে না... বোঝাতে পারব না। অনিকেত বলে।

শুক্লাও একই কথা বলে। অনিকেতের এই বউ প্রেমজ বিবাহের ফল নয়। ওর দ্বারা প্রেম-ট্রেম হয়ে ওঠেনি। মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা-টলার বিপক্ষে একটা শক্তি কাজ করে

গিয়েছে, সেটা ওই মঞ্জু-ঘটিত ট্রমা। অনিকেতের ছোট বোনটির বিয়ে ঠিক হলে, বাড়িতে একজন কোনও 'মেয়ে' দরকার বলে—ওর বিয়ে। পিসিরা বলল, কী রে অনি, রেডিওতে তো কাজ করছিস, নিজে থেকে কিছু ঠিকঠাক করেছিস না কি?

অনিকেত বলেছিল, না।

'না' বলতে একটু ইগো প্রবলেম হয়েছিল বইকি। অনিকেতের বাবার সময়ে এই ধরনের প্রশ্ন করার অবকাশই ছিল না। যদি জিগ্যেস করা হত, অনিকেতের বাবা গর্বের সঙ্গে বলত : না। অন্তর্নিহিত ভাবটা হল, আমি নিজে নিজের বিয়ে ঠিক করব? ছিঃ। একেই বলে কালপ্রবাহ। এখন কোনও ছেলের যদি গার্লফ্রেন্ড না-থাকে, বা কোনও মেয়ের বয়ফ্রেন্ড, বন্ধুমহলে সে হেয়। এরকম তো কত চিঠি পায় অনিকেত—আমার সামনের দাঁত উঁচু বলে আমার কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই। আমি কি দাঁত উঠিয়ে সুন্দর দাঁত বসাব? রুট ক্যানাল ব্যাপারটা কী? আমার যে গার্লফ্রেন্ডটি আছে, সে কেবলই চকোলেট, আইসক্রিম ইত্যাদি খেতে চায়। বাবা আমায় যা হাতখরচ দেয়, সব ওর পিছনে চলে যায়। মাঝে-মাঝে ভাবি ওকে আমি ফুটিয়ে দি। কিন্তু আমার হাতে আর কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই। বাবার পকেট থেকে মাঝে-মাঝে টাকা চুরি করি। বাবা মা-কে বকাবকি করে। বাবা ভাবে, মা-ই টাকা চুরি করেছে। এজন্য বাবা একদিন মা-কে মারল। মা খুব কান্নাকাটি করছে। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। আমার গার্লফ্রেন্ডকে মুখ ফুটে বলতেও পারছি না—বাদাম-ঝালমুড়িতে সন্তুষ্ট থাকতে না-পারলে আমি খেলব না। আমি কি আমার গার্লফ্রেন্ডকে সব খুলে বলব?...। কিংবা, আমার বয়েস ১৭+, কিন্তু বুকটা খুব অপরিণত বলে আমার কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই। কাগজে নানারকম তেলের বিজ্ঞাপন দেখি যা মালিশ করলে...।

বর্ণালী গড়াই-এর কথা ফের মনে পড়ে অনিকেতের। বর্ণালী গড়াইকে নিয়ে কিছু একটা লিখতে হবে। হয়তো গল্পই।

কবিতায় ব্যর্থ হয়ে গল্প-টল্প মাঝে-মধ্যে লিখত অনিকেত। দু-চারজন লেখক-বন্ধুও হয়েছিল। কফি হাউসেও যেত।

বিয়ের পরপরই একটা চটি-বই ছাপিয়েছিল অনিকেত নিজের পয়সায়। ওর শ্বশুরবাড়িতে খবর চলে গিয়েছিল ও একটা বই লিখেছে। অনিকেতের শ্বশুরমশাই ছিলেন স্থানীয় একটি স্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই। তিনি একদিন বলেন, বইটা দেখালে না, দেখতাম কেমন লিখেছ... শুক্লা বলে, বাবাকে এই বই দিতে হবে না। কিন্তু শ্বশুরমশাইয়ের কথা অমান্য করবে কী করে অনিকেত? বইটা দেয়।

কয়েকদিন পর বইটা ফেরত পায় অনিকেত। শ্বশুরমশাই বলেন, পড়তে পারলাম না। আমাদের বাংলা সাহিত্যের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। আর কিছু বললেন না। অনিকেত বইটা নিয়ে এসে দেখে, মাস্টারমশাই ভাষা-সংশোধন করেছেন। যেখানে 'গু' আছে, সেটা কেটে পাশে পেনসিলে লিখেছেন বিষ্ঠা। 'রাঁড়' কেটে করেছেন 'বিধবা', 'হাগতে যাব' কেটে করেছেন 'বাহ্যে যাব'।

'শুয়োরের বাচ্চা'-ও কেটেছেন। 'বরাহনন্দন' করেছেন। কিন্তু এক জায়গায় আছে সন্তান কাজ না-করে স্কুলে যাচ্ছে বলে ওর খেতমজুর বাবা বলছে—এবার স্কুলে গেলে, এ্যাঁড় ছিচে দুব... এই জায়গাটা শুধু আন্ডারলাইন করে ছেড়ে দিয়েছেন। সংশোধনের সীমা ছাড়িয়ে

গিয়েছিল, তারপর হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনাটা বলা হল শুক্লার বাড়ির ঐতিহ্য বোঝানোর জন্য। এই আবহাওয়াতেই শুক্লা বড় হয়েছে। তাই রেডিও-র ওই 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠান নিয়ে শুক্লার সঙ্গেও আলোচনা করেনি অনিকেত। ওকে শুনতেও বলেনি কখনও। অনিকেত এ-ব্যাপারে খুবই একা এবং নিঃসঙ্গ।

পরের রোববার সাড়ে সাতটা নাগাদ বাজার করতে বেরিয়ে গেল অনিকেত। শুক্লা ট্যাংরা মাছ ভালবাসে, ট্যাংরা মাছ কিনল। আটটার সময় ওই অনুষ্ঠানটা শুরু। শুক্লার কি মনে আছে? শুক্লা ঢ্যাঁড়সও ভালবাসে। কচি ঢ্যাঁড়স নেবে বলে উবু হয়ে বসে। ঢ্যাঁড়সের পিছনের দিকটা ফাটাতে-ফাটাতে অনিকেত দেখল উল্টো দিকে একটা নতুন হনুমান মন্দির। পাড়ায় অবাঙালি আসতে শুরু করেছে। একবার মন্দিরের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে অনিকেত বলল, বাবা হনুমান, শুক্লা যেন ভুলে যায়।

শুরুতে একটা ছোট্ট স্কিট আছে। বদমেজাজ নিয়ে। সাইকোলজিস্ট-রা বলেন অ্যাগ্রেশন। নিজের অস্তিত্ব বোঝানো। কিশোর কালের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। এটা আট মিনিট। তারপরই প্রশ্নোত্তর। প্রথম দু'টো প্রশ্ন যা হোক করে ম্যানেজেব্‌ল। থার্ড প্রশ্নটাই তো সমস্যায় ফেলে দেবে...। হিসেব করে দেখল আট-টা আঠারো মিনিটটা সংকটজনক সময়। ঠিক ওই সময় একটা ফোন করবে অনিকেত। জিগ্যেস করবে খয়রা মাছ উঠেছে, ওটা আনবে কি না, দুলালের মা কি মাছ কুটে দেবে? না কি ও রাগ করবে? এসব জিগ্যেস করে মিনিট তিন-চার সময় পার করে দেবে। দরকার হলে মাঝখানে একবার ফোন কেটে দেবে, যেন এমনিই কেটে গেল। কিছুটা সময় নষ্ট হবে। নষ্ট কেন, নষ্ট কেন, কিছুটা সময় বেঁচে যাবে। তারপর আবার ফোন করবে... বলবে—বলছিলাম কি, পাঁচফোড়ন-টাচফোড়ন আছে তো?

এইসব দুষ্টুবুদ্ধি ভূতে জোগায়। আর একেই তো বলে স্ট্রাগ্‌ল ফর এগ্‌জিস্ট্যান্স। তখন তো মোবাইল ফোন ছিল না, বুথে গিয়ে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ফোন লাগাল বাড়িতে।

শুক্লা ধরল। বলল—বাজারে খয়রা মাছ উঠেছে... শুক্লা বলল—যা খুশি আনোগে যাও, আমি এখন তোমার ওই সব শুনছি। ফোনটা রেখে দিল শুক্লা।

এরপর অনিকেত দাঁড়িয়ে থেকে ট্যাংরা মাছ কুটিয়ে নিল। পুঁটি আর মৌরলা মাছ কিনেছিল, ওগুলোও কুটিয়ে নিতে-নিতে ঘণ্টাখানেক কাবার করল। তারপর বাড়ি ফিরল।

কলিং বেলটা টিপতে আবার কয়েক সেকেন্ড দেরি করল। যেখানে যেভাবে যতটা সময় খাইয়ে দেওয়া যায়।

ও তো আর শালা-টালা বলতে পারে না, নইলে দরজা খুলেই বলত—লজ্জা করে না শালা...। দরজাটা শুক্লাই খুলল।

মুখটা হাসি-মাখা। ইলেকট্রিকের তারে ঝোলা কাটাঘুড়ির মতো ওর মুখে রগড় ঝুলে আছে।

ব্যাপারটা কী? অনিকেত নিজেই ভাবে, মেয়েরা মাইরি আজব চিজ। কিচ্ছু বোঝা যায় না। এজন্যই বলে দেবা ন জানন্তি। শুক্লার সঙ্গে এতদিন ঘর করেও কিছু বোঝা গেল না!

অনিকেত বলল, মাছ-টাছ কুটিয়ে এনেছি। শুক্লা কিছু বলল না।

অনিকেত এবার বলল, জলখাবার কী হবে? লুচি? থাক, লুচি-টুচি করতে হবে না। চিঁড়ে দিয়ে দাও। এগুলো সব শুক্লাকে খুশি করার চেষ্টা। শুক্লা এবার বলল, ওসব কথাগুলো যখন

বললে, মুখে একটুও আটকাল না? প্রশ্নটা ছুড়েই দিল, কিন্তু ঢিল ছোড়ার মতো নয়, নদীর বুকে জাল ছুড়ে দেওয়ার মতো। জাল তো ছোড়ে না, বিছিয়ে দেয়। কিংবা এমনভাবে বলল, যেন, বিষ্ঠা নিয়ে কাজ করা কোনও রিসার্চ-স্কলার'কে তার গাইড জিগ্যেস করছে—পারলে এত নোংরা ঘাঁটতে?

'তোমার মুখে একটুও আটকাল না?' এই প্রশ্নের উত্তরে শিশুর মতো মাথা নাড়ল অনিকেত। যেন শিশুটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'তোমার অন্ধকারে যেতে ভয় করে না সোনা?' শুক্লা আবার বলল—যে-মেয়েটার চিঠিটা তুমি পড়লে, সেটা কি মেয়েটা সত্যি-সত্যিই লিখেছিল? না কি তুমি ওটা বানিয়েছ?

অনিকেত মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—হ্যাঁ, সত্যি মাইরি, চিঠিটা তো লিখেছিল মেয়েটা।

শুক্লা বলল, বাব্বা, এখনকার মেয়েরা পারেও। ওই যে কথা আছে, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না—ওগুলো এখন বাতিল প্রবাদ।

অনিকেত সাহস পেল। বলল, তোমার খারাপ লাগেনি তো?

শুক্লা বলল, খারাপ তো লেগেইছে। রুচিতে তো বাধে। সেই ছোটবেলা থেকে একটা কনসেপ্ট তৈরি হয়েছে, কনসেপ্ট ঠিক নয়, মানে একটা ইয়ে।

একটা সংস্কার? অনিকেত কথা জোগায়।

—সংস্কার? বলতে পারো...

—তা হলে কুসংস্কার?... অনিকেতের খুব বাড় বেড়েছে।

ন্-না-না, কুসংস্কার বলব কেন?—বরং এই একটা ধারণা, মানে বোধ, মানে, রুচিবোধ।

—হ্যাঁ। তো?

—ওটায় আঘাত করলে খারাপ লাগে।

অনিকেত বলল—একটা তো রুচিবোধ গড়ে উঠেছিল স্বামী মারা যাওয়ার পর অবশিষ্ট যে 'স্ত্রী' থাকে, মানে বিধবা, ওদের কর্তব্য-অকর্তব্য নিয়ে। সেই রুচিবোধ বা সংস্কার—যাই বলি না কেন, বিদ্যাসাগর কি আঘাত করেননি সেই রুচিবোধকে?

—ছিঃ, তুমি নিজেকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনা করতে পারলে?

—ছিঃ, তা করতে যাব কেন? আমি? কোথায় চাঁদ আর কোথায়...'পাদ' কথাটা মুখে এসেছিল। সামলে নিল অনিকেত।

যে-প্রসঙ্গটা নিয়ে এত সব, সেটা হল একটা চিঠি। মুর্শিদাবাদের ডোমকল থেকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি মেয়ে চিঠি লিখেছিল, 'আপনারা যে-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, তার সিংহভাগই ছেলেদের সমস্যা। আমার মতো মেয়েদেরও অনেক সমস্যা আছে। প্রকৃতির নিয়মে আমরাও চিরকাল শিশু থাকি না। দেহের পরিবর্তন হয় যৌবনের চিহ্ন ফুটে ওঠে। ওইসব চিহ্ন আড়াল করার জন্য আমরা পোশাক জড়িয়ে রাখি। কিন্তু ছেলেদের বেলায় এমন বিধান নেই। ছেলেরা দিব্যি খালি গায়ে ঘুরে বেড়ায়। ওদের বুকেও তো লোম ওঠে। ওগুলো আমরা দেখি। দেখতে ভালই লাগে। প্রশস্ত বুকে মাথা রাখতেও ইচ্ছা করে। কিন্তু ওইসব ইচ্ছা অবদমন করি। বিবাহের পূর্বে ওইসব ঠিক নয়—এই সামাজিক বিধান মেনে চলি। প্রকৃতিতে জীবজন্তুর ক্ষেত্রে অবদমনের কোনও ব্যাপার নেই। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে আছে। কোনও ছেলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত না-হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করে না। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে কামভাব থাকে। সেই

কামনা থেকে কিছুটা নিবৃত্তির জন্য নিজের হাতেই একটা উপায় বেছে নেয়, ওটাকেই হস্তমৈথুন বলা হয়। আপনারা ওইসব নিয়ে আলোচনা করেছেন, এবং ডাক্তার বিষ্ণু মুখার্জি বলেছেন ওই ব্যবস্থা খুব খারাপ কিছু নয়, এর সপক্ষে তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েদেরও একই সমস্যা আছে। বাল্যবিবাহের দিন শেষ। কামনা তো আমাদেরও আছে। প্রকৃতির নিয়মেই আছে। কামনা সত্য। 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতি বলেছিলেন, কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ? এ জগৎ মহা হত্যাশালা...। হত্যা অরণ্যমাঝে, হত্যা লোকালয়ে, হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে কীটের গহ্বরে।...চলেছে নিখিল বিশ্বহত্যার তাড়নে...। এখানে স্যর 'হত্যা' শব্দটির পরিবর্তে যৌনতা শব্দটি বসিয়ে দেওয়া কি ভুল হবে? কিন্তু, সর্বোপরি, আমরা সামাজিক। সুতরাং যা-খুশি করতে পারি না। কিন্তু কারও কোনও ক্ষতি না-করে, কাউকে প্রোপোজ-ট্রোপোজ না-করে যদি নিজেই কিছুটা কাম নিবৃত্তি করি, সেটা সমর্থন করবেন? বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে? আমি আরও স্পষ্ট করে জানতে চাই—মেয়েরা কি হস্তমৈথুন করতে পারে? যদি পারে, কীভাবে? করলে কি কোনও ক্ষতি হয়? আমি বাংলা অনার্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী।

এই চিঠির কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে পড়েছিল অনিকেত। শেষের দিকটা বাদ দেয়নি। ওটাই তো আসল প্রশ্ন। ভারতীদি উত্তরে বলেছিলেন—না, কোনও ক্ষতি হয় না। আঙুলের নখটা যেন বড় না-থাকে, আর আঙুল যেন পরিষ্কার থাকে। ক্লাইটোরিস কী বস্তু, সেটাও বলেছিলেন; বলেছিলেন কলম, পেনসিল বা ওই জাতীয় কোনও কিছু ব্যবহার কোরো না। এইসব বলে শেষকালে বলেছিলেন—শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে মন। মনের তৃপ্তিই সবচেয়ে বড় তৃপ্তি। ভাল গান শোনো, খেলাধুলো করো, বই পড়ো, মানুষের উপকারে লাগো, এতেই মন পূর্ণ হবে। সেইসঙ্গে অনিকেত যোগ করে দিয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত লাইন—শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম?

অনিকেত শুক্লাকে বলে ফেলল—ডোমকলের ওই মেয়েটার মনে যে-প্রশ্ন এসেছে, এই ধরনের প্রশ্ন তোমার মনে আসেনি—তোমার ওই বয়সে?

শুক্লা একটু হাসল। বলল—একদম আসত না সেটা বলি কী করে? আসলে ওটা-কে খুব নোংরা জায়গা ভাবতাম। টাচ করতাম না। মায়েদের দেখতাম প্রতিমাসে অশুচি হত। তখন কিছু ছুঁত না। কাকিমারা রান্না করত। একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল, ওটা খুব নোংরা জায়গা।

—সাবান-টাবানও দিত না...

ধুস, জানি না যাও। কেবল নোংরা কথা। এখন আর নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় না শুক্লা—অনিকেত বুঝে নিল। কিন্তু অনিকেত নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি করছে বলে বকাবকি করল না তো? এতে ওরও সায় আছে না কি?

একটা স্মৃতি মনে পড়ে। বিয়ের পর একটু বেড়াতে গিয়েছিল ওরা। 'হনিমুন' কথাটা তখনও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের সংসারে ঢং-এর কথা। বকাটে কথা। বউদের গায়ে ম্যাক্সি খুব একটা চড়েনি, বিউটি পার্লারের রেওয়াজ হয়নি। সায়াটা কেচে প্রকাশ্যে তারে ঝোলানো গেলেও, ব্রা-টাকে একটু আড়াল করে, সম্ভব হলে ওটার ওপরে কিছু চাপা দিয়ে শুকোতে হত। 'হনিমুনে যাচ্ছি' না-বলে বলতে হয়েছিল : যাই, জগন্নাথ মন্দিরে একটু পুজো দিয়ে আসি। সম্বন্ধ করা বিয়ের পর, কিছুদিন পরস্পরকে ইম্প্রেস করার ব্যাপার থাকে। আর আমি তোমার প্রতি কতটা 'লয়াল'

বোঝানোর ব্যাপার থাকে, এবং লয়ালিটি বোঝানোর জন্য কিছু-কিছু স্বীকারোক্তি পর্বও থাকে।

সমুদ্রের ধারে বসে, অনিকেত ওর খুচখাচ পাপ কবুল করেছিল। সবাই সব কিছু কবুল করে না। অনিকেতও করেনি। মঞ্জু-র ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিল। শুক্লাও ওর ছাত্রী-জীবনের কথা বলেছিল একটু। কলেজে ওর দিকে অনেক ছেলেই তাকাত, কিন্তু—ও কারও দিকে তাকাত-টাকাত না। একটি ছেলে, সে ব্যাঙ্কে নতুন চাকরি পেয়েছিল, ও শুক্লাকে 'ফলো' করত, শুক্লা বাসে উঠত, ছেলেটাও সেই বাসে উঠত। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকত। ওদের ক্লাসের কয়েকটা ছেলের সঙ্গে একটু বেশি আলাপ-পরিচয় হল 'শ্যামা' করার সময়। শুক্লা গান গেয়েছিল। সেই সূত্রে পরিচয়-হওয়া একটা ছেলে বলেছিল, একটা ছেলে তোর সঙ্গে আলাপ করার জন্য পাগল। ছেলেটা ব্যাঙ্কে কাজ করে। আমাদের পাড়ায় থাকে। তোর সঙ্গেই বাসে ওঠে। আমাদের চেয়ে একটু বড়। তোর সঙ্গে খুব মানাবে। আমি তোর সঙ্গে পড়ি জেনে আমাকে ধরেছে। তোর সঙ্গে একটু 'মিট' করিয়ে দেব। আমি তো কিছুতেই রাজি হচ্ছিলাম না, ও রোজ বলত। তারপর একদিন 'ঘোষ সুইট্স'-এ গেলাম। ওখানে কচুরি বলল। ভাজা হচ্ছিল তখন। ওই ছেলেটাও এসেছিল। কাঁচুমাচু মুখ করে বসেছিল। আমার ক্লাসমেট-টা ওর আরেকটা বন্ধুকেও নিয়ে এসেছিল। সেই ছেলেটার নাম সুনীল। ও করল কী, কী পাজি—একটু পরেই টেবিলের তলায় আমার পা-টা টাচ করল। তারপর নিজের পা আমার পায়ের পাতার ওপর তুলে দিল। ওর চটি খুলে চাপ দিচ্ছিল। আমার তো ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। আমি আমার পা-টা সরিয়ে নিলাম।

অনিকেত জিগ্যেস করেছিল, আর ওই ছেলেটা, মানে ব্যাঙ্কে-কাজ-করা ছেলেটা—তখন কী করছিল? শুক্লা বলেছিল—কিচ্ছু না। কী নিয়ে পড়েন, কোথায় থাকেন—এসব জিগ্যেসা করছিল।

অনিকেত বলেছিল, এরপর আর এগোল? শুক্লা বলেছিল, ধুৎ, আমি তো পাত্তাই দিইনি। নাম কী ছেলেটার? অনিকেত জিগ্যেস করেছিল।

—নাম? কী যেন বলেছিল। মনে নেই।

—ওই ছেলেটার নাম মনে আছে? যে তোমার ক্লাসমেট, যে তোমাদের ওই 'ঘোষ সুইট্স'-এ নিয়ে গিয়েছিল?

একটু আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করে শুক্লা বলেছিল, উঁহু, ওই ছেলেটার নামটাও মনে পড়ছে না। অনিকেত বলল : অথচ দ্যাখো, ওর নাম ভুলে গেলে, যে তোমার প্রেমে পড়ল, ক্লাসমেটের নামটাও মনে নেই, অথচ যে তোমার পায়ের ওপর পা রেখেছিল, তার নামটা দিব্যি মনে আছে, সুনীল।

একটু যেন বেকায়দায় পড়ল শুক্লা। বেচারা আকাশ ও সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল। দিগন্ত-বিস্তৃত সুনীল ওটা তো বহু পুরনো ব্যাপার। হঠাৎ মনে পড়ল। কেন মনে পড়ল? মনের ব্যাপার মনও জানে না।

অনিকেত আজ হঠাৎ জিগ্যেস করল—আচ্ছা শুক্লা, সেই সুনীলকে মনে আছে?

—কে সুনীল!

—যে 'ঘোষ সুইট্স' তোমার পায়ের ওপর পা...

—যা ব্বাবা হঠাৎ আজ একথা! এসব তো ভোলো না দেখছি।
—তুমিও তো ভোলোনি।
—তা, ওর কথা কেন আজ হঠাৎ!
—বলছি কী, আজ যদি সুনীল আবার তোমার পায়ের ওপর পা উঠিয়ে দেয়, কী করবে?
—কী আবার করব? পা-টা ধুয়ে নেব!

কুমুদ'দার ফেয়ারওয়েল হয়ে গেল। কুমুদদাকে দেওয়া হল একটা চাকা-লাগানো ট্রলি ব্যাগ। আগেকার দিনে ফেয়ারওয়েল-এ দেওয়া হত লাঠি, শাল, 'রামায়ণ'/'মহাভারত'/'রামকৃষ্ণকথামৃত'। নিত্যানন্দ'দা ট্রলি ব্যাগের দিকে তাকিয়ে বললেন—এটা দেখেই বুঝতে পারছি, আমরা পাল্টাচ্ছি।

নিত্যানন্দ'দা একবার শেয়ালের ডাক রেকর্ড করতে গিয়ে সাপের কামড় খেয়েছিলেন। রাত্রে যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়েছিলেন বাদুড়িয়া-র দিকে কোথাও। নাটকে দরকার এমন অনেক সাউন্ড এফেক্ট ওঁর হাতে করা। বহুদিনের পুরনো মানুষ উনি। যখন রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থাও ছিল না, নাটক লাইভ হত, তখন নাটকের দরকার মতো সাউন্ড এফেক্ট দিতে হত। এক গামলা জলে নানা কায়দায় নদীর কলকল, জলপ্রপাতের কুলুকুলু, বৃষ্টির টুপটাপ কিংবা ঝমঝম, এমনকী সাঁতারের ঝপাৎ ঝপাৎ করতে হত। পাথরের ওপর খোলামকুচি ঠুকে অশ্বক্ষুরধ্বনি, খালি পাউডারের কৌটোয় স্ক্রু-ডাইভার ঠুকে অসিযুদ্ধ, কাগজের ঠোঙা ফাটিয়ে বোমার শব্দ, হাঁড়ির ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে কথা বলে ভৌতিক আওয়াজ, শিশিতে ফুঁ দিয়ে জাহাজের ভোঁ, মাইকের সামনে ফুঁ দিয়ে ঝড়—এরকম কত কী করতে হয়েছে একসময়। টেপ রেকর্ডার আসার পর ওই ধুমসো রেকর্ডার নিয়ে কত কী 'শব্দ'-সংগ্রহ করেছেন। কুকুরের ল্যাজ মাড়িয়ে, কুকুরকে চিমটি কেটে, কুকুরকে বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে, কুকুরদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে কতরকমের কুকুরের ডাক রেকর্ড করেছিলেন তিনি। রেকর্ডার নিয়ে বাংলা মদের ঠেকে গিয়ে রেকর্ড করেছেন মাতালের কোলাহল, রিকশার ঠুনঠুন শব্দের সঙ্গে মাতালের গাওয়া শ্যামাসংগীত-ও 'আকাশবাণী'-র শব্দ-সংগ্রহে আছে।

উনি ফেয়ারওয়েল-এর বক্তৃতায় ওই সব শব্দ-সংগ্রহের অভিজ্ঞতা বলছিলেন। রাজাবাগান বস্তির কলের লাইনের একটা বালতি চুপিচুপি সরিয়ে দিয়ে বস্তির ঝগড়া রেকর্ড করার গল্প করলেন উনি। 'পটলডাঙার পাঁচালি'-তে ওই ঝগড়া ব্যবহার করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু পারেননি। প্রযোজক রাজি হননি শব্দগুলোর জন্য। বড্ড কাঁচা খিস্তি ছিল। এই ধরনের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বললেন, সব কিছুর শব্দ হয় না, আবার সব শব্দের রেকর্ড হয় না। ফুল ফোটার শব্দ নেই। ফুল তো ফট করে ফোটে না। গন্ধও শনশন করে ছোটে না। ধুপধাপ করে হিম পড়ে না, চাঁদ ডোবার সময় ঝুপ শব্দ করে না, বুকটাও ফটাস করে ফাটে না।

কিন্তু ওইসব নিঃশব্দ শব্দগুলো বুঝতে হয়।

কুমুদদা শেষদিন পর্যন্ত কাজ করেছেন। অনিকেতের 'সন্ধিক্ষণ' প্রোডাকশন-এর একটা ছোট নাটিকায় একটা স্বগতোক্তি ছিল—'তা হলে মুখের পাউডারে একটু ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে নিই?' ওখানেই শেষ।

এর আগের ঘটনাটা হল, একটি কালো মেয়েকে পাত্রপক্ষ পছন্দ করছে না। মেয়েটি ফরসা হওয়ার জন্য অনেক কিছু করছে। মুসুরি ডাল, দুধের সর, হলুদ বাটা...

ব্লিচিং পাউডার পর্বটি ছিল শেষ সংলাপ। এরপরই মিউজিক। একটা জুতসই মিউজিক খুঁজছিল শেষ সংলাপটির পর ফেড ইন করানোর জন্য। কুমুদদাকে কাছেই দেখল অনিকেত। বলল, একটা মিউজিক বেছে দিন না কুমুদদা...। কুমুদদা চার মিনিটের স্কিট-টা শুনলেন। তারপর বললেন, সারেঙ্গি-সন্তুরে কিছু হবে না দাঁড়া, আমি ব্যবস্থা করছি। শিরিষ কাগজ ঘষে একটা শব্দ তৈরি করলেন। কীরকম যেন আর্তনাদের মতো। শেষ সংলাপের পর ওই শব্দটা জুড়ে দিলেন।

ফেয়ারওয়েল-এর পর কুমুদদা সবার ঘরে গিয়ে দেখা করলেন। অনিকেতের ঘরেও এলেন। সঙ্গে সন্তুদাও ছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে কুমুদদার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল অনিকেত।

সনৎদা বলল—নখ-টখ ঠিকমতো কাটা আছে তো, দেখিস, সরি-সরি, তুই তো আঙ্‌লি করছিস না, কুমুদদার দিকে হাত বাড়িয়েছিস। ইঙ্গিতটা কুমুদদা বুঝলেন। কুমুদদা অনিকেতের হাতটা ঝাঁকিয়ে বললেন, গো ফরোয়ার্ড। মেয়ে বলে কি ওদের ইয়ে নেই না কি? আমার নাতনিটা নেহাত ছোট। নইলে ওকেও শুনতে বলতাম। ১৫/১৬ বছর আগে যদি এই সব হত...

ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস কুমুদদার। নিজের মেয়েটার কথাই কি ভাবলেন? অনিকেত শুনেছিল কুমুদদার মেয়ের মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল না। আত্মহত্যা। বোধহয় গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। কুমুদদা অনিকেতের কাঁধে হাত রাখলেন। যেন বলতে চাইলেন 'সঙ্গে আছি।'

কুমুদদা বললেন, 'আকাশবাণী'-র লোগো-তে লেখা আছে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'। আছে না? কাজীদা, মানে নজরুল যখন এখানে ছিলেন, ওঁকেও কচুরিপানা নিধন নিয়ে ফিচার লিখতে হয়েছে, মশা নিয়ে গান বাঁধতে হয়েছে। ব্রিটিশ আমলের 'আকাশবাণী' স্বাধীনতা সংগ্রামে তেমন কিছু করতে পারেনি বটে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক কিছু করেছে। আরে, কলা মুলো পটলের জন্য কম করেছি না কি আমরা? 'পল্লীমঙ্গল আসর'-এর ভুবনদার জ্বরটর হলে আমি অনেক প্রক্সি দিয়েছি। জৈবসার, গোবর সার এসব কম বলেছি না কি। ব্যাটাছেলেগুলোকে রান্না শিখিয়েছে 'মহিলামহল'...

সনৎদা কুমুদদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল—হ্যাঁ, এখন মেয়েদের আঙ্‌লি করা শেখাচ্ছে রেডিও। বহুজন সুখায়...।

কুমুদদা বলল, বেশ করেছে শেখাচ্ছে...। সনৎদা বলল, আমিও তো বলছি বেশ করেছে। গার্জেনরা আশীর্বাদ করবে তোদের। আরে সব গার্জেনই তো চায় ওদের ছেলেমেয়ের যেন সুখ হয়। আমাদের মানিকদার গল্পটা শোনো, মানিকদা মানে সারেঙ্গি আর্টিস্ট। গিয়েছিল পাড়ায়। দরাদরি হচ্ছে। মেয়েছেলেটা একশো দিয়ে শুরু করল, মানিকদা দরদারি করতে-করতে দশ টাকায় নামাল। আমাকে মানিকদা পরে কী বলেছিল জানিস, কী ভুল হয়ে গেল সনৎ, এমন জানলে ছেলেটাকেও নিয়ে আসতাম, দশ টাকায় হয়ে যেত। চব্বিশ বছর বয়েস,

ও কি আর আমার মতো এত ভাল দরাদরি করতে পারত? কুমুদদা বললেন—মানিক গুল মেরেছে বটে, কিন্তু ওর বুকের ভিতরের 'গুল', মানে গোলাপটা ফুটে উঠল ওই গুল-এ। বুঝতে পারছিস? পিতৃস্নেহ...। আমি বলছি অনিকেত, ইয়ার্কি করছি না, এটা কিন্তু বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়-ই হচ্ছে। সনৎদা মাঝের আঙুলটা নাড়াতে-নাড়াতে বলল, রাইট। বহুজন সুখায়-ই তো হচ্ছে।

কয়েকজন অভিভাবকের কয়েকটা চিঠি সত্যি-সত্যিই পেয়েছে অনিকেত। একজন লিখেছিলেন, 'আমার স্ত্রী যখন গত হন, আমার মেয়ের বয়স তখন দশ। মায়ের অভাব কখনও বাবা মেটাতে পারে না। আমি আর বিবাহ করিনি। যখন আপনাদের 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠান শুরু হয়, তখন আমার মেয়ের বয়স চোদ্দো। আমি কখনওই নিজের মেয়েকে বলতে পারতাম না, যা মায়েরা বলে। আপনারা মায়ের কাজ করেছেন।'

আর একজন লিখেছিলেন—'রেডিও শোনার অভ্যাস আমার বহুদিনের। আমার একটি দর্জির দোকান আছে। সবসময় রেডিও চলে। একদিন 'সন্ধিক্ষণ' নামক অনুষ্ঠান শুনিলাম। শুনিয়া মনে হইল এই অনুষ্ঠানটি আমার পুত্রেরও শোনা উচিত। ছেলেকে বলি এই অনুষ্ঠানটি শুনিতে। আমরা যদিও সংস্কারবশত এক ঘরে বসিয়া এক রেডিওতে অনুষ্ঠানটি শুনিতে পারি না, আমরা দুইজনে, দুই ঘরে একই অনুষ্ঠান শুনি। কোনও একটি কারণে পুত্রের সহিত আমার দূরত্ব তৈয়ারি হইয়াছিল। এখন মাঝে-মাঝে ওই অনুষ্ঠানের বক্তব্য সম্পর্কিত দুই-এক কথা পিতা-পুত্রের মধ্যে আলোচনা হয়। আপনারাই আমাদের মধ্যে সেতু গড়িয়া দিয়াছেন...।'

এই চিঠিগুলোই তো জল। টবের গাছ এরকম জল পেলে বেড়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় কথা—শুক্লাটাও খুব একটা খচল না। সময়টা ভালই তো যাচ্ছে।

চিঠিপত্রগুলো ফাইল করছিল অনিকেত। একই বিষয়ের চিঠিগুলো একসঙ্গে ক্লিপ করছে। যে-বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে—ওগুলো ফেলেই দিচ্ছে। বেশ কিছু চিঠি আসছে, যেখানে অভিভাবক সম্পর্কে অভিযোগ। 'মা বলছে বন্ধুদের সঙ্গে মিশবি না, বন্ধুদের টিফিন দিবি না, অথচ আমার খুব বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে, খেলতে ইচ্ছে করে। বাবা-মা'র কথা শুনতে হয়, বাবা-মা'কে ভক্তি করতে হয়। কিন্তু আমার বাবা-মা সবসময় ঝগড়া করে। ওদের একদম ভক্তি করতে ইচ্ছে করে না। আমাদের বাড়িতে কাজের মাসি আছে। যখন মা থাকে না, আমার বাবা ওকে ডেকে ছাদে নিয়ে যায়। চিলেকোঠা পরিষ্কার করায়। আর এইসব নিয়েই ঝগড়া হয়। বাবাকে আমার একটুও ভাল লাগে না। মা-কেও নয়। ওদের কথা শুনব কেন? যদি বলে কাউকে টিফিন দিবি না, কারও সঙ্গে খেলবি না, ওসব অমান্য করা কি অন্যায়? দয়া করে উত্তর দেবেন। আমার নাম বলবেন না। আমি রবিবার সকালবেলা আমার পড়ার ঘরে চুপিচুপি রেডিওতে এই অনুষ্ঠান শুনি। তখনও আমার বাবা ঘুমিয়ে থাকে, মা কাজ করে।'

এই চিঠির কী উত্তর দেওয়া উচিত? পিতা-মাতাকে মান্য করিবে, কদাচ পিতামাতার অবাধ্য হইবে না—অনিকেত, অনিকেতের বাবা, ঠাকুরদা—সবাই বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' থেকে জেনেছে। বিদ্যাসাগরের সময়ে ঘুষখোর, লম্পট, মাতাল বাপের কমতি ছিল না। ওরকম কোনও বাপের ছেলে যদি বিদ্যাসাগরকে জিগ্যেস করত : আমার এরূপ পিতাকে কি ভক্তি করিব? বিদ্যাসাগর মশাই কী উত্তর দিতেন কে জানে? যদি অনিকেতের সামনেই এই প্রশ্নটা

ফেলা যায়? অনিকেত কী বলবে? এসব মালা ভদ্র জানেন। সমাজতাত্ত্বিক মালা ভদ্র। সত্যিই কি জানেন তিনি? উনি তো বলবেন ভাগ করে খাও, ভাগ করে বাঁচো, একা-একা বাঁচা যায় না। এই কথাই তো বলবেন, নাকি প্রসঙ্গটা ঠিক এড়িয়ে যাবেন?

কত প্রশ্ন পৃথিবীতে। প্রশ্নোত্তরের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে নিতে মন্দ লাগে না অনিকেতের। নিজের ছোট্ট পরিবারের ছোট বৃত্তটা কত বড় হয়ে যায়।

কিন্তু ছেলেপিলেগুলোকে নিয়ে কী করা যায়? বেশ কয়েকটা চিঠি আলাদা একটা ফাইলে জমিয়ে রাখা হয়েছে।

মহাশয়, আমি একজন পুরুষ, কিন্তু নিজের ওপর ঘৃণা হয়। কেবল মনে হয় আমি যদি মেয়ে হতাম, খুব ভাল হত। আমি পুরুষ হয়েও মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি না; বরং পুরুষদের ভাল লাগে। আমার বয়স ২১, কো-এডুকেশন কলেজে পড়ি। ইচ্ছা করে মেয়েদের সঙ্গে বসি, ওদের সঙ্গে গল্প করি আর ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করি। একটা ছেলের প্রতি আমি খুব আকৃষ্ট। কিন্তু সে-কথা ওকে বলতে পারি না। আমার এই স্বভাব কি অস্বাভাবিক? যদি অস্বাভাবিক হয় তবে প্রতিকারের উপায় কি?

এরকম আর একটা—'আমরা এক ভাই, তিন বোন। বোনরা হার পরে, দুল পরে, কী সুন্দর রঙিন ফ্রক পরে। আমার ওইসব পরতে ইচ্ছে করে। দিদি নখে নেলপালিশ লাগায়। আমি যদি নেলপালিশ লাগাই, আমার মা বলে, কেন এগুলো নষ্ট করছিস? ওরা নখে লাগালে নষ্ট নয়, আমি লাগালেই নষ্ট? আমি হার পরেছিলাম বলে মা আমাকে মেরেছিল। কিন্তু বাড়িতে গোপাল ঠাকুর আছে। মা রোজ পুজো করে। গোপালকে খুব সুন্দর করে সাজায়। গলায় হার পরিয়ে দেয়। গোপালের হাতেও বালা আছে। আমার বাবার সোনা-রুপোর দোকান আছে। গোপালের জন্য গয়না নিয়ে আসে। গোপালও তো ব্যাটাছেলে। গোপাল সাজলে দোষ হয় না, আমি সাজলে দোষ হবে কেন?

আমি একদিন চুপিচুপি বোনের ফ্রক পরতে চেষ্টা করেছিলাম, তখন ফ্রকটা ছিঁড়ে যায়। বাবা-মা বুঝল, ওটা আমার কাজ। আমাকে মারল। এত সুন্দর-সুন্দর ক্লিপ, ফিতে, পুতুল— সবই কি মেয়েদের জন্য? আমি ক্লাস এইট-এ পড়ি। আমার মনের কথা বলার কোনও বন্ধু নেই, তাই আপনাদের আমার মনের কথা বললাম...।'

আর একটি চিঠি : 'আমি একজন যুবক। বয়স ২৬। আমার ইচ্ছে একটি ছেলের সঙ্গে আজীবন থাকি। ও আমার মেসের রুমমেট। পড়াশোনার জন্য বসিরহাটে থাকতাম। ও আমার চেয়ে বয়সে ছয় বছরের ছোট। ওর কথাবার্তার ধরন মেয়েলি। আমি এখন চাকরি পেয়েছি। বাড়ি থেকে বিয়ের কথা বলছে। বিয়ে করার পরও ওই ছেলেটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই। আমি ওই ছেলেটির সঙ্গে যৌনকার্য করি। পুরুষে-পুরুষে সংযোগ খারাপ কাজ বলেই শুনেছি। কিন্তু এই খারাপ কাজ করছি। হয়তো নরকে পুড়তে হবে। এই অবস্থায় আমার কোনও নারীকে বিবাহ করা কি উচিত? নারীর প্রতিও আমার যে একেবারে আকর্ষণ নেই তা নয়। কিন্তু পুরুষের প্রতিই বেশি। বিশেষত ওই বন্ধুটির প্রতি। ওই বন্ধুটির সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী'র মতো সম্পর্কে উৎসুক। বন্ধুটিও তা-ই চায়। সে এখন একটি আচার কারখানায় কাজ করে। তাকে সবাই লেডিজ, বউদি এসব নামে ডাকে। এতে ও কিছু মনে করে না। ও-বাড়িতে এসে মাঝে-মাঝে শাড়ি পরে।

আমি মনের সব কথা লিখে পাঠালাম, এবার আমি কী করব—এই উপদেশ চাই। আ.মণ্ডল।'

আ.মণ্ডল জিগ্যেস করেছে, আমি কী করব?

অনিকেত কী করবে?

স্টেশন ডিরেক্টর সুমিত চক্রবর্তীর উপদেশ চায়। সুমিতবাবু বলেন—মহা মুশকিলে ফেললেন। কী যে বলি, এইসব হোমো-সেক্সুয়ালিটি বড় বাজে সাবজেক্ট, কীভাবে ডিল করা উচিত হবে জানি না। আফটার অল, এটা তো প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ব্যাপার। হেটেরো সেক্সুয়ালিটি-ই হচ্ছে নেচার-এর চয়েস। অপোজিট জেন্ডার-এর প্রতি আকর্ষণটাই তো স্বাভাবিক। সেম জেন্ডার-এর দিকে আকর্ষণটা অস্বাভাবিক। এই সাবজেক্ট-টাকে অ্যাভয়েড করা যায় না?

অনিকেত বলল, চিঠিপত্র কিন্তু আসছে। দশ-বারোটা চিঠি অলরেডি পেয়ে গিয়েছি।

—দশ-বারোটা চিঠি এমন কিছু নয়। কতদিন ধরে চলছে অনুষ্ঠানটা?

—চার মাসের বেশি। সাড়ে চার মাস।

—এ পর্যন্ত কত চিঠি পেয়েছেন?

—পাঁচশো মতো।

—পাঁচশো চিঠির মধ্যে দশ-বারোটা কোনও পার্সেন্টেজে আসে না। ব্যাপারটাকে ইগ্‌নোর করুন। অ্যাভয়েড করুন। আমার তো তা-ই মত।

এর আগেও এমন দু-একটা চিঠি পেয়েছিল—যা পড়ে অনিকেতের কান গরম হয়ে গিয়েছিল। এরা এসব লিখছে কী করে? ভেবেছিল অ্যাভয়েড করবে। কিন্তু ওই ধরনের প্রশ্ন আরও আসতে লাগল। তখন আর অ্যাভয়েড করার উপায় থাকল না। কয়েকটা এরকম চিঠি গাইনি ভারতীদি'কে দেখাল অনিকেত। জিগ্যেস করল, এগুলোর কী উত্তর দেওয়া যায়? উনি চিঠিগুলো পড়লেন। বললেন—নেক্সট মিটিং-এ এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। মিটিং ডাকা হল।

অনিকেত কয়েকটা চিঠি পড়ল। বলল, পনেরোটা মতো চিঠি রয়েছে এই ফাইলে। এবার আমরা কী করব?

সাহিত্যিক বিভাস রায় বললেন—এসব এন্টারটেন করাই উচিত নয়। অ্যাবনর্মালিটি।

মনোবিদ দেবলীনা সান্যাল বললেন, হোয়াই অ্যাবনর্মালিটি? দিস ইজ আদার কাইন্ড অফ সেক্সুয়াল প্র্যাকটিস। অন্য ধরনের যৌনতা। অ্যাবনর্মালিটি বলতে রাজি নই।

ডাক্তার মুখার্জি বললেন—অন্য ধরনের যৌনতা মানে তো একসেপ্‌শন। প্রকৃতি তো চেয়েছে বাই-সেক্সুয়ালিটি। এককোষী জীব থেকে বহুকোষী জীবের ইভলিউশন হল কেন? একজিসটেন্স-এর জন্য। বৈচিত্রের জন্যও বটে। কোনও সেল-এর মধ্যে যদি ডিফেক্ট থেকে থাকে, তা হলে সেই সেল ডিভিশন হলে ডিফেক্ট-টা প্রতিটি সেলেই থেকে যাবে। এজন্যই তো মাইটোসিস থেকে মিয়োসিস। দু'টো প্রোডাকটিভ সেল দু'টো আলাদা সোর্স থেকে এলে ডিফেক্ট-টা কমে যেতে পারে। এগুলো খুব সাধারণ ব্যাপার। সবাই জানেন। প্রকৃতি চেয়েছে দু'টো ডিফারেন্ট সোর্স। ক্রোমোজোম ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এজন্যই স্পার্ম অ্যান্ড ওভাম। এজন্যই বিপরীত লিঙ্গে সংযোগ। সম-লিঙ্গের সংযোগ প্রকৃতি চায় না। যা প্রকৃতি চায় না, সেটাই অ্যাবনর্মাল।

সমাজতাত্ত্বিক মালা ভদ্র বললেন—দেখুন ডক্টর মুখার্জি, মানুষ একটা আলাদা প্রাণী। জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচার করাটা ঠিক হবে না। মানুষের বুদ্ধি, মেধা, আবেগ, অনুভূতি এবং ক্রিয়েটিভিটি মানুষকে অন্যরকম করেছে। সুতরাং, মানুষের বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন-এর মধ্যে নানারকম কালার আসতেই পারে। সমকামিতাও একটা কালার।

সাহিত্যিক বললেন—সমকামিতা ব্যাপারটা বাজারে খাচ্ছে ভাল। বিশেষত মহিলা সাহিত্যিকরা অশ্লীল কিছু লিখলেই 'হট কেক' হচ্ছে। কিন্তু সরকারি মাস মিডিয়া এসব কেন ঘাঁটাঘাঁটি করবেন? কী মেসেজ দেবেন? বলবেন হোমো-টোমো সব ঠিক আছে? সব নর্মাল ব্যাপার? তোমরাও হোমো করতে পারো? মনে রাখবেন, এটা কিন্তু বাচ্চাদের প্রোগ্রাম। এমনিতেই তো কয়েকটা পত্রপত্রিকা ওদের মাথা খাচ্ছে...।

মালা ভদ্র বললেন—এভাবে ভাবছেন কেন? আমরা তো বলতেই পারি, যারা সো-কল্‌ড মেয়েলি ধরনের পুরুষ, যারা নিজেদের মেয়ে ভেবে পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তারাও মানুষ। ওদের ঘেন্না কোরো না।

সাহিত্যিক রেগে উঠলেন। কেন ঘেন্না কোরো না? ওরা তো ঘেন্নারই পাত্র। এই বয়স্ক হোমোগুলো বাচ্চাছেলেদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। যা-তা সব কাণ্ড করে। একদিন তো দেখছিলাম একটা স্কুলের ছেলে রিঅ্যাক্ট করল। পেছনে ফিরে বলল, কী হচ্ছে কী কাকু, ছিঃ, ঠিক করে দাঁড়ান। মাঝবয়সি লোকটা বলল, বাসে যা ভিড়...ছেলেটা বলল ভিড়ের চাপ আলাদা, আর আপনি যা করছেন সেটা বুঝি না ভেবেছেন?

তারপর তো অন্য প্যাসেঞ্জার সব ছ্যা-ছ্যা করে উঠল। একজন কন্ডাক্টর'কে বলল, এই লোকদের মুখ দেখে রাখো, বাসে ওঠাবে না।

মালা ভদ্র বললেন—দেখুন, একটা কথা বলছি, মাইন্ড করবেন না, আপনারা সাহিত্য রচনা করেন কল্পনায় ভেসে। সব কিছু তো কল্পনা করে নিলে হয় না, আপনি কল্পনা করে নিয়েছেন ওই লোকটা হোমো-সেক্সুয়াল। তা তো নয়। ওদের বলে পিডোফিল। ওটা একটা বাজে মানসিক রোগ।

সাহিত্যিক বললেন, এ তো দেখি একেবারে কূটতর্ক লাগিয়ে দিলেন, কে এত সূক্ষ্মবিচার করতে যাচ্ছে ম্যাডাম? পিডোফিল'রা তো সমকামীদেরই একটা স্তর, না কি?

—একদম বাজে কথা। একটু পড়াশোনা করে নেবেন। পিডোফিল-রা শিশুদের সঙ্গে যৌনতা চায়। এটা অন্যায়। পিডোফিল'দের কখনওই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু পিডোফিল'দের সঙ্গে সমকামীদের গুলিয়ে ফেলবেন না।

—সবই তো গোলানো ব্যাপার। এই মিটিং-এ আসবই না। ক'টা টাকা দেয়? এই সময়ে দশ-বারো পৃষ্ঠা লেখা হয়ে যেত। মিটিং-এ আসব না আর, কিন্তু এসে গিয়েছি যখন সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিবাদ করব। সাহিত্যের কাজ হল সমাজের হিতসাধন। বঙ্কিমচন্দ্র তা-ই তো বলেছিলেন। রেডিওর ও রেডিওর তাই কাজ বলেই জানতাম। আকাশবাণী-র লোগো-তে লেখা থাকে 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়'। প্রথম যখন শুরু করেছিলেন অ্যাপ্রোচ-টা অন্যরকম ছিল। আমি লাস্ট কয়েকটা এপিসোড শুনেছি, কোথায় নিয়ে ফেলেছেন 'বহুজন সুখায়...'। গারবেজ। স্টেশন ডিরেক্টর অন্যান্যদের জিগ্যেস করলেন—আপনাদের এ ব্যাপারে কী ওপিনিয়ন? আপনারা শুনছেন তো?

উত্তরগুলো এরকম।

—আমি ভাই ভুলেই যাই... সরি।

—আমি বেশি রাতে শুই তো, রোববারটা একটু বেলায় উঠি।

—মাঝে দু-একটা শুনেছিলাম, তবে ফাস্ট এপিসোড শুনেছি। কাউন্সেলিং করার জন্য লোকজন এসে যায় কি না... সান্‌ডে বিকেলটা অবশ্য ফ্রি করে রাখি। বিকেলে ব্রডকাস্ট করলে পারতেন।

স্টেশন ডিরেক্টর কথা বাড়ান না। অ্যাডভাইসরি বোর্ড এরকমই হয়, তবু রাখতে হয়। শ্রোতারা কী বলছেন? কোনও অ্যাডভার্স কমেন্ট পেয়েছেন? অনিকেতকে জিগ্যেস করলেন এসডি।

—এখনও খারাপ কিছু পাইনি, বরং অ্যাপ্রিসিয়েশন-ই পেয়েছি।

—তা হলে আপনি কী বলছেন মিসেস সান্যাল? এই হোমো-সেক্সুয়াল'দের ব্যাপারে। বিষয়টা কী রাখব?

দেবলীনা সান্যাল বললেন—আমি তো বলছি বিষয়টা আসা উচিত। এটা হল 'আদার কাইন্ড অফ হ্যাবিট'। কাউন্সেলিং করে হ্যাবিট-টা চেঞ্জ করানো যায়।

ডা. মুখার্জি বললেন—এটা হল ইনার থিং। জেনেটিক, হরমোনাল। মনোরোগ নয়। কাউন্সেলিং করে কী হবে?

সাহিত্যিক বললেন—ওই তো, কাউন্সেলিং। সব কিছু কাউন্সেলিং। বাচ্চা কেন পাতলা পায়খানা করছে—কাউন্সেলিং। কাউন্সেলিং করাতে পারলেই তো ক্লায়েন্টগুলো ঠিক থাকে। স্টেশন ডিরেক্টর বললেন—প্লিজ, ব্যাপারটা পার্সোনাল লেভেল-এ নিয়ে যাবেন না।

মালা ভদ্র বললেন—শুধু আমরা কেন, সারা পৃথিবী জুড়ে ঝগড়া চলছে। কেউ বলছে এটা মানসিক রোগ, কেউ বলছে জেনেটিক, কোন দেশে এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, আমাদের দেশের ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী পশুমেহন যেমন অপরাধ, সমকামিতাও। আবার অনেক দেশে সমকামিতার স্বীকৃতিও আছে, সমকামীরা বিয়ে রেজিস্ট্রি করতে পারে। দেখুন, কথা হচ্ছিল এটা অসুখ কি না—এ নিয়ে। আমাদের দেশে সবরকম অসুখ নিরাময়ের জন্য কতরকম পোস্টার। লোধবাবুদের, চাঁদসীদের, তান্ত্রিকদের। অর্শ-ভগন্দর, যৌনশীতলতা, ধাতুদৌর্বল্য সব কিছু সারানো হয়, কই সমকামিতা সারানো হয় এরকম কোনও বিজ্ঞাপন কখনও চোখে পড়েছে? গুপ্তরোগের লিস্টিতে এটা এখনও ঢোকেনি। গোপনে মদ ছাড়ানো থেকে গোপনে প্রেম ছাড়ানোর জন্য ফোন নম্বর গাছে-গাছে ঝুলছে। সমকামিতা সারানো দেখেছেন কখনও? নেট খুলুন—সমাধান নেই। সব কনফিউজিং। কেউ বলবে এটা রোগ নয়, রোগের উপসর্গও নয়। কেউ বলবে—এটা চূড়ান্ত অস্বাভাবিক ও অন্যায়। নেট-এ হয়তো বিদেশি কাউন্সেলারদের নামও পাবেন, যারা সমকামিতা সারায়। আবার ভূরি-ভূরি সমকামীদের পত্রিকা পাবেন, ওদের বক্তব্য পাবেন, কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার নয়। তবে ওরা সামাজিকভাবে খুব কোণঠাসা।

স্টেশন ডিরেক্টর বললেন—আমরা তা হলে একটা জিনিস করতে পারি। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা রাখতে পারি। ভাল-খারাপ নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। পিডোফিল'দের কথা বলতে পারি, ওদের থেকে সাবধান থাকার মেসেজ দিতে পারি। মেয়েলি ধরনের ছেলেরা, যারা

অনেকেই ছেলেদের প্রতিই বেশি আকর্ষণ বোধ করে, মানে হোমো-সেক্সুয়াল, ওদের যেন ব্যঙ্গ না-করা হয়, হ্যাটা না-করা হয়—এটা বলতে পারি।

স্টেশন ডিরেক্টর যেন ছোট্ট করে জিভ কাটলেন। বোধহয় 'হ্যাটা' শব্দটা উচ্চারণের জন্য। ডিরেক্টরের মুখে 'হ্যাটা' মানায় না। মালা ভদ্র বললেন—যাঁরা চিঠি লিখছেন আপনাদের, নিজেদের সমকামী বলছেন, ওঁদের ডেকে আনুন না, কথা বলুন না...। অনিকেত বলল—ওরা তো গ্রামের ছেলে। আসতে বললেই আসবে কি না, ঠিক নেই। তা ছাড়া ওরা থাকবে কোথায়? রেডিও তো হোটেল খরচ দেবে না, সেই প্রভিশন-ই নেই। তা ছাড়া ওরা চিঠিতে যা লিখছে, আমাদের সামনে বলবে কেন? চিঠিতে তো মুখ থাকে না। মালা ভদ্র বললেন—ওদের আনতে পারলে ভাল হত। যারা ওদের মনের কথা বলবে, মনের ব্যথা বলবে...। অনিকেত মিসেস সান্যালকে বললেন—যারা আপনার কাছে কাউন্সেলিং করাতে আসে—এমন কেউ নেই?

মিসেস সান্যাল বললেন—ওরা নিজেদের এক্সপোজ করবে বলে মনে হয় না। ঘড়ি দেখলেন ম্যাডাম। স্টেশন ডিরেক্টর অনিকেতের চোখের দিকে চেয়ে বললেন—চেষ্টা করে দেখুন না, পাওয়া যায় কি না!

অনিকেতকে এবার সমকামী খুঁজে বার করতে হবে। কোথায় খুঁজবে ও!

অনিকেত কীভাবে যেন শুনেছিল কার্জন পার্ক-এর আশেপাশে কিছু সমকামী ঘোরাফেরা করে। ওরা পেছনের দিকে হাত রেখে চলাফেরা করে। অনিকেত তো বহুবারই কার্জন পার্ক-এর পাশ দিয়ে চলাফেরা করেছে, কিন্তু কখনও পেছনে হাত দেওয়া ছেলেদের চোখ পড়েনি তো। কিন্তু হেরম্বদা বললেন, উনি শিওর, কার্জন পার্ক-এ ওদের ঠেক আছে।

হেরম্বদা একজন ক্যাজুয়াল অ্যানাউন্সার। খুব মোটা গলা। যাত্রা করেন। হা-হা-হা-হা অট্টহাস্যে ওস্তাদ। রাবণ, কার্ভালো, কাপালিক—এসব যাত্রার ডায়লগ মুখস্থ। ভিলেন চরিত্রে পটু। রামকৃষ্ণ যাত্রাপালায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের পার্ট-টা উনিই করবেন, রিহার্সাল চলছে। উনিই বলেছিলেন, কার্জন পার্ক-এর কথা। হেরম্বদা এসব নানারকম খোঁজখবর রাখেন। উনি আবার একটা স্কুলের শিক্ষকও। একদিন গল্প করছিলেন, সোনাগাছিতে একটা ঘর থেকে বেরিয়েছেন, দরজার সামনেই ওঁর এক ছাত্রের সঙ্গে মুখোমুখি। ছাত্রটি না-দেখার ভান করে ঢুকে যাচ্ছিল, উনিও না-দেখার ভান করে চলে যেতে পারতেন, কিন্তু সেটা ঠিক হত না। হেরম্বদার ভাষ্যে : আমি খপ করে ওর হাতটা ধরলাম। বললাম, অ্যাই বিলে, এখানে এসেছিস? সব দেখে নেওয়া ভাল, কিন্তু জীবনে একবার বা দু'বার। ব্যস। অভ্যেস হয়ে গেলে খুব বিপদ। ভাবছিস স্যর এখানে কেন? তাই তো? আরে, শ্রীরামকৃষ্ণ পালায় গিরিশ ঘোষের পার্টটা করতে হচ্ছে তো? এসব একটু চাক্ষুষ না-দেখে গেলে অভিনয়টা জীবন্ত হবে কী করে? বুঝলি না? আমি জানি

ও-ব্যাটাও স্কুলে কিছু বলবে না। তা-ই হল।

অনিকেত কার্জন পার্ক-এর চারদিকে সন্ধের পর অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছিল, কিন্তু পিছনে হাত দেওয়া কাউকে দেখল না। কার্জন পার্ক-এর ওই দিকটায়, মানে ডেকার্স লেন-এর উল্টো দিকে, বেশ কিছু মূক-বধির জড়ো হয়। ওরা নিজেদের সাংকেতিক গল্প করে। ওরা শুধু আঙুল নাড়ায়, মাঝে-মাঝে ঠোঁট নড়ে, চোখের কিছু অভিব্যক্তি হয়, ওরা হেসে ওঠে, রাগ হয়, বিরক্তি প্রকাশ করে। ট্রাম গুমটির দিকটায় কয়েকজন বেদে-বেদেনীর ঝুপড়ি। ওরা জড়িবুটি বিক্রি করে। ফ্লাইং কলগার্লও কয়েকজন ঘোরাফেরা করে। অনিকেতকে ঘুরতে দেখে একজন হাতছানি দিল। একজন পাশের জনকে বলল, ঢ্যামনার ইচ্ছে আছে, কিন্তু সাহস নেই। দু-তিনটে পাক দেওয়ার পর মার্ক্স-এঙ্গেল্স-এর মূর্তির সামনে একটু দাঁড়ায় অনিকেত। একটা লোক, অনিকেতের দিকে এগিয়ে আসে। বেশ মোটা গোঁপ। প্যান্টের মধ্যে শার্ট গোঁজা। কোমরে বেল্ট। অনিকেতের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মারল। অনিকেতের মনে হল, এই লোকটা তা হলে হতে পারে। কিন্তু অনিকেত কী বলবে তার কোনও স্ক্রিপ্ট তৈরি ছিল না। ফার্স্ট ডায়লগেই কী বলবে না কি 'আপনি হোমো?' অবশ্য তার আগেই লোকটা বলে : ঠেক ফিট আছে? অনিকেত একটু ঘাবড়ে যায়। ও মাথা নেড়ে দেয়। মানে, নেগেটিভ। মানে-না। লোকটা বলে, ঠিক আছে, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। বাট্টু সালসা তো? তার মানে ওই লোকটা অনিকেত-কেই পুরুষ যৌনকর্মী ভাবছে। 'বাট্টু' মানে বোধহয় পায়ু। তার মানেটা দাঁড়াচ্ছে, এই অঞ্চলে এদের পাওয়া যায়। অনিকেত বুঝতে পারছে না। যেসব মানুষজন ঘোরাফেরা করছে, তাদের মধ্যেই হোমো আছে। অনিকেত চিনবে কী করে, ওই লোকটাই ভুল করল। ভুল লোককে চিহ্নিত করল।

অনিকেত বলল, আপনি বোধহয় ভুল করছেন। তবে আপনি যাদের খুঁজছেন, আমিও তাদের খুঁজছি। আমি একজন জার্নালিস্ট, রেডিও-জার্নালিস্ট। ওদের দরকার আমার।

লোকটা বলল, সরি সরি, ডোন্ট মাইন্ড। আপনি অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাফেরা করছিলেন তো তাই ভাবছিলাম...।

অনিকেত বলল—আপনাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করব? আমার একটু হেল্প হয়...।

—বলুন...

—আপনি কি হোমোদের খোঁজে এদিকে আসেন?

—ধুরানি-র খোঁজে আসি। আসতাম। বহুদিন পর এলাম। এখন দেখছি না। বোধহয় পুলিশ রেড-টেড করছে।

—ধুরানি মানে?

—কিছুই তো জানেন না, আপনি কী রিপোর্টিং করবেন?

—কিছু মনে করবেন না, আপনি কি 'হোমো'?

—আমি সব। ওকে। চলি। গুড লাক। লোকটা হনহন করে হেঁটে যায়।

কার্জন পার্ক-এ ওর লাভ হল না সেদিন। সেদিন ওখানে ঘুরে-বেড়িয়ে মন্দ লাগছিল না। একটু বুক ধুকধুক করছিল যদিও, কিন্তু ব্যাপারটা রেলিশ করছিল। বেশ একটা খোঁজ। একটা তদন্ত। একটা ইনভেস্টিগেশন।

অনিকেতের এক বন্ধু আছে, বয়সে ছোট, একটা খবর কাগজের সাংবাদিক। ক্রিমিনাল

রিপোর্টিং করে। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে। ওকে জানায় ও কী করতে চায়। সেই সাংবাদিক বলে সাদার্ন অ্যাভিনিউ-তে সন্ধের পর লেকের ধারে কিছু 'গে' ঘোরাফেরা করে। মেয়েদের মতো পোশাক, এছাড়া কিছু 'গে' কালীঘাট এবং যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনের সামনে আড্ডা মারে। ওদের অনেকেই এক কানে দুল পরে।

অনিকেত দক্ষিণ কলকাতা ভাল করে চেনে না। লেক-টেকের দিকে তেমন যায়নি। একদিন ওধারে গেল। একা-একাই হাঁটছিল। লেকের ধারে জোড়ায়-জোড়ায় গল্প করছে। গায়ে গা। চুমুটুমু খেতেও দেখছে।

তখনও ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রকাশ্য মেলামেশার বহর এখনকার মতো ছিল না। রবীন্দ্রসদন এবং নন্দন চত্বর এতটা সহনশীল ছিল না। লেক-এর উল্টোদিকের একটা গলির মোড়ে তিন-চারজন মেয়েকে দেখল অনিকেত। জিন্স আর টাইট গেঞ্জি পরা। চড়া রঙের লিপস্টিক। ভাল করে তাকালে মনে হয় ঠিক মেয়ে নয়। ঘাড় বেঁকিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে কথা বলছে। মেয়েরা কিন্তু এতটা অঙ্গভঙ্গি করে না। একজন ফুচ করে মুখ থেকে পানপরাগের পিক ফেলল। মেয়েরা সাধারণত পানপরাগ খায় না। মেয়ে-বেশ্যারা হয়তো খায়। একটা গাড়ি এল, ওদের সামনে দাঁড়াল। একজন গাড়িতে ঢুকে গেল। উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে অনিকেত। সামনে যেতে একটু ভয় করল। এভাবে হবে না। অনিকেত বুঝতে পারল, এরা হল পুরুষ যৌনকর্মী। মেয়েদের মতো সাজসজ্জা করে দাঁড়ায়, পয়সা রোজগার করে। এরা যাদের সঙ্গে শারীরিক ভাবে লিপ্ত হয়, তারা পুরুষ। এদের দিয়ে ওর কাজ হবে না।

যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনের কয়েকটা গেট আছে। একটা গেটের সামনে সত্যি-সত্যিই কয়েকটা ছেলেকে দেখা গেল। ওরা মেয়েদের পোশাকে নেই। শার্ট-প্যান্ট, জিন্স-পাঞ্জাবি, জিন্স-টি শার্ট এসবই পরনে। একজনের এক কানে একটা দুল দেখা গেল। ওরা ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে কথা বলছে। অনিকেত ওদের কাছাকাছি দাঁড়ায়। যেন কাউকে খুঁজছে, বা কারও আসার কথা। মাঝে-মাঝে ঘড়ি দেখছে আর ওদের কথা শুনছে।

—দ্যাট গাই ইজ ফ্যান্টাস্টিক। আড়িয়াল। আড়িয়াল পাক্কি।

—তোর তো সবই আড়িয়াল।

—মাইরি বলছি। খাম্বা লিকম্।

—কড়ি কর। কড়ি কর।

—রোল খাবি?

—নো ইয়ার।

—চ, খিদে পেয়েছে।

—পেটের খিদে না বাট্টু-র খিদে?

—না মাইরি। চ, রোল খাই।

—পরে যাচ্ছি। অ্যাই, রোববার ডায়মন্ড হারবার যাবি সবাই মিলে?

—কেন? বাই উঠল কেন? পারিক আছে ওখানে?

—না রে, বাবাকে বলেছি গাড়িটা একদিন নেব। দেবে বলেছে।

—ইয়োর ফাদার ইজ রিয়েলি গুড। লাভিং ফাদার। আমার বাপটা শালা গান্ডু। আমার সঙ্গে তো কথাই বলে না। সাইকোলজিস্ট-এর কাছে যাব না বলেছি, তাই। আরে

সাইকোলজিস্ট কী করবে? খালি মালকড়ি খিঁচে নেয়। বাপ যদি আলটিমেটলি ফুটিয়ে দেয়, কোথায় যাব মাইরি? কোন খোলে যাব?

—মাল্টি-মিডিয়াটা নে। চাকরি শিওর।

—বাপ তো সেই টাকাও দেবে না।

—ধুরানিগিরি করে রোজগার কর তবে।

ওরা চারজন একটু পর জায়গাটা ছেড়ে চলে যায়। কোনও কথা হল না, তবে এদের দিয়ে কাজ হবে মনে হচ্ছে।

ওদের কথাবার্তায় কিছু অচেনা শব্দর মানে আন্দাজ করতে পারছে অনিকেত। 'ধুরানি' মানে বোধহয় যারা পয়সার বিনিময়ে যৌনকর্ম করে। 'লিকম্' মানে পুরুষাঙ্গ। রেডিও-তে এসব শব্দ তো চলবে না, ওরা আসতে রাজি হবে কি না কে জানে? তবে রেডিও-তে অনুষ্ঠান করলে টাকা পাওয়া যায়। টাকা পেলে যাবে নিশ্চয়ই। কী-কী প্রশ্ন করা হবে সেটা ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হবে।

অনিকেতের অফিসে রটে গিয়েছে ও 'হোমো' খুঁজছে। এ নিয়ে একটু হাসাহাসিও হচ্ছে। একজন বলল, শেয়ালদা স্টেশন থেকে বেরিয়ে দু'নম্বর প্লাটফর্ম বরাবর রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান আছে। ওখানে হোমো-রা আড্ডা মারে। অনিকেত জিগ্যেস করল, আপনি কী করে জানেন? উনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেকশনে কাজ করেন। বললেন—আরে গত কুড়ি বছর ধরে ইছাপুর থেকে ডেলি পাষণ্ডারি করছি। শেয়ালদার আনাচ-কানাচ জানি। যদি কোনও দিন বসার সিট জুটে যায়, চোখ বুজি, শেয়ালদা স্টেশনে ঢোকার মুখে ঘটাংঘট শুনে বুঝে যাই কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে গাড়ি দিচ্ছে। বুঝলেন না? কতগুলো ব্যাটাছেলে আসে টিটাগড়, মৈহাটি থেকে। ব্যাটাছেলেদের বাথরুমে ঢুকে শাড়ি পরে, লিপস্টিক পরে। তারপর বিজনেস করে, তারপর ফেরার সময় মেয়েদের বাথরুমে ঢুকে মুতে-টুতে ড্রেস চেঞ্জ করে ব্যাটাছেলে হয়ে বাড়ি ফেরে। সবই তো দেখি। যেদিন ফিরতে একটু রাত হয়, সেদিন দেখি, কিছু মেয়ে ভাড়া খেটে ফিরছে। কিছু 'মওগা' দাঁড়িয়ে থাকে ওই যে বললাম, চায়ের দোকানটার সামনে। ওখানে একদিন গিয়ে দেখুন।

অনিকেতের দেখতে ইচ্ছে করে। ব্যাপারটা বুঝতে ইচ্ছে করে। ওদের হয়তো রেডিওতে ইন্টারভিউ নেওয়া যাবে না, কারণ বোঝাই যাচ্ছে ওরা হচ্ছে পুরুষ যৌনকর্মী। 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠানে যৌনকর্মীর সন্ধান দেওয়ার কোনও দরকার থাকতে পারে না। তবে একদিন দেখে এলে হয় ব্যাপারটা।

অনিকেত একদিন সন্ধেবেলায় গেল শেয়ালদা স্টেশনে। ১৯৯৬ সালে শেয়ালদা স্টেশন অন্যরকম ছিল। নতুন বাড়িটা শেষ হয়নি। সামনেই লোহা-লক্কড়। বাইরের চত্বরে কয়েকটা টেবিলে পশরা। ফল, বিড়ি-সিগারেট, গেঞ্জি-মোজা-জাঙ্গিয়া-রুমাল—চায়ের দোকানও কয়েকটা। 'মওগা' জাতীয় কাউকে চোখে পড়ল না।

'মওগা' ব্যাপারটার সামান্য কিছু ধারণা আছে ওর। রেডিওতে আসার আগে কয়েকটা চাকরি করতে হয়েছিল অনিকেতকে। প্রথম চাকরিটা ছিল মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। বিহারে থাকতে হয়েছিল। সাসারামে একটা বেশ বড়সড় 'মওগা' বসতি দেখেছিল। সালোয়ার-কামিজ পরা বুক উঁচু করা কিছু মানুষ, কিন্তু চোয়াল কঠিন, গাল দেখে মনে হয় দাড়ি কামানো। লম্বা

চুল, নাকে নথ, খাটিয়ায় শুয়ে আছে, অথচ পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। ওটা হয়তো বিশ্রামের পোশাক। হিন্দি সাইনবোর্ড পড়ে জানা যায়, বিয়েবাড়ি বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে নাচার বায়না নেওয়া হয়। সাইনবোর্ডে নাচের ছবিও ছিল। পাশাপাশিই ব্যান্ডপার্টির ঠেক। বিহারে ওদের খুব চাহিদা। ছটপুজোর সময় দেখেছে মওগা নাচ। বিয়ের সময় বরযাত্রীরা ওদের নিয়ে যায়। অনিকেতের ধারণা ছিল ওখানে মেয়ে-নাচনিওয়ালি পাওয়া যায় না বলেই ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পরে সেই চাহিদা মেটায়। তখন বুঝত না অনিকেত যে—এক ধরনের মানুষের কাছে নারীর বিকল্প 'মওগা' নয়, 'মওগা' বা 'লন্ডা'ই ওদের দরকার। ওরা এদেরই চায়। আর এই 'মওগা' বা 'লন্ডা'-রা শুধু জীবিকার জন্যই নয়, নিজেদের দেহের এবং মনের চাহিদায় এরকম মেয়েদের মতো থাকতে ভালবাসে।

হিজড়েদেরও একটা পাড়া ছিল সাসারামে। তখন হিজড়ে আর 'মওগা'-দের মধ্যে তফাত বুঝত না। এখন যেন অনেকটা বোঝে। কত রকমের ভাঁজ, কত আলো-অন্ধকার। কত সূক্ষ্ম তফাত। মানসিক স্তরের তফাত ওদের জীবনধারাটাই বদলে দিয়েছে। বাঁচার নিয়মটাই বদলে দিয়েছে। গোষ্ঠীবদ্ধ হিজড়ে সমাজের মধ্যে বেশ কিছু নিজস্ব আচরণ আছে, রীতি-নীতি আছে, যা নিয়ে কিছুটা গবেষণাও হয়েছে, কিন্তু 'মওগা' বা 'লন্ডা'-দের নিয়ে কি আলাদা কোনও গবেষণা আছে? কে জানে?

তা, অনিকেত তো গবেষণা করতে শেয়ালদা যায়নি, ও গবেষক নয়। ওর অত এলেম নেই। কিছুটা কৌতূহল-বশতই গিয়েছে।

কিন্তু কোথায়? ওইসব মওগা-টওগা তো চোখে পড়ল না...। তিন-চারটে চায়ের টেবিলের এপাশে-ওপাশে ঘুরঘুর করছিল অনিকেত। একটা চা-ওলাকে জিগ্যেস করেই ফেলল—দাদা শুনেছিলাম এখানে কিছু 'হোমো' আসে, আমি একজন সাংবাদিক, ওদের একটু দরকার...। চা-ওলা অবাক হল। বলল—ক্যা? হোমো ক্যা?

অনিকেত বুঝতে পারেনি, ওই চা-ওলাটি অবাঙালি। কিন্তু বাঙালি হলেই বা কী হত? 'হোমো' মানে বুঝত? মধ্যবিত্তের শালীনতাবোধ ওর মুখ দিয়ে 'মওগা' উচ্চারিত হতে দিল না।

অনিকেত কিছু বলল না। ওখানে ঘুরঘুর করছিল। মাথায় লাল ফিতে-বাঁধা একটি মেয়ে ওর কাছে এল। বলল, কী গো, বসবে না কি? মেয়েদের মাথায় ফিতে তো উঠেই গিয়েছে। দু'পাশে বিনুনি, আর দুই বিনুনির ওপরে দু'টো লাল ফুল। বেশ অবাক হল অনিকেত। মেয়েটাকে দেখতে লাগল। হয়তো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোনও গ্রাম থেকে এসেছে। ওখান থেকে এখনও লাল ফিতে উঠে যায়নি। রান্নাবাটি খেলা উঠে যায়নি, এক্কাদোক্কা উঠে যায়নি। শিবের মতো বর পাওয়ার জন্য নীলষষ্ঠীর ব্রত? মেয়েটা বলে, ওদিকে চলো।

অনিকেত মৃদু ঘাড় নাড়ায়।

মেয়েটা বলে, কাউকে খুঁজছ?

অনিকেত বলে, শুনেছিলাম এখানে নাকি কিছু ছেলে আসে, ওরা ছেলেদের সঙ্গে করে। সত্যি?

মেয়েটা হেসে ওঠে। বলে, ও, তুমি বাট্টুখোর? চলে যায়। একটু পরেই সঙ্গে দু-তিনজন মেয়েকে নিয়ে আসে। একজন বলে অ্যাই, শোনো—'ধুরানি'-গুলোকে এখান থেকে হাটিয়েছি।

ওরা বহুত ঝামেলা করে। ফোটো এখান থেকে। যাও। সামনে দিয়ে হয় না শালাদের। পেছন চাই। যাও। ফোটো...।

অনিকেত কিছুটা বুঝতে পারল ব্যাপারটা। এখানে কিছু পুরুষ-যৌনকর্মীও আসত ঠিকই, কিন্তু নারী-যৌনকর্মীদের সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত কারণেই গণ্ডগোল হয়েছে। নারী-যৌনকর্মীরা ওদের আর আসতে দেয় না এখানে।

অনিকেত এসব অ্যাডভেঞ্চারের কথা বাড়িতে বলে না। শুক্লা এটা মজায় নেবে না। অথচ ব্যাপারগুলো এমন, কাউকে না বলেও পারা যায় না। অফিসের দু-একজনকে বলে। ওরা জিগ্যেস করে, তারপর তুমি কী করলে? অনিকেত বলে, তারপর আবার কী করব? ওরা অসম্পূর্ণ গল্প শুনতে চায় না। এন্ডিং চায়। হ্যাপি এন্ডিং। কী হলে এন্ডিং-টা হ্যাপি হয়?

এর মধ্যে 'অনুষ্টুপ' পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ পড়ল অনিকেত। লেখকের নাম অমিতরঞ্জন বসু। লেখাটা ৩৭৭ ধারা নিয়ে। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭৭ ধারাতে সমকাম-কে অজাচার, পশ্বাচার ইত্যাদির সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে, সমকামিতা আইনত সিদ্ধ নয়। প্রবন্ধটিতে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। অমিতরঞ্জন বসু বলতে চেয়েছেন, এটা ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী। যৌন অভ্যাস মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। যদি সমাজের কোনও ক্ষতি না-করে অন্য কোনও ব্যক্তির অসুবিধে না-ঘটিয়ে কেউ যৌনাচার করে, তবে তার ব্যক্তিগত যৌনাচারে রষ্ট্রের নাক গলানো উচিত নয়। অমিত বসুর সঙ্গে অনিকেতের পরিচয় হয়েছিল আগেই। উনি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। বেশ কিছুদিন আগে রেডিওতেই একটা ধারাবাহিক অনুষ্ঠান করতে হয়েছিল অনিকেতকে। নেশার বিরুদ্ধে। মদ, গাঁজা, ড্রাগ এসবের কুফল নিয়ে। যেহেতু অমিতবাবু মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ, ওঁকে ডাকা হয়েছিল গাঁজার নেশার মানসিক কুফল নিয়ে কিছু বলার জন্য। উনি এসেছিলেন, কিন্তু জানালেন, আমি ভাই নিজের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারব না। গাঁজার বিরুদ্ধে আমি কী বলব? আমার বলার কিছু নেই।

অনিকেত বলেছিল, কেন? বলবেন গাঁজা খেলে স্মৃতিশক্তি কমে যায়, বুদ্ধিনাশ হয়, ইত্যাদি কত কথাই তো আছে।

উনি বললেন, এসব রাবিশ। কে বলেছে গাঁজা বুদ্ধিনাশ করে? গাঁজা বরং কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। সাধু-সন্ন্যাসী-বাউলরা গাঁজা খায়। ওদের কি বুদ্ধি কম? ওরা কত ভাল-ভাল কথা বলে। শিব গাঁজা খেতেন। ক্রিমিনাল-রা ক্রাইম করার আগে অনেক সময় মদ খায়। কিন্তু একটা উদাহরণ দিতে পারেন, যেখানে কেউ গাঁজা খেয়ে রেপ করেছে? কেউ খুন করার আগে গাঁজা খেয়েছে? গাঁজা খেয়ে কেউ ক্রুড হতে পারে না। গাঁজা খেয়ে কেউ নৃশংস হতে পারে না। গাঁজার একটা সুদিং এফেক্ট আছে। আমি 'সেভ ক্যানিবাস'-এর মেম্বার। 'সেভ ক্যানিবাস' নামে একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আছে। গাঁজার বিরুদ্ধে যে সব অপপ্রচার হয়, আমরা তার প্রতিবাদ করি। বরং ড্রাগ নিয়ে বলতে বলুন, আমি বলব। ব্রাউন সুগার নিয়ে বলতে বলুন, বলব। কিন্তু গাঁজার বিরুদ্ধে কোনও কিছু বলতে পারব না।

উনি শেষ অবধি বলেননি। অন্য লোক ধরতে হয়েছিল।

অমিতরঞ্জন বসু-র ফোন নম্বর অনিকেতের কাছে ছিল। অনিকেত যোগাযোগ করল। অমিতবাবু জানালেন, 'গে'-দের দু-একটা সংস্থা আছে কলকাতায়, ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। 'থটশপ' নামে একটি সংস্থার কথা বললেন অমিতবাবু, এবং ওই সংস্থার

সেক্রেটারি পবন ধল-এর ফোন নম্বরটাও দিলেন।

পবন ধল বললেন, আমাদের একটা ঠেক আছে, আমরা এক জায়গায় বসি। মিড্‌লটন রো-তে। ওখানে চলে আসুন। এত নম্বর মিড্‌লটন রো, ওখানে একটা গার্ডেন রেস্তোরাঁ আছে। ওই সময় মোবাইল ফোনের রমরমা ছিল না। তখন মোবাইল ফোন ছিল আকারে অনেক বড়। বলা হত সেল ফোন, এবং খুব কম লোকের কাছেই ওই যন্ত্র থাকত। বেশ খরচা-সাপেক্ষ ছিল। ফোন এলেও পয়সা দিতে হত, ফোন করতে হলে তো বটেই। অনিকেত বলল, আমি চিনব কী করে? পবন বলল—ওখানে গিয়ে বলবেন, পবনের সঙ্গে দেখা করতে চাই, যে কেউ দেখিয়ে দেবে। কিন্তু কবে আসবেন?

অনিকেত বলল, আগামিকাল?

পবন বলল ওকে, কাম আফটার সেভেন পিএম। অনিকেত গেল ওখানে। একটা ছোট গেট। গেট দিয়ে ঢুকলেই বাগান। ওরকম এলাকায় যে এরকম একটা বাগান থাকতে পারে, বাইরে থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই। অনেকগুলো রঙিন ছাতা। কয়েকটা কাউন্টার। কোল্ড ড্রিংক্স বিক্রি হচ্ছে, রঙিন আলো-টালো দিয়ে সাজানো আছে। ওখানে পবনকে পেয়ে যায় অনিকেত। খুব সুন্দর দেখতে। স্মার্ট। শার্ট-প্যান্ট পরা। কোনওরকম মেয়েলিপনা নেই। অনিকেত অমিত বসুর পরিচয় দিয়েই ওদের সঙ্গে যোগাযোগটা করেছিল। পবন বলল, অমিতদা ইজ ওয়েল উইশার অফ আস। ইউ গাই আর ফ্রম আকাশবাণী। টেল মি হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ।

সমকামী সম্পর্কে অনিকেতের ধারণাটাই পাল্টে গেল। 'পাল্টে গেল' কথাটা বোধহয় ভুল হল। ব্যাপারটা জটিলতর হল। ধারণা ছিল, ওরা মেয়েলি ধরনের হয়, কথাবার্তায় একটা সুর থাকে, অঙ্গভঙ্গি করে কথা বলে। কিন্তু পবনকে দেখে তো সেরকম মনে হচ্ছে না।

অনিকেত বলল, আপনাদের সাহায্য আমাদের দরকার। রেডিও তো একটা মাস মিডিয়া, এর মাধ্যমে কিছু ভুল ধারণা দূর করতে চেষ্টা করছি। কত দূর কী করতে পারব জানি না।

পবন ধল হাতটা বাড়াল। বলল, আই হ্যাড আ টক উইথ অমিতদা। আপনার কথাও কিছুটা শুনেছি। লেখেন-টেখেন...।

—ওই আর কী। তেমন কিছু নয়।

পবন বলল, আসুন, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এর নাম রঞ্জন, এর নাম অনির্বাণ, এ হল সঞ্জয়, আর ইনি হলেন বক্সী। সবাইকেই প্রথম নামে পরিচয় করাল পবন, শুধু বক্সীর বেলায় পদবি। বক্সী-র বয়স ওদের চেয়ে বেশি। বেশ বড় চেহারা। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। চওড়া কাঁধ। ঠোঁটের ওপর বেশ চওড়া গোঁপ। গোঁপের মধ্যে কয়েকটা রুপোলি রেখা। এই মধ্যবয়সি ভদ্রলোকও ওদের বন্ধু? অবাক ব্যাপার। রঞ্জন লম্বামতো, রোগা। সঞ্জয়ের এককানের লতিতে চকচক করছে একটা দ্যুতি। হিরে? কে জানে? গলাতেও একটা হার। নখ চকচক করছে। ভাল করে লক্ষ করলে বোঝা যায়, ঠোঁটেও হাল্কা করে লিপস্টিক বোলানো আছে। পবন বলল, আমাদের একটা ম্যাগাজিন আছে, ম্যাগাজিনটার নাম 'প্রবর্তক'। অনির্বাণ হল এডিটর। আপনাকে কয়েকটা ইস্যু দেব।

ওরা ওই বাগান-রেস্তোরাঁয় একটা ছাতার তলায় বসল। গোল টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে। কফি এল। পবন সেতার বাজায়। বারো বছর বয়স থেকে সেতার শিখছে। রেডিও-তে

কখনও অডিশন দেয়নি। ওসব ভাবেওনি কখনও। ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। একটা বড় কোম্পানিতে চাকরি করে। অনির্বাণ, যে ওদের পত্রিকা প্রবর্তক-এর সম্পাদক, ও একটা কলেজে ইংরেজি পড়ায়। সঞ্জয় একটা অ্যাড এজেন্সি-তে চাকরি করে। ভিজ্যুয়ালাইজার। মি. বক্সী এক্স-মিলিটারি। এখন একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি অফিসার।

পবন বলল—উই ডোন্ট হেজিটেট টু ডিক্লেয়ার দ্যাট উই আর গে। বাট নট দ্যাট—উই আর প্রাউড অফ বিয়িং গে। এবারে বলুন আমরা কী করতে পারি? অনিকেতের নিজেকে একটু নার্ভাস লাগছিল। এত স্মার্ট 'হোমো' হতে পারে ভাবেনি আগে। কতরকম দেখল। বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।

পবনকে জিগ্যেস করল অনিকেত, এরকম একটা সংস্থা করার কথা কীভাবে মাথায় এল?

পবন বলল, পুণেতে কিছুদিন ছিলাম। ওখানে 'বোম্বে দোস্ত' নামে একটা কাগজ বেরুতে দেখতাম। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। দেখলাম, ওরা 'গে'-দের অধিকার নিয়ে ভাবছে। সামাজিক অপমানের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করছে, এড্স সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস করছে। ভাবলাম, কলকাতাতেও কিছু করি।

অনিকেত বলল, আপনারা চারজন আমাদের অফিসে আসুন। কোন চারজন আসবেন—নিজেরাই ঠিক করে নেবেন। তারিখ জানিয়ে দেব।

কী করতে হবে ওখানে?

নিজেদের অনুভূতির কথাই বলবেন। আমরা ঠিক করে নেব কী-কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। মোট কথা একটা পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিষয়টা দেখব। এই আর কী।

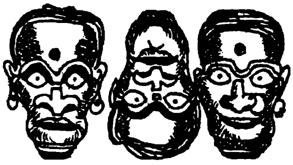

পবন ধল একটা দারুণ কথা বলেছিল। গোলাপের রং তো আমরা গোলাপি-ই বুঝি। পিংক। কিন্তু গোলাপ যদি সাদা কিংবা হলুদ হয়, তবে কি সেটা গোলাপ নয়? আমরাও পুরোপুরি মানুষ। মানুষের সমস্ত ধর্ম আমাদের মধ্যে আছে। আমাদের মধ্যে শিল্পীসত্তা আছে, পরের জন্য দুঃখবোধ আছে, সমাজ সচেতনতা আছে, আবার হিংসা-পরশ্রীকাতরতাও আছে। শুধু ব্যক্তিগত যৌনতার ক্ষেত্রে আমরা আলাদা।

সেদিন পবন ধলের সঙ্গে এসেছিল অনির্বাণ, রঞ্জন, আর বাসব। প্রথম আলাপের দিন বাসব ছিল না। বাসব ভাল কথা বলতে পারে বলে ওরা বাসবকে নিয়ে এসেছে। বাংলায় এমএ ফার্স্ট ক্লাস, একটা স্কুলে চাকরি করে। নেট, স্লেট এসব পরীক্ষা দেবে।

বাসব বলল, ছোটবেলা থেকেই ওর মনে হয়েছে ও ছেলে না-হয়ে মেয়ে হলেই ভাল হত। মনের মধ্যে একটা নারী ঢুকেছিল ছোটবেলা থেকেই। সব পুরুষের মধ্যেই কিছু-না-কিছু নারীত্ব আছে, আবার সব নারীর মধ্যে কিছু-না-কিছু পুরুষ-ভাব। পুরাণে অর্ধনারীশ্বরের কথা আছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রেও আছে রাধাভাব-এ কৃষ্ণসাধনার কথা। অনেক বৈষ্ণব নিজেকে রাধা ভেবেছেন

মনে-মনে। কিন্তু অর্ধনারীদের সামাজিক স্বীকৃতি নেই। বরং অবজ্ঞা। এই সামাজিক অবজ্ঞার কারণেই, এইসব অনেক পুরুষের ঠাঁই হয় হিজড়ে-সমাজে। হিজড়েরা শারীরিকভাবে স্বাভাবিক পুরুষ, কিন্তু মনের গভীরে নারী। স্বাভাবিক নারীর মতো এরাও চায় প্রেমিক, স্বামী, সন্তান। কিন্তু শরীরটা যে পুরুষের, সন্তানধারণ তো করতে পারে না। অথচ ইচ্ছেটা সরাতেও পারে না। যতটা পারে, নারী হতে চায়। পুরুষের সঙ্গ ভালবাসে। এটা সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। আমাদের দেশেই হিজড়ে-সমাজের একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে। ইউরোপের মতো উন্নত দেশগুলোতে মেয়েভাবাপন্ন পুরুষদের আলাদা গোপন সমাজ গড়তে হয় না। ওরা সংসারেই থাকে, সমাজেই থাকে। অন্য পাঁচজনের মতোই চাকরি-বাকরি, ব্যবসা করে। সামাজিক অবজ্ঞার কারণেই কিছু মানুষ হিজড়ে-সমাজে গিয়ে আশ্রয় খোঁজে। ওখানে ওরা সমাজ পায়, বন্ধু পায়, এবং রোজগারপাতিও হয়।—খুব ভাল বলেছিল বাসব। অনির্বাণ আর রঞ্জনও বলল ওদের শৈশব আর কৈশোরের কথা। স্কুলে পড়ার সময় ওদের কোনও সহপাঠীকে ভাল লাগার অভিজ্ঞতা, পুরুষের প্রতি আকর্ষণের কথা। উপসংহারে অনিকেত বলেছিল, আমরা চারজন সমকামী-র বক্তব্য শুনলাম। ওঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির কথা শুনলাম। ওঁরা সবাই বুদ্ধিমান, সামাজিক মানুষ। অত্যন্ত ব্যক্তিগত কিছু পছন্দ-অপছন্দ সেটা ওঁদের নিজস্ব। আমরা যেন ওঁদের ‘লেডিস’ বলে, ‘বউদি’ বলে অবজ্ঞা না-করি!

ওদের বেশ ভালই লাগল অনিকেতের। বেশ স্পষ্টবাদী, গুছিয়ে কথা বলতে পারে। বাসব তো বেশ রসিক ছেলে। প্রচুর পড়াশোনা। ওরা ‘প্রবর্তক’ নামে যে-পত্রিকা বার করে, সেই পত্রিকার কয়েকটা কপি দিল। ওরা যে-সংগঠনটা করে, তার নাম ‘কাউন্সেল ক্লাব’। তাদের উদ্দেশ্য ইত্যাদি নিয়ে একটা লিফ্‌লেট-ও দিল ওরা।

কাউন্সেল ক্লাব
প্রযত্নে রঞ্জন, পোস্ট ব্যাগ নং ৭৯৪
কলকাতা ৭০০০১৭, ভারত
সব গোলাপই গোলাপ
কিন্তু সব গোলাপ যে লাল নয়!
প্রিয় বন্ধু,
কাউন্সেল ক্লাবের তরফ থেকে জানাই হৃদয়ের উষ্ণ ভালবাসা এবং অভিনন্দন।

কাউন্সেল ক্লাব সবরকম মানুষের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা সমকামী নারী-পুরুষের একটি সমর্থক গোষ্ঠী। ১৯৯৩ সাল থেকে শুরু করে আগামী ১৫-ই আগস্ট আমরা পা দেব তিন এর বছরে।

আমাদের সদস্যরা সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধি। বয়ঃসীমা ১৮ থেকে ৬০। আমাদের কর্মক্ষেত্র মূলত কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি হলেও সমগ্র ভারতবর্ষ এমনকী বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তেও আমাদের সদস্য ছড়িয়ে আছেন। একইভাবে সদস্য হওয়ার সুযোগ আমরা কেবলমাত্র সমকামী নারী-পুরুষ বা উভকামী মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখিনি। যৌনতার পরিচয় নির্বিশেষে সকল মানুষকেই আমাদের সংস্থায় শামিল হওয়ার জন্যই মুক্ত আহ্বান। সেই সঙ্গে যাঁরা সমলিঙ্গধারী ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ বোধ করেও নিজের যৌনতাকে কোনও বিশেষ শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেন না, তাঁরাও স্বাগতম।

এইসঙ্গে আরও জানাচ্ছে, ওরা প্রত্যেক রবিবার আড্ডার ব্যবস্থা করে, শরীর সম্পর্কে পরামর্শ দেয়, আইনের সাহায্য দেয়, ৩৭৭ ধারার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে ইত্যাদি। ওদের পত্রিকা 'প্রবর্তক'-ও পড়ল অনিকেত। অনেক কিছুই নতুন করে জানতে লাগল, বুঝতে লাগল। মানুষের মন কী জটিল, কতরকমের ভাঁজ, কতরকমের প্যাঁচ। আলো-অন্ধকার। 'প্রবর্তক' পত্রিকায় প্রশ্নের উত্তর আছে, যৌনস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত টিপ্স আছে, সমকামীদের মনের কথাও আছে, ওদের লেখা কবিতা-গল্প ইত্যাদিও আছে। বেশির ভাগ লেখাপত্তর ইংরেজিতেই, তবে বাংলা-হিন্দিতেও আছে। বন্ধুত্বের আবেদনও রয়েছে বেশ কিছু পৃষ্ঠা জুড়ে। একজন ছত্রিশ বছরের যুবক, বুকে লোম নেই, প্যাসিভ কোনও মাসকুলার পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাইছে। একজন বত্রিশ বছরের অ্যাক্টিভ পুরুষ, গান-বাজনা ভালবাসে, কুড়ি থেকে চল্লিশ বছর বয়সি গান বাজনা ভালবাসে এমন পুরুষ খুঁজছে। টকেটিভ, হিউমারাস, লাভ্স কুকিং অ্যান্ড হাউসহোল্ড ওয়ার্ক-এ দক্ষ সুইট গে, সিক্স ক্লোজ ইনটিমেসি উইথ প্লেজেন্ট লুকিং গে...। এরকম সব। লক্ষ করার বিষয়টা হল : ছেলেটি জানাচ্ছে ঘরোয়া কাজ এবং রান্না করতে ভালবাসে।

খুব ছোটবেলা থেকে সবার মতো অনিকেতও জেনে এসেছে কিছু কাজ আছে ছেলেদের। কিছু কাজ আছে, যা শুধু মেয়েদের জন্যই। রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, সেলাই করা মেয়েদের কাজ। নাচ তো বটেই, গানও। যেসব ছেলে নাচ-টাচ করে, ওদের মনে করা হয় ওরা ঠিকমতো ছেলে নয়। কোনও বাড়ির পুরুষরা স্ত্রী-র সাহায্যের জন্য মাছ বা তরকারি কুটে দিতে দেখলে অন্য মহিলারাই বলে, ওই লোকরা ব্যাটাছেলেই নয়। স্ত্রী-র কাজ স্বামীর জাঙিয়া কেচে দেওয়া। কোনও পুরুষ স্ত্রী-র ব্রা কেচে দিলে ছ্যা-ছ্যা হবে যদি লোকে জানে।

সেই কবে, কোন আদিম যুগে, জঙ্গলচারী পুরুষরা শিকারে যেত। মেয়েরা কৃষিকাজ করত। এখন সমাজ পাল্টেছে। গাঁ-গ্রামে মেয়েরা লাঙল চালায় না ঠিকই, কিন্তু চাষের অন্য কাজ করে, ছেলেরাও করে। মেয়েরা এখনও পেটো বানায় না, সেটা ওদের করতে দেওয়া হয় না বলে। কিন্তু ঠিকই পারবে ওরা। মাওবাদী স্কোয়াডগুলোতে তো মেয়েরা বন্দুক চালাচ্ছে, গ্রেনেড অপারেশন করছে। শহরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাজের তফাত সামান্যই। কিন্তু তবু কিছু কাজ রয়ে গিয়েছে ছেলেদের জন্য নির্দিষ্ট, মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট। ছেলেরা যে রান্না-বান্না করতে পারে না তা তো নয়, হোটেলের বড়-বড় শেফ তো ব্যাটাছেলেই। কিন্তু ঘরে কেউ-কেউ শখে খাসির মাংসটা কিংবা চিংড়ির মালাইকারিটা করে থাকলে তা নিয়ে আলাদা গর্ব হয়।

যে-সব ছেলে মেয়েলি ধরনের, তারা লিঙ্গ-চিহ্নে পুংলিঙ্গ-ধারী। কিন্তু মনে-মনে অনেকটাই নারী। সমাজ যেটাকে মেয়েদের কাজ বলে থাকে, সেইসব কাজ করতে ভালবাসে। ভাবভঙ্গিও অনেকটাই মেয়েদের মতো। মানে, মেয়েদের মতো ভাবভঙ্গি করতে ভালবাসে। কখনও কখনও একটু বেশি মাত্রাতেই করে। মেয়েরাও হয়তো ততটা হাত নাড়িয়ে কথা বলে না—ওরা যতটা করে। ভাষাটাও মেয়েদের মতোই করার চেষ্টা করে।

মেয়েদের ভাষা বলে কিছু আছে না কি? আছে তো। ভাষা না-বলে উপভাষা বলা ভাল। কে জানে, উপভাষাও ঠিক কি না। ভাষাবিদরা বলতে পারবেন। সুকুমার সেনের একটা গবেষণা ছিল মেয়েদের মুখের ভাষা নিয়ে। উনি লিখেছিলেন—নেবু, নুচি, নাউ—এই প্রবণতা ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে বেশি। শর্মিলা বসুও পরবর্তীকালে গবেষণা করেছিলেন এ

নিয়ে। কিছু-কিছু মেয়েলি উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন। যেমন শব্দের দ্বিত্ব উচ্চারণ। ছোট্ট, বড্ড, কত্তো...এরকম। 'তুমি কত্তো ভাল ছেলে...।' 'আমার বড্ড ইচ্ছে করছে...।' বোধহয় আবেগ একটু বেশি প্রকাশ পায় এরকম উচ্চারণে। কোনও ছেলে যদি বলে, 'আমি কখনও করিনি', মেয়েরা বলবে, 'আমি কক্ষনও করিনি'। মেয়েদের মৌখিক বাক্যগঠনে একটা গল্প বলার ভঙ্গি থাকে। 'আমি না, ওখানে না, গিয়ে দেখলাম কী, ওদের বাড়িতে, বাপরে বাপ সে কী কাণ্ড...' আবার 'যাঃ' (সঙ্গে একটু হাত নাড়ানো, মেয়েরা ডান হাতটা নাড়ালেও মেয়েলি-ছেলেরা বাঁ হাতটা বেশি), 'ইশ' শব্দটাও মেয়েরা বেশি ব্যবহার করে। 'ইঃ', 'উফ্' এসব শব্দ, 'মাইরি', 'মা কালীর দিব্যি', 'সোয়্যার'—এ ধরনের শপথ মেয়েদের বাক্যেই বেশি। তারপর 'অসভ্য' শব্দটা—নানা ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করে মেয়েরা। 'যাঃ, অসভ্য' একটা অন্য অর্থ প্রকাশ করে। ছেলেরা সাধারণত 'যাঃ অসভ্য' বলে না। পাজি, দুষ্টু, বাঃ, ভাল হবে না কিন্তু, আড়ি হয়ে যাবে কিন্তু—এ ধরনের কথা মেয়েরাই বলে। 'গো' শব্দের প্রয়োগ মেয়েরাই বেশি করে। গ্রামে লো, ওলো এখনও কিছুটা চলে। মেয়েদের হাসিটারও একটা অন্য ভঙ্গি আছে। সাহিত্যে মেয়েদের হাসিকে 'হিহি' বা 'খিলখিল' শব্দে লেখা হয়। হা-হা, হো-হো ছেলেদের হাসিতেই প্রযোজ্য। অট্টহাস্য তো মেয়েদের মুখে একেবারেই মানায় না, অশোক বনের চেড়িরা হয়তো অট্টহাস্য হেসে থাকতে পারে। মেয়েদের খিস্তিও একটু আলাদা হয়। গ্রাম্য-মেয়েদের গালাগালিতে পোড়ারমুখি ভাতারখেকো, পোঁদমুখো, ফ্যাদামুখো, মা-মেগো এসব থাকলেও গুরুতর খারাপ কথা থাকে না। ঘ্যাম, বিলা, কিচাইন, খোবড়, মাল—এসব শব্দ ছেলেরাই বেশি ব্যবহার করে। তবে শহুরে মেয়েরাও ব্যবহার করছে আজকাল। শহরে বলতে গেলে, মেয়েদের ভাষা আর ততটা আলাদা থাকছে না। তফাত কমে আসছে। কিন্তু এখনও আমরা মেয়েলি ভাষা বলে একটা ভাষাভঙ্গিকে চিহ্নিত করতে পারি।

'কাউন্সেল' ক্লাবের পত্রিকা 'প্রবর্তক'-টা দেখছিল অনিকেত। ওইসব বন্ধু খোঁজার আবেদনগুলোর কথা তো বলাই হল। কিছু নিবন্ধ আছে সেফ সেক্স নিয়ে। পায়ুদ্বারের পেশি-সংস্থান কেমন, কী কী সাবধানতা নিলে পায়ুতে ক্ষত হবে না বা রক্তপাত হবে না—এসব বলা আছে। যোনির সঙ্গে পায়ুর পেশিসজ্জার তফাত আছে। যোনি বাইরে থেকে ভিতরের দিকে চাপ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু পায়ু সেটা পারে না। মল নির্গমনের কারণেই পায়ুর পেশিসজ্জা। ভিতর থেকে কিছু সহজে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু বাইরে থেকে কিছু প্রবেশ করাতে গেলে মাংসপেশির বিরুদ্ধে যেতে হয়। এজন্য ওরা কিছু প্রক্রিয়ার কথা লিখেছে। অ্যাবোনাইট-এর মসৃণ লিঙ্গসদৃশ জিনিস জেলি দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে রাখতে উপদেশ দিয়েছে। লিঙ্গগ্রহণের সময় কে-ওয়াই জেলি ব্যবহার করতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। কন্ডোম ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এইচআইভি প্রতিরোধের জন্য। চুম্বন এবং মুখমেহনের নানা কায়দা শেখানো হচ্ছে বিভিন্ন নিবন্ধে। ৩৭৭ ধারা রদের জন্য কোথায় কী আন্দোলন হচ্ছে তার খবরাখবর রয়েছে। 'আত্মকথা' বলারও একটা বিভাগ আছে। ওখানে গে এবং লেসবিয়ান-রা নিজেদের অনুভূতির কথা বলছে। পড়ছে আর অবাক হচ্ছে অনিকেত, এই জগৎ সম্পর্কে আগে তেমন কোনও ধারণাই ছিল না। একজন পুরুষ ভালবেসে অন্য পুরুষের লিঙ্গগ্রহণ করে তার পায়ুদেশে।

একটা ধারণা ছিল অনিকেতের যে, কোনও-কোনও পুরুষ প্রবল কামোত্তেজনায় যোনির

অভাবেই পায়ুমেহন করে। প্রথম কৈশোরে ছেলেরা পরস্পরের লিঙ্গ ঘাঁটাঘাঁটি করে, এরটা ও দ্যাখে, ওরটা এ ধরে। অনিকেতের কৈশোরেও এরকম ঘটেছে। কেউ কেউ হাতে ধরে পরস্পরের লিঙ্গ হস্তমৈথুন করে দিয়েছে, এরকমও ঘটে। জেলের কয়েদিরা সমলিঙ্গে যৌন কার্যকলাপ করে বিপরীত লিঙ্গের অভাবেই তো। পুলিশ ব্যারাক বা মিলিটারি ছাউনিতেও এসব হয়।

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে অনিকেতের। ও তখন অন্য একটা চাকরি করত। ভূমি রাজস্ব দপ্তরে। বোলপুরের আগের স্টেশন ভেদিয়া-তে পোস্টিং। বাইশ তেইশ বছর মাত্র বয়েস তখন। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই বেড়াতে যেত ওখানে। ভেদিয়া থেকে বোলপুর, রামপুরহাট, তারপর রামপুরহাট থেকে বাসে চেপে ম্যাসেঞ্জোর গিয়েছে কয়েকবার। একবার এক বন্ধু এল, ওর নাম অরূপ। একটু কবিতা লেখার বাতিক ছিল অরূপের। অরূপ বলল ম্যাসেঞ্জোর যাবে। রাতের রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার রাত বারোটা নাগাদ ভেদিয়া-তে আসে। সাড়ে তিনটে নাগাদ রামপুরহাট পৌঁছয়। ওখান থেকে ফার্স্ট বাসে চেপে ম্যাসেঞ্জোর যাওয়ার প্ল্যান। টিকিট কাটা হয়নি ট্রেনের। রাতের ট্রেনে চাপা হল। রামপুরহাট পৌঁছল। দেখা গেল, বেরনোর পথে চেকার দাঁড়িয়ে আছে। অরূপ বলল, ও শালা কতক্ষণ থাকবে ঠিক নেই। একটা ডাউন ট্রেনও আসবে। রেলিং ডিঙিয়ে বাইরে চল। অনিকেত বলেছিল দূরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক, কিংবা প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে লাইন দিয়ে কিছুক্ষণ চলে গেলে ঠিকই বেরনোর রাস্তা পাওয়া যাবে। অরূপ বলল, এত ঝামেলার দরকার কী। রেলিং ডিঙোলেই তো হয়। রেল প্ল্যাটফর্মে যেরকম লোহার রেলিং থাকে, সেই রেলিং টপকে বাইরে লাফ দিল অরূপ। তারপরই কুকুরের ঘেউঘেউ। অনেকগুলো কুকুর একসঙ্গে তুমুল চেঁচিয়ে উঠল। তারপর দু-তিনটে কণ্ঠস্বর শোনা গেল কৌন হ্যায়? কৌন হ্যায়? একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, পাকড়ো, উসকো পাকড়ো...। তারপর সামান্য শোরগোল। অরূপের কোনও কণ্ঠ শোনা গেল না।

অনিকেত কিছুক্ষণ পর স্টেশন ফাঁকা হলে বাইরে বেরিয়ে যায়। রাত। স্টেশনের বাইরে রাস্তায় একটা চায়ের দোকানের রোয়াকে বসে। চিন্তা হচ্ছিল। অরূপের কী হল? ও ধরা পড়ে গিয়েছে বোঝাই যাচ্ছিল। ওকে নিয়ে কী করবে? অনিকেত ভাবল, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর খোঁজখবর করবে। আরও মিনিট কুড়ি পরে অরূপ এল। বলল শালা, কেলো হয়ে গিয়েছে। যেখানে লাফিয়ে পড়েছিলাম, ওখানে ছিল আরপিএফ ক্যাম্প। কুত্তাগুলো শালা চিল্লামিল্লি শুরু করে দিল, তারপর নাইট পাহারাদার ধরল। বুঝলাম কেস খেয়ে গিয়েছি। কিচ্ছু করার নেই। সব স্বীকার করলাম। বললাম, টিকেট নেহি কিয়া, গলতি হো গিয়া, মাফি মাংতা হুঁ। ওরা তখন ওদের ব্যারাকে নিয়ে গেল। একটা ঘরে ঢোকাল। বলল, প্যান্ট খোল। আমি বললাম ক্যায়া করেগা আপ? একটা পুলিশ বলল গাড় মারেগা। সত্যি-সত্যি একটা লোক ওর জিনিসটা বার করল। আমি তো দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। পায়ে পড়তে যাচ্ছি, তখন বলছে—যা বলি শোন, নইলে কয়েদ হয়ে যাবে। কী করব, প্যান্টটা খুলতে হল। আমি হাতজোড় করে বললাম, ভাইসাব, শুধু ঠেকাকে রাখো, ঠেলো মাত। বললাম, কথা কি শোনে? শুধু ঠেকিয়ে রাখলে ওদের হবে? যা-তা কাণ্ড। ওদের ওখানে মুখ-ফুক দিতে হল একটু, কাছে একটা টিউবওয়েল ছিল। অরূপ বলল, একটু পাম্প কর তো, ভাল করে মুখটা ধুই।

এরপর অনিকেতদের বন্ধুমহলে ওই লাইনটা প্রবাদবাক্য হয়ে গিয়েছিল—ঠেকাকে রাখো,

ঠেলো মাত। কোনও বিপদ-আপদে পড়লে বলা হত লাইনটা।

পুলিশ ব্যারাকে এসব হতে পারে। কিন্তু এরা এর জন্য কত সাধ্যসাধনা করছে! কত কষ্ট! অ্যাবোনাইট রড গুহ্যদেশে ঢুকিয়ে ওরা পথ প্রশস্ত করছে। জেলি নিচ্ছে। 'প্রবর্তক'-এ একটা প্রবন্ধ ছিল সাজগোজ বিষয়ে। ত্বকের প্রসাধন, ত্বকের যত্ন, ফেস প্যাক ইত্যাদির ব্যবহার বিষয়ে। মেয়েদের কাগজে যেমন থাকে। রান্নার টিপ্‌সও ছিল। পুডিং এবং জেলি তৈরি করা। যেহেতু এটা অভিজাত গে'দের কাগজ, তাই পুডিং তৈরির প্রণালী লিখেছে।

ছোটবেলায় অনিকেতের বাবার মামারবাড়িতে দুর্গাপুজো হত। বিরাটিতে। ঠাকুরমার সঙ্গে বেশ কয়েকবার বিরাটিতে ওই পুজোবাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন করে থাকত। পরে, বড়বেলাতেও ওই পুজোবাড়িতে যেত। গত আট-দশ বছর ধরে ওই পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওখানেই বলি দেখেছে অনিকেত। ষষ্ঠীর দিনে বোধন দেখেছে, নাড়ু বানানো দেখেছে, তিলতক্তি বানানো দেখেছে।

পুজোর দুই-তিনদিন আগে থেকেই নাড়ু বানানো শুরু হত। বাড়ির দিদিমারা, ঠাকুরমারা, পিসিমারা সবাই মিলে নারকোল কোরাত, গুড়-চিনি দিয়ে জ্বাল দিত, নাড়ু পাকাত, সন্দেশের ছাঁচে ফেলে নারকোলের সন্দেশ তৈরি করত। কী সুন্দর-সুন্দর ছাঁচ ছিল। পাথরের, কাঠের...। ওই মেয়েদের মধ্যে একজন পুরুষ ছিল। ওর নাম ছিল ননী। অনিকেতের ছোটবেলার ঠাকুরমা-দিদিমারা তখনও ততটা বুড়ি নয়। ষাটের কমই হবে বোধহয়। ওরা নিজেদের মধ্যে অশ্লীল রসিকতা করত। আর ননী মাঝে-মাঝে জিভ বের করে বলত অ্যামা...লাজ...। মানে এ-মা, কী লজ্জা! ননী মাঝে-মধ্যে মুখ বেঁকিয়ে বলত ঢ-অ-ঙ। ঠাকুমা-দিদিমা-পিসিমাদের পান সেজে দিত, হাসার সময় ধুতির খুঁটটা মুখে চাপা দিত। মেয়েরা তো মুখে আঁচল চাপা দেয়। ননী আঁচল কোথায় পাবে? ঠাকুমা-দিদিমারা মাঝে-মধ্যেই যা-তা রসিকতা করত। হয়তো খুন্তিটা পাওয়া যাচ্ছে না, একজন জিগ্যেসা করল—খুন্তিটা কোথায় রাখলা গো দিদি? দিদি বলল—কোথায় রাখমু, আছেই কোথাও। আমি তো এত বড় খন্তিটা হোনা-র ভিতরে রাখি নাই...'হোনা' মানে হল সোনা। যৌন অঙ্গকে ওরা আদর করে, কিংবা সাংকেতিকে সোনা বলত। এরকম অনেক বদ রসিকতা হত অনিকেতের সামনেই, ওরা জানত, এই বাচ্চাটা কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। নারকোলের মোদক বানানোর জন্য গুড়-নারকোলের পাকের পর মণ্ডটা প্রথমে লম্বা করে নিতে হত, পরে মন্দিরের মত আকৃতি দেওয়া হত। যখন লম্বা করা হত, কেউ বলত, তোর কত্তার মতন এত লম্বা করছস ক্যান! অন্য কেউ বলত, ইশ, সাহস কত! আমার কত্তার কত বড় তুই জানলি কী করে? ননী তখন মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠত, ছিছিছি, ঠাকুরের পস্‌সাদ নিয়া কী আকথা-কুকথা কইতেছ তোমরা...। থামাও। লাজ-লাজ। ওরা ননীর সামনে ওইসব মেয়েলি কথা বলতে সংকোচ করত না। ননীকে সবসময়ে রান্নাঘরে কিংবা মহিলাদের আড্ডাতেই দেখত অনিকেত। মনে আছে, একবার ননী বলছে, কন দেখি দিদি, এই শোলকের মানে কী? চিৎ কইর‍্যা ফ্যালাইলাম, মাইগ্য নাইড়া করলাম, কামকাজ হইয়া গেলে ধুইয়া-মুইছ্যা রাখলাম...। ঠাকুমা বলতেন—কী আবার, শিল। বাটনা-বাটন। অনিকেতদের আদি বাড়ি পূর্ববঙ্গে হলেও ওর ঠাকুর্দা দেশভাগের আগেই চলে এসে এই মুকুন্দপুরে বাড়ি করেছিলেন। মুকুন্দপুরে কোনও বাঙাল ছিল না আগে। ওই অঞ্চলে ওরাই প্রথম বাঙাল।

অনিকেত স্মৃতি হাতড়ায়।

ও যখন আরও বড় হল, ওইসব গল্পগুজবের মানেগুলো বুঝতে শিখল।

ওইসব মেয়েলি গল্প-গুজবের কিছু স্মৃতি এখনও মনে আছে ওর।

আর একটা গল্প মাঝে-মাঝেই মনে পড়ে। একজন জিগ্যেস করল—তোর বড় পোলা জলধররে তুই কত বচ্ছর বয়সে বিয়াইছিলি?

উত্তরটা পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় লিখতে গেলে সবাই বুঝতে পারবেন না। ব্যাপারটা এরকম—

উত্তরদাত্রী বলেছিলেন—আমার বিয়েটা তো হয়ে গিয়েছিল আমার নয় বছর বয়সে। বিয়ে ব্যাপারটা কী, কিছুই বুঝতাম না। শাড়ি পরে, ঘোমটা দিয়ে থাকতে হত। এগারো বছর বয়স থেকে স্বামীর সঙ্গে শোয়া। বারো বছরে রজঃস্বলা হলেও সঙ্গম ব্যাপারটা কী তখনও বুঝতেন না। 'কত্তা মইধ্যে-মইধ্যে বেড়াইয়া ধইরা হোয়াগ (সোহাগ) করলে ভালই লাগত' একদিন উনি দেখলেন, কাজের ছেলেটি গরু বাঁধতে গিয়েছে মাঠে। গরুর খুঁটা গাড়ছে নিচু হয়ে। ওখানে একটা গাছের আড়ালে শুয়েছিল কাজের মেয়ে সুরবালা। দূর থেকে দেখেছিলেন, ছেলেটি শুয়ে থাকা মেয়েটির গায়ে কী যেন করছে। আমি কত্তারে জিগাইলাম সুরবালার প্যাটের কাছে বাগাল ক্যান খুঁটা পুঁতে? কত্তা কইলেন তুমি দেখছ বুঝি খুঁটা গাড়ন? তবে দ্যাখবা কেমনে খুঁটা গাড়ে? আমিও খুঁটা গাড়ুম। হেই রাইতে কত্তা খুঁটা গাড়লো। আর হেই হইল জলধর। জলধর হচ্ছে বড় কাকুর নাম। বাবার মামাতো ভাই।

একবার মনে পড়ে, কী একটা সন্দেশের ছাঁচ পাওয়া যাচ্ছিল না। ননীকে জিগ্যেস করেছিল কোথায় রাখছুস তুই? ননী বলেছিল, হ, আমি হোনায় থুইছি। ওরা তখন হাসাহাসি করেছিল। ওরে ননীরে, মাইয়াগিরি করতে গিয়া তুই ভুইলা যাস ক্যান তোর হোনার ভিতরে কিছু লুকাইয়া থোওন যায় না। তোর তো ক্যালা গা। মানে—ননী যখন বলেছিল আমি কি আমার যৌনাঙ্গের ভিতরে ঢুকিয়ে রেখেছি নাকি? অন্য মহিলা বলেছিল, বেচারা ননী, মেয়েলিপনা করতে গিয়ে ভুলে যাস কেন তোর যৌনাঙ্গের ভিতরে কিছু লুকিয়ে রাখা যায় না। তোর তো কলার মতো বার করা...।

কথাটা শুনে, ননী দুঃখ পেয়েছিল। কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছেছিল ননী। কেন কলার মতো লিঙ্গের জন্য দুঃখ পেয়েছিল ননী—অনিকেত বোঝেনি। এখন যেন কিছুটা বুঝতে পারছে। এখন বুঝতে পারছে 'প্রবর্তক' পত্রিকা-র রান্নাবান্নার টিপ্‌স আর সাজগোজ, ঘরকন্নার কথা কেন? ননীর কথা মনে হচ্ছে।

ননীর নাকি বিয়েও হয়েছিল। ননীর নাকি সন্তানও আছে। ননী ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গিয়েছিল। কেউ কেউ বলে, ও ইচ্ছে করেই ট্রেনের তলায় শরীর উৎসর্গ করেছিল।

'প্রবর্তক'-টা পড়তে গিয়েই তো ননীর কথা মনে পড়ল অনিকেতের। প্রবর্তক-এর একটা কবিতার ওপর চোখ আটকে গেল—

স্বীকারোক্তি

বয়স তখন তেরোর শেষে
প্রথমবার একা
বাড়ির বাইরে পা বাড়ালেম
মামার বাড়ি—জোকা।

গোসাঁইবাবুর অনুশীলন
মামা বাড়ির পাশেই
মামা ছেলে, জোকার 'দাদা'
ব্যায়াম শিখত ওতেই।
জোকার দাদা জোকার দাদা
হাসির খুড়োর কল
বিকেল হতেই বললে আমায়
আমার সাথে চল।
ছুটি চেয়ে গুরুর কাছে
বললে চড়া সুরে
চলছে কেমন অনুশীলন
দেখাব ঘুরে ঘুরে।
দেখতে পাবি জিমনাস্টিক
কঠিন ভারোত্তোলন
প্যারালাল বার ফ্রি হ্যান্ড আর
যোগের প্রশিক্ষণ।
দেখছি আমি নয়নজোড়া
সুঠাম সারি সারি
অর্ধনগ্ন পুরুষ দেহ
তুলছে ওজন ভারী
মিষ্টিমুখ আর মাচো দেহের
ভাঁজ খাওয়ানো ছাঁচে—
চলছে আসন সময় ধরে
ওস্তাদদের কাছে
দেখছি আমি সম্মুখেতে
নগ্ন পেশি যত
উঠছে ফেঁপে উঠছে ফুলে
কষছে দেহ যত।
পেশির জোরে ঊর্ধ্বটানে
পেশির জোরেই মাৎ
বক্ষ পেশির ঘেমো ছাতি
দেখেই আমি কাত
পেশির খেলায় জোয়ার-ভাটা
পেশির বৃন্দাবন
নগ্নপেশির নগ্নটানে
মন যে উচাটন।

দীপ্ত আমার সুপ্ত শিখা
হৃদয় গভীর মাঝে
কারাগৃহের ক্ষুব্ধ অসি
ঝনঝনিয়ে বাজে
হচ্ছে কী যে মনের মাঝে
বলব কী তা আজ
বলতে গেলেই আসবে তেড়ে
পড়বে মাথায় বাজ।
আমার আশা আমার ভাষা
জানি শুধু আমি
জানি না তো জানেন কিনা
স্বয়ং অন্তর্যামী।
মা বোঝে না, কেউ বোঝে না
কোথায় আমার আমি।
ব্যাঙ্গ করে বলতে পারো
তুইতো সমকামী।

—পরী।

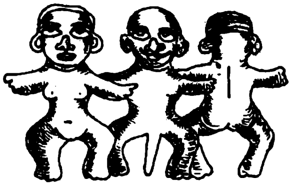

অফিসে একদিন বেলা বারোটা নাগাদ একটা টেলিফোন পেল অনিকেত।

নমস্কার স্যর, আপনাদের 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠানটা শুনছি। সমকামীদের নিয়ে দু'দিন অনুষ্ঠান হল। আমি একজন অভিভাবক। ছেলেকে নিয়ে ভুগছি। খুব সমস্যায় আছি। চিঠিতে কাজ হবে না, আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করে আমার সমস্যার কথা বলতে চাই। প্লিজ আমাদের বাঁচান।—মহিলা-কণ্ঠ। কাতর গলা। গলার স্বরে অসহায়তা মেশানো।

অনিকেত বলল—আমি কী সাজেশন দেব আপনাকে? আমি তো বিশেষজ্ঞ নই, আপনি বরং বিশেষজ্ঞদের কাছে যান।

উনি বললেন, প্লিজ ফেরাবেন না। আপনাদের অনুষ্ঠান শুনেছি বলেই বলছি। খুব দরদি অনুষ্ঠান। অনেকটা মানসিক বল পাই। আগে ছেলেটার ওই সমস্যার জন্য সবাই মিলে সুইসাইড করার কথাও ভেবেছি। অনুষ্ঠানটা শুনে মনে হল, আমাদের মতো অনেকেরই হয়। সত্যিই তো গোলাপ যে হলুদও হয় সেটা ক্রমশ বুঝতে পারছি। ওকে সারানোর চেষ্টা করেছি। মনে হচ্ছে ও আর সারবে না। এখন কী করে ছেলেটা সুখে থাকতে পারে, মা হিসেবে তো

আমাকে সেটাই ভাবতে হবে, তাই না? আপনাদের অনুষ্ঠানটা শুনে সেটাই মনে হল আমার। আমাকে একটু সময় দিন। আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে আর একটু মানসিক বল পাব।

অনিকেত বলল, ঠিক আছে। আগামীকাল একজন সাইকোলজিস্ট-ও আসবেন। কালই চলে আসুন। রিসেপশনে এসে বলবেন বিজ্ঞান বিভাগে যাব।

পরদিন একজন মহিলা এলেন। মাঝবয়সি। চেনা-চেনা মুখ। বললেন, কাল ফোন করেছিলাম। অনিকেত বলল, বসুন। উল্টো দিকের চেয়ারে বসলেন উনি। আরে, মঞ্জু না? মঞ্জুই তো? ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অনিকেত।

অনিকেত খুব আস্তে করে জিগ্যেস করে—মঞ্জু না? ও তখন অনিকেতের মুখের দিকে তাকায়। ও বলে, বাগবাজার?

অনিকেত মাথা নাড়ে।

ডাবুদা?

অনিকেত ঘাড় নাড়ে।

কত চেঞ্জ... কিন্তু তোর ভাল নাম অনিকেত বন্দ্যোপাধ্যায় কী করে জানব? তোকে তো ডাবু বলেই জানতাম...। এ মা, তোকে 'তুই' বলে ফেললাম...।

—তাতে কী হয়েছে, আমাকে তো 'তুই' করেই বলতিস।

ও মাথা নাড়ে। বলে, কতদিন পরে...।

অনিকেত কি বলে ফেলবে, তোর কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ পাইনি মঞ্জু, সেই কলঘরের ঘটনাটা আমাকে বহুদিন বিঁধেছে, কিন্তু আমি কিছু বলতে পারিনি। চোখে একটা ক্ষমা চাওয়ার অনুনয় নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অনিকেত। মঞ্জু বলে, এভাবে আবার দেখা হবে ভাবতেও পারিনি।

মঞ্জুর মাথার চুল অনেক পাতলা হয়ে গিয়েছে। ওর ঘন চুলের কথা মনে পড়ল, সেই বিনুনি, বিনুনির মধ্যে লাল বা বেগুনি ফিতের ফুল। ওর চোখের তলায় এখন একটু কালচে দাগ। মুখে বিষণ্ণতার মেঘ। ওর কপাল এবং সিঁথি লক্ষ করে, বিয়ের চিহ্ন খোঁজে। একটু লাল দাগ দেখতে পায়। হাতে শাঁখা-টাখা নেই। আজকালকার মেয়েরা অবশ্য এসব পরে-টরে না। মঞ্জু কি আজকালকার মেয়ে? ও তো প্রায় অনিকেতেরই বয়সি। দু-তিন বছরের তফাত মানে সমবয়সিই। অনিকেত তাই ডাবুদা। শাঁখা-সিঁদুর তো অনিকেতের বউ পরে। কিন্তু ওর সহকর্মী মহিলাদের মধ্যে প্রায় কেউ-ই পরে না। প্রথমেই জিগ্যেস করা যায় না, বিয়ে করেছিস কি না, কিংবা ঘর-সংসারের খবর কী? সেফ প্রশ্ন হল, বল, তোর খবর বল?

তার আগেই মঞ্জু জিগ্যেস করল, বল কেমন আছিস?

অনিকেত ঘাড় নাড়ে। বলে, তুই?

মঞ্জু মাথা নিচু করে। বলে, ভাল নেই তো বুঝতেই পারছিস। একটা কারণ তো ফোনে বলেছিলাম। তখন তো জানতাম না ফোনটা তুই ধরেছিস...। গলা শুনে তো বোঝা যায় না।

যদি জানতিস আমি, তা হলে কি ফোনটা করতিস? বোধহয় করতিস না।

মঞ্জু বলল, কে জানে? একটা জড়তা তো আছেই।

—সেটা তো আমারও। আমি ভুল করেছিলাম। কম বয়সে এমন ভুল অনেকেই করে। এই অনুষ্ঠানটা করতে গিয়ে আরও বেশি করে বুঝতে পারছি।

—কম বয়সে কেন, বেশি বয়সেও মানুষ ভুল করে। ভুলের আবার বয়স হয় না কি?

এরপর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। কেউ কোনও কথা বলতে পারে না। কিন্তু মনে হচ্ছিল, অনেক কথা জমে আছে। এই ঘরে লোকজন আসে, ভিজিটর আসে, সহকর্মীরাও। মঞ্জুকে নিয়ে স্টুডিওতে যায় অনিকেত।

মঞ্জু বলে, আকাশবাণী-র ভিতরে কখনও আসিনি। বাইরে থেকেই দেখেছি। এখানেই অনুরোধের আসর হত?

—এখনও তো হয়।

—জানি। কিন্তু শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ওঁরা তো আর নেই। জপমালা ঘোষ, উৎপলা সেন, সতীনাথ...তুই হেমন্তকে দেখেছিস?

—দেখেছি।

—অনেকদিন ধরে এখানে কাজ করিস?

—হ্যাঁ।

—নাটক কোথায় হয়?

—চল, দেখাব। সেই ঝোলানো মাইক্রোফোন, যার সামনে দাঁড়াতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বসন্ত চৌধুরী, শম্ভু মিত্র, নির্মলকুমার, মঞ্জু দে, তৃপ্তি মিত্র, কেয়া চক্রবর্তী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনলাল মুখোপাধ্যায়...

মঞ্জু বলল, এখন শুক্রবারের নাটকটা শোনা হয় না আর। কিন্তু রোববার দুপুরের নাটকটা মাঝে-মাঝে শোনা হয়। রেডিও শোনার অভ্যেসটা রয়েই গিয়েছে। নইলে 'সন্ধিক্ষণ'-টা শোনা হত না। আর তোর সঙ্গেও দেখা হত না।

ড্রামা স্টুডিওটা ফাঁকা ছিল। ওখানেই ওরা বসল। মেঝেতে কার্পেট পাতা আছে।

—বল, তোর সমস্যা বল। জানি না আমাদের দিয়ে তোর কিছু লাভ হবে কি না।

মঞ্জু বলল, তোর হাতে কতটা সময় আছে?

—কিছু অসুবিধে নেই।

মঞ্জু বলল—যে-কারণে এসেছি, সেটা নিশ্চয়ই বলব। তার আগে একটা ব্যাপার বলে দিই। সেই ছোটবেলার কথা। যেটা কখনও বলা হয়নি। সেই যে দাদুর সঙ্গে আমাকে দেখেছিলি...।

নাটকের ফ্ল্যাশব্যাক-এর একটা মিউজিক যেন বেজে ওঠে—টিরি টিরি টিরিং।

দাদুর ক্যানসার হয়েছিল। মঞ্জু মাথা নিচু করে।

দাদু বলেছিল, আরও ক'টা বছর আমি বাঁচতে চাই মঞ্জু। তুই আমাকে বাঁচাতে পারিস। শুধু তুই।

আমি বলেছিলাম—আমি? আমি কী করে তোমার অসুখ ভাল করব?

দাদু বলেছিল, আমি তো পুজোআচ্চা করি, শাস্ত্র পড়েছি। শাস্ত্রে একটা কথা লেখা আছে, বেদ-পুরাণেও আছে। আগেকার দিনে এভাবে অনেকে ভাল হয়েছে।

—কীভাবে?

দাদু বলল, বলছি। কিন্তু তোর-আমার মধ্যেই ব্যাপারটা রাখিস। তোকে মিনতি করছি মঞ্জু। দাদু হাতজোড় করল। দাদুর চোখে জল।

আমি বললাম, আমি কী করতে পারি বলো...

দাদু বলল, যেটা বলব, শুনে হয়তো আমাকে খারাপ ভাববি। হয়তো রাজি হবি না। কথা দে, তুই আমার এই অনুরোধটা রাখবি।

কী করতে হবে আমাকে কিছুই বুঝতে পারলাম না। দাদুর চোখের জল দেখে বলে দিলাম—আচ্ছা, রাখব...।

দাদু আমার মাথায় হাত রাখল। বলল, আশীর্বাদ করি সুখে থাক। রাজরানি হ্। পুজোআচ্চা করি, ভগবানের নাম করি, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে থাকি। যদি আশীর্বাদের কিছু শক্তি থাকে, সেটা ফলবে।

আমি বলি, বলো এবার...।

দাদু বলল, শাস্ত্রে আছে ষোড়শী বালিকা জরা নাশ করতে পারে। রোগ-ব্যাধি মুক্ত করতে পারে। ষোড়শী বালিকার অনেক ক্ষমতা...। তুই যদি তোর শরীরটা দিস আমাকে...। শাস্ত্রে আছে ষোড়শী রমণ সর্বব্যাধিহর। আরও কী সব শ্লোক বলল।

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। বুক ধুকধুক করতে লাগল। আমি জোরে-জোরে মাথা নাড়ি।

দাদু আবার দু'হাত জোড় করে। আমার পা চেপে ধরে।

আমি বলি, কী হচ্ছে দাদু? এ কী করছ! দাদু বলে, বাঁচব মঞ্জু, বাঁচব। আমাকে বাঁচা। রমণ তো হবে না। তুই শুধু বিবস্ত্র হবি। আমি তোর শরীর স্পর্শ করব। আমার সর্ব অঙ্গ দিয়ে তোর শরীর স্পর্শ করব। ষোড়শীর স্পর্শেই রোগ সারবে। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নয়। কেউ জানবে না। শুধু তুই আর আমি। একদিন সুযোগ বুঝে তোকে ডাকব। এটা গোপন ক্রিয়া। কিন্তু অব্যর্থ। আমি যদি ক'টা দিন বাঁচি, সেটা তোর জন্যই বাঁচব রে মঞ্জু। তোর প্রতি কৃতার্থ থাকব। কৃতজ্ঞ থাকব। সারা জীবন আশীর্বাদ করে যাব। একদিন তো মরবই। মরার পরও, আমার আত্মা সর্বদা তোর মঙ্গল চাইবে। তোর কাছে ভিক্ষা চাই রে মঞ্জু। ভিক্ষা চাই। তুই ফেরাস না।

একটা অদ্ভুত প্যাথোজ মিউজিক ড্রামা স্টুডিও-র দেওয়াল থেকে বাজতে থাকে। অনিকেতের সারা শরীর রিনরিন করতে থাকে। ও কীরকম হাওয়ায় ভাসতে থাকে।

—তারপর তুই আমাকে দেখে ফেলেছিলি দাদুর সঙ্গে, ওইভাবে। খুব খারাপ ভেবেছিলি আমাকে...!

অনিকেত বলে, আর ওই জন্যই তো...। আমি ভেবেছিলাম যে মেয়েটা একটা ক্যানসারের বুড়ো রুগিকে...তাকে...।

—যে এমন করতে পারে, সে খুব অ্যাভেলেব্‌ল। খুব চিপ। এইসব ভেবেছিলি। ভাবতেই পারিস। তোর দোষ কী? কিন্তু আমি সেদিন তোর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। যা-তা করেছিলাম। মনে হয়েছিল, ভেবেছে কী সবাই? একটা বুড়ো একরকম ভাবে বলল, তারপর একটা ইয়ং ছেলে...।

—ঠিকই তো। তোর কী দোষ? তুই ঠিকই করেছিলি। তোর ওই কথা আর তুই যা করেছিলি—তাতে আমার উপকারই হয়েছিল। মেয়েদের শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলাম। তুই আমাকে সংযত হতে সাহায্য করেছিলি... অনিকেত বলে।

মঞ্জু বলল, সেই মুহূর্তে খুব রাগ হয়েছিল। তোর ওপর ব্যক্তিগত রাগ নয়। হয়তো আমার নিজের ওপরই। নিজের শরীরের ওপর।

মঞ্জু একটু নিশ্চুপ থাকে। ড্রামা স্টুডিও-র দেওয়াল থেকে যেন ছুটে আসে মেহের আলি-র চিৎকার। তফাত যাও...তফাত যাও...সব ঝুট হ্যায়...। দেয়াল থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। সেই হাহাকার। জাহানারা-র সেই সংলাপ—চমৎকার। আবার বলি চমৎকার...।

অনিকেত বলে, তোর কী মনে হয় মঞ্জু এখন? জীবনের অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছি আমরা। তোর কি মনে হয়, তোর দাদু, মানে আমার সেই বড় পিসেমশাই, তোকে ভোগ করার জন্য ওসব বাহানা করছিল? নকশা করছিল?

মাথা নাড়ে মঞ্জু। বোধহয় তা নয়। দাদুর ওই বিশ্বাসটা জেনুইন ছিল। আমাকে ছোঁওয়ার আগে চোখ বুজে কিছু প্রার্থনা করছিল। আমার গা ছুঁয়ে নিজের মাথায় হাত রেখেছিল। আমার বুক ছুঁয়ে নিজের সারা গায়ে বোলাচ্ছিল। গলার ওই জায়গাটায় বেশি করে, যেখানটা ফুলে ছিল। কীরকম পুজো করার মতো করছিল।

অনিকেত বলে, এত কথাই যখন বললি, তখন আমার জিগ্যেস করতে হেজিটেশন নেই, ওঁর কি ইয়ে-টা, মানে পুরুষাঙ্গটা, 'হার্ড' হয়েছিল? মঞ্জু বলে, আমি ওদিকে তাকাইনি, তবে আমার ওখানে টাচ করিয়েছিল। 'হার্ড' ছিল না মনে হয়। অতটা মনে নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তো তুই জানালা খুললি...।

ওই ব্যাপারটা কি কাউকে বলেছিলি? অনিকেত জিগ্যেস করে।

—না।

—তোর মা-কে?

—না।

—আর, আমার ব্যাপারটা?

—না।

—তোর মা-কেও বলিসনি?

—না।

—তা হলে তোর মা আমার দিকে অমন করে তাকাতেন কেন?

—তোর মনের ভুল। তোর নিজের অপরাধবোধ।

—কিচ্ছু বলিস্নি মা-কে?

—বোধহয় একবার একটু বলেছিলাম ডাবু ছেলেটা সুবিধের নয়।

—ওটাই যথেষ্ট, তোর মা যা বোঝার বুঝে নিয়েছিলেন।

—হয়তো।

—তোর মা জিগ্যেস করেননি, ...এরকম বলছিস কেন?

—না।

—কিন্তু পরেও কি আমাকে ঘেন্না করতিস মঞ্জু?

—বললাম তো, তোকে ঘেন্না না। নিজের শরীরের ওপর। কেন এরকম হল? ছোট ছিলাম, বেশ ছিলাম, এরকম মনে হত।

—তা হলে আমাকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নিতিস কেন? থুতু ফেলতিস...

—থুতু?

—হ্যাঁ তো...।

—মনে পড়ছে না। ছাড় ডাবু ওসব। অনেকের জীবনেই অনেক কিছু ঘটে। কত সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

—তোর আর রাগ নেই তো?

—বলছি তো না।

—হাল্কা হলাম রে মঞ্জু। ওটা একটা ট্রমা-র মতো ছিল। কত সব ভুলভাল ধারণা মানুষের। বড় পিসেমশাইয়ের বিশ্বাসটা হয়তো খুব জেনুইন ছিল, হয়তো বাঁচার প্রবল আর্তিতেই ওসব করতে চেয়েছিল...।

অনিকেত কিছু বইপত্র জোগাড় করেছিল মনের বিচিত্র ভাঁজ, আলো-অন্ধকার বোঝার জন্য। যৌনতা-সম্পর্কিত কিছু বইও। একটা বইয়ের একটা শ্লোক মনে পড়ল। বইটা বাড়ি গিয়ে খুঁজে পেয়েছিল। একটা চটি বই। বইটির নাম 'রতিমঞ্জরী।' মহাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বংশীয় মহামহাধ্যাপক পণ্ডিত উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের প্রপৌত্র পণ্ডিত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ কর্তৃক সংকলিত—পতিগণের শক্তিস্বরূপা অভিন্নহৃদয়া অর্ধাঙ্গিনী নারীকুলের করকমলে উৎসর্গীকৃত। দু'শোটার মতো সংস্কৃত শ্লোক আছে। নারী কয় প্রকার, কাদের কেমন গুণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলতে-বলতে কোন নারীগমনে কী ফল হয়, তাও আছে। কয়েকটা শ্লোক এখানে বলা যেতে পারে, যা থেকে বড় পিসেমশাই ও মঞ্জুর ব্যাপারটা বোঝা যায়।

আষোড়শী ভবেদ্বালা তরুণী ত্রিংশতীমতা
পঞ্চপঞ্চাশতি প্রৌঢ়া ভবেৎ বৃদ্ধা ততঃ পরম

ফলমূলাদিভির্বালা তরুণী রতিযোগতঃ
প্রেমদানাদিভিঃ প্রৌঢ়া বৃদ্ধা চ দৃঢ় তাড়নাৎ

বালাতু প্রাণদা প্রোক্তা তরুণী প্রাণহারিণী
প্রৌঢ়া করোতি বৃদ্ধত্বং বৃদ্ধা মরণমাদিশেৎ

মানেটা দাঁড়াচ্ছে এরকম : নায়িকা চাররকম। বালা, তরুণী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা। ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত নারীরা 'বালা'। ষোলো থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত তরুণী, তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের নারীরা প্রৌঢ়া, এরপর বৃদ্ধা। ফলমূল দিয়ে বালাকে, রতি দ্বারা তরুণীকে, প্রেমবচনে প্রৌঢ়াকে এবং তাড়না দ্বারা বৃদ্ধাকে বশ করতে হয়।

বালা নারী মাত্রই 'প্রাণদা'। তরুণী 'আয়ুহারিণী'। প্রৌঢ়ার সঙ্গে রমণ আরও বৃদ্ধ করে। বৃদ্ধা-রমণ মৃত্যু ডেকে আনে।

কোনও মুসলিম কিতাবেও পড়া গেছে বালিকা-রমণে আয়ু বাড়ে। বলবৃদ্ধি হয়।

বালা তু প্রাণদা প্রোক্তা। বড় পিসেমশাই এটা বিশ্বাস করতেন। আরও কেউ-কেউ বলেছিল হয়তো। মঞ্জু তো তখন বালা। বালা'কে ফলমূল দিয়ে বশীভূত করতে হয়। এখন কেউ চকোলেট, লজেন্স দিয়ে কিংবা স্যান্ডউইচ-বার্গার দিয়েও চেষ্টা করে হয়তো, কিন্তু পিসেমশাই তো হাতজোড় করে কাতর-কণ্ঠে ওর কাছ থেকে প্রাণ চেয়েছিল।

অনিকেত বলল, ওইসব ভুলভালগুলো...। কী বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। থেমে গেল। আবার শ্বাস নিল অনিকেত।

বলল—বল, তোর আসল কথা বল। কেন এসেছিস? এতক্ষণ যা সব কথা হল, তা তো এক্সট্রা।

মঞ্জুও দীর্ঘশ্বাস নিল, যেন অনেক কথা বলবে। কিন্তু কিছু না-বলে দীর্ঘশ্বাস-ই শুধু। স্টুডিও-র মাইক্রোফোন অন থাকলে ঝড় আর দুর্যোগের সাউন্ড-এফেক্ট হত।

দু-চার সেকেন্ড নিস্তব্ধ থেকে মঞ্জু বলল, তুমি ভাল আছ ডাবুদা?

—ওই আর কী।

—বিয়ে? নিশ্চয়ই করেছ...

—তুই কিন্তু আমাকে 'তুই' করেই বলতিস...

—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ...বিয়ে করেছিস? না, না, 'তুই' করে পারব না।

—হ্যাঁ, করেছি।

—বউ নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী...

—ওই আর কী।

—ছেলে-মেয়ে?

—না।

—কেন রে, হয়নি?

—না।

—ও!

ছেলেদের বিয়ের চিহ্ন থাকে না। মেয়েদের থাকে। অনিকেত মঞ্জুর মাথায় কোনও লুকনো সিঁদুর দেখতে পেল না। হাতেও কিছু নেই। বাঁ হাতে শুধু একটা ঘড়ি। অনিকেত জিগ্যেস করল, তুই বিয়ে করিসনি?

—করিনি। হয়েছিল। টেকেনি।

—ও। বাচ্চা?

—একটা। ছেলে।

—কার কাছে থাকে?

—আমার কাছেই।

—কত বড় হল?

—ষোলো। সেই ষোলো। সর্বনাশা ষোলো।

সুকান্ত ভট্টাচার্য আঠেরো বছর বয়সের কথা লিখেছিলেন। অনিকেত দ্যাখে ষোলো বছর বয়সটাও কম কিছু নয়।

মঞ্জু বলতে থাকে—আমি আর ও থাকি একটা বাড়িতে ভাড়ায়। ওর যখন আট বছর বয়স, তখন ওর বাবা চলে গেল। মানে, আমায় ছেড়ে গেল।

—ডিভোর্স হয়েছে?

—না। কোর্টে যাওয়া হয়নি।

—ও টাকা-পয়সা দেয়?

—না। দেয় না। কী করে দেবে? অন্য মহিলার সঙ্গে থাকে, সংসার আছে।

—বাঃ, ছেড়ে চলে গেল, খোরপোশ দেবে না? ছেলেটা তো ওর।

—বলেছিলাম, বলল, পারবে না।

—কোর্টে গেলে পেয়ে যেতিস...

—কে যাবে? আমার তো কেউ নেই...

—কেন, মহিলা সমিতি-টমিতি কত আছে...

—জানি না রে...।

—তোর চলছে কী করে?

—আমি একটা ছোটখাটো চাকরি করি। তাতে যা হোক করে ডাল-ভাত হয়ে যায়।

—কোথায় থাকিস মঞ্জু?

—পানবাজার। এন্টালির কাছে।

—তোর বর কী করে?

—বিজনেস। লেদের কারখানা। এখন বিজনেস-টা তেমন চলে না শুনেছি।

—যোগাযোগ আছে?

—একটু-একটু।

—তার মানে সম্পর্কটা ধুয়ে-মুছে যায়নি। তাই না? কিছু বলে না মঞ্জু।

—বরের প্রতি তোর এখনও একটা সফ্‌ট কর্নার আছে, তাই না?

—কী করে বুঝলে?

—ওই যে, বলছিলি—কী করে টাকা দেবে, ওর সংসার আছে...বিজনেসটাও ভাল চলছে না...।

—আমার কথা ছাড়। আমার ছেলেটাকে বাঁচা। ও ছাড়া আমার কেউ নেই। খুব সমস্যায় পড়েছি ছেলেটাকে নিয়ে।

—কী সমস্যা?

—তোরা যা নিয়ে আলোচনা করছিলি। রেডিও-টা শোনার অভ্যেস ছিল ছোটবেলা থেকে। একটা রোববার সকালে শুনলাম, এরপর থেকে পরপর কয়েকটা রোববার-ই শুনলাম। তোরা বলছিলি, হোমোসেক্সুয়ালিটি কোনও রোগ নয়, অথচ আমরা জানি এটা একটা অসুখ। আমার ছেলেটা...।

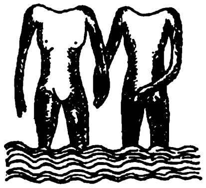

মঞ্জু বলেছিল, ওর ছেলেটা সমকামী। কথাটা বলার সময় যেন ও লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। বলছিল, আমার স্বামীটা ছেড়ে চলে গেল, ছেলেটাই ভরসা, কিন্তু ও এরকম উচ্ছন্নে গেল...।

—উচ্ছন্নে গেল বলছিস কেন মঞ্জু? লেখাপড়ায় কেমন ও?

—ছোটবেলায় তো বেশ ভাল ছিল। এখনও খুব খারাপ না। কিন্তু বিগড়ে গেল।

—বিগড়ে গেল মানে?

—অংক-টংক একদম করে না। করতেই চায় না। গান শোনে, গানের সঙ্গে-সঙ্গে নাচে। টেপ চালিয়ে।

—তাতে কী হল? একে কি বিগড়ে যাওয়া বলে নাকি?

—স্কুলেও যেতে চায় না। কবিতা-টবিতা লেখে।

—আবার কী আজে-বাজে বকছিস! কবিতা লেখা কি খারাপ নাকি?

—না, কবিতা লেখা খারাপ সেটা বলছি না, কিন্তু স্কুলের সিলেবাসে তো কবিতা ছাড়াও আরও সাবজেক্ট আছে। ওসব পড়ে না। সিক্স-সেভেন থেকেই ও কেমন একটা হয়ে গিয়েছে। মেয়েদের মতো সাজগোজ করে। তারপর আরও সব বিচ্ছিরি কাণ্ডকারখানা। আমার লাইফ-টা হেল করে দিল। ছোটবেলায় ও কী সুন্দর ছিল, কী ভাল মেমোরি ছিল। যা পড়ত, একবার-দু'বার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যেত। ওকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখতাম...। সব স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছে পরিমল। আসলে পাপের শাস্তি বোধহয়।

—কী পাপ করলি আবার?

—ওই যে ছোটবেলায়—তোর পিসেমশাইয়ের সঙ্গে...। কিন্তু আমি কী করতাম? একটা অসুস্থ মানুষ বলেছিল বাঁচতে চায়...।

—ওটা ভুলতে পারলি না?

—ভুলে তো গিয়েছিলাম, কিন্তু ছেলেটা ওরকম হয়ে গেল বলেই মাঝে-মাঝে মনে হয় রোগ নয়...। সত্যি বল তো, তুই নিজেও কি বিশ্বাস করিস এটা কোনও রোগ নয়?

—আমিও আগে ভাবতাম, এটা একটা রোগ। এখন বুঝেছি।

—এটা নর্মাল ব্যাপার?

—সবাই তো বলছে। বিশেষজ্ঞরা...।

—তা হলে আমার ছেলেটা নর্মাল?

—তাই তো।

—তা হলে ও যে মেয়েদের মতো সাজে, চুপিচুপি মেয়েদের পোশাক পরে, আমি যখন বাড়ি থাকি না, আমার শাড়ি পরে...এসব পাল্টাবে না?

—তুই চেষ্টা করেছিলি?

—করেছিলাম। বলে-কয়ে, বুঝিয়ে...। বলেছিলাম, তুই ব্যাটাছেলে, পুরুষমানুষ, কেন মেয়েদের মতো হাবভাব করিস? ও বলেছিল আমি যদি মেয়ে হতাম, তা হলেই ভাল হত। আমি বলেছিলাম, বোকার মতো কথা বলছিস কেন? মেয়ে হওয়া কি ভাল? আমি কি মেয়ে হয়ে ভাল আছি? তুই ছেলে, ছেলেদের মতো হ। খেলবি, মারপিট করবি, দৌড়বি। তুই কেন এরকম মিনমিনে স্বভাবের হচ্ছিস? হাত-মুখ বেঁকিয়ে কথা বলছিস, ছিঃ!

—ওর কত বছর বয়স থেকে এসব লক্ষ করলি?

—বাচ্চা বয়সে তো সবাই একরকমই থাকে। স্কুলে যেত, গান শুনতে ভালবাসত, গান গাইতেও ভালবাসত। খুব সুইট ছিল। আদুরে। ওর বাবার সঙ্গে আমার যখন ঝগড়া হত, ওর মনে সেটার এফেক্ট পড়ত। ও বলেছিল, বাবাটা একদম ভাল না। তুমি ভাল। আমি মনে-মনে খুশি হতাম। ওর যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন থেকেই ওর বাবা অন্য এক মহিলার সঙ্গে

ইনভল্‌ভড হয়ে পড়েছিল। ওর আট বছর বয়সের সময়, ওর বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যায়। তখন থেকেই বাবার প্রতি ওর একটা বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। পুরুষদের ঘৃণা করতে গিয়ে ও নিজেকেও ঘৃণা করতে শুরু করে। নিজেকে পুরুষ ভেবে লজ্জা পেতে শুরু করে।

—এই রাবিশ ব্যাখ্যা তোকে কে দিয়েছে? তুই কি নিজে-নিজেই এইভাবে ভেবেছিস?

—আমাকে একজন সাইকোলজিস্ট বলেছিল।

—সাইকোলজিস্ট দেখিয়েছিলি বুঝি?

—দেখিয়েছি তো।

—কবে?

—কিছুদিন আগে। মাস দু'য়েক।

—কী বলেছিলেন উনি?

—বলেছিলেন কাউন্সেলিং করাতে হবে। কুড়ি-টার মতো সিটিং দরকার হবে। পার সিটিং দু'শো টাকা। তার মানে কুড়িটার জন্য চার হাজার টাকা। এই টাকাটা আমি খরচা করতে হয়তো পারতাম, কিন্তু পরিমল রাজি হল না। ও কিছুতেই গেল না। পরিমল আমার ছেলের নাম।

—জানি তো...। বলে যা।

—একদম লেখাপড়া করতে চায় না। পড়াশোনায় মন নেই। স্কুলেই যেতে চায় না। স্কুলে যেতে ওর ভাল লাগে না। ওকে স্কুলের ছেলেরা টিটকিরি দেয়। টিচাররাও ব্যঙ্গ করে। কোনও-কোনও টিচার ওকে 'পরি ম্যাডাম' বলে।

—ও কি তাতে দুঃখ পায়?

—এটা একটা প্রশ্ন হল? দুঃখ পাবে না?

—কেন দুঃখ পাবে? ওর তো এতে ভাল লাগার কথা। তুই তো বললি ও মেয়ে হতে চায়। নিজেকে মেয়ে বলে ভাবতে ভালবাসে। তাই যদি হয়, তা হলে যখন কেউ ওকে পরি বলে ডাকে, মানে ওর মেয়েলিত্ব-কে স্বীকৃতি দেয়, তখন তো ওর আনন্দ হওয়ারই কথা।

মঞ্জু একটু মাথা চুলকোয়। কিছুক্ষণ চুপ। বলল, এতটা জটিল করে ভাবতে পারি না রে। আসলে, বলার মধ্যেই তো ব্যঙ্গ আছে। বিদ্রুপ আছে। হ্যাটা আছে। অপমান আছে। এই অপমানটা প্রতিদিন ওকে কষ্ট দিচ্ছে। ওইজন্যই ও স্কুলে যেতে পারছে না। স্কুলে যেতে চায় না বলে আমিও ওকে মেরেছিলাম। তারপর একদিন ও ব্লেড দিয়ে ওর হাতের শিরা কেটে দিয়েছিল। আমি তখন কাজে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে দেখি ওর হাত রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ভাল করে কাটেনি বলে বেঁচে গিয়েছিল। এখনও হাতে সেলাইয়ের দাগটা আছে। ওটা দেখে আমার বুক টনটন করে ওঠে এখন। ভয় হয়। এরপর থেকে ওকে কিচ্ছু বলি না আর। কয়েকদিন কাজে যাইনি। কিন্তু কাজ কী করে কামাই করব? কাজ না-করলে খাব কী? ওকে বললাম, বাবু, তোর যা ভাল লাগে তাই কর, তোকে আমি আর কিচ্ছু বলব না। বকব না। কিন্তু পড়াশোনা কর। স্কুলে না-যাস লেখাপড়াটা ঠিক করে কর। পরীক্ষাটা দে। ও কিন্তু পড়াশোনায় বেশ ভাল। বিশেষ করে বাংলায়। ক্লাস এইট-এ যখন পড়ত, ইস্কুলের ম্যাগাজিনে কবিতা বেরিয়েছিল।

ওর বাবা যখন ছেড়ে-ছুড়ে চলে গেল, তখন ভেবেছিলাম ছেলেকে যে করে হোক মানুষ

করব। যে করে হোক, ছেলেকে ভাল করে লেখাপড়া করাব। ছেলেটা তো ইন্টেলিজেন্ট-ই ছিল...।

অনিকেত বলে, ইন্টেলিজেন্ট ছিল বলছিস কেন, এখনও ইন্টেলিজেন্ট। ওর প্রতিভার বিকাশ হতে দে, ও ঠিক বড় হবে।

—কী করে বড় হবে ও? ও তো যা-তা শুরু করে দিয়েছে। জঘন্য ব্যাপার-স্যাপার শুরু করেছে।

—যেমন?

—চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটা ছেলেকে ঘরে নিয়ে আসছে, স্কুলে না-গিয়ে এসব করছে। বিছানায় একটা ব্যাটাছেলের সঙ্গে...।

—ও যদি ব্যাটাছেলেকে ঘরে না-ঢুকিয়ে কোনও মেয়েকে নিয়ে আসত, তা হলে কি মেনে নিতিস?

—সেটাও হয়তো মেনে নিতাম না, তবু ভাবতাম এটা তো বয়সের ধর্ম। অ্যাবনর্মাল কিছু নয়। কিন্তু ব্যাটাছেলের সঙ্গে জামাকাপড় খুলে জড়াজড়ি করাটা তো অ্যাবনর্মাল। কী করে সহ্য করব? আমার নিজেরই সুইসাইড করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু আমি যদি ওসব করি, ছেলেটা তো ভেসে যাবে। শুনেছি হিজড়েরা এই ছেলেদের টোপ দেখিয়ে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয়। এটা কি সত্যি?

অনিকেত বলে, জানি না। তবে জেনেছি হিজড়েরা প্রায় সবাই পুরুষমানুষ। আগে আমার ধারণা ছিল, হিজড়েরা উভলিঙ্গ। মানে, ওদের জন্মগত ত্রুটি থাকে। ওদের পেনিস আর ভ্যাজাইনা দু'টোই থাকে, কিন্তু অপরিণত। এরকম বাচ্চাকে ওদের বাবা-মা-ই হিজড়েদের দিয়ে দেয়, এইভাবে হিজড়েদের দল তৈরি হয়। ভুল জানতাম। পরে শুনলাম, জেনেটিক ত্রুটির কারণে হিজড়ে হয়। এটাও ভুল জানতাম।

মঞ্জু বলল, আমার খুব ভয় হয়। সবসময় একটা ভয়। ছেলেটা হিজড়ে-টিজড়ে হয়ে যাবে না তো? ওকে অনেকে হিজড়ে বলে। পাড়ার অনেকে। কেউ যদি আমার বাড়ি খুঁজতে-টুঁজতে আসে, বলে, ওই বাড়িটা তো, একজন ভদ্রমহিলা থাকেন, ওঁর একটা হিজড়ে মতন ছেলে আছে? এগুলো সর্বক্ষণ আমাকে কুরে-কুরে খায়। একদম বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমি এখানে এসেছি যদি একটা পথ তোরা দেখাতে পারিস...।

অনিকেত বলল, এবার আমাদের এখান থেকে উঠতে হবে। চয়ন বসু-র আসার কথা। উনি একজন সাইকোলজিস্ট। তোর সঙ্গে কথা বলিয়ে দিচ্ছি।

ড্রামা স্টুডিও থেকে নিজের ঘরে গেল অনিকেত। গিয়ে দেখল চয়ন বসু বসে আছেন—অনেকক্ষণ? অনিকেত জিগ্যেস করে।

—না, পাঁচ মিনিট।

—হাতে সময় আছে আজ?

—আছে।

—তা হলে এই ভদ্রমহিলাকে একটু সময় দিন। তারপর কাজের কথা বলব।

চয়ন বসু-কে আসতে বলেছিল অনিকেত সমকামীদের মানসিক সংকট নিয়ে একটা আলোচনা করার জন্য। এঁকে নতুন করে প্যানেল-এ নেওয়া হয়েছে।

অনিকেত চয়নবাবুকে মঞ্জুর ছেলের সমস্যাটার কথা বলে। চয়ন বসু বলেন—অত চিন্তা করছেন কেন ম্যাডাম? ব্যাপারটা নিয়ে এত ভাববেন না। ও একজন পরিপূর্ণ মানুষ। মানুষের সমস্ত গুণ ওর মধ্যে আছে, ওগুলো বিকশিত হতে দিন। কতটা ছেলের মতো ব্যবহার, কতটা মেয়ের মতো—এসব কোনও ব্যাপারই নয়। এগুলো আমরাই তৈরি করেছি। মেয়েরা তো এখন শার্ট-প্যান্ট পরছে, এটা কুড়ি বছর আগেও আমাদের চোখে খারাপ লাগত। কিন্তু মেয়েদের শার্ট-প্যান্ট পরা না-পরা নিয়ে আপনার কোনও মাথাব্যথা আছে?

মঞ্জু বলে, না।

এখন তো অনেক মেয়ে বাড়িতে বারমুডা-গেঞ্জি পরেও সংসার সামলাচ্ছে। গেঞ্জি উঠিয়ে বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিড করাচ্ছে।

—হুঁ।

—তা হলে, কোনও ছেলে যদি শাড়ি-টাড়ি পরে, আপত্তি কীসের?

মঞ্জু বলল—একটা কথা বলব ডাক্তারবাবু? মেয়েরা শাড়ির বদলে সালোয়ার-কামিজ পরে কেন? চলাফেরায় সুবিধার জন্য। শার্ট-প্যান্ট পরে কমফর্ট-এর জন্য। কিন্তু ছেলেরা কেন শাড়ি পরতে যাবে?

চয়ন বসু বললেন—আমি ছেলেদের শাড়ি পরার পক্ষে ওকালতি করছি না মোটেই। সত্যি তো, ছেলেরা কেন শাড়ি পরতে যাবে? কিন্তু মেয়েরাই বা কেন কষ্ট করে নাক ফুঁড়তে যাবে? কান ফুঁড়তে যাবে? সাজবে বলে, তাই তো? দেখতে ভাল লাগবে, তাই। যদি কোনও ছেলে নিজে মনে করে লিপস্টিক লাগিয়ে ঠোঁটটা লাল হলে ওকে দেখতে ভাল লাগবে, কিংবা কাজল পরলে দেখতে ভাল লাগবে, তা নিয়ে আমরা কেন এত হাসাহাসি করি? প্যান্ট পরলে একটা মেয়ে সমাজের চোখে হয়ে যায় স্মার্ট, আর কাজল পরলে একটা ছেলে হয়ে যায় হিজড়ে—এই মনোভাবটা, এই দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টে ফেললেই মনে অশান্তি থাকবে না। জানি, বহুদিন ধরে একটা সোশাল ভ্যালু তৈরি হয়। ওগুলো আমাদের মনের গভীরে গেঁথে থাকে। আর ওইসব ভ্যালুজ সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে পাল্টায়। অনেকের বাড়িতেই তো ঠাকুর-দেবতা আছে। দেবতাদের গায়ে গয়না নেই? কৃষ্ণের কানে দুল, গলায় মালা, হাতে বালা, মাথায় মুকুট। রাধারও তাই। সব রাজা গয়নাগাটি পরতেন। এতে তো কোনও নিন্দে ছিল না। ইউরোপে আগেকার দিনে ছেলেরাও ফ্রক পরত। কোনও-কোনও ছেলে হয়তো ধর্মীয় কারণে নয়, অন্য কোনও ভাল-লাগা থেকে মেয়েদের পোশাক-টোশাক পরে। মানে, যাকে আমরা মেয়েদের পোশাক বলে ভাবি আর কী। এ নিয়ে অতটা দুশ্চিন্তা না-করলেও চলবে। ওকে নর্মাল বলে ভাবুন না, ওর যা প্রতিভা আছে, বিকশিত হতে দিন। ক্রমাগত যদি ওকে বকাবকি করা হয়, ওর কিন্তু প্রতিভার স্ফুরণ হবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক উদাহরণ আছে, যারা বিরাট প্রতিভাবান, কিন্তু মেয়েলি স্বভাবের, মানে যাকে আমরা মেয়েলি স্বভাব বলি আর কী!

মঞ্জু বলল—ও তো শুধু মেয়েদের পোশাকেই আটকে নেই, সত্যি কথাই বলছি, ডাক্তারদের কাছে কিছু গোপন করা উচিত নয়। ও তো ঘরে ব্যাটাছেলেদেরও ডেকে আনছে। ও তো সমকামী...। চিকিৎসা নেই?

চয়ন বসু একটু শ্বাস নিলেন। বললেন, একটা কথা বলি ম্যাডাম? আগে ভাবা হত চিকিৎসা হয়। ভাবা হত, সমকাম একটা রোগ। এখন ঠিক সেভাবে ভাবা হয় না। নিঃসন্দেহে এরা

অন্যরকম। এরকম না-হলেই ভাল হত। কিন্তু কী করা যাবে? সব সমকামীরা মেয়েদের পোশাক পরতে ভালবাসে এমন নয়, কিন্তু যারা মেয়েদের মতো পোশাক আর সাজসজ্জা করে, তারা সাধারণত সমকামী-ই হয়। আবার যারা মেয়েদের সাজসজ্জা করতে ভালবাসে, ওদের বলে ট্রান্সভেস টাইট। তারা ওখানেই সীমাবদ্ধ না-থেকে অনেকে পুরো নারী হতে চায়। এদের বলে রূপান্তর-কামী বা ট্রান্সজেন্ডার। কাউন্সেলিং করে অনেক সময় এটা আটকানো যায়। আপনার ছেলের সঙ্গে আমি না-হয় কথা বলে নেব...।

মঞ্জু বলল—এত সব মানসিক রোগের চিকিৎসা আছে, পাগলও ভাল হয়ে যায়—আর এটা ভাল হয় না?

চয়ন বসু বললেন—সেই এক কথাই আমি কিছুতেই আপনাকে বোঝাতে পারলাম না। রোগ-রোগ-রোগ করেই গেলেন। আগে রোগ মনে করে এদের ওপর কম অত্যাচার হয়েছে? শক থেরাপি করা হত।

—মানে?

—মানে, ইলেকট্রিক শক দেওয়া হত। হাল্কা শক যদিও। প্রতিটা শক-এ কুঁকড়ে যেত ছেলেটা। ভাবখানা এই—আর করবি? তা হলে শক দেব। পাগলের চিকিৎসাতেও শক দেওয়া হত আগে খুব। এখন কমে গিয়েছে। ভাবনাটা কী ছিল জানেন? একটা স্টাডি-তে দেখা গিয়েছিল যারা পাগল, ওদের মৃগী বা এপিলেপ্সি হয় না। সুতরাং যারা পাগলামি করে, ওদের যদি আর্টিফিসিয়ালি কিছুক্ষণের জন্য এপিলেপ্টিক করা যায়, মানে মৃগীরোগীতে রূপান্তরিত করা যায়, তা হলে পাগলামি সেরে যাবে। এইভাবেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। সমকামীদেরও পাগল ভেবেই শক ট্রিটমেন্ট করা হত। কোথাও-কোথাও সমকামীদের পুরুষত্বহীন করে দেওয়া হত। থিয়োরি-টা হচ্ছে সমস্তরকম যৌন অনুভূতিকে নষ্ট করে দেওয়া, ধ্বংস করে দেওয়া। ভাবখানা এরকম—মেয়েদের সঙ্গে না মিশে ছেলেতে ছেলেতে এসব করছিস, দ্যাখ, তোর যৌন অনুভূতিই নষ্ট করে দিচ্ছি। এতে উল্টো ফলই হল। পুরুষের যে হরমোন টেস্টোস্টেরন, সেটার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলে মেয়েলিত্বই বেশি ফুটে উঠবে। আমেরিকার এক ডাক্তার সমকামিতার কারণ হিসেবে মস্তিষ্কের একটা বিশেষ জায়গা নির্দিষ্ট করলেন। সার্জারি করে সমকামিতার চিকিৎসার তত্ত্ব দিলেন। কেউ-কেউ করালেন, কাজ হল না। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আচ্ছন্ন করে রাখার পক্ষপাতীও কেউ। ঘুমোক, ঘুমিয়ে পড়ে থাকলে তো লিপস্টিক দিতে পারবে না, ন্যাকা-ন্যাকা কথাও বলতে পারবে না। ন্যাকা-ন্যাকা কথা মানে মেয়েলি কথা আর কী। লিপস্টিক লাগানোর চেয়ে ঘুমিয়ে থাকা ভাল। এটাই হল ফান্ডা।

মঞ্জুর বোধহয় চয়নবাবুর কথা খুব একটা ভাল লাগছিল না। মঞ্জু বারবার ভ্রু কোঁচকাচ্ছিল।

চয়ন বসু-র বয়স চল্লিশের মতো। মাথায় পনিটেল বাঁধা, গায়ে চকরাবকরা জামা।

চয়ন মঞ্জুকে দেখিয়ে অনিকেতকে বলল—ইনি কি আপনার খুব পরিচিত?

অনিকেত বলল, ছোটবেলার বান্ধবী।

—তা হলে ওঁকে সব বলা যায়। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়, কিন্তু বন্ধুর মতোই তো।

অনিকেত বলল, বন্ধুর মতোই কেন? বন্ধুই তো।

চয়ন বলল—তা হলে আমারও বন্ধুর মতোই। মঞ্জুকে বলল, জানেন কি ম্যাডাম, হোমো-সেক্সুয়ালদের ওই রোগ, মানে আপনার মতো যারা এটাকে রোগ ভাবছেন, সেটা সারানোর

জন্য ওদের প্রচুর টর্চার করা হয়েছে? ফ্রান্সের একদল ডাক্তারের দেখাদেখি ইউরোপের কিছু ডাক্তার ওদের হরমোন ইনজেকশন দিয়ে বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম করিয়েছে। বারবার। ভেবেছে, বারবার ওটা করিয়ে মেয়েদের দিকে আকর্ষণ ফিরিয়ে আনবে। ভাবুন তো, মন বলেও তো একটা কথা আছে। মন বড়, না হরমোন বড়? মন-ই বড়। মনই তো হরমোন-কে নিয়ন্ত্রণ করে। মনের অলিগলিতে ঢোকার সাধ্য কারও নেই।

—আপনার তো মন নিয়েই কারবার। আপনিও মনের খবর জানেন না?

চয়ন বলল—একটা গান আছে না ম্যাডাম, 'কোথাও আমার মনের খবর পাইলাম না...।' ব্যাপারটা তাই। সাইকোলজি পড়ে কতটাই বা জেনেছি?

মঞ্জু বলল, তা হলে আপনি কী করে বলছেন আমার ছেলে নর্মাল?

—ওই তো, আমার যেটুকু জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, তা দিয়েই বলছি। যুক্তি দিয়েই তো বলছি। অ্যাবনর্মাল ভেবে যা-যা চিকিৎসা করা হয়েছে, খুব একটা কাজ দেয়নি, সেটাই বলেছি। এমনি-এমনি যদি বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়, তো হল; কিংবা কিছুটা বুঝিয়ে। ওষুধপত্র দিয়ে, ইনজেকশন দিয়ে, শক দিয়ে—কিছু হয় না।

—তা হলে আধ্যাত্মিক লাইন-এ কিছু কাজ হয়? মঞ্জু কীরকম বেচারি-বেচারি মুখ করে জিগ্যেস করে।

—আধ্যাত্মিক মানে? তান্ত্রিকের কাছে নিয়ে যাবেন না কি?

—না, কবচ-মাদুলি তো করেছি। ও পরে না। বলছিলাম, যদি দীক্ষা-টিক্ষা দিয়ে দিই...।

চয়ন বেশ জোরে হেসে উঠল। অনিকেত হাসল না। হাসলে মঞ্জু ব্যথা পাবে। মঞ্জুর জন্য কেমন সহানুভূতি হচ্ছে ওর। চয়ন বলল—ম্যাডাম, অনেক সাধুটাধু আছেন, যাঁরা সমকামী। তবে ওটা অন্য ব্যাপার। ওঁরা ব্রহ্মচারী। ওঁরা না-পাওয়া থেকে করেন। ওঁরা ট্রান্সজেন্ডার নন। মানে, ওঁরা নারীসঙ্গ পান না বলে পুরুষের সঙ্গে মাঝেমধ্যে যৌনকর্ম করার চেষ্টা করেন। জেলখানার কয়েদিরাও করে। ওদের এই প্রসঙ্গে আনছি না। আপনার ছেলেটা, যা বুঝলাম, মনে-মনে মেয়ে, তাই বাইরেও মেয়ে হতে চাইছে, ছেলেদের সঙ্গ চাইছে। এ নিয়ে কেন এত চিন্তা-ভাবনা করছেন। দিনকাল পাল্টেছে। ভাল করে লেখাপড়া করুক, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক, বলছেন তো গান-বাজনাটা ভাল করে। ওদিকেই যাক না। বলছেন বাংলায় ভাল...

—কিন্তু ওকে যে সবাই টিটকিরি দেয়, স্কুলে টিচাররাও...

চয়ন বলল, এটার বিরুদ্ধেই তো লড়াই। স্কুলে যেতেই হবে ওকে। স্কুলে যাওয়ার সময় সাজগোজ করে ও?

—না। কিন্তু ওর ব্যাগে আয়না আর লিপস্টিক পেয়ে ওর টিচাররা ওকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

চয়ন একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

মঞ্জু বলল, জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলাম একবার ওর জন্মছক নিয়ে। জ্যোতিষী বলল, ওর শুক্র ডাউন, বৃহস্পতি খারাপ, মঙ্গল বক্রী আরও কী সব। একটা যজ্ঞ করতে বলেছিল, আর একটা কবচ দিয়েছিল। যজ্ঞটা করাইনি, অনেক খরচ। মাদুলি দিয়েছিলাম, পরেনি। বলেছিল তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিয়ে দিতে, বিয়ের পর নাকি ঠিক হয়ে যাবে। যদি জন্মের সময়ের দোষে, মানে গ্রহের দোষেই এরকম হয়, তা হলে তো ও কোনও দিনই ঠিক হবে না...।

অনিকেত বলল—রেডিও-র প্রোগ্রাম-টা শুনেই তো ছুটে এলি এখানে—তাই তো? ওখানে যে-ক'টা ছেলে ছিল—ওরা কি সবাই একই সময়ে জন্মেছিল? কেন এইসব ভাবছিস? ওই ছেলেগুলো তো সবাই যে যার মতো কাজ করছে। একজন মানুষ কী পোশাক পরছে, কেমন করে কথা বলছে, কার সঙ্গে মিশছে, এসব না-ভেবে দ্যাখ মানুষটা ভালমানুষ হতে পারছে কি না। একটা মানুষের পিছনে যদি ল্যাজও হয়, কিন্তু সেইসঙ্গে যদি সে ভালমানুষ হয়, অন্যের ক্ষতি না-করে, সমাজকে কিছু দেয়, তখন ল্যাজ থাকা না-থাকাটা কোনও ম্যাটার করে না। মঞ্জু কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকে। তারপর চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে খুব আস্তে-আস্তে বলে—শোন না, আমি না, ওর জাঙ্গিয়াটা চেক করি, চুপি-চুপি। দেখি, মাঝেমধ্যে নোংরাও হয়, মানে ওর আছে, হয়, মানে ও নপুংসক নয়। তা হলে কেন...

অনিকেত এবার একটু অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। বলে—উঃ। সেই ভ্যাজর-ভ্যাজর। নপুংসক বলে কিছু নেই। হিজড়েদেরও ওটা থাকে—যদি না কেটে ফ্যালে। মঞ্জু দু'হাতে চোখ ঢাকে। বলে, তবে কি আমার ছেলেটা হিজড়ে? হিজড়ে?—অ্যাঁ?—উঃ, পরিমল...!

আমি পরি। স্কুলের নাম পরিমল। হোক গে। আমার পরি নামটাই ভাল লাগে। ছোটবেলাতে তো সবাই পরি নামেই ডাকত। কোনও ছেলে পরি হয় না। সব পরি মেয়ে। জলপরি, ফুলপরি, মেঘপরি...। পরিরা নাচ জানে। গানও জানে। পরিরা উড়তে পারে। ফুলবাগানে নেমে যায়, বনে-জঙ্গলে, ঝরনার ধারে নেমে যায়। ডানা মেলে জোছনা রাত্তিরে চাঁদের আলো সারা গায়ে মেখে ওড়ে। মানুষ তো আর পরি হয় না কখনও, আমিও হতে পারব না। কিন্তু পরিদের কথা ভাবতে খুব ভাল লাগে। খুব যখন ছোট ছিলাম, দিদা পরিদের গল্প বলত। সেই থেকে স্বপ্নে আমি পরি হয়ে উড়ি। পরিদের মতো রত্নহার পরি, ফুলের গয়না পরি, ফুলবাগানে নাচি।

নাচতেও ভাল লাগে খুব। তাসাপার্টির নাচ নয়, ধুমধাড়াক্কা বিসর্জনের নাচও নয়। নাচ কি শুধু লাফানো-ঝাঁপানো নাকি? সুরে-সুরে শরীরটাকে মিশিয়ে দেওয়া। মেয়েরা নাচে। ছেলেদের নাচতে নেই। পাড়ায় যখন রবীন্দ্রজয়ন্তী হত, তখন আলোদি বলত, কে কী করবে বলো। আমি বলেছিলাম, আমি নাচব। আমি বাড়িতে একা একা নাচ প্র্যাকটিস করতাম। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে আয় আয় আয়', গানটার নাচ আমার খুব ভাল লাগে। ওই যে 'আয় আয় আয়' বলে হাতছানি দিয়ে ডাকা, ওটা দারুণ। 'ডালা যে তোর ভরেছে আজ পাকা ফসলে'—গানে শরীর যেভাবে কথা বলে, ওটা যেন ডালাটা ভরে ওঠা নয়। শরীরটা ভরে ওঠা। মেয়েরা যখন ডালা ভরে ওঠার কথা বলে, তখন কী সুন্দর মানিয়ে যায়, কারণ মেয়েরা বড় হলে যে ওদের শরীরটা ভরে ওঠে। কী সুন্দর হয়ে যায় বুক দু'টো। আমার কেবল মনে হত, এখনও হয়, যেন জোড়া ফুল। আমার বুকটা যদি ওরকম ভরাট আর ভরন্ত হয়ে যেত, তা হলে কত ভাল হত। ওরকম ফুলের মতো বুকের মাঝখানে বোঁটাটা। গলায় হার পরলে, দুই বুকের

মাঝখানে হারের লকেটটা ঝুলবে। যেখানে দু'টো স্তন তাদের আলাদা-আলাদা রূপ পেয়েছে, সেই জায়গাটাকে ক্লিভেজ বলে। নামটাও সুন্দর, দেখতেও সুন্দর। আমার চোখেই এত সুন্দর লাগে, তবে তো ছেলেদের চোখে আরও সুন্দর লাগবে। সুন্দরী মেয়েদের দেখলে আমার কেমন যেন একটা হিংসে হয়। মাইরি বলছি। মান্না দে-র ওই গানটা মনে পড়ে। 'ও কেন এত সুন্দরী হল...।' আমি কেন হলাম না?

খুব ছোট ছিলাম যখন, দিদা কত গল্প বলত। পরিদের, রাজা-রানিদের, রাজকন্যা-রাজপুত্তুরদের। আমার হাতে ঢাল-তরোয়াল নিয়ে রাজপুত্তুর হয়ে যুদ্ধ করতে ইচ্ছে করত না একদম। বরং রাজকন্যা হয়ে, হাতে মালা নিয়ে, স্বয়ংবর সভায় রাজপুত্র বরণ করতে ইচ্ছে করত। কাজল-পরা চোখে বেশ লজ্জা-লজ্জা ভাব। রাজপুত্তুরের দিকে একটু করে তাকাচ্ছি, আবার একটু করে চোখ নামিয়ে নিচ্ছি। সখিরা সব দেখছে। রাজপুত্তুরদের জিম-করা বডি। না না, জিম নয়, তির-ধনুক ছুড়ত, মুগুর ভাঁজত, তাতেও তো মাস্‌ল ভাল হয়। ছেলেদের মাস্‌লওলা বডি দেখতে দারুণ লাগে। আমার বাবার চেহারাটা একদম বাজে ছিল। কাঁধটা চওড়া ছিল না। বুকে কোনও খাঁজ নেই, অল্প কয়েকগাছি লোম, তার মধ্যে আবার ভুঁড়ি। একদম বাজে দেখতে লাগত। তার চেয়ে ভাল লাগত—বরুণকাকুকে। আমরা একবার পুরী গিয়েছিলাম। আমি তখন অনেক ছোট। আমি, বাবা, মা, বরুণকাকু, কাকিমা। সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছিলাম। বাবার হাত ধরে স্নান করছিলাম। সমুদ্রের ঢেউ এলে লাফাতাম। বেশ মজা লাগত। বাবা একবার আমার হাত ছেড়ে কাকিমার হাত ধরল। তখন একটা ঢেউ আমাকে ধাক্কা দিল। আমি পড়ে গেলাম। ঢেউটা টেনে নিয়ে গেল, বালিতে আছাড় দিতে লাগল। দু'হাত তুলে বাবাকে ডাকতে চেষ্টা করলাম, নুনজল পেটে ঢুকে গেল। কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছি। মনে হচ্ছিল, মরে যাব। তখন কে একজন আমাকে টেনে তুলল। সে আমাকে জড়িয়ে ধরল বুকে। সে একজন নুলিয়া। তার কালো শরীরে লেপ্টে রইলাম। যেন জীবনের সঙ্গে লেপ্টে রইলাম। নুলিয়াটা আমাকে পাড়ে এনে দিল। ততক্ষণে আমার মা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি নুলিয়াকাকুকে ছাড়তে চাইছিলাম না। তার শক্ত, কালো শরীরে সেঁটে থাকতে ইচ্ছে করছিল। সেই থেকে কালো শরীরের মধ্যে যেন জীবন পাই। মনে হয়, শক্তপোক্ত শরীরের মধ্যেই জীবন থাকে। শক্তি থাকে। যাকে বলে—পৌরুষ। মেয়েদের থলোথলো নরম শরীর দেখতে ভাল, কিন্তু ওই শরীরে লেপ্টে থাকতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, আমি যেন কোনও শক্ত শরীরে সমর্পণ করি।

খুব ছোট ছিলাম যখন, দিদিমা-র রূপকথার গল্পে আশ্চর্য পুকুরের গল্প শুনতাম। ওই পুকুরে ঠিকমতো মন্ত্র পড়ে স্নান করলে কুরূপা-রা রূপসী হয়ে যায়। আমি স্বপ্নে কতদিন স্নান করেছি, স্নান করে পাল্টে গিয়েছি। আমার নুনুটা খসে গিয়েছে। বুকে গোল-গোল পেয়ারার মতো দু'টো ফল হয়েছে। আর পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকত রাজপুত্র। সে আমাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যেত। রাজপুরীর ভিতরে আমাকে সোনার পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে রত্নহার পরিয়ে দিত, আর খুব আদর করত। অত ছোটবেলায় কি কেউ সেক্স-টেক্স বোঝে? আমিও বুঝতাম না। তবু সেই স্বপ্নের আদর আমার খুব ভাল লাগত। তারপর পুরী থেকে বাড়ি ফিরে, সেই রূপকথার পুকুরের স্বপ্ন দেখেছি আরও বহুবার। পুকুরে ডুব দিতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছি। আর আমাকে উদ্ধার করছে নুলিয়াপুরুষ। সেই নুলিয়াপুরুষ। আমি মেয়ে হয়ে গিয়েছি। নুলিয়াদের বস্তিতে গিয়ে

আমি মাছ রান্না করছি। মশলা বাটছি। একটা বাচ্চা কাঁদছে, ওকে আমি মাই খাওয়াচ্ছি। আমি পা ছড়িয়ে বসে আছি বাইরে, আর নুলিয়াপুরুষটি আমার মাথার উকুন বেছে দিচ্ছে পিছনে বসে। ও আমার পিছনে, সমুদ্দুরের হাওয়ায় সমুদ্দুরের গন্ধ, তার মধ্যে মিশেছে শুকনো মাছের গন্ধ, তার মধ্যে ওই নুলিয়াপুরুষের ঘামের গন্ধ। সব কিছু মিলে জীবনের গন্ধ। জীবনটা বড় ছেনাল মাইরি, আমি প্যাঁচড়া জীবন ছ্যাঁচড়া জীবনের কথা বলছি না, জীবন ধাড়া, ধন ধরে দাঁড়া—সে জীবন নয়, আমি এই জন্ম-এক্কাদোক্কা-ভেলপুরি-ফুচকা জীবনের কথা বলছি, এই ধুরানি-মারানি-বিলুয়া-বাট্টু ইলাবিলা জীবনের কথা বলছি, ওয়ান প্লাস ওয়ান জীবন মানে ম্যাদামারা জীবন, প্লাস কলকলানো জীবন মিলে যা হয়, সেই জীবনের কথা বলছি, মানে বলতে চাইছি, ওই যে একটা গান আছে না, ওরে জীবন রে...তুই ছাইড়া গেলে আমি সোহাগ করমু কারে...। জীবনকে বলি আয়, আয়, আয়রে, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় আয়—ডাকি আঙুলের ইশারায়। কিন্তু জীবন আসে না, লুকোচুরি খ্যালে। কখনও আসে, টুকি দিয়ে চলে যায়। টু-উ-উ-কি, টু-উ-উ-কি, মানে সে আছে, কোথাও আছে, আশেপাশেই আছে, ওকে খুঁজে বার করতে হবে। খুঁজতে গিয়েই তো ঝামেলা। ভুপেন হাজারিকা-র ওই গানটার কথা মনে পড়ে মাঝে-মাঝে, হাসি নিয়ে আয় রে বাঁশি নিয়ে আয়...জীবন খুঁজি আয়। কোথায় খুঁজব মাইরি? ল-সা-গু গ-সা-গু-র ভিতরে কি জীবন থাকে? সুদ কষার ভিতরে, ঐকিক নিয়মের মধ্যে কি জীবন থাকে? জীবনটা কি তৈলাক্ত বাঁশ? যেখানে মিনিটে সাত ইঞ্চি উঠলে পরের মিনিটে পাঁচ ইঞ্চি পড়ে যেতে হয়? কে জানে শালা যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের মানুষের সঙ্গে তার হয়নাকো দেখা...। জীবনানন্দের বই কিনে এনেছিলাম বলে মা খুব বকেছিল। বলেছিল, কেন এসব বই আনিস, এই পয়সা দিয়ে একের ভিতর তিন আনতে পারিস না? ব্যাকরণ, ভাব সম্প্রসারণ ও প্রবন্ধ রচনা। ইজি লেটার রাইটিং আনতে পারিস না। মা তো ওরকমই বলে। সব সময় মায়ের কথা শুনতে ভাল লাগে না। শুনিও না। মায়ের পয়সা চুরি করি। বেশ করি। জীবনানন্দ-র 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কিনেছিলাম। কবিতাগুলো বুঝি না। কিন্তু কতগুলো কথা পড়ে কীরকম গা শিরশির করে। 'আরও এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে'—এই লাইনটা পড়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। পড়েছিলাম—

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো দুধে আর্দ্র
কবেকার শঙ্খিনীমালার;

নিজেকে কেন যেন শঙ্খিনীমালা মনে হয়েছিল। করুণ শঙ্খের মতো স্তন যদিও আমার নেই। যেটুকু আছে, সেটা ভিখিরির হাতের মতো করুণ। কিন্তু শঙ্খিনীমালা বা শঙ্খমালার চোখে তো গত শতাব্দীর নীল অন্ধকার। জীবন খুঁজতে গিয়ে খোঁড়ানো লোকের চোখের হতাশার অন্ধকার। নিজের কাছেও বাতেলার মতো লাগছে। এই বয়সে গত শতাব্দীর নীল অন্ধকার? সবে তো ষোলো বছর প্লাস। একটা কবিতা লিখেছিলাম :

নাকের নীচে গোঁফের চিহ্ন

জানিয়ে দিচ্ছে অপরাহ্ণ
কম্ম সারো তাড়াতাড়ি
বুকের মধ্যে সকালসন্ধে ঢাকের বাড়ি।

গোঁফ-দাড়ি ওঠা মানেই তো পুরো পুরুষ হয়ে গেলাম। ব্যাটাছেলে হয়ে গেলাম। আমি ব্যাটাছেলে। ব্যাটাছেলেদের যা-যা করা উচিত বলে মনে করে আমার মা, স্যারেরা, ব্যাটাছেলে-বন্ধুরা, তাই যদি না-করি—তা হলে আমি ভেড়ুয়া, আমি যাচ্ছেতাই। কিন্তু গোঁফ-দাড়ি ঠেকাব কী করে, ওটা তো হবেই। জীবনবিজ্ঞান বইয়ে পড়েছি পুরুষ-ময়ূরের পেখম হয়। পুরুষ-মুরগিদের ঝুঁটি হয়। আমারও গোঁফ হল নাকের তলায়। এখানে-ওখানে চুল গজাল, যেখানে আগে ছিল না। একদিন আয়নায় দেখলাম নিজেকে, সব খুলে, পুরোপুরি। আয়নায় যেন অন্য কেউ। আমি নই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। ওই লোকটাকে বেশ ভাল লাগল আমার। শুধু নাকের তলায় গোঁফের চিহ্ন-ই নয়, পেটের তলাতেও। উঠছিল বুঝেছিলাম, জানি ওঠে, দেখেওছিলাম অন্য পুরুষের। কিন্তু আমারও?—না, আমি না, আমি না, আয়নার ওপাশে যে—সে অন্য কেউ। পেটের তলায় ঝুলে পড়া অঙ্গটা ক্রমশ আকৃতি পাল্টাতে থাকল। রং-ও পাল্টাল। বেদনার গাঢ় রসে লাল হল, বেদানা নয়, বেদনা, বেদনা। অঙ্গটা উঁচিয়ে রইল আমার দিকে, আঙুল উঁচিয়ে যেমন অপরাধীকে দেখায় পুলিশ, সেরকম ভাবেই। আমি আয়নায় ওর মুখ চেপে ধরলাম, আড়াল করলাম, ও তখন অন্য কেউ। একটা পুরুষ। একটা লিকম্‌দার। আর আমি পরি। আমার ওকে খুব ভাল লাগতে লাগল। আমি ওর দিকে এগিয়ে গেলাম, জড়িয়ে ধরতে যাব, আয়নায় লেগে গেল। আমার সঙ্গে ওর লেগে গেল। তখন বুঝলাম। সত্য মিথ্যা-বাস্তব-মায়া, কায়া-ছায়া কোথাও কেমন একাকার হয়ে যায়। আমি আমার জেগে যাওয়া লিঙ্গটাকে লুকোবার চেষ্টা করলাম। দুই উরুর খাঁজে ঢুকিয়ে দিলাম। এইতো, মেয়েদের মত। ওইতো কৃষ্ণত্রিভুজ। ছিঃ, মা ঢুকেছে ঘরে। কেন যে ঘরের দরজাটা বন্ধ করিনি? তক্ষুনি আবার সোজা দাঁড়ালাম, তখনো ওটা উত্থিত।

ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখল মা। ঢুকেই বেরিয়ে গেল। আমি ধড়াচুড়ো পরে নিলাম। ব্যাটাছেলের পোশাক। সালোয়ার-কামিজ পরে তো আর রাস্তায় বেরতে পারি না। কিন্তু আয়নার ভিতরে যাকে দেখলাম—যে মায়া ব্যাটাছেলেটার জন্য আমার মধ্যে ঝুমঝুমি বাজানো, সেও কি আমি? ছিঃ!

মা কিন্তু কোনও রাগ দেখাল না সেদিন, মা বোধহয় আমার ব্যাটাছেলের লক্ষণ দেখে খুশি হয়েছিল মনে-মনে। ঘরের বাইরে থেকে বলেছিল, কী রে, হয়েছে? যেন আমি বাথরুমে আছি। মা ঘরে ঢুকেছিল, যেন একটু-একটু হাসি লেগেছিল মুখে, মেঘের শরীরে যেমন চাঁদের আলো লেগে থাকে চাঁদ-ভাসা রাতে, মায়ের মুখে যেন একটু-একটু লজ্জাও লেগেছিল। মিষ্টি লজ্জা। মা কি একটু আঁচল চাপা দিয়েছিল মুখে? আঁচল কী করে হবে? মা তো সেদিন সালোয়ার-কামিজ পরেছিল। হয়তো একটু ওড়না চাপা দিয়েছিল মুখে। ওড়নাকে আঁচলই বলতে ইচ্ছে করে আমার। বুকের কাপড় হাওয়ায় উড়াইয়া লইয়া যায়—কী সুন্দর যে গানটা। রবীন্দ্রনাথ কেন মুখের আঁচলখানি করলেন? ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো আমার মুখের আঁচলখানি ধরা থাকে না হায় গো, তারে রাখতে নারি টানি/আমার রইল না লাজ লজ্জা/আমার ঘুচলো গো সাজ সজ্জা...। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ওটা বুকের আঁচল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখলেন মুখের আঁচল। শুনে

মনে হয়েছিল ভুল গাইছে, বাড়িতে তো 'গীতবিতান' আছে, খুলে দেখেছিলাম ওটা 'মুখের আঁচল'-ই লেখা আছে। কে জানে, লিখতে গিয়ে কলমের মনে হয়েছিল কিনা মুখ বুকের চেয়ে ভাল...।

মায়ের 'গীতবিতান'-টা এখন এমনি-এমনি। হারমোনিয়াম-টাও এমনি-এমনি। আগে মা গান গাইত। আমি মায়ের পাশে চুপটি করে বসে গান শুনতাম। আমি মায়ের গানের সঙ্গে নাকি তাল দিতাম। মা আমাকে সা রে গা মা শিখিয়েছিল। হারমোনিয়াম বাজানো শিখিয়েছিল। এখন হারমোনিয়ামের বেলোটা ফুটো। মা কেটে ফুটো করে দিয়েছে। আমি গান গাইতাম বলে, মানে, বেশি গাইতাম বলে, না কি গান ভালবাসি বলে মা বলেছিল, গান গাইতে হবে না মেয়েদের মতো। আমি বলেছিলাম হেমন্ত মুখার্জি, কিশোরকুমার—এঁরা কি সব মেয়ে? ভুপেন হাজারিকা কি মেয়ে? মা বলেছিল হেমন্ত-মান্না-কিশোরদের সঙ্গে তুই নিজের তুলনা করছিস? ওঁরা কি তোর মতো হাত ঘুরিয়ে কথা বলেন নাকি? আমি বলেছিলাম, বেশ করব গান গাইব, বলে হারমোনিয়ামটা বাজাতে শুরু করেছিলাম। মা বলেছিল, ও বাব্বা, মেয়েলিপনা করলে কী হবে, জেদ দেখাচ্ছে, জেদ, দেখাচ্ছি তোর গান করা, বলেই একটা বঁটি নিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। ভাবলাম, বঁটিটা দিয়ে আমাকেই মারবে বোধহয়, মারো, মারো, এমনি করেই আমায় মারো। কিন্তু হারমনিয়ামের বেলো-টার ওপর কোপ বসিয়ে দিল। এখন হারমনিয়ামটার বেলো টিপলে দীর্ঘশ্বাসের মতো বাতাস বেরয়, শুয়ে-থাকা রুগ্ণ ভিখিরির মতো কীরকম কাতর শব্দ, অসহায় ফ্যাসফ্যাসে আর্তনাদ করে। হারমোনিয়ামের কোনও দোষ ছিল না তো, যত দোষ—সে তো আমার। আমার তো অনেক দোষ। আমি কেন ক্রিকেট খেলতে যাই না? পাড়ায় তো ক্রিকেট খেলা হয়। যেতাম, ছোটবেলায় তো যেতাম। যখন ফিল্ডিং করার সময়—আমার পায়ের ফাঁক দিয়ে বল গলে যেত, ওরা বলত তোর ক্রিকেট খেলা হবে না, রান্নাবাটি খ্যালো গে, যাও। বলত, এক্কাদোক্কা খ্যালো গে যাও। রান্নাবাটি কার সঙ্গে খেলব? আমার কি বোন আছে? মামাতো বোন আছে, মামার বাড়িতে তো যাই মাঝে-মাঝে, মামাতো বোন দু'টো রান্নাবাটি খ্যালে না, ওদের বাড়িতে একটা কাজের বউ আছে, ওর মেয়ের নাম ফুলি। ফুলি রান্নাবাটি খেলত, একা-একা। বালি দিয়ে ভাত করত, আমাকে দিত, বলত গরম, ফুঁ দিয়ে খাও। তাই করতাম। পেঁপের কালো-কালো বিচি দিয়ে ডালনা করে দিত। মিছিমিছি খেতাম। একদিন ফুলিকে বললাম, ফুলি, আজ আমি রান্না করি, তুই খা, কেমন? আমি ডাল বসালাম। গুঁড়ো মাটির ডাল। অদৃশ্য কাউকে বললাম—কী যে ডাল আনো, সেদ্ধ হয় না, একটু দেখেশুনে না আনলে কি হয়? ওপাশ থেকে অদৃশ্যকণ্ঠে শুনতে পেলাম, তুমি পারো না? তুমি আনো গে যাও...। সবই তো পারো। এরকম কত-কত কথা বলি। ইশ, লজ্জা করে না, স্নান করার সময় লুকিয়ে দেখছ?...স্নান করার সময় অদৃশ্য কাউকে বলি। তুমি রোজ-রোজ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকো কেন? স্কুলে যাওয়ার পথে অদৃশ্য কাউকে বলি, না, দরজা খুলব না—যাও...। অভিমান করে অদৃশ্য কাউকে বলি। সাবানকেও তো বলি, গলে যা, মিশে যা আমার সারা গায়ে...। আমার গায়ের গন্ধ হয়ে তুই মিশে যা, সাবান সোনা...। সাবান কী লিঙ্গ গো? ক্লীবলিঙ্গ? উঁ-হু...। পুংলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ।

সেভেন-এইট'এ হিন্দি ছিল স্কুলে। হিন্দির লিঙ্গ-টিঙ্গগুলো ভারি ইয়ে...। দোয়াত পুংলিঙ্গ, কলম স্ত্রীলিঙ্গ। তালা স্ত্রীলিঙ্গ, চাবি পুংলিঙ্গ। যা কিছু গ্রহণ করে, সব স্ত্রীলিঙ্গ। বোতাম যদি

পুংলিঙ্গ হয়, বোতামের ঘর স্ত্রীলিঙ্গ। পরিমল তো পুংলিঙ্গ। পরি কী লিঙ্গ তবে? পরি আর পরিমল নিয়েই তো আমি। আমি কী লিঙ্গ? আমাকে তো পাড়ার অনেকে কী সব বলে। হিজড়েও বলে। হিজড়েদের ভালকথায় 'ক্লীব' বলে। আমি কি ক্লীব লিঙ্গ? এসব কথা ব্যাকরণে থাকে না।

আমাকে কেউ ভালবাসে না। মা-ও না, বাবাও না। বাবাকে কতদিন দেখিনি। সেই লাস্ট দেখেছিলাম চার বছর আগে। আমার ব্রেন ম্যালেরিয়া হয়েছিল। বাবাকে দেখেছিলাম হাসপাতালে। কীরকম আবছায়ার মধ্যে, কীরকম যেন বরিক পাউডার মাখা কুয়াশার' মধ্যে বাবার গলার স্বর শুনেছিলাম : এবার আমায় রেহাই দাও। বাবা বোধহয় মাকেই বলেছিল কথাটা। আমার শরীরে তখন নুনজল ঢুকছিল, নুনজল। আর দেখিনি বাবাকে। ছোট্টবেলায় বাবার ঘাড়ে চড়ে ঠাকুর দেখতে যেতাম। দুগ্গাঠাকুর। বাবা বেলুন কিনে দিত। বাবা আমায় মিলিটারি জামা কিনে দিয়েছিল আর একটু বড় হলে। একটা বন্দুকও দিয়েছিল। বন্দুক নয়, মেশিনগান। ওটা টিপলেই টরটর টরটর করে শব্দ হত, আর লাল রঙের আলো জ্বলত। বিল্টুর সঙ্গে ওটা আমি এক্সচেঞ্জ করে নিয়েছিলাম। বিল্টু আমাদের পাড়ার ছেলে। বিল্টুর মা ওর মায়ের সঙ্গে আমাদের বাড়ি আসত। বিল্টু একটা ডিম-পাড়া মুরগি নিয়ে এসেছিল। একটু চেপে দিলেই ডানা দু'টো উঠে যেত, আর একটা ডিম পেড়ে দিত। খুব মজার। আমি বিল্টুকে বলেছিলাম আমার বন্দুক তুই নে, আর তোর মুরগিটা আমায় দে। বিল্টু রাজি হয়েছিল।

বাবা খুব বকেছিল, মা-কেও। বলেছিল, বন্দুকটার কত দাম, আর মুরগিটা তো সস্তা। ওরা আমার ছেলেকে মুরগি করে চলে গেল, ছিঃ, বুদ্ধু, বোকা। শুধু 'বোকা' বলেনি, ওর সঙ্গে আরও দু'টো অক্ষর। বাবা খুব মুখখিস্তি করত। মা-কে। আমাকেও। তখন তো খিস্তিগুলোর মানে বুঝতাম না; আর কোন কথাটা খিস্তি নয়, কোন কথাটা খিস্তি—সেটাও বুঝতাম না। মা যখন বাবাকে 'মাতাল' বলত, বুঝতাম ওটা খারাপ কথা। কিন্তু গানের মধ্যে যখন থাকে 'বসন্তের এই মাতাল সমীরণে', তখন তো 'মাতাল' শব্দটাকে খিস্তি মনে হয় না। বাবা বলত মা-কে, আমি আর পারব না, যাও মারিয়ে রোজগার করোগে। মা তখন বলতো ঘেন্না করে তোমায়। অথচ শুকনো পাতা মাড়িয়ে যাওয়া কী সুন্দর লাগে। ও, মাড়ানো তো ড-য় শূন্য ড়। হ্যাঁ, মারানো মানে আমি পরে বুঝেছি। মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া হত খুব। মা বলত, তাই বলে তুমি ঘরের বউ ছেড়ে অন্য মেয়েছেলের সঙ্গে যা-তা করবে? বাবা বলত, বেশ করব। শীত লাগলে কেউ বরফ ঘষে না গায়ে, আগুনের পাশে যায়। মা বলত, ওই আগুন তোমাকে পুড়িয়ে বেগুনপোড়া করে দিয়েছে, বেগুনপোড়া কোথাকার...। তার মানে 'বেগুনপোড়া' একটা খিস্তি। বাবা বলেছিল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, জানা আছে সব...বুড়োমারানি কোথাকার। 'বুড়োমারানি' তার মানে একটা খিস্তি। মা বলেছিল—আমি তোমাকে সব কথা বলেছিলাম, সব উজাড় করে বলেছিলাম বলে, বিশ্বাস করেছিলাম বলে—একথা বলতে পারছ। তুমি সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখোনি। তুমি নিজে গোপন কারবার চালিয়ে গিয়েছ। বাবা তখন খিস্তি দিয়েছিল। আমি অনেক খিস্তি জানি এখন, মাঝে-মাঝে বলি, না-বললে আমার এখনকার বন্ধুরা রাগ করে। কিন্তু ছোটবেলায় খিস্তিগুলো তো বাবার কাছ থেকেই শিখেছি। মদের গন্ধটা, সেটাও তো বাবার কাছেই। এইভাবেই ষোলো বছর বয়স হয়ে গেল আমার। বাপ নেই, মা আছে হাফ। স্কুলে প্যাঁক, কোনও ঝিনচ্যাক নেই কোথাও, তবুও শালা মশাগুলো সঙ্ঘারামে জেগে থাকে জীবনের

স্রোত ভালবেসে। সঙ্ঘারাম ব্যাপারটা কী? ইতিহাসে কোথাও যেন কথাটা ছিল। যে কোনও সময়ে মশাকে কেউ চেপ্টে মেরে দিতে পারে, তবু মশা জেগে থাকে। আমিও মশার মতো।

পরীক্ষাটা তো দিতে হবে। পরীক্ষা এসে গেল। পাসটা করে যাব ঠিকই, ফেল করা খুব শক্ত। সায়েন্স নিয়ে হার্গিস পড়ব না। মা এখন আর কিছু বলবে না। হাল ছেড়ে দিয়েছে।

আমায় নিয়ে মায়ের বড় জ্বালা। কতবার ভেবেছি বাবলু-পিন্টুদের মতো, শেখর-অরিন্দমদের মতো হব। মায়ের ইচ্ছে আর আমার ইচ্ছে মেলাতে পারি না। জ্যোতিষীর কাছে নিয়ে গিয়েছে মা, সাইকোলজিস্ট-এর কাছেও। মামাতো ভাইরাও কত কী বলেছে। একটা বাজে বই পড়তে দিয়েছিল শেখরদা। জিম-এ নিয়ে গিয়েছিল। বডি বিল্ডিং দেখাচ্ছিল, বলেছিল তুইও এরকম কর। ব্যাটাছেলে হ। ফোর প্যাক, সিক্স প্যাক...। ওদের দেখে আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু ওই সব ফোর প্যাক, সিক্স প্যাকের চেয়ে আমার শরীরে দু'টো আপেল কামনা করেছিলাম আমি। জিমে-দেখা ছেলেদের নিয়ে একটা পদ্যও লিখেছিলাম। ভাল হয়নি জানি, 'প্রবর্তক'-এ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ওরা ওরকমই চায়। ওরা ছেপেছিল। বইটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। মা একদিন দেখেছিল, পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলেছিল। আবার আর একটা পাঠিয়েছিলাম, সেদিন ছাপা হল। কবিতাটার নাম 'ইচ্ছে'। ওটা পদ্য নয়, কবিতা। পদ্য আর কবিতার তফাত কী জিগ্যেস করলে কিন্তু গুছিয়ে বলতে পারব না আমি।

লিখেছিলাম—

এখন যদিও পচা ভাদর
জড়িয়েছি তবু কালচে চাদর
আড়াল করেছি, আড়াল করেছি ইচ্ছে
অসহায় তাপে ঘামছি যদিও
শুকিয়ে যাচ্ছে বহতা নদীও
প্রাণটা তবুও প্রাণের আরাম নিচ্ছে...।

আরও ছ'লাইন আছে। অরূপ বলেছিল, ভাল হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে।

অরূপকে এখন আর অরূপদা বলি না। ওকে নাম ধরে ডাকি। ও আমাকে 'তুই' ডাকে, আমি ওকে 'তুমি'। ও আমাকে আদর করে, আমিও ওকে চুমি। আমি লিখেছিলাম 'অরূপ দাদা অরূপ দাদা তোমার বাড়ি যাব, অরূপ দাদা অরূপ দাদা তোমায় চুমু খাব', যেন একটা সারপ্রাইজ, খামে ভরে দিয়েছিলাম। লাস্টে লিখেছিলাম, কেমন হবে আমিও যদি খারাপ ছেলে হই? কিন্তু কয়েকবার ভেবে 'ছেলে' কেটে মেয়ে-ই করে দিলাম। অরূপদা বলেছিল, হেব্বি হয়েছে, আমাকে একটা ভাল জিনিস কিনে দিয়েছিল। লোম তোলার লোশন। অরূপদা-ই তো আমাকে 'প্রবর্তক' পত্রিকা এনে দিল। ওখানে লেখা পাঠালাম, ছাপা হয়ে গেল। অরূপদা বলেছে আবার পাঠিয়ে দে। ওটা তো সমকামীদের কাগজ। আমিও তাই, তাই ওরা সব ওই ধরনের লেখাই ছাপে। আমি কেন ওখানেই লেখা পাঠাব শুধু? আর ওই লেখাই বা লিখতে যাব কেন শুধু? সবরকম লিখব। আমার মায়ের কষ্টের কথা লিখব। আমায় নিয়েই মায়ের কষ্টটা যদিও বেশি—সেটাই লিখব। আকাশ ভরা সূর্য তারার কথা, উল্টো হয়ে পড়ে থাকা শিউলি ফুলের ব্যথা, শান-বাঁধানো ফুটপাথের কাঠখোট্টা গাছ কচিপাতায় পাঁজর ফাটিয়ে হাসে—বাসগুলো সব গাড়লের মতো কাশে—সবই তো লিখতে মন চায়। শুকনো ঘাস,

ভিজিয়ে দিচ্ছে আষাঢ় মাস; এক মা-পাখি, ঘর বাঁধার খড় খোঁজে একাকী; একটা লোক, চেটেপুটে খায় সকল শোক; রাস্তার জমা জলে, কবিতা থাকে কৌতূহলে। লিখব। লিখব। ওগো অরূপ সোনার ছেলে, কবিতা লিখব তোমায় পেলে...।

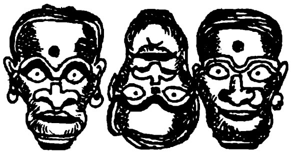

ওদের লজ্জাই করছিল গঙ্গার ধারে এভাবে হাঁটতে। একটা নৌকোওলা চোখ মেরে ডাকল 'আইয়ে-আইয়ে'। অন্য একটা লোক অনিকেতের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল— 'নৌকো নিন না, পরদা ফেলা যায়...।' অনিকেত বুঝতে পারছিল না ওরা কী করে বুঝতে পারছে মঞ্জু পরস্ত্রী। নিজের বউ সঙ্গে করে যারা একটু হাওয়া খেতে আসে, ওদের নিশ্চয়ই এরকম ফিসফিস করে কেউ বলে না—পরদা ফেলা যায়...। তা হলে? ওদের কি কোনও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আছে? না কি এই বয়সের দম্পতিরা এখন আর গঙ্গার ধারে আসে না, এলে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আসে, কিংবা দল বেঁধে। ফুচকা খায়, আইসক্রিম খায়, ভেলপুরি খায়। সূর্যাস্ত দ্যাখে। এখন শীতকাল। অনেক গাছের পাতা ঝরে গিয়েছে। গঙ্গার জল লাল, কারণ সূর্য নেমে এসেছে ওপারের চিমনি-টিমনিগুলোর কাছে। মিহি কুয়াশার আস্তরণ পড়েছে জলের ওপর। 'শরীর খুব খারাপ, পাতলা হাগচি...। আমারও খুব অম্বল'...কারা বলছে? খড় বেরিয়ে যাওয়া দু'টো শেতলা মূর্তির পাশে দাঁড়ানো তিনটি নারী সুখ-দুঃখের কথা বলছে। তিন দেবীয়াঁ। ওরা ভাড়া খাটে। এখান থেকে ওদের তোলা যায়। তুলে, নৌকোয় নিয়ে যাওয়া যায়। মঞ্জুকে কি ওরা এরকম ভাবল নাকি? হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় অনিকেত। মঞ্জুর মুখের দিকে তাকায়।

মঞ্জু হালকা মতো হেসেই, হাসিটা ফিরিয়ে নেয়। বলে, কী দেখছিস ডাবুদা?

অনিকেত কি বলতে পারে ও দেখছিল—মঞ্জুকে বাজারের মেয়েদের মতো দেখায় কি না। বলা যায়?

অনিকেত বলছিল...তোকে...।

আ-হ্-হা...। মঞ্জু বলল। 'আ' বলার মধ্যে কিছুটা আহ্লাদ মিশল।

এরকম হয় না। মঞ্জুকে যেটুকু দেখেছে অনিকেত, উচ্ছ্বাসহীন, ছায়া-লেপ্টে-থাকা অন্ধকার একটা মুখ। মুখের মধ্যে কোনও জোয়ার-ভাঁটা খেলে না, শুধু শীত। বসন্ত নেই।

মঞ্জু অনিকেতের হাতে ছোট্ট একটা চিমটি কেটে বলল : ঢ-অ-ং।

একটা হাসির হুল্লোড় শুনল। ওই তিন নারীর নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই ওদের দেখে নয়, অন্য কারণ।

মঞ্জু বলল, ঝালমুড়ি খাওয়াবি, ঝালমুড়ি?

ঝালমুড়ি আবার খাওয়ানো কী? এ তো ছোটবেলার কথা। আলুকাবলি খাওয়া, ঘুগনি খাওয়া না মাইরি...। এখন কেউ কাউকে 'খাওয়ানো' বলতে স্কচ, বিয়ার, বড়জোর বিরিয়ানি খাওয়ানোর জন্য অনুরোধ করতে পারে। চা-রোল-ঘুগনি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বলা হয়—চল একটু

চা খাই, বা ঘুগনি খাই। কে খাওয়াবে, মানে কে পয়সা দেবে ওটা ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না।

ঝালমুড়িওলা টিনের কৌটোয় মুড়ির সঙ্গে বাদাম, পিঁয়াজ, মশলাপাতি মিশিয়ে জিগ্যেস করল, লংকা?

—মঞ্জু বলল, দাও, বেশি করে। শশা দিও না।

ঝালমুড়িওলা টিনের কৌটোয় চামচ দিয়ে মুড়ির সঙ্গে মশলাপাতি জড়িয়ে নিচ্ছিল, ঠনঠনাঠন শব্দে বেজে উঠছিল পুরনো দিন, ছেলেবেলা। নাগরদোলা, নস্কর মাঠের মেলা, চোর-চোর খেলা, ওরা ঝালমুড়ি খেতে-খেতে হাঁটছিল। মঞ্জুর মুখে লালচে আভা। সূর্যাস্তের রং, না কি লংকার কারণে? অনিকেত বলল—চ' কোথাও বসি।

ঠিকঠাক বসার জায়গা পাচ্ছিল না। কংক্রিটের বেঞ্চিগুলোয় কমবয়সি ছেলেমেয়েরা জড়াজড়ি করে বসে আছে। এক জায়গায় দেখল একজোড়া বুড়োবুড়ি বসে আছে। ওরা চাদরে-মাফলারে জড়ানো। পাশে কিছুটা জায়গা আছে। ওখানেই ওরা বসে পড়ল। ওরাও তো প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। অনিকেত তেতাল্লিশ, মঞ্জু চল্লিশ-একচল্লিশ মতো হবেই। শাস্ত্রবচন অনুসারে, ষোলো থেকে তিরিশ পর্যন্ত মেয়েরা তরুণী। তিরিশ থেকে পঞ্চাশ প্রৌঢ়া। অনিকেত কি তেতাল্লিশেই প্রৌঢ়? কোনও বাস ওকে ধাক্কা দিলে কি লেখা হবে, পথ দুর্ঘটনায় প্রৌঢ়ের মৃত্যু?

ভদ্রমহিলা খবরের কাগজ পড়ে ভদ্রলোককে শোনাচ্ছেন। ভদ্রলোকটির চোখে মোটা কাচের চশমা। ভদ্রমহিলা বললেন, ডায়না বলেছে—একসঙ্গে থাকা অসম্ভব। ডিভোর্সের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে। বুঝলে? ভদ্রলোক কানের ছিপিটা চেপে ধরে বললেন, আবার বলো। ভদ্রমহিলা আবার বললেন একই কথা। ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, আমাদের ক'বছর হল গো। তিপ্পান্ন। তিপ্পান্ন বছর একসঙ্গে...।

ভদ্রমহিলা মাফলারটা জড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোকের গলায়। খবরকাগজ দেখে বললেন—বৃহস্পতি গ্রহের চারদিকে ঘুরছে গ্যালিলিও। গ্যালিলিও কী গো?

—গ্যালিলিও জানো না। একজন সে-যুগের সাইনটিস্ট। বলেছিলেন সূর্য স্থির, পৃথিবীই পাক খাচ্ছে।

—তো গ্যালিলিও কী করে ঘুরবে?

—ওটা বোধহয় স্যাটেলাইট। নাম রেখেছে 'গ্যালিলিও'। ভদ্রমহিলা খবর কাগজ থেকে এবার পড়লেন—দিল্লিতে সমকামীদের মিছিলে লাঠিচার্জ। আহত কুড়ি।

ভদ্রলোক বললেন—বেশ হয়েছে।

ভদ্রমহিলা বললেন—সমকামী কী গো?

ভদ্রলোক বললেন—ওরা বাজে লোক।

মঞ্জু অনিকেতকে বলল, চল উঠি। অনিকেতের সম্মতির অপেক্ষা না-করেই উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে চলল। মঞ্জুর পিছন-পিছন অনিকেতও। মঞ্জু কীরকম থপথপ পায়ে হাঁটছে। চটিতে অভিমান।

অনিকেত একটু এগিয়ে গিয়ে মঞ্জুর কাঁধে হাত দেয়, বলে, কী হচ্ছে মঞ্জু, দাঁড়া...। মঞ্জু দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে অনিকেতের হাত চেপে ধরে। তক্ষুনি একটা লোক অনিকেতের কাছে

ফিসফিসায়—লৌকা লিবেন স্যর...। অনিকেত হাত ছেড়ে দেয়। তিন দেবীয়াঁ হেসে ওঠে। স্টিমার ভোঁ মারে।

মঞ্জু বলল, চ' গঙ্গার ধার ছেড়ে চলে যাই। অনিকেত বলল, গঙ্গা কী দোষ করল? মঞ্জু বলল, বাজে জায়গা। একটা গাছে এঁটে রয়েছে, 'গঙ্গা দূষণ রোধ করুন'। অনিকেত বলল, কোথায় যাবি তা হলে? মঞ্জু বলল, জানি না। অনিকেত বলল, সব জায়গাই এরকম। এখানে তবু একটা খোলা পরিবেশ আছে। মঞ্জু বলল, কোথায় খোলা? অনিকেত গঙ্গার বিশাল বিস্তার, আর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে চাইল কোথায় খোলা?

অনিকেত অনেকদিন পর আজ গঙ্গার ধারে এল। বহুদিন পর। হাওড়া স্টেশন থেকে গঙ্গা পারাপার-কে গঙ্গায় আসা বলে না। চুল্লিতে বাবার দেহ ঢুকিয়ে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তভাবে গঙ্গার ধারে ঘোরাটাকেও বলে না। শেষ কবে বেড়াতে এসেছিল? কোনও এক ধর্মঘটের দিন। শত ধর্মঘট হলেও, রেডিও খোলা থাকে। আগের দিন রাতে থাকতে হয়। পরদিন সারাদিন ডিউটি। অনেকেই থাকে। বেশ হইহল্লা হয়। অনিকেত স্ট্রাইক-ডিউটি নিত শুধু মজার জন্য। মেয়েদের ওই ডিউটি করতে হত না। ছন্দা সেন-রা বলত, তোদের কী মজা রে, আমাদের দেয় না কেন মাইরি? আইভি একদিন গিয়ে স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে বলেছিল, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি না কি স্যর? আমরা কেন স্ট্রাইক ডিউটি করতে পারব না? স্টেশন ডিরেক্টর বোধহয় একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, হোয়াট? হোয়াট? আইভি বোঝানোর চেষ্টা করছিল, স্ট্রাইক ডিউটি করার মজা থেকে মেয়েরা কেন বঞ্চিত হবে? এসডি নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলেছিলেন। আইভি বলেছিল—আরে স্যর, আমার সিকিউরিটি আমি পুষি। আমায় কে কী করবে? (বলতে চেয়েছিল—কোন শালা কী করবে, আমি কি এমনি এমনি বড় হয়েছি নাকি, মায়ের দুধ খেয়েছি স্যর) বেশি এগোলে মুশকিল (এইসা দেব না...); তা ছাড়া স্যর, মেয়েদের সিকিউরিটি-র প্রশ্ন তুলে আমাদের পুরুষ-কলিগদের অপমান করছেন—যেন স্যর ওরা সবসময় রেপ করার ফন্দিফিকির খোঁজে, এটা খুব বাজে অ্যাটিটিউড স্যর...। এস ডি নাকি বলেছিলেন, লেডিজ আর নট অ্যালাউড টু'...আইভি বলে উঠেছিল, 'আমি তো লেডি নাও হতে পারি স্যর...'

বড় অফিসার এবার আরও বেশি রিখ্‌টার স্কেলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আইভি-র মুখের দিকে...মুখ নয়, বুকের দিকে ক্লিনিকাল দৃষ্টি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিলেন—তখন আইভি আবার বলেছিল—ঠিক আছে, আমি লেডি, কিন্তু 'লেডিজ আর নট অ্যালাউড টু স্টে অ্যাট নাইট' বললেই হল? পুরনো লোকদের কাছে শুনেছি সুপ্রীতি ঘোষ, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও অনেকেই 'মহিষাসুরমর্দিনী' লাইভ করার যুগে রাত্তিরে এসে থাকতেন, ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করে, গরদ পরে মহালয়ার ভোরে গান গাইতে বসতেন...

শেষ অবধি পারমিশন আদায় করেছিল আইভি, তবে সঙ্গে আরও একটি মেয়েকে জোটাতে হয়েছিল। অর্চনা সেন, ক্যাজুয়াল নিউজ রিডার।

অনেকে মিলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এসেছিল ওরা। চাক্কা বন্‌ধ হলেও জলের প্রবাহ বন্ধ থাকে না। বয়েই চলে। হাওয়াদেরও বন্‌ধ নেই। বয়েই চলে। সেদিন অনিকেতের ঠোঁটের থেকে সিগারেট কেড়ে নিয়ে টেনেছিল আইভি। একটু-একটু কেশেছিল। গঙ্গার ধারে দাঁড়ানো একটা নৌকো থেকে কয়েকটা কিশোর জলে লাফ দিয়ে পড়ছিল। আইভি হাততালি দিয়ে

বলছিল, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আইভি বলছিল, হাফপ্যান্ট আছে কারও কাছে, হাফপ্যান্ট?

হাফপ্যান্ট কী হবে?

—একটু নেমে পড়তাম মাইরি। জামা-টামা খুলে। আজ স্ট্রাইক বলে ভিড় নেই, ঝামেলা হত না।

হাফপ্যান্ট কারও কাছে ছিল না। থাকার কথাও নয়। আর থাকলেও কি সত্যি-সত্যি হাফপ্যান্ট পরে জামা খুলে জলে ঝাঁপ দিত না কি? ওগুলো উইশফুল থিংকিং। আইভি সেদিন গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে পারেনি বটে, কিন্তু ব্যালেন্স-এর খেলা দেখিয়েছিল। চক্ররেলের লাইনের ওপর দিয়ে হেঁটেছিল। চেঁচিয়ে বলেছিল—এই যে ব্যাটাছেলেগুলো—হাঁটো দেখি, এরকম লাইনের ওপর দিয়ে আমার মতো...। কোনও ব্যাটাছেলে লাইনের ওপর ব্যালেন্সের খেলা দেখানোর জন্য এগিয়ে যায়নি সেদিন, বরং একবার যখন আইভি পড়ে গেল, ব্যাটাছেলেগুলো হাততালি দিয়ে উঠেছিল। সেই দলে অনিকেতও ছিল।

হাততালির শব্দ শুনল অনিকেত। এই তালির শব্দ অন্যরকম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, কয়েকজন হিজড়ে। কোমর বেঁকিয়ে হেলতে-দুলতে হাঁটছে। একটা ফুচকাওলাকে ঘিরে ধরল ওরা। একজন হাতের পাতায় কিছুটা নাচের মুদ্রা করে বলল—'অ্যাই ফুচকাওলা, ভাল ফুচকা আছে?'

একজন বলল, ডাঁশা হবে তো?

একজন বলল, তোমার ফুচকাগুলো বড্ড ছোট। নারকোল কুলের সাইজ। পেয়ারা সাইজের ফুচকা করতে পারো না?

অন্য একজন বলল, পেয়ারা সাইজ খাবে, তোর মুখের গর্তে ঢুকবে। অন্য একজন বলল দাও, বেশি করে ঝালটাল দিয়ে দাও। আমাদের আশালতা আবার পোয়াতি হয়েছে। তখন খিকখিক করে যে হেসে উঠল, সে-ই বোধহয় আশালতা। বলে উঠল, ঠিক বলেচিস লো...পাঁচ ম্যাস চলছে কিনা...মুকে বড্ড অরুচি।

আবার খিলখিল। হাসির শব্দ, জলস্রোতে। অনিকেত বোঝে, ওদের উইশফুল থিংকিং। ওই হাসির শব্দের মধ্যেই মঞ্জু আবার বলে, উঃ, চল, জায়গাটা ছেড়ে চল এক্ষুনি। কোথাও একটু ভাল জায়গা নেই কলকাতা শহরে...। ওরা সামনের দিকে এগিয়ে চলে। চক্ররেলের ইডেন গার্ডেন স্টেশন। রেলের মাইকে ঘোষণা শোনে, দমদম যাওয়ার চক্ররেল আসছে। অনিকেত বলে, কোনওদিন সারকুলার ট্রেনে চড়েছিস? মঞ্জু মাথা নাড়ায়। বলে চল, উঠি। বাগবাজারে নেমে যাব, ওখান থেকে তুই এন্টালি চলে যাবি। গঙ্গার ধার দিয়ে ট্রেনটা যায়। খুব ভাল জার্নি।

মঞ্জু আজ ফোন করেই এসেছিল। বলেছিল, একটু সময় দিবি। খুব দরকার আছে। দরকারি কথাটা এখনও বলা হয়ে ওঠেনি। মঞ্জুর মালিকের মা মারা গিয়েছেন বলে আজ ওদের অফিস বন্ধ। অফিস কি বলা যায়? দু'টো মাত্র ঘর। সামনের ঘরে তিনজন, পিছনের ঘরে মালিক, মালিকের মেয়ে। মালিকের নাম বলরাম চ্যাটার্জি, কোম্পানির নাম চ্যাটার্জি স্পেশাল। এটা একটা ভ্রমণ সংস্থা। কনডাকটেড ট্যুর করায়। মঞ্জু বলেছে, মঞ্জুর বসার সিটের পিছনে একটা বিরাট বড় ভারতবর্ষের ম্যাপ আছে। মঞ্জু হলুদ গোলাপি সবুজ প্রদেশগুলোর ভিতরে মনে-মনে ঘুরে বেড়ায়। ও আঙুল দিয়ে জব্বলপুর খাজুরাহো অজন্তা ইলোরা কোনারক দেখিয়ে দিতে পারে, কিন্তু ওসব জায়গায় কোনও দিন যায়নি। বাগবাজারে নামল। অন্নপূর্ণার ঘাট। মা সারদা

একসময় এই ঘাটে স্নান করতে আসতেন। গিরিশ ঘোষ হয়তো এই ঘাট থেকে ইলিশ মাছ দড়ি ঝুলিয়ে নিয়ে যেতেন। গিরিশ ঘোষের বাড়িতে ইলিশ মাছ রান্না হলে হয়তো নিবেদিতার বাড়িতে সেই গন্ধ যেত। এখানেই হয়তো পক্ষীর দলের গাঁজার আসর বসত কোনও একসময়। গোকুল মিত্তির কি হাতে ছড়ি নিয়ে সান্ধ্যভ্রমণ করতেন, পাত্রমিত্র নিয়ে? এখানে গঙ্গাটা বেশ চওড়া। একটা বাঁক নিয়েছে। বাঁকের ধারে বাজার বসত, বাঁক-বাজার থেকেই হয়তো বাগবাজার। জায়গাটা অনিকেতের চেনা। ওর পিসির বাড়ি তো এখানেই ছিল। ছোটবেলায় এসেছে কত। ফেরিঘাটের পাশে কতগুলো কংক্রিটের চেয়ার। ওখানে বৃদ্ধরা বসে আছে। বৃদ্ধা তেমন নেই। কাছেই একটা মন্দির। মন্দিরের ভিতরে অনেকে বসে আছে। ওখানে অনেক বৃদ্ধা আছে। কীর্তন হচ্ছে। একটা চোঙার মুখ বাইরের দিকে। বিরহে ব্যাকুল রাধা খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করেছেন। নিদ্রা নেই, চোখের তলায় কালি পড়েছে—এইসব বলছেন কথক। কথক বলছেন—রাতে ঘুম হচ্ছে না আমাদের রাধারানির। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছেন। হয়তো প্রেশার কমে গিয়েছে, লো-প্রেশার হয়ে গিয়েছে। কেবল কৃষ্ণনাম করে যাচ্ছেন। বলছেন—বুঝি না কেমনে বা হয়ে যায় ভোর, এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর...। গাইছেন, খোল-করতাল মৃদঙ্গ-পাখোয়াজ বেজে উঠছে। একটা বেঞ্চি পাওয়া গেল। পাশে দুই বৃদ্ধ।

—রাত্তিরে ক'বার ওঠো?

—দু-তিনবার। কোনও দিন চারবারও। শীতকালে বড় কষ্ট।

—আমার দু'বার উঠলেই চলে। তোমার অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম?

—না ভাই ঘোষাল। ছেলে-ছেলেবউ অ্যাটাচ্‌ড বাথের ঘরে থাকে।

—আমাদের তো পুরনো আমলের বাড়ি। অ্যাটাচ্‌ড বাথের গপ্পো নেই। ছেলেদের ফ্ল্যাটে অবিশ্যি ওসব আছে, তা থাক। আমি একটা গামলায় সেরে ফেলি। তুমিও তাই করো।

—ভালই বলেছ। কত টাইম লাগে তোমার ঘোষাল?

—একদম ফোর্স নেই। কখনও ফোঁটা-ফোঁটা করে পড়ে।

—বুজিচি। প্রস্টেট-টা দেখাও, বুঝলে...

—দেখিয়েছি তো। আলট্রাসোনোগ্রাফি করাতে হল। বলছে তো অপারেশনটা করিয়ে নাও।

—হোমিওপ্যাথি করিয়েচো? আমি তো হোমিওপ্যাথি করচি। বরদা বড়ুয়া। ফড়েপুকুরে বসে। বুঝলে ভাই, পুরুষ মানুষের প্রস্টেটটা খুব জটিল যন্তর...।

এইসব কথাবার্তার মধ্যে মঞ্জু আর অনিকেত। অনিকেত বলল, এবার তোর দরকারি কথাটা বলে ফ্যাল।

—আচ্ছা, আমার ছেলেটারও কি বড় হলে প্রস্টেটের সমস্যা হবে?

—যাবাব্বা, এই প্রশ্নটা করার জন্য এত দূর এলি?

—না, ওরা বলছিল তো, তাই মনে এল। আমার ছেলেটাও তো ব্যাটাছেলে, আর প্রস্টেটটা তো ব্যাটাছেলেদেরই থাকে...

মঞ্জু খুব আস্তে করে বলে, অনিকেতের কানের কাছে মুখ নিয়ে। অনিকেত ওর কানে গরম বাতাসের স্পর্শ পায়, দুশ্চিন্তা-মাখা।

—তোর ছেলের যদি ব্যাটাছেলেদের অসুখ হয়, তুই খুশি হবি? রেপ করা তো ব্যাটাছেলেদেরই অসুখ। অবশ্য মেয়েরাও করতে পারে, পুরুষের অসম্মতিতে; জোর করে,

কিন্তু আইনে ওটা রেপ নয়। ছেলেরাই আইনত রেপ করে। যদি তোর ছেলে...

—ধুর। আমার ছেলের সে মু[illegible] নেই। বলতে গেলে, ওই তো রেপ্‌ড হয়।

—মানে? কী বলতে চাস তুই মঞ্জু?

মঞ্জু বলে, ওর জাঙ্গিয়ায় আমি রক্তের দাগ দেখেছি। জাঙ্গিয়াটার পিছন দিকে। কেঁদে ফ্যালে মঞ্জু। আঁচল দিয়ে জল মোছে।

অনিকেত বলে, ওকে কি কেউ জোর করে?

মাথা নাড়ে মঞ্জু।

—নিজের ইচ্ছেয়?

মঞ্জু স্থির।

—তা হলে রেপ বলছিস কেন?

—না হোক রেপ। কিন্তু এটা কি ঠিক করছে? তুই বল, এটা কি ঠিক করছে ও?

এবার অনিকেত স্থির। মাথা কোনও দিকেই নাড়াতে পারে না।

কয়েক মুহূর্ত পর অনিকেত বলে—যদি তোর ছেলে না-হয়ে ও তোর মেয়ে-সন্তান হত, তখন যদি ও কোনও ছেলেকে বাড়িতে ডেকে আনত, তা হলে কী করতিস?

—কী আবার করতাম? স্বাভাবিক, বয়েস হলে তো...

—এরপর যদি তোর মেয়ের প্যান্টিতে কিছু চিহ্ন দেখতিস...

—হ্যাঁ, বলতাম সাবধান হতে...।

—তা তোর ছেলেকে সেটাই বল...।

—কী আশ্চর্য রে বাবা, একটা জলজ্যান্ত ব্যাটাছেলে, ওকে কেউ ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে যাবে, আর আমি বলব সাবধানে কর...। তোকেও বুঝতে পারছি না ডাবুদা, তুইও কি 'হোমো' হয়ে গিয়েছিস? আগে তো ছিলিস না। 'হোমো' হলে সেই ছোটবেলায় আমাকে ওই অ্যাপ্রোচটা করতিস না।

—যা বাব্বা। তোর এসব মনে হচ্ছে কেন? আমি কেন ওসব হতে যাব। মঞ্জুর হাত ধরল। বলেই মনে হল, ও যেন রক্ষণাত্মক খেলছে। প্রমাণ করতে চাইছে ও 'হোমো' নয়।

—তা হলে 'হোমো'-দের হয়ে সাফাই গাইছিস কেন?

—সাফাই গাইছি না তো, ...বলেই অনিকেত ভাষ্য-পরিবর্তন করল। বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাফাই গাইছি। হলদে গোলাপও তো গোলাপ। তোর পরি-র সবই ঠিক, শুধু সেক্সুয়াল চয়েস-এর ব্যাপারে একটু আলাদা, তাতে...

মঞ্জু অনিকেতের কথাটা থামিয়ে দিয়ে বলে, পরি নয়, পরি নয়, পরিমল।

—ও ঠিক আছে। অনিকেত ব্যাপারটা লঘু করার চেষ্টা করে।

পাশে বসা একজন বৃদ্ধ বলল, এবার ওঠা যাক ঘোষাল। ঠান্ডা লাগছে বড়। আজকালকার উলে তেমন গরম হয় না।

—এই শীতের মধ্যে ওরা কেমন দিব্বি খালি গায়ে ঘুরে বেড়ায় দেখেচ?

—ওরা মানে কারা?

—ওই নাচের মেয়েগুলো...টিভিতে...

—ওটা দ্যাখো না কি?

—ছেলে আমার ঘরে একটা ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েচে। নাড়াতে-নাড়াতে ওটাও দেখি।

—কী নাড়াতে-নাড়াতে?

—চ্যানেল। চ্যানেল নাড়াতে-নাড়াতে। পুঁচকে মতো বোতাম আচে না? ওটা টিপলে চ্যানেল চেঞ্জ হয় তো। তিন-চারটে চ্যানেল আসে। সব জায়গায় দেকেচো, কী অশ্লীল নাচ?

—তোমার তো দেকচি এখনও খুব রস...

—যজ্ঞিবাড়ি দেকেচো—ছোটবেলায়? কাঠের উনুনে খিচুড়ি-লাবড়া রান্না হত। চ্যালাকাঠ ঢুকিয়ে দেওয়া হত। কাঠ পুড়তে-পুড়তে যখন প্রায় শেষ হয়ে যায়, তখন কাঠের পোঁয়া দিয়ে বিজবিজ করে রস বেরোয়, দেকেচো? আমাদের হচ্ছে সেই রস।

—যাও, তুমি ওসব দেকোগে যাও। আমি ভাই সাতটা পঁইত্রিশের নিউজ শুনব রেডিওতে। সকালে শুনেছি পুরুলিয়ার কাছে ঝালদায় আকাশ থেকে বন্দুক পড়েচে, মেশিনগান, গোলাগুলি, একেবারে অস্তর-বৃষ্টি। কী হল শুনি গে। টিভি-র চেয়ে রেডিওটাই ভাল লাগে আমার। বিছানায় শুয়ে পাশে নিয়ে...

—হ্যাঁ, কী আর করবে ভায়া, রেডিওকেই পাশে শোয়াও এখন, হ্যা-হ্যা-হ্যা।

ওরা গাত্রোত্থান করে। অনিকেত রেডিওপ্রেমী লোকটাকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে থাকে। ওর অন্নদাতা। মঞ্জু অনিকেতের ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেয়। বলে, ওই বুড়োকে দেখতে হবে না, আমায় দ্যাখ।

বাব্বা, মঞ্জু এতটাই পাল্টে গেল নাকি এর মধ্যেই। ওকে যেটুকু দেখেছে, বেদনাতুর মনে হয়েছে, ডিপ্রেসিভ, ঝরে পড়া ভোরের শিউলি যেমন। ওকে কখনও এতটা অ্যাগ্রেসিভ দেখেনি অনিকেত। অবশ্য ক'দিনই বা দেখেছে?

মঞ্জু বলে, ওই বুড়োগুলো ছিল বলে ঠিক করে কথাগুলো বলতে পারছিলাম না। এবার শোন। আমাকে বাঁচা। কী আশ্চর্য তখনই কথক ঠাকুর চিৎকার করলেন—আমায় বাঁচা, বাঁচা সখি, কৃষ্ণ-বিরহে প্রাণ যায়। না যদি বাঁচি, পুনরায় কীভাবে কৃষ্ণ-অঙ্গ দর্শন পাব?

ওই কথকতার মধ্যেও ওদের কথা ভেসেই থাকছে, জলপ্রবাহে যেমন নৌকা। মঞ্জু বলল, শোন। শুনতে খারাপ লাগবে হয়তো, আমার এই দুর্গতির জন্য তুইও দায়ী।

—আমি?

করতাল বেজে উঠল ঝনঝন। ঢোল বেজে উঠল ড্রিমড্রিম।

—আমি কী করলাম? আমি কেন দায়ী হতে যাব?

—তুই একা নয়। তুইও। আরও অনেকের সঙ্গে তুইও।

—মানে?

—সেই যে দাদু, যে জামাপ্যান্ট খুলিয়েছিল, বলেছিল বাঁচা, তোর সংস্পর্শ আমার অসুখ সারাবে...

—জানি তো, ওসব কথা তো হয়ে গিয়েছে। ওটা তো একটা কুসংস্কারের বশে, একটা উদ্ভট থিয়োরি-কে বিশ্বাস করে...

—হ্যাঁ, আমি তো বাঁচাতে চেয়েছিলাম বুড়োটাকে, ওই অসুস্থ বুড়োটা তো আমার কাছে হাতজোড় করে ভিক্ষে চেয়েছিল, জীবন ভিক্ষে। আমি সব খুলেছিলাম। বলেছিল, তোর হাত

দিয়ে এখানটা স্পর্শ কর। মানে ওর গলার ফুলো জায়গাটা, যেখানে টিউমার, ক্যান্সারের টিউমার, আমি ছুঁয়েছিলাম। বাঁ হাতে। তারপর মনে হল বাঁ হাত অপবিত্র, বাঁ হাতে কাজ হবে না, তারপর ডান হাতে, তারপর দু'হাত দিয়ে ওই বিষফল। দাদু তারপর বলেছিল, তোর বুকটা আমার অসুখে ছুঁইয়ে দে সোনা। আমি ভয় পেয়েছিলাম। একবার মনে হল, যদি আমার বুকেও ওই অসুখটা হয়ে যায়? আমি মাথা নাড়িয়েছিলাম। ওই দাদুটা, মানে তোর পিসেমশাই, তখন আমাকে শুইয়ে দিয়ে দুর্গে দুর্গে রক্ষণীস্বাহা করতে-করতে ওর গলার বিষফল আমার বুকে ছুঁইয়ে দিল। তারপর দু'হাত দিয়ে...। নখ বসে গেল, উঃ। তারপর তো তুই দেখলি। এরপর বমি হল আমার। ঘেন্নার, কাউকে কিছু বলতে পারলাম না। তুই আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে আমার সামনে থুতু ফেলতিস। কিন্তু, তুই, তুই কেন এলি? তুই কেন শরীর চাইলি আমার? তোর পরই শেষ নয়। আমার একটা মামাতো দাদা। ও বিয়ে করা লোক, তবুও। যেন জোর করে। মামার বাড়িটা বড়লোক। আমাদের অনেক হেল্প করত। আমার বাবা তো কম্পাউন্ডার। গরিব। মামাতো দাদাকে কিছু বলতে পারিনি। পরে আর একদিন। জোর করে। আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। তবু ওকে আঁচড়ে দিইনি, কামড়ে দিইনি। কিন্তু এরপর থেকে পুরুষমানুষ দেখলেই কেমন ভয় করত। শুধু পুরুষমানুষ নয়, শশা, গাজর এসবও খুব খারাপ লাগত। আজও শশা খাই না। গাজর খাই না। শিবরাত্তির করতাম। ওটাও ছেড়ে দিলাম। মা বলেছিল শিবরাত্তির করবি না? কুমারী মেয়েদের করতে হয়। বলেছিলাম করব না, বিয়ে না হলে, হবে না।

কিন্তু বিয়ে হল। মামাবাড়ি থেকেই সম্বন্ধ করে বিয়ে হল। সেই মামাতো দাদা ভাল হার দিল। পিঁড়িতে উঠিয়ে সাতপাক ঘোরাল। ছেলের লেদের ব্যবসা। ভাল ইনকাম। সোনারপুরে জমি কেনা আছে, বাড়ি করবে। আমার বরের গলায় সোনার হার, মাথায় কোঁকড়া চুল, গায়ে মেশিনের গন্ধ। মেশিনের গন্ধ তো আমার ভালই লাগত। কিন্তু দু'হাতে চোখ ঢেকেছিলাম যখন ও ধুতিটা খুলল ফুলশয্যার দিন। মাথা নাড়িয়ে বলে উঠেছিলাম, না, না, একদম না। পুরীতে নিয়ে গেল ক'দিন পর। মনে হল নিষেধ করা ঠিক হবে না। ও করত, কিন্তু কাঠকে। একটা নিষ্প্রাণ ন্যাকড়াকে। সন্তান হল। হয়ে গেল। কিন্তু কেন বেশিদিন একটা কাঠের পুতুলকে সহ্য করবে? ওর কোনও দোষ নেই। আমাকে কাঠ করে দেওয়ার জন্য যারা দায়ী, তুইও তাদের মধ্যে একজন। ওদের সামনে এসে একটা রেকাবি নিয়ে দাঁড়াল একজন মহিলা। রেকাবিতে নকুলদানা। বলল, জয় রাধে। গলা শুনেই মুখের দিকে তাকাল অনিকেত। ব্যাটাছেলের মতোই তো মুখটা। গলার স্বরও তো ব্যাটাছেলেদের মতোই, রেকাবিটা নাড়িয়ে আবার বলে উঠল, জয় রাধে।

আর তখনই ঘাটের সিঁড়ি থেকে উঠে এল দু'জন। এতক্ষণ গঙ্গার দিকে মুখ ছিল ওদের, তাই বোঝা যায়নি। ওদের হাতে হাত। ওরা পরিমল এবং অরূপ।

মঞ্জুর সঙ্গে চোখাচোখি হল পরিমলের, হ্যালোজেন-জোছনার জন্ডিস হলুদে।

আমি মঞ্জু। নাম শুনেই তো বোঝা যায় আমি হেলাফেলার মেয়ে। এসব দুয়ো-মেয়েদেরই নাম হয় : তপু, খেঁদি, ছায়া, মায়া, মঞ্জু। সুয়ো-মেয়েদের নাম অন্যরকম হয়। ওদের বাবা কত ভেবেচিন্তে, ডিকশনারি ঘেঁটে নাম রাখে। সুয়ো-মেয়েদের নাম হয় প্রিয়ংবদা, নন্দিনী, সেবন্তী, অনুরাধা—এইসব। ওদের সুন্দর-সুন্দর ডাকনামও হয়। টিয়া, মৌ, তোড়া এইসব। আমার একটাই নাম। মঞ্জু। ওটাই ভাল নাম, ওটাই ডাকনাম। ডিকশনারিতেই নেই। এই শব্দটার কোনও মানেই নেই। তার মানে মঞ্জু-র কোনও মানেই হয় না। আমার তো দাদা ছিল। তার মানে বাবা-মা পুত্রসন্তান পেয়ে গিয়েছিল প্রথমেই। আমি তৃতীয় সন্তান। দ্বিতীয় সন্তান ছিল একটি কন্যাসন্তান। এক বছর বয়সে মারা গিয়েছিল। ওই অকালে-মরা মেয়েটার জন্য হা-হুতাশ শুনিনি তেমন, যেমন বিলাপ শুনেছি হাম-জ্বরে ছ'মাসে মরে যাওয়া ভাইটার জন্য। আমি আমার মায়ের পেটে, পরপর দু'বার হওয়া, দ্বিতীয় মেয়ে। ওরা নিশ্চয়ই ছেলেই চেয়েছিল। আমিই হয়ে গেলাম। আমি কী করব?

আমার বাবা ছিল কম্পাউন্ডার, যদিও গরিব মানুষরা বাবাকে 'ডাক্তারবাবু' বলেই ডাকত। বাবার একটা সাইকেল ছিল। ক্যারিয়ারে ব্যাগটা বসিয়ে সাইকেল চালিয়ে চলে যেত পুরকুরিয়া, হোগালিয়া, খাজাইতলা...। বাবার ব্যাগটায় থাকত কাচের ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ, ডিস্টিল্ড ওয়াটারের অ্যাম্পুল, তুলো-কাঁচি, গজ, ইথার, সাবান আর একটা ছোট মা কালীর ছবি। রিকশাওলা, কাঠমিস্ত্রি, ঠিকে ঝি-রা আমাকে ডাকত ডাক্তারবাবুর মেয়ে। বাবার একটা বই ছিল। 'সচিত্র অ্যালোপ্যাথি শিক্ষা'। ডা. স্বপন পান্ডে প্রণীত। বইটার প্রথম পাতাটা খুললেই একটা কঙ্কালের ছবি। আমি ছোটবেলায় বাবার বই খুলে দেখতাম সেই কঙ্কাল। বাবা বলত, ভাল করে লেখাপড়া কর। ডাক্তার হবি। বই খুলে দেখেছি পরিপাক তন্ত্র, রেচনতন্ত্র, জননতন্ত্রও দেখেছি। রেশন থলির মতো পাকস্থলী, জোড়া ঝুমঝুমির মতো ফুসফুস, কাঠবাদামের মতো কিডনি দেখেছি, জননতন্ত্রের ছবিগুলোও দেখেছি। লেবিয়া মেজোরা, লেবিয়া মাইনোরা, ক্লিটোরিস, সার্ভিক্স...। ওসব শুধু ছবি। পটে লিখা। আমার নিখিল ওতে অন্তরের মিল পায়নি। ওসব বাজে ছবি। খারাপ।

মা তো তা-ই শিখিয়েছে। বলত ওসব হল নোংরা জায়গা। রোজ-রোজ ইজেরটা কেচে দিতে হত। নোংরা জায়গায় হাত দিয়েছিল বলে জুঁইকে ওর মা খুব মেরেছিল। জুঁই আমার বন্ধু ছিল। রান্নাবাটি খেলতাম, পুতুল খেলতাম, পুতুলের বিয়ে দিতাম। একবার বিয়ের পর ও বলল, এবার মজা হবে। একটা কাঠের টুকরোর ওপর লাল শালুর টুকরো বিছিয়ে উঠোন থেকে টগর আর নন্দদুলাল ফুল ছিটিয়ে বলেছিল, এবার ফুলশয্যা হবে। বর-পুতুলটা আমার। এত যত্ন করে পরানো বর-পুতুলটার ধুতি খুলে দিয়েছিল জুঁই। ওর বউ-পুতুলটারও কাপড় খুলে

ফেলল জুঁই। তারপর কাঠের টুকরোটার ওপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে, বর-পুতুলটাকে তার ওপর উপুড় করে শুইয়ে দিয়েছিল। আমি বলেছিলাম এসব কী হচ্ছে, আমি খেলব না। ও বলেছিল ফুলশয্যা-খেলা তো এরকম করেই খেলতে হয়। আমি বলেছিলাম, এটা অসভ্য খেলা। আমি খেলব না।

বড় হয়ে তো আমাকে ফুলশয্যা-খেলা খেলতে হয়েছিল ওর সেই লাল হয়ে থাকা নোংরা জায়গাটায় চুমু খেতে বলেছিল। চুমু তো খেতে হয় আদর করে। আদর করতে গেলেই তো ঠোঁটটা সরু হয়ে যায়। আদর করেই তো বলি চুনু-মুনু-সুনু। চুনু-মুনু বলার সময় ঠোঁট দু'টো সরু হয়ে যায়। আমার বরটাও প্রথম প্রথম চুনু-মুনু করেই চুমু খেত। আমার ঠোঁটটা সরু হল না ওই নোংরা জায়গাটা দেখে। প্রথমদিন বর জোর করেনি, তারপর তো জোর করত। আমি একদিন কামড়ে দিয়েছিলাম। তারপর ও আমাকে মেরেছিল। থাপ্পড় মেরেছিল দু'গালে।

ওই যে জুঁইয়ের কথা বললাম, ওর সঙ্গে আড়ি হত, আবার ভাবও হত। জুঁই আমাকে বলত, তোর বাবা তো ডাক্তার, তুইও বেশ ডাক্তার হ। জুঁইদের একটা ঘর ছিল, ওই ঘরে কেউ থাকত না, হাবিজাবি জিনিসপত্র রাখা ছিল। ভাঙা আলনা, ট্রাঙ্ক, ড্রাম, পুরনো বই, এসব। ওই ঘরে নিয়ে গিয়েছিল জুঁই। জুঁই বলেছিল আমার জ্বর হয়েছে, থার্মোমিটার দে। মৌরি লজেন্স-এর সরু কাচের নল দিয়ে বলেছিল, এটা বেশ থার্মোমিটার, বগলে দে। দিয়েছিলাম। ও বলল, কত জ্বর? আমি বললাম, একশো। জুঁই বলল, তা হলে ইঞ্জেকশন দে। ও একটা ড্রপার নিয়ে এসেছিল। ও বলল, হাতে খুব ব্যথা, কোমরে দে। ও ওর লাল ইজেরটা খুলে ফেলেছিল। আমি ওর কোমরে ড্রপার দিয়ে ইঞ্জেকশন দিলাম, কোমরের তলায় কী সুন্দর গোলাকার জায়গা, যেন শ্বেতপদ্ম। ইঞ্জেকশনের জল পদ্মপাপড়ির গা বেয়ে সরু রেখায় গড়িয়ে পড়ছিল। আমি মুছে দিয়েছিলাম। জুঁই বলেছিল, ভাল করে মুছে দে। ম্যাসেজ করে দে, ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর যেরকম করতে হয়, আমি তাই করেছিলাম। ঠিক সেই সময় জুঁইয়ের মা ঢুকেছিল ঘরে। ঢুকেই এরকম ভাবে আমাদের দেখল।

ওর মা চিৎকার করে উঠল। বলল, এসব কী হচ্ছে, অ্যাঁ? জুঁই বলেছিল ডাক্তার-ডাক্তার খেলছি। জুঁইয়ের মা আমাকে বলেছিল, তোর বাপ-মা তোকে এই শিক্ষে দিচ্ছে? যা— বেরো...।

আমার মা-কে নিশ্চয়ই জুঁইয়ের মা এসব বলেছিল। আমার মা আমাকে মেরেছিল। বলেছিল, এসব নোংরা কাজ কখনও করবি না। বলেছিল, ছিঃ, তোর ঘেন্না নেই? যেখান দিয়ে পাইখানা-পেচ্ছাপ বেরয় ওইসব জায়গা ঘাঁটা? এত নোংরা তুই?

আমি তো তখন একদম ছোট। তখনও বাবার 'সচিত্র অ্যালোপ্যাথি শিক্ষা' পড়িনি। জরায়ু, ডিম্বাশয়, শুক্রাশয় জানি না। লেবিয়া মেজোরা, লেবিয়া মাইনোরা-ও নয়। পরে যখন বাবার বইয়ের ওইসব ছবি দেখলাম, মনে হয়েছিল, নোংরা ছবি। ফুসফুস হৃৎপিন্ড, ওসব নোংরা নয়। পাকস্থলীও নোংরা নয়। কিন্তু পাকস্থলীর শেষ প্রান্ত থেকে আঁকাবাঁকা নল যেখানে শেষ হয়েছে, সেই জায়গাটার নাম পায়ুছিদ্র। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা নোংরা জায়গা। ওখান দিয়ে গু বের হয়।

বাবা মাঝে-মাঝে এসে বলত, আজ ডুস দিয়ে বাহ্যি করিয়ে এলাম। মা বলত, চ্যান করে ঘরে ঢুকবে। আমরা তো বহুদিনের এদেশি। আমরা হলুম নস্কর বংশের। এইসব মুকুন্দপুর

বলো, কালিকাপুর বলো, সবই আমাদের বংশের লোকের হাতেই ছিল। আমরা একটু ফকফকে থাকতে ভালবাসি। বাঙালদের মতো নোংরা থাকি না। আমরা কখনও হেগো-কাপড়ে থাকি না। পাইখানা যাওয়ার জন্য আলাদা গামছা থাকে। হয়ে গেলে, ধুয়ে দিতে হয়। বাঙালরা দিব্যি হেগো-কাপড়েই ঘুরে বেড়ায়। ডাবুদারাও বাঙাল। ওরা নাকি অনেকদিন আগে থেকেই এখানে আছে। নস্করদেরই কেউ জমিদারির হিসেবের কাজে ওদের আনিয়েছিল। বলতে গেলে, আমাদের কর্মচারী ওরা। কিন্তু আমাদের চেয়ে ওরাই ভাল আছে। ডাবুদার পিসেমশাইও তো বাঙাল। নোংরা। আমার যার সঙ্গে বিয়ে হল, কার্তিক, ডাকনাম কেতো, সেও বাঙাল। নইলে এত নোংরা হয়? যেখানে-সেখানে মুখ দেয়, আবার মুখ দিতেও বলে, নইলে জোরাজুরি করে। সব বাড়িতেই তো নর্দমা থাকে। নর্দমা দিয়েই তো খারাপ পদার্থগুলো বেরিয়ে যায়। কেউ কি নর্দমায় মুখ দেয়, না কি নর্দমার ধারে বসে ভাত খায়? মা আমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার শিক্ষা দিয়েছিল। মা বলত, মেয়েদের শরীরটা খুব নোংরা। দু'বেলা চান করতে হয়। আমি যখন বড় হলাম, মা একদিন বলল—নোংরা জায়গা থেকে যখন নোংরা-রক্ত চুঁইয়ে পড়বে, আমায় বলবি। যখন আমি এইট-এ, তখন একদিন ওরকম হল। মা-কে বললাম। মা তখন শিখিয়েছিল ন্যাকড়া দিয়ে কীভাবে জায়গাটা বেঁধে রাখতে হয়। মা বলল, মাসে-মাসে শরীরের বদরক্ত বেরিয়ে যায়। তখন মেয়েরা অশুচি হয়। রান্নাঘরে যেতে নেই, খাবার জিনিস ধরতে নেই। মা শিখিয়েছিল ওই নোংরা ন্যাকড়া কীভাবে লুকিয়ে-লুকিয়ে জলকাচা করে, কীভাবে লুকিয়ে-লুকিয়ে শুকোতে দিতে হয়। রান্নাঘরের পিছনে কুলঝোপে শুকোতে দিতাম। সবসময় শুকোত না ভাল করে, ওটাই পরতাম। চুলকোত, কখনও পিঁপড়েও ধরত। কিন্তু চুলকোতে নেই। ওটা খুব অসভ্যতা। সহ্য করতে হয়। সহ্য করা শিখতে হয়। সহ্য করাই মেয়েদের গুণ। আমি তো গুণবতীই ছিলাম।

ঠাকমা বলত, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। আমার যখন খারাপ-রক্ত বেরতে শুরু করল, তখন বুঝলাম, আমিও রমণী হয়ে যাচ্ছি। শরীর পাল্টাতে লাগল। মা ঝালর-বসানো ফ্রক নিয়ে এল। ইস্কুলে নাইন থেকে শাড়ি। ব্লাউজের ভিতরে পরার জন্য ছোট-জামা নিয়ে এল মা। ওসব লুকিয়ে রাখতে হত শাড়ির ভাঁজের ভিতরে। মাও তাই করত। কিন্তু বাবার-দাদার জাঙ্গিয়া দিব্যি আলনাতেই থাকত, প্রকাশ্যে, সগর্বে।

ওরা তো গরমকালে খালি গায়ে থাকতে পারে। আমাদের জামা পরে থাকতে হয়। যখন রমণী হয়ে গেলাম, তখন টেপজামা পরেও থাকা যেত না। ওটার ওপর কিছু চাপাতে হত। ঘামাচি বেরত। পিঠে, বুকে এসব জায়গায় ঘামাচি বেরত। দুপুরবেলা মা ঝিনুক দিয়ে গেলে দিত, তারপর হাত বুলিয়ে দিত, তখন মনে হত মায়ের হাতে একটা মলম আছে, সেই মলমটার নাম মমতা। কুয়োর জলে অনেক জোছনা মিশে গেলে ওরকম মলম তৈরি হয়। আমি যেদিন কালসিটে-পড়া পিঠ নিয়ে বাড়ি এসেছিলাম, মা সেদিন যে মলম-মাখা হাত বুলিয়ে দিয়েছিল, সেখানে চোখের জলও ছিল। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, নারী জন্মো, নারী জন্মো।

যখন নাইন-এ, বাক্যরচনা করতে দিয়েছিল 'নরক'। একটা মেয়ে লিখেছিল, নারী নরকের দ্বার। দিদিমণি বলেছিলেন—এটা লিখলে কেন? মেয়েটা বলেছিল বইতেই তো আছে, বলে প্রবাদ-প্রবচন অধ্যায়টা খুলে দেখিয়ে দিয়েছিল। ওখানে লেখাই ছিল 'নারী নরকের দ্বার'। দিদিমণি আর কিছু বলেনি তখন। আমি তো তা-ই জানতাম। মেয়েরা নোংরা। মেয়েরা নরকের

দ্বার। মেয়েরা বোকা, গবেট। ওই দাদুটাই তো প্রথম বলেছিল, তুই প্রাণদায়িনী। তুই দুর্গা। ওই দাদুটা যখন ওর গলার ক্যানসারের টিউমারটা আমার শরীরে স্পর্শ করতে-করতে বলছিল দুর্গে দুর্গে রক্ষণী স্বাহা, তখন ভেবেছিলাম আমাকেই দুর্গা ভেবে ওরকম বলছে। কুমারী-পুজো হয়তো...। এখন জানি, সেই দুর্গা অচেনা দুর্গা, আর আমি চেনা ওষুধমাত্র ছিলাম, হিঞ্চে-ছেঁচা রস, পদ্মগুলঞ্চের জল।

আমার মা অনেকবার স্নান করত। ওই অভ্যেসটা আমারও হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিল, ওটা বাতিক। মনের ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম পরিমলকে নিয়ে। ও কি যেতে চায়? উপোস করার ভয় দেখিয়ে, মরে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে...। আমি বলতে চেয়েছিলাম, দেখুন না ডাক্তারবাবু, ছেলেটা কাজল পরে, পুরনো 'সানন্দা' কিনে এনে পড়ে। ভাল করে গুছিয়ে ওসব বলার আগেই ছেলেটা বলে দিয়েছিল, মা বারবার স্নান করে, বারবার বিছানার চাদর ধোয়। ডাক্তারটা আমাকেই জেরা করতে শুরু করল। বলল, এটা বাতিক। সেদিন ডাবুও বলল এটা বাতিক। বলল, এক ধরনের ম্যানিয়া। ও.সি.ডি.ই তো বলল, ওটা নাকি একটা মনের অসুখ। আমার স্বামীও তাই বলত। আমি যখন বলতাম, না, এসব করতে পারব না, ছিঃ, কী বীভৎস রুচি তোমার! তুমি একটা অসুস্থ লোক। ও উল্টে বলত, তুমিই অসুস্থ, তুমি বাতিকগ্রস্ত। বলত, তুই একটা ফালতু, ফালতু মেয়েছেলে। শালা বুড়োমারানি...।

'বুড়োমারানি' ওর খুব প্রিয় গালাগাল ছিল। সব বলেছিলাম কিনা, গা ঘেঁষে, একদিন সব বলেছিলাম...। না, সব নয়, শুধু দাদুটার কথাই বলেছিলাম, আর কারও কথা বলিনি।

ও বলেছিল—ওই বুড়ো তোমাকে চোদু পেয়ে জীবন বাঁচানোর ঘ্যাতড়া গেয়েছিল, আসলে ওর বুড়োবয়েসের ঘেয়ো ইঁদুরটা লাফাচ্ছিল। ওসব ব্যাং-ইঁদুর ভুলে যাও, ওসব সবার লাইফেই খুচখাচ হয়। তুমি সিংহ দেখ, সিংহ। কেশর ফোলানো।

বাবার 'সচিত্র অ্যালোপ্যাথি' বইতে একপাতা-জোড়া পুং-জননতন্ত্রের ছবি আছে। কী নিরীহ দেখতে। গুটিসুটি হাবলু গাবলু, শীত-কাতুরে। কেমন বেচারার মতো ঝুলে থাকা। সামনে করবীফলের মতো দেখতে একটা অংশের নাম মুষ্ক। দু'পাশে যেন দু'টো সরস্বতী পুজোর কুল, ভিতরে আলপনা আঁকা। লেখা শুক্রগ্রন্থি। ওটা যে একেবারে আলাদা রূপ ধারণ করতে পারে, সেটা বুঝেছিলাম হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার পরই। মামাতো দাদাটা। ওর এক বন্ধুকেও নিয়ে এসেছিল সেদিন। বাড়িতে কেউ ছিল না। বলেছিল আয়, একটা জিনিস দেখাব। দেখিয়েছিল। তারপর ওরা জোর করেছিল। আমি চেঁচাইনি, কিন্তু আমার সারা শরীর চিৎকার করেছিল, শব্দ হয়নি। 'ধর্ষণ' শব্দটার মানে বুঝেছিলাম সেদিন। মূর্ধন্য ষ-র ওপরের রেফ-টা যেন একটা কাঁটা। বিষকাঁটা। কিংবা একটা ছুরি। মূর্ধন্য ষ অক্ষরটার ওপর আমূল বসে আছে। মানুষ শব্দটারও শেষ অক্ষর মূর্ধন্য ষ। তো, আমি কী করব? আমার সেদিন ভীষণ খারাপ লেগেছিল। খুব কষ্ট। রক্ত। একটা রুমাল চেপে রক্ত মোছার চেষ্টা করেছিল দাদার বন্ধুটা। আমি থুথু ছিটিয়েছিলাম ওর মুখে। সেই রুমাল দিয়ে ও মুখ মুছেছিল। ওর মুখেও রক্ত লেগে গিয়েছিল। ও তখন 'তবে রে' বলে আমার ওপর আবার। আমি আমার একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তুলে দিয়ে চেপেছিলাম। ওরা পা সরানোর চেষ্টা করছিল। উরুতে নখের দাগ। আফগানিস্তানে বোম পড়ছিল তখন। ওদের ঘরে খুলে-রাখা টিভিতে আগুনে ঝলসে যাওয়ার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। বোমা-গুলি-বারুদ আমার গায়েও লেগেছিল। আমার সারা গা জ্বলছিল। আমি

চিৎকার করিনি, কিন্তু শরীরের ভিতর থেকে হাজার হাজার বছর আগেকার দ্রৌপদী চিৎকারের সঙ্গে মিশে থাকা সাইরেন বাজছিল, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার উরু-নাভি-হাঁটু চটচট করছিল। আমার দিকে উঁচিয়েছিল অস্ত্র। পুং-ইন্দ্রিয়। এসব শুরু করার আগে মামাতো দাদাটা বলেছিল : বাঘ দেখবি, বাঘ? বাঘের লকলকে জিভ, থাবা, সব কিছুই তো দেখলাম সেদিন। আরও কী হত কে জানে, যদি না তখন কড়া নড়ে উঠত। পাড়ার কোনও বাড়ির সত্যনারায়ণ পুজো সেরে যদি তখন মামিমা না-এসে পড়ত। আমি তক্ষুনি কলঘরে ঢুকেছিলাম। মগ-মগ জল ঢেলেছিলাম। সাবানে জ্বালা করছিল আমার।

আমার বিয়ে হল। বিয়ে দেওয়া হল। ঘরে যুবতী মেয়েসন্তান, বিয়ে তো দিতেই হবে। ছেলের ব্যবসা। লোহার কারবার। নিজের লেদ মেশিন। স্বামীও তো বলেছিল সিংহ দেখাবে।

আমার লোভ হত না কোনও বাঘ-সিংহ দর্শনে। আমি সে-খেলা করতে পারতাম না, যে-খেলা ওরা চায়। ভয়ে।

'ট্রমা' শব্দটা আমি খুব জানি। জীবনে কতবার শুনেছি। আমার মধ্যে কি ওটা আছে? ট্রমা শুনলেই কেন ট্রয় নগরীর কথা মনে হয় আমার? সেই কবে পড়েছিলাম স্কুলের ইতিহাস বইতে। ট্রয় নামে কোনও এক নগরী ছিল। এখন নেই। ম্যাপে নেই। কিন্তু আছে। এরা ইতিহাসে থাকে, স্মৃতিতে থাকে। ট্রমা কি ট্রয়ের মতোই? কোনও লুপ্ত ঐশ্বর্যের মতোই কিংবা দুঃস্বপ্নের মতো?

এক্কা দোক্কা তেক্কা...পাঞ্জা-ছক্কা সাগর। সাগর মানে একটা গোল দাগ। সাগরের সীমা। ওর মধ্যেই সেফ্‌টিপিন। সাগর থেকে সেফ্‌টিপিন কুড়িয়ে নিতাম। ছেলেরা দাঁড়িয়ে দেখত তেক্কা থেকে পাঞ্জায় লাফানো। জুঁইও তো লাফাত—কাঁপত। ঝালর-বসানো ফ্রকের তলায় আমারও কাঁপত। ডাবুদারা দেখত। জুঁইয়ের কানে-কানে বলেছিলাম : দ্যাখ, দেখছে। জুঁই আমার কানে-কানে বলেছিল, দেখার জিনিস দেখছে। ডাবুদা দেখতে ভাল, পড়াশোনায় ভাল, আমার যখন দান পড়ত, দেখে নিতাম ডাবুদা দেখছে তো? আমার কেমন যেন মনে হত জুঁইয়ের যখন দান পড়ত, তখন ডাবুদা বেশি করে দেখছে। জুঁইও কি তাই ভাবত? নইলে একদিন জুঁই হঠাৎ মুখ করল কেন—অ্যাই, তোদের লজ্জা করে না—মেয়েদের খেলা দেখছিস? তবু ওরা আমাদের দেখত। সোজাসুজি না-হলেও হয়তো বারান্দা থেকে, হয়তো জানালার শিকের ওধার থেকে। কখনও শিসের শব্দও ভেসে আসত। শিস নয়, সিটি। এক্কা-দোক্কার সাগরের ওপার থেকে। ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সংগীত ভেসে আসে...। মা বলেছিল—মঞ্জু আর এক্কা-দোক্কা খেলতে হবে না রাস্তায় নেমে...। নস্করবাড়ির মেয়েরা কেন এসব নোংরামোর মধ্যে যাবে।

তবু খেলতাম। রাস্তায় নয়, ছাদে। ওখানে ছেলে-দর্শক ছিল না। দর্শক না-থাকার অভাববোধ তো ছিলই। তবুও একদিন এক্কা-দোক্কা কোর্টের সাগরের ওপর একটা ভাঁজ-করা কাগজ পেয়েছিলাম। প্রেরকের নাম ছিল না। কাগজে ছিল, 'বল তো দেখি আমার ফিতে ইংরিজি কী?'

'ফিতে' ইংরেজি কে না জানে, টেপ। 'আমার ফিতে' মানে তো 'মাই টেপ'। ইস কী অসভ্য, বলতে-বলতে হাসিতে গড়িয়ে পড়েছিলাম আমি, জুঁই, আর রানি।

সেই এক্কা-দোক্কা যুগটা কী সুখেরই না ছিল, কী মজার। সেই আলুকাবলি-দিন, সেই বৃষ্টিমাখা-দিন, সেই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে শিস ভেসে আসা দিন এখন বিদিশা, মহেঞ্জোদাড়ো

কিংবা ট্রয় নগরীতে আছে। সেই আলুকাবলি দিনগুলোর মধ্যেই সেই কণ্ঠী-গলার দাদু বলেছিল, জীবন দে।

'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই'-এর মতোই। মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে আসা সংগীতের মতোই দাদুটা বলেছিল, বাঁচা। আমি বিহ্বল। আমি নিরুপায়। নিরুপায় ভাবে ব্যবহৃত। ধর্ষণ? আইন অনুযায়ী নয়। ওখানে নাকি 'পেনিট্রেশন' শব্দটা আছে। লিঙ্গ প্রবিষ্ট হতে হবে। কিন্তু যে-লিঙ্গ প্রবিষ্ট হওয়ার ক্ষমতা রাখে না? সেটা কি ধর্ষণ নয়?

কিন্তু পেনিট্রেশন তো হয়েছিল। আমার মস্তিষ্কে। আমার চেতনায়। যেটা প্রবিষ্ট হয়েছিল, তার নাম ভয়।

এর ক'দিন পরই তো ডাবুদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ডাবুদা তুই। তোকেই তো বলছি এত কথা। উজাড় করে দিচ্ছি তোকে। তুই বাঘ-সিংহ কিছু দেখাসনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস ভেঙেছিলি। এভাবে কাউকে বলতে হয়? মেয়েরা কি মেলার সাজানো বেলুন, বন্দুকের টিপ পরীক্ষা করার?

এর কিছু দিন পরই সেই মামার বাড়ি। বাবার 'সহজ অ্যালোপাথি শিক্ষা'-র পুংজনন ইন্দ্রিয় বই ছেড়ে সাপ হয়ে আমার কাছে আসত। ছোবল মারত। অসহ্য হয়ে উঠেছিল, মাইরি বলছি। ভালবাসতে পারিনি আমার স্বামীকে। একটু ভুল বললাম। ওকে ভালই তো বাসতাম। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম, মাথা টিপে দিতাম, ক্যাসেটে কিশোরকুমারের গান চালিয়ে দিতাম। ওর মদের জন্য আলুভাজা, ডালের বড়া ভেজে দিতাম। ওর পিঠে সাবান ঘষে দিতাম। দু'জনে একসঙ্গেও তো সাবান ঘষেছি। আমি ভালবাসতে পারিনি 'সহজ অ্যালোপাথি শিক্ষা'-র ১৬ নং পৃষ্ঠাকে, বেরিয়ে আসা ওই বিচ্ছিরি প্রাণীটাকে। আমি ওটাকে ঠিক সহ্য করতে পারিনি প্রথমে।

অথচ কী আশ্চর্য! আমার ছেলেটার শরীরে ওই পরাক্রান্ত যন্ত্রটাই দেখতে চাই, যাকে আমি ভালবাসিনি। আমি পরিমলের পরি হয়ে থাকাটা চাই না, কিছুতেই চাই না। তবে আমি কী চাই?

আমি কি চাই, ও কাউকে বলুক—

বাঘ দেখবি, বাঘ!

অনুষ্ঠানটা প্রায় শেষের দিকে। আর অল্প কয়েকটা পর্ব করলেই প্রোজেক্টটা শেষ। এই প্রোজেক্ট একটা অচেনা জগতের দরজা খুলে দিয়েছে। নিষিদ্ধ দরজাও বলা যেতে পারে।

সেদিন অফিসে ঢুকে লিফ্‌ট-এর দিকে যাওয়ার সময় চেঁচামেচি শুনতে পেল অনিকেত। চামড়া খুলে নেব, একদম চামড়া খুলে নেব...একটা গাট্টাগোট্টা লোক চিৎকার করছে। শোভন পাঠক নামে একজন ডিউটি অফিসার লোকটার সঙ্গে তর্ক করছেন, তর্ক নয়, বলা ভাল সামলানোর চেষ্টা করছেন। বলছেন—আপনার যা বক্তব্য লিখে দিয়ে যান, এটা প্রোটেক্টেড প্লেস, অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারেন। লোকটার এক সঙ্গী বলল অ্যারেস্ট-ই করুন। আইন

অমান্য করছি। অন্য লোকটা বলল, লিখিত অভিযোগ তো এনেইছি, কিন্তু এতে কী হবে?

অনিকেত ওই দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু শোভন পাঠক হাতের ইশারায় চলে যেতে বলে।

সেদিন মিটিং সরগরম। বিষয়টা ওই অনুষ্ঠান নিয়ে নয়, অন্য একটা অনুষ্ঠান নিয়ে। একটা পাঁচালি-ধর্মী অনুষ্ঠান হয়েছিল, ওটা শোভন পাঠকই প্রযোজনা করেছিলেন। ওঁরই লেখা। বিপদতারিণী দেবী এবং ওলাইচণ্ডী দেবীর কাব্যযুদ্ধ। ওলাইচণ্ডী হচ্ছেন কলেরার দেবী। দাস্ত-বমির ওই অসুখটাকে ওলাউঠা বলা হত। এখন যদিও কলেরা আর কলেরা নামে নেই। কিন্তু দাস্ত-বমিটা রয়েই গিয়েছে। এখন ওই রোগটাকে আন্ত্রিক বলা হয়। ওই পাঁচালিতে বিপদতারিণী দেবী ওলাইচণ্ডীকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য ওআরএস-এর বিধান দিচ্ছেন। 'ওআরএস' হচ্ছে 'ওরাল রিহাইড্রেশন সাপ্লিমেন্ট'। বিপদতারিণী দেবী গান গেয়ে 'ওআরএস' বোঝাচ্ছেন, এবং মাঝে-মধ্যেই ওলাইচণ্ডীকে গাল পাড়ছেন। ওলাইচণ্ডীও কম ঝগড়ুটে নয়। এইসব ঝগড়ায় মুখপুড়ি, ভাতারখাকি, ভাশুরশুঁকি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এইসব শব্দ ব্যবহার নিয়ে আপত্তি তুললেন একজন প্রোগ্রাম অফিসার। অন্য একজন বলল, রেডিও-র কী অবনতি!

সত্যিই তো 'শালা' শব্দ আছে বলে রন্ধনশালা কেটে রান্নাঘর করতে হত, বালবাচ্চা কেটে বাচ্চাকাচ্চা, সেখানে এসব শব্দ?

একজন বলল, মুখপুড়ি ভাতারখাকি এখন কী এমন দোষ করল? যেসব অনুষ্ঠান হচ্ছে এখন, কোনও নোংরাই তো বাদ দিচ্ছেন না অনিকেতবাবু। একজন বললেন—আমাদের অনুষ্ঠানে ঠাকুর-দেবতা না-টেনে আনাই ভাল। মানুষের তো একটা সেন্টিমেন্ট আছে। হিন্দুধর্মটা সহনশীল বলে এসব চলছে।

অন্য একজন বললেন—গাঁয়ের কৃষ্ণযাত্রা-য় কৃষ্ণকে কত কী বলা হয়।

—শিবযাত্রায় শিব-পার্বতীর কোন্দল শুনেছেন?

—ওসব গেঁয়ো যাত্রায় হয়। তাই বলে রেডিওতে? স্টেশন ডিরেক্টর তেমন কোনও মন্তব্য করছেন না। শুধু বললেন, কোনও কিছুই তো আগের মতো থাকে না, রেডিও-র কী করে সব আগের মতো থাকবে?

একজন পুরনো অফিসার বললেন, আর দেড় বছর আছি। রিটায়ার করে বাঁচব। হোক, যা খুশি হোক। যে যা খুশি, তা-ই করুক। অনিকেতের দিকেই ওঁর চোখ। চামড়া বলে আর কিছু থাকল না। মিটিং শেষে চামড়া উঠিয়ে দেওয়ার কেসটা জানতে নিচে নামল অনিকেত। শোভন পাঠক একটা চিঠি ধরিয়ে দিলেন। 'সর্বভারতীয় যোগ মহাসঙ্ঘ' লেখা একটা প্যাড। এরপর 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'।

এরপর—মাননীয় কেন্দ্র অধিকর্তা, বেতার কেন্দ্র হইতে এরূপ অশ্লীল অনুষ্ঠান প্রচার করিতেছেন কেন? লজ্জা করে না? আমাদের যুবসমাজ অধঃপাতে যাইতেছে। কিছুদিন আগে একটি নাটকে অবিবাহিত যুগল ঘরে ঢুকিল। আপনারা খিল বন্ধ করিবার শব্দ শুনাইলেন। তারপর উঃ আঃ ইত্যাদি অশ্লীল্ শব্দ। বিবাহিত যুগল হইলেও এত আপত্তি ছিল না। আমাদের সভ্যরা বলিতেছিল রবিবার সকালে একটি অতি অসভ্য অনুষ্ঠান চলিতেছে। নিজে কানে শুনিলাম। শুনিয়া নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আপনারা সমকামী ধরিয়া আনিলেন। ছিঃ। উহারা আবার বড় মুখ করিয়া নিজেদের কীর্তির কথা বলিল। জানি না কী

করিয়া এইসব অ্যালাও করেন। অতঃপর পায়ুদেশের বর্ণনা। অবিলম্বে এইসব বন্ধ করুন নচেৎ আমরা সমবেত হইয়া ঘেরাও করিব।

ধন্যবাদ দিলাম না। কেন দিব?

শ্রীকান্ত হালদার।

কপি টু : মাননীয় রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, কলিকাতা হাই কোর্ট,

চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছিল অনিকেত, শোভন পাঠক বললেন—এটা তুমি কোথায় ঢোকাচ্ছ।

কেন? পকেটে?

—পকেটে না, ওটা এসডি-র কাছে যাবে। ওঁকেই তো অ্যাড্রেস করা আছে। চিঠিটা ফেরত দেয়।

তোমার এই কেত্তন বন্ধ হচ্ছে কবে।

—হয়ে এল তো।

—যত তাড়াতাড়ি পারো শেষ করো। ঝক্কি তো আমাদেরই পোহাতে হয়...।

সত্যিই, ঝক্কি-ঝামেলা তো ডিউটি রুমকেই পোহাতে হয়। দরজা দিয়ে ঢুকে রিসেপশন, তারপরই ডিউটি রুম। ডিউটি রুম পেরিয়ে স্টুডিও। স্টুডিও-তে কে যাচ্ছে, কে আসছে, ডিউটি অফিসারদের লক্ষ রাখতে হয়, কোন স্টুডিওতে কী রেকর্ডিং হচ্ছে জানতে হয়। এমনকী কোন স্টুডিও থেকে কী সম্প্রচার হচ্ছে, তা-ও। ঘোষক-ঘোষিকারা ডিউটি রুমেই বসেন। বিদ্যুতের গোলযোগে অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ হলে পাবলিকের গালাগালির ফোন এই ডিউটি রুমেই আসে। 'কী মশাই, আপনারা বললেন ষাট কিলোমিটার বেগে ঝড় আসছে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। দরকারি কাজ ছিল, বেরলাম না, অথচ কিস্‌সু হল না। মিথ্যে কথা কেন বলেন মশাই?' এটাও ওঁদেরই শুনতে হয়। অনিকেতকেও শুনতে হয়েছে। কারণ বেশ কয়েক বছর ওখানে কাজ করেছে ও। কত কিছু সামলেছে। দিল্লির রিলে চলছিল, ক্রিকেটের ধারাবিবরণী, বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু অ্যানাউন্সার নেই। অনিকেত-ই ছুটে গিয়ে বলে এসেছিল 'খেলার জন্য বৃষ্টি বন্ধ।' তাড়াহুড়োয় এটুকু ভুল হতেই পারে। সামলেছিল তো... কত কিছু সামলেছে। যখন রেডিও-র অ্যানাউন্সাররা দূরদর্শন-এর খবর পড়তেন, তখন ওঁদের মুখ দেখা যেত। ছন্দা সেন, তরুণ চক্রবর্তী, দেবাশিস বসু—এঁদের কী তুমুল জনপ্রিয়তা। টেলিভিশনকে তো পুষ্টি দিয়েছিল রেডিওই, পরে রেডিওকেই অপুষ্টি ধরল। যাই হোক, সেই তুমুল জনপ্রিয়তার সময়, একজন ভদ্রলোক ছন্দা সেন সম্পর্কে প্রবল উৎসাহী ছিলেন। মাঝে-মধ্যে ঠোঙায় করে আপেল-আঙুর নিয়ে আসতেন। বলতেন, কাল টিভিতে দেখলাম ছন্দা সেন বড় রোগা হয়ে গিয়েছে। মুখটাও শুকনো। মেক আপ করে আমার চোখকে কী করে ফাঁকি দেবে ও? ওকে এই ফলগুলো দেবেন।

ওই লোকগুলোকে সামলাতে হত। শুধু গলা শুনেও কেউ-কেউ প্রেমে পড়ে যেত। কানে শুনে প্রেমে পড়ে চোখের দেখা দেখতে আসত। ওদেরও সামলাতে হত। কত যে পাগল ঢুকে পড়ে, কেউ বলে—বলে দিন আমি নোবেল প্রাইজ পেয়েছি। কেউ বলে—আমার দুশ্চরিত্রা

বউটাকে আপনাদের কাছে রেখে যেতে চাই। একজন একটা ঘটি নিয়ে এসে বলেছিল, শম্ভু মিত্র কখনও এলে বলতে, যেন কুলকুচি করে এই ঘটিতেই জল ফেলেন। ওঁর কুলকুচি করা জল দিয়ে গার্গল করব আমি...এরকম কত। আজও যোগগুরু শ্রীকান্ত হালদারকে সামলাতে হয়েছে ওঁদের।

পাঠক মশাই বললেন—শুনলে তো—বলেছে চামড়া ছাড়িয়ে নেবে...

—শুনলাম তো।

—তা তুমি চামড়া ছাড়াচ্ছ কবে?

কীসের চামড়া?

—ইংরেজিতে বলব, নাকি বাংলায়?

—ও, বুঝে গিয়েছি, বুঝে গিয়েছি...বলতে হবে না। তো, কার চামড়া ছাড়াব?

তোমার ছাড়াতে হবে কি হবে না জানি না, তবে চামড়া ছাড়ানোটা বোধহয় হয়নি। করবে না কি একটা?

মন্দ বলেননি কিন্তু শোভনদা। 'সারকামসিশ্‌ন'-এর কথা বলতে চেয়েছেন। শুদ্ধ বাংলায় লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদ। মুসলমানরা যাকে সহজ করে বলে 'সুন্নত'। লালনের গানে আছে সুন্নত করলে হয় মুসলমান নারী লোকের কী হয় প্রমাণ। কিন্তু সুন্নত মানেই ওই জায়গাটার ত্বকচ্ছেদ নয়। 'সুন্নত' হল যা করলে ভাল হয়, রসুল যা করা পছন্দ করতেন। ফর্জ হচ্ছে যা করতেই হয়। নামাজ রোজা জাকাত এসব হল ফর্জ। নামাজের সময় গোসল করতে হয়। গোসলের সময় কুলি করাই ফর্জ, কিন্তু হাতের কনুই পর্যন্ত ধোয়া সুন্নত। কিন্তু লিঙ্গাগ্র ছেদন তো সব মুসলমানকেই বোধহয় করতে হয়। ইহুদিদেরও। কোনও কোনও আদিবাসীদেরও অবশ্যকর্তব্য। এটা নাকি বিজ্ঞানসম্মত। নোংরা জমে না। আর অনেকে বলেন লিঙ্গমুণ্ড উন্মুক্ত থাকায় পোশাকের ঘর্ষণে কিছুটা ট্যান হয়ে যায়, ফলে সঙ্গমকালে অতি-অনুভূতিপ্রবণ থাকে না। আবার কিছু পুরুষের বড় হলেও পুরো খোলে না। বিয়ের পর কাটিয়ে নিতে হয়। ছোটবেলায় কাটিয়ে নিলে সমস্যা থাকে না। কিন্তু কাটানোটাই তো সমস্যা। বেতারে কি বলা যায়, কাটিয়ে নাও হে ভায়েরা? তবে ডাক্তারবাবুরা বলেছেন যখন সারকামসিশ্‌ন ব্যাপারটা ভালই, এ নিয়ে একদিন করা যেতেই পারে।

ঠিক সেদিনই সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা। এখানে সাহিত্য বিভাগ আছে। একসময় এখানে প্রেমেন্দ্র মিত্র কাজ করেছেন, লীলা মজুমদার, কবিতা সিংহ...। অনিকেত সাহিত্যবিভাগে একটু আড্ডা মারতে গিয়েছিল। ওখানে বসেছিলেন সুধীর চক্রবর্তী। ওঁকে ডাকা হয়েছিল কিছু বিষয়ে বলার জন্য। অনিকেতের ধারণায় উনি হলেন একজন সর্বজ্ঞানী লোক। অনিকেত সুন্নত সম্পর্কে কিছু ফান্ডা চায়। সুধীরবাবু বলেন—একজন তরুণ লেখককে আমি জানি, ওর নাম আনসারউদ্দিন, ওকে বলব, ও তোমাকে লিখে জানিয়ে দেবে। আমার চেয়ে ও অনেক ভাল জানে বিষয়টা। তোমার ঠিকানা দাও।

সত্যিই, দিন দশেকের মধ্যেই আনসারউদ্দিনের একটা চিঠি পায় অনিকেত। আনসারউদ্দিন ওঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখে জানান। এই লিঙ্গের চর্মচ্ছেদনের প্রচলিত নাম হল খৎনা।

আনসার লেখেন : 'আমার খৎনা হয় আট বছর বয়সে। ফাল্গুন মাস। টানের মাস। কাঁচা ঘা এ সময় তাড়াতাড়ি শুকায়। এ কারণে ফাল্গুন মাসেই বেশি খৎনা হয়। আল্লার আদেশ হল

ফরজ, আর হজরত মহম্মদের নির্দেশ হল সুন্নত। খৎনা হল সুন্নত। খৎনার দিন নিকটজনদের দাওয়াত দেওয়া হয়। ওই আত্মীয়রা কেউ পুলিপিঠা বানিয়ে নিয়ে আসে, কেউ আনে মুরগি। খৎনার শিশুর জন্যও উপহার আনে। বড়লোকের বাড়ির ছেলেদের বড়লোক আত্মীয়রা আনে সোনার আংটি, ছেলের মামা হয়তো ভাগ্নের 'খৎনা'-য় একটা সাইকেল উপহার দিয়ে দিল। আমি পেয়েছিলাম গোট চারেক গামছা, একটা পেন্টলুন আর দু'টো জামা। কোনও কোনও বাড়ির খৎনা-র দিনে মাইক বাজে। মাইকে হিন্দি গান হয়, আবার বড়লোকের বেটি লো হয়। বড়লোকের বাড়ির খৎনায় সারা গ্রামের দাওয়াত হয়। দশ-বারোটা গরু কাটা হয়। বিয়ের উৎসবের মতোই বাজি পোড়ে। আসলে খৎনা আর বিয়ের মধ্যে একটা মিল আছে। দু'টো উৎসবই হল যৌনযাপনের স্বীকৃতি। খৎনা হওয়া মানে তোমার পুংলিঙ্গটি যথাযথ হল।

খৎনার অন্তত একমাস আগে ওস্তাদকে দাওয়াত দিতে হয়। একজন দক্ষ ওস্তাদের ওপর আস্থা রাখে ৩০-৪০টি গ্রাম। প্রতি ফাল্গুন-চৈত্রে একজন ওস্তাদ শ'খানেক লিঙ্গমুণ্ডর চাম কাটেন। গাঁয়ের মানুষ ওস্তাদকে হাজাম বলেও ডাকে। হাজাম মানে নাপিত। আগে হাজামরাই এই কর্ম করতেন। আমার যিনি খৎনা করেছিলেন ওঁর নাম লোকমান খালিফা। এই খালিফা সাহেব ষাট বছর ধরে আড়াইশো মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামের খৎনার কাজ করে গিয়েছেন। জীবনের শেষ পাঁচ বছর অন্ধত্ব নিয়েও নাকি ওই পবিত্র কাজটি সমাধান করেছেন।

একজন দক্ষ খৎনাকার হিসেবে লোকমান খালিফা কিংবদন্তি হয়ে আছেন। তাঁকে দূর গ্রাম থেকে গরুর গাড়ি ভাড়া করে আনতে হত। শিশুর গোপনাঙ্গে হাত দেওয়া মাত্রই তিনি বুঝে যেতেন সেটি খৎনার উপযুক্ত হয়েছে কি না। লিঙ্গমুণ্ডের পূর্ণ বিকাশ না-হলে শলা ঘোরাতেন। শলা ঘোরানো ব্যাপারটা খুব যন্ত্রণাদায়ক। একটি সরু কাঠি চর্মাচ্ছদনীর ভিতরে ঢুকিয়ে এঁটে থাকা চামড়াটা ঢিলে করতে হয়। ওই ওস্তাদ সারা জীবনে কত চামড়া ছাড়িয়েছেন তার হিসেব করা মুশকিল। ছোটবেলায় খৎনার ব্যাপারে আমার ভীষণ ভয় ছিল। পাড়ায় ওস্তাদ বা হাজাম এসেছে শুনলেই পালাতাম। আইরি খেতের জঙ্গলে বসে থাকতাম। একবার পাশের বাড়ির ছেলেটার খৎনা দেখেই এই ভয়টা হল। একদিন আমারও খৎনার দিন ঠিক হল। যাতে আমি না-পালাই এজন্য আগের দিন থেকে বাড়িতে বন্দি। আমার কাছে ওটা শাস্ত্রীয় ব্যাপার ছিল না, যেন মনে হত শহিদ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। খৎনার দিন সকাল থেকে আত্মীয়স্বজনরা আসতে শুরু করেছে। আমাকে নতুন লাল গামছা আর নতুন গেঞ্জি পরানো হল। চোখে কাজল, লোকমান খালিফা ঘরে এলেন। লম্বা সাদা দাড়ি। গা থেকে আতরের গন্ধ আসছে। আমার কেবল মনে হচ্ছিল খালিফা ছুরি দিয়ে যা খুশি করুন, যেন করাত আনার কথা না বলেন। খালিফা সাহেব ন্যাকড়া পুড়িয়ে ছাই করলেন। বাইরে কুল কাঠের আগুন জ্বলছে। ঘরের বারান্দায় বিছানা পাতা। তার ওপর মায়ের হাতে বোনা নকশা করা কাঁথা। শিথানে এবং দু'পাশে দু'টো বালিশ। মেজোমামা আমার দুই হাত দুই ঠ্যাঙের মধ্য দিয়ে গলিয়ে পিছন থেকে সাপটে ধরলেন। লোকমান খালিফা আমার শিথিল অঙ্গটা নাড়াচাড়া করে বলে উঠলেন, এ যে কলার খোসার মতো। এক্ষুনি হয়ে যাবে। বুঝলাম শলা ঘোরানো থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। চোখ বাঁধা হল। কাঁথার ওপরে একটা কলাপাতা। কলাপাতার ওপরে আমার নিম্নদেশ। জিগ্যেস করা হল, কলমা জানো? আমি কাঁপা গলায় বললাম। লা ইলাহা ইলাল্লাহো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ...তারপর বাংলায় বল্লাম—হে আল্লা, ব্যাথা দিওনাগো। আল্লা বাংলা ও বোঝেন নিশ্চই।

একবার হে মা কালীও বলে ফেল্লাম। কলমা শেষ হতেই শুনি—ওই দ্যাখ তোর মাথার ওপর ফিচিং পাখি। চোখ বন্ধ অবস্থায় আমি মাথার ওপর তাকাই। আর তখনই আমি লিঙ্গে কিছু একটা অনুভব করি। এক মুহূর্তের যন্ত্রণা। আমার যখন চোখ খুলে দেওয়া হল, আমি বিছানায়। কলাপাতা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা রক্তপাত কলাপাতার ওপরেই পড়েছে। লক্ষ করি নিম্নাঙ্গে পোড়া ন্যাকড়ার বেষ্টনী। দুই মামা ছোট-ছোট বালির পুঁটলি কুল কাঠের আঁচে গরম করে চারপাশ সেঁক দিচ্ছে। সেদিন কিছুক্ষণ টনটন করেছিল। প্যান্ট পরার সময় প্রথম কয়েকটা দিন কেমন যেন সরসর করত। সাতদিন পর প্যান্ট পরা গেল। তারপরই অনেকটা ঠিকঠাক হয়ে যায়। পুরোপুরি সারতে—মাসখানেক লেগে যায়।'

অনেক কিছু জানা গেল। একটা আন্তরিক বর্ণনা দিয়েছে আনসারুদ্দিন। প্রচুর জ্ঞান হচ্ছে অনিকেতের। এইসব জ্ঞানকে কে কি জি কে, মানে 'জেনারেল নলেজ' বলা যায়? যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডাইরেক্টর-এর জন্য ইন্টারভিউ দিতে যায়, ওকে কি কেউ জিগ্যেস করবে খৎনা কী? কোতি কাদের বলে? এসবও জিগ্যেস করবে, না ধান সেদ্ধ করার পাত্রকে কী বলে? জিরেন রস কাকে বলে? এই কাজ করতে এসে জিরেন রস থেকে মদন রস সব জেনে গিয়েছে অনিকেত। বেশ রসালো কাজ। অনিকেত ভাবে, আনসারুদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওদের গ্রামে গিয়ে 'ও.বি' করবে। 'ও.বি' মানে বাইরে থেকে রেকর্ড করে আনা অনুষ্ঠান।

পায়রাডাঙা থেকে ভ্যান রিকশায় মিনিট কুড়ি গিয়ে, তারপর মিনিট পনেরো হেঁটে একটা বাড়িতে পৌঁছনো গেল। টিনের ঘরের সামনে টিনের সাইনবোর্ডে লেখা ওস্তাদ নূর মহম্মদ আব্বাস। আগেই চিঠি লেখা ছিল। অনিকেতের সঙ্গে মনোজ নামে একটি লম্বা রোগামতো ছেলে। আব্বাস সাহেব আশাহত হলেন। হেঁটে-হেঁটে এসেছে রেডিও-র লোক। সঙ্গে একটা ছোট টেপ রেকর্ডার, যে মেশিনে ওরা হরবখত গান শোনে, ওইরকমই একটা মেশিন। উনি ঘরে বসালেন। শরবত হুকুম করলেন। খৎনা সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া হচ্ছে শুনে উনি বললেন—আমাদের রসুল খৎনা-র সুপারিশ করে গিয়েছেন, সুতরাং এটা করতেই হয়। যেসব বাচ্চার খৎনা হওয়ার আগেই ইন্তেকাল হয়েছে, শেষ বিচারের আগে ওদের অবশ্যই খৎনা করতে হবে। নইলে বেহেস্তে যাওয়া যাবে না। আব্বাস সাহেব বললেন—'আমারও নিস্তার নাই রে ভাই, কবর থে উঠে আমরেও ছুরি ধরতি হবে। বেখৎনা বাচ্চাগুলোকে খৎনা না করি দিলে তো ওদের গতি হবে নে।'

—কিছু অ্যান্টিসেপটিক দেন?

—ওসব কিছু লাগে না। কলমা পড়ে ফুঁ দিই। খৎনার পর ত্যানাপোড়া ছাই আর গ্যাঁদা গাছের পাতা থুপে লাগিয়ে দিই। ওতেই ফতে হয়ি যায়।

—কত মজুরি নেন?

—ওটা মজুরি না। এই নেক কাজের মজুরি হয়? এটা একটা ইমানদারি। পঁচাত্তর, একশো, দেড়শো—যে যা পারে দেয়। এই টাকা সবাই হাসিমুখে দেয়। যখন ছেলের বে দেবে, বিশহাজার পণ হাঁকবে।

এসব কথাবার্তার মধ্যেখানে অনিকেত জিগ্যেস করে ফেলেছিল—আপনি কি অণ্ডকোষও কাটতে পারেন?

'তওবা' 'তওবা' বলে উঠেছিলেন আব্বাস সাহেব। ওটা কাটার কথা উঠে ক্যান, অ্যাঁ? ওটা কাটতে হয়?

'সরি' 'সরি' বলে উঠল অনিকেত।

উনি আবার বললেন—নাউজুবিল্লা, নাউজুবিল্লা।

চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে আছেন। এরপর আর খুব একটা কথা এগোয় না। ভেবেছিল বলবে, সামনে কোনও খৎনা-র অনুষ্ঠান আছে কি না, তা হলে সেটা রেকর্ড করে রাখবে। 'সালাম' জানিয়ে ফিরে আসে অনিকেত। আসলে অনিকেত জেনেছিল লিঙ্গান্তরকামী পুরুষেরা ওদের অণ্ডকোষ-সহ লিঙ্গচ্ছেদন করে গোপনে। কিন্তু এটা তো অধর্মীয়। একজন ধর্মীয় খৎনাকারীর কাছে এই প্রশ্নটা অন্যায়। অনিকেতের নিজের কাজে নিজের খুব খারাপ লাগল।

অঞ্চলটা মুসলিম প্রধান। একটা মাঠের এক কোণে তাজিয়ার কাঠামো পড়েছিল। একটা পাঁচিলের গায়ে, কোথায় যেন উরস হবে, সেটা সাঁটানো আছে। পায়রাডাঙার কাছে এসে দেখল একটা ডাক্তারখানা। ডা. আজিজুল হক, এফআইসিপি। 'এফআইসিপি' কী ব্যাপার কে জানে? 'পি'-তে প্র্যাকটিশনার হতে পারে। যাবতীয় রোগের চিকিৎসা-সহ সুন্নত করা হয়।

সুন্নত দেখে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকল অনিকেত। ওটা চেম্বার কাম বাড়ি কাম পোলট্রি। লম্বা বারান্দার এক কোণে খাঁচার ভিতরে মুরগি। আর এক কোণে ক্রস লাগানো দরজা।

রেডিওর লোক শুনে দরজা খুলে দিল। তখন খুব পাত্তা পেত রেডিওর লোকরা।

—সুন্নতও করেন?

—করি বইকি।

—কী করে করেন?

—আপনি তো হিন্দু...

—হ্যাঁ।

—তবে করালেই বুঝবেন কী করে করি। করাবেন? ডাক্তারটি বেশ রসিক। হাসছেন। বয়েস চল্লিশের মতো। অনিকেতও হে-হে করল।

ডাক্তারটি বলল, আমরা কিন্তু প্রথমেই টেডভ্যাক দিয়ে দিই। হাজামদের মতো নয়। রেকর্ডার অন করে মনোজ।

টেডভ্যাক দিয়ে দেওয়ার পর ইসপিরিট দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করি। তারপর আয়াত পড়ে যন্তরের সাহায্যে খৎনা করি। অ্যান্টিবায়োটিক মলম দিই। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খেতে দিই। ব্যান্ডেজ করে দিই। পানি কম খেতে বলি যাতে প্রেসাবের বেগ কম পায়। সাতদিনে আরাম। হাজামের কাছে খৎনা করালে একমাস লাগে ঘা শুকোতে। আমি ভাল দাবাই দিয়ে দিই। তবু কিছু লোক আছে এখনও পুরনো কায়দায় সুন্নত করায়।

ব্যস, মেটেরিয়াল পেয়ে গেল অনিকেত। এই রেকর্ডিংটাই সাজিয়ে-গুছিয়ে, কিছুটা ন্যারেশন আর মিউজিক দিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে প্রোগ্রাম।

বন্ধুরা, লিঙ্গমুণ্ডের অগ্রভাগের চামড়া অনেকের এমনিতেই বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে উন্মুক্ত হয়ে যায়, অনেকের হয় না। অনেকের এত সেঁটে থাকে যে প্রয়োজন মতো খোলে না। এই অবস্থাকে বলে ফাইমোসিস। তখন সামান্য শল্য চিকিৎসার সাহায্য নিতে হয়। কিছু-কিছু ধর্মীয় বিধান অনুসারে শিশু বয়েসেই লিঙ্গমুণ্ডের আবরক চামড়া সামান্য কেটে দেওয়া হয়। মুসলিম

ধর্মে এর নাম খৎনা। সুন্নত-ও বলা হয়। এখন আধুনিক উপায়েও সুন্নত করা যায়...এরপর ইন্টারভিউটা...।

'বোম্বে দোস্ত' একটি সমকামীদের পত্রিকা। ওর একটা সংখ্যায় অনিকেত দেখেছিল যারা পায়ুসঙ্গম করে ওদের লিঙ্গ মুক্ষ অনাবৃত হওয়া উচিত। নইলে রক্তপাতের সম্ভাবনা আছে, এবং তাতে এইড্‌স্ এর সম্ভাবনাও বাড়ে। আর সমকামীদের মধ্যে যাঁরা বটম শ্রেণির, মানে অনুপ্রবিষ্ঠ করাতে ভালবাসে, ওরা আচ্ছাদনহীন লিঙ্গ পছন্দ করে। কিন্তু এসব কথা রেডিও-তে নয়। রেডিওতে পায়ুসঙ্গমের বিপদের কথাই বলা হবে। অনিকেতের একবার মনে হল মঞ্জুর ছেলেটাকে এই বিপদের কথাটা জানিয়ে দেয়া উচিত। কিন্তু কী করে জানাবে?

কমল গুপ্ত নামে এক রসিক অ্যানাউন্সার একবার বলেছিল—'ঘর মুখো গাই, আর নাই মুখো মাই' আটকানো যায় না। পায়ুমুখো লিঙ্গগুলিকে এইড্‌স-এর ভয় দেখিয়ে হয়তো কিছুটা চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু যে ছেলেগুলো মনেপ্রাণে মেয়ে, যাদের যোনিছিদ্র নেই, ওদের তো পায়ু আছে শুধু, —ওদের কী হবে?

—কে জানে কী হবে? পরের পর্বটা তৈরি করে শোভন পাঠককে অনিকেত বলে, চামড়া ছাড়িয়ে দিলাম দাদা।

অনিকেতের বেশ কয়েকটা নতুন নাম হয়েছে। অফিসের সনৎদা ওকে ডাকে ডা. লামা। কখনও ডা. লোধ। শুক্লা কখনও রেগে-টেগে গেলে বলে 'ভাম' কোথাকার। কেন 'ভাম' বলে কে জানে? জিগ্যেস করা যায়নি। জিগ্যেস করলেও, ঠিকঠাক উত্তর পেত বলে মনে হয় না। 'ভাম' হল এমন একটা প্রাণী, চুপচাপ ছোটখাটো শিকার করে। দেখলে নিরীহ মনে হয়। 'ভাম'-এর আগে সাধারণত বুড়ো শব্দটা লাগিয়ে 'বুড়োভাম' বলারই রেওয়াজ বেশি। শুক্লা 'বুড়োভাম' বলছে না। শুধু 'ভাম'। তবে কি তার ভাম ভীম-জাত? ভীম বোধহয় ভীমরতির সংক্ষিপ্ত রূপ। কিন্তু সনৎদা যে নতুন নামে আজকাল ডাকতে শুরু করেছে, এর ব্যঞ্জনা স্পষ্ট। ডা. লামা এবং ডা. লোধ দু'জনেরই খুব বিজ্ঞাপন বের হয় সেক্সোলজিস্ট হিসেবে। যাবতীয় যৌনরোগ ও যৌন-সমস্যার সমাধান। অনিকেত জিগ্যেস করে, বলুন সনৎদা, আপনার কী সমস্যা? সনৎদা বলে—আমার সমস্যার তুই কিছু করতে পারবি না। একমাত্র ও-ই যদি সল্‌ভ করতে পারে। খবরকাগজের সিনেমার পাতার এক হিরোইনের দিকে ওর আঙুল। অন্য এক সহকর্মী ওকে দেখলেই আজকাল বলে 'হিজুমে'। ছেলেটি কিছুদিন সাঁওতালি বিভাগে কাজ করেছিল, কয়েকটি সাঁওতালি শব্দ শিখেছে। 'হিজুমে' একটা সাঁওতালি শব্দ। মানে 'এদিকে এসো'। 'হিজড়ে' শব্দটার সঙ্গে ধ্বনিগত মিলের কারণেই 'হিজুমে' সম্বোধন। ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল

চেতলায়। হিজড়ে পাড়ার কাছে। এদিকে কোথায়? এর উত্তরে অনিকেত বলেছিল—একটু ও-পাড়ায় গিয়েছিলাম।

—ও-পাড়ায় বলতে?

—হিজড়ে পাড়ায়।

ব্যস, হয়ে গেল।

কিছুকাল আগে একটা সিনেমা এসেছিল 'সড়ক'। এক হিজড়ে চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সদাশিব অম্রপুরকর কিছু একটা পুরস্কারও পেয়েছিলেন। পরিচালক ছিলেন মহেশ ভাট। কিন্তু চরিত্রটা যেন লোক হাসানোর জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। দর্শকের কোনও সহানুভূতি তৈরি হয় না ওদের প্রতি।

একদিন শিয়ালদার কাছে রাস্তা পার হতে যাওয়া একটা বাচ্চাকে ছুটে গিয়ে হাত ধরে টেনে আনতে দেখেছিল একটি হিজড়ে-কে। বাচ্চাটার বিপদ হতে পারত। বেশ সাহসিকতার কাজই করেছিল হিজড়েটি। অথচ 'নপুংসক' বলে একটি গালাগালি আছে, ভিতু-পুরুষদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। হিজড়েদের অপর নাম নপুংসক। আবার ভিতুদেরও নপুংসক বলা হয়। কিন্তু অনিকেতের ধারণায়, হিজড়েরা ভিতু নয়। ট্রেনে যখন ওরা তোলা আদায় করে, কিংবা যখন ঝগড়াঝাঁটি করে, তখন তো ভিতু বলে মনে হয় না। অনেক হিজড়েই লিঙ্গচ্ছেদ করে। ভিতু লোকরা একটা ইনজেকশন নিতেও ভয় পায়। কিন্তু ভয়কে কতটা জয় করতে পারলে লিঙ্গচ্ছেদনের মতো একটা কাজ করতে পারে ওরা!

হিজড়েরা তো বেশির ভাগেই লিঙ্গান্তরকামী। এই ধরনের কয়েকজনের সঙ্গে তো আগেই কথাবার্তা হয়েছে অনিকেতের। কিন্তু ওরা সবাই লেখাপড়া জানা। কেউ-কেউ ভাল চাকরি-বাকরিও করে। কিন্তু রাস্তায় যারা উগ্র সাজে ঘোরে, হাততালি দেয় একটা অদ্ভুত শব্দে, বাচ্চা নাচায়, ওরা নাকি একসঙ্গে থাকে। মূল সমাজে ওরা পাত্তা পায়নি, প্যাঁক খেয়েছে পাড়ায়, অবজ্ঞা পেয়েছে পরিজনদের কাছে, তারপর হয়তো হিজড়েদের দলে গিয়ে নাম লিখিয়েছে। ওখানে একটা সমাজ পেয়েছে ওরা, বন্ধু পেয়েছে, মনখারাপ দেওয়া-নেওয়া করতে পেরেছে, মনের খুশি লোফালুফি করতে পেরেছে, মানে বন্ধু পেয়েছে, হইচই পেয়েছে, যাকে এককথায় বলা যায় 'মস্তি'।

একটা সময় অনিকেত শুনত এবং বিশ্বাসও করত যে, হিজড়েরা যখন 'কার হোলো গো...' বলতে-বলতে হাততালি মেরে বাড়ি-বাড়ি ঘোরে তখন যদি দেখে কোনও শিশু লিঙ্গহীন, বা উভলিঙ্গ—তখন ওরা বাচ্চাটাকে চেয়ে নেয়, এবং বাচ্চার মা-বাবাও ওদের দিয়ে দেয়। এখন জেনেছে, এটা বাজে কথা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। মাও সে তুং-ও বলেছিলেন, নিরক্ষরদের থেকে জ্ঞান নাও। এই বয়সেও ওকে কত কী জানতে হচ্ছে। জানতে ইচ্ছে করছে যে। রাস্তায় যেসব হিজড়ে ঘুরে বেড়ায়, ওদের কাছে গিয়ে তো জিগ্যেস করা যায় না : হিজড়া, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? বললে বলবে, তোমার বাপের পিছন হইতে। ওরা বড্ড খিস্তি দেয়। চেতলা অঞ্চলে ওদের একটা ডেরা আছে। ওদের ডেরার পাশে ঘুরঘুর করেছে, ভিতরে ঢোকার সাহস হচ্ছিল না। মনে সাহস পাম্প করে ঢুকেছিল, হাতে প্যাড আর কলম। দরজা দিয়ে ঢুকে একটা উঠোন, উঠোনের তিনদিকে তিনটে টিনের চালার ঘর। উঠোনে একটা নিমগাছের তলায় খাটিয়া পাতা, খাটিয়ার ওপর লুঙ্গি আর গেঞ্জি-পরা

একজন বিড়ি খাচ্ছে। তখন বেলা দশটা মতো। গেঞ্জিটা ছেলেদের গেঞ্জির মতো নয়। ও কোনও কথা না-বলে সুড়সুড় করে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল। ঘর থেকে শাড়ি পরা একজন বেরিয়ে এল, গরমকাল বলেই হয়তো, ব্লাউজ নেই। ঠাকুমা-দিদিমারা যেভাবে শাড়ি পরতেন, সেই স্টাইলে পরা শাড়ি। বয়সটাও পঞ্চাশের ওপর। লম্বা চুল। বারান্দার ওপর থেকেই চেঁচিয়ে উঠল—অ্যাই? কী হল?

—কিছু কথা ছিল।

অনিকেত শুনেছিল ওদের গুরুমা-রাই হচ্ছে ওদের লিডার।

বলল, গুরুমা-র সঙ্গে দেখা করব।

—আমি-ই গুরুমা।

প্যাডটা বাঁ হাতে, ডানহাতে কলম। প্যাডের ওপর ১-২-৩-৪ করে প্রশ্ন লেখা—সমাজে নতুন হিজড়েরা কোথা থেকে আসে? হিজড়েরা কি সবাই সমকামী হয়? যেসব হিজড়ের পুরুষাঙ্গ আছে তারা কি উভকামীও হতে পারে কখনও? হিজড়েদের নিয়মকানুন...?

গুরুমা বলল, থানায় নতুন আমদানি? গত মাসেরটা তো দিয়ে দিয়েছি...

—না, আমি থানা থেকে না। অনিকেতের নিজের ওপর একটা ইয়ে হল। ওকে পুলিশ ভাবল? ও কি পুলিশদের মতো দেখতে? নিজের আঁতেল-সত্তায় শ্রদ্ধা হারাল।

—থানা থেকে নয়। তবে কোন চুলো থেকে?

—আমি সাংবাদিক।

—সাংবাদিক—তো, সোগামারানির একেনে কী দরকার? কতা? ভাগো, সরে পড়ো...

সরে পড়ে। আর তখনই সেই সহকর্মীর সঙ্গে দেখা, কিছুদিন পর দ্বিতীয়বারের জন্যও। একই জায়গায়, সেই হিজড়ে পাড়ায়। কারণ ও হাল ছাড়েনি। সুমন চট্টোপাধ্যায়ের ক্যাসেটটা ততদিনে বেরিয়ে গিয়েছে, এবং তোলপাড়। তাই হাল ছাড়েনি। জোরে কণ্ঠ ছাড়া ওসব পাড়ায় খুব মুশকিল। এরকম বার দুয়েক দেখা হওয়ার পর থেকেই 'হিজুমে' সম্বোধন।

চেতলার ওই ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, একটা মুদি দোকানে একটা হিজড়ে তেল, ডাল, পেঁয়াজ এসব কিনছে, সবাই যেমন কেনে। ওখানে একটু দাঁড়াল। হিজড়েটা বলে যাচ্ছে—রসুন এক টাকার, চিনি দু'টাকার, চা পাত্তি দু'টাকা, টুপি ছ'টা।

দোকানদার বলল, ভাল জিনিস দেব?

—কোন ভাল জিনিসটা শুনি?

—কোহিনুর...

—না বাবা, অত ফুটুনির কাজ নেই, নিরোধ দাও...।

কথা বলার ইচ্ছে ছিল, বলতে পারল না। কী স্বাভাবিক ভাবে তেল-মশলার সঙ্গে কন্ডোম কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তার মানে, এই মুদি দোকানওলা নিশ্চয়ই জানে যে এরা পিছন-কর্ম করে। হিজড়েটি চলে গেলে অনিকেত দোকানদারটিকে জিগ্যেস করে—এরা সব আপনার খদ্দের?

দোকানদার উত্তর দেয় না। দোকানের তাক সাজাতে ব্যস্ত থাকে। অনিকেত জিগ্যেস করে, এরা এখানে কতজন আছে?

দোকানদার বলে, আপনার কী দরকার?

—আমি সাংবাদিক।

—বিশ-পঁচিশজন আছে।

'আমি সাংবাদিক' না-বললে দোকানদারও ফুটিয়ে দিত। কিন্তু ওরা সাংবাদিক শুনেও ফুটিয়ে দিয়েছিল খিস্তি মেরে।

—ওরা তো বেরিয়ে যায়। কখন বেরয়?

—ন'টা...দশটা...।

—কখন ফেরে?

—আমি কি জিম্মাদরি নিয়েছি নাকি, সব জানতে হবে?

—তা তো ঠিক। বলছি, ওদের গুরুমা-র সঙ্গে একটু কথা বলিয়ে দেবেন?

—না। আমি ওদের ঘরেও যাই না। আপনি আসুন।

অনিকেত চলে যায়। ও ভাবে—রঞ্জন, পবন, অনির্বাণ, বাসব, এদের সঙ্গে তো পরিচয় আছেই, ওদের কাছ থেকে জেনে নেবে। কিন্তু এটাও ঠিক, এখানেও একটা শ্রেণিবৈষম্য আছে। ওরা হল 'গে'। ওরা অভিজাত। ওরা ইংরেজি বলতে পারে, কেউ-কেউ ভাল চাকরি করে, চাউ-পিৎজা-বার্গার-আইসক্রিম খায়। ওরা কোহিনুর-কে 'ফুটুনি' ভাবে না, আরও ভাল কিছু কিনতে পারে। ওদের সঙ্গে এদের অনেক তফাত। ওরা এদের কথা জানে না।

একদিন অনিকেতের মনে পড়ল ওর স্কুলের এক সহপাঠী পুলিশে চাকরি পেয়েছিল। ওকে 'মুচো' বলে ডাকা হত। মুচো নামের উৎপত্তি মোচ বা গোঁফ থেকে নয়। ওকে 'মুরগি চোর' বলে ডাকা হত। কেন যে ডাকা হত কে জানে? সংক্ষেপে 'মুচো'। ও পুলিশে চাকরি পেয়েছিল। মুচো-র ভাল নামটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না।

অবশেষে খোঁজখবর করে জানতে পারল, মুচো এখন চেতলা থানারই ওসি। নারায়ণ বিশ্বাস। অফিসের গাড়িটা নিয়ে হাজির হল চেতলা থানায়। গাড়িটা নিল—যাতে ওসি একটু পাত্তা দেয়।

মুচো চিনতে পারল অনিকেতকে।

স্কুল-জীবনের সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা হলে স্যরদের কথা ওঠে, দুষ্টুমি, এইসব। এসব কথা ওঠার আগেই অনিকেত বলল, আমায় একটু হেল্প করবি?

—পুলিশের কাছে এসেছিস যখন নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছিস। কী হয়েছে?

অনিকেত বলল—আমাকে একটু হিজড়ে পাড়ায় এন্ট্রি করিয়ে দিবি? তোর এলাকায় তো হিজড়ে পাড়া আছে।

অবাক হয়ে তাকায় মুচো।

অনিকেতের মনে হয় এই মুহূর্তে প্রসঙ্গ উল্লেখ-সহ ব্যাখ্যা করা দরকার, কিংবা সরলার্থ, কিংবা ভাবার্থ। কিন্তু 'কমন' না-আসা প্রশ্নের উত্তর-অপারগ বেচারার কলম কামড়ে থাকার মতো মুখ করে বসে থাকে।

—হিজড়ে কী হবে তোর? তুই তো খুব ভাল ছেলে ছিলি রে অনিকেত?

অনিকেতের সঙ্গে মুচো-র দেখা বহুদিন পর। কালের ব্যবধানে কার কী হাল হয় কে জানে? ইতিবৃত্ত বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। তবে রেডিওতে চাকরির কারণে ছোট করে বলাটা রপ্ত হয়েছে। কারণ পাঁচ মিনিট, ন'মিনিট, তেরো মিনিট ইত্যাদি সময় অনুসারে ফিড করার ব্যাপারে একটা পারদর্শিতা জন্মেছে। ও চার মিনিটের চাংক-এ ব্যাপারটা বোঝাল। মুচো

বলল—হিজড়েদের জীবন যন্তরনা চাই? তুই কি লেখকও হয়েছিস নাকি? এসব কাগজ-রেডিও-টিভিতে যারা করে খায়, ওরা নাকি আবার লেখকও হয়। মুচিপাড়া থানায় যখন ডিউটি ছিল, তখন বেশ কয়েকবার হাড়কাটা রেইড করেছিলাম। প্রায় প্রতিবার দু-এক পিস কবি-সাহিত্যিক পেয়েছিলাম। সবাই বলেছে জীবন যন্তরনা চাই। যন্তর চাই কেউ বলে না—সব বলে যন্তরনা চাই।

তারপর ওর এক রেইড-করা আখ্যান ব্যাখ্যান করে বলতে লাগল।

মুচো একটু বেশি কথা বলে। ওকে পাঁচ মিনিটের চাংক-এ কোনও টক দিলে নির্ঘাত প্রচুর এডিট করতে হবে। তারপর মুচো জিগ্যেস করল, অ্যাকচুয়ালি তুই কী চাস বল তো? তুই কি ডাব্‌লডেকার?

'ডাব্‌লডেকার' শব্দটার অর্থ ও জানে। গে-দের কোনও এক পত্রিকায় শব্দটা পেয়েছিল। মানে যারা সামনে এবং পেছনে—দু-জায়গাতেই অভ্যস্ত। উভকামী আর কি। জোরে মাথা নাড়ায় অনিকেত। বলল, জাস্ট কিছু ইনফর্মেশন নেব। কিছু প্রশ্ন লেখা আছে। আমি একবার গিয়েছিলাম, ফুটিয়ে দিয়েছে। শুনেছি থানার সঙ্গে ওদের একটা ইয়ে থাকে অনেক সময়। সঙ্গে পুলিশ যদি থাকে, তা হলে হয়তো কিছু বলতে পারে।

মুচো হাসল। বলল, ওক্কে ওক্কে। বুঝেছি। একজন কনস্টেব্‌ল ওদিকটা বিট করে, ওকে ফিট করে দিচ্ছি তোর সঙ্গে। চা খা।

ঘরে মুচো ছাড়া আর কেউ ছিল না। ও বলল—ওর সঙ্গে ঘ্যাম নিয়ে থাকবি। বেশি কথা বলবি না। কারণ কী, আমি ওসি, তুই আমার বন্ধু। এসব পয়দা আমি ছুঁই না। ছুটকো। থ্রি সেভেন্টি সেভেন-এ পয়সা নেই। ওরা যা পারে করুগ গে...।

—মানে?

—মানে, আইপিসি থ্রি সেভেন্টি সেভেন হল একটা কুমিরছানা, যেটা দেখিয়ে দু-চার পয়সা পাওয়া যায়। মানে, এই আইনে উল্টোপাল্টা সেক্স বেআইনি। উল্টোপাল্টা মানে উল্টোদিকে। হিজড়ে-বৃত্তি কিন্তু বেআইনি নয়। এর এগেনস্টে কোনও আইন নেই। ছেলে নাচানো, তালি-মারা, খিস্তি করা—এসব চলতে পারে। কিন্তু পেছনকম্মটির বিরুদ্ধে থ্রি সেভেন্টি সেভেন আছে। হিজড়েদের ঘরে সন্ধের পর রেড করলে ওরকম কেস পাওয়া যায়। এজন্য ওরা ফিটিং করে রাখে। ওখানে অবশ্য কবি-সাহিত্যিক যায় না। তবে আমি বাড়ি দু-তিনটের কথা জানি, আমি কখনও যাইনি।

যে কনস্টেব্‌লটিকে ফিট করে দেওয়া হল, ওর নামই জিগ্যেস করেনি অনিকেত। ঘ্যাম নিয়েছে। কিন্তু গুরুমা-র নাম জিগ্যেস করল। কমলা। অনিকেত বলেছিল, আরও আগে একদিন এসেছিল, কোনও কথা বলেনি।

কনস্টেব্‌ল বলল—ওরা এরকমই করে।

অনিকেত বলল—সেদিন দেখলাম একজন লুঙ্গি পরে খাটিয়ায় বসেছিল। ওরা কি লুঙ্গিও পরে?

—ও বোধহয় মিনসে।

—মিনসে মানে?

—ওদের কাজকম্ম করে, খেটে দেয়। কখন গিয়েছিলেন?

—দুপুর নাগাদ।

—দুপুরে? থালে মিনসেটাই ছিল। ওরা রাতে সবাই থাকে। এখন গুরুমা-কে পাবেন, আর যদি দু-একজন থাকে জ্বরজারি হওয়া...।

গাড়িটা থামল ও-পাড়ায়। সেই মুদি দোকান। বিকেল হয়েছে। মুড়ি-চানাচুর কিনে নিয়ে গেল একটি হিজড়ে।

কনস্টেব্‌লটি বলল, আসুন। উঠোনের সামনে দাঁড়িয়ে একটা গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, কমলদি আচো...

—ক্যা রে...?

—আমি। থানাবাবু।

—অ। এখন আবার কী হল? ঝলকি তো দিয়েছি।

—ঝলকি নয়, বড়বাবু একজনকে পাঠালেন। সাংবাদিক।

—পাতিয়া? পাতিয়া পাঠাল কেন?

—কথা বলে দ্যাখোই না।

অনিকেতকে হাতছানি দিয়ে ডাকল কনস্টেব্‌ল।

অনিকেত সামনে যেতেই সেই গুরুমা বলল, আরে, এ তো আর একদিন এসেছিল।

অনিকেত বলল, সেদিন তো কথা হয়নি।

—বোসো। খাটিয়ার দিকে ইঙ্গিত গুরুমার।

খাটিয়ায় বসল অনিকেত।

গুরুমা, মানে, কমলদি বারান্দায়। কনস্টেব্‌ল দাঁড়িয়ে আছে।

—কী বলবে বলো...হাত নাড়াল গুরুমা।

—আমি কী আর বলব? আপনাদের কথা কিছু বলুন।

—বা-আ-রে...বলুন...। আমার এখন ভড়কানি পায়নি যে ভড়কাব।

কনস্টেব্‌লটা হাসছে। অনিকেতকে বলল, ভড়কানি মানে পায়খানা করা।

যত্ত সব বিলন্‌তিস...মুখটা বিকৃত করল গুরুমা। অনিকেত আন্দাজ করল—বিলন্‌তিস মানে বাজে ঝামেলা বা উৎপাত। এরকম কিছু। অনিকেত বলে, আপনাদের সমস্যার কথাটা জানতে এসেছিলাম আর কী।

গুরুমা বলল—মেন সমস্যা তো আমাদের হচ্ছে টুপি। বাচ্চাকাচ্চাই হচ্ছে না। বাচ্চার মশলা রবারের টুপিতে সেদোচ্ছে। বাজার খুব খারাপ। সেকেন্ সমস্যা হল ফ্যালাট বাড়ি। ওকেনে ঢোকা যায় না।

অনিকেত জিগ্যেস করে—আপনার আন্ডারে যারা আছে, ওরা যা রোজগার করে, তা কি সব আপনাকে এনে দেয়?

খেঁকিয়ে উঠল গুরুমা। তোমায় বলব কেন গা?

পুলিশের লোককে বলল—কাটো তো, ঝাকে লিয়েসচো, তাকে লিয়ে কাটো, তোমার এ মাসের ঝলকি হয়ে গেচে, যাও...

'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব' মনে এসেছিল একবার। কিন্তু যেতে হয়। যেতে হয়, নইলে খিস্তি শুনতে হয়।

চলে যায়, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে একটা আকাঙক্ষা থেকে যায়। একটা গান শুনেছিল বিমান মুখোপাধ্যায়ের কাছে—আমার গোল্লায় গেছে মন, নজরুলগীতি, যদিও পরের লাইনটাই ছিল, আমার রসগোল্লায় গেছে মন।

অনিকেতের গোল্লায়-যাওয়া-মন খুঁজতে লাগল আরও খবরটবর। জানল—ট্যাংরা, টালিগঞ্জ, উল্টোডাঙা, খিদিরপুর এসব অঞ্চলে কিছু হিজড়ে ঠেক আছে। কিন্তু ওর যা অভিজ্ঞতা, একা গেলে কিছু লাভ নেই। আইভি-কে নিয়ে এলে হয়? আইভি কি রাজি হবে?

ইতিমধ্যে বাসবকে খুব ফ্র্যাঙ্কলি জিগ্যেস করেছে হিজড়েদের নিয়ে কোনও কাজ-টাজ হচ্ছে কি না। বাসব কুরিয়ান, প্যাটেল, জিয়া জেফরি—এরকম কয়েকটা নাম বলল। অজয় মজুমদার, নিলয় বসু এরাও নাকি এদের নিয়ে কাজ করছে জানাল, আর সোমনাথ ব্যানার্জির কথাও বলল, ও নাকি বগুলার দিকে কোনও কলেজের পার্টটাইম লেকচারার। আশাপূর্ণা দেবীকে নিয়ে পিএইচডি করছিল। ও নাকি এসব নিয়ে একটু কাজ-টাজ করছে। ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ। ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি। ও নৈহাটিতে থাকে।

একটা রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অনিকেতের। মূলমঞ্চ থেকে একটু দূরে, নন্দনের কাছাকাছি ওরা পাঁচ-ছ'জন গুলতানি করছিল। মেয়েদের পোশাকে কেউ ছিল না, কিন্তু কেউ-কেউ কাজল পরা ছিল, ঠোঁটও রাঙানো ছিল। বাসব সোমনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আরও কয়েক জন ছিল। সনাতন, জয়ন্ত, নয়ন, শুভজিৎ—এরকম সব নাম। বাসব তো ফার্স্টক্লাস পাওয়া, বাংলায়। একটা স্কুলের টিচার। সোমনাথও ব্রিলিয়ান্ট। কিন্তু অন্য যারা আছে, তারা ঠিক সেই পর্যায়ের নয়। কারও বিউটি পার্লার আছে, কাউকে মুদি দোকানে বসতে হয়। আসলে বাপের দোকান, বসতে হয়—মহা জ্বালা। ওরা সবাই রং-তামাশা করছিল। কথা বলার ধরন অনেকটা মেয়েদেরই মতো।

সোমনাথ বাসবকে জিগ্যেস করল, পারিক?

'পারিক' মানে জানে অনিকেত। পুরুষ-যৌনসঙ্গী। বাসব বলে—ধুর। অনিকেত ব্যানার্জি। রেডিও শোনো না?

সোমনাথ বলল, আমার বাবা শোনে।

বাসব তখন কিছুটা বলল অনিকেত সম্পর্কে।

সোমনাথ বলল, শুনেছি এরকম কিছু একটা রেডিওতে হয়েছে। খামোকা এসব করতে গেলেন কেন?

অনিকেত বলল, খামোকা বলছেন কেন? এটাও একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক।

—কবে কবে হয়?

—শেষ হয়ে গিয়েছে।

—তবে তো ল্যাটা চুকেই গিয়েছে।

—অনিকেত বলল, ল্যাটা চোকেনি। অফিসের অ্যাসাইনমেন্ট-টা শেষ হয়েছে। কিন্তু আমার ব্যাপারটা দ্য এন্ড করতে ইচ্ছে-করছে না।

বাসবের কাছে শুনলাম আপনি ইউনাকদের নিয়ে কাজ করছেন। আমাকে একটু সাহায্য করবেন?

—হিজড়ে বললে হয় না? ...ইউনাক...জাঙ্গিয়ার বুকপকেট...।

অনিকেত মাথা চুলকোয়।

—হ্যাঁ, কিছু-কিছু তো করেছি। গিয়েছি ওদের খোল-এ। —সোমনাথ বলে।

—কেন গিয়েছিলেন? অনিকেত জানতে চায়।

—নিজেকে চিনতে। রবীন্দ্রনাথের একটা গানে আছে না—আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না/এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।

অনিকেত দেখল মানুষটা খুব ইন্টারেস্টিং। মুখ-খারাপও করে, আবার সিরিয়াস গানের লাইনও বলে। অন্য ছেলেপুলের ওপর সোমনাথের একটা প্রভাবও আছে মনে হল। লম্বায় ও সবার চেয়ে বড়। ছাতিতেও। যতই মেয়েলিপনা করুক না কেন, বড়সড় চেহারা, মানে, পুরুষালি চেহারার একটা শাসন কিন্তু রয়েই যায়।

সোমনাথ কিন্তু একদিন সত্যিই নিয়ে গেল ঋষি বঙ্কিম রোডের একটা খোল-এ। হিজড়েদের বাসস্থানকে ওরা 'খোল' বলে। ওখানে আট-ন'জন থাকে। সোমনাথ ঘরের সামনে গিয়ে হাঁকল, কে আছো গো...। একজন বেরিয়ে এল, বেশ লম্বা। শাড়ি পরা, ওকে দেখে সোমনাথ বলল, আজ ছল্লা গেলে না? ও মুখ বেঁকিয়ে বলল না, গো...। শরীল খারাপ..., মাসিক হয়েছে—বলে শরীর বেঁকিয়ে অদ্ভুত হাসল। আবার বলল, নিরখা ঝরছে বাট্টুতে।

বোঝাই যাচ্ছে সোমনাথের এখানে যাওয়া-আসা আছে।

সোমনাথ বলল—ওর নাম ফুলঝুরি।

ফুলঝুরি বলল—কে গা? সঙ্গে? কোতি?

সোমনাথ বলল—জানি না। আমার বন্ধু। একটু দেখাতে নিয়ে এলাম। দু'টো কথা বলবে।

—কী কতা বলব? গুরুমার নিষেধ আছে।

সোমনাথ বলল—গুরুমা কোথায়? আমি পটিয়ে নিচ্ছি।

—গঙ্গাচ্যানে গেচে। আজ মঙ্গলচণ্ডী কি না।

—কী রান্না হচ্চে আজ?

—তেতোর ঝোল, ডাল, আলুচোখা—ব্যাস।

—ডাক্তার দেখাচ্ছ?

—কেন?

—ওই বাটলি নিরখার?

—বলছে অপরেশন করতে হবে। আঙুর হয়েছে। কী ঝকমারি বলো দিনি...।

—তোমার ছেলে কই?

—ওই তো...। একটা নেড়ি-কুকুরকে দেখাল, বারান্দার কোনায় গুটলি মেরে শুয়ে আছে।

—'সড়ক' সিনেমাটা দেখেছ?

—না।

—'লাওয়ারিস'?

—দেখেচি।

অনিকেত জিগ্যেস করল, তোমরা কি সত্যিই ওরকম সিনেমার মতো নাকি?

ফুলঝুরি কিছুক্ষণ উদাসভাবে চেয়ে রইল। তারপর বলল—আমাদের মজা লাগে। অনিকেত ভাবল ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছে বোধহয়।

জিগ্যেস করল—তোমাদের এখানে নতুনরা আসে?

—আসে তো।

—কীভাবে আসে?

সোমনাথ অনিকেতের হাতটা ধরে চেপে দেয়।

সোমনাথ তারপর দু'চার কথার পর বলল—চলুন, উঠি।

অনিকেতের প্রত্যাশা মিটল না।

রাস্তায় সোমনাথের সঙ্গে যাচ্ছে। দু-একজন লোক ওর দিকে কেমনভাবে যেন তাকাচ্ছে।

সোমনাথ বলল—ওরা সব কথা বলে না। 'কী করে নতুনরা আসে?' বললে উল্টোপাল্টা বলবে।

—ওরা কি জোর করে নিয়ে আসে?

সোমনাথ বলল, একদম নয়। স্বেচ্ছায় চলে আসে। আমিই যদি গরিব ঘরে জন্মাতাম—হয়তো আমিই এদের দলে ভিড়তাম...

অনিকেত বলল, কয়েকটা কথার মানে বুঝলাম না...যেমন নিরখা...

—মানে, রক্ত। রক্ত। ফুলঝুরি বলল মাসিক হয়েছে। উইশফুল থিংকিং। আসলে ওর অর্শরোগ আছে। বলছিল না—বাটলি-আঙুর?

অনিকেত জিগ্যেস করল আপনি ওদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন। বলবেন আমাকে? সোমনাথ বলল, অনেক কিছুই জানি না।

অনিকেত বলল, সে তো নিউটনও বলতেন উনি ফিজিক্স-এর কিছুই জানেন না।

সোমনাথ বলল—দু'টো এক নয়। নিউটন তো অংকে আর ফর্মুলায় ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, আর এই জগৎ অংকে ব্যাখ্যা হয় না। ভীষণ আলো-আঁধার আর গলিঘুঁজি। আমিও তো জানার চেষ্টা করছি...। আসলে নিজেকেই জানতে চাইছি...।

আবার একদিন অনিকেত ওখানে গেল। একা। অ্যাডভেঞ্চারে পেয়ে বসেছে। কী আর করবে ওরা? মারবে তো না!

ওখানে হাজির হল ফের। সন্ধ্যাবেলা। গণিকাপল্লির ভিতর দিয়ে রাস্তা। এখানে চেনাশোনা কারও থাকার কথা নয়। কেউ দেখবে না। সব গা-দেখানো হাফড্রেস-এ দাঁড়িয়ে। অনিকেতেরও যে একটু-একটু লিক্‌ম ফড়কাচ্ছে না, তা নয়। লিক্‌মের কী দোষ? ওই বাড়িতে হাজির হল।

ও ডাকল, ফুলঝুরি দিদি...।

ঘরে মদের আসর বসেছিল হয়তো। ফুলঝুরি দিদি এল। হাতে গেলাস...।

—ক্যা...রে...এ...

—আমি, আমি, সেদিন এসেছিলাম...।

—কী চাই?

—ভাল আছেন?

—কী চাই বল না...

—দু'টো কথা ছিল...

—কী কথা...

—আচ্ছা...আপনাদের না কি নমাজ পড়তে হয়...?

—আর কী পোস্নো?

—বাচ্চাদের যদি নুনু না-থাকে ওদের বাপ-মা'রা আপনাদের দিয়ে দেয়?

প্রশ্নটা শুনেই বোধহয় তিন-চারজন বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

—বাপমারানির ব্যাটাটা ক্যা রে...একজন জিগ্যেস করল।

ফুলঝুরি বলল, কোতি সোমনাথ নিয়ে এসেছিল একদিন...

একজন বলল—সিআইডি-গিরি করতে এয়েচ? ভাগো, এক্ষুনি ভাগো...।

এরই মধ্যে একজন ওর কাপড়টা তুলে দিল। শেষ অবদি এটাই তো তোদের পুছ—কী থাকে। দ্যাক...!

অনিকেত ওখানে জমাট-বাঁধা অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না।

একজন বয়স্কমতো হিজড়ে বলল—জন্মের সময় তোদের কোল দিইচি। আশীর্বাদ করিচি। এখন আমাদের লিয়ে সিআইডি-গিরি কোরো না। আমাদের বাঁচতে দাও। কেঁদে ফেলে বুড়ি হিজড়ে। হাতের মদের গেলাস কাঁপে।

কান্নাটা সংক্রমিত হয়। কান্না পিছনে ফেলে ফিরে আসে অনিকেত।

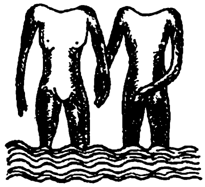

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম—এই গানটা শুনল স্বপন বসুর গলায়। জিন্‌স পরে লোকসংগীত গাওয়াটা বোধহয় তিনিই শুরু করলেন। বেশ কিছু গান সংগ্রহ করেছে ও। আমাদের অনেক গান পানাপুকুরের কাদায় ডুবে গিয়েছে, অনেক গান পটাশ-ইউরিয়া-অ্যামোনিয়া মাখা মাটির সঙ্গে ধুয়ে চলে গিয়েছে খালে, বিলে, ড্যামের লকগেট-এ আটকে আছে কিছু গান, কিছু গান কুয়োয় পড়ে আছে। হেমাঙ্গ-খালেদ-কালী দাশগুপ্ত বা অমর পাল-রা কিছু গানকে তুলে শুশ্রূষা দিয়েছেন। কিন্তু আদুড় গায়ের গানের শরীরে নতুন জামা পরিয়ে আলো-মাখা স্টেজে হাজির না-করলে নব্য-মধ্যবিত্ত পাত্তা দেবে না—এটা বুঝেছিলেন স্বপন বসু। ওই গানটা ছিল—

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নও জোয়ান হিন্দু মোসলমান
মিলিয়ে বাঙলা গান আর মুর্শেদি গাইতাম
হিন্দু বাড়িতে যাত্রাগান হইত—
নিমন্ত্রণ দিত, আমরা যাইতাম...

ওই গানটার কথা মনে রেখে অনিসেত মনে মনে একটা গান ভাবে—

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম

অফিসের পরে
কফি হাউসের ঘরে
টেবিল চাপড়াইয়া উজির মারিতাম।
কিংবা ঘরে আসিয়া
বউ-এর পাশে-বসিয়া
মন দিয়া সিরিয়াল দেখিতাম
হায় রে
আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
গিন্নির সঙ্গে বসিয়া
দু'জনে রসিয়া রসিয়া
পাশের ফ্ল্যাটের বউয়ের নিন্দা করিতাম
দূর হইতে তাহাকেই ঝাড়ি করিতাম
আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।

আর এখন হয়েছে যত গেরো। মঞ্জু জুটেছে। ছেলের সমস্যা নিয়ে আসছে, নিজেরও সমস্যা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করছে। আসলে ওর সমস্যার অনেকটাই ওর ছেলেকে জড়িয়ে। নিজের অর্থনৈতিক সমস্যাও আছে কিছুটা। একটা শাড়ি কিনে দিয়েছে একদিন। মঞ্জু আপত্তি করেনি। টাকাপয়সা দিলেও নিয়ে নেবে। এটা বোঝা গিয়েছে, মঞ্জু ফ্রিজিড। কামশীতল। এবং এই শীতলতার জন্য দায়ী ওর কৈশোরকালীন শক। সেই ট্রমাময় দিনগুলোর, ঘটনাগুলোর অভিঘাত। মন এক আজব বস্তু। বস্তুই তো! ম্যাটার? মন কি বস্তুরই কোনও ধর্ম? কে জানে বাবা। এই যে পিটুইটারি, কিং অফ অল এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস, এই পিটুইটারি-ও তো মনচালিত। অ্যাড্রিনালিন বলো, টেস্টাস্টোরেন বলো, ইস্ট্রোজেন বলো, প্রজেস্টেরন বলো—সব কিছুকেই কন্ট্রোল করছে পিটুইটারি। আর যাবতীয় লিবিডো তো হরমোন-তাড়িত। মন বড়, না হরমোন বড়? এ নিয়ে যদি তর্ক হয়, অনিকেত তো মনের দলেই যাবে। শুক্লার যখন হিস্টোরেক্টমি হল, জরায়ু-টরায়ু বাদ গেল, তারপর কতদিন ধরে ওর গ্যাস-অম্বল। কিছুতেই সারে না। ওভারি-টোভারি-র সঙ্গে অ্যাসিডিটি-র কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু ওটা হল। প্রচুর অ্যান্টাসিড-এন্‌জাইম ইত্যাদি খেয়েও যখন কিছু হল না, তখন মনের ডাক্তারের কাছে গেল। উনি কিছু ওষুধ দিলেন, মনের ওষুধ। তাতেই তো কমল। ওই যে ওষুধগুলো দেওয়া হয়েছিল, ওগুলো কতগুলো কেমিক্যাল। কিছু রাসায়নিক মলিকিউল। মানে, বস্তু। বস্তু তো বস্তুর সঙ্গেই ক্রিয়া করবে। মন কি তবে বস্তু? মন কি স্নায়ু, মানে, নিউরন-শৃঙ্খলের মধ্যে বিঁধে থাকা কিছু রাসায়নিক কোড? কে জানে রে বাবা!

মঞ্জুর কথা হচ্ছিল। মঞ্জুর ফ্রিজিডিটি-র কারণেই ওর বর ফুটেছিল। এই সত্যটা মঞ্জুও স্বীকার করে। রাতের-পর-রাত একটা কাঠ-শরীরের সঙ্গ ভাল লাগেনি ওর। কম্পন কে না চায়? কে না চায় হিল্লোল? সমুদ্রের কাছে ছুটে যাওয়া ঢেউ ভালবেসে। মঞ্জুকে একবার বলেছিল, ছেলেকে ওষুধ না খাইয়ে তুই খা বরং। ওষুধ তোকে লিবিডো দেবে।

লিবিডো কী?—মঞ্জু জিগ্যেস করেছিল।

লিবিডো?—ওটাও খুব কঠিন প্রশ্ন। সাইকোলজি-র বইতে নিশ্চয়ই এর একটা সংজ্ঞা

আছে। প্রশ্নপত্রে চার-ছ'নম্বরের শর্ট নোট লিখতে হয় নিশ্চয়ই। সেই সংজ্ঞা অনিকেত জানে না। ও বলেছিল—ওটা হল ইচ্ছে। যে-ইচ্ছে শরীর জাগায়।

—ওটা দিয়ে আমার কী হবে? কী করব আমি লিবিডো দিয়ে?

কথাটা ঠিকই ছিল মঞ্জুর পক্ষে। অনিকেতও কখনও নিজের শরীর জাগানোর ওষুধ-বিষুধ ব্যবহার করেনি। ওরও একই সমস্যা। শুক্লার শরীরেও ঢেউ নেই, হিল্লোল নেই। আগে ছিল, এখন নেই। এর কারণ মন নয়, হরমোন। চিনেবাদামের মতো ছোট-ছোট দু'টো ওভারিই তো ইস্ট্রোজেন-প্রজেস্টেরন দেয়।

তাতেই তো রক্তে দোলা লাগে, অঙ্গ লাগি অঙ্গ কাঁদে, কী গুণ করে ওই কেমিক্যাল যে, মদন আগুন জ্বলে, কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরো-থরো, ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে। শুক্লার ইস্ট্রোজেন নেই, প্রজেস্টেরন নেই। হাঁটুব্যথা আছে। ওর তো কোনও দোষ নেই। নক্ষত্রের দোষ। নক্ষত্র মানে তো কেমিস্ট্রি। অনিকেত ব্যাপারটা বোঝে। অনিকেতের একটা যৌন-অবদমন আছে। কে জানে—ওই অবদমনের কারণেই এসব বিষয়ে এতটা মন দিচ্ছে কি না। ফ্রয়েড-ট্রয়েড ঘাঁটাঘাঁটি করার এই হল মুশকিল।

সেই কমল গুপ্তর কথা মনে পড়ল। ও খুব বেচারার মতো মুখ করে জিগ্যেস করেছিল—অনিকেতবাবু, আপনার জং না কড়া?

ব্যঞ্জনার্থ বুঝতে কিছুটা সময় লাগলেও, শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল। বেশি ব্যবহারে কড়া পড়ে। যারা বেশি হাতুড়ি পেটায়, ওদের হাতে কড়া হয়। আর অব্যবহৃত থাকলে মরচে পড়ে যায়। যারা ফাইমোসিস-এর কারণে পুংযন্ত্র পরিষ্কার করতে পারে না, ওদের ভেতরে এক ধরনের আস্তরণ পড়ে। ওটা মরচেই তো, অব্যবহৃত থাকলেও ওরকম হয়। অনিকেত বলেছিল, আমার তো দাদা মরচে। উনি বললেন, অমুকের-অমুকের তো কড়া পড়ে গিয়েছে। কড়া তো চাইলেই পাওয়া যায় না, অর্জন করে নিতে হয়।

'কড়া' আর 'মরচে' কথায়-কথায় এসে পড়ল, কী করা যাবে। কথা হচ্ছিল গেরো নিয়ে। অর্জন করা গেরো। অর্জিত ঝামেলা।

মঞ্জু একটা গেরো। পবন, বাসব—ওদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর আর একটা অজানা জগৎকে জানার ইচ্ছেটাও একটা গেরো। কোথায় কীভাবে খৎনা হয়, সেটার জন্য গাঁয়ে চলে যাওয়া, কোথায় হিজড়েরা থাকে, ওটা দেখার জন্য ঝামেলা পোহানো, এর কোনও দরকার ছিল? 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম'। এখন চিঠি আসছে 'প্রবর্তক'-এর কাছ থেকে, 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি'-র কাছ থেকে, আজ আইপিসি ৩৭৭ ধারার বিরুদ্ধে কনভেনশন, কাল গে চলচ্চিত্র উৎসব...। আমেরিকা, কানাডা, সুইডেন, ডেনমার্ক এসব দেশের গে-রা কী ধরনের ছবি করে, কিংবা ওদের ছবিতে গে-রা কীভাবে এসেছে—এসব নিয়ে ছবি। 'যাক গে মরুক গে' করে এড়িয়ে যেতেও পারছে না। আবার সোমনাথ ব্যানার্জি বলছে, আমি 'অবমানব' নামে একটা কাগজ করব, আপনাকে লেখা দিতে হবে কিন্তু। অনিকেত বলল, আমি আবার কী লিখব? ও বলল, আপনার অভিজ্ঞতার কথাই লিখবেন। ওখানে কিছু লিখলেই 'প্রবর্তক' থেকে বলবে, এ বলবে, সে বলবে। এমনিতেই তো ওর নাম ডা. লোধ হয়েই গিয়েছে! তার ওপর আবার?

ইতিমধ্যে ও খোঁজ পেল বলরামবাটিতে একটা মেলা হয়, ওখানে হিজড়ে সম্প্রদায়ের

মানুষরা আসে। মেলাটা নাকি দেখার মতো।

আমাদের মেলাগুলো বড় বিচিত্র। বহু মেলার সঙ্গেই লোককথা জড়ানো, এবং এক-একটা মেলা এক-একরকম। বহু মেলাতেই ঘুরেছে অনিকেত। কখনও কর্মসূত্রে, কখনও নিজের উদ্যোগে। জয়দেবের মেলায় বাউল গান তো হাড়োয়ার মেলায় মোসলমানি জলসা। বিষ্ণুপুরে সাপ খেলা তো পরকুলে টুসুগান। গঙ্গাসাগরের মেলায় তো গোটা ভারতবর্ষ।

অনিকেত বলরামবাটি চলল সকালবেলা। শুক্লা জানে, ন্যানো মেটেরিয়াল নিয়ে সারাদিনের সেমিনার শুনতে যাচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে বলরামবাটি স্টেশনে নামতে হয়। ওখান থেকে দু'কিলোমিটার দূরে বাসুবাটি নামে গ্রামে আছে একটা পিরের মাজার। ওই পিরের নাম জালালুদ্দিন পির। ভেবেছিল, ট্রেনে অনেক হিজড়ে মানুষের দেখা পাবে। চোখে পড়ল না। হয়তো অন্য কামরায় আছে। চপলকান্তি ভট্টাচার্যর 'বাংলার মেলা' বইটায় পড়েছিল অনিকেত—'হিজড়ারা দলবদ্ধ হইয়া মিছিল করিয়া অগ্রসর হয় বাসুবাটির পথে। এই মিছিলের নাম সন্দল। মাজারের নিকটেই হিজড়াগণের জন্য নির্মিত হয় অস্থায়ী তাঁবু। দূরদূরান্ত হইতে আগত হিজড়ারা ওই তাঁবুতেই বিশ্রাম নেয়। উহারা মাজারে চাদর প্রদান করে এবং সমাধিস্থলে গোলাপ জল ছড়াইয়া মাজার প্রদক্ষিণ করে। মেলার এক প্রান্তে হিজড়ারা তাহাদের নিজস্ব সংগীত করিয়া আমোদ প্রমোদ করে। অনেকেই মাজারের সম্মুখে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষে ঢিল বন্ধন করে। বিশ্বাস ইহাতে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। সন্ধ্যার পর, কাওয়ালি গানের আসর বসে। গুরু মায়েরা তাহাদের শিষ্যাদের মঙ্গল কামনায় মানৎ করে। মেয়ের মস্তকের ওপর টাকা স্থাপন করিয়া গুরুমা হাত দিয়া সেই মুদ্রা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে কাওয়ালি দলের কেহ ওই মুদ্রা লইয়া যায়। কাওয়ালি চলাকালীন গুরুমায়েরা খুচরা পয়সা চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেন।

এই মেলায় হিজড়া সমাগমের কারণ হিসেবে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। পিরসাহেব আরবের বোখারা হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করিয়া অবশেষে বাসুবাটিতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তিনি বহু অস্পৃশ্য চণ্ডালকে কোলে স্থান দিয়াছিলেন। একাসনে বসিয়া এক অন্ন গ্রহণ করিতেন। অনেক অস্পৃশ্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক হিজড়াও তাঁহাকে মুর্শেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কথিত আছে, একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হিজড়া পিরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দোয়া মাগেন। পির সাহেব মোনাজাত করেন, অতপর সে ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠে। কিন্তু আরও আশ্চর্য কাহিনী হইল এই জনৈক হিজড়া পির সাহেবকে বলেন আমি নিজস্ব সন্তান চাই। আমার গর্ভে যেন সন্তান হয়। পির সাহেব মোনাজাত করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সেই হিজড়া সন্তানসম্ভবা হয়। এই কথা হিজড়াদের মহল্লায় মহল্লায় প্রচারিত হয়, আর তাহার পর হইতেই প্রতি বৎসর হিজড়া সমাবেশ হয়...'

একটি হিজড়ে নিজের গর্ভে সন্তান কামনা করেছিল! সেই হিজড়েটি কি নির্বাণপ্রাপ্ত ছিল? 'নির্বাণপ্রাপ্ত' মানে লিঙ্গচ্ছেদ করা। না কি সে লিক্‌মদার ছিল? সে কি সন্তান লাভ করেছিল পায়ু-সঙ্গমে? না কি মেরি মাতা যেমন গর্ভ পেয়েছিলেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে—সেরকম? মুসলমানি বিশ্বাস আছে, বেহেস্ত থেকে ফেরেস্তা এসে গর্ভিণীর যোনিতে রুহ ফুঁকে দেয়। তাতেই গর্ভের সন্তান প্রাণ পায়। রুহ মানে এক দৈব শক্তি, যাকে আত্মাও বলা যেতে পারে। 'রুহ আফজা' নামে একটি হেকিমি শরবত আছে। এর মানে বোধহয় প্রাণের আরাম। আবার

'প্রাণের আরাম' কথাটা ব্রাহ্মদের প্রার্থনাস্থলেও লেখা থাকে। সে যাকগে যাক। মানুষ অত কূট কথায় যায় না। পিরের কেরামতিতে হিজড়েরও গর্ভ হয়—এই বিশ্বাসে হিজড়েরা নয় শুধু, হাজার মানুষও আসে।

বলরামবাটি স্টেশনে অনেক লোক নামল। কিন্তু হিজড়ের সংখ্যা তো খুব কম। মাত্র ৮/১০ জনের একটা দল, ব্যস। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই লাগল। বইয়ের সঙ্গে কিছুই তো মিলছে না, অবশ্য বইটা ৬০/৭০ বছর আগেকার।

একটা ভ্যান রিকশায় মেলাস্থলে গেল। মেলাটার একটা গ্রাম্যচরিত্র আছে। মাটির হাঁড়ি-কলসির সঙ্গে বিক্রি হচ্ছে মাটির কড়াই। দু'পাশে হাতলও আছে, মাটির। মাটির তাওয়া। যারা কিনছে, ওদের ঘরে নিশ্চয়ই অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি আছে, রুটি করার লোহার তাওয়াও কি নেই? আসলে, সহজে কিছুই ছাড়ি না আমরা। অনিকেতের ঘরে তো মিক্সি আছে। আবার শিল-নোড়াও। বাড়িতে যখন ভুট্টাটা ছিল, মানে কুকুরটা, ও শোওয়ার আগে তিনটে পাক দিয়ে শুত। কবে কোন বন্যজীবনে শোওয়ার আগে ঘুরে-ঘুরে হাওয়ার অভিমুখ বুঝে নিত, যাতে শত্রুর ঘ্রাণ ঠিকমতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, গৃহজীবনেও ওই অভ্যেস ছাড়েনি, ছাড়তে পারেনি। বিক্রি হচ্ছে বাঁশ আর তালপাতা দিয়ে তৈরি লম্ফমান হনুমান, সেই সঙ্গে ব্যাটারিচালিত বাঁদর। বিগত দিন আর বর্তমান কেমন একই সঙ্গে। মাজারের কাছে গেল। বিগত দিনের কবরে কিংবদন্তি। ধূপ-আতর বিক্রি হচ্ছে, আর নানারকম কাপড়ের ফালি। চাদর চড়াচ্ছে মাজারে।

অনিকেতের বাড়ির কাছেই তো খাজাইতলা। ওখানেও তো একজন পির শুয়ে আছেন। সেই পিরের গল্প তো জানে না ও। ভাল করে দেখাই হয়নি। দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া...। ওখানে দেখল, একটা মেলা কমিটির অফিস। অনিকেত জানল—এই মেলা বহুদিন ধরেই হচ্ছে, কিন্তু কতদিন জানে না। ওরা দেখেছে, ওদের বাপ-ঠাকুরদাও এই মেলা দেখেছে। হিজড়েদের প্রসঙ্গ এল। ওদের একজন বলল, আর বলবেন না দাদা, ওরা বড় নুইসেন্স। ওরা মনে করে—এই পিরবাবা ওদের সম্পত্তি। ছোট্ট মাজারটা ঘিরে বসে থাকে। কেউ-কেউ নাটক করে।

—নাটক মানে?

—কান্নাকাটি করে, নানারকম নৌটঙ্কি করে।

—কান্নাকাটি করে? শ্বশুরবাড়ির কষ্ট-পাওয়া বউ যেমন বাপের বাড়ি এসে কান্নাকাটি করে? অনিকেত ভাবল, কিন্তু বলল না।

—তা ছাড়া ওরা বাজে নাচ-টাচ করে। খিস্তি দেয়। গাঁয়ের ভদ্রলোকরা আপত্তি করেছিলেন, ওরা শোনে না, গত বছর মারপিট হয়ে গেল। আমাদের একটা ছেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল।—ওদের কারও কিছু হয়নি।

—ওদের ছেড়ে দেবে না কি? ওরাও মারধোর খেয়েছে। একজনের তো দাঁত পড়ে গিয়েছিল।

—এজন্য এ বছর ওরা আসেনি?

—আসবে না মানে? গতকাল ওদের 'ডেট' ছিল। গতকাল সব এসেছিল।

—'ডেট' ছিল মানে? ওদের আলাদা 'ডেট' থাকে না কি?

—'ডেট' থাকে না, কিন্তু গতবার ঝামেলা হওয়ার পর শান্তিশৃঙ্খলার জন্য পুলিশ ঠিক করে

দিল যে, ওদের জন্য একটা দিন আলাদা রাখা হবে। সেদিন শুধু ওরাই আসবে। ওরা আলাদা ভাবে যা খুশি করুক।

—ওরা কী করে জানল যে গতকালই ওদের 'ডেট' ছিল?—অনিকেত জিগ্যেস করল।

—আরে ওদের মারাত্মক নেটওয়ার্ক। পুলিশ থেকে দু-চারটে গুরুমাকে আগেই খবর দিয়ে দিয়েছিল, ওরাই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে।

—তার মানে, গতকালই ওরা সব এসেছিল?

—হ্যাঁ।

অনিকেতের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—ইস্‌স।

—ইস্ কেন? আপনি কি ওদেরই দেখতে এসেছেন নাকি?

অনিকেত ঢোক গিলে বলল—হ্যাঁ।

—কেন?

—আমি সাংবাদিক কিনা...

সাংবাদিক বললে অনেক খুন মাপ হয়ে যায়। ওদের একজন বিগলিত গলায় জিগ্যেস করল, কোন কাগজ?

এটাই মুশকিল। খবরের কাগজ না-হলে সাংবাদিক হয় না।

অনিকেত বলল, রেডিও-র।

একজন বলল, রেডিও-র সাংবাদিক হয় না কি আবার?

অন্য একজন বলল, কেন হবে না? রেডিওতে খবর হয় না বুঝি?

অন্য একজন বলল, কিন্তু রেডিও-র সাংবাদিকের হাতে টেপরেকর্ডার থাকে। খগেন মণ্ডলের শুয়োরের ফার্মে এসেছিল একজন। আমি দেখেছি। টেপরেকর্ডার-টা খগেনদার সামনে ধরে জিগ্যেস করেছিল—এগুলো কি শুয়োরের বাচ্চা? এবার অনিকেতকে জিগ্যেস করল—স্যর, আপনার টেপরেকর্ডার কই?

অনিকেত বলল—না, আমি রেকর্ড করতে আসিনি।

—দেখতে?

—হ্যাঁ।

—অনেকের অনেকরকম কামনা থাকে। একবার এক বাংলা সিনেমার হিরোইন এসেছিল, বোধহয় বোম্বের হিরোইন হওয়ার মনস্কামনা ছিল। আবার অনেক ছুপা কোতি-ও আসে। 'কোতি' মানে অনিকেত জানে। তবু জিগ্যেস করল। 'কোতি' হল : হিজড়ে হয়নি, কিন্তু হিজড়ে-হিজড়ে ভাব। এসব হল ওদের ভাষা।

অনিকেত 'কোতি' মানে যেটা জানে, সেটা ঠিক এরকম না হলেও—অনেকটাই তাই। ওরা অনিকেতকে 'কোতি' ভাবছে কি না কে জানে?

অনিকেত বলল—আজ তো দেখলাম কয়েকটা হিজড়ে এসেছে।

—ওরা কি মাজারে যেতে পেরেছে? আমাদের ভলেন্টিয়ার-রা আটকে দিয়েছে। আজ ওরা নট অ্যালাউড।

তার মানে, যে-দলটা এসেছিল, ওদের চলে যেতে হয়েছে। ইস, ওদের মেলাটাও ভদ্রলোকরা ছিনতাই করে নিল? ভদ্রলোক না-বলে 'হেট্রো' বলাই ভাল—অনিকেতের মনে

হয়। হেট্রোসেক্সুয়াল। হেট্রো-রা, মানে সংখ্যাগুরুরা, যা মনে করবে, সেটাই হবে। সেটাই ঠিক।

মেলার এক কোনায় মাদুলি বিক্রি হচ্ছে। স্বপ্নদোষ কমানোর মাদুলি, সর্বরোগহর বড়িও বিক্রি হচ্ছে। একটা টেস্টটিউবে একটু ঘোলা জলীয় পদার্থ। বিক্রেতা চাঁচা গলায় বলছে, ভায়েরা আমার, এই হল ধাত-মেশানো প্রচ্ছাপ। প্রচ্ছাপের সঙ্গে ধাত নির্গত হয়ে এমন ঘোলা দেখাচ্ছে। এবারে লক্ষ করুন, এই আশ্চর্য বড়ি কী করে...

লোকটা টেস্টটিউবে বড়িটা ফেলে দিল, এবং ঘোলা তরলটা স্বচ্ছ ফটফটে হয়ে গেল। মানুষ কিনছে। মেলাতেই এসেছে পেজার কোম্পানি। ওরা বিক্রি করছে না যদিও, পেজারের কার্যকারিতা দেখাচ্ছে। বলছে, লক্ষ করুন...।

মেলাতেই একটি ছেলে অনিকেতের হাত ধরে টানল।

—চিনতে পারছেন?

ছেলেটা প্যান্ট-শার্ট পরা। বছর ২৫-২৬ বয়স হবে মনে হচ্ছে। খুবই সাধারণ দেখতে।

মনে হয় গুটকা জাতীয় কিছু খায়। ফচ করে থুথু ফেলল।

অনিকেত ওকে চেনার চেষ্টা করছিল। মুখটা একটু চেনাই লাগছে। কিন্তু কোথায় দেখেছে, ঠিক বুঝতে পারল না।

ছেলেটা বলল, আমার নাম জয়ন্ত। রবীন্দ্রসদনে দেখা হয়েছিল। সোমনাথদাদের সঙ্গে আড্ডা মারছিলাম, আপনি এসেছিলেন...।

—হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। অনেকেই ছিল তো...।

—সোমনাথদা আপনার খুব প্রশংসা করছিলেন। আমরা, 'এলজিবিটি'-রা ওঁকে খুব মানি।

এই শব্দবন্ধগুলোর মানে জেনে গিয়েছে অনিকেত। লেসবিয়ান গে বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডার।

তুমি একা এসেছ? অনিকেত জিগ্যেস করে। না, আমার একজন ফ্রেন্ড আমার সঙ্গে এসেছে। 'ফ্রেন্ড' শব্দটার ঠিক আগে একটা মাইক্রোসেকেন্ডের পজ্ ছিল, মানে অনুচ্চারিত শব্দ। যেন ও বলতে চেয়েছিল, আমার সঙ্গে 'বয়ফ্রেন্ড' এসেছে। ছেলেটার কথার মধ্যে একটু মেয়েলিপনা আছে। মানে, পুরুষসমাজ যে-বাচনভঙ্গিকে মেয়েলি মনে করে। 'ফ্রেন্ড' ছেলেটার সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিল। ওর নাম তপন দাস। ডেকরেটরের বিজনেস। ও জয়ন্তর চেয়ে একটু বড়ই হবে বয়সে। অনিকেতের মনে হয়েছিল, ওই তপন বোধহয় জয়ন্তর 'পারিক', যাকে প্রেমিক বলা যেতে পারে—তবে যৌনসঙ্গী বলাটাই বোধহয় ভাল।

—আপনি এখানে এসেছেন কেন অনিকেতদা? চাদর লাগাবেন না কি?

অনিকেত বলল—না, আমি আর কী করতে চাদর লাগাব?—বলেই মনে হল, হিজড়ের যদি বাচ্চা হতে পারে, তা হলে জরায়ুহীনার কি সন্তান হতে পারে না? সন্তানের জন্য একটা চাদর চড়িয়ে গেলে হত না? পরক্ষণেই মনটা বলে উঠল, ধুর। কী সব ভাবছি। মনেরও উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু আছে। দুর্বল মুহূর্তে হঠাৎ-হঠাৎ কী যে মনে হয়... অনিকেত আগের প্রশ্নের রেশ ধরে বলল, এমনিই এসেছি। তোমরা?

জয়ন্ত বলল, এলাম যখন আমি একটু পুজো দিয়েই যাব। আফটার অল এলজিবিটি-দের ভগবান। বন্ধুটা অবশ্য পুজো দেবে না।

—কী করো তুমি জয়ন্ত? কাজ-টাজ, না কি...

—আমার একটা বিউটি পার্লার আছে।

—জেন্টস না লেডিজ?

—নাম তো দিয়েছি 'সাজাব যতনে'। ভেবেছিলাম ইউনিসেক্স করব। ছেলেরাও আসবে, মেয়েরাও আসবে। দু-চার পিস ছেলে আসে, ফেসিয়াল-টেসিয়াল করে, কিন্তু মেয়েরাই আসে মূলত।

—কী করে ওরা?

—কী আবার? সাজুগুজু করে। ফেসিয়াল, পেডিকিওর, ম্যানিকিওর, ফাইলিং এসব।

—ফাইলিং-টা কী?

—ম্যানিকিওর-এর একটা পার্ট। মানে হাতের নখ, আঙুল ওগুলো ঠিকঠাক করা হল ম্যানিকিওর, আর নখটাকে শেপ দিয়ে চকচকে করাটা হল ফাইলিং।

—ম্যাসাজও করো?

—ওমা, ফেসিয়ালের বড় পার্টই তো ম্যাসাজ।

—সে তো মুখে। ঘাড়ে, হাতে করো না...আমরা যেমন সেলুনে গিয়ে মাঝে-মাঝে...

—হ্যাঁ, করি। আমার দু'জন খদ্দের আছে হোল বডি করায়।

—তোমার কিছু অসুবিধে হয় না মেয়েদের গায়ে এভাবে...

—ধুর, আমার ফড়কায় না।

—ওদের? ওদের অস্বস্তি হয় না? শত হলেও তুমি ব্যাটাছেলে...

—এটা খুব কঠিন প্রশ্ন করেছেন দাদা। ওরা কতটা ব্যাটাছেলে ভাবে কে জানে? কিছুটা তো ভাবে, কেউ-কেউ। আবার ব্লিচ করার সময়, বা অন্যসময়, বউদিরা এমন খুলে দেয়, যেন আমি ওদের ননদ। কনেও সাজাই তো। বিয়ের আগে কনের শুধু মুখে নয়, অনেক অঙ্গে দুধ-মধু-মুলতানি মাটি-শশার রসের প্যাক লাগাই। অনেক কথা আছে, পরে বলব। আসুন না আমাদের বাড়িতে। সোমনাথদার বাড়ির কাছেই তো। 'লিপিকা' সিনেমা হল-এর পিছনে...।

জয়ন্তর 'বয়ফ্রেন্ড' বিশেষ কথা বলছে না। ও একটু স্মার্ট থাকার চেষ্টা করছে। সিগারেট খাচ্ছে। অনিকেত বুঝল, মানে অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারল, যে, জয়ন্ত এবং তপন দু'জনই সমকামী। সমকামীদের আধুনিক টার্মিনোলজি-তে বলা হচ্ছে 'এমএসএম' মানে, 'ম্যান সেক্স উইথ ম্যান'। জয়ন্ত হল 'বটম এমএসএম', তপন হল 'টপ এমএসএম'।

জয়ন্ত বলল—আজকের মেলাটা একদম নিরামিষ। ওরা আসেনি কিনা।

আগে কখনও এসেছে কি না জিগ্যেস করায় জয়ন্ত বলল, বছর তিনেক আগে একবার এসেছিল।

তার মানে ওরাও এই মেলাটাকে নিজেদের মনে করে?

জয়ন্তকে দেখে কিছুই বোঝা যাবে না যে, ওর মধ্যে অন্য কোনও সত্তা গোপনে বাস করছে।

অনিকেত ঘুরছে। একটা নাগরদোলাও আছে। গোল হয়ে ঘোরে না, নিচ থেকে উপরে ওঠে। ওখান থেকে আহ্লাদ-মেশানো হাসির ছর্‌রা আসছে। ওখানে দাঁড়িয়ে মানুষের খুশি

দেখতে ভাল লাগছিল। ঘুরন্ত চাকাটা থামলে যারা নেমে এল, ওদের কয়েকজনকে দেখে বেশ অবাক হল অনিকেত।

জিন্‌স-গেঞ্জি, জিন্‌স-শার্ট পরা কয়েকটি কমবয়সি ছেলে হইহই করতে-করতে নেমে এল। ওদের চোখে কাজল, কারও ঠোঁটে লিপস্টিক। এক কানে দুল পরাও কয়েকজন। একজনের কানে আলো ঝলকাচ্ছে। হিরে? নাও হতে পারে, হয়তো নকল হিরে।

একজন বলল, উঠতে-উঠতে আকাশে উড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল।

একজন বলল, আমারও।

অন্য একজন ওকে বলল, তুই উড়ে যেতেই পারতিস, তুই তো পরি। সেই তো, যাকে এক ঝলক দেখেছিল গঙ্গার ঘাটে। মঞ্জুর ছেলেটা। ছেলেটার বন্ধু বা পরির অরূপও কি আছে? অরূপকে দেখতে পেল না। ওরা মজা করতে-করতে, অন্যদিকে চলে গেল। পরি কি অনিকেতকে দেখতে পেয়েছে? দেখলে কি চিনতে পারবে? মঞ্জুর সঙ্গে পরির চোখাচোখি হয়েছিল। মঞ্জুর পাশে অনিকেতও তো ছিল। পরে মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করেছিল অনিকেত, ওই ব্যাপারটা নিয়ে কোনও কথা হয়েছিল কি না পরির সঙ্গে। মঞ্জু বলেছিল—ডাইরেক্ট কিছু বলেনি, তবে একদিন বলেছিল—তুমি কার সঙ্গে মিশছ না মিশছ, কোথায় যাচ্ছ, কী কোচ্ছো আমি জানতে চাইনি, তুমিও আমার ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার কোরো না। আমি বলেছিলাম, যাকে দেখেছিলি ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, ছোটবেলার বন্ধু। ও থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, আমি কি জানতে চেয়েছি মা?

সন্ধে নাগাদ ফিরে এল স্টেশনে। একটা ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। মেলা উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেন দেওয়া ছিল, ওটা সেরকম। খুব বেশি ভিড় ছিল না। জানলার ধারে একটা জায়গা পেয়ে বসে গেল। একটু পরই এল জয়ন্ত আর তপন। ওরা অনিকেতকে দেখল। হয়তো বা ওরা আলাদাই বসতে চেয়েছিল, কিন্তু অনিকেতকে দেখে ভদ্রতাবশত অনিকেতের পাশেই বসল। অনিকেতের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা চক্ষুভঙ্গি করল, অনেকটা চোখ মারার মতো। এর গূঢ়ার্থ অনিকেত বুঝল না। জয়ন্তর হাতে একটা 'সানন্দা' ছিল। ওটা খুলে 'মেচেতা হলে কী করবেন' পড়তে লাগল।

একটু পরই হইহই করতে-করতে ট্রেনে উঠল ওই দলটা, যাদের হাসি আর হল্লা নাগরদোলা থেকে ছিটকে আসছিল। বসেই একজন ব্যাগ থেকে ক্যাডবেরি বের করে সবাইকে ভাগ করে দিল। জয়ন্ত বলল, সব লালুপুসু বাচ্চা।

—মানে?

—মানে, আবার কী? বাপের পয়সায় শখ মেটাচ্ছে। দেখুন হয়তো বাপের এক ছেলে। কিছু বলতে পারছে না। আমার মতো স্ট্রাগ্‌ল করতে হয় না ওদের।

অনিকেত পরিকেও দেখতে পেল। ফুলপ্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরে আছে ও। অন্যদের তুলনায় ও একটু ম্রিয়মাণ। জামাটাও সাধারণ, একটু শর্ট ঝুল।

একটি মেয়েকেও দেখতে পেল অনিকেত। জয়ন্তকে জিগ্যেস করল—ওদের দলে মেয়ে কেন? ওদের গার্লফ্রেন্ড?

জয়ন্ত বলল, মেয়ে কী করে বুঝলেন? বুক দেখে? ওটা লিল্‌কি নয়, ইলু।

—ইলু মানে?

—নকল। নকল।

মেয়েটাকে দেখতে থাকে অনিকেত। না কি ছেলেটাকে? চুলটা এমনভাবে ছাঁটা, যে, ওটাকে ছেলেদেরই ছাঁট বলা যায় না। অনেক মেয়েও আজকাল এরকম করে চুল ছাঁটে। কানের ওপরে চুল। কিছু চুল কপালে এসে পড়েছে। গোঁফদাড়ির চিহ্ন নেই। ভ্রু-টা খুব সুন্দর। যেন চোখের ওপর এক-একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট। চোখের পাতার ওপর নীলচে কিছু লাগিয়েছে। আইশ্যাডো, না কি মাসকারা? জিন্স-এর ওপরে গেঞ্জি। গেঞ্জি ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে বক্ষ। বলল, আজ কাঁপিয়ে দিয়েছি। সবাই আমার দিকে জুলজুল করে তাকাচ্ছিল।

অন্য একজন বলল, মাজারে ও গোলাপ দেয়নি। গোলাপ কেন কেনেনি জানিস তো, কাঁটার ভয়ে। কাঁটা লেগে গেলে ভুস হয়ে যেত।

উঁচু বুকওলা মেয়েটা হিহি করে হেসে অন্য একজনের গায়ে গড়িয়ে পড়ল।

পরির কানে একটা হেড-ফোন। গান শুনছে। এসব শুনছে না বলে একজন ওর কান থেকে ইয়ার-ফোনটা খুলে নিজের কানে দিল। ও ব্বাবা, রবীন্দ্রসংগীত। খোল তো। এখন মজা কর। পুলু-র ইলুতে ছুঁচ ফুটিয়ে দে।

পুলু বলে মেয়েটা বলল, তোদের কী বলি? জেলাস? কেন এ দু'টোর পিছনে লেগেছিস? তোদের তো সাহস নেই লাগানোর।

অন্য একজন বলল, তোর এগুলো নিয়ে বাড়ি যাওয়ার সাহস আছে?

ও বলল—এখন হয়তো নেই, কিন্তু একদিন পার্মানেন্ট ব্রেস্ট বানিয়ে বাড়িতে ঢুকব। দেখে নিস।

আরও দু-একজন যাত্রী এল। একজন পাকা কলার ফেরিওলা এল। কলা নিয়ে একটু ঠাট্টা-ইয়ার্কি হল। তারপর পুলু বলল, এবার আমি পল্লব হয়ে নিচ্ছি। অনেক হয়েছে। গেঞ্জিটার তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে এক-এক করে দু'টো জলভরা রবারের বল বার করে আনল। একজন বলল, বল্ হরি, অন্যরা বলল, হরি-ই-ই বল্। 'বলো হরি' নয়, বল্ হরি। হরি বল্। বল দু'টো নিয়ে লোফালুফি খেলতে লাগল ওরা।

একজন পল্লবকে জিগ্যেস করল—ওটা খুললি না? পল্লব বলল, ওটা ভিতরেই থাক। বাড়ি গিয়ে বের করব।

মনে হয় ব্রা-এর কথা বলছে। ওটার খোপেই তো জল-বেলুনগুলো ছিল।

পল্লব জলের বোতল থেকে জল বের করে মুখটা ধুয়ে নিল। চোখের পাতায় জল দিল। রুমাল দিয়ে মুছে নিল। পুনর্পল্লব ভব হতে লাগল। এবং তক্ষুনি অন্য একজন হাতের ব্যাগ থেকে ছোট আয়না এবং লিপস্টিক বের করে নিজের ঠোঁটে বোলাতে লাগল।

ভাবটা এই—দ্যাখ, আমি কাউকে কেয়ার করি না।

কত যে অদ্ভুত মানসিকতা...।

অথচ জয়ন্ত, যে ওর পাশে বসে আছে, সে কিন্তু কোনও সাজগোজ করেনি। কত যে ভাঁজ, কত যে রকমফের বোঝা মুশকিল। ওদের মধ্যে কেউ হয়তো মেয়েলি পোশাকেই তুষ্ট, কেউ ট্রান্সজেন্ডার, কেউ-বা এমএসএম বটম, কেউ টপ। টপ মানে সক্রিয়। ওদের মধ্যে বোধহয় কেউ নেই। যদি থাকে তো জয়ন্তর পাশে বসে আছে তপন।

ট্রেন ছাড়ল। অনিকেত দেখল জয়ন্ত টুক করে হাতটা কপালে ছোঁয়াল। পিরের উদ্দেশেই হয়তো।

জয়ন্ত অনিকেতের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আসুন না নৈহাটিতে...'

অনিকেত বলল, আসব।

জয়ন্ত বলল, ফোন নম্বরটা দিন।

অনিকেত ওর কার্ডটা দিল।

অনিকেত খবরের কাগজটা ব্যাগ থেকে বের করল। কাগজ পড়তে লাগল।

জয়ন্তর বয়ফ্রেন্ড ঘুমোচ্ছে।

ট্রেনের শব্দ ছাড়িয়ে ওদের হল্লা শোনা যাচ্ছে।

একটা বাদামওলা এল।

জয়ন্ত বলল—অনিকেতদা, বাদাম খাই। চুপচুপ বসে না-থেকে টুকটাক...

বাদাম নেওয়া হল। দু'জনের থাইয়ের ওপর খবরের কাগজ পেতে। বাজপেয়ীর হাতের ওপর বিটনুন রাখল। সিনেমার পাতাটা অনিকেতের কোলের ওপর। 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়', 'বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা'। শাহরুখ-কাজল-রানি মুখার্জির ওপর ছড়িয়ে আছে বাদাম। জয়ন্ত একটা-একটা করে বাদাম তুলে নিচ্ছে। বাদাম নেওয়ার সময় অনিকেতের মনে হল অনিকেতের উরুর ওপর অনাবশ্যক ভাবে বেশি সময় ধরে হাত রাখছে জয়ন্ত। একবার বাদাম তুলে নেওয়ার সময় অনিকেতের উরুসন্ধিতে আঙুল বোলাল। কিছু ধরার চেষ্টা করল, যদিও খবরের কাগজের ওপর থেকেই। অনিকেত আস্তে-আস্তে বলল, কী হচ্ছে জয়ন্ত?

জয়ন্ত অনিকেতের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, কুছ কুছ হোতা হ্যায়।

অনিকেত বলল—ভুল করছ। আমি না।

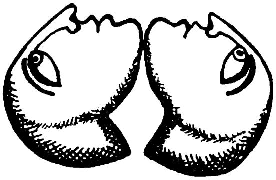

জ্যান্ত দেশি পুঁটি পাওয়া গেল বাজারে। জলের রুপোলি শস্য শুধু ইলিশ মাছ কেন? দাম বেশি বলে? পুঁটি-ও তো রুপোলি শস্য। একটা পলিথিনে জল ভরে মাছগুলো এনেছিল। বাড়িতে আনার পরেও কয়েকটা জ্যান্ত ছিল। দেখে, শুক্লার খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু ওর মুখে খুশি ভাব দেখা গেল না। শুক্লা জানাল, দুলালের মা আজও আসেনি।

গতকালও কামাই করেছে দুলালের মা। ও খুব একটা কামাই করে না। তার মানে, জ্বরজারি হয়েছে। তার মানে, আরও কামাই করার সম্ভাবনা আছে। শুক্লার মনখারাপ হওয়ারই কথা। পুঁটি মাছগুলো অনিকেতই কাটবে। হাঁটু মুড়ে বসতে শুক্লার বেশ অসুবিধে।

অনিকেত এসব পারে। কী করে যেন শিখে গিয়েছে। মাছের ফিজিওলজি মোটামুটি জানে। ভোলামাছের মাথার দিক ঘেঁষে ইনসিশন দিলে নাড়িভুঁড়িগুলো বেরিয়ে আসে। পুঁটির মাঝামাঝি জায়গায়। মৌরলার তলার দিকে। খেয়াল রাখতে হবে, পিত্ত থলেটা বেরিয়ে গিয়েছে কি না। নইলে তেতো লাগবে।

পুঁটিগুলো মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে ছুরি দিয়ে আঁশ ছাড়াচ্ছিল অনিকেত। ছাই হলে সুবিধে

হত। এখন ছাই পাবে কোথায়? মাছটা টাটকা ছিল বলে পিছলে যাচ্ছিল। কয়েকটা পুঁটিমাছ তখনও লাফাচ্ছিল। ওদের জ্যান্ত শরীর থেকে আঁশগুলোকে চেঁচে নিচ্ছিল ছুরি। তারপরও জীবন্ত থাকতে পারে মাছটা? তখন পেটের মাঝখানে চিরবে, দু'-আঙুলে চাপ দেবে, আর মাছের শীতল, দীন রক্তসমেত বেরিয়ে আসবে দলা-পাকানো লিভার-গলব্লাডার-ইনটেনস্টাইন-হার্ট-লাং। নিষ্ঠুর মনে হয় না তো...। মমতাময়ী মা-রা তো ক্রোড়ের শিশুকে স্তন্যপান করাতে-করাতে হাসিমুখে মাছ কোটে। আসলে মাছ যে আওয়াজ করতে পারে না, কণ্ঠ ছাড়তে পারে না জোরে। চিৎকার করতে পারে না। তাই নির্জন মাছের ব্যথা এইখানে হয়ে আছে চুপ।

এ সময় এল দুলালের মা। সে কি দাদাবাবু, আপনি মাছ কুটতিছেন? সরো সরো...।

মাছ কুটছিল দুলালের মা, কুটতে-কুটতেই বিস্ফোরণের মতো কেঁদে ফেলল। বঁটি উল্টে গেল।

—কী হল, ও দুলালের মা...?

দুলালের মা কান্না থামানোর চেষ্টা করে। অনেকটা বাতাস ভিতরে নিয়ে বলল—দুলালরে ফিরে পালাম।

—তাই না কি? ফিরেছে ও? কাঁদছ কেন তবে? শুক্লা উচ্ছ্বসিত। অনিকেত ভাবল ওটা ওর আনন্দাশ্রু।

দুলালের মা বলল—কিন্তু সেটা আমার দুলাল না, অন্য দুলাল।

—মানে? কী বলছ বুঝতে পারছি না তো...।

—আবার কাঁদতে থাকে দুলালের মা। রক্ত-কাটা পুঁটিমাছের শরীরে নুনমাখা জল পড়ে। জল-মাখা চোখে বলে—কিছু টাকা দাও না দাদাবাবু...। দুলাল হাসপাতালে।

—কেন? কী হয়েছে দুলালের?

—দুলালের পেট কাটি দেচে।

—কে?

—কী করে কব? দুলাল কতা কচ্চে না।

—কোথায় পাওয়া গেল ওকে?

—খাজাই পিরের মাজারে।

—তবে যে বললে ও তোমার দুলাল নয়, অন্য দুলাল?

—এই দুলাল বেলাউজ পরা। যখন খপর পেয়ি দেকতি গেলাম, দেখি শাড়িখান দলাপ্যাঁচা পড়ি আচে পাশে। রক্ত। চোকে মাছি। মুখটা দুলালের মতো। সবাই বলল, এটাই দুলাল।

আমুও দেকলাম, কপালে কঞ্চিকাটা দাগ, কানের তলায় জডুল। হাঁ করে আছে, ঘুমোলে যেমন পানা হাঁ করি থাকত। অবিকল। মুখটা দেখি মনে হল আমার দুলাল। আগে একবার দুলাল দেখতি গেছিলাম, তার মুখ ছিল না। এই দুলালের মুখ আছে, কিন্তু পুরুষ চিন্ন নাই। ওখেনে মেয়েলোকের মতো। ও কি করে আমার দুলাল হবে? একজন বলল, নিশ্বেস পড়তিচে। পুলিশে খপর গেল। পুলিশ হাসপাতালে নে গেল। আমুও গেলাম।

—কোন হাসপাতাল?

—নীলরতন।

—তারপর?

—হাসপাতালে সেলাই দেছে পেটে। বিকালা জ্ঞান এসিচে। এবার যাব হাসপাতাল।

—ও তো তোমার দুলাল না-ও হতে পারে। হয়তো একইরকম মুখ...এরকম তো হয়...।

—আমার দুলাল না হয় যদি, কারও তো দুলাল...।

এই সরল, নিরীহ বাক্যটা বোমার মতো আছড়ে পড়ল।

—তোমার দুলাল নয় বলছ কেন দুলালের মা? মা কি নিজের ছেলেকে চিনবে না? হয়তো তোমার সঙ্গেই দেখা করতে আসছিল, হয়তো অনেক টাকা রোজগার করেছিল, সেই টাকাই হয়তো ছিনতাই করতে গিয়ে কেউ ওকে মেরেছে। চিন্তা কোরো না, হাসপাতালে আছে যখন, ঠিক ভাল হয়ে যাবে, দেখো, তোমাকে মা বলে ডাকবে। শুক্লা বলল।

শুক্লার শেষ বাক্যটা ভিতর থেকে। 'একবার মা বলিয়া ডাকো' শুনতে পেল অনিকেত। যেটা শুক্লার প্রাণের মাঝে লুকিয়ে থাকে।

দুলালের মা বলল, তোমার মুকে ফুল-চন্দন পড়ুক। যেন ভগবান তাই করে। কিন্তু ও যদি দুলাল হবে, তবে দুলালের চিন্ন কই? ওকে তো উদলা দেখেছি, মাটিতে চিৎ হয়ে পড়েছিল।

অনিকেত কিছু একটা আশঙ্কা করল, কিছু বলল না। শুক্লা বলল, আজ তো রবিবার, অপিস নেই, দুলালের মায়ের সঙ্গে গেলে ভাল হত না?

অনিকেত তো সেটাই ভাবছিল। শুক্লা আগেই বলে দিল।

এসব হাসপাতাল থেকে তথ্য জোগাড় করা খুব কঠিন ব্যাপার। নার্সের কাছে জানা গেল, এটা পুলিশ কেস। জানা গেল জ্ঞান ফিরেছে। জানা গেল, আজ রবিবার, বড় ডাক্তার আসবেন না। আর একটু পরে হাউস স্টাফ আসবে। একটা কাগজ ধরিয়ে বলল, ওষুধ আনতে হবে। সেই লিস্টে স্যালাইন এবং অ্যান্টিবায়োটিক ছিল। দুলালের মা কাতর গলায় জিগ্যেস করল, বাঁচবে তো দিদিমণি? মোটামতো নার্সটি জবাব দিল, আমি কী করে বলব? আমি কি জ্যোতিষী?

—কার আন্ডারে ভর্তি আছে?

নার্সটি বলল, ডাক্তার পলাশ সেনগুপ্ত। এমনভাবে বলল, যেন একটা বাউন্সার। অনিকেত তো পলাশ সেনগুপ্তকে চেনে। রেডিও-র টকার। সার্জেন। খুব ভাল ডাক্তার।

দুলালের মা মেল সার্জিকাল ওয়ার্ডের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। নার্স বলল, ভেতরে ঢোকার ধান্দা? এখন নয়। ভিজিটিং আওয়ার শুরু হয়নি। নিচে গিয়ে বসুন।

—হাউস স্টাফ কখন আসবে? অনিকেত জিগ্যেস করে।

কোনও কিছু জিগ্যেস করতেই ভয়-ভয় করে—যেন কিছু গোপন কথা জিগ্যেস করছে।

—ওদের ব্যাপার জানি না। বারোটাতেও আসতে পারে, বেলা একটাতেও আসতে পারে।

—কেস খারাপ হলে?

—কলবুক পাঠাই...।

তা হলে কেসটা খুব খারাপ নয়। একটু আশ্বস্ত হয় অনিকেত।

হাউস স্টাফ কখন এল বুঝব কী করে? অনিকেত জিগ্যেস করে।

—ডাকলেই বুঝবেন। নম্বর ধরে পেশেন্ট পার্টিকে ডাকবে। এখন নিচে গিয়ে বসুন—যান।

নিচে গিয়ে কোথায় আর বসবে? অনেকে মেঝেতে বসে আছে। কুকুর সরিয়ে দুলালের মা বসল। অনিকেত ওষুধপত্র কিনে এনে দিয়ে এল। ঘুরঘুর করছে। পাতালে, হাসপাতালে।

একবার দু'টো কচুরি সাঁটিয়ে এল। দুলালের মায়ের জন্যও নিয়ে এল। 'খাব না, খাব না' করে খেয়ে নিল।

বেলা একটা নাগাদ ডাকাডাকি শুরু হল। গাইনি এল, ওদিকে নেফ্রোলজি-র ডাক পড়ল। একটা ছেলে এল, 'সার্জিকাল—সার্জিকাল মেল' হাঁক পাড়তে-পাড়তে। অনিকেত ওর কাছে গেল। ও স্থির নেই। অনিকেতও স্থির নেই। ওর ঠোঁটের তলাটায় অল্প দাড়ি। ছোট করে। এটা নতুন ফ্যাশন। হাতে মোবাইল ফোন। অনিকেতের নেই। বেশ দামি। ফোন করলে তো বটেই, ফোন এলেও নাকি পয়সা লাগে। ছেলেটা বলছে—মস্তি করো গুরু, কিচ্ছু ভেবো না, আমি তো তোমার সেবার জন্য আছি। না, না, কেউ খসেনি...। কথা বলা শেষ হলে মোবাইলটা কোমরের খাপে গুঁজে বলতে লাগল—এমএস দু'থার্টি-পেশেন্টের পেচ্ছাপ হয়ে গিয়েছে, গায়ে জ্বর আছে; টু-থার্টি এইট কাল ছুটি হয়ে যাবে...। টু ফর্টি ফোর—এক বোতল রক্ত লাগবে, কাল নিয়ে এসে জমা দেবেন। এ প্লাস...

অনিকেত বলল—আমার পেশেন্ট। কী হয়েছে ওর—

—আপনার পেশেন্ট, কী হয়েছে জানেন না?

—না, ঠিক জানি না—

—জেনে আসবেন, টু ফর্টি সিক্স...

ফেঁসে গেল অনিকেত। পরদিন যেতে হল। রক্তদান-ই হবি এমন একজন ছেলে জোগাড় হল বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবে। রিকুইজিশন নিয়ে ব্লাড ব্যাংক, তারপর নীলরতন। পলাশ সেনগুপ্তকে খুঁজে বের করল। ওঁর ঘরের সামনে ভিড়। ভিড় ঠেলে ঢোকার চেষ্টা করতে জনৈক গ্রুপ ডি বলল, কোথায় যাচ্ছেন? অনিকেত বলল, পলাশবাবু আমার বন্ধু। গ্রুপ ডি বলল, বন্ধুত্ব বাড়িতে। কিন্তু অনিকেত দেখল, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ-রা অবলীলায় ঢুকে যাচ্ছে।

ভিড় পাতলা হলে দেখা করল। পলাশ সেনগুপ্তকে দুলাল মণ্ডল বলাতে উনিই জিগ্যেস করলেন—ও কে হয় আপনার?

অনিকেত বলল, যা বলার।

—ওর তো টেস্টিকেল্স, পেনিস, কিচ্ছু নেই। মনে হয় ক্যাসট্রেটেড। আনসাইনটিফিক্যালি।

—তাই না কি?

—জানতেন না?

—কী করে জানব? বহুদিন নিরুদ্দেশ ছিল। দশ বছর পর ফিরেছে।

—কিন্তু ছুরি মারল কে? ভাগ্য ভাল লিভার-স্প্লিন এসব ঠিক আছে। ইনটেনস্টাইনের এক জায়গায় ফেঁসে গিয়েছিল। ঠিকঠাক করে দিয়েছি। প্রচুর ব্লিডিং হয়েছে। ও কি হিজড়ে খাতায় নাম লিখিয়েছিল?

—আমরা জানি না। ওর লাস্ট দশ বছর আমাদের কাছে ব্ল্যাংক।

পলাশ সেনগুপ্ত বললেন—খোঁজ নেবেন তো...। বেঁচে তো যাবে মনে হয়। তারপর কি ওদের দলেই ভিড়বে নাকি?

এর উত্তর তো অনিকেতের জানা নেই।

কোন কুক্ষণে 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠানটা করতে গিয়েছিল। যত অন্তস্থ-য ওর কপালেই জুটছে। অন্তস্থ-য ঔ-কার। পবন রঞ্জন, বাসবদের সে এড়িয়ে চলতেই পারে, কিন্তু মঞ্জু? ওকেও আস্তে-আস্তে ফুটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু দুলাল? দুলালকে ফোটানো মানে দুলালের মা-কে ফোটানো। সেই কবে থেকে দুলালের মা এ বাড়িতে। সবার জন্য করেছে, অনির বাবা-মায়ের সেবাও। একটা কিছু এধার-ওধার করেনি। যদি আত্মীয় বলে কিছু হয়, দুলালের মা তাই। তা হলে দুলালও। কিন্তু দুলাল কেন হিজড়ে হতে গেল? হিজড়ে হয়ে যাওয়া দুলাল, সমকামী পরি, ফ্রিজিড মঞ্জু। যত সব যৌ জুটেছে। ধুর শালা। এদের এক-এক করে হঠাতে হবে।

শুক্লা বলল—দুধ মন্থন করলে মাখন ওঠে। তুমি নোংরা মন্থন করেছ, নোংরার ক্রিম উঠছে এখন। মাখো।

অনিকেত বলল, এখন তো ওসব করি না। এখন তো প্রতিবন্ধীদের জন্য, বিশেষত ব্লাইন্ডদের জন্য, একটা প্রোজেক্ট শুরু করতে চলেছি। ব্লাইন্ড-রা খুব রেডিও শোনে। ওদের কথা ভেবে স্পেশাল প্রোগ্রাম। পুণ্য হবে।

শুক্লা বলল, আগে পাপের ফলটা ভোগ করে নাও, তারপর তো পুণ্য।

তবু তো শুক্লা মঞ্জুর কথা তেমন কিছু জানে না। ওর ছেলের কথাও নয়।

পরদিন অনিকেত দুলালের মা-কে বলল—আমার পক্ষে তো রোজ-রোজ হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব নয়, পাড়ার ছেলেদের ধরো। একা গিয়ে তুমি কিছু বুঝবে না। ওষুধপত্র আনা আছে, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলা আছে...। দুলালের মা মাথা নিচু করে বলে, পাড়ার লোকরা হাসাহাসি করছে। 'দুলালের মা' বলে যে ডাকত, সে কাল ডাকল...

গলা রুদ্ধ হয়ে এল ওর।

—কী ডাকল?

—ডাকল 'ও হিজড়ের মা'।

—সে ডাকুক গে। বিপদে-আপদে ওরাই তো ...

—তাই বলে বিপদের দিনে টোন-টিটকিরি দেবে?

—দিকগে যাক। প্রথম-প্রথম একটু অমন করবেই তো। আগে ভাল হয়ে ঘরে আসুক, পরে দেখা যাবে কেন ওর এমন হয়েছে।

দুলালের মা বলল—শত্রুতা করে কেউ ওর ওসব কেটে দিয়েছে। ওর মুখপুড়ি বউটারই কাজ। ও-ই লোক দিয়ে অমন করিয়েছে।

মাথা থাবড়াতে থাকে দুলালের মা।

কয়েকটা দিন হাসপাতাল থেকে রেহাই পাওয়া গেল হয়তো। যদি বেঁচে যায়, ব্যাপারটা জানা যাবে। দুলাল প্রথম দিকে কাঁচা-আনাজের ব্যবসা করত। তারপর তো সাইকেল করে আলতা-সিঁদুর-টিপ-নেলপালিশ ফেরি করত। ওর তো ছেলেও হয়েছিল একটা। তারপর নিরুদ্দেশ। ও কি হিজড়ের দলে নাম লেখাল?

শুক্লার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হচ্ছিল।

শুক্লা বলল, ওর বউটা সুবিধের নয়। যদি ওর বউটার খোঁজ পাওয়া যায়, তা হলে বোঝা যেত। দুলালের মায়ের কথাটাই হয়তো ঠিক। ও-ই কলকাঠি নেড়েছে।

অনিকেত বলল, তাই বলে এতদিন পরে কেন ওর কলকাঠি কেটে দিতে যাবে?

শুক্লা বলল, কাগজে পড়েছিলাম কোনও বউ তার স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বঁটি দিয়ে নিজের স্বামীর ওটা কেটে দিয়েছিল।

—তাই বলে এতদিন পরে কেন কাটতে যাবে?

—কে জানে? ভেতরে-ভেতরে রাগ ছিল হয়তো। কিংবা এমনও হতে পারে অনেক আগেই কেটে দিয়েছিল। তারপর লজ্জায় বাড়ি ছেড়েছে। ভেবেছে মুখ দেখাবে কী করে?

—মুখ দেখালে তো কোনও দোষ নেই, 'মুখ' মানে কী বলতে চাইছ তুমি?

—হ্যাঁ, 'মুখ' মানে বলতে চাইছি ওই জায়গাটাই। তুমি যা ভাবছ। ওটাই তো ছেলেদের 'মুখ'। ওটা নিয়েই তো পুরুষমানুষের যত তড়পানি।

—ধুর, ওর বউ ওর কলকাঠি কেটে দিল আর কেউ জানবে না? ওর মা-ও জানবে না? দুলালের মা ঠিকই আমাদের বলত।

শুক্লা একটু চিন্তায় পড়ল। তারপর বলল, এমনও তো হতে পারে, দুলাল সাইকেল করে যে মেয়েদের সাজবার জিনিস ফেরি করত, তখন হয়তো কারও সঙ্গে লটরপটর হয়েছে। তখনই বউবাচ্চা ছেড়ে ভেগেছে। ব্যাটাছেলেদের কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। তারপর ওই নতুন বউ ওর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন বঁটি দিয়ে কেটে দিয়েছে।

অনিকেত বলল—অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বঁটি দিয়ে কেটে ফেলার থিয়োরিটা ছাড়ো। ওর অত্যাচার করার ইচ্ছে বা ক্ষমতা ছিলই না। বরং তোমার ওই অত্যাচারটা কম হত বলেই ওর বউ পালিয়েছে—যেখানে অত্যাচারটা ভাল পাওয়া যায়। 'অত্যাচার' শব্দটা নিয়ে বেশ একটু খেলাধুলো করল অনিকেত। তারপর বলল—আমার কি মনে হয় জানো, ও নিজেই ওসব কেটে ফেলেছে।

শুক্লা বলল, নিজে? নিজে হাতে? তা আবার হয় না কি? অনিকেত বলল—নিজে হাতে নয়, কাউকে দিয়ে। হিজড়েরা তো এটা করেই। আর যারা রি-অ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি করে ছেলে থেকে মেয়ে হতে চায়, তারা ভাল সার্জেনকে দিয়ে করিয়ে নেয়। দুলাল তো হিজড়েই হয়েছিল। ওর তো শাড়ি ছিল পরনে।

শুক্লা বলল, তাই যদি হবে—পিরের কাছে এসেছিল কেন? এমনও তো হতে পারে ওকে শাড়িটাড়ি পরিয়ে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল যেন লোকে ভাবে ও হিজড়ে। মানে ওকে হিজড়ে সাজানো হয়েছিল।

বাব্বা! শুক্লা তো বেশ পেঁচিয়ে ভাবতে শিখেছে। ফেলুদা পড়ছে কিনা, তবে পিরের দরগায় কেন এসেছিল এটা একটা প্রশ্ন।

বাসুবাটিতে তো হিজড়েরা যায়। ওখানেও পিরের মাজার আছে। খাজা জালালুদ্দিন।

পিররা অনেকেই সুফি। সমাজের এঁটোকাঁটাদের ওঁরা কাছে টানতেন, ইসলামেও দীক্ষা দিতেন। হিজড়েরা হয়তো পিরদের কাছে মানসিক শুশ্রূষা পেত। আজমির শরিফে খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি-র দরগায় নাকি অনেক হিজড়ে যায়, ওরা খাজাবাবা-কে খুব মানে। ঘুটিয়ারি শরিফেও শ্রাবণ মাসে মেলা বসে। 'বাংলার মেলা ও পূজাপার্বণ' নামে একটা সরকারি বই আছে, অশোক মিত্র সম্পাদিত। ওখানেও লেখা আছে—ওই মেলায় আগে হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষের প্রচুর আগমন হত। ইদানীং কমে যাচ্ছে। ওই পিরের নামের আগে খাজা নেই, গাজি আছে। গাজি সৈয়দ মোবারক আলি শাহ সাহেবের মাজার। বীরভূমের পাথরচাপড়ি-র হজরত

মহবুব পিরের মাজারেও হিজড়েরা যায়। এরকম আরও পির আছেন। গরিফা-র চশমাবাবা পির, করিয়া-র কালো পির...। চব্বিশ পরগনা খুঁজে খাজাইতলা-র খাজাই পিরের কথা পেল না। এখানে তো মেলা হয় না, তাই হয়তো উল্লেখ নেই। তা ছাড়া এসব বইতে সব কিছু অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশ বড় বিচিত্র দেশ।

'খাজা' কথাটার মানে কী? অনেকের নামের আগে 'খাজা' থাকে। কাকে জিগ্যেস করা যায়? সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-কে ফোন করল অনিকেত। উনি বললেন, 'খাজা' শব্দটা ফারসি। এটা একটা সম্মানসূচক বিশেষণ। এর মানে, অনেকটা 'প্রভু'-র কাছাকাছি। যদিও প্রভু হলেন আল্লা, সবাই তাঁর বান্দা। এই শব্দটা শিষ্যরাই প্রয়োগ করে থাকে। শেখ বা সৈয়দদের মতো এটা বংশগত উপাধি নয়।

সিরাজ সাহেব অনিকেতের খুব পরিচিত কেউ নন, কিন্তু খুব ভাল করে কথা বললেন উনি। আসলে অ্যাকাডেমিক কোনও বিষয় পেলে উনি খুব খুশি হন। অনিকেত ওর সমস্যাটার কথা বলল। খাজাইতলা-র কথাও জানাল। সিরাজ সাহেব বললেন—তোমার ওই খাজা কোনও 'খোজা' থেকে আসেনি তো? খোঁজ নিয়ে দ্যাখো তো?

—কী করে খোঁজ নেব? জিগ্যেস করে অনিকেত।

—দ্যাখো, ঠিকই গল্পকথা ছড়িয়ে থাকবে ওই এলাকায়।

অনিকেত বলল—ওই এলাকায় পুরনো লোকজন তো কমে আসছে। চারদিকে ফ্ল্যাট হচ্ছে, প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে। নতুন-নতুন মানুষজন আসছে, গল্পকথা কিছু থাকলেও হয়তো হারিয়ে গিয়েছে।

সিরাজ বললেন—তবু দ্যাখো, কাছাকাছি মসজিদের ইমাম যদি কিছু জানেন, আসলে গল্পকথাগুলো কোঁচড়ে ভরে রাখে মহিলারা। আমার মনে হচ্ছে, তোমার খাজাইপির কোনও 'খাজা' নন। তা হলে জাঁকজমক বেশি হত। গাছতলায় চুপচাপ পড়ে আছেন যখন, খোজা-ই হবেন তিনি। খোজা পির। খোজাতলা থেকে খাজাইতলা। পুরনো দলিল-টলিল থাকলে হয়তো দেখতে পাবে মৌজার নাম খোজাতলা। না-ও হতে পারে। হয়তো খোজাতলা নামে কোনও মৌজা নেই, লোক-মুখে ওই এলাকার নাম খোজাতলা হয়ে গিয়েছিল, লোক-মুখে অনেক জনবসতির নাম তৈরি হয়, কিন্তু রেকর্ডে থাকে না। আমাদের গোকর্ণের কাছে একজন পিরকে আমি ছোটবেলায় দেখেছি। সেই পির শাড়ি পরতেন। শরিয়তি মুসলমানরা কেউ ওই পিরের ছায়াও মাড়াতেন না। গরিব-গুর্বো-জোলা মুসলমানরা ওঁর কাছে যেত। শূদ্র চণ্ডালরাও যেত। শাড়ি পরলেও উনি মহিলা ছিলেন না। ইসলামে কোনও মহিলা মসজিদের ইমাম হতে পারে না. পির তো দূরের কথা। মহিলারা তো প্রকাশ্যে নামাজ পড়তেও যেতে পারে না, ঈদের নামাজ হলেও নয়। দূর থেকে ওই শাড়ি-পরা পিরকে দেখতাম। মুরিদ, মানে শিষ্যদের সঙ্গে, কথা বলতেন। গলার স্বরটা মনে আছে। একটু কর্কশ ছিল। মেয়েদের মতো নয়; পুরুষদের মতোও নয়। কিন্তু কথার মধ্যে সুর খেলা করত। কী বলতেন আর মনে নেই, তবে হিন্দুদের বলতে শুনেছি, উনি প্রতিমা পির। মুসলমানরা বলত, ফতে পির। ফাতেমা হল পয়গম্বরের মেয়ের নাম। ফাতেমা আবার হাসান-হোসেনের মা-ও হন। আলি-র স্ত্রী। আলি হলেন প্রথম ইমাম। এই ফাতেমা জড় এবং জীবের মধ্যে যে মিস্টিক শক্তি কাজ করে, সে-কথাও বলেছিলেন। সুফিরা ওঁকে খুব মানে। আবার স্তনত্যাগী শিশুকেও বোঝায়। ওই পির নিজেকে

নারী ভাবতেন। আল্লাহ্ যদি পরমপুরুষ হন, নিজেকে নারী ভাবতে পারলে, তাঁর প্রতি আকুতি বাড়ে। বৈষ্ণবদের মধ্যে রাধাভাব সাধনাও তো আছে। কোনও পুরুষ নিজেকে রাধা ভাবতে পারলেই—কৃষ্ণকে প্রাণমন সমর্পণ করে দিতে পারে। আমাদের গোকর্ণের ওই পিরের যে খুব নাম-ডাক ছিল, তেমন নয়। থাকবে কী করে? দেশে গিয়ে কিছুদিন আগে খুঁজতে গিয়েছিলাম। একটা মাজার আছে, অবহেলায়। নাম হয়ে গিয়েছে ফতে পিরের মাজার। ফাতেমাও নয়, প্রতিমাও নয়। ফতে। পুরুষতন্ত্র একেই বলে!

অনিকেত জিগ্যেস করল—ওখানে কি হিজড়েরা আসে?

সিরাজ সাহেব বললেন—সেটা বলতে পারব না। তবে ওঁর শিষ্যদের মধ্যে মেয়েলি-পুরুষ দু-চারজন হয়তো ছিল। আমাদের আলকাপ দলের একটি ছোকরা তো খুব ওঁর কাছে যেত। ছোকরা মানে আলকাপ দলের মেয়েলি-পুরুষ। ছেলে আর মেয়ে, পুরুষ আর নারী, এই সম্পর্কটার মধ্যে কোথায় যে ভেদরেখা কে জানে। শুধু কি লিঙ্গচিহ্ন? জনন-দ্বার? মনে হয় না। আমি একটা পুরুষ-ছোকরায় বড় বিভোর ছিলাম বহুদিন। পারলে আমার 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসটা পড়ে নিও।

অনিকেত জিগ্যেস করল—ওই ফাতেমা পির কি খোজা ছিলেন? ক্যাস্ট্রেশন করিয়েছিলেন? হেসে উঠলেন সিরাজ সাহেব। বললেন, সেটা আমি কী করে জানব? আমার জানার কথা নয়। বৈষ্ণবদের যাঁরা রাধাভাবের সাধক, ওঁরা তো ক্যাস্ট্রেশন করান না। পারস্যেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে ম্যানিকিজ্‌ম নামে এক বিশেষ ধর্মমতের উন্মেষ ঘটে। শরীর-পীড়নের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের আশায় ওই মতে বিশ্বাসীদের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলতে হত। আবার খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ অরিজেন ওই একই সময়ে যৌনতাকে ঈশ্বর-সাধনার পরিপন্থী ভেবে তাঁর পুরুষাঙ্গ ছেদন করেছিলেন—এরপর ওঁর নামে একটা দল গড়ে ওঠে। ভ্যালেসিরাও ভাবতেন, পুরুষাঙ্গ ছেদন করলেই মন যৌনচিন্তা থেকে সরে ঈশ্বরের দিকে যাবে। কিন্তু পুরুষাঙ্গ ছেদন করলেই যৌনতা শেষ হয় না। তা হলে ছিন্নি-হিজড়েদের কোনও যৌনতাই থাকত না। আসলে ব্যাপারটা কী জানো? নারীর মধ্যে প্রকৃতিগত ভাবেই সেবা করার এলিমেন্ট থাকে। ওরাই স্তন্যপান করায় কিনা। স্নেহপ্রবণতা ওদেরই বেশি। হয়তো এর পিছনে কোনও হরমোন কাজ করছে, জানি না, তবে এটা জানি বৈষ্ণবদের মতো সুফিদেরও একটা 'স্কুল' নারীভাবে ঈশ্বর-ভজনা করেন।

সিরাজ সাহেব একটু দম নিলেন। ওঁর একটু শ্বাসের কষ্ট হয়। উনি আরও বলতে লাগলেন—পারস্যে একটা সেক্ট আছে, ওঁরাও নিজেদের খোজা বলেন। কিন্তু ক্যাস্ট্রেটেড নন। ওঁদের একটা অংশ গুজরাট-মহারাষ্ট্রে বসবাস করেন। পারসিদের মতো ওঁরা পুরোপুরি অগ্নি-উপাসক নন। যেমন আমাদের টাটা, ওয়াদেয়া। ওঁরা দশাবতারে বিশ্বাস করেন, কিন্তু দশম অবতার হলেন আলি। ফাতেমার স্বামী। খুব ইন্টারেস্টিং।

আবার উটকো ঝামেলায় পড়ল অনিকেত। ওই খাজাইপির তবে কি খোজা? কীরকম খোজা? হারেমে যাদের রাখা হত, ওদের খোজা বলা হত। সেই ধারায় ক্যাস্ট্রেটেড বা লিঙ্গচ্ছেদ-করা পুরুষ হলেই খোজা। উনি কি সেই গোকর্ণের ফতে পিরের মতো কেউ ছিলেন, না কি বৈষ্ণব-মনোভাবাপন্ন খোজা সম্প্রদায়ের কেউ।

খাজাইতলায় গেল অনিকেত। গাঁয়ের বসতির বাইরে পিরের সমাধিটা ফেটে গিয়েছে।

চুনবালির পলেস্তরা খসে গিয়েছে। একটা পুরনো গাছ। গাছে কিছু ঢিল ঝুলছে।

গাঁয়ে অল্প কিছু মুসলিম আছে। সুতরাং একটা মসজিদ। মসজিদের ইমামের খোঁজ পেল। মুড়ি-ফুলুরি খাচ্ছিলেন। জানালেন, হাটতলায় রেডিও সারাইয়ের দোকান আছে। চলে না। জানালেন, ওই খাজাই পির সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না, ওঁর বাবা হয়তো জানতেন। বাবার ইন্তেকাল হয়েছে গত বছর। বাবার কাছে শুনেছেন নীল চাষের সময়ে এখানে একজন পির থাকতেন। শ্রাবণ মাসে কিছু লোকজন আসত। চাদর চড়াত, এখন কাউকে দেখা যায় না। তবে দু-চারজন টুকটাক আসে। ইমামের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। গোড়ালির একটু ওপরে পাজামা। আর হাওয়াই শার্ট। হাঁক পাড়লেন, কী রে...ইলেকটিরি এল?

উত্তর এল, এখনও লোডশেডিং। অনিকেতকে বলল, এই হল ঝামেলা। গলা চিরে যাবে। মোয়াজ্জেন শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে।

পানি খেলো ঢকঢক করে, দেড় লিটারের পেপসি-র বোতল থেকে। অনিকেত জিগ্যেস করল—এই মাজারে কি হিজড়েদের আসতে দেখেছেন কখনও? ইমাম সাহেব বললেন, মনে তো পড়ে না। বললাম তো ইন্টারেস্ট নেই। তা ছাড়া ওই মাজারটা তো গাঁয়ের বাইরের দিকে, কে আসে না-আসে, নজরে পড়ে না।

অনিকেত বলল—আপনাদের গাঁয়ের দুলালের মা আমাদের বাড়িতেই কাজ করে...

ইমাম সাহেব বললেন, বুঝেছি। আপনাকেও চিনি। ওই পথেই যাতায়াত কিনা। আর হিজড়ের কথা কেন জিগ্যেস করছেন সেটাও অনুমান করতে পারি। দুলাল ওরকম হয়ে গিয়েছে কি না ভাবছেন। আর ও কেন খাজাইপিরের কাছে গেল? ও যদি বেঁচে ফিরে আসে ইনশাল্লা, সব বোঝা যাবে। তবে আমার এক নানা বেঁচে আছে। ওঁর কাছে গেলে জানা যাবে। অবশ্য এখন তো যাওয়া যাবে না, আজানের টাইম...। তারপর লোকজন আসবে। আজ জুম্মাবার কিনা, পানি পড়া দিতে হবে।

—এখনও পানি পড়া নিতে আসে?

—আসবে না কেন? দরুদদোয়ায় কাজ হবে না?

—ক'জন হয়?

—পাঁচ-সাত-দশ...।

আজ একটা ছুটির দিন ছিল, ক্ষেত্রসমীক্ষায় চলে গেল। এসব হচ্ছে তারাপদ সাঁতরা-সুধীর চক্রবর্তী-দিব্যজ্যোতি মজুমদারদের কাজ। এসব কম্ম কি ওকে দিয়ে হয়?

দুলালের ছুটি হওয়ার আগের দিন নীলরতন সরকার হাসপাতালে গেল অনিকেত। যেতেই হল, কারণ ডাক্তারবাবু দুলালের মা-কে বলেছেন, তোমার ওই বাবুকে নিয়ে এসো। কথা আছে।

ড. পলাশ সেনগুপ্ত বললেন—কোনও ধানাইপানাই না-করেই বললেন—ওর রেকটাম-টা ফানেলের মতো হাঁ করা। বোঝাই যায় পেনিট্রেশন হয়। তা ছাড়া ক্যাস্ট্রেটেড। হিমোগ্লোবিন কম। সন্দেহ হল। ওর ব্লাড এলাইজা টেস্ট করতে পাঠালাম। এইচআইভি পজিটিভ। সম্ভবত এড্‌স-এর ম্যানিফেস্টেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। এটা জানানো দরকার ছিল। ওকে সাবধানে রাখতে হবে। আন্ডারস্টুড?

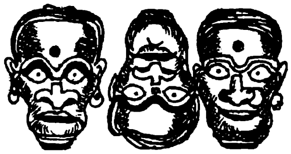

অনিকেতদের বাড়ির চিলেকোঠার ঘরটাকে টিবি-ঘর বলা হয়। অনিকেতের দাদুর কোনও জ্ঞাতি-ভাইয়ের টিবি হয়েছিল, উনি ছিলেন ব্যাচেলর, ওঁকে রাখা হয়েছিল। ওই ঘরে, আলাদা করে। অনিকেত দেখেনি। উনি ওই ঘরেই মারা যান। অনিকেতের মনে পড়ে, ওর ছোটবেলাতে ওই ঘরে ঢোকা নিষেধ ছিল। যক্ষ্মা হলে মানুষ ভয় পেত, কারণ খুব খরচ-সাপেক্ষ ছিল চিকিৎসা, তা ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এর কোনও চিকিৎসা ছিল না। এজন্য এর নাম ছিল 'রাজরোগ'। যক্ষ্মা-র ইংরেজি নাম টিউবারকিউলোসিস। সংক্ষেপে টিবি। ওই শব্দ একটা ভয় বয়ে আনত। টিবি-ঘর যেন ভূতের ঘর। সে-সময় সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়ার সময় খোঁজ নেওয়া হত পাত্র বা পাত্রীর বংশে কারও 'রাজরোগ' আছে কি না।

টিবি নিয়ে এখন কেউ মাথা ঘামায় না আর। ভাল ওষুধ বেরিয়ে গিয়েছে। এখন সেই ভয়টা এসে বাসা বেঁধেছে এড্‌স শব্দটার মধ্যে।

কোত্থেকে যে এল রোগটা, ক'বছর আগেও তো এ নামের কোনও অসুখের নামই শোনা যেত না। যেমন সন্তোষী মা। হঠাৎই এলেন এবং জয় করলেন। শুক্রবার-শুক্রবার শুক্লা টক খায় না, বোঁদে খায়। সন্তোষী মা করে কিনা, আর এসেছে চাউ ও রোল। আশির দশক থেকেই রাস্তায়, অফিসপাড়ায় চাউমিন বিক্রি হতে থাকে। বাঙালির জলখাবারেও ঢুকে যায় চাউ। চাউ এবং সন্তোষী মা-ও বাঙালির ঘরে এই সময়েই ঢোকেন। কীভাবে যে কে ক্লিক করে যায়, বোঝা মুশকিল। পাশের রাজ্য বিহার থেকে সারা উত্তর ভারতেই হনুমান পুজোর রমরমা, কিন্তু বাঙালি হনুমানকে গ্রহণ করল না। বাঙালির ঠাকুরঘরে হনুমানজি ঢুকলেন না। সারা শ্রাবণ মাস জুড়ে মাইক বাজে। বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে যারা যায়, তাদের মনোরঞ্জনের জন্য প্লাস্টিকের ফুল সাজানো বাঁক, বাঁক রাখার স্ট্যান্ড তৈরি হয় পাড়ায়-পাড়ায়। 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ'—স্লোগানের পাশেই এসব বাঁক রাখা। প্রচুর মানুষ এখন তারক-ভক্ত। 'জয় বাবা তারকনাথ' সিনেমার প্রভাবেই কি এই সমারোহ? কে জানে, 'জয় বাবা হনুমান' সিনেমা এলে কি বাঙালি হনুমান-ভক্ত হবে? মনে হয় না। বাঙালির রক্তে কি কোনও অ্যান্টি-হনুমান অ্যান্টিজেন আছে?

হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস বা 'এইচআইভি' হল একটা ভাইরাসের নাম, যা রক্তের টি সেল-কে কাজ করতে দেয় না। এর ফলে মানুষ রোগ প্রতিরোধ করতে পারে না। সহজেই অন্য রোগের কবলে পড়ে। এই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাচ্যুত মানুষরাই হল এড্‌স-এর রুগি। 'এআইডিএস' মানে হল 'অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম'। অ্যাকোয়ার্ড মানে 'অর্জন'।

এড্‌স-এর রুগি নিয়ে ভয়টা এখন আমাদের মধ্যে, সেটা টিবি-র ভয়ের চেয়েও বেশি। টিবি-ঘরের মতো হাসপাতালেও এইচআইভি 'পজিটিভ'-দের জন্য আলাদা ঘর থাকে। ওদের রক্তে খুব ভয়, ওদের শরীর থেকে নিঃসৃত রসে ভয়। চোখের জলেও ভয়?

ডাক্তার পলাশ সেনগুপ্ত বললেন—ওর তো অপারেশন হল, আলাদা যন্ত্রপাতি তো ব্যবহার হয়নি, ওই যন্ত্রপাতি দিয়েই তো অন্য অপারেশন হবে। যদিও স্টেরাইল করা হয়, কিন্তু হাসাপাতালের ব্যাপার...। ওকে আরও ক'টা দিন হাসাপাতালে রাখা উচিত ছিল, কিন্তু এইচআইভি 'পজিটিভ' পাওয়া গেল, কোনও রিস্ক নেব না। বাড়ি নিয়ে যান।

'ও' মানে দুলাল। দুলালের এইচআইভি 'পজিটিভ' পাওয়ায়, দুলাল এখন 'ও'। নাম-হীন। ও এখন এইচআইভি 'পজিটিভ'। অনিকেত জিগ্যেস করেছিল—'পজিটিভ' মানেই কি এড্‌স?

ডাক্তারবাবু বললেন—'পজিটিভ' মানেই সবার ক্ষেত্রে এড্‌স নয়, এইচআইভি 'পজিটিভ' মানে ওর রক্তে ওই মারাত্মক ভাইরাস-টা রয়েছে, মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তিকে অকেজো করে দেবে। সহজেই ঠান্ডা লাগবে, ডায়রিয়া হবে, ওজন কমতে থাকবে—একবার ঠান্ডা লাগলে, কি নিউমোনিয়া হলে, বাঁচানো শক্ত; আন্ত্রিক হলে কমতে চাইবে না; নানা ধরনের স্কিন ডিজিজ-ও...। তবে আপনার পেশেন্টের মনে হয় এড্‌স হয়েই গিয়েছে। সারা গায়ে তো দেখছি লিম্ফোমা, বাড়ি নিয়ে যান, পরে আউটডোর-এ আসতে বলবেন। এড্‌স এর আলাদা সেকশন আছে। আপনি এত কিছু মাথায় নিচ্ছেন কেন? যথেষ্ট করেছেন। বাড়ির কাজের লোকের ছেলের জন্য কেউ এত করে না।

ঠিকই তো, অনিকেতের কী দায় পড়েছে? দুলালের মা দুলাল পেয়েছে, ব্যস, মিটে গেল।

ট্যাক্সি করে দুলালকে বাড়ি পৌঁছে দিল অনিকেত। ওর বাড়ি পর্যন্ত ট্যাক্সি যায় না। কিছুটা ভ্যান, বাকিটা ধরাধরি করে। পাড়ার কেউ-কেউ ওকে ধরল। যখন জানবে ওর এড্‌স হয়েছে, ওকে ছোঁবে না।

দুলালের মা বলল—আপনার দয়ায় আমার দুলাল ফিরে পালাম দাদাবাবু। দুলালের মা-কে 'মাসি' বলে ডাকে অনিকেত। কিন্তু দুলালের মা ওকে বোনপো বলে ডাকে না। 'দাদাবাবু'-ই বলে।

ট্যাক্সিতে দুলাল কোনও কথা বলছিল না। অনিকেত জিগ্যেস করছিল, এতদিন কোথায় ছিলে দুলাল? দুলাল চুপ। ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। শরীর থেকে বেরনো জল। শরীর-নিংড়ানো নুন থাকে ওতে। সঙ্গে কি ভাইরাসও থাকে?

দু-তিনবার জিগ্যেস করে উত্তর পেল না। অনিকেত ভাবল পরে জিগ্যেস করবে। রোগটা তো 'অ্যাকোয়ার্ড'। কোথা থেকে 'অর্জন' করেছে ও? অনিকেত দেখছিল, সারা ট্যাক্সি-যাত্রায় দুলালের মা ওর বাসন-মাজা হাত ঘর-মোছা হাত দুলালের গায়ে-মাথায় বুলিয়ে দিচ্ছিল। মায়া-মমতা বুলিয়ে দিচ্ছিল। না কি ওর ঘর-মোছা হাতে দুলুর শরীরের অসুখ-বিসুখ মুছে নিচ্ছিল? বারবার জিগ্যেস করছিল একই কথা—ভাল ছিলিস তো দুলু? দুলাল 'হ্যাঁ'-ও বলছিল না, 'না'-ও বলছিল না।

দুলালের বাড়িতে কোনও টিবি-ঘর নেই। ওদের একটাই তো ঘর, টিনের ছাউনি। ওখানে শুইয়ে দেওয়া হল। দুলালের ছেলে ওর বাবাকে ড্যাবড্যাব করে দেখছিল। এখন ওর বছর বারো বয়স। রোগা-রোগা চেহারা। দেখেই বোঝা যায় ছেলেটার শরীর ভীরুতা-মাখানো। ওর নির্মল চোখের কোণে অক্ষম পিচুটি।

অনিকেত দুলালের মা-কে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলল—এবার আমি যাই। দুলালকে সাবধানে রেখো, যেন কোথাও না কেটে-কুটে যায়। বলেই মনে হল, কেটে গেলে কী করবে।

বলল, মাসি, তোমার হাত দু'টো খুলে দেখাও তো!

দু'হাত মেলে দেয় দুলালের মা। হাতের আঙুল ফাটা-ফাটা। দুই আঙুলের সন্ধিস্থলে একটু হাজাও আছে মনে হল। ওকে কী করে বলবে কেটে-কুটে গেলে হাতে গ্লাভস পরে নিও, যাতে ওর রক্ত... ও বলল, তোমায় একটা মলম কিনে দেব। হাজা হয়েছে তো...!

—জল ঘাঁটতে হয় দাদাবাবু, কী করব... কেউ কি শুনবে? এখন তো আরও এক বাড়ি কাজ ধরতে হবে। দুলু তো এখন কুনু কাজ করতে পারবে না।

এসব সমস্যার সমাধান তো অনিকেত করতে পারবে না। বড়জোর শুক্লাকে বলতে পারে, ওর পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও। ব্যস। এর মধ্যে অনিকেত আর নেই। অনেক হয়েছে। দুলালের এই রোগের কথা শুক্লাকে বলেনি এখনও। বলবেও না। এড্‌স রোগীর সঙ্গে করমর্দনে এই রোগ হয় না, এক বিছানায় শুলে কিছু হয় না, এমনকী হাল্কা চুম্বনেও কিছু হয় না—এসব কি শুক্লা মানবে?

ডাক্তাররাই হাসপাতাল থেকে সরিয়ে দিচ্ছে—কাগজে তো বেরচ্ছে।

অনিকেত বলল—এবার যাই মাসি। সাবধানে থেকো। কলেজে এনসিসি করার সময় যেমন অ্যাবাউট টার্ন করত, সেভাবে পিছন ফিরল। অনেক হয়েছে, আর না।

জামাটা ধরে মৃদু টানল দুলালের মা। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় বনের হরিণী শকুন্তলার আঁচল টেনেছিল। অনিকেত দাঁড়িয়ে যায়। দুলালের মা হঠাৎ বসে পড়ে, দুই হাতে কুয়োভাদিস-পরা পা চেপে ধরে বলে, দাদাবাবু গো, আপনি ছাড়া কে আছে আমার...।

অনিকেত পা ছাড়ায়।

বলে, ছি ছি। তোমাকে মাসি বলি, এটা কী করছ?

দুলালের মা বলে—আমার বড় বিপদ দাদাবাবু। দুলালের আইভি রোগ হয়েচে, এ রোগে কেউ বাঁচে না...

—কে বলল তোমায়?

—নার্স দিদি, আর ছোট ডাক্তার।

অনিকেত বলল, পাড়ার কাউকে বোলো না।

দুলালের মা বলল, আমায় ছেড়ে যাবেন না দাদাবাবু গো...

'অনেক হয়েছে আর না' তো মনে-মনে বলেছিল অনিকেত। দুলালের মা শুনল কী করে? অনিকেত বলল, ছেড়ে যাব না মানে? বাড়ি যাব না? আমার ঘর-বাড়ি নেই?

দুলালের মা ওর দু'হাত কচলাচ্ছে। যেন ওর অন্তর-বাসনাকে হাতের তালুতে এনে রস বার করছে। বলল—আপনার ঘরেই থাকুন দাদাবাবু, মনে-মনে আমার ঘরেও...।

শুক্লা বলল, অনেক পুণ্য করলে গো...। আমারও পুণ্য হল।

—কেন? তোমার কেন?

পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য...!

রবীন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ'র বাণী লেখা পিতৃদত্ত ডায়রিটার প্রভাব? ওসব মনীষী-বাণী উদ্ধৃত করে রচনা লিখতে হয়। ওগুলো বিশ্বাস করে জীবনে 'লগ ইন' করে না কি কেউ?

অনিকেত বাজাতে চায়। বলে, কেন? পুণ্য কেন?

জীবে প্রেম করে যেই জন...শুক্লা বলল।

যদি বলা যায় দুলাল এড্‌স রুগি? এড্‌স রুগি প্রেম করে যেই জন...সেইজন সেবিছে ঈশ্বর মেনে নেবে তো শুক্লা?

মাদার টেরিজা গত হয়েছেন। উনি অনেক অসুস্থকে কোল দিয়েছেন, সেবা দিয়েছেন। কুষ্ঠরুগিকে সেবা করার মধ্যে মহিমা বেশি। যিশু করেছেন, গান্ধীজিও। মাদার-ও অনেক কুষ্ঠরুগিকে সেবা দিয়েছেন। কুষ্ঠ রোগের মধ্যে বীভৎসতা আছে। পুঁজ-রক্ত আছে। এদের সেবা করার মধ্যে মহিমা প্রকাশ হয়। এড্‌স রুগিদের তো অঙ্গবিকৃতি নেই, রক্তপাত নেই...কোনও গ্ল্যামারও নেই। ধীরে, করুণ সুরে মরে। মাদার যদি বেঁচে থাকতেন, এড্‌স রোগীদের জন্য কিছু করতেন। নিশ্চয় করতেন। নিশ্চয়ই করতেন।

১৯৯৭ সালে মাদার দেহ রেখেছেন। তাতে কী হয়েছে? 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি' আছে তো...। ওখানে গিয়ে খোঁজ নিলে হয় না? ওখানেই তো আশ্রয় পেতে পারে দুলাল। এটা তো মাথাতেই আসত না...যদি না শুক্লা 'পুণ্য'-র কথাটা তুলত।

গ্রামে যদি জেনে যায় দুলালের এই ব্যারাম হয়েছে, দুলালের মা'কে টিউবওয়েলের জল পাম্প করতে দেবে না। পুকুরে স্নান করতেও দেবে না। ১৯৮২ থেকে ১৯৯৬—এই ষোলো বছর মাত্র এই রোগটার বয়েস। আসল বয়স নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশি, কিন্তু শোনা যাচ্ছে তো '৮২ থেকেই। ভারতে প্রথম এইচআইভি ধরা পড়ে ১৯৮৬ সালে। মাদ্রাজে। 'ন্যাশনাল এড্‌স কন্ট্রোল প্রোগ্রাম' চালু হয় ১৯৮৭ সাল থেকে। আর 'ন্যাশো'; মানে 'ন্যাশনাল এড্‌স কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন' তৈরি হয় ১৯৯২ থেকে। টাকা-পয়সা আসছে। প্রচারও হচ্ছে খুব। হোর্ডিং, খবর কাগজে বিজ্ঞাপন, বেতার ও দূরদর্শন খুব এড্‌স-এড্‌স করছে। এই শব্দটা এখন জুজু-র মতো। অফিসে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সাহায্য আসে। ওটাও এড্‌স। ওই শব্দটা আজকাল বলা হয় না। বলা হয় গ্র্যান্ট। ডাক্তারবাবুরা রুগিদের কাছ থেকে এরকম প্রশ্নও শুনছেন, কানেও কি এড্‌স হয় নাকি? কেননা, হিয়ারিং এড্‌স বলে একটা জিনিস শুনছি কিনা...। ব্যান্ড এড্‌স-কে ওষুধের দোকানের লোকরা বলে ব্যান্ডেট। আর যাবতীয় ওয়াকিং এড্‌সগুলোকে এককথায় বলা হচ্ছে 'ওয়াকার'। ইংরিজি খবরের কাগজে অর্থ সাহায্য বোঝাতে এইড্‌স-এর বদলে লেখা হচ্ছে গ্রান্ট চারিদিকে ভয়। সচেতনতা ছড়ানোটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল হয়তো, তাই একটা ভয়ের আবহ তৈরি হয়ে গিয়েছে।

আজও অফিস গেল না অনিকেত। ভাল কাজে একটা সি.এল. দান করল। স্নান করল অনেকটা সময় নিয়ে। সাবানটা বার কয়েক ঘষল সারা শরীরে। তৃতীয়বার সাবান ঘষার সময় নিজেকেই প্রশ্ন করল, এতবার কেন? ও কি কালিমা-মুক্ত হচ্ছে? ও কি জুজু ধুচ্ছে? করমর্দন কিংবা আলিঙ্গনে এড্‌স সংক্রমিত হয় না—এই স্লোগানটাও সাবানের ফেনায় মিশিয়ে নিল। তারপর শাওয়ার-স্নান।

দুপুরে শুক্লা আর অনিকেত পাশাপাশি শুয়েছিল। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছিল। জল পড়ে পাতা নড়ে হচ্ছিল। জলের নাচন পাতায়-পাতায় হচ্ছিল। কপোত-কপোতী উচ্চ বৃক্ষচূড়া থেকে নেমে কোনও নিরাপদ ঘুলঘুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল। হঠাৎ এ কী গভীর বাণী এল ঘন মেঘের ওপার হতে।

অনিকেত বলল—আচ্ছা শুক্লা, আমার যদি এড্‌স হয়ে যায়, তুমি কী করবে?

শুক্লা বলল, ধুর, কীসব বাজে কথা একটা সুন্দর দুপুরবেলাটায়...

—ধরো না, যদি হয়...

—কী করে হবে? কার থেকে ঘরে নিয়ে আসবে ওটা?

—না, ধরো নিষ্পাপ ভাবেই যদি হয়, ধরো, রক্ত পরীক্ষা করাতে গেলাম, সেই সুচ বা সিরিঞ্জ থেকে হয়ে গেল।

—কেন? রক্তপরীক্ষা করতে গেলে নতুন সুচ নাও না?

—নিই তো। তবু যদি...

—ধুর, অলুক্ষুনে কীসব বলছ।

—না, এমনি খেলাচ্ছলে বলছি। এই ঝরঝর মুখর বাদর দিনে একটু খেলছি।

—তোমার ও-রোগ হলে তোমার থেকে আমি নিয়ে নেব।

—কী করে নেবে? করমর্দনে এড্‌স হয় না, পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও এড্‌স হয় না, আলিঙ্গনেও নয়। কেবলমাত্র...

—ওই কেবলমাত্র যেটা, সেভাবেই নেব।

—নেবে? তা হলে ট্রায়াল হয়ে যাক।

বলে তো ফেলল। কিন্তু মনে ভিতর থেকে 'ট্রায়াল' নেওয়ার উত্তেজনা আসছে না কেন?

হে কামদেব, অনঙ্গ দাও। অনঙ্গ শরে বিদ্ধ করো আমায়। মাথার ভিতরে লুকিয়ে-থাকা ছোট্ট পিটুইটারি, সক্রিয় হও হে। হে আমার গোনাডোট্রফিন হরমোন, জাগো-জাগো...। মনের ভিতর থেকে যেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-র কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানে 'জাগো জাগো মা' শুনতে পায়।

বহুদিন কিছু নেই। হয় না এ বিছানায়। ইচ্ছেই হয় না। ওই জন্যই অফিসের আড্ডায় 'কড়া পড়া' ও 'মরচে পড়া'—এইভাবে শ্রেণি-ভাগ করা পুরুষের মধ্যে ও 'মরচে' শ্রেণিতে। অব্যবহৃত থেকে মরচে। তাই বলে কি হ্যান্ডবিলের ভাষার 'ইন্দ্রিয়শৈথিল্য, নাকি? তা ঠিক নয়। সকালবেলায় সূর্য একাই ওঠে না কি? আরও কিছু ওঠে। কিন্তু সকালবেলায় ভৈরব রাগিণী। দু-একবার অ্যাপ্রোচ করেছিল, সাড়া পায়নি, কারণ ওটা পুজোর সময়। ভোরে উঠে স্নান করে একটু পুজোআচ্চা করে শুক্লা। আর রাত্তিরে দেখেছে শুক্লা পুতুল-প্রায়। হাত উঠিয়ে দিলে উঠে যায়, পা ওঠালে পা। পুতুল কোনও শব্দ করে না। কিচ্ছু বলতে পারে না। শুক্লা 'উঃ লাগছে', কিংবা 'ব্যস, হয়েছে?' এটুকুই বলতে পারে। আইপিসি ৩৭৭ ধারায় বিভিন্ন অপ্রাকৃতিক শারীরিক সংযোগ নিষিদ্ধ করা আছে। পায়ু, জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি। কিন্তু পুতুল-সঙ্গম নিষিদ্ধ নয়। পুতুল বা রোবট বিষয়ে কিছু বলা নেই। সে যাক, পুতুলটা ঠিক হ্যান্ড্‌ল করতে পারে না অনিকেত। সপ্রাণ হলেও। শুক্লার না-হয় পুতুল থাকার শারীরিক কারণ আছে, কিন্তু মঞ্জুর তো মানসিক। শুক্লা যদি বার্বি ডল হয়, মঞ্জু কাঠের পুতুল। অনিকেত নিজে এখনও পরীক্ষা করে দেখেনি ওর পৌত্তলিক ধর্ম, এটা মঞ্জুর নিজস্ব উক্তি। কিন্তু যেদিন মঞ্জু কিছুটা ঘন হয়ে, অনিকেতের হাত ধরে বলেছিল, 'পারবি, তুই পারবি পুতুলটাকে প্রাণ দিতে?' অনিকেত একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল, রক্তস্রোতের চাঞ্চল্যও টের পেয়েছিল, কথাটার প্রাথমিক শক-এ হাতটা ছেড়ে দিলেও, আফটার শক-এ হাতটা বেশ জেরে চেপে ধরেছিল। মঞ্জুর হাতের পাতা উন্মুক্ত

হয়ে গেলে অনিকেতের হাত ওখানে আশ্রয় নিল। একটা হাতের আঙুলের ফাঁকে-ফাঁকে ঢুকেছে আর একটা হাতের আঙুল অনিকেতের মনে হচ্ছিল শুক্লার তুলনায় এই হাত আরও উষ্ণ। আরও কোমল। অনিকেতের চোখের মধ্যে টর্চ জ্বলে উঠেছিল, টর্চ নয়, সার্চলাইট। মঞ্জুর শরীরের ওপর ঘুরছিল। ডুবুরি হয়ে মঞ্জুর শরীরের গভীরে ঢুকে গিয়ে বলে উঠেছিল, পেয়েছি, পেয়েছি। মুক্তো! মুক্তো! কিন্তু মনে-মনে। কোথাও তোমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। কিন্তু রবীন্দ্রসদনের সিঁড়ির ওপর বসে এর বেশি কিছুই সম্ভব ছিল না। সিঁড়ি ছাড়াও ওই চত্বরে অনেক কুঞ্জ আছে। কিন্তু ওই বয়সে কুঞ্জগমন পোষায় না কি? কিন্তু 'পারবি পুতুলটাকে প্রাণ দিতে'—এই বাক্যাংশটা আফ্রোডেজিয়াক-এর কাজ করেছিল অনিকেতের শরীরে। ওই শব্দ ক'টিই যেন মদনানন্দ মোদক। রতিকল্প তৈল।

এই এখন, বৃষ্টিদিনে শুক্লা একটা ইঙ্গিত দিয়েছে, বহুদিন পরে, কেন কে জানে? বৃষ্টিই কারণ। ওর আহ্বানে সাড়া দেওয়া উচিত। মঞ্জুর মুখোৎসারিত সেই শব্দ ক'টা গিলে ফেলল অনিকেত। এবং মনে হল, হচ্ছে। ভায়াগ্রা নামে একটা ওষুধের কথা শোনা যাচ্ছে। পৃথিবীর কয়েকটা দেশে চালু হয়ে গিয়েছে। ওই ওষুধটা নাকি শরীরে রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে দেয়, সমস্ত সরু জালিকাগুলো রক্তে টইটম্বুর হয়ে ওঠে। এদেশে এখনও ওষুধটা আসেনি, কিন্তু গল্প এসেছে। মঞ্জুর মুখ থেকে বের হওয়া ওই নিরীহ শব্দ ক'টা কেন ভায়াগ্রা হয়ে ওঠে। মন বড় বিচিত্র বস্তু।

শুক্লা অনিকেতের গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

বলল, তুমি বেশ ভাল লোক কিন্তু...

—কেন, এতদিন পর এ কথা মনে হচ্ছে কেন?

—বলছি, লোকের জন্য কত করো। দুলালের মা তো একটা 'মা', আমি যদিও মা নই, হতে পারিনি, কিন্তু মায়ের মন বুঝি। তুমি সার্ভিসটা না-দিলে দুলাল বেঁচে ফিরত না। বলে— আবার একটু আদর করল। তুমি একটা ভাল্‌ল্লো ছেলে। ভেরি গুড বয়।

অনিকেতের গায়ে উপুড় হল। এরকম তো হয় না, ভেরি আনলাইক্‌লি। অনিকেত তো খালি গায়েই ছিল। এবং বারমুডা। শুক্লা ম্যাক্সিতে। শুক্লা অনিকেতের শিরায়, হাড়-পাঁজরায়, আঙুল ছুঁইয়ে দিচ্ছিল, পিয়ানোর মতো বেজে উঠছিল ও। বর্ষা-সিম্ফনি। হাতটা নাভি ছাড়িয়ে নামছিল। স্পর্শও করেছিল লিঙ্গস্থল। শুক্লা মায়া-আহ্লাদে বলে উঠেছিল, ও-মা? এ কী? কিন্তু হায়, শুক্লা জানে না এই জাগরণ-রহস্য। জাগরণের গুপ্তকথা। সামান্য অপরাধবোধ এল অনিকেতের মনে। এখন বেশি অপরাধবোধ ভাল নয়।

শুক্লা বলল, দুলালটা এটাকেই কেটে ফেলেছিল? অ্যাঁ? কেন গো?

—ওটাই তো...।

'বিপন্ন বিস্ময়' কথাটা মনে এলেও বলল না। 'বিপন্ন বিস্ময়' শব্দটার সঙ্গে জীবনানন্দ দাশ এমন বিচ্ছিরিভাবে জড়িত যে, জীবনানন্দকে এসবের মধ্যে আনতে চাইল না। অনিকেত বলল, ওটাই তো বিচ্ছিরি বিস্ময়।

শুক্লা বলল, আমার কী মনে হয় জানো, ও কোনও প্রায়শ্চিত্ত করেছে। দুলাল নিশ্চয়ই অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে.... ওর মনে পাপবোধ এসেছিল, ওর বউকে মুখ দেখাতে পারত না লজ্জায়, ওর মনে হয়েছে ওর অপকর্মের জন্য এই জিনিসটাই দায়ী, তাই ওটা কেটে ফেলেছে।

—উঃ, পারা যায় না এসময় এসব কথা। আবার তো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।

কথা বাড়ায় না অনিকেত। কথা কম, কাজ বেশি। অনিকেত খুব অবাক হচ্ছিল। শুক্লাকে এভাবে পায়নি কতকাল। এরূপ দেখেনি কতদিন। শুক্লা নিজেও অনেকটা সক্রিয় ছিল। বেশিটাই। এক যুগ আগে এরকম শীৎকার শব্দ ফেলে এসেছে। কী করে আবার ফিরে এল?

তবে যে বলে হরমোনটাই আসল, যৌনতা কেমিস্ট্রি মাত্র। যে-রাসায়নিক দ্রব্যগুলো মানুষকে লিবিডো-পীড়িত করে, সেগুলো শুক্লার শরীরে নিঃসৃত হয় না। হরমোনের উৎস কাটা গিয়েছে। ওভারি শুধু নয়, সারভিক্স-সহ জরায়ু। তা হলে এ তাড়না ও পেল কীভাবে হঠাৎ করে? ও আজ যা-যা করল—মনীষী ডায়রি পড়া, সকালে স্নান করে পুজোয় বসা, এবং উপযুক্ত আধ্যাত্মিক গুরু খুঁজে দীক্ষা-বাসনায় থাকা শুক্লার পক্ষে একটু অস্বাভাবিক। টিভিতে খোলামেলা পোশাক পরা মেয়ে-টেয়ে দেখলে বলে, ইস, দেখা যায় না। ওর মা-বাবা দেখছে না? ওর ছেলেমেয়ে থাকলে দেখছে না? তাই বলে চ্যানেল পাল্টেও দেয় না। বলে, তুমি দ্যাখো। তোমাদের জন্যই তো দেখাচ্ছে। যে-মেয়েটা এখনও কাপড় ছাড়ার সময় অনিকেতকে ঘর থেকে বার করে দেয়, সে আজ অনেকটা যেন সফ্‌ট পর্ন-এর নায়িকা হয়ে গেল।

অভিনয়?

কেন এই অভিনয়?

অনিকেত জিগ্যেসই করে ফেলল, তোমার আজ কী হয়েছিল শুক্লা? হঠাৎ কোত্থেকে টিন-এজ খাবলে নিলে তুমি এই চল্লিশ প্লাস বয়সে?

শুক্লা বলল, ফট্টি-নট্টি...। বলেই হাসল...হাসতে-হাসতে বলেছে, 'অলকানন্দা' কাগজের কভার স্টোরি। 'অলকানন্দা' একটা মেয়েদের কাগজ। যুগান্তকারী লেখা থাকে। ছেলেদের জোটানো এবং ফোটানো, ফ্লার্ট-এর এ বি সি ডি—এসব লেখা থাকে।

—তুমি আবার 'অলকানন্দা' কেনো না কি? আগে তো দেখিনি?

ও বলল, একটা কিনলাম হঠাৎ।

অনিকেত বলল—মধ্যবয়সে স্বামীকে খুশি করার টিপ্‌স আছে নাকি ওটায়?

শুক্লা বলল—অনেকটা ও-ধরনের আছে একটা আর্টিক্‌ল...

—ও, তা হলে ওইসব থিয়োরির প্র্যাকটিকাল ক্লাস করলে বুঝি আজ?

—কেন? ভাল লাগেনি?

—ভাল তো লেগেইছে। কিন্তু তুমি যেসব আওয়াজ-টাওয়াজ করলে, ওগুলোও কি থিয়োরি? ওইভাবেই হোমওয়ার্ক করতে বলেছিল তোমায়? তোমার ওই পনেরো-বিশ মিনিটের অভিনয়টা অসাধারণ হয়েছিল, নিঃসন্দেহে।

শুক্লা বলল—অভিনয় বলছ কেন? ওসব তো আমিই করেছিলাম। অসভ্যের মতো। ভীষণ ইচ্ছে করছিল তোমায় ভালবাসতে। ভীষণ।

—কেন?

—বললাম না? দুলালদের জন্য তুমি কত কী করলে। ভাল লোক না-হলে কেউ এরকম করে?

মাথা চুলকোয় অনিকেত। মন? না হরমোন?

বিকেল শেষের বৃষ্টি-ধোয়া আলো শুক্লার মুখে। ওর মুখটা মায়াবী দেখাচ্ছে। লাবণ্যে পূর্ণ দেখাচ্ছে।

অনিকেত সোফায় গা এলিয়ে সিগারেট ধরিয়েছে। তৃপ্ত হলে যা করতে হয়। পা-টা সেন্টার টেবিলের ওপর লম্বা করে তুলে দিয়ে নাচাচ্ছে। এরকম একটা দৃশ্য ওদের মুকুন্দপুরের ঘরে বহুদিন পরে তৈরি হল।

শুক্লা বলল—একটা খুব ভাল স্বপ্ন দেখেছি আজ ভোরে। শেষরাতের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে স্মিত হাস্যে অনিকেত শুক্লার দিকে তাকায়।

শুক্লা স্বপ্নের কথাটা না-বলে বলে—কালকের কাগজে দেখলাম একটি পুরুষ গর্ভবতী হয়েছে। পড়েছ?

—পড়েছি। ও পুরুষ ছিল না। আসলে নারীই ছিল। X-X ক্রোমোজোম-সম্পন্ন। হয়তো বহিরঙ্গে পুরুষ। ভিতরে-ভিতরে নারী। এজন্যই হয়তো...।

শুক্লা বলল, সব গুলিয়ে দাও তোমরা। অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ...। ও একটা ব্যাটাছেলে ছিল। ওর নাম অভয়চরণ দাস। কাগজে তাই তো লিখেছে। ওর হঠাৎ পেটটা বড় হয়ে গেল। বাড়ির লোক ভেবেছিল ওটা টিউমার। তারপর ডাক্তারের কাছে গেল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পেটে বাচ্চা...

অনিকেত যেটা বলতে পারল না—সেটা হল—ভ্রূণ অবস্থায়, সব ভ্রূণেরই, গোনাডিক এরিয়া প্রথম দিকে একইরকম থাকে। পাঁচ মাসের পর থেকে আস্তে-আস্তে পরিবর্তন হতে থাকে। দু'টো সরষের দানার মতো গ্ল্যান্ড পুরুষ-ভ্রূণদের ক্ষেত্রে বড় হয়ে ধীরে-ধীরে পেটের তলায় ঝুলে যায়। সেটাই অণ্ডকোষ। স্ত্রী-ভ্রূণদের ক্ষেত্রে পেটের ভিতরেই থেকে যায়, পরে ওটা ওভারি-তে রূপান্তরিত হয়। আর একটা ছোট্ট পিণ্ড বেড়ে গিয়ে পুরুষ-লিঙ্গে পরিণত হয়, মেয়েদের ক্ষেত্রে ওটা তেমন বাড়ে না, জনন-অঙ্গের ওপরেই রয়ে যায়। ওটা ক্লিটোরিস। কে পুরুষ হবে, কে নারী হবে সেটা নির্ভর করে ৪৬টা ক্রোমোজোমের মধ্যে যে দু'টো সেক্স-ক্রোমোজোম, তাদের ওপর। xx হলে নারী, xy হলে পুরুষ। কোনও-কোনও পুরুষ-শিশুর ক্ষেত্রে অণ্ডকোষটা পেটের ভিতরেই রয়ে যায়। লিঙ্গটিও অপরিণত হয়। ওরা হিজড়ে নয়। পুরুষ। সার্জিকাল অপারেশনে ঠিক হয়ে যায়। কোনও স্ত্রী-শিশুর ক্ষেত্রে ক্লিটোরিস-টা একটু বড়ই দেখায়। মনে হয় যেন পুরুষ। আসলে সে নারী। অভয়চরণ সেরকমই। তার জনন-ছিদ্র ছিল, শুক্রসংযোগও ঘটেছিল। নইলে...।

এত কিছু বলা মানে, এই রচিত সুন্দর দৃশ্যচিত্রটার ওপর কালি ছিটিয়ে দেওয়া। ও শুধু বলল, কাগজে সবটা কি লেখে? স্বপ্নটার কথা বলো।

শুক্লা বলল—দেখি, বাড়িতে বিদ্যাসাগর এসেছেন। গায়ে উড়নি। ধুতি। হাসছেন। বলছেন, তোমার নাকি কন্যাসন্তান হয়েছে শুনলাম...। আমার বাবাও ছিলেন। বাবা বললেন, বিদ্যাসাগরমশাইকে প্রণাম করো। বাবাও প্রণাম করলেন। বিদ্যাসাগর মশাই মেয়েটার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তক্ষুনি এলেন নিবেদিতা। সাদা গাউন পরা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বললেন শুক্লা, মেয়েটাকে কিন্তু আমার স্কুলে দিও...।

তা হলে একটু আগে যা কিছু হল তার কারণ একটা স্বপ্ন? এত কিছু করাতে পারে?

হে ফ্রয়েড, ইয়ুং, পাভলভ, উইল্‌হেম জনসন, ডকিন্‌স, তোমরা দেখে নাও—মন-পরিবেশ-হরমোন-জিন শুধু নয়, আরও এক প্যারামিটার আছে, যেটা লিবিডো চালনা করে—যেটা শুক্লা জেনেছে—সেটা স্বপ্ন।

মেট্রো রেল পুরোটাই চালু হয়ে গিয়েছে। প্রথম দিকটা টালিগঞ্জ থেকে এসপ্লানেড, আর ওদিকে দমদম থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত চলছিল। মাঝখানের অংশটুকু তৈরি হতে দেরি হয়েছে। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-তে কীসব মামলা ছিল। মামলা মিটতে দেরি হয়েছে। ফলে ওই অঞ্চলের কাজটুকুও আটকে ছিল।

কলকাতা খোঁড়াখুঁড়ি করে মাটির তলা থেকে যা-যা পাওয়া গিয়েছে, তাই নিয়ে একটা এগ্‌জিবিশন চলছে এশিয়াটিক সোসাইটি-তে। অনিকেত একটু আগে ভাগে অফিস কাটল। মেট্রো স্টেশনগুলো ঝকঝক করে। এই পাতাল-কলকাতার সঙ্গে ওপর-কলকাতাকে মেলানো যায় না। লোকজন নীচে কাগজ ফেলে না, সিগারেট খায় না, থুথু ফেলে না। কেউ পানের পিক ফেললেই অন্য কেউ প্রতিবাদ করে। একই তো লোকজন। ওপরে উঠলেই মানসিকতা পাল্টে যায়। এটাকে কি বলা যায় বাই-আইডেন্টিটি। বাই-পোলারিটি? কে জানে? তা হলে বাইজেনটিয়ানিটি। হঠাৎ বাইজেন্টিয়ান সাম্রাজ্যের কথা উড়ে এল কেন পুরনো কালের স্কুল-বই থেকে? ইতিহাস দেখতে যাওয়া হচ্ছে বলে? নাকি 'বাই' শব্দটা নিয়েই একটা বাই হয়েছে আজকাল। বাই-সেক্সুয়াল, বাই-লিঙ্গুয়াল, বাইনারি বন্ডিং...চলমান সিঁড়ি দিয়ে নামছিল অনিকেত। এর নাম এস্কালেটর। বেশ মজা লাগে চড়তে। ফাঁক পেলেই মেট্রো রেল চড়ে অনিকেত। এশিয়াটিক সোসাইটি তো পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে। আকাশবাণী থেকে বাসেই যাওয়া যেত, কিন্তু মেট্রোতেই যেতে ইচ্ছে করল। চার-পাঁচ বছর হয়ে গেল, এখনও বেশ লাগে। ওর বাড়িটা যেখানে, ওখানে মেট্রোয় খুব একটা সুবিধে হয় না। বাসেই যাতায়াত করে। তাই সুযোগ পেলেই মেট্রোয় ওঠা। এসপ্লানেড স্টেশন।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে অনিকেত, হাই বস...লুক্‌স নাইস...

আইভি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। একটা বিন্দুতে ওরা পরস্পরকে অতিক্রম করল, সেই মুহূর্তে টুক করে মাথার টুপিটা উঠিয়ে নিল আইভি। অনিকেত পিছন ফিরে দেখল, টুপিটা আইভি ওর মাথায় পরে নিয়েছে, আইভি ওপরে উঠে যাচ্ছে।

এগুলো ওর বাড়াবাড়ি। ইচ্ছে করে এসব ছেলেমি করে। এই ইয়ার্কিগুলো তো ছেলেদের।

নিচে নেমে গিয়ে আবার ওপরে ওঠার এস্কালেটর দিয়ে উঠতে হচ্ছে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে আইভি। মাথায় টুপি।

ছাতার বদলে টুপিই ব্যবহার করে অনিকেত। রোদ্দুর আটকায়, হাল্কা বৃষ্টিতেও কাজ দেয়।

টুপি ব্যবহারে প্রথম দিকে একটু জড়তা ছিল, মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এই জড়তাটা কাটিয়ে দিয়েছেন। আইভি বলল—তুমি আমায় টুপি পরাতে পারবে না গুরু, তার আগেই আমি পরে নিলাম। ইস্কুল কেটে কোথায় যাচ্ছ? ইএমএ?

'ইএমএ' মানেটা বুঝতে পারল না অনিকেত। 'এইএমইউ' জানে। মুখে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন এঁকে দাঁড়িয়ে রইল অনিকেত।

—মানে বুঝতে পারলে না? এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স। একদিন খুব গদগদ ভাবে কথা বলছিলে একজন মহিলার সঙ্গে, খুব ঘেঁষটে হাঁটছিলে, আমি যে তোমার সামনে ছিলাম, খেয়ালই করোনি। কিছু মনে কোরো না বস, 'ইএমএ' করতে চাইলে আরও ভাল পেতে। ওই ভদ্রমহিলা মোটেই ইমপ্রেসিভ নয়। কোত্থেকে জোটালে?

—ধুস্, ওরকম কিছু নয়। 'ইএমএ' আবার কী? সেই ছোটবেলার পাড়ার মেয়ে, অনেকদিন পর দেখা হল...

—আইস্ শা...। তুমি 'লাজে রাঙা হল কনে বউ গো' টাইপের হয়ে যাচ্ছ কেন? বলো না বেশ করেছি।

—বলছি তো, ওরকম কিছু নয়। কারও সঙ্গে কথা বললেই প্রেম হয় না কি? এখন যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, এটা কি প্রেম?

—যাবাব্বা। প্রেম কোত্থেকে এল? 'ইএমএ' মানে কি প্রেম নাকি? আর তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করতে চাইলেও, আমি করব না কি? এটা হল বাই-কনসেনচুয়াল। যাক, যা করছ করো, বুক ফুলিয়ে করো। যদিও তোমার বুক ফুলবে না। যাও। 'ইএমএ' করতে যাও।

শালা। সব ক'টা মেয়েই জেলাস। আইভি ছেলেমিপনা দেখালে কী হবে, ঠিক ভিতরে-ভিতরে জেলাস। অনিকেত ভাবে। ও যে মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে না, সেটা প্রমাণ করার জন্যই যেন বলে—একটা এগ্‌জিবিশন দেখতে যাচ্ছি। কলকাতার গর্ভে পাওয়া পুরাতাত্ত্বিক জিনিসপত্র।

—গর্ভ বললে কেন? অভ্যেস খারাপ হয়ে গিয়েছে, তাই না? আইভি বাঁকা চোখে বলল। চোখের এই ভঙ্গি, যেটাকে ভ্রুভঙ্গি বলে, সেটা মেয়েরাই বেশি করে।

—যাব্বাবা, গর্ভই তো। ভূগর্ভ, সমুদ্রগর্ভ, এগুলো...

—না, বললেই তো হত কলকাতার মাটির তলায় পাওয়া পুরাতাত্ত্বিক না কী বললে, সেই এগ্‌জিবিশন, সাধুভাষা বলার কী দরকার ছিল? অসাধু উদ্দেশ্য।

—এর মধ্যে অসাধু উদ্দেশ্য? কী হয়েছে তোমার, অ্যাঁ?

—কী আবার হবে? গর্ভ কথাটা শুনলেই শালা গা ঘিনঘিন করে। জরায়ু-ফরায়ু কী সব বলে না...

কপাল কুঁচকে গেল, ঠোঁটটা বেঁকে গেল আইভি-র, যেন ওর গায়ে বিচ্ছিরি কিছু নোংরা লেগেছে। অনিকেত বলতে যাচ্ছিল : ওসব তো তোমারও আছে, কেন বদার করছ? বলতে গিয়েও বলে না। আইভি-র ব্যাপারটা ও কিছুটা বোঝে। চারপাশেই কত ভুল-করে-পাওয়া লোকজন। যাহা পাই তাহা ভুল করে পাই। ভারতবর্ষে তিরিশ-চল্লিশ লক্ষ ট্রান্সজেন্ডার ঘুরে বেড়াচ্ছে। লিঙ্গান্তর-কামী। কোনও তো হিসেব নেই, এসব হল এনজিও-র হিসেব। গত সেনসাসে এদের পুরুষ বলেই হিসেব করা হয়েছিল। যদি তিরিশ লক্ষই হয়, তবে প্রতি হাজারে

তিনজন করে লিঙ্গান্তর-কামী রয়েছে। মানে, নিজেদের জেন্ডার আইডেন্টিটি যাদের পছন্দ নয়। এই তিরিশ লক্ষর মধ্যে বারো লক্ষ পেশাগত হিজড়া, মানে হিজড়ে পেশায় নিযুক্ত। 'কার হল গো' বলে তালি লাগায়, ট্রেনে যাত্রীদের কাছ থেকে তোলা আদায় করে, কিংবা স্টেশনের লেডিজ টিকিট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকে, ওখানে ভিড় কম। পুরুষদের টিকিট কেটে দিয়ে পয়সা নেয়। 'সর্বভারতীয় হিজড়া কল্যাণ সমিতি'-র ১৯৯৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, হিজড়েদের সংখ্যা বারো লক্ষ। এ ছাড়া আছে লোন্ডা-নাসিন, যারা মেয়ে সেজে বিয়েবাড়ি বা অন্যান্য উৎসবে নাচে। আর আছে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অজস্র কোতি। আমাদের মধ্যেই কত 'পরি' রয়েছে, তাদের সংখ্যা কত কে জানে? যে সব এনজিও এদের নিয়ে কাজ করে, তারা সবাই একইরকম পরিসংখ্যান দেয় না। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায়—বারো থেকে পনেরো লক্ষ পেশাদার হিজড়া ও লন্ডা ছাড়াও পঁচিশ-ত্রিশ লক্ষ ঘরে থাকা লিঙ্গান্তর-কামী রয়েছে।

এরা কিন্তু পুরুষ। জন্মসূত্রে, বা শারীরিক ভাবে পুরুষ, কিন্তু মনে-মনে নারী। পুরুষ-সত্তা পছন্দ করে না। মেয়ে হতে পারলে মানসিক তৃপ্তি পায়।

নারী লিঙ্গান্তর-কামীদের এই হিসেবে ধরা হয়নি। জন্মসূত্রে স্ত্রী-লিঙ্গচিহ্ন পাওয়া যেসব মেয়ে তাদের ওই লিঙ্গ-পরিচয়ে সন্তুষ্ট নয়, তাদের মধ্যে অনেকেই মনে-মনে পুরুষ। বা ভাবে, পুরুষ হতে পারলে ভাল হত। নিজেকে পুরুষ ভেবে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় তারা। চারপাশের লোক ভাবে, দু'টো মেয়েতে কীসব করছে। ওদেরই লেসবিয়ান বলা হয়। আইভি নিশ্চয়ই তা-ই। আর যত এইসব পাবলিকের সঙ্গেই পরিচয় হয়ে যায় অনিকেতের।

অনিকেত যদি এখন আইভিকে জিগ্যেস করে, আইভি তুমি কি লেসবি?

ও হয়তো উত্তর দেবে—তাতে তোমার কী?

আইভি বলল, এগ্‌জিবিশন যাবে বলছ, চলো, আমিও যাই। দেখে আসি। যদি 'ইএমএ' করতে যেতে, তা হলে তোমার সঙ্গে যেতাম না।

অনিকেত বলল—ঠিক আছে, চলো, কিন্তু তোমাকে আজ বেশ বিন্দাস লাগছে আইভি। অফিসে সকালবেলা একবার দেখলাম, তারপর কোথায় কেটেছিলে তুমি? আইভি বলল—একটা ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম অনিকেতদা, কাউকে বোলো না। একটা সিকিউরিটি অফিসারের চাকরি। এই পুতুপুতু চাকরিটা একদম ভাল লাগছে না। কী আছে এই চাকরিতে? খেলা হলে কমেন্টেটর ফিট করো। একটা লোক রিলে করবে, আর আমি পাশে বসে কমেন্টেটরের তত্ত্বতালাশ করব। পিকে ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামীদের তেল মারব। সিএবি কর্তাদের তেল মারব, ক্রিকেট অ্যানালিসিসের জন্য সম্বরণকে ডাকব, কবে কলকাতায় গাভাসকর আসছে, কপিলদেব আসছে, তক্কে-তক্কে থাকব। ওদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার জন্য ওদের চামচেদের তেল মারব, ধুস। ক্রিকেট একটা ক্রেজ, আর ক্রিকেট একটা খেলা না কি? আমি গুরু ক্যারাটে জানি, তাইকোয়ান্ডো জানি, ভলিবলে স্টেট খেলেছি, এসব কেরানি-মার্কা চাকরি আর পোষাচ্ছে না। সিকিউরিটি অফিসারের কাজটা যদি হয়ে যায়, নিয়ে নেব। ইউনিফর্ম পরে অফিস যাব। একদম প্যান্ট-জ্যাকেট, হয়তো একটা লাইসেন্সড রিভলভার-ও দেবে...। বলো গুরু, কাজটা ভাল না?

অনিকেত বলল, গভর্নমেন্ট-এর চাকরিটা ছেড়ে দেবে? আইভি বলল—ধুর, গরমেন্টের গা...খিস্তি করার জন্য ইনস্টিগেট কোরো না কিন্তু...।

—আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে...।

এশিয়াটিক সোসাইটি-তে একটা হল-এ এগ্‌জিবিশন সাজানো হয়েছে। পুলক নামে একটা ছেলে ওখানকার ফেলোশিপ পাওয়া গবেষক।

ও বলছে, জোব চার্নক কলকাতা এলেন তারপর এখানে বসতি শুরু হল—অনেকে এরকম ভাবেন, এটা ঠিক নয়। বহুদিন আগে থেকেই গঙ্গার ধারে এই অঞ্চলে জনপদ ছিল। কলকাতার কাছেই বেড়াচাঁপা অঞ্চলের চন্দ্রকেতুর গড়ে গুপ্তযুগের প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। সুন্দরবনেও বেশ কিছু পুরাতাত্ত্বিক চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, যা কয়েক হাজার বছরের পুরনো। নবদ্বীপের কাছে বল্লাল ঢিপি এখনও খোঁড়াখুঁড়ি হয়নি। মঙ্গলকোটের কাছে পাণ্ডুরাজার ঢিপির রহস্যও জানি না আমরা। কলকাতার চারপাশে প্রাচীন ইতিহাসের চিহ্ন রয়েছে। এই বিরাট অঞ্চল জুড়ে সভ্যতা ছিল। আলেকজান্ডার উত্তর-পশ্চিম ভারতে হানা দিয়েছিলেন, বেশ কিছু এলাকা দখল করে নিয়েছিলেন, কিন্তু আর এগোননি, কারণ শুনেছিলেন—গঙ্গারিডি নামে একটা খুব শক্তিশালী রাজ্য আছে, ওদের প্রচুর ক্ষমতা। গঙ্গারিডি রাজ্যর মধ্যেই একসময় কলকাতা পড়েছে। তারও আগে, মহাভারতের সময় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের কথা আছে। কর্ণ ছিল অঙ্গের রাজা। কলকাতা অঙ্গের মধ্যে থাকলেও, আরও ওপরে বঙ্গ।

'বঙ্গ' নামের উৎপত্তি দেখাচ্ছে পুলক একটা চার্টে। দ্রাবিড়-ভাষী জাতি বঙ্গা ছিল এখানে।

অনিকেত বলল—'বোঙ্গা' থেকে হতে পারে? অস্ট্রিক-রা 'বোঙ্গা' বলতে ভূত বোঝায়।

পুলক হাসল। পুলক তো মুরগি পেয়েছে। সারা এগ্‌জিবিশন হল-এ আর কোনও লোক নেই। আর অনিকেত এসেছে পুলক বলেছে বলেই।

পুলক ইতিহাস বোঝাচ্ছে।

গুপ্তযুগের পর পাল বংশ, সেন বংশ, এইসব ভ্যারভ্যার করল। মধ্যযুগে হাওড়া-হুগলি-চব্বিশ পরগনা মিলিয়ে ভুরশুট রাজ্য হয়েছিল, তারা খুব বাণিজ্য করত, এসবও বলল। বলল, কলকাতার আশেপাশে পুকুর খুঁড়তে গিয়ে অনেক কিছু পাওয়া গিয়েছে, যেমন গড়িয়ার কাছে মহামায়াতলায়, ধপধপিতে, বারাসতে, ঠাকুরপুকুরে, ওসব বিভিন্ন মিউজিয়মে আছে। এখানে শুধু মেট্রো রেল খোঁড়াখুঁড়ির সময় যা পাওয়া গিয়েছে, এবং পিরিওডিক্যালি সাজানো নেই। পুলক বলছে—এগুলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কয়েন। এগুলো জাহাঙ্গির-এর সময়ের কয়েন। এই যে এই হাড়ের লাঠিটা, এটা নাগপুরি লাঠি। বর্গীরা খুব হানা দিত ১৭১০ থেকে ১৭৫০ পর্যন্ত। ওরাই এনেছিল নিশ্চয়। এই যে, এটা আধা-ফসিল হওয়া হাড়। এক্সপার্টরা বলছে এটা গন্ডারের হাড়। ১৭০০ সালেও নাকি সুন্দরবনে গন্ডার ছিল। ওটা মগদের তামাক খাবার পাইপ। আইভি এর মধ্যে কনুই খোঁচা দিয়েছে। মানে, এবার ফোটো। কনুই খোঁচা দিয়েই বলল, সরি। বোধহয় ভাবল এটা তো মেয়েলি জেস্‌চার।

—এই দেখুন এটা মিশরের স্বর্ণমুদ্রা। তিন পিস। এটা মিশরের স্কারা মাদুলি।

এ-ধারে দেখুন সব মাটির বাসনের টুকরো। পোড়া মাটির কত পুতুল। এটা বোধহয় সূর্যমূর্তির হাত। ওটা বিষ্ণুমূর্তির পা। কষ্টিপাথরের। এদেশে তো এরকম পাথর নেই, নিশ্চয়ই বাইরের। এটা একটা গোটা বুদ্ধমূর্তি। পাল রাজারা তো বৌদ্ধ ছিল। এটা যক্ষিণী। পোড়ামাটির। এটা দেখুন আজব একটা মূর্তি। পোড়ামাটির। এখনও নষ্ট হয়নি, দেখুন। কে জানে কোত্থেকে কলকাতায় এসেছে এই মূর্তি। মিশর-টিশর হতে পারে, কম্বোজ, মানে

কম্বোডিয়াও হতে পারে। মুরগির ওপর বসা দেবীমূর্তি। চারটে হাত। এক হাতে ছোরা। হিন্দু দেবদেবীদের প্যাঁচা, হাঁস, ময়ূর—পাখি হিসেবে এই তিনটেই জানি। মুরগি-বাহন দেখিনি কখনও। রংটা দেখুন লাল। তেল-সিঁদুরের আস্তরণ পড়েছিল। সিঁদুর মানে মার্কিউরিক অক্সাইড কিনা, এর লাল রং বহুদিন থাকে।

খুব মন দিয়ে মূর্তিটা দেখতে থাকে অনিকেত। খুব চেনা লাগছে। চেনা লাগছে কেন? এবার এধারে আসুন। বোধহয় কোনও বাবু-বাড়ি ভেঙে পড়েছিল। কত ঝাড়লণ্ঠনের টুকরো। ওধারে চলুন, নৌকোর ভাঙা অংশ আছে।

অনিকেত একটা ট্রে-র ওপর রাখা অজানা দেবীমূর্তিটা দেখতে থাকে। আইভি বলে, খুব পছন্দ হয়েছে দেখছি...। পুলক বলে, কী দেখছেন ওটা? ভাবখানা এমন : আর্কিওলজি-র আপনি কী বোঝেন—এরকম বিশেষজ্ঞর দৃষ্টিতে দেখছেন যে খামোকা?

—দেখছ, চারটে হাতের একটা হাতে বরাভয় মুদ্রা। দুর্গার যেমন থাকে, অন্নপূর্ণার। লক্ষ্মীরও...।

পুলক বলল—এ আর নতুন কথা কী? চার হাতের সব দেবদেবীরই একটা হাত বরাভয় মুদ্রায় থাকে।

অনিকেত বলল—এই মূর্তি আমার চেনা। আমি এই মূর্তি দেখেছি। এই দেবীর নাম বহুচেরা।

—বহুচেরা? এটা আবার কী দেবী? পুলক জিগ্যেস করে।

অনিকেত বলে—হিজড়েরা এই দেবীর পুজো করত। এখনও করে। তার মানে প্রাচীন কলকাতায় হিজড়েরা ছিল...। অনিকেত বলল, লক্ষ করে দ্যাখো, এটা মাটি-টিপে করা নয়, মানে টেপা-পুতুল নয়। ছাঁচে ঢেলে পোড়ানো হয়েছে। তার মানে একসঙ্গে অনেক পুতুল বা মূর্তি করা হয়েছিল। আর এটা পাথরের মূর্তি নয়। পোড়ামাটির। মানে বাইরে থেকে নিয়ে আসা নয়, এখানেই, এই বাংলায়, হয়তো বা এই কলকাতায়, এগুলো তৈরি হয়েছিল, তার মানে কলকাতায় বহুচেরা দেবী পূজিতা হতেন...।

পুলককে বলল—এই সাবজেক্টটা নিয়ে কাজ করো। পিএইচডি অবধারিত।

পুলক বলল, একটা কাজ তো করছি সেন যুগ নিয়ে...। বল্লাল ঢিপিটা এক্সকাভেট করতে পারলে অনেক সুবিধে হত, কিন্তু তার আগে আপনাকে এক্সকাভেট করতে হয়...কী করে কনফিডেন্টলি বললেন যে এটা 'বহুচেরা'...। অনিকেত বলতেই পারত, দুলালের কথা। দুলালের ঘরে এরকম একটা ছবি আছে। রোজ পুজো করে দুলাল। দুলাল বলেছে, ইনি মা বহুচেরা। আমাদের কথা শোনেন। কিন্তু বলল না কিছু। বললেই, দলবল নিয়ে হাজির হবে। দুলালরা পড়বে সমস্যায়।

ওখান থেকে বেরিয়ে এল অনিকেত। আইভি বলল, তোমার এই দেবীতে ইন্টারেস্ট হল কেন? নামের মধ্যে 'চেরা' শব্দটা আছে বলে?

অনিকেত বলল—তুমি তবে চেরাপুঞ্জি বেড়াতে গিয়েছিলে কেন? 'চেরা' শব্দটার জন্য?

আইভি বলল—ধুর, আই হেট দিস চেরা পার্ট অফ মাই অর্গান। তোমাকেই বলা যায়। আমার যদি তোমাদের মতো একটা এক্সটেন্ডেড পার্ট থাকত ওই জায়গাটায়, খুশি হতাম। যখন ফ্রয়েড পড়েছিলাম একটু, দেখেছিলাম উনি বলছেন, মেয়েদের ইনফিরিয়রিটি-র জন্য দায়ী ওই

যন্তরটা না-থাকা। ফ্যালিক ইনডেফিসিয়েন্সি। বাচ্চা বয়সে ছেলেমেয়েরা সবাই যখন উদোম, একটা মেয়ে দেখতে পায় একটি অঙ্গ ওর নেই। তাই থেকে একটা হীনম্মন্যতার বোধ মনে গেঁথে যায়। একটা বাচ্চা ছেলে যখন দেখে, ওর শরীরে একস্ট্রা কিছু আছে, তখনি মনে সুপিরিয়রিটি-র ধারণা তৈরি হয়। আর ছেলেরা যখন বড় হয়, ওদের ওই অর্গান-টা যখন এক্সপ্যান্ড করে, তখন তো ভাবে ওটা একটা খাপ-খোলা তলোয়ার। ওয়েপন।

জানো, ছোটবেলায় জয়েন্ট ফ্যামিলিতে ছিলাম। বাড়িতে একজন বহুদিনের পুরনো কর্মচারী গোছের ছিল, ওকে বাঙাল জ্যাঠা বলতাম। ও বাড়ির বাজার করত, ঘরদোর সাফ করাত, বাথরুমগুলো পরিষ্কার করাত, বাড়ির মেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দিত...। আমাদের শাসন-টাসনও করত। আমাদের বাড়িতে একটু বাগানমতো ছিল। ওখানে দু'টো পেয়ারা গাছ ছিল, সফেদা গাছ ছিল, ওখানে লুকোচুরি খেলা হত। পেচ্ছাপ পেলে—ছেলেরা দিব্বি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হিসি করে দিত। মেয়েরাও আছে বলে পরোয়া করত না। আর মেয়েদের আবার বাড়ি যেতে হত। একদিন আমার খুব পেয়ে গিয়েছিল।

কড়ে-আঙুলটা একবারের জন্য একটু তুলে দেখাল আইভি। ভাবলাম, বাড়ি যাব না। একটু ঝোপের পিছনে গিয়ে বসে পড়েছিলাম। বাঙাল জ্যাঠা বলে উঠল, হেই, পূর্বদিকে মুখ কইর‍্যা পচ্ছাপ করো ক্যান? পূর্বদিকে আমাগোর কুলদ্যাবতা আছেন না। পূর্ব দিকে সূর্য উঠে...আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, আমায় বলছেন কেন? ছেলেরাও তো করে। এই দিকে মুখ করেই তো করে।

বাঙাল জেঠু বলেছিল—শুনো মা, ব্যাটাছেলেদের দোষ নেই। অরা পূর্বদিকে মুখ করলেও—এই দিক ওই দিক ঘুরাইতে পারে। তোমরা পারো না মা...।

এই ছোট্ট পাইপটুকুর জন্য তোমাদের যত রং, প্রাইড অ্যান্ড অ্যারোগেন্স। গাছে উঠতে দিত না। দাদারা বলত, তুই না মেয়ে, গাছে উঠবি কী? বাঙাল জ্যাঠাও বলত, মেয়ে-মাইনষের গাছে উঠতে লাই। তোমরা ওপরে উঠলে ছেলাগুলো খারাপ চোখে তাকাইবে।

তবু আমি গাছে উঠতাম। আর ছেলেগুলো, মাইরি, কী বলব, আমার জ্ঞাতি দাদা-টাদাগুলো ছাড়াও পাড়ার কয়েকটা ছেলেও খেলতে আসত, ওরা ফ্রকের তলায় তাকাত। কী দেখবি রে শালা? কী আছে। ওখানে তো অন্ধকার। আমি পরোয়া করতাম না। যা দেখবি দ্যাখ।

ছেলেরা সব সময় আপারহ্যান্ড নেয়। ডমিনেট করার চেষ্টা করে। শুধুই কি ওদের একস্ট্রা অর্গানের অহংকার? আমি তো তখন ফ্রয়েড-টয়েড জানতাম না, এখন যা সামান্য জানি, তাতে মনে মনে ভাবি, আ বে ফ্রয়েড সাহেব—মানি না তোমায়, ফোটো। আমিও ভেবেছি ওই চার-পাঁচ ইঞ্চি যন্তরটাই সব না কি? ওটা দেখিয়ে তোমরা রাজ্য জয় করবে, মেয়েদের চমকাবে, বশ করে রাখবে, কেন?

আমরা শালা জন্ম থেকেই বঞ্চিত, বঞ্চিত বাঞ্চোত। কিছু মনে করছ না তো? ভগবান আমায় ওটা দেয়নি। দেয়নি তো দেয়নি। তো? আমি তো কমতি যাব না। চ্যালেঞ্জ করছি তোমায়, ক্যারাটেতে এসো, পাত্তা পাবে না।

আইভি-কে বেশ উত্তেজিত দেখায়। অনিকেত ব্যাপারটা লঘু করার জন্য বলে—ভগবানকে দোষ দিও না। ভগবান তোমাদের যা দিয়েছে ছেলেদের তা দেয়নি। বুকের ওপর কী সুন্দর দু'টো মন্দির...

—ড্যাম। আমার ইচ্ছে করে কেটে ফেলতে। নিমাই হয়ে যেতে। ফালতু ও দু'টো। বদারেশন। কত যে কনুইয়ের গুঁতো খেয়েছি তার ঠিক নেই। ভিড় বাসে উঠলে ব্যাগটা দিয়ে গার্ড করে রাখতে হয়। তা ছাড়া ওটা তো ছোটবেলায় ছিল না। ফ্রয়েড যদি সত্যি হন—তবে তো বলতে হয়, ছোটবেলাতেই মেয়েদের মনে সেন্স অফ ইনফিরিয়রিটি ঢুকে গিয়েছে। ডিউ টু ল্যাক অফ দ্যাট কক। একেবারে সুপার ইগো ছাড়িয়ে ইদ্-এ ঢুকে বসে আছে।

কিন্তু জানো অনিকেতদা, আমি এইসব থিওরি মানি না। অস্বীকার করি। মাই নেম মে বি আইভি। আইভি একটা লতানো গাছ। কিন্তু আমি লতা না, পুতুপুতু না। মেয়েদের শরীর পেয়েছি বটে, কিন্তু মনে-মনে তোমাদের অনেকের চেয়ে বেশি পুরুষ। সেই রোমান পুরুষদের মতো, এক হাতে শিল্ড। সেই শিল্ড আমার বুক ঢাকার জন্য নয়, সোর্ড প্রোটেক্ট করার জন্য...

ফালতু বকছি, না? সেই বহুচেরা দেবী থেকে এত কিছু এল।

কাউকে বোলো না, অ্যাঁ? তোমাকেই বলছি, আমি না আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই অভিশপ্ত চেরা জায়গাটায় মাঝে-মাঝে গাজর-টাজর প্লেস করে দেখি কেমন লাগে দেখতে। নট ফর মাস্টারবেশন ম্যান, টাচউড, ওনলি টু ফিল...

ফিল করতে পারছ? কষ্টটা?

দুলালের মা সব সময় মনমরা। সব সময় ওর মুখে কালো মেঘ। অপরাধীর মতো মুখ করে থাকে, সোজা চোখে তাকায় না, ওর পড়শিরা জেনে গিয়েছে দুলালের খারাপ রোগ হয়েছে। ওদের বাড়ির কাছাকাছি একটা ছোট পুকুর আছে, ওখানে দুলালের লুঙ্গি কাচতে গিয়ে বাধা পেয়েছে দুলালের মা। যে বলল—'কার লুঙ্গি দুলালের মা? কোনও দিন আর পুকুরে আসবে না মাসি'—সে দুলালের সঙ্গে ছোটবেলায় একসঙ্গে সাঁতার কেটেছে এই পুকুরে। 'তুমিও চ্যানে আসবে না মাসি। অসুখ বলে কতা, ছোঁয়াচে।' তবে কোথায় চ্যান করব? জিগ্যেস করেছিল দুলালের মা। জবাব পেয়েছে, তোলা জলে, নিজের উঠোনে। এটা কি সম্ভব? খুব ভোরবেলা উঠে টিউবওয়েল-এ পাম্প করা জলে স্নান সেরে নেয় দুলালের মা। দুলালের লুঙ্গি-গেঞ্জি ওর নিজের উঠোনেই কাচতে হয়।

মাঝে কয়েকবার দুলালের বাড়ি গিয়েছে অনিকেত। ওর 'খোল জীবনের' দশ বছরের টুকটাক টকঝাল টুকরো কাহিনি শুনেছে, এবং আশ্চর্য হয়েছে। কিন্তু আসল কথাগুলো জানা হয়নি, কারণ কথা পাড়া হয়নি। বহুচেরা দেবীর মূর্তিটা ওকে একটা অনুসন্ধিৎসার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। যে ছ'ইঞ্চির টেরাকোটা মূর্তিটা দেখেছে, সেটা কি বহুচেরা দেবীর মূর্তি? দুলালের ওই ছবিটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার ইচ্ছে হল, এবং শুধু এজন্যই ওর বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে হল।

এসব উটপটাং ইচ্ছের জন্য দায়ী তারাপদ সাঁতরা। তারাপদ সাঁতরার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পাথরা-য়।

ইয়াসিন পাঠান নামে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন আকাশবাণী-তে। ছোটখাটো একজন মানুষ। বললেন, আমাদের গ্রামে অনেক মন্দির আছে, কংসাবতীর ধারে। অর্ধেকের বেশি মন্দির কংসাবতীর গর্ভে চলে গিয়েছে। নদী ভাঙছে, মন্দিরগুলোকে খেয়ে নিচ্ছে। কিছু ব্যবস্থা না-নিলে বাকি মন্দিরগুলোও শেষ হয়ে যাবে। ডিএম সাহেবকে লেখালিখি করে কোনও লাভ হয়নি। যদি রেডিওতে এই বিপদগ্রস্ত মন্দিরগুলোর কথা বলা হয়, মানুষ জানতে পারবে। বড় খবর কাগজের রিপোর্টারদের সঙ্গেও কোনও চেনাজানা নেই, যদি আমরা এই ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারি তো খুব ভাল হয়। ইয়াসিন জানালেন—নিজেরা চাঁদা তুলে কিছু বালির বস্তা ফেলে ভাঙন আটকানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু এতে কী হবে?

একজন মুসলমান যুবকের হিন্দু মন্দিরগুলো সংরক্ষণের চেষ্টা একটু আপ্লুত করেছিল। কী করে যেতে হয় জেনে নিয়ে একদিন সকালে চলে গিয়েছিল একাই। খড়গপুর থেকে মেদিনীপুরের দিকে যাওয়ার রাস্তায় আমতলা থেকে মাত্র ৮/১০ কিলোমিটার দূরে গ্রামটা। প্রচুর ভগ্নাবশেষ ছিল, বোঝাই যায় প্রাচীন গ্রাম। গ্রামে ঢুকতেই বুড়ো পিরের মাজার। তারপরই ছোট-ছোট মন্দির। এরপর নদী। নদীর পাড়ে হেলে পড়েছে একটা বেশ বড় মন্দির। যে কোনও সময় কংসাবতী-র গর্ভে পড়ে যাবে।

ইয়াসিন পাঠানের সঙ্গে দেখা হল। ইয়াসিনের বাড়িতেই ছিলেন তারাপদ সাঁতরা। মন্দির এবং লোক-সংস্কৃতির গবেষক। নামটা শোনাই ছিল, ইয়াসিন আনুষ্ঠানিক আলাপ করিয়ে দিল।

তারাপদ সাঁতরা-র ঝোলা ব্যাগে টেপ। মানে, ফিতে। উনি আর পাঠান ফিতের দু'দিক ধরে মন্দিরগুলোর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপছিলেন। তারাপদবাবু মন্দিরের টেরাকোটা প্যানেলের দিকে তাকিয়ে বলছিলেন : এগুলো দশমহাবিদ্যা, এগুলো দশাবতার...। অনেক কিছু বলছিলেন, সব মনে নেই, মনে থাকার কথাও নয়। তবে একটা কথা এখন মনে পড়ে গেল, তখন অতটা গুরুত্ব দেয়নি অনিকেত। তারাপদবাবু বলছিলেন—এই দেখুন, একটা যৌনদৃশ্য, একাধিক মহিলা, আর একজন পুরুষ। সম্ভবত ছোটখাটো হারেম। আর এই ভদ্রলোকটিকে দেখুন, মাথায় ঝুঁটি, উরুসন্ধি দেখে যোনির মতোই লাগছে, কিন্তু বুকটা দেখুন সমান। উচ্চতায় রাজার চেয়ে বড়। সম্ভবত খোজা। হারেমে রাজা বা জমিদারের সহকারী হিসেবে কাজ করছে। ও নিজে যৌনক্রীড়া করতে পারে না, কিন্তু ক্রীড়াতে অংশ নেয়।

অনিকেত বলছিল—রেফারি বা লাইন্সম্যান-এর মতো?

তারাপদবাবু বলেছিলেন—না, বল-বয়ের মতো। বল-টল কুড়িয়ে আনে যারা। তারাপদবাবু বলছিলেন—এটা ষোলোশো, সাড়ে ষোলোশো-র মন্দির। এ সময়ে এদিককার অন্তঃপুরে খোজা থাকত। মহিষাদলের রাজবাড়ির ব্যাপার এটা নয়। তবে খোজা ছিল। মন্দিরের গায়ে তো সমাজচিত্র-ই ফুটে ওঠে।

তারাপদবাবুকে খুব ভাল লেগেছিল অনিকেতের। উনি বলছিলেন, কতরকমের ঘুঁটে হয় আমাদের দেশে, কতরকমের উনুন হয়, কতরকমের মন্দির হয়, এসব বলছিলেন। ওঁর এদিকে উৎসাহ কী করে হল, তা নিয়ে একটা গল্প-ও বলেছিলেন একটা রাসমন্দিরের চাতালে বসে। তারাপদবাবু কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। কোনও একটা কারণে নেতৃত্বের সঙ্গে প্রবল মতভেদ হয়। বাগনানের কাছে একটা পুরনো টেরাকোটা মন্দিরের চাতালে চুপচাপ মনখারাপ করে বসেছিলেন। হঠাৎ একটা টেরাকোটা রিলিফ-এর দিকে নজর যায়। দেখেন এক স্ত্রীলোক একটা

লাঠি দিয়ে কোনও পুরুষকে মারছে। দেখে মনে হল, এটা কীরকম ব্যাপার হল? কোনও পুরুষ তার বাড়ির মেয়েছেলেকে মারধর করছে—এটাই তো স্বাভাবিক, এরকমই তো হয়। এখানে মন্দিরের গায়ে উল্টো ছবি কেন? অন্যান্য টেরাকোটা দেখতে থাকেন। দেখলেন মাথায় জটা, মুখে দাড়ি এক পুরুষ এক নারীকে আলিঙ্গন করছেন। জটাওলা লোকটাকে 'সাধু'-ই তো মনে হচ্ছে। সাধু তো ব্রহ্মচারীই হন। কেন সব উল্টোপাল্টা ছবি? এমন সময় পাজামা-পাঞ্জাবি, চশমা পরা এক সাহেব এলেন। এসে ছবি তুলতে লাগলেন, ডায়রিতে কিছু নোট করতে থাকলেন। তারাপদবাবু ভাবলেন নিশ্চয়ই কোনও গবেষক। ওই রিলিফগুলোকে দেখালেন। ভদ্রলোক খুব মন দিয়ে দেখলেন, ছবিও তুললেন। তারপর বললেন, হ্যাভ ইউ এভার সিন কালীঘাট'স পট?

তারাপদবাবু কালীঘাট জানতেন, কিন্তু কালীঘাটের পট জানতেন না। খেতমজুরদের সমস্যা জানতেন, আলুর বিভিন্ন রোগ জানতেন, ধানগাছের পোকা জানতেন, রূপনারায়ণের জেলেদেরও জানতেন। কিন্তু কালীঘাটের পট জানতেন না। ওই সাহেব বোঝালেন কালীঘাটের পটে নানারকম সামাজিক ব্যঙ্গ থাকে। বড় মানুষের বাড়ির কেচ্ছা, বাবুদের কাজ-কারবার, এসব থাকে। তা ছাড়া অ্যাট দি এজ অফ কলি, মানে কলিকালে, কী হবে এসবও পটুয়ারা আঁকতেন। কলিকালে সব উল্টো হয়ে যাবে, ব্যাটাছেলেরা ঘরে বসে রান্না করবে, মেয়েছেলেরা বাইরে গিয়ে টাকা রোজগার করবে, সবাই মদ খেয়ে মাতলামি করবে—এসব। বউরা বাড়ির কর্তাকে মারবে, এসবও থাকত। এই মন্দিরগুলো হল আর্লি এইট্টিন্থ সেঞ্চুরি-র। কালীঘাটের পট-ও ওই সময়ের। মন্দিরের গায়ে এই রিলিফগুলো হল কালীঘাটের পটের ইনফ্লুয়েন্স।

তারাপদবাবু বলছিলেন—আমি তো অবাক! কোথায় কালীঘাটের পট আর কোথায় হাওড়া জেলার গড়াইতলার মন্দির?

সাহেব বললেন—যাঁরা মন্দিরের রিলিফের কাজগুলো করেছিলেন, তাঁরা কালীঘাটে তীর্থ করতে যেতেন। ওখান থেকে পট কিনে আনতেন। আই বিলিভ, দিজ আর ইনফ্লুয়েন্সড বাই কালীঘাট। ওই সাহেবের নাম কী জানেন, ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন? লোকটি কম বয়সেই মারা গেলেন, কিন্তু আমাকে নেশা ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। ভাবলাম, আমার চারপাশে এত, অথচ আমিই জানি না!

তারাপদ সাঁতরার সঙ্গে ওইভাবেই আলাপ হয়েছিল পাথরাতে। এরপরও অল্পবিস্তর যোগাযোগ আছে। শেষ কথা হয়েছিল পিজি হাসপাতালে। কিডনির গন্ডগোলে ভুগছেন। ডাক্তার অভিজিৎ তরফদারকে দেখাতে এসেছিলেন। ওখানে বলেছিলেন—খিদিরপুরে একটা ইন্টারেস্টিং শিবমন্দির দেখলাম, বুঝলেন, মন্দিরের গায়ে পাথরে খোদাই একটা ইনসক্রিপ্‌শন আছে—'এই নেক মন্দিরে কেহ জুতা পায়ে প্রবেশ করিবেন না, যে প্রবেশ করিবেন, তাহাকে তাল্লাক।' ভাব দেখেই বুঝতে পারছেন, বেশি পুরনো নয়, শ'দেড়েক বছরের হবে। ভূকৈলেশের জমিদাররা এই মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু মন্দির-ফলকে কেন আরবি শব্দ? 'নেক' মানে পবিত্র, আর 'তাল্লাক' মানে শুধু ডিভোর্স-ই বোঝায় না, দিব্যি দেওয়া, শপথ বা প্রতিজ্ঞা-ও বোঝায়। কিন্তু কারা লিখেছে শিবমন্দিরে আরবি শব্দ? সিপাহি যুদ্ধের পর অযোধ্যার নবাবরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন খিদিরপুর-মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে। মুসলমান বসতি শুরু হয়। কোনও মুসলমান কি এই শিবমন্দিরটা দেখভাল করতেন? কে জানে?

এশিয়াটিক সোসাইটি-র এগ্‌জিবিশন-টা দেখে পরদিনই তারাপদবাবুকে ফোন করেছিল অনিকেত। জিগ্যেস করেছিল—মুরগি-বাহন কোনও দেবীমূর্তি দেখেছেন? একটু স্তব্ধতার পর তারাপদবাবু উত্তর দিলেন, মোরগ-বাহনা দেবী? মনে পড়ছে না তো...মোরগ গুজরাটের কোথায় যেন দেখেছিলাম। আপনি কোথায় দেখলেন? তারাপদবাবুর গলাটা কেমন যেন ম্রিয়মাণ লাগছিল।

অনিকেত এশিয়াটিক সোসাইটি-র প্রদর্শনীটার কথা বলল। তারাপদবাবু বললেন—শুনেছি তো ওরকম কিছু হচ্ছে। যেতে পারলে ভাল হত। শরীর খারাপ। ছবি দেখাতে পারবেন? অনিকেত বলেছিল, চেষ্টা করব।

পরের রবিবার দুলালদের বাড়ি গেল অনিকেত। সঙ্গে আপেল আর কমলালেবু। শীতকাল। শীতকালে রোদ্দুরটা বেশ কমলা-হলুদ ফোকাস মারে। ফাঁকা মাঠঘাটে যেন মনে হয় আকাশ থেকে ঝুলছে জরির ঝালর। আবার দু-এক টুকরো জমিতে কাটা-ধানের গোড়াগুলো নুলো হাত নেড়ে 'হায় হায়' করে। দুলালদের বাড়িতে ঢুকতেই একটা লোক বলল—আপেলই খাওয়ান আর নেসপাতিই খাওয়ান—যে-রোগ বাধিয়েছে, তার থেকে ওর নিস্তার নেই। আমাদের মহা কঁ্যাচাল। ওর মা তো আপনাদের বাড়িতে বহুত দিন ধরে কাজ কচ্চে, তা আপনারা ওদের নিয়ে যান না, আপনাদের পাকা বাড়ি, একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে রেখে দেবেন। একেনে তো সে-উপায় নেই।

অনিকেত বলার চেষ্টা করে—দুলালের রোগটা তো সেরকম ছোঁয়াচে কিছু না। বলে, ছোঁয়াচে হলে কি আমি আসতাম?

—আপনারা বড়লোক। আপনাদের অনেক পোটেকসন থাকে। ভাল খাওয়াদাওয়া করতে পারেন। আমাদের খাওয়াদাওয়ায় ভিটামিন থাকে না, এজন্য সহজে আমাদের রোগে এটাক মারে।

এ তো দেখি অতি সচেতনতা! অনিকেত বলে, অহেতুক ভয় পাচ্ছেন কেন? ওর নিশ্বাস-প্রশ্বাস বা ওর স্নানের জল থেকে এ রোগ ছড়ায় না।

লোকটা বলল, ওসব বুঝি না, একে এই গাঁয়ে আর বেশিদিন রাখা যাবে না। এদের পরিবারটাই কঁ্যাচাল। এর বউটা অন্য ব্যাটাছেলের সঙ্গে লটরপটর করত। দুলাল নিজে হিজড়ে হয়ে গেল, এখন এড্‌স বাধিয়েছে। এলাকার বাচ্চারা তো বড় হচ্ছে। যদি জিগ্যেস করে কী হয়েছে লোকটার, তখন তো খারাপ কথাটা উচ্চারণ করতে হবে।

—কোন খারাপ কথাটা?

—কেন? এড্‌স! এটা খারাপ কথা না? তারপর যদি জিগ্যেস করে কী করে ছড়ায়? দেখুন না, রেডিও-তে, টিভিতে অবলীলায় বলে দিচ্ছে যৌনরস। পোস্টারের মধ্যে লিখে দিচ্ছে চুম্বন, আলিঙ্গন—এসব। এই রোগটার জন্য চারদিক অপসংস্কৃতিতে ভরে গেল। সব চক্রান্ত। এই রোগটা নাকি আমেরিকা থেকে বেরিয়েছে!

প্রশ্নটা শুনে অনিকেতের মনে হল লোকটা হয়তো পঞ্চায়েত নেতা। আর 'চক্রান্ত' শব্দটা রাজনীতির লোকদের খুব প্রিয় শব্দ। জিগ্যেস করল, রাজনীতি করেন?

লোকটা বলল—উচিত কথা বললেই আপনারা রাজনীতির গন্ধ পান। আমি করি না,

আমার ভাইপো এই পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি। সাতদিন সময় দিচ্ছি, এই জঘন্য লোকটাকে সরিয়ে নেবেন, নইলে...

গলাটা শক্ত করল অনিকেত।

বলল, নইলে?

'নইলে' শব্দটা নিজের কাছেই অচেনা লাগল। হুমকির জবাবে হুংকার? ও তো এরকম অকস্মাৎ গলা ওঠাতে পারে না। আজকাল পারছে কী করে? সাহস বেড়েছে। বছর দুই আগে একটা ক্যাসেট বেরিয়েছে 'তোমাকে চাই', সুমন চট্টোপাধ্যায়ের ওই ক্যাসেটের একটা গানে একটা কথা আছে—'বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে'। কথাটার সঙ্গে একটা গিটার নির্ঘোষ। অনিকেত আবার বলল—বলুন, নইলে কী করবেন?

লোকটা আর কোনও কথা না-বলে চলে গেল। কে জানে লোকসংগ্রহ করতে গেল কি না—দুলালদের ঘরের সামনেই ঘটনাগুলো ঘটছিল, কিন্তু দুলালের মা ঘর থেকে বের হয়নি। সব সময় নিজেকে আড়াল করেই রাখে। দুলালের ছেলেটা গাঁদা ফুলের মালা গাঁথছে।

মালা কী হবে রে?—অনিকেত জিগ্যেস করে। ছেলেটা হাসে। বলে, পুজোয় দেবে।

—কী পুজো?

—মুরগি সরস্বতী।

—ওটা আবার কী?

—বাবা করে।

—আজ ইস্কুল যাসনি?

—রবিবার না?

দুলালের ছেলের নাম মন্টু। ভাল-নামটা জানে না। কখনওই জিগ্যেস করেনি। আজ জিগ্যেস করল। ছেলেটা জবাব দিল না। মাথা নিচু করে রাখল। তোর ইস্কুলের নাম কী?

ছেলেটা জবাব দেয় না।

দুলালের মা বলল—পোসেনজিত।

—বাঃ, খুব ভাল নাম তো। বলছিস না কেন?

ও চুপ থাকে।

দুলালের মা বলল—ওর নাম কইতে ওর লজ্জা করে।

—ওর এই নাম কে রেখেছিল?

—ওর মুখপুড়ি মা। ওকে এই নামে ইস্কুলে দিয়েছে।

অনিকেত বলল, প্রসেনজিৎ তো খুব ভাল নাম। প্রসেনজিৎ মানে কী জানিস?

মন্টু ঘাড় নাড়ায়। মানে জানে।

—বল, কী মানে?

—ঝাড়পিট।

—হাসল অনিকেত। মন্টুও অল্প।

—ঝাড়পিট মানে তো ভাল রে। তুই নাম বলতে লজ্জা পাস কেন?

মাথা নিচু করে মন্টু বলল, ঝাড়পিট পারি না।

চৌকিতে বসে দুলাল মুড়ি খাচ্ছিল। লুঙ্গি পরা। মুখের হনু বেরিয়ে পড়েছে। কোমর থেকে

ওপরের অংশ যেন একটু বড়। ইউনাক সম্পর্কে পড়াশোনা করার সময় 'ইউনাকয়েড গ্রোথ' নামে একটা অংশ দেখেছিল, সেখানে লেখা ছিল ক্যাস্ট্রেশনের পর অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের অভাবে এক ধরনের মেটাবলিক ডিসঅর্ডার হয়, তাতে শরীরের ওপরের দিকটা একটু বেশি বাড়ে। কিন্তু এটা আর্লি-ক্যাস্ট্রেশন-এ হয়। দুলাল তো এসব করেছে বেশি বয়সে। ও যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, তখন ওর বয়স ২৭-২৮। হয়তো ওটা ইউনাকয়েড গ্রোথ নয়। না-হজম-হওয়া খাদ্য অনেক সময় উদ্গারে জানিয়ে দেয়, না-হজম-হওয়ার বার্তা। না-হজম-হওয়া বিদ্যেও তাই। ফুকো, দেরিদা, ডকিন্স, চমস্কি এসব নাম অনেকের উদ্গারে চমকায়। এটাও তাই। অনিকেতও এখন কিনসে, ইবিং, সিস্‌জেন্ডার, ভ্যাজিনোপ্লাস্টি, পেগিং এসব শব্দ মাঝে-মাঝে কপচায়। অনেক সময় ঠিকঠাক না বুঝেই।

—কেমন আছ দুলাল?

দুলাল অল্প হাসে।

হাসে না তো, ক্যালায়। দাঁত ক্যালায়।

অনিকেতও ওর ওপর বিরক্ত। একটা জীবন্ত স্যাম্প্‌ল পেয়েছে ঠিকই, যাকে নিয়ে উপন্যাস লেখা যায়, যদিও অনিকেত তো উপন্যাস লেখে না, লেখার ইচ্ছে যে নেই তা নয়, কিন্তু এসব ওর কম্ম নয়, সেটা ও ভালই জানে। দুলালের কাছে আসাটা স্রেফ দুলালের মায়ের জন্য। যে-মহিলাটি বহু দিন ধরে সার্ভিস দিয়েছে, তার জন্য। বিপদের দিনে যে পাশে দাঁড়ায়—সেই না আত্মীয়—'সিরাজদৌল্লা' নাটকের ডায়লগ। কর্তব্যের আহ্বানেই আসা। তবে 'বাই ওয়ান গেট ওয়ান'-এর মতো কর্তব্যকর্মের সঙ্গে অভিজ্ঞতাটাও পাওয়া যাচ্ছে। নতুন কিছু জানার নেশাটা খুব বড় নেশা। একটা জিনিস বুঝেছে অনিকেত, নলেজ বড় আনন্দদায়ক। বড় সুখ দেয়। যে কোনও ইন্দ্রিয় সুখের স্থায়ীত্ব, মানে ডিউরেশন কম। খাবার সময় জিভের টেস্ট বাডস্‌গুলো কতক্ষণের সেনসেশন পায়? সঙ্গমই বা কতক্ষণের? কিন্তু নলেজ বারবার সুখ দেয়। নলেজ নিয়ে জাবর কাটা যায় রিসাইকেল করা যায়।

দুলালের কাছে এর আগে ওদের গুরুমা নিয়ে কিছুটা আলোচনা হয়েছিল। ওদের ডিসিপ্লিন, খাওয়া-দাওয়া, আমোদ—এসব নিয়েও কিছুটা। কিন্তু ওর যৌনজীবন নিয়ে কোনও কথা হয়নি। শুধু একবার জিগ্যেস করেছিল, রোগটা বাধালে কী করে? ও মাথা নিচু করে বসেছিল।

আর, 'ছুরি খেয়েছিলে কেন' জিগ্যেস করলে বলেছিল, পুলিশকে কয়েচি, পুলিশ কাউকে কইতে মানা করেচে। দুলালের ঘরের তাকে মুরগি-বাহনা মূর্তি, হাতে ছোরা। বেশ কিছু ছাই পড়ে আছে। ধূপধুনো দেওয়া হয়। ছবিটা কাচ-বাঁধানো। আকারেও বড় নয়। ছবিতে মালা। হ্যাঁ, এই মূর্তিই দেখেছিল এশিয়াটিক সোসাইটি-তে।

—ওটা বহুচেরা দেবী, তাই তো?

দুলাল মাথা নাড়ে।

—কীভাবে পুজো করো?

—যেভাবে পারি। একট মালা, ধূপ...পাঁচালি পড়ি।

—পাঁচালি, পাঁচালি আছে না কি?

—আছে তো। গুরুমা পড়ত, আমরা শুনতাম।

—শুধু বহুচেরা, অন্য পুজো নেই?

—আছে তো, নক্ষী, সরসোতি, দুগ্গা—এনারা তো আচেই। কিন্তু ইনিই আমাদের মেন ঠাকুর।

—কী বারে পুজো হত? যেমন বেস্পতিবারে লক্ষ্মী পুজো হয়, তেমন কোনও—

—না দাদা, আমাদের ঠাকুর খুব ভাল ঠাকুর। কোনও নিয়ম-কানুন নেই। যে যেমন পারে। আবার খুব রাগীও। কত ব্যাটাছেলের খসিয়ে দিয়েছেন...লজ্জা-পাওয়া-মুদ্রায় বাঁ হাতটা ঘুরিয়ে মুখ চাপা দিল দুলাল। অনিকেত বুঝে নিল দেবী রেগে গিয়ে কী খসিয়ে দিয়েছেন। অনিকেত জিগ্যেস করল—এই দেবীর উৎপত্তি কীভাবে হল জানো? যেমন মনসার উৎপত্তি শিবের ইয়ে থেকে, দুর্গার সৃষ্টি সমস্ত দেবতার তেজ থেকে...

দুলাল বলল—স্বর্গের দেবী নয় দাদাগো, ইনি মানুষ। ইনি ছিলেন এক রাজকন্যা।

ভাদুর সঙ্গে মিল পেল যেন। ভাদুরানিও ছিলেন রাজকন্যা।

—কোথাকার রাজকন্যা? অনিকেত জিগ্যেস করে।

দুলাল বলে তা হলে পাঁচালিটা শোনাই। আজ বিকেলের পাঁচালিটা পড়া হয়ে যায় থালে। দেশলাই জ্বেলে ধূপ জ্বালিয়ে ছবিটার সামনে রাখে, তারপর দুলাল চোখ বুজে বলতে থাকে—

চরণরাজার কন্যা আহা মরি মরি
চম্পকবরণ বর্ণ দেখিতে সুন্দরী
মাথা ভরা চুল যেন মেঘের মতন
নিতম্বিনী কন্যা সে যে বিল্বফল স্তন
বাপের বাড়ি থিকে শ্বশুরঘর যায়
এমন সময় ডাকাত দল হানা দিল হায়
ডাকাতের দলপতি বাপিয়া তার নাম
সুন্দরী দেখিয়া তার জাগিয়া যায় কাম
সুন্দরীর সঙ্গে ছিল সাত সহচরী
তাহারাও ভয়ে-ভয়ে ডাকে হরি-হরি।
ডাকাত হাঁকিয়া বলে খুলহ কাপড়
আমরা চাপিব সব তোমার ওপর
ইহা শুনি সুন্দরী তরবারি দিয়া
নিজের দুই স্তন দিলেন কাটিয়া
ইহা দেখি আর যত সহচরী নারী
নিজেদের স্তন দিল কাটি তাড়াতাড়ি।
হাতে ধরা অসি আর রক্তমাখা দেহ
হাঁকিয়া বলিল, আইস, কী করিতে চাহ
তখন পলাইল সব যতেক ডাকাত
সূর্যদেবতা ডুবে ক্রমে আসে রাত
আট দেহ শুয়ে আছে ষোলো খানি স্তন
মাটিতে লুটায়ে আছে ফুলের মতন
ষোলোটি কদম্ব গাছ পরদিন ওঠে

আটখানি পাহাড় সেইখানে ফুটে
বাপিয়া ডাকাইত সহ যতেক পাষণ্ড
পরদিন তাহাদের খসে যায় অণ্ড।
বাপিয়া স্বপ্ন দেখে চতুর্ভুজা নারী
মোরগ বাহনা তিনি, হাতে তরবারি।
বলেন যেখানে আছে আটখানি শিলা
সেখানে দেখিবি তুই আমারই লীলা
বড় পাহাড়ের শিরে মন্দির করিবি
সেখানে স্ত্রীবাস পরে আমারে পূজিবি
আমার এরূপ মূর্তি গড়াইয়া নিবি
জানিবি আমার নাম দেবী বহুচেরা
চরণ রাজার কন্যা রাজ্য সেহরা।

দুলাল চোখ বুজে পাঁচালি পড়ছিল, এবার চোখ খুলল।

অনিকেত জিগ্যেস করল, সেহরা জায়গাটা কোথায়?

দুলাল ওর ডান হাতটা ভোটের 'হাত চিহ্ন'-র মতো সামনে এগিয়ে ধরল। মুখে কথা বলল না। মানে—এখন কথা বোলো না। দুলাল জোরে শ্বাস নিয়ে আবার চোখ বুজল।

অনিকেত দেখল দুলালের মা-ও মেঝেতে বসে আছে, যে-দেবীর নাম জীবনে শোনেনি, তাঁর উদ্দেশে হাত জোড় করা। দুলালের মায়ের ঠোঁট নড়ছে। পুত্র-মঙ্গল প্রার্থনা করেই চলেছে ওই অচেনা দেবীর কাছে।

দুলাল হাতজোড় করে আবার পাঁচালি পড়তে থাকে—

বহুচেরা মাতাজি'র বহুত মহিমা
এনাতে বিরাজ আছে কালী মা দুর্গা মা
অটন্তী নগরে ছিল এক সওদাগর
তেজপাল নাম তার দেখিতে সুন্দর
বড়িয়া মকান তার, মনে নাই সুখ
লিকমের দোষে তার মনে বড় দুখ
তিনজন বউ তার দেখিতে চামর
তথাপি বাপ নাহি হয় সওদাগর।
লিকম সাপুটি থাকে না পারে রমণ
বহুচেরা মা-র কাছে করেন গমন
তেজপাল করজোড়ে জানাল আকুতি
দেবী কন তুমি বাছা হয়ে আছ কোতি।
বাহিরে পুরুষ-চিহ্ন অন্তরে জেনানা
যাহা বলি তাহা করো অন্যথা কোরো না।
পুরুষ-চিহ্ন মোরে উৎসর্গ করিও
পুরুষের বাস ছাড়ি স্ত্রীবাস পরিও।

মন্দিরে রহিও তুমি সেবক হইয়া
নিত্য পূজিও মোরে ভকতি করিয়া
নাই মন্ত্র নাই তন্ত্র বাজাইবা ঢোল
'জয় জয় মাতাজি কি' এই হল বোল।
পৃথিবীর যত শিশু জানিও তোমার
দিল মাঝে ভালবাসা রাখিও অপার
মাছ মাংস দারু এসব কভু না খাইবে
প্রতি পূর্ণিমাতে সবে ক্ষীর ভোগ দিবে।
একথা শুনিয়া সে ছিব্‌ড়ি হইল
স্ত্রীলোকের বাস পরি মন্দিরে রহিল
একদিন মাতা আসি দেখন স্বপনে
আশা আমি পূর্ণ দেব যাহা আছে মনে।
সওদাগর দেখে এক আসমানি আলো
কী আশ্চর্য সওদাগরের দেহে ঢুকে গেল।
দুই মাস পরে তার অরুচি হইল
তিনমাস পরে মুখে খাট্টা উঠিল
চারমাস পরে বুকে লিলকি দেখা দিল
ছয়মাস পরে পেট ফুলিয়া উঠিল।
শরীরে সুগন্ধ এক ভাসে সাত মাসে
আট মাসে গায়ে যেন চন্দ্র আলো আসে
শিশু নড়াচড়া করে পেটের ভিতর
নয় মাসে সাধ ভক্ষণ করে সওদাগর
সাধ ভক্ষণের দিনে দেবীর সকাশে
সওদাগরের সেই তিন বউ আসে।
কেহ তারে যত্ন করি দেয় আলুভাজা
কেহ দেয় পিঠাপুলি কেহ দেয় গজা
সওদাগর কহে দেখ মাতাজি'র ছল
পুরুষ নারী কিছু নয়, মানুষই আসল।
দশম মাসেতে তার ব্যাটাছেলে হল
ভক্তিপূর্ণ মনে সবে জয় মাতা বলো।

অনিকেত শুনল সবচেয়ে বেশি জোরে দুলালের মা বলে উঠল—জয় মা, মা গো, দুলালকে ভাল করো। অনিকেত মন দিয়ে শুনছিল পাঁচালি। সওদাগরের শেষ অবদি ব্যাটাছেলেই তো হল। কেন? কন্যাসন্তান হলে চলত না? যারা এই পাঁচালিটা বানিয়েছে, ওরাও তো পুরুষতন্ত্রেরই অংশ।

এই পাঁচালিটা কে বানিয়েছে? তোমার গুরুমা? অনিকেত জিগ্যেস করল।

দুলাল আবার ডান হাতটা আগের মতো সামনে স্থাপন করল। মানে, এখন থামো। পাঁচালি শেষ হয়নি—

ভক্তি ভরে যেবা নিত্য বহুচেরা পূজে
অন্য কোন দেবদেবী কভু নাহি খোঁজে।
দেবীর কৃপায় মন সদা মস্তি থাকে
জানিও সেই লোক মার কোলে থাকে।।

এরপর সব পাঁচালিতে যা থাকে, সেই সব। মনোবাঞ্ছা পূরণের কথা। তবে, সব পাঁচালিতেই অর্থ প্রাপ্তির স্বপ্নপূরণ থাকে, এখানে ছিল না, পাঁচালি শেষ হলে ছবিটার দিকে তাকিয়ে দুলাল জোড় হাতে নমস্কার করল। দুলালের মা-ও।

অনিকেত বলল—এই পাঁচালি এই প্রথম শুনলাম।

দুলাল বলল—সবাই জানে না।

আবার জানতে চাইল অনিকেত—পাঁচালিটা কার কাছে শিখেছে ও।

দুলাল বলল, গুরুমায়ের কাছ থেকে। গুরুমা শিখেছিল তার গুরুমা-র কাছে।

অনিকেত জিগ্যেস করল, ·তোমাদের ওখানে কি ঘটা করে এই দেবীর পুজো হয় কোনও এক বিশেষ দিনে—যেমন কোনও-কোনও এলাকায় কার্তিক পুজো হয়? 'বেশ্যা' কথাটা উচ্চারণ করতে ওর কাছে এখনও একটু আটকাল।

দুলাল বলল—মূর্তি গড়ে পুজো হয়নে। মূর্তি শুধু মন্দিরে। আমাদের কাছে শুধু ফটোক।

—মন্দিরটা কোথায়।

—বহুত দূর। গুজরাট।

—গুজরাটের কোথায়।

—বেচরাজি না কী যেন বেশ নাম। সুরাট দিয়ে যেতে হয়।

—তুমি গেছ?

—আমার যাওয়া হয়নিকো। গতবার যাব ভাবলাম, আর আমার শরীল খারাপ হয়ে গেল। অনেকে গ্যাচে। যারা গ্যাচে, তাদের কাছে গপ্‌পো শুনিচি। খুব ধুম হয়। বহুত দূর দূর থেকে সব লোক আসে। মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি, হিন্দু, মোসলমান, পাকিস্তান থেকেও আসে, বোরখা পরা কোতিরাও আসে।

—শুধু হিজড়েরাই যায়?

—সবরকম যায়। মেয়েরাও যায়। পাঁচালিতে পড়লুম না বন্ধ্যা নারী পুত্র পায়?

মনে-মনে একটা দৃশ্য দেখতে পেল অনিকেত। বোরখা থেকে দু'টো হাত বেরিয়ে তালি দিচ্ছে আর কোমর দোলাচ্ছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। হিজড়েদের মধ্যে অবশ্য ততটা হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই, এমনটাই জেনেছে, কিন্তু পাকিস্তান থেকে আসা হিজড়েরা বোরখা পরেই এসেছে নিজেদের 'নারী' প্রমাণ করার জন্য। কারণ পুরুষদের বোরখা পরতে হয় না, নারীকেই পরতে হয় যে।

—ওই মন্দিরে পরব কখন হয়? অনিকেত জিগ্যেস করে।

—পরব লাগে দশেরা-র দিনে, চত্তির মাসে, শ্রাবণ মাসের কবে কবে যেন হয়।

বাসুবাটিতেও চৈত্রমাসেই মেলাটা হয়। ওখানেও তো ব্যাটাছেলের গর্ভ হওয়ার কাহিনিটা

রয়েছে। ওখানে বহুচেরা-র কোনও চিহ্ন দেখেনি ঠিকই, কিন্তু কলকাতার মাটির তলায় পাওয়া গেল পোড়ামাটির বহুচেরা? কীভাবে? কেন? তাকের সামনে গিয়ে বহুচেরা-র ছবিটাকে দেখতে থাকে অনিকেত। মনে হল, ওই দেবী স্ফীতবক্ষা নন। তরোয়াল দিয়ে বক্ষ কেটে ফেলেছিলেন কিনা। এজন্যই দেবীর হাতে তরোয়ালটাও রয়েছে। কলকাতার মাটির তলায় পাওয়া বহুচেরার মূর্তিটিও কি স্তনহীন ছিল? ঠিক খেয়াল করতে পারছে না এখন। মূর্তিটা সিঁদুর-চর্চিত ছিল। মূর্তিটা যে বহুচেরা-র, এতে সন্দেহ নেই। মুরগি-বাহনা দেবী আর কেউ নেই। মুরগি নয়, মোরগ। মাথায় ঝুঁটি আছে। মুরগির মাথায় ঝুঁটি থাকে না।

কলকাতার কোন অঞ্চলে প্রাচীন কালেও ছিল বৃহন্নলাদের ডেরা? কবে থেকে? সুরাটেও ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠি। সুরাটের কাছাকাছি কোথাও আছে ওই দেবীর মন্দির। ওই মন্দির ঘিরে নিশ্চয়ই গড়ে উঠেছে বৃহন্নলাদের ডেরা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা কি ওখান থেকে কিছু বৃহন্নলাকে কলকাতা নিয়ে এসেছিল একসময়? ওদের দিয়ে নাচাত? না কি নারী-অভাবী গোরাগুলো ওদের নিয়েই জ্বালা মেটাত, কারণ বারাঙ্গনা পল্লি তখনও গড়ে ওঠেনি খিদিরপুর বা সোনাগাছিতে। না কি কলকাতার খোজা-হয়ে-যাওয়া দাসগুলো একসঙ্গে এই দেবীর পুজো করত। বিনয় ঘোষের একটা বইতে ছিল, সতেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে আটের শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এখানেও দাস কেনাবেচা হত। হিকির গেজেটে 'পাত্র চাই পাত্রী চাই'-এর মতন বিজ্ঞাপন থাকত স্বাস্থ্যবান স্লেভ বিক্রয়ের, বয়স ২৪। ১৭৯২ সালের 'ক্যালকাটা ক্রনিক্‌ল' পত্রিকায় বেরনো একটা সংবাদের কথা লিখেছিলেন—কসাইতলায় এক আস্তাবলে বন্দি কয়েকজন ক্রীতদাসের কথা। ওই ক্রীতদাসদের কাউকে কি খোজা করে দেওয়া হত? কে জানে? আঠেরোর শতক ছিল পাল্কির যুগ। মানুষ বইত মানুষ-ভরা পাল্কি। পাল্কি-বাহকদের খোজা হতে হয় না তো? ষাঁড় নয়, বলদে গাড়ি টানে, লাঙল দেয়। ষাঁড়কে খোজা বানালেই তো বলদ হয়। পাল্কি-বাহকরা কি খোজা হত? আর খোজা-হয়ে-যাওয়া মানুষরা তাদের দেবী-ভজনা করত কলকাতার কোথাও?

ধুর! আজগুবি ভাবনা। অ-গবেষক হলে যেমন হয়। পাল্কি-বেহারারা কেন নিজের ইচ্ছেয় খোজা হতে যাবে? ওদের তো সংসার ছিল। পাল্কি-বেয়ারা ক্রীতদাস ছিল না কখনও। বরং একবার পাল্কি-বেয়ারারা স্ট্রাইক করেছিল।

যদি এরকম একটা বানিয়ে লেখা যেত, কলকাতার ক্রীতদাস পাল্কি-বেহারা, ওদের জোর করে খোজা করা হয়েছে, ওরা সুন্দরী বউদের নিয়ে চলেছে কোথাও। এবার খোজা হলে কী হবে, ট্রান্সজেন্ডারদের মতো সেল্‌ফ-ক্যাসট্রেটেড তো নয়, মনের ভিতরে কামনা। কামনার আগুন। পাল্কি-বেহারারা ওদের নামাল, কিছুই করতে পারল না, শুধু দেখল। দেখতে-দেখতে অর্গাজম হল, সেরিব্রাল অর্গ্যাজম। এসব ইংরেজিতে লিখতে হয়। যেমন অমিতাভ লেখেন—লোককথা জড়িয়ে। ইতিহাসকে বানাতে পারেন তিনি। 'ক্যালকাটা ক্রোমোজোম'-টা পড়ল সেদিন।

যাকগে যাক। তারাপদবাবুকে বিষয়টা বলবে আরেকবার। এসব ওর বিষয়ও নয়। বহুচেরা নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া হয়েছে। এবার থাক। অনিকেত জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল, রোগটা বাধালে কী করে দুলাল? কিন্তু ঝট করে এ প্রশ্ন উচিত নয়। 'আর্ট অফ ইন্টারভিউ'-তে এরকমই বলেছিলেন প্রীতীশ নন্দী।

অনিকেত জিগ্যেস করল—পেট খারাপটা কমেছে দুলাল?

দুলাল ঘাড় কাত করে।

—কী খেয়ে এমন হল?

দুলালের মা বলল, কিচ্ছু খায়নিকো। ওকে পাদলা করে ঝোল-ভাত দি, নাউ দি ঠান্ডা বলে। গ্যাদাল পাতা দি। ওসবই তো খাচ্ছিল...।

—তোমার বউটা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এল না, ও কি তোমার খবর জানে?

ওপর-ঠোঁটের ওপর নীচের ঠোঁটটা উঠিয়ে দিয়ে বাঁ হাতের আঙুলগুলো একটু ঘোরাল দুলাল। এই দেহ-ভঙ্গিমার অর্থ, কে জানে?

—ওই পোড়ামুখী খুব খারাপ মেয়েমানুষ। চরিত্তির নেই। সেই যে ছেড়ে গেল, নিজের পেটেরটাকেও একটিবারের জন্য দেখতে এল না।

অনিকেত দেখল সব কথাই ওর মা বলে দিচ্ছে। অনিকেত বলল—ও মাসি, তুমি একটু বাইরে যাও। দুলালের সঙ্গে প্রাইভেট কথা আছে।

ও চলে গেলে অনিকেত জিগ্যেস করল—দুলাল, আনাজের ব্যবসাটা ছেড়ে দিয়েছিলে কেন তুমি?

—পোষাচ্ছিল না।

—কেন?

—বড় খাটালি।

—ওই কাজ ছেড়ে সাইকেলে চড়ে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে আলতা সিঁদুর ফিতে সেফটিপিন চুলের কাঁটা বেচতে, ওটা বুঝি খাটনির কাজ নয়?

—ওটাই ভাল লাগত যে।

—কেন ভাল লাগত? অনেক মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমত বলে? অনেক মেয়ে-বউয়ের সঙ্গে ভাব হত বলে?

—মাথাটা একটু নিচু করে দুলাল বলল—সিটা হত, কিন্তু ওদের তো মা-বোনের মতো লাগত।

—নকশা মেরো না দুলাল, মা-বোনের মতো? ওদের দেখে তোমার মনে কোনও কামনা-বাসনা জাগত না?

—মা কালীর দিব্বি, ওরম হত না। ওরা সব সইয়ের মতো ছিল। মাইরি বলছি, আমার আসলে আলতা সিঁদুর কাঁটা ফিতে ঘাঁটতে খুব ভাল লাগত। লাল টিপ, হলদে টিপ, নেলপালিশ, সায়ার দড়ি...

—সায়ার দড়ি খালি? বডিজ রাখতে না। বডিজ? দু'বার মাথা নাড়াল দুলাল।

কল্পনায় দেখতে পায় অনিকেত—কাঁচা রাস্তার ধারে কোনও গ্রামে গিয়ে হাঁস-মুরগি, কাঁঠাল গাছ, পেয়ারা গাছ, ছাগলছানা, নেড়িকুকুর সমন্বিত কোনও উঠোনের ভিতরে সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়েছে দুলাল—টিরিং। বউ-ঝি'রা ঘিরে ধরেছে সাইকেল। দুলাল বলছে, অ'দিদি এই পুঁতির হারটা ন্যাও না, তোমায় খুব মানাবে। অ'বউদি, ছোট জামার কতা বলেছিলে, এই এনেচি গো।

—আমার সাইজ জানো?

—তোমার তো বউদি ভরন্ত শরীল। তো, ভাতার-সোহাগী বউদিমণির জন্য আটতিরিশ তো লাগবেই। আচে...।

অনিকেত বলে—তো দুলাল, বউদি-টউদির সঙ্গে তো খুব রঙ্গরসে দিন কাটাতে। নিজের বউটার কী হত?

দুলাল অনিকেতের দিকে ল্যাবার মতো চেয়ে থাকে।

অনিকেত একটু বে-পরোয়া হয়। বাঁ-হাতের তর্জনীর ওপরে মধ্যমাটা বেঁকিয়ে দু'আঙুলের ফাঁকে একটা গহ্বর তৈরি করে ডান হাতের তর্জনী সেখানে লাগিয়ে বলে, বউয়ের সঙ্গে হত?

দুলাল যেন কোনও অন্যায় করেছে, সেইভাবে বলল, বউ জোর করত। যেটা বলল না, তা হল—'আমি কী করব?'

অনিকেত বলে ফেলল, দাঁড়াত?

দুলাল একটু অবাক চোখে তাকাল অনিকেতের দিকে। এ ধরনের কথা ঠিক যেন আশা করতে পারেনি।

দু'বার মাথা নাড়ল দুলাল।

মানে, দাঁড়াত।

দুলাল বলল, কিন্তু ভাল লাগত না। বউয়ের পেড়াপেড়িতে...

—বেরুত?—অনিকেত জিগ্যেস করল।

—কী, ঝিন্নি?

'ঝিন্নি' মানে বুঝতে পারল না অনিকেত। জিগ্যেস করল, ঝিন্নি বলতে কী বলতে চাইছ?

—ধাত। এই শব্দটা বলতে গিয়ে গলা নামাল। যেন অপরাধ। ওর যেন বীর্য নিঃসরণ কোনও অন্যায়।

হ্যাঁ, ওটা বেরত! মাথা নাড়াল দুলাল।

কিন্‌সে-র বইটার কথা মনে পড়ল। আলফ্রেড কিন্‌সে। সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার ইন হিউম্যান মেল। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত এই মূল বইটা পড়া হয়নি যদিও, কিন্তু বারবার কিন্‌সে-র তত্ত্বের কথা এসেছে যৌনতা-সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখায়। উনি পতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে গল্ ওয়াস্‌প নামে এক ধরনের বোলতা জাতীয় পতঙ্গের ক্ষেত্রে দেখেছিলেন, ওই পতঙ্গগুলোকে নির্দিষ্ট যৌনলিঙ্গে শনাক্ত করা যায় না। ওই জাতের একটি নির্দিষ্ট পতঙ্গকে পুরুষ-পতঙ্গ বলা যায় না, কিংবা স্ত্রী-পতঙ্গও বলা যায় না। একটি পুরুষ-পতঙ্গ দরকার মতো স্ত্রী-পতঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে, আবার স্ত্রী-পতঙ্গও পুরুষে পরিণত হতে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গের মিলনে যে নিষিক্ত ডিম হয়, তা থেকে স্ত্রী বা পুরুষ-পতঙ্গ জন্মায়, আবার অনিষিক্ত ডিম থেকে লিঙ্গচিহ্ন-হীন পতঙ্গ জন্মায়। মৌমাছিদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে অনিষিক্ত ডিম থেকে কর্মী-মৌমাছি তৈরি হচ্ছে। পিঁপড়েদেরও। ভারত মহাসাগরে এক জাতের মাছ আছে, মালয়ীরা বলে 'মুপি', ওরা ছোট-ছোট ঝাঁক বেঁধে চলে। একটা ঝাঁকে ৭০-৮০টা করে মাছ থাকে। একটাই পুরুষ-মাছ, বাকি সব স্ত্রী-মাছ। যদি কোনও বড় মাছ ওই ঝাঁক থেকে পুরুষ-মাছটাকে খেয়ে নেয়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অন্য একটা স্ত্রী-মাছ পুরুষ-মাছে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মাছের বাপারটা অবশ্য কিন্‌সে দেখেননি, উনি পতঙ্গ নিয়েই কাজ করছিলেন। কিন্তু ওই গল্ ওয়াস্‌প পোকাগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখে কিন্‌সের মাথার পোকাও নড়ে উঠল। ওঁর মাথায় প্রশ্ন

এল—মানুষের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কি কোনও বর্ডার লাইন আছে? কারা পুরুষ? কারা নারী? কীভাবে নির্ধারিত হবে? লিঙ্গচিহ্নে? ওভারি এবং টেস্‌টিকল-এর উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে, না কি ক্রোমোজোমে? কিন্‌সে ১৯৫৬ সালে মারা যান। জেনেটিক্স তখনও এতটা পরিণতি পায়নি। কিন্তু ক্রোমোজম আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্‌সে দেখলেন, পুরুষ লিঙ্গ-চিহ্নধারী অনেকেই নিজেকে নারী ভাবতে ভালবাসে। সংখ্যায় কম হলেও অনেক নারীও পুরুষ ভাবে নিজেকে। কিন্‌সে দীর্ঘদিন ধরে নারী-পুরুষের যৌনতার ঝোঁক পর্যবেক্ষণ করলেন। প্রচুর স্যাম্প্‌ল নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত এলেন যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই পুরুষ-সত্তা এবং স্ত্রী-সত্তা আছে। সব পুরুষের কম বেশি সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ আছে। তিনি একটা 'স্কেল' করেছিলেন। স্কেলের 'শূন্য' মানে সম্পূর্ণ বিষমকামী, 'ছয়' মানে সম্পূর্ণ সমকামী। আবার এই অবস্থান সারাজীবনের জন্য নির্দিষ্ট নয়। আজ যে 'তিন'-এ আছে, কয়েক বছর পর সে 'পাঁচ'-এ পৌঁছে যেতে পারে। 'তিন' মানে উভকামী। হিজড়েদের ভাষায় 'ডবল ডেকার'। যে 'দুই' চিহ্নে, সে প্রধানত বিষমকামী বা হেট্রোসেক্সুয়াল, কিন্তু মাঝে-মধ্যে সমকামিতার দিকে ঝোঁকে। যাকে 'পাঁচ' স্কেলে ফেলা যায়, সে সমকামীই, তবে একটু-একটু বিষমকামী। অনেক সমকামীই পরিবারের চাপে বিয়ে করে ঘরে বউ আনে, সন্তানও হয়। ছোটবেলায় দেখা ননী নামে যে লোকটি মহিলাদের সঙ্গে থাকতে ভালবাসত, নাড়ু বানাত, মেয়েলি রসিকতা করত, সে বিবাহিত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল।

দুলাল কিন্‌সে-র স্কেলে কোথায়? পাঁচ-এ? যখন বিয়ে করেছিল, পুরুষলিঙ্গ-ধারী সবাই যেমন করে, তখন কি পাঁচ-এ ছিল? পরে সেই সংসার অসহ্য বোধ হল? এরপর পালাল দুলাল?

এত কিছু ভেবে ফেলল কয়েক মুহূর্তে। মন তো সবচেয়ে দ্রুতগামী। বকের সঙ্গে ক্যুইজে যুধিষ্ঠির একদম ঠিক জবাব দিয়েছিল। এত সব ভাবতে-ভাবতেই অনিকেত ভাবল—ধুর, ফ্রয়েড বলো, কিন্‌সে বলো, সাইমন লিভে বলো, কোনও তত্ত্বেই এসব পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। এ এক বিপন্ন বিস্ময়।

দুলাল একটা বিড়ি ধরানোর জন্য উশখুশ করছিল। বলল, একটা খাচ্ছি দাদা।

অনিকেত বলল—ছাড়া যায় না? শরীরটা খারাপ কিনা...

দুলাল বলল, বহুদিনের অব্যেস কিনা...।

অনিকেত বলল—আচ্ছা, একটা কথা বলো তো দুলাল, তোমার বউ তো দেখতে-শুনতে বেশ ভালই ছিল, আদর-টাদর করতে ইচ্ছে করত না?

দুলাল মাথা চুলকাতে লাগল।

অনিকেত প্রশ্নটা করেই ভাবল, কিন্‌সে তো কবে মারা গিয়েছেন, অথচ এখনও কত রিসার্চ স্কলার ওঁর আন্ডারে কাজ করে চলেছে, কিন্‌সে জানলেন না।

দুলালের দিকে তাকিয়ে থাকে অনিকেত একটা উত্তরের আশায়।

দুলাল বলল—প্রথম ক'দিন মন্দ লাগতনি। সাইকিল নিয়ে নতুন গাঁয়ে যাবার মতন। তারপর হল কী, ওর গতর দেখে, মানে ম্যানা দু'টো দেখে, আমার মনে কীরম ধারা হিংসে হত। ভাবতাম ওরম যদি আমার থাকত। ও আমায় খুব আকার-ইঙ্গিতে বর-বউ খেলার জন্য বলত। খেলতাম, কিন্তু ভাল লাগতনি খুব। কখনও বলতাম গায়ে ব্যথা, কখনও বলতাম মাথা

ব্যথা। অকম্মে বলত, মেনিমুখো, নেংটি ইঁদুর এসব বলত। আমি বলতাম আমার দ্বারা হবে না গো, মাপ করো। এরপর ওর গভ্‌ভো হল। গভ্‌ভো হলে ভাইবোন হয়ে থাকতে হয়, তাই ছিলাম। এরপর একদিন ওকে অন্য ব্যাটাছেলের সঙ্গে দেখলাম ঘরে। ও ছিল আমার মহাজন। ওটা দেখে খুব দুঃখু হল। দুঃখু হওয়ার কথা নয়। তবু হল। নিজের বে করা বউ কিনা। জানি, স্বামীর কম্ম-কত্তব্য করিনি, তা বলে অন্য ব্যাটাছেলে ঘরে ঢোকাবে?

জিগেস করলাম, কবে থেকে?

ও বলল, বলবনি। ব্যস, আমিও সুযোগ পেয়ে গেলাম, ওর সঙ্গে আর ভড়কানি করতে হত না।

তুমি তবে উপোস থাকতে দুলাল? কারও সঙ্গে ছিল না কিছু?

মাথা নিচু করে দুলাল। বলে, সব জেনে কী করবেন?

অনিকেত বলে—তুমি চেপে গিয়েই বা কী করবে? আমায় বলো, তোমায় বুঝতে পারব।

—ছিল। একটা চালের আড়তদার। পরে একটা নাপিত। নাপিতের নিজের বউ ছিল না। আমাকে চুল কেটে দিত। তারপর মুখে-গলায় হাত বুলিয়ে দিত। ওই হাতের কথা আমি বুঝে নিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। ওর বাড়ি নিয়ে যেত। কিন্তু চালওলাটার বউ একদিন আমায় খুব প্যাঁদাল।

—ওই চালওলার সঙ্গে তুমি কী করছিলে, যখন ওর বউ দেখল? লজ্জার ভাব করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—বলব না যাও। চোখে এমন ভাব করল—মেয়েরা 'যাও, অসভ্য' বলার সময় তেমন ভ্রু-ভঙ্গি করে।

—তো, হিজড়েদের দলে ভিড়লে কী করে?

দুলাল অনেকটা শ্বাস নিল, বোধহয় অনেক কথা বলবে ভেবে অনেকটা বাতাস ভরে ছিল বুকে।

দুলাল বলতে লাগল—সাইকিলে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একদল হিজড়ের সঙ্গে দেখা। ওরা ছল্লায় যাচ্ছিল। আমায় দেখে তালি দিল। থামতে বলল। আমিও থামলাম। বলল, দেখাও দিকি বাপু কী আছে? আমার কাছে কমা-মালও থাকত।

—কমা-মাল কী জিনিস?

—কমা-মাল হল বোরোনীল, লাকমি, পিয়ার, এইসব। বোরোলিন নামটা একটু পেল্টে বোরোনীল, ল্যাকমে পেল্টে লাকমি, এমনধারা। একইরকম দেকতে। বড়বাজারে পাওয়া যায়, চিংড়িহাটাতেও একজন মহাজন এসব রাখে। ওসব লি আসতাম, দাম কম হত। ওইজন্য কমা-মাল। ওরা কমা-মাল দেকতে চাইল। আমি দ্যাকালাম। ওরা দু-একটা মাল কিনল। আমায় একজন বলল—কী, দেকে মনে হচ্ছে নুনে নুন। কোতি?

—নুনে নুন মানে?

—তখন আমুও মানে জানতাম না। মানে হল...ইয়ে, ব্যাটাছেলে দেখেই যদি কোনও ব্যাটাছেলের...

—বুঝেছি। তুমি কী বললে?

—আমি কিছু বলিনি। ওদের একজন বলল চিপটি চলে? আপনি যেমন আঙুল দিয়ে বাহার করেছিলেন, সেরকম আঙুল দেখাল। বলল, করো? অন্য একজন বলল, বউ আছে? অন্য একজন বলল, ধুরপিট্টি হয়?

আমি দাদা একটু ভ্যাবাচাকা মতন খেয়ে গেলাম। একজন আমার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, গান্ডুসোনাটা ঢ্যামা খেয়ে গেছে গো... ও জিগ্যেস করল, তোমার নাম কী গো? নাম বললাম। ও বলল, আমার নাম চাত্তারা। পরে বুঝেছিলাম ওর আসলে চাঁদতারা নাম। চাঁদতারা হিজড়েনি। ওরা বলল, কসবায় ওদের একটা আটপুরে আছে, ওখানে যেতে।

—আটপুরে মানে?

—মানে খোল, মানে থাকার জায়গা, কিন্তু টেম্পোরালি। মানে বড় গুরুমা-র এক টোস্‌কা চেলি ওখানে থাকে, ওর কাছে ওরা ক'দিনের জন্য এসেছে। ওদের আসল খোল পানাগড়। ওরা ছল্লায় যাচ্ছিল, পথে দোকান-টোকান থেকে মাংতি নিচ্ছিল, আমার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা হতে লাগল। আমি আমার ঘরের কথা ওদের বলে দিলাম। চাত্তারা বলল, তোর চিপটিধারী বউ যদি কোনও আকঘাট মদ্দর সঙ্গে ধুরপিট্টি চায়, তাতে তুই কেন কাঁটা হবি? ওকে ওর মতো চলতে দে, তুই তোর মতো চল। আমাদের সঙ্গে চলে আয়। একই তো কথা, এখনও ঘুরচিস, পরেও ঘুরবি। ঘরে বসে থাকলে চলবে? সবার আগে পেট। পেটের তলা সেকেন্‌থার্ড। আমরা কিন্তু মস্তিতে আছি। ছল্লা করি, ছমকাই, ছেমো-ছেনালি করি, বিলকুল ছক্কা লাইফ। এসো একদিন।

—তারপর?

গেলাম ওখানে। কসবায়। ঠিকানা দিয়েছিল। ওরা খুব বন্ধুর মতো ব্যাভার করল।

এরম ব্যাভার তো ঘরে পাই না, পাড়ায় পাই না। সবাই তো দুচ্ছাই করে। একদিন চলে গেলাম। চৈতন্যঠাকুরও তো চলে গিয়েছিলেন মা'কে ছেড়ে, বিষ্ণুপ্রিয়া বউকে ছেড়ে।

হাত জোড় করল দুলাল।

তাকে রাখা বহুচেরা মায়ের দিকেই কিন্তু ওর চোখ।

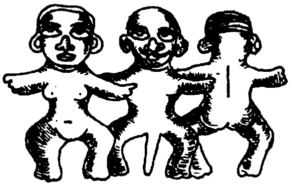

এই দুনিয়া ঘোরে বন বন বন বন ছন্দে ছন্দে কত রং বদলায়—রং বদলায়। দুরন্ত ঘূর্ণি। এই লেগেছে পাক...। কথা ও সুর সলিল চৌধুরী, কণ্ঠ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

৭৮ আরপিএম-এর রেকর্ড আর চালানো যাবে না। পিন নেই। যাঁরা পিন তৈরি করেন, তাঁরা তো শুধু রেডিও-র জন্য পিন তৈরি করবেন না। লং প্লেয়িং ডিস্ক ৪৫ কিংবা ৩৩ আরপিএম-এ চলে। এই পিন এখনও পাওয়া যায়। কতদিন পাওয়া যাবে কে জানে? বহু গান শুধু ৭৮-এ বন্দি, ওসব গান শোনানো যাবে না আর, হারিয়ে যাবে কমলা ঝরিয়া, আব্বাসউদ্দিন, গিরিবালা দাসী, কানন দেবী, বিষ্ণুপদ দাস, কে মল্লিকদের কত গান...। এখন এই গানটা বাজছে। এই দুনিয়া ঘোরে বন বন...।

কত রং পাল্টানো। কত কী হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে শিগগিরি একটা চাকতি আসবে, পাতলা

ধাতুর, ওর নাম নাকি কমপ্যাক্ট ডিস্ক। এক-একটা চাকতিতে এক-দেড় ঘণ্টার রেকর্ডিং ঢুকে যাবে। কম্পিউটার এসে গিয়েছে। মোবাইল ফোনও এসে গিয়েছে। তার লাগছে না, রিসিভার নেই, পকেটে ঢুকে যাচ্ছে আস্ত টেলিফোন, রিলে করার জন্য আর টেলিফোন লাইন বুক করার দরকার নেই।

এই তো সেদিন গ্যালিলিও উপগ্রহটাকে আকাশে ছাড়া হল। বৃহস্পতি-র উপগ্রহ আবিষ্কার করল গ্যালিলিও। আবার দেখল ওখানে বরফ রয়েছে। ১৯টা দেশ সই করল মানুষের ক্লোনিং বন্ধ করার জন্য। ভেড়ার ক্লোনিং হয়ে গিয়েছে, ক্লোন করা ভেড়া দিব্যি সুস্থ হয়ে বেঁচে আছে। মানুষের এখন যা প্রযুক্তিগত পারদর্শিতা, তাতে হয়তো মানুষকেও ক্লোন করে ফেলতে পারে। কী উপায় হবে তা হলে? মাধুরী দীক্ষিত যদি নিজেকে ক্লোন করেন, এবং ক্লোন করা নতুন মাধুরী যদি অভিনয় না-করে কেবল ক্লোনিং বিজনেস শুরু করে দেন, নিজের কোষ থেকে নতুন-নতুন মানুষ, মানে নতুন-নতুন মাধুরী—কী হবে ভাবুন তো, মাধুরী-বন্যা বয়ে যাবে। এমনিতে তো এখনই স্পার্ম ব্যাংক হয়ে গিয়েছে। কোনও মহিলা যদি মা হতে চান, এ জন্য আর যৌন প্রক্রিয়ার দরকার নেই। প্রক্রিয়া না-বলে ক্রীড়া বলাই ভাল। প্রক্রিয়া তো একটা দরকার। ডিম্বাণুটাকে নিষিক্ত করতে হবে তো। ওটা নারী শরীরের গভীরের ফ্যালোপিয়ান টিউব-এ না-হয়ে টেস্ট টিউবেও হতে পারে। ফার্টিলাইজেশন-এর দোকান, মানে ক্লিনিকে গেলে দোকানদার, মানে ফার্টিলাইজেশন এক্সপার্ট জিগ্যেস করবেন, কী স্পার্ম চাই? বক্সার নেবেন? না কি ওয়েট লিফ্‌টার? একদম ম্যাসকিউলিন। স্ট্যাটিস্টিসিয়ান আছে, ইক্‌নমিস্ট, ম্যাথমেটিসিয়ান—অঙ্কে এক্কেবারে হদ্দমুদ্দ। আর্টিস্ট পছন্দ করেন? পেন্টার? নাকি পোয়েট? হ্যাঁ, অ্যাক্টরও আছেন। বচ্চন?—না না, কারও নাম বলা যাবে না। যা চান...।

পছন্দ করে স্পার্মটি ডিম্বাণুর সঙ্গে ফার্টিলাইজ্‌ড করিয়ে নিজ-গর্ভে ধারণ করতে পারেন। ঠিক ওই একই জিনিস হবে। 'দুই মাস পরে কন্যার অরুচি হইল। তিন মাস পরে মুখে টক জল উঠিল। চতুর্থ মাসেতে দেহ কাঞ্চন বরণ। পঞ্চম মাসেতে চেঞ্জ গর্ভের গড়ন...।' এবার ন'মাসে সাধ খাও, বাপ কে জানো না, ওই ভদ্রলোককে তেল মেরে সন্তুষ্ট করতে হয়নি, জামাইষষ্ঠীতে 'এই চলো না গো, চলো না গো' বলে বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে হয়নি, পুরো ফ্রিডম। যদি মনে করো নিজের পেটে নেবে না, ফোলা পেটে অফিস যেতে ভাল্লাগে না, ঠিক আছে, সারোগেট মায়ের পেটে ভরে দাও সেই জাইগোট, সেখানেই বড় হবে। যে-সন্তানটা হবে, সেখানে গ্যারান্টেড তেইশটা ক্রোমোজম তোমার। এই দুনিয়া ঘোরে বন বন বন বন ছন্দে ছন্দে কত রং পাল্টায়...।

একজন বিখ্যাত গাইনি, যাঁর ফার্টিলিটি ক্লিনিক আছে, টেস্ট টিউব বেবি-তে সফল, তাঁকে অনিকেত জিগ্যেস করেছিল—কোনও লেসবিয়ান মহিলা মা হতে চেয়েছে?

উনি বলেছিলেন—বিদেশে যখন ছিলেন, একজন লেসবিয়ান এসে স্পার্ম চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ছেলেদের সঙ্গে ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এখানে এসেছেন। ওঁদের স্পার্ম ব্যাঙ্কে হোমোসেক্সুয়ালদের স্পার্মও ছিল। জিগ্যেস করেছিলেন, ওরকম চলবে কি না...। সেই লেসবিয়ান মহিলা চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, ওন্‌নো-ও-ও। হোমোসেক্সুয়াল পুরুষের সন্তান হোমোসেক্সুয়াল হয়, এমন কোনও কথা অবশ্য নেই, এমনকী যমজ দুই ভাইয়ের একজন হোমো হলে অন্যজন না-ও হতে পারে, না-হওয়ার চান্স-ই বেশি, তবু সেই মহিলা

চিৎকার করে উঠেছিলেন—নো...। অথচ দেখুন, উনি নিজে লেস্‌বি। এদিকে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। বিজেপি আর তার সঙ্গীসাথীরা ২৫১টা আসন পেয়েছে। কংগ্রেস ১৬৬। বিজেপি ক্ষমতায় এসেই পোখরানে পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে বোমপরীক্ষা করল, আরএসএস-এর সভ্যরা মুম্বই জুড়ে হোর্ডিং আর পোস্টারে চলচ্চিত্র নায়িকাদের বুকে আলকাতরা লেপে দিলেন। কিছুদিন পর চাঘাই-তে পাকিস্তান আরও শক্তিশালী পারমাণবিক বোমা ফাটাল। এবং ধর্মীয় দলের সভ্যরা লাহোর এবং করাচিতে জিন্‌স পরা মহিলাদের জিন্‌স-এর ওপর দিয়ে ব্লেড ও খুর চালিয়ে দিল। পোস্টার পড়ল, মহিলার শরীরকে বোরখায় ঢেকে রাখতে হবে। আর বার্লিন-এর আলেকজান্দ্রা প্লাৎস-এর যে স্পটে হিটলার ৩৬০ জন সমকামীকে একসঙ্গে জড়ো করে গুলি করে মেরেছিলেন, ওখানে সমকামীরা বিরাট সমাবেশ করলেন, থাইল্যান্ড থেকে 'এলকাজার' নামে একদল ট্রান্সজেন্ডার নৃত্যশিল্পী আশ্চর্য নৃত্য প্রদর্শন করলেন, এবং সারা পৃথিবীতে সমকামকে বৈধ করার দাবি তুললেন।

এরকম সময়ে স্টেশন ডিরেক্টর অনিকেতকে ডেকে বললেন, 'বিবিসি' আপনাকে চেয়েছে।

—মানে?

—'বিবিসি' সেক্স এডুকেশন নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে ব্যাংককে। ইন্ডিয়া থেকেও কয়েকজন যাবে। রেডিও থেকে দু'জন। যেহেতু আপনি এই কাজটা করেছেন, আপনাকে পাঠাব। আপনি রাজি আছেন?

এই পৃথিবী ঘোরে বন বন বন—আর কোথাকার জল কোথায় ছিটকে যায়।

বিদেশ যাচ্ছে অনিকেত, জীবনে প্রথম, সরকারি পয়সায়।

ব্যাংকক এয়ারপোর্ট-এর লাউঞ্জ দেখে তো চোখ ছানাবড়া। বিরাট লাউঞ্জ। কত যে দোকানপাট। কাচের এধার দিয়ে দেখা যায় মাসাজ চলছে। কমবয়সি মেয়েরা মাসাজ করে দিচ্ছে। ম্যাট্রেসের ওপর বিশাল-বপু আফ্রিকান কিংবা ছোট আকৃতির চিনেম্যান চিত বা উপুড়। প্রচুর এস্কালেটর, চলমান রাস্তা, গাছপালা, কোনটা আসল কোনটা প্লাস্টিকের বোঝা মুশকিল। বাইরে এলে দেখা গেল হাতে 'বিবিসি' প্ল্যাকার্ড ধরা যুবতী। ওরাই গাড়ি করে পৌঁছে দিল হোটেলে। ফোয়ারা, সুইমিং পুল, অ্যাকোয়ারিয়াম শোভিত হোটেল।

বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, সুদান, কেনিয়া, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান থেকে প্রতিনিধিরা এসেছে। তিনদিন ধরে ওয়ার্কশপ চলবে। প্রতিনিধিদের সংখ্যা চল্লিশ।

অনিকেতের একবার মনে হল—ওর এইসব কিছুর মূলে তো গ্রামবাংলা থেকে আসা কয়েকটা অসহায় চিঠি, যারা স্বপ্নদোষের ভয়ে গার্ডার আটকে রাখত জননযন্ত্রে, যারা ধর্ষিত হওয়ার জন্য দোষ দিয়েছিল ওদের উন্মুখ স্তনকে, বন্ধ করতে চেয়েছিল উদ্‌গম, যারা অপরাধবোধে জর্জর ছিল বীর্যস্খলনে, ওদের জন্যই তো একটা অনুষ্ঠান রচনা, আর সেই পরিণামেই আজ এখানে আসা, এত ফলের রসভর্তি গ্লাস, এত বাদাম, এত রং, এত ধুম। বেড়াচাঁপা, মহিষাদল, বলুহাটি, কদম্বগাছির ছেলে-মেয়েগুলো তো জানতেও পারল না। ওই অনুষ্ঠানটা করে ওদের কতটা কী হয়েছে কে জানে? অনিকেতের তো এই সব হচ্ছে।

প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটারের নাম সুসানা রস। সঙ্গে আছেন হ্যাজেল স্লেভিন, পারভেজ আলম, ক্লাইভ হলওয়ে, হরিণী সিং। এঁরা রিসোর্স পার্সন। প্রথমে একটা করে ফর্ম ধরিয়ে

দেওয়া হল। এটা যেন একটা অ্যাডমিশন টেস্টের মতো। জানতে চাওয়া হচ্ছে, এঁদের মধ্যে কাদের-কাদের যৌনক্ষমতা থাকা উচিত?

ওই তালিকায়—গে, লেসবিয়ান, যাজক, মেনোপজ হয়ে যাওয়া নারী, সত্তরোর্ধ্ব পুরুষ, টিনএজার, মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষ, শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষ...ইত্যাদি। সবার শেষে পিডোফিল।

অন্যরা সব ঠিকই আছে। যাজকও। কিন্তু পিডোফিল, মানে শিশুদের ওপর যাদের যৌন আসক্তি, ওদের নিয়েই তো সমস্যা। সবার ক্ষেত্রে 'ইয়েস' করে পিডোফিলদের পাশে 'নো' লিখে দিল অনিকেত।

হোয়াই নো? অনিকেতকে জিগ্যেস করা হল। অনিকেতকেও একটু মাথা চুলকোতে হল। বলল, ম্যাডাম, কাগজে প্রায়ই পড়ি সাত বছর, পাঁচ বছর এমনকী তিন বছরের গার্ল চাইল্ডকে ধর্ষণ করা হয়েছে, বয় চাইল্ডরাও বাদ যায় না। আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। আমার মতো অনেকেরই এরকম অভিজ্ঞতা আছে। বাসে যখন দাঁড়িয়ে যেতাম, আমার পিছনে কোন বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে যেত, প্রেশার দিত। আনক্যানি ফিলিং হত। বড় হয়ে এদেরও হোমোসেক্সুয়াল ভাবতাম। এখন বুঝি ওরা পিডোফিল।

ম্যাডাম মুচকি-মুচকি হাসছেন। বলছেন—দেন ইউ থিংক দ্যাট পিডোফাইল্‌স আর টু বি ক্যাস্‌ট্রেটেড?

আবার মাথা চুলকোচ্ছে। ও ওদের খোজা করে দেওয়ার কথা বলতে চায়নি তো...।

ম্যাডাম এবার একজন শ্রীলঙ্কানকে নিয়ে পড়লেন—যিনি 'প্রিস্ট'-দের পাশে 'নো' লিখেছিলেন।

মজাই লাগছে।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত এসব চলল। তারপর ছুটি। ঘোরো ইচ্ছেমতো। পুরো ব্যাংকক ট্রিপ-টা মনে-মনে সাম-আপ করছিল অনিকেত—হোটেলে শুয়ে। যেন কাউকে বলছিল। একদম প্রথম দিনে কী এলাহি ব্রেকফাস্ট জানো, ফ্যানা ভাতও ছিল, দলাপাকানো, পিন্ডির মতো দেখতে ভাতের মণ্ড। পোকাও ছিল, হ্যাঁ গো, পোকা। ফ্রাই করা। কী পোকা জানি না। শুক্লাকে বলল। এরপর হিউম্যান সেক্সুয়ালিটি, মিথ অ্যান্ড মিসকনসেপ্‌শন। গোটা তিরিশেক প্রশ্ন। ফল্‌স বা ট্রু লিখে জমা দিতে হবে। এর ওপর পরে আলোচনা হবে।

আ গার্ল মাস্ট হ্যাভ এ হাইমেন টু বি আ ভার্জিন। কী, তুমি কী মনে করো? সতীচ্ছদ ফাটা থাকা মানেই সে কুমারী নয়?

—সে কী, অনিকেত তো মঞ্জুকেই জিগ্যেস করছে।

মঞ্জু বলছে, ফল্‌স। সাইকেল চালালে কিংবা খেলাধুলো করলেও ছিঁড়ে যেতে পারে।

—মেনোপজ ইজ দ্য এন্ড অফ উয়োমেন্‌'স সেক্সুয়াল লাইফ?

মঞ্জু ঠোঁট উল্টে দিল। জানি না। এর আগেও তো এন্ড হতে পারে...।

অনিকেত মঞ্জুর থুতনি নাড়িয়ে দিল। বলল, ন্যাকা? এন্ড? দেখবি?

হোটেলের বিছানাটা বেশ বড়। পর্দা ঝুলছে লম্বা। মঞ্জুকে শুইয়ে দিল অনিকেত। মেন আর মোর সেক্সুয়াল দ্যান উয়োমেন...ফল্‌স না ট্রু?

—জানি না, যা...।

—সাইজ অফ পেনিস হ্যাজ এ লিট্‌ল রোল টু প্লে ইন দি সেক্সুয়াল অ্যাক্ট? কী? ফল্‌স না ট্রু?

—একটা থাপ্পড় মারব, বদমাশ কোথাকার, এটা কপট রাগ, বুঝতেই পারছে অনিকেত। শোন না, ভ্যাজাইনাল আর ক্লিটোরাল—দু'রকম অর্গ্যাজ্‌ম হয়, সেটা জানিস? মঞ্জু বলল—অ্যাঁ?

ও জানে না। ও কি অর্গ্যাজ্‌ম জানে? জেনেছে কোনওদিন?

শূন্য-বিছানাকে জিগ্যেস করে অনিকেত। শোনো, এ এক অদ্ভুত ওয়ার্কশপ। আইভি-কে বলল অনিকেত। এরকমও ওয়ার্কশপ যে হয়...

ম্যাডাম বলল—ওয়েল, লেট আস বি ফ্রি অ্যান্ড ফ্র্যাংক। সমস্ত ইন্‌হিবিশন কাটাতে হবে। বলল—উয়োমেন্‌স রিপ্রোডাক্‌টিভ অর্গ্যান-কে কী বলে? —সে অ্যাজ মেনি ওয়ার্ডস অ্যাজ ইউ ক্যান। সবাইকে বলতে হবে। প্রথমে তামিলনাড়ু থেকে আসা ছেলেটিকে জিগ্যেস করল—ছেলেটি 'পুসি', 'কান্ট'—এসব বলল, কিন্তু ওদের তামিল ভাষায় কী বলে বলতে পারল না, মানে উচ্চারণ করতে পারল না। ও বলল, আমি বরং লিখে দিচ্ছি। ও লিখে দিল, ম্যাডাম পড়ল, পেনুরুপ্‌পু। তোমাকে যদি জিগ্যেস করত, বলতে পারতে তুমি আইভি, বাংলাটা?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। কী আছে? শুনবে?

—ইট্‌স ওকে, ওকে।

—এরপর কী হল? মেল রিপ্রোডাকটিভ অর্গ্যান জানতে চাইল না?

—চাইল তো? বলে দিলাম। একদম চন্দ্রবিন্দু দিয়ে। মাস্টারবেশন-কে কী কী বলে জানতে চাইলেন, সেক্স ওয়ার্কার-দের কী কী বলে, মেনসট্রুয়েশন-কে কী বলে, বিভিন্ন ভাষায়—এসব আবার অনেকে নোট করল। বাধ্য ছাত্র।

—তুমিও?

—হ্যাঁ। আমিও।

—গুড। তারপর কী হল!

তারপর অ্যাপ্রোচ, এইম, টার্গেট এইসব নিয়ে লেকচার। একই মেসেজ বিভিন্নভাবে বলতে হয়...এইসব...

—রাখো তো মেসেজ, মাসাজ করালে না?

—বলব, বলব। একটা ইন্টারেস্টিং গল্প শুনবে আইভি, গল্প নয়, সত্যি কথা। কেনিয়া থেকে যে-মেয়েটা এসেছিল ওর নাম আরিদা মুসু। মুসলিম। আরিদা বোধহয় ফারিদা থেকে এসেছে। ওদের ডায়লেক্টে 'ফ' ধ্বনি 'অ' হয়ে যায় আমাদের দেশের কোথাও কোথাও যেমন রাম আম হয়। বলছিল ওদের দেশে মেয়েদেরও ক্যাস্‌ট্রেশন হয়। 'ক্যাস্‌ট্রেশন' তো নয়, সারকামসিশন। মেয়েদেরও কেটে দেয়।

—ওদের আবার কী কাটবে? ভগবানই তো কেটেকুটে সাইজ করে দিয়েছে!

—না, মেয়েটা বলছিল—ওদের দেশে কিছু ট্রাইবালদের মধ্যে আর মুসলিমদের মধ্যে এই নিয়মটা আছে। ক্লিটোরিস-টা খুঁচিয়ে উপড়ে ফেলে দেয়। সুদানের মেয়েটাও একই কথা বলল, জানো। পাঁচ-ছ'বছরের মেয়েদের এই খতনাটা হয়। আগে জানতাম শুধু মুসলিম আর ইহুদি ছেলেদের খতনা হয়। ওখানে শুনলাম মেয়েদেরও করে। শুধু ক্লিট নয়, লেবিয়া মাইনোরা-ও

ছেঁটে দেয়। ওদের অনুভূতি কমিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েদের সতীত্ব গ্যারান্টেড করার জন্য এরকম করা হয়।

—এতে কী করে গ্যারেন্টেড থাকবে?

—এই জায়গাগুলো, যেখানে নার্ভ নেটওয়ার্কটা বেশ ঘন, এগুলো খুবলে নিলে মেয়েদের যৌন-অনুভূতি কমে যাবে, সেনসেশন কমে যাবে। আরিদা বলছিল ওর নিজেরও ছোটবেলায় সারকামসিশন হয়েছিল। ওর তখন পাঁচ বছর বয়স। কিছু লোকজনকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। ওরা কেউ চকোলেট এনেছিল উপহার হিসেবে, কেউ পুঁতির মালা। একজন মহিলা এটা করেছিল। ভীষণ ব্যথা পেয়েছিল, ভীষণ কষ্ট, ভীষণ জোরে চিৎকার করেছিল, চিৎকারটা করতে দেয়, মুখে নেকড়া গুঁজে দেয় না। চিৎকার মানে হল কাজটা ঠিকঠাক হচ্ছে। কিন্তু তখন খুব জোরে ঢোল বাজে, এক ধরনের ফাঁপা কাঠের বাঁশি বাজে, সেই বাঁশিতে সুর নেই, শুধু শব্দ। আর্তনাদ চাপা দেওয়ার শব্দ।

আরিদা একটা এনজিও-তে কাজ করে। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস নিয়ে পড়েছে। ও বলছিল—আসলে ওইসব অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গন্ডগোল লেগে থাকত, পুরুষরা যুদ্ধে যেত, শিকারেও যেত, তাই মেয়েদের যৌনতাকে পঙ্গু করে দেওয়া হত। যৌন-কর্মটা যেন শুধু পুরুষদের। পুরুষরা এসে...আইভি বলল—একটা গর্ত পেলেই হল, না?

—ওরকমই ব্যাপার। মেয়েদের অনুভূতি রইল কি না-রইল...বাইরেটা তো কেটেছে শুধু। ভেতরে তো জরায়ু আছে। সন্তান তো হবে। ছেলেদের খতনা করা হয় যেন ছেলেরা আরও বেশি করে যৌন-সুখ পায়, আর মেয়েদের খতনা করা হয় যেন ওরা যৌন-সুখ না পায়। ওটা কম হলে সতী থাকবে। শুধু আফ্রিকান দেশগুলো নয়, অনেক আরব দেশেও এই প্রথা আছে। আরিদা বলছিল যখন ক্লিটোরাল অর্গ্যাজমের কথা বলো, আমি হাঁ করে থাকি। আমি কিছু বুঝতে পারি না। যখন ফিমেল গোনাড্‌স-এর ছবি দেখি, ওখানে ক্লিট দেখি, নিজেদের সঙ্গে মেলাতে পারি না। আমাদের ট্রাইবে ওটা নেই। সংবেদনের মূল কেন্দ্রটাই উপড়ে দেয় আমাদের....

আরিদা যখন এসব 'শেয়ার' করছিল তখন ম্যাডাম সুসানা বলছিল আমাদের দেশেও চেস্‌টিটি বেল্ট ছিল। ক্রুসেডের সময় পুরুষরা ওদের বউদের তালা বন্ধ করে যেত। একটা বেল্ট এমন বুদ্ধি করে তৈরি করা, যাতে মেয়েরা 'পি' করতে পারবে, ন্যাপকিনও প্লেস করতে পারবে, কিন্তু কোনওরকম পেনিট্রেশন সম্ভব হবে না। চাবিটা তো সঙ্গে করে নিয়ে যেত। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বেল্ট খুলত।

—যদি এমন হত, যুদ্ধেই মারাই গেল, তা হলে কী হত? তা হলে কী করে খোলা হত ওই চেস্‌টিটি বেল্ট? শ্রীলঙ্কার মেয়েটি জিগ্যেস করল।

কী আশ্চর্য, ওই প্রশ্নের পর একটা সমবেত হাসি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কেউ হাসল না। সুসানা বলল, যদি মেয়েটির আবার বিয়ে হত, তা হলে হয়তো ওর নতুন স্বামী বেল্টটা খোলার ব্যবস্থা করত।

—আর যদি মেয়েটা আর বিয়ে না-করতে চাইত?

এই প্রশ্নের উত্তর দিল না কেউ। সারা জীবন একটা চেস্‌টিটি বেল্ট কোমরে ধারণ করে থাকতে হত। কে জানে, ১৪০০-১৫০০ সালের ইয়োরোপ জানে, সুসানা জানে না।

ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা ছেলেটির নাম সারমুদা। আসলে সমুদ্র। সমুদ্রই সারমুদা হয়, যেমন সুকর্ন হয় সোয়েকর্ন। ও বলল—আমাদের দেশে দাঙ্গা হলেই মেয়েদের ওরকম একটা জিনিস পরে থাকতে হয়। প্রাণে মেরে দেবে, মরুক, কিন্তু রেপ করতে পারবে না।

ম্যাডাম রস এই বিষয়ের ওপর একটা ডকুমেন্টারি দেখিয়েছিলেন। মেয়েদের খতনা বিষয়ক। টিউনিশিয়ায় তোলা। তলায় সাবটাইটেল। একটি ৫/৬ বছরের মেয়ে, কোঁকড়া চুল, দোলনায় দুলছে। ওকে ঘরে ডেকে আনা হল। গলায় পরিয়ে দেওয়া হল মালা। হাতে তুলে দিল কিছু খাবার। একজন মহিলা এসেছেন। উনি বললেন এটা খুব পবিত্র কাজ। এই কাজ করে ওর খুব পুণ্য হচ্ছে। ব্যাগ থেকে বার করলেন দু'টো ছুরি, একটা কাঁচি, আর একটা ব্লেড। মহিলা বলছেন—মেয়েরা খুব সেক্সি হয়। মেয়েদের সতীত্ব রাখতে গেলে এই কাজ করাটা জরুরি। উনি হাসছেন। মেয়েটিকে স্নান করানো হল। ছুরি, কাঁচিগুলো গরম জলে ফোটানো হল। তারপর মেয়েটিকে শোয়ানো হল বিছানায়। একজন গাঁওবুড়ো মোষের শিং-এর ভেঁপু বাজাচ্ছে। ড্রাম বাজছে। মেয়েটির দু'টো হাত বেঁধে দেওয়া হল দু'টো কাঠের সঙ্গে। দু'টো পা ফাঁক করে পা দু'টোও বাঁধা হল। মহিলার হাতের মুঠোয় একটা ছুরি। বেগুনের ভিতরের পোকা খুবলে ফেলার মতো ছুরির ডগা দিয়ে একটা ছোট মাংসপুঞ্জকে খুবলানো হতে লাগল, ছুরির ডগা রক্তে লাল। মেয়েটির চিৎকার শোনা যাচ্ছে বাজনা উপচিয়ে। কাঁচি দিয়ে আবার কিছুটা কাটা হল। ওটা লেবিয়া মাইনোরা। রক্ত। বাজনা। দ্রিমদ্রিম। পোঁপোর পোঁ। এবার সেলাই। সেলাইটা এমন যে মাসান্তিক স্রাবরক্ত চুঁইয়ে পড়বে ঠিক। যখন বিয়ে হবে, মেয়েটার, সমর্থ লিঙ্গের চাপে সেলাই ছিঁড়ে যাবে, আবার রক্তপাত হবে নব-রক্তপাত, সেই রক্ত শুষে নেবে কাপড়, ওই রক্তমাখা কাপড়খানা হল পবিত্র সতীত্ব-চিহ্ন। বিয়ের পর তিনরাত পাত্র থাকে পাত্রীর বাড়ি। তারপর পাত্র নিয়ে যায় পাত্রীকে। সেই শুভ শোভাযাত্রায় সবার সামনে একটা লাঠির মাথায় উড়তে থাকে রক্তমাখা ন্যাকড়া, গর্বচিহ্ন। উড়তে থাকে সতীগর্ব।

আধুনিক সময়ের এরকম নববিবাহিত বরযাত্রা দেখানো হল, একটা গাড়ির সামনে উড়ছে একটা লাল পতাকা।

এটা এখন রিচুয়াল, বুঝলে আইভি, আমার মনে হয় ওদের দেশের দশকর্মা ভাণ্ডারে বিয়ের দ্রব্যসামগ্রীর লিস্টিতে এরকম সতী-চিহ্নের লাল কাপড়ও পাওয়া যায়। বিয়ের পর এটা দরকার। লিস্টিতে থাকে। যারা ফাটিয়ে রক্ত বের করে না, ওদেরও একটা লাল কাপড় লাগে। নিয়ম। প্রথা। তাই না? কোথায় আইভি, ও কখন ফুটে গিয়েছে। এইসব ফুটোস্কোপের গল্পে ও বোর হয়ে চলে গিয়েছে।

হোটেলে শুয়ে আছে অনিকেত। একা ঘরে। বাইরে আলোয় সাজানো ব্যাংকক। বিরাট-বিরাট বাড়ি, হোটেল, ফোয়ারা নাচে। চকচকে রাস্তায় পিছলে যায় দামি গাড়ি, গিজগিজ করছে ট্যুরিস্ট। সারা শহর জুড়ে মাসাজ ক্লিনিক, শহরে বেশ কয়েকটা এলাকায় গণিকালয়। সেই প্রথম দিনেই তো এয়ারপোর্টে দেখেছিল বিমান ধরার ফাঁকে কেউ কাচের ঘরে শুয়ে আছে। তার গায়ে চড়ে মাসাজ করছে কন্যাসমা। ব্যাংকক থেকে সোজা হাইওয়ে চলে গিয়েছে পাটায়া। সমুদ্রের ধারে পর-পর নারী-বিপণি। গো গো বার, সওনা বাথ, হাইড অ্যান্ড সিক, ইরোটিক শো...।

ও কমলদা, মানে কমল গুপ্তকেই বলে অনিকেত। জানেন, কী বলব, একটা রিভ্লভিং

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা, শরীরে দু'ফালি কাপড়, ওদের গলায় ঝোলানো নম্বর। প্ল্যাটফর্মটা ঘুরে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে। আপনি মেয়ে পছন্দ করে কাউন্টারে গিয়ে ওই নম্বরটা বলুন শুধু, একটা লোক চলে আসবে আপনার সঙ্গে, আপনার মাথায় একটা ছোট্ট ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে, সিল্কের ছাতা, ছাতার ওপরে ওই নম্বরটা লেখা, ওই নম্বরটা দেখে ঘুরন্ত প্ল্যাটফর্ম থেকে লাফিয়ে নেমে এসে আপনাকে জড়িয়ে ধরে হামি খাবে। এবার আপনি ওকে নিয়ে চলে যেতে পারেন সমুদ্রের ধারে। মেয়েগুলোর বয়স পনেরো থেকে কুড়ির মধ্যে।

কমল গুপ্ত বলল—ইস রে, একদম আমার মেয়ের বয়সি। ধ্যার...।

সাত লক্ষ মেয়ে এই কাজ করছে সারা থাইল্যান্ডে। কেউ বলে ন'লক্ষ। দশ লক্ষও হতে পারে। তাদের মধ্যে ত্রিশ শতাংশের বয়স ১৮-র কম। ব্যাংকক-এ প্রতি আড়াই মিনিটে একটা করে প্লেন এসে, পর্যটক বমি করে দিচ্ছে। যত পর্যটক আসছে তার দশ শতাংশ আসছে শুধুই যৌনতার জন্য, তিরিশ শতাংশ শুধু যৌনতার জন্য না এলেও কিছু-না-কিছু টাকা সেক্স ট্যুরিজ্‌ম-কে দেয়। সাত বা আট লক্ষ নারীদেহ বিক্রয়কারিণীর সঙ্গে আছে কুড়ি-পঁচিশ হাজার পুরুষ। পুরুষদের কি দেহ-বিক্রয়কারিণী বলা যায়? বেশ্যাদের 'যৌনকর্মী' বলতে চায় না অনিকেত, কথাটা ক্রমশ চালু হচ্ছে। কর্ম বা কাজ হল সেটাই, যার সঙ্গে উৎপাদন যুক্ত। কাজের একটা লক্ষ্য থাকে। দেহ বিক্রির মধ্যে কি ওসব আছে? উৎপাদন নেই, ধ্বংস আছে। দেহ পসারিণীরা বলেন, আজ এতজনকে বসালাম। বলেন না—আজ এতজনের সঙ্গে কাজ করলাম। কোনও নারীই ভালবাসাহীন চিত হওয়ার মধ্যে, যান্ত্রিক পা ফাঁক করার মধ্যে আনন্দ পেতে পারেন না। অনিকেত তাই 'যৌনকর্মী' শব্দটাকে না-ব্যবহার করারই চেষ্টা করে। কিন্তু পুরুষদের বেলায় কী বলবে? পুরুষদের বারবণিতা, বারবধূ, রূপজীবিনী, এসব তো বলা যায় না। কী বলবে? দেহ-বিক্রয়কারী? এটাও মানায় না। মহা ফ্যাচাং। 'যৌনকর্মী' বলাটাই সোজা। এরা সবাই মিলে, সব যৌনকর্মী মিলে তাঁদের স্বদেশকে প্রতিদিন আশি-লক্ষ ডলার উপহার দিচ্ছেন। তাঁদের আকর্ষণে হোটেলগুলো রোজগার করছে, রোজগার করছে স্পিডবোট, প্যারাসুটওলা, মদের দোকান, অটো রিকশা, ট্যাক্সি, কন্ডোমের দোকান, ওষুধের দোকান, লুব্রিক্যান্ট জেলি, যৌনরোগের চিকিৎসক, এড্‌স-এর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। সারা ব্যাংকক, পাটায়া, ফুকেট-এ আলো ঝলকায় থাই-বালিকাদের যৌবনের বিনিময়ে। ওই যে একটা ফোয়ারা নাচছে, ওর জন্য হয়তো লেগেছে সাড়ে দশ হাজার জোড়া স্তন, হোটেলের লাউঞ্জের ঝুলন্ত দ্যুতিময় ঝাড়বাতিটার জন্য তিরিশ হাজার অনিচ্ছুক চুম্বন, আর সারা শহরের রাস্তার পাশের ফুটন্ত ফুলগুলোর জন্য? পাটায়া কিংবা ব্যাংকক-ফুকেট হাইওয়েগুলোর জন্য?

ওয়াকার স্ট্রিট দিয়ে হেঁটেছিল একদিন। নানারকম বিপণি। পেঁপে-আনারস-আঙুরের পাশের দোকানেই বিক্রি হচ্ছে রবারের পুংলিঙ্গ। ডিল্‌ডো। টুলে বসে আছে পেশিবহুল চেহারার পুরুষ। ওদের খদ্দের হল নারী। শুনুন না কমলদা, ও, না, আপনি তো চলে গিয়েছেন, তা হলে দেবাশিস, তুই শোন—তুই রিলে করে যা—পাটায়ার রাস্তা থেকে সরাসরি বলছেন দেবাশিস বসু—যে-গলায় রবীন্দ্রনাথের কৃষিচিন্তা কিংবা আধ্যাত্মিক ভারতের মানববাদ বলিস—সেই গলায় বলে যা—কালো গেঞ্জি পরে খদ্দেরের আশায় বসে আছে কয়েকটা জিগোলো। দু'জন মোটা মতন...না বল—স্থূলকায়া মধ্যবয়সি শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা এলেন।

একজন ছেলেটির মাথায় টুসকি মারল, 'টুসকি' বলবি না কী বলবি তুই ভেবে নে। ছেলেটি বলল, ওয়েলকাম ম্যাম। ওরা ভিতরে চলে গেল। পাশে গো-গো শো। এরপরই ফানি কানি শো। চল্লিশ ভাট টিকিট। ঢুকে গেলাম। একটা কিশোরী মেয়ে একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে আছে। গায়ে বসন নেই, শুধু পায়ে কালো জুতো। ইজি-চেয়ারের দুই হাতলে দুই পা। দুই পায়ের মাঝখানে কিছু হাতড়াচ্ছে একটি লোক। ভিতরে কিছু পেল। বের করে আনছে। বের করে আনছে ব্লেডের মালা। সারি-সারি ব্লেড। ব্লেডের গায়ে রক্ত। আলো পড়ছে রক্ত-মাখানো ব্লেডে। মিউজিক। দেবাশিস—তুই মুখ বিকৃত করলি? তোর তো মেয়ে নেই, তবুও।

তা হলে শুক্লা, তুমিই শোনো। কত ফল। কী টাটকা! নানারকমের ফল। ছোট ছোট কাঁঠাল, ওরা বলে কুরিয়েন। বাক্সভর্তি স্ট্রবেরি। থোকা-থোকা আঙুর। বেদানা, নিটোল কমলালেবু, আপেল। অনেক আপেল।

আপেলে কামড় বসাব? প্ররোচনা দিচ্ছে ইভ।

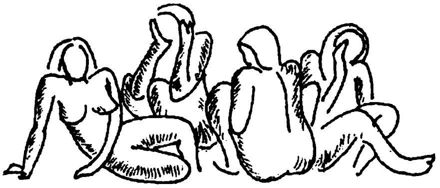

গত সত্তরের দশকে থাইল্যান্ডের কোনও রাজা নাকি বলেছিলেন, আমাদের দেশের কী সুন্দর প্রকৃতি! কত ফুল, কত ফল। তিনটে এস। সি, সান অ্যান্ড স্যান্ড। আমি আর একটা এস জুড়ে দিতে চাই। 'সাশে'। 'সাশে' হল সুগন্ধে ভরপুর নরম পুঁটুলি। আমাদের মেয়েরা। আমাদের মেয়েরাও তো দেশের কাজে লাগতেই পারে।

মেয়েরা কাজে লেগেছে। দেশের কাজে। সেক্স-ট্যুরিজমের অন্তর্গত মানুষগুলো বলে থাকে 'আমরা সার্ভিস সেক্টরে কাজ করি।'

আর এই 'সার্ভিস সেক্টর'-এ কাজ করা নব্বই শতাংশ মেয়েদের বয়স ১৫ থেকে ৩০-এর মধ্যে।

হোটেলের রিসেপ্‌শনিস্ট-কে জিগ্যেস করেছিল অনিকেত। একটা প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না, তোমাদের সার্ভিস সেক্টরে যারা কাজ করে, তারা তো সবাই কমবয়সি। বয়স বেড়ে গেলে ওরা কোথায় যায়?

—সো মেনি প্লেসেস, লাইক মি। মেয়েটার মুখে মোহিনী হাসি।

—কত বছর সার্ভিস সেক্টরে কাজ করেছিলে?

—ফিপ্‌তিন ইয়ার্‌স।

—তোমার স্পেশালিটি কী ছিল?

—এস্‌স্পিসিয়ালিতি? হি-হি। আই স্তারটেড অ্যাজ গো-গো ড্যান্সার অ্যাট দ্য এজ অফ ফোরতিন। আই ওয়াজ দেন লাইক দিস। আঙুলগুলো সাজিয়ে যে-মুদ্রা তৈরি করল, ছোট কোনও ফল বোঝাতে এরকম মুদ্রা ব্যবহার করা হয়।

—দেন সামডেজ প্যারাসেলিং পার্টনার।

সমুদ্রের ধারে প্যারাসুটের মতো ওড়ার ব্যবস্থা আছে। সাধারণত একজনই ওড়ে। কখনও দু'জন। কোনও পুরুষ-ট্যুরিস্ট একটি সঙ্গিনী ভাড়া নিতেই পারে। দু'জনে একসঙ্গে ওড়ে, সঙ্গিনীকে তখন থ্রিল্‌ড হতে হয়, ভয় পেতে হয়, সঙ্গীটিকে জড়িয়ে ধরতে হয়।

—দেন অ্যাট মাসাজ পার্লার। এই ব্যাপারে আর কিছু জিগ্যেস করেনি অনিকেত। হতে পারে কোনও ইরোটিক পার্লারে ওর স্পেশালাইজেশন ছিল সাকিং। হতেও পারে।

—ফাইনালি হিয়ার। নাও আই অ্যাম থার্টি ফোর। অ্যাম আই নট স্তিল লুকিং গুড? হি-হি।

—খুব সুন্দরী লাগছে। খুব। ম্যাডাম আর ইউ ম্যারেড দেন?

—ইয়েস। আই অ্যাম। গট টু দটার্‌স। হি-হি।

—ওরাও কি একদিন সার্ভিস সেক্টরে...

গম্ভীর হয়ে গেল মুখটা। হঠাৎ মেঘ। নো-নো-নো। দে আর নট লাইক মি। নাও আই হ্যাভ মানি টু গেট দেম এডুকেশন। মাই ফাদার ওয়াজ আ পুয়োর ম্যান ইউ নো, ফার্মার অফ কুলিয়ং ডিস্ট্রিক্ট। ইট ইজ ইন নর্থ পার্ট। দিস পার্ট ইজ পুয়োর এরিয়া। অ্যান্ড গার্লস অফ দোজ এরিয়া আর কামিং দাউন টু দিস সিটিজ। হোয়াট টু ডু ম্যান? আই ওয়াজ দ্য এলডেস্ট...

একটা ব্যাপার বোঝা গেল, এখানে সামাজিক ভাবে যৌন-ব্যবসা নিয়ে খুব একটা 'ট্যাবু' নেই। এখানে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবশেষ কিছুটা রয়ে গিয়েছে। সংসারের প্রতি মেয়েরা দায়িত্বশীল। সর্বত্রই মেয়েদের কাজ করতে দেখা যায়। এদেশের যৌন-ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মেয়েদের বিয়ে-টিয়ে নিয়ে খুব একটা অসুবিধা হয় না। ৮-১০-১২ বছর এই কাজ করে, টাকা-পয়সা জমায় ওরা। যৌবন-বেচা পয়সায় সংসারের জন্য আমেরিকান কোম্পানির ফ্রিজ, জাপানি কোম্পানির টিভি, ডাচ কোম্পানির ফ্রিজ, কোরিয়ান কোম্পানির ওয়াশিং মেশিন কেনা হয়। অসুবিধা হয় যদি আগে সন্তান হয়ে যায়। রাষ্ট্র সেই সন্তানের কোনও দায়িত্ব নেয় না। তবে সন্তান হয় না বললেই চলে—বিশেষ কোনও কারণ ছাড়া।

আশির দশকে থাইল্যান্ডের একজন মন্ত্রীকে 'মি. কন্ডোম' নামে ডাকা হত। ওঁর আসল নাম মিকেল বীরবৈদ্য। উনি ছিলেন এড্‌স অ্যান্ড ট্যুরিজম মিনিস্টার। লক্ষ্য করার বিষয়, এড্‌স-এর সঙ্গে ট্যুরিজম-কে ক্লাব করে দেওয়া হয়েছে। উনি খুব করিৎকর্মা মন্ত্রী ছিলেন। ওঁর চেষ্টাতেই কন্ডোম আবশ্যিক হয়ে গিয়েছে। ওঁর চেষ্টাতেই কন্ডোম কেনার মেশিন বসেছে রাস্তায়। পয়সা দিলেই বেরিয়ে আসবে। এড্‌স অনেকটাই বাগে আনা গিয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানও। সেক্স-পুলিশ রয়েছে বিশেষ এলাকায়। ওরা ডলার খরচ করতে আসা সেক্স-ট্যুরিস্টদের সাহায্য করে।

অথচ থাইল্যান্ডে বেশ্যাবৃত্তি আইনসম্মত নয়। অথচ রাষ্ট্রীয় মদতেই চলে এই ব্যবসা।

আমেরিকাতেও বেশ্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ। কিন্তু ওখানেও তো চলছে। ইউরোপের অনেক দেশেই নিষিদ্ধ। আরব দেশগুলোতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। পাকিস্তানেও। কিছু ইসলামিক দেশে 'জেনা'-র শাস্তি খুব বেশি। 'জেনা' মানে যে কোনও বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক। 'জেনা'-র শাস্তি চাবুক, কারাবাস থেকে 'মৃত্যু পর্যন্ত পাথর ছুড়ে মারা' অবধি হতে পারে। এবং 'জেনা'-তে মেয়েরাই দোষী সাব্যস্ত হয়। পুরুষরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রেহাই পেয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ওদেশে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বেশ্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ ছিল। সমাজতন্ত্রের পতনের পর বছরে দশ লক্ষ নারী রাশিয়া, বেলারুশ,

ইউক্রেন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, আলবেনিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপ, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জাপানে পাড়ি দিচ্ছে। হয়তো থাইল্যান্ডেও রয়েছে ওরা কেউ-কেউ। আগে এক ধরনের নিরাপত্তা ছিল, চাকরি না-পেলে বেকার-ভাতা ছিল, অসুস্থ হলে চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ ছিল, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। এখন শুধু ক্ষুধা আছে। এই ক্ষুধা যৌন-ক্ষুধা নয়। পেটের খিদে। সন্তানের মুখে খাদ্য তুলে দেওয়ার মানবিক তাড়না। আর ওদের যা জীবনযাপন, তাতে শাকভাত, হাঁড়িয়ায় চলে না। শীতের দেশ। শরীর গরম রাখার জন্য একটু ভারী পোশাক-পরিচ্ছদ চাই, একটু মাখন চাই, মাংস চাই। স্নান কম করা হয় বলে পারফিউম চাই। তাই পথে নামা।

আমাদের দেশে বেশ্যাবৃত্তি বেআইনিও নয়, আইন-সম্মতও নয়। একটা অস্পষ্ট আইন আছে : পিটা। প্রিভেনশন অফ ইমমর‍্যাল ট্রাফিকিং অ্যাক্ট। এই আইনে রাস্তায় বা উন্মুক্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে খরিদ্দার ধরা বেআইনি। কিন্তু ঘরের ভিতরে টাকা পয়সার বিনিময়ে কেউ দেহ বিক্রি করলে আইনের কিছু বলার নেই। দেহ বিক্রির জন্য কাউকে 'প্রোভোক' করা বেআইনি। দেহ-ব্যবসা করার জন্য কাউকে প্ররোচিত করাও বেআইনি।

অথচ নিত্যনতুন মেয়েরা আসছে এ লাইনে। পুলিশ মর্জিমতো 'পিটা' আইনের ভয় দেখিয়ে মাঝেমধ্যে তোলা আদায় করে। মাঝে-মধ্যে 'রেড' হয় এবং অসৎ উদ্দেশ্যে আনা নাবালিকা উদ্ধার হয়ে হোম-এ যায়। দেহ বিক্রিকে আইনের স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলছে অনেকেই।

সেদিন, ১৯৯৭-এর নভেম্বরে, সল্টলেকে যৌনকর্মীদের জাতীয় সম্মেলন করল 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি'। সারা ভারতবর্ষ, এমনকী ভারতের বাইরে থেকেও, 'যৌনকর্মী'-রা এল। 'যৌনকর্মী' নাম-টাও বোধহয় ওরাই চালু করেছিল। 'বেশ্যা' শব্দটা তো সংস্কৃত 'বিশ' থেকে আসা। যার অর্থ জনসাধারণ। জনসাধারণের ভোগ্যা। পরে 'গণিকা' শব্দটি এল। যারা কুল ত্যাগ করে এসব পাড়ায় গিয়েছে, ওরা নিশ্চয়ই 'কুলটা'। আর 'কুলটা' যদি হয়, 'পতিতা'-ও বটে। 'ঝি' যদিও 'দুহিতা' শব্দ থেকে আসা, মানে মেয়ে, কিন্তু খারাপ শোনায় বলে 'কাজের মেয়ে' বলতে থাকলাম ভদ্দরলোকরা। তেমনই 'গণিকা' বা 'বেশ্যা'-দের জন্য একটা নতুন শব্দ দরকার হয়ে পড়ল। তাই 'যৌনকর্মী' শব্দটির আবিষ্কার। এই শব্দটা যেন ওদের জীবিকাটাকে আরও বেশি করে চিনিয়ে দিচ্ছে। একজন 'যৌনকর্মী'-ই বলেছিল—নতুন নাম বেরিয়েছে যৌনকর্মী। এটা বেশি লজ্জার। বেশ্যার চেয়েও খারাপ। যৌনটা তো লুকিয়ে রাখি। (ও যৌন এবং যোনি এক করে দিয়েছে) কাপড়ের তলায় থাকে। ওটা নিয়ে বড়াই করে বলার কী আছে?

আসলে গণিকা ও বারবণিতা-র মতো যৌনকর্মী শব্দটাও একটা জীবিকাকে বর্ণনা করেছে। ভাবা হয়েছিল, বেশ্যা বা বারবণিতা-র পরিবর্তে 'যৌনকর্মী' বললে ওই বৃত্তিজীবী মেয়েদের নামের সঙ্গে যুক্ত কলঙ্ক-জ্বালায় কিছুটা ক্রিম ঘষে দেওয়া হবে। আর কর্মী কথাটা জুড়ে রাখলে 'শ্রমিক' মর্যাদার জন্য দবি তোলা যাবে। 'সেক্স ওয়ার্কার' শব্দের এই অনুবাদের সময় মনে হয়নি, এই নতুন নাম আসলে শিকল পরানোর ছল।

তো, যৌনকর্মীদের সম্মেলনে দাবি তোলা হল যৌনকর্ম একটা কাজ, এই কাজের আইনি স্বীকৃতি চাই। যৌনকর্মীদের শ্রমিকের অধিকার দিতে হবে। শ্রমিকের স্বীকৃতি মানে? ঘোষণা করতে হবে, ওরাও শ্রমিক। তা হলে কী হবে? বোনাস পাবে? ১ মে-তে ছুটি পাবে? ট্রেড

ইউনিয়ন করতে পারবে? ট্রেড লাইসেন্স-ও। বাঃ? কোম্পানিগুলোর নাম কী হবে? শান্তি সার্ভিস, প্লেজার সেন্টার, অর্গ্যাজম পয়েন্ট? না কি আয়া সাপ্লাই সেন্টারের মতো সোজাসুজি? ওরা শ্রমিক, সুতরাং শ্রমিক সাপ্লাইয়ের জন্যও এজেন্সি চাই। ধরা যাক, নব্য উদ্যোগপতি ব্যাংক লোন নিতে এসেছেন।

—কোম্পানির নাম?

—সেক্স ওয়ার্কার এক্সপোর্টার সাপ্লায়ার অ্যান্ড স্টকিস্ট।

—বাঃ ব্যালান্স শিট তো ভালই। খুব ভাল প্রফিট। টাকাটা নিয়ে কী করবেন?

—এসি বসাব, আর রাশিয়া থেকে কিছু এস ডব্লিউ আনাব।

নামটা পাল্টালেই হয়? অনিকেত এই মাঝরাত্তিরে বিড়বিড় করে। ঘুম আসছে না।

অক্টারলনি মনুমেন্টের নাম পাল্টে, মাথা লাল রং করে, 'শহিদ মিনার' নাম রাখলেও—লোকে ওটাকে মনুমেন্ট-ই বলে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখলেই কি ওর লোচন পদ্মের মতো হয়?

আইনের স্বীকৃতি না-থাকলে—একটা অপরাধ-বোধ থেকে যায়। বেশ্যাবৃত্তি উঠিয়ে দেওয়া যাবে না, জোর করে ওঠানো উচিতও নয়। যারা এই কাজ করে, তারা নিজের ইচ্ছেয় করে না। তাদের বাধ্য-হয়ে-গ্রহণ-করা চোখের জল জড়ানো বৃত্তিটিকে মহান বললে মনুষ্যত্বের অপমান করা হয় না? তা হলে পুরুষ দেহজীবীরা? ওরাও কি চোখের জল ফেলতে-ফেলতে এই পেশায় আসে? এখানেই একটা প্রশ্ন-চিহ্ন নাচে। যাদের আমরা পুরুষদেহজীবী বলছি, আসলে তো তারাও নারী। জিগোলোদের কথা আলাদা। ওরাও যৌনতা বিক্রি করে। বিক্রি করে নিজেদের লিঙ্গপ্রহার। ওদের খদ্দের নারী। কিন্তু অন্যান্য পুরুষ যারা, তারা তো আপাত-পুরুষ, মনে-মনে নারী। নিজেদের নারীই ভাবে। নারীর যোনি আছে, ওদের নেই, ওদের ওটা নেই বলে ওদের কষ্ট। কিন্তু ওদের পায়ু আছে। 'হায়' শব্দটা কোত্থেকে টুকরো কাগজের মতো উড়তে-উড়তে কাঁপতে-কাঁপতে জুড়ে গেল 'পায়ু আছে'-র পর। তাই ওটাই ব্যবহার করে। এভাবেই ওরা যৌনতা পেতে চায়।

নারী-বেশ্যরা যান্ত্রিক সঙ্গমের মধ্যে, একাধিক পুরুষের ক্লেদ-রসের মধ্যে আনন্দ পেতে পারে না, তারা পয়সা-দেওয়া পুরুষটিকে দেহ বিছিয়ে দেয়, কিন্তু মন থেকে এই বৃত্তিটি গ্রহণ করে না।

যে সামান্য কয়েকটি দেশে যৌনব্যবসা আইনি, ওখানে যৌনকর্মীরা খুব সুখে আছে—এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক ওইসব দেশের জীবনযাত্রার মান এমনিতেই ভাল, ওদের দেহ-পসারিনীরাও স্বভাবতই ভাল আয় করে। কিন্তু সুখ? ওটা দু'অক্ষরের রহস্যময় তান্ত্রিক শব্দ। 'সুখ' নামের শুকপাখিটাকে নিয়ে কত দার্শনিক বার্তা, কত গান-কবিতা, তবে লরির পেছনে যেটা লেখা থাকে, তার চেয়ে বড় কথা বুদ্ধ-প্লেটো-সক্রেটিস-যুধিষ্ঠিররা বলতে পারেন না : 'সুখ স্বপনে শান্তি শ্মশানে।'

ছেলেটা বলেছিল ওর মায়ের নাম শান্তি। বলেছিল তেহট্ট বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে ভালুকবাটি বললেই ভ্যানগাড়ি নিয়ে যাবে। ওর মা-কে ওর দু'টো ছবি আর একটা সাদা পাথরের থালা পৌঁছে দিতে পারবে কি না। অনিকেত রাজি হয়নি। সম্ভব হবে না। ছেলেটার নাম চন্দন।

এখানে সবাই চ্যাংডেন বলে ডাকে।

একটা শো দেখতে গিয়েছিল অনিকেত। ওখানে অনেকগুলো ইভেন্ট ছিল। যেমন নগ্ন নারীর স্কিপিং লাফানো, নর-নারীর কুস্তিযুদ্ধ এইসব ছিল। এরপর একটা বামন এল। ডোয়ার্ফ। পৃথুল। থপথপ করতে-করতে বামনটা এল, মাথায় মুকুট। জরির পোশাক, বুকে ক্লিপ দিয়ে আঁটা নানা অভিজ্ঞান। গলায় মেডেল। বামনটা কোনও কথা বলে না। ক্যাটওয়াক করে। পিছনে কমেন্ট্রিতে বলে, হি ইজ অ্যান ইনদিয়ান গাই, নেম ইজ চ্যাংদেন। হি ইজ উইনার অফ সো মেনি সেক্স কনতেস্ত। হি ইজ এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন অফ কক্ অলিম্পিয়াদ। ছেলেটা 'বাও' করে। দর্শকদের সামনে মাথা ঝোঁকায়। তারপর একে-একে পোশাকগুলো খুলতে থাকে। যখন সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়, তখন দেখা যায় ওর লিঙ্গটা হাঁটু ছাড়িয়েছে। এমনিতে ওর উচ্চতা তিন ফুটেরও কম, কিন্তু লিঙ্গটি প্রায় একফুট। চ্যাংদেন লিঙ্গটিকে বাজনার তালে-তালে নাচাতে থাকে। এরপর তিন-চারটি যুবতী আসে স্টেজে। ওই লিঙ্গ দর্শনে উত্তেজিত হয়। ঝপাঝপ পোশাক খুলতে থাকে। এবার চ্যাংদেনের লিঙ্গ-প্রতিক্রিয়া হয়। লিঙ্গগাত্রে আলো পড়ে। ঝিন ঝিনা ঝিকা। ঝিকা ঝিকা ঝিন। যুবতী-হাতগুলো এগিয়ে আসে। সবাই লিঙ্গটি ধরতে চায়, চ্যাংদেন-কে কোলে তুলে নিতে চায় কেউ, কেউ ছিনিয়ে নেয়। লিঙ্গটি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়। অকস্মাৎ ওটি খুলে আসে, দীর্ঘ, অথচ ফাঁপা। কৃত্রিম। চন্দনের উরুসন্ধিতে, হয়তো বা দুর্বল লিঙ্গটির ওপর ওই তেজি পিভিসি লিঙ্গ পরানো ছিল। একটি যুবতীর মুষ্ঠিতে ওই বিচ্ছিন্ন পিভিসি, আর চন্দন দু'হাতের চেটো চোখের সামনে রেখে ভ্যাঁ করে কেঁদে দেয়। আর তখন স্যাক্সোফোনের আর্তনাদ ছাপিয়ে হইহই, সিটি, তালি, হাসি।

অনিকেতের খুব কৌতূহল হয়েছিল। পরে, চেষ্টা করে ছেলেটার সঙ্গে দেখা করেছিল। তখনই জানল ছেলেটার নাম চন্দন। বাঙালী সার্কাসে জোকারি করত। সেই সার্কাস দল খেলা দেখাতে গিয়েছিল বাংলাদেশে। ওখান থেকেই ওকে তুলে নেয় এই কোম্পানি। বহুদিন দেশে যায় না। ওদের গ্রামের এক মাস্টারমশাইয়ের নামে মাঝে-মধ্যে টাকা পাঠায়। ওর মা কেমন আছে জানে না। যদি দেশে যেতে পারে, ওর মা-কে একটা মোবাইল কিনে দেবে। তখন মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।

ছেলেটা বলছিল, ভাল নেই ও। এত খেতে হয় যে ভাল লাগে না। গাদা-গাদা আলু, মাখন, চিজ, জেলি, ওকে মোটা থাকতে হবে। বেঁটে তো ভগবানই করে দিয়েছে, সেই সঙ্গে মোটা, থলথলে, ভুঁড়িওয়ালা থাকতে হবে, নইলে মানুষ হাসবে না।

অনিকেত চন্দনকে জিগ্যেস করেছিল—তুমি ওই রবার-দণ্ডটা নিয়ে এত কায়দা কী করে করো? মেয়েগুলো আসার পরই কী করে ওটা বেড়ে যায়? কী করে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে ওপরে উঠে যায়? ছেলেটা বলেছিল—সুতো স্যর, কালো সুতো। হাতে থাকে, টানতে হয়। কায়দা আছে, তবে না লোক হাসবে, আমার মায়ের মুখের হাসি দেখতে চাই স্যর, ম্যানেজারের ফোন নম্বরটা নিয়ে যান স্যর, মায়ের মুখের একটা হাসি-হাসি ছবি পাঠাতে পারবেন স্যর?

এত ঝামেলা ও নেয়নি। একেই হাজার ঝামেলা। ও বলেছিল, সরি চন্দন, আমার সময় হবে না ভাই। চলে এসেছিল। পালিয়ে এসেছিল। অনিকেত ভাবে এসব অভিজ্ঞতা রগরগে ভাবে লিখে, 'রাতপরিদের দেশে' কিংবা 'হরেক মজার রাত' জাতীয় নামে ছাপতে পারলে কেমন হয়? প্রকাশক পেতেও অসুবিধে হবে না হয়তো। বিক্রিও হবে। কিন্তু ...এই আর্ত শব্দ-

মালা কি রগরগে করে লেখা যায়? যোনি-গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা রক্তমাখা ব্লেডেও কি সুড়সুড়ি থাকে? ওটা সত্যিকারের রক্ত নয় নিশ্চয়ই, রক্তরঙে রঞ্জিত। ও কিছু না। কিন্তু রগরগে হবে? এই ঘটনাটাও কি রাখা যায়? ইরোটিক শো দেখতে এসেছিল যে বোরখাপরা মহিলাটি, সে বমি করছিল একটা লেহন-দৃশ্যে, মুখের কালো ঢাকনা সরিয়ে, ওটাও কি লেখা যায়? রগরগে হবে?

নাথিং ইজ অ্যাবনরমাল ইন সেক্স। তোমার কাছে কোনও-কোনও অ্যাক্ট আন-ডিজায়ারেব্‌ল হতে পারে, বাট ইউ ক্যান্ট সে অ্যাবনরমাল। একজন রিসোর্স পার্সন বলেছিলেন ওই ওয়ার্কশপ-এ। হেট্রো, বাই অর হোমো-সেক্সুয়ালিটি, নাথিং ইজ অ্যাবনরমাল। নো অ্যাক্ট ইজ অ্যাবনরমাল—তাই বলছেন? পিডোফাইলরা-ও তা হলে ঠিক আছে? যারা শিশুদের ধর্ষণ করে?

—ও ইয়েস। একজন পিডোফাইলের 'পয়েন্ট অফ ভিউ' থেকে ও এটাকে অ্যাবনরমালিটি মনে করছে না কিন্তু, সোসাইটি মনে করছে এটা ঠিক নয়।

—কেন? একজন পিডোফাইল তো জানে ওর এই ধরনের কাজটা সমাজ অনুমোদন করে না। ও জানে শিশুটির সম্মতি নিয়ে ও এসব করছে না। তা ছাড়া শিশুর সম্মতি কথাটা ভেগ্‌। ১৮ বছর বয়সের আগে নিজস্ব সম্মতি দেওয়ার অধিকার তৈরি হয় না। অনিকেত নিজের যুক্তি রাখে।

—আমরা বলছি না পিডোফিলিক অ্যাক্ট ভাল।

—তা হলে যারা স্যাডিস্ট, যারা যৌনসঙ্গীকে উৎপীড়ন না-করতে পারলে তৃপ্তি পায় না, ওরাও নরমাল?

রিসোর্স পার্সন মাথা চুলকে বলেছিলেন—অ্যাবনরমাল বলি কী করে, যখন বহু মানুষ এভাবেই তৃপ্তি পায়। যারা ম্যাসোসিস্ট, একটু মারধোর না-খেলে তৃপ্তি পায় না, ওরা যদি স্যাডিস্ট-এর সঙ্গে কাপ্‌ল করে, ঠিক আছে। বোথ আর হ্যাপি...।

রিসোর্স পার্সন এবার বললেন—অফ কোর্স, মানুষের মধ্যে কিছু-কিছু আনকমন বিহেভিয়ার থাকেই টুওয়ার্ডস সেক্স, যেমন—কিছু স্কোপোফিলিক আছে, যারা শুধু দেখতেই বেশি ভালবাসে, জেরান্‌টোফিলিক আছে, যাদের বৃদ্ধ বা বৃদ্ধায় মতি, এমনকী নেক্রোফিলিক-ও কেউ-কেউ থাকতে পারে, যাদের মৃত মানুষের সঙ্গে...এরা যৌনসঙ্গীর কাছ থেকে কোনও সাড়া পেতে চায় না, মনে করে যৌনসঙ্গী তার সম্পূর্ণ করায়ত্ত। যৌনসঙ্গী যদি পুতুলের মতো, মড়ার মতো থাকে—তাতেই ওরা সন্তুষ্ট...।

বাকিটা শুনতে পারছিল না। কান ভোঁ-ভোঁ করছিল। অনিকেত কি তবে নেক্রোফিলিক? পুতুলের সঙ্গে?...তা কেন হবে? ওটা তো বাধ্যবাধকতা। তবে তা হলে এরকম কেউ-কেউ আছে, যারা পুতুলই চায় পুরো অধিকার করবে বলে?

ওরা বেশ কিছু প্রোগ্রাম দেখিয়েছিল—যা নাকি কিশোর-কিশোরীদের জন্য তৈরি। ওরা চাইছে, ওদের দেখানো মডেলেই এইসব দেশগুলোতে যৌনশিক্ষা হোক। অনিকেত বুঝল ফোর্ড ফাউন্ডেশন প্রচুর টাকা ঢালছে যৌনশিক্ষার ব্যাপারে। যৌনশিক্ষার নামে বিভিন্নভাবে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে টাকা আদায় সম্ভব। 'বিবিসি' ওদের হয়েই কাজ করছে এবং উৎসাহ দিচ্ছে। অনিকেতের মনে হল, প্রকৃতপক্ষে ফোর্ড ফাউন্ডেশন যেটা চাইছে সেটা যৌনশিক্ষা নয়, বরং যৌনকার্যের প্রসার।

বিবিসি প্রশ্ন করেছিল অনিকেতকে—কেন তুমি তোমার প্রোগ্রামে সেক্সুয়াল অ্যাক্ট রাখোনি? কন্ডোম রাখোনি? 'জি' পয়েন্ট রাখোনি, কন্ট্রাসেপ্‌শন রাখোনি...?

অনিকেত বলার চেষ্টা করেছিল—আমরা তো কিশোর-কিশোরীদের যৌনকর্ম শেখানোর জন্য অনুষ্ঠানটা করিনি, বরং ভুল ধারণাগুলো ভেঙে একটা সুস্থ মন, সেক্সুয়াল এথিক্‌স...

—এথিক্‌স ইন সেক্স? হেসে উঠেছিল ব্রিটেন-কাম্পুচিয়া-ফিলিপিন্‌স-থাইল্যান্ড। একজন বললেন, এখানেও আন্‌টাচেবিলিটি?

অনিকেতের মনে হচ্ছিল—একটা বাজার খোলার চেষ্টা চলছে যেন। ভারতের জীবনযাত্রায় যৌন বিধিনিষেধ থাকার জন্য যৌন-পণ্যসামগ্রীর বিক্রি খুব একটা বেশি নয়। ভাইব্রেটর, ক্লিটোরিস-উত্তেজক টুনা, প্রেশার রিং, ডিল্‌ডো—এসবের বাজার নেই। ওরা চাইছে বাজার বাড়ুক। যৌনতা বাড়ুক। বিশ্বায়নের সঙ্গে সেক্সায়ন হোক। যৌনতা অবাধ হলে তবেই তো অবাধ যৌনতার কুফলের কথা বলে কন্ডোমের বিক্রি বাড়ানো যায়। এই রবার বিদেশ থেকে আসে। নিয়ন্ত্রণ করে কয়েকটি দেশ। যৌনরোগের ওষুধ, এড্‌স-এর ওষুধ—সবই তো ওদের নিয়ন্ত্রণে।

ওরা বলল মি. অনিকেত, আপনার ওই প্রোগ্রাম অর্থোডক্স প্রোগ্রাম। সেফ পিরিয়ড-এর কথাই বলেননি, এটার ডিফেন্সে কোনও কথাই হতে পারে না।

অনিকেত চুপ করে শুনে গেল। বুঝল, সেক্সুয়াল 'এথিক্‌স' শব্দটা থাইল্যান্ড-কাম্পুচিয়া-ফিলিপিন্‌স-এ প্রায় ন্যাপকিন হয়ে গিয়েছে।

এদেশেও তো কিশোর-কিশোরীদের পত্রিকায় কভার স্টোরি হচ্ছে 'পটাও এবং ফোটাও'। ফিরে গেলে স্টেশন ডিরেক্টর জিগ্যেস করবেন, কেমন হল?

কী বলবে অনিকেত? বলবে—আমরা ব্যর্থ স্যর, আমরা ওই প্রোগ্রামটা করে অ্যাফ্রোডিজিয়াক ক্রিম-জেলি-টুনা-ডিল্‌ডোর বিক্রিটা বাড়াতে পারিনি। আমরা ব্যর্থ।

অফিসে গিয়েই শুনল অনিকেতের ট্রান্সফার অর্ডার এসেছে। এটা রুটিন। কলকাতায় পাঁচ বছর কাটিয়ে দিয়েছে, সুতরাং এবার বাইরে যেতে হবে। গ্যাংটকে পোস্টিং এসেছে।

ডিরেক্টরের ঘরে গেল।

—কেমন ঘুরলেন? কেমন হল?

যা বলবে ভেবেছিল, বলা গেল না। অনেক কথা বলতে হয়, মানে গল্প করতে হয়, ডিরেক্টরের সঙ্গে একজন প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভের গল্প করার সম্পর্ক নয়। 'সম্পর্ক' ভাল থাকলেও নয়। অনিকেত বলল—ভালই, আমরা যে সিনপ্‌সিস নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটা শুনে 'বিবিসি' বলল 'অর্থোডক্স প্রোগ্রাম'।

—যাকগে। খাওয়াদাওয়া ঠিকঠাক ছিল?

—ওসব ঠিক ছিল। তবে আমার ট্রান্সফারটা...। আমি তো একটা সিরিয়াল শুরু করেছি, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে, লাস্ট এপিসোডে একজন ব্লাইন্ড হকারকে এনেছিলাম, যে বৈঠকখানা থেকে ধূপকাঠি কিনে ট্রেনে বিক্রি করে। ও বঙ্গবাসী কলেজের গন্ধ পায়, গন্ধে-গন্ধে মশলাপট্টি পার হয়ে ধূপকাঠির বাজারে আসে, তারপর শিয়ালদা। ও বলেছে, সাউথ স্টেশনেরও আলাদা গন্ধ আছে। ও বোঝে। খুব একটা ইন্টারেস্টিং জায়গায় পৌঁছেছে সিরিয়ালটা। এরপর...

—সে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি চলে গেলেও সিরিয়াল বন্ধ হবে না।

—কিন্তু আমি যে খুব ঝামেলায়...

—ওসব বলে লাভ নেই। ট্রান্সফার তো আপনার নতুন হচ্ছে না, আপনি জানেন, যেতে হবেই। আমাকেও ট্রান্সফারে যেতে হবে সামনের বছরই। আপনি যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন করেন, কিছুটা সময় চান, আমি দিল্লিতে পাঠিয়ে দিতে পারি।

অনিকেত বলল—তা হলে স্যর, একটু ভাল করে লিখে দেবেন, আর গ্যাংটক নয়, কাছাকাছি কোথাও দিন, গ্যাংটক থেকে কলকাতা আসা তো খুব মুশকিল...

'স্যর' বলে ফেলল। অন্য সময় তো সুমিতদাই বলে।

—আপনার কলকাতা আসার কী দরকার? মিসেস-কে নিয়ে চলে যান। আপনি তো ঝাড়া হাত-পা। আপনার কীসের অসুবিধে?

'ঝাড় হাত-পা' কথাটা শুনতে খুব নিরীহ, আসলে ওর ব্যথার জায়গাটাতেই তো সুচ ফোটানো 'ঝাড়া হাত-পা' মানে তুমি তো নিঃসন্তান। ছেলে-মেয়ের এডুকেশনের ঝামেলা নেই...

—না স্যর, অসুবিধে আছে।

—কী অসুবিধে বলুন?

অনিকেত চুপ করে থাকে।

সত্যিই তো ওর কী অসুবিধে? এর আগের বার তো কটক আর রাঁচিতে ট্রান্সফার হয়েছিল, শুক্লা সঙ্গে গিয়েছিল। এবারও বললে চলে যাবে। বদলি মানে অন্য পরিবেশ, অন্য আবহাওয়া, একটু অন্যরকম খাওয়াদাওয়া। শুক্লার তো ভালই লাগে।

তা হলে বদলির কথা শুনে অনিকেতের মনখারাপ হয়ে গেল কেন? কেন কাছাকাছি কোনও স্টেশন চাইছে?

দুলালের জন্য? ওর একটা খারাপ রোগ হয়েছে, ব্যাপারটা দেখভাল করছে। একটা দায়িত্ব রয়ে গিয়েছে...।

শালা, নক্‌শা দিচ্ছো? দুলাল? অনিকেতের ভিতর থেকেই কেউ বলে উঠল।

—না না শুধু দুলাল নয়, এই যে একটা অচেনা জগতের দরজা খুলে কিছুটা এগিয়েছে, আরও ঢুকতে চেষ্টা করছে, এ সময়ে ট্রান্সফার মানে তো হেঁচড়ে টেনে নিয়ে আসা...। এই যে পরিমল বা পরি, ওকে তো একটু এক্সকাভেট করতে হবে।

এই যে বাবা, পথে এসো। পরি? না পরির মা? কাকে এক্সকাভেট করতে চাও তুমি? মনে হচ্ছে শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের ওই লেডিজ ব্যাগ। বড় ব্যাগের মধ্যে একটা মেজো ব্যাগ, মেজো ব্যাগের মধ্যে একটা সেজো ব্যাগ, সেজো ব্যাগের মধ্যে একটা ছোট ব্যাগ, ওখানে টাকা-পয়সা। মানে আসল জিনিস।

কী বলা যায়? কেন কাছাকাছি পোস্টিং? ইউরেকা।

অনিকেত বলল—শুক্লার খুব হাঁপানি হচ্ছে আজকাল। ঠান্ডা জায়গা একদম সইবে না। সেবার দার্জিলিঙে খুব ঝামেলায় পড়েছিলাম।

ডিরেক্টর বললেন—তা হলে শিলিগুড়ি চলে যান। ওখানে ঠান্ডা নেই।

অনিকেত বলল—চাইবাসা-টা দেখুন না। ওখানে যদি খালি থাকে...।

—চাইবাসা কেন চাইছেন?

কেন চাইবাসার কথা মনে এল? শক্তি-সন্দীপনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে বলে? রোরো নামের নদীটার জন্য? না কি সাত ঘণ্টার পথ বলে?

অনিকেত বলে ফেলল—ট্রাইবাল এরিয়া কিনা? একটু নতুন অভিজ্ঞতা হতেই পারে।

বস বললেন, অ্যাপ্লিকেশন-টা দিন, আমি দেখছি।

অনিকেত বুঝে গেল হাতে বড়জোর তিন মাস সময়। এর মধ্যে কত কাজ। কম্পিউটারটা জানে না, গাড়ি চালানোটা জানে না। চাইবাসা চলে গেলে কয়েক বছরের জন্য গ্যারেজ। কম্পিউটারটা শিখতে হবে। আর একটা কাজও তো আছে। সেটা শুধু ওর মনের ছোট ব্যাগটার মধ্যে রাখা আছে। ঠান্ডা মঞ্জুর শরীরে আগুন জ্বালানো। মঞ্জুই তো বলেছিল, তুই পারবি? অনিকেত তখন কথা বলেনি। কথা না-বলা মানে। নৈঃশব্দ্য। নৈঃশব্দ্যের ভিতরে অনেক কথা পোরা থাকে।

টেবিলে গেল। এখন প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ। প্রতিবন্ধী বলা হয় না। ফিজিকালি চ্যালেঞ্জ্‌ড। একটা চিঠি পেল। একজন স্পাইনাল কর্ড ভাঙা লোক চিঠি লিখেছেন—গাড়ি দুর্ঘটনায় আমার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে। আমার নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ অবশ। আমি হুইল-চেয়ারে চলাফেরা করি। ঘরে বসে টিউশনি করি ও পাঠ্যবই রচনা করি। আমি ক্যাথিটারের সাহায্যে প্রস্রাব করি। আমি কীভাবে আরও ভাল করে জীবন কাটাতে পারব?

পড়েই অনিকেতের চোখের সামনে কয়েকটা ছবি ভেসে এল। ধিক অনিকেত! ওই মেরুদণ্ড-প্রতিবন্ধী মানুষটির নিরাবরণা স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে লোকটার সামনে। লোকটির নিম্নাঙ্গ যেহেতু অবশ, কার্য-ক্ষমতাহীন, লোকটি তার হাত মুখ জিভ ইত্যাদির সাহায্যে চেষ্টা করে চলেছে। কিছুক্ষণ পর ওর স্ত্রী এক গ্লাস জল আর একটা পিকদানি ওর সামনে ধরে। লোকটা কুলকুচি করে পিকদানিতে ফ্যালে।

দ্যাখে, লোকটি ফোন করছে—ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু, আমার স্পাইন ভাঙা। আমার স্পাইনের এগারো নম্বর হাড় ভেঙে গেছে। এর তলা থেকে সব অকেজো। আমার বয়স বত্রিশ ডাক্তারবাবু, স্কুটার চালিয়ে বউয়ের জন্য আইসক্রিম নিয়ে আসছিলাম, জোরে চালাচ্ছিলাম যেন না গলে যায়। অ্যাক্সিডেন্ট হল। জননেন্দ্রিয়ে কোনও প্রাণ নেই। শুধু ঝুলে থাকে। কিন্তু টেস্টিস তো আছে। ওখানেই নাকি স্পার্ম থাকে। ডাক্তারবাবু, সন্তান চাইছে আমার স্ত্রী। এ কী মুশকিল বলুন, সন্তান পেতে গেলে জন্মদাতার লিঙ্গ দৃঢ় হতেই হবে? কেন? আমার তো রয়েছে, চেরাপুঞ্জি থেকে এক কণা মেঘ গোবি-সাহারার বুকে নয়, আমার শরীর থেকে এক কণা স্পার্ম নিয়ে অন্যভাবে কিছু করা যায় না ডাক্তারবাবু?

আইভি-কে ফোন করতে ইচ্ছে হল। আইভি মোবাইল ফোন নিয়েছে। ও এখন একটা সংস্থার সিকিউরিটি অফিসার। ও খুশি। ও একদিন ফোন করে বলেছিল—হেব্বি লাগছে

কাজটা। খাওয়াব। ইউনিফর্ম পরে অফিস যাচ্ছি। অনিকেত বলেছিল, ছেলেদের পোশাক পরতে ভাল লাগবেই তো। ও বলেছিল, প্যান্ট-শার্ট কি ছেলেদের বাপের নাকি? অনিকেত বলেছিল, হ্যাঁ, বাপেরই তো। আইভি বলল, তবে আমিও শালা ছেলে। শার্ট পরলে বুকের ফুলো-টুলোগুলো বোঝা যায় না। অনিকেতের মোবাইল নেই। একটা নিতে হবে। ধুস, এখন নিয়ে কী হবে? চলেই তো যাচ্ছে। আগে ল্যান্ড-ফোন থেকে মোবাইলে ফোন করা যেত না, এখন যায়। ফোন করল। বলল, আইভি, আমার ট্রান্সফার অর্ডার এসে গিয়েছে। বাইরে যেতে হবে।

আইভি কোথায় আহা-উহু করবে, উল্টে বলল, ফ্যান্টাস্টিক! কোথায়? যোধপুর যাও, কিংবা পোর্টব্লেয়ার। দারুণ হবে। আমি যাব। সবাই বলে যাব, কেউ যায় না। বলা যায় না, আইভি হাজিরও হয়ে যেতে পারে।

অনিকেতের ভিতরে-ভিতরে একটা প্রশ্ন ছিল, হঠাৎই উগরে দিল। জিগ্যেস করে ফেলল—আইভি, তুমি কি লেস্‌বি?

হা-হা করে হেসে উঠল আইভি। হাসি থামতে বলল—একটা ছাপ্পা না-মারলে তোমাদের চলছে না, না? শিডিউল কাস্ট, ওবিসি, হোমো, হেট্রো, লেস্‌বিয়ান...ছাপ্পা মারার খুব দরকার, না? এটুকু বলতে পারি—কোনও ব্যাটাছেলের পুতুপুতু বউ হয়ে জীবন কাটাতে পারব না আমি, ব্যস। হঠাৎ আজকে এ প্রশ্ন কেন অনিকেতদা?

অনিকেত বলল, হঠাৎ নয়, অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম, আজ জিগ্যেস করে ফেললাম।

আইভি বলল, বেশ করেছ। কিন্তু উত্তরটা পেলে না বলে ঠিক মতো তোমার মেন্টাল অর্গ্যাজ্‌ম হল না, তাই না? আমার কোনও মেয়ে-বন্ধু আছে কি না, তার সঙ্গে আমার কেমন গোপন কাজকর্ম হয়, এসব জানতে খুব ইচ্ছে করছিল, তাই না?

অনিকেত জবাব খুঁজে পায় না। ভিতরে-ভিতরে আমতা-আমতা করে। ওকে অস্বস্তি থেকে রেহাই দিল আইভি। বলল, আমার মনটা আজ হেবি বিন্দাস। একজনকে খুব ক্যালালাম। অফিসে ঢুকে সে তড়পাচ্ছিল। ঘাড় ধরে বার করে দিলাম। তোমাদের অফিসের কাজটা খুব নিরামিষ ছিল।

সেদিনই অফিস ছুটির পর একটা কম্পিউটার শেখার স্কুলে চলে গেল অনিকেত। 'বেসিক' শিখবে। প্রথম দিনেই ক্লাস। কাকে বলে র‍্যাম, ফাইল কী, ফাইল জমা করার ফোল্ডার, কী করে সেভ করতে হয়, এসব বলল। হাতের মুঠোতে যখন মাউস, মনে হচ্ছিল ওর হাতের মুঠোয় একটা অন্য বিশ্ব। তির-চিহ্নটাকে বাগে আনতে পারছিল না। বারবার পিছলে যাচ্ছিল। তির-চিহ্নটা একটা ফোল্ডারের গায়ে যদি ঠিকমতো লাগে, তারপর ক্লিক করলেই খুলে যায় ভিতরে পুরে রাখা তথ্য। মনে হচ্ছিল কত ফাইল ওর সামনে। ঠিকমতো ক্লিক করে খুলে নেওয়া যেত। মঞ্জু একটা ফাইল, আইভি একটা ফাইল, পরি একটা ফাইল, দুলাল একটা ফাইল...। পাটায়া-য় দেখে আসা চন্দন ও একটা এম্প্‌টি ফাইল। ওখানে কয়েক এমবি তথ্য ভরতে হবে। ওকে নিয়ে একটা গল্প লিখলে হয় না? চেষ্টা করবে না কি?

শুক্লাকে ট্রান্সফারের খবরটা দিল। শুনে শুক্লার প্রতিক্রিয়া—'বাড়িতে ভাল তালা নেই।'

—মানে?

—তালা লাগাতে হবে না? কেউ থাকব না, একটা তালার চাবি হারিয়ে ফেলেছিলে,

তালাওলাকে দিয়ে ডুপ্লিকেট বানাতে হল। ওটা বাতিল করে দেব। বাকিগুলো পুরনো। কয়েকটা ভাল দেখে তালা কিনে এনো।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—কোথায় হল? ভাল জায়গা নাও। যেমন গ্যাংটক, আলমোড়া, ডালহৌসি...।

অনিকেত চুপ। ওর তো গ্যাংটক-ই হয়েছিল, ও ওটাকে পাল্টানোর চেষ্টা করছে। শুক্লাকে বলল না কিছু।

—আবার ট্রান্সফারে যেতে হবে, তোমার কষ্ট হচ্ছে না? মনখারাপ হচ্ছে না শুক্লা?

শুক্লা বলল, কার জন্য মনখারাপ হবে? তোমার সঙ্গেই তো যাচ্ছি। গোপালও যাবে। ওকে তো নিয়েই যাব। রুমকি, মেজবউ, রামপ্রসাদ—ওরাও তো থাকবে। না কি ওদের পাব না ওখানে? গোপাল হল নাড়ুগোপাল, পেতলের। বাকিরা টিভি সিরিয়ালের চরিত্র। কলকাতারই মূলত। প্রাইভেট চ্যানেল তখন শুধু একটা-দু'টো।

অনিকেত বলল, ব্যস?

শুক্লা ঘাড়টায় মৃদু ঝাঁকুনি দিল। চুলগুলো নড়ে উঠল। এখনও এসব করলে ওকে বেশ লাগে। বলল, হ্যাঁ, ব্যসই তো। আমার কীসের বন্ধন? ছেলে-মেয়ের স্কুল, কলেজ, মাস্টার ওসব ঝামেলা সবার থাকে, আমার তো নেই। আর এখানে আমার কোনও এক্সট্রা-ম্যারিটাল সম্পর্কও নেই যে আঠা থাকবে। আমার কাছে কলকাতাও যা, ধাপধাড়া গোবিন্দপুরও তাই—।

তারাপদ সাঁতরার কাছে শুনেছিল—গোবিন্দপুর গ্রামটা ছিল শুঁড়ার কাছে। বেলেঘাটার শুঁড়া। গঙ্গা থেকে বিদ্যাধরী পর্যন্ত দু'টো সংযোগস্থল ছিল তখন। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য গঙ্গা থেকে বাণিজ্য-নৌকোগুলো বিদ্যাধরী-তে যেত। গোবিন্দপুর গ্রামটা ছিল খালের ধারে। ওখানে বাণিজ্য-তরীগুলোর থেকে মাশুল আদায় করা হত। মাশুলকে স্থানীয় ভাষায় বলা হত 'ধাপ'। সেই 'ধাপ' ধরা হত। কোথায়-কোথায় যে ইতিহাস ঘাপটি মেরে বসে থাকে নিজেরাই জানি না। ইতিহাস কথায়-কথায় থাকে। ক'দিন আগে মঞ্জুকে নিয়ে একটু ডায়মন্ডহারবার গিয়েছিল অনিকেত। সব কথা তো বলা হয়নি, বলা যায়ও না। মাঝে-মাঝে ওরা বেরয় টুকটাকে। তবে আগুন জ্বালানোর কাজটা হয়ে ওঠেনি।

তো, ওখানেই কোনও যাত্রী গল্প করতে-করতে অন্য একজনকে বলল—আরে, কথায় আছে না, জয়নগরের মোয়া, সাদুমের পোঁয়া।

সাদুম?

লোকটাকে একবার জিগ্যেস করল—যেটা বললেন ওটার মানে কী দাদা?

লোকটা হাসল। পাশের লোকটাও। বলল, এসব আমাদের ঘরের কথা। দেখে মনে হয় দু'টো লোকই ছোটখাটো কাজ করে।

—মানেটা কী?

—বলা যাবেনি। সবার সামনে বলা যায়? মঞ্জুর দিকে চোখটা ঘুরিয়ে নিল।

অনিকেতের ইচ্ছে হল—লোকটাকে আলাদা ডেকে নিয়ে জিগ্যেস করে। কিন্তু যেহেতু এই প্রবাদটা মানুষের পিছন-দিক সম্পর্কিত, তাই খুব বেশি উৎসাহ দেখাল না তখন।

একটু পরে লোকটা বিড়ি খেতে দরজার ধারে গেল। অনিকেতও গেল। বেশি উৎসাহ দেখালে ওরা ভাবতেই পারে অন্য কিছু, ভাবুক গে।

জিগ্যেস করল—'সাদুম' নামে সত্যি-সত্যি কোনও লোক আছে না কি?

লোকটা বলল, সাদুম কোনও লোক নয়। একটা গাঁয়ের নাম।

—গ্রাম? ওই গ্রাম নিয়ে একটা প্রবাদ তৈরি হয়ে গিয়েছে!

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, হুঁ। ও-গাঁয়ের লোকেদের খুব বদনাম।

অনিকেত জিগ্যেস করল, গ্রামটা কোথায়?

লোকটার চোখে কারুকার্য তৈরি হয়। ভ্রূ উঁচিয়ে অনিকেতের দিকে তাকায়। অনিকেত পড়তে পারে—কেন? ও গাঁয়ে যাবা না কি?

অনিকেত জিগ্যেস করল, ওই গাঁয়ের এরকম বদনামের পিছনে কোনও গল্প-কথা আছে?

লোকটা কী বুঝল কে জানে? বলল, গপ্পো-কথা নয়। এখনও ও-গাঁয়ের সঙ্গে কেউ বিয়ে-শাদির কাজ করতে চায় না।

—গাঁ-টা কোথায়?

লোকটা এবার সত্যিই জিগ্যেস করে, কেন, যাবেন না কি?

অনিকেত বলে, হ্যাঁ, পারলে যাব, একটু দেখে আসতাম। এরপর কৈফিয়ত দেওয়ার মতো বলে—আমি সাংবাদিক কিনা...

—সাংবাদিক? তাই বলি, আপনাদের সঙ্গে তো মন্ত্রীমণ্ডলীর দেখাশোনা হয়, একটু বলে দেবেন ছ্যার—আমাদের দিকে পানিতে খুব আর্ছেনিক, এই দেখুন নখের রং কালো, হাতের চামড়া কেমন হয়ে গিয়েছে, বারুইপুর ব্লক, আমাদের গাঁয়ের নাম গোমতা, আশপাশের নদাখালি, গজুলা—এসব অঞ্চলেও এমনধারা।

অনিকেত বলল—সে নাহয় হবে...বলেই চুপ করে গেল।

ওর মনে হল কোনটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট?—সাদুমের পোঁয়ার তত্ত্বতালাশ না জলের আর্সেনিক? 'সে না হয় হবে, আগে সাদুমের কথা বলো'—এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিল, বলতে পারল না। মিথ্যে কথা বলল। বলল, লিখে দেব।

কোন কাগজ ছ্যার?

বানিয়ে একটা বড় কাগজের নাম বলে দিল। তারপর জিগ্যেস করল, সাদুম কোথায়?

লোকটা বলল—ওই তো বাশুলডাঙা থেকে যেতে হয়। ডায়মন্ডহারবারের দু'স্টেশন আগে। গঙ্গার ধারে। এমনিই একটা বদনাম রয়ে গিয়েছে—ও কিছু নয়।

অনিকেত সেদিন মনে-মনে ভেবেছিল—একদিন আসবে। বাশুলডাঙা স্টেশনে নেমে ভ্যান-রিকশা করে যাবে ওই গ্রামে। যাওয়া আর হয়নি। গিয়ে কী দেখত? কয়েকটা চায়ের দোকান, উঠোনে ছাগল নাচছে, হাঁস প্যাঁকপ্যাঁক করছে পুকুরে, কুঁজো ইমাম সাহেব লুঙ্গি-গেঞ্জিতে, দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে। ইমাম সাহেবকে যদি জিগ্যেস করত—জয়নগরের মোয়ার মতো তোমাদের গ্রামের পোঁয়া প্রসিদ্ধ হল কেন? কী বলত কে জানে?

তখনই মনে এসেছিল গ্রামটার নাম 'সাদুম' কেন? কথাটা 'সাদোমি' থেকে আসেনি তো? 'সাদোমি' আরবি শব্দ হলেও এখন ইংরেজিতেও চলে এসেছে—সোডোমি। হোমো-সেক্সুয়ালিটি বোঝায়। আরবের দেশগুলোতে সাদোমি-র শাস্তি কোথাও চাবুক-মারা, কোথাও পাথর ছুড়তে-ছুড়তে মেরে ফেলা। 'সাদোম' ছিল আরবের একটা জনপদ। কোনও ভ্রাম্যমাণ বেদুইন জাতি ওই জনপদের বহু মহিলাকে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল। ওখানে তাই নারীর অভাব ঘটেছিল। তখন পুরুষরা পুরুষদের সঙ্গে যৌন-কাজে রত হত।

এটা আল্লাহ্‌তালার অভিপ্রায় নয়। ফলে তিনি 'সাদোম'-এর মানুষদের ওপর ভীষণ রেগে গেলেন। তাঁর গজবে আসমান থেকে পাথরবৃষ্টি হল। সাদোম শহরের মানুষরা মারা গেল। সাদোম ধ্বংস হয়ে গেল।

সাদোম-এর নাম থেকেই পুরুষের সমলিঙ্গের যৌনতাকেই 'সাদোমি' বলা হয়।

কোথায় আরব, আর কোথায় ডায়মন্ডহারবার। এই ডায়মন্ডহারবারের কাছে কোনও গ্রামের নাম সাদোম। 'সাদোম' নয় ঠিক—সাদুম। এই অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা বেশি। লোকটা তো আর্সেনিক বলেছিল জলে নয়, পানিতে। যে-গ্রামটার নাম সাদুম, আগে কি অন্য কোনও নাম ছিল? নদীর পাড়ের এই গ্রামটাতে কি ফিরিঙ্গি হানা হত? পর্তুগিজ দস্যুদের? কিংবা মগ হানা? কখনও কি ওই গ্রামের যুবতী মেয়েদের লুঠ করে নিয়ে যায় ওরা? তারপর কি ওরা সমলিঙ্গে যৌনতা করত? গ্রামটার নাম পাল্টে গেল, সাদোম হয়ে গেল? আর জন্ম নিল ওই প্রবাদবাক্যের?

এসবই কল্পনা। ওই যে মাটির তলায় পাওয়া বহুচেরা মায়ের মূর্তি—এরও তো ইতিহাস আছে। যদি কল্পনা করা যেত, সায়েন্স ফিক্‌শন তো হয়। ফিক্‌শনাল হিস্ট্রি হয় না?

এত কথা উঠে এল সেই ধাপধাড়া গোবিন্দপুর প্রসঙ্গে।

বেচারা শুক্লা। ওর কোনও সাধ-আহ্লাদ নেই। দামি শাড়িও কেনে না, লিপস্টিকও লাগায় না ঠোঁটে। বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি বলে বক্ষসৌন্দর্য এখনও বেশ ভাল। কিন্তু এরকম হলে কী হয়? ও যাবে স্বামীসেবা করতে। স্বামীর খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর রাখতে। জামা-গেঞ্জি-জাঙিয়া কেচে দেবে বলে।

শুক্লা বলল—তুমি যখন বাইরে ছিলে, দুলালের মা দু'দিন আসেনি। আজ সকালে এসেছিল। বলল, দুলালের খুব পেচ্ছাপের কষ্ট হচ্ছে।

—হোক গে।

বলল বটে, কিন্তু পরদিনই গেল দুলালের বাড়ি।

দেখল দুলাল চিত হয়ে শুয়ে আছে, লুঙ্গি খোলা, আর ওর দুই পায়ের ফাঁকে একটা শীর্ণ, দীন ভিখিরির মতো সরু নুনু। নুনু নয়, একটা সরু পাইপ। রবারের। একটা রবারের পাইপ ওর মূত্রছিদ্রের থেকে ইঞ্চিদুয়েক বেরিয়ে আছে। ওর লিঙ্গ, অণ্ডকোষ কিছু নেই। জমাট অন্ধকারে কিছু খাংলা চুল, আর লজ্জানত একটু পাইপ। আসলে ক্যাথিটার। দুলাল চোখ বুজে শুয়ে আছে। ওর মা বলল, পেটের ভিতরে সুপুরি ফুলেছে বলে পেচ্ছাব আটকে গিয়েছে। ডাক্তার এসে পাইপ লাগিয়ে দিয়েছে। আমাকে দেখিয়েও গিয়েছে। আমি মা হয়ে এখন ওর এসব জায়গায় হাত লাগাই। কিছুই তো নেই। আমার আর লজ্জা কী! লজ্জা হলেও-বা কী করব? আর কে আছে?

অনিকেত বুঝল—ওর প্রস্টেটে কিছু হয়েছে। দুলালেল দেহের বাইরে-ঝোলা পুরুষ অঙ্গগুলিকে ছাঁটা হয়েছে। কিন্তু পেটের ভিতরেও তো পুরুষ-অঙ্গ আছে—প্রস্টেট। ওটা তো থেকেই গিয়েছে। এখন শেষকালে ওটাতেই গন্ডগোল হল?

—একটু ওধার মুখে করে থাকো দাদাবাবু—দুলালের মা বলল।

দুলালের মা একটা কন্ডোম বার করেছে। মোড়কটা খুলবে। অনিকেত অন্যদিকে মুখ করে রইল। ওই রবারের পাইপটা কন্ডোমে ঢোকাবে। এরপর গার্ডার দিয়ে টাইট করবে। ফোঁটা-

ফোঁটা পেচ্ছাপ কন্ডোমে জড়ো হবে। কন্ডোমটা ফুলে গেলে আবার নতুন একটা।

কেই বা করাবে? আয়া রাখার টাকা নেই। তা ছাড়া আয়ারা করবেই বা কেন? এড্‌স না?

দুলালের মায়ের ক্যাথিটারে লজ্জা নেই, লজ্জাটা কন্ডোমে।

দুলালের মা বলল, হয়ে গিয়েছে।

অনিকেত দুলালের মা-কে দেখল। চোখে কোনও কাপড় বাঁধা নেই, তবু মনে হয় ও গান্ধারী।

দেখল দুলালের দু'পায়ের ফাঁকে লজ্জায় গুটিয়ে রয়েছে একটা ফ্যাকাশে কন্ডোম।

এই ক্যাথিটার কে পরিয়ে দিয়েছে? অনিকেত জিগ্যেস করল।

দুলালের মা উনুনের মুখের মতো মুখ করে তাকিয়ে রইল।

—'ক্যাথিটার' মানে হল রবারের পাইপ। ওটা কে পরাল?

—ডাগ্‌দার বাবু। গজা ডাগ্‌দার। একশো নিল।

এই অঞ্চলে গজা ডাক্তারের নাম-যশ আছে। পাস-করা ডাক্তার নন, বিপদে-আপদে উনিই ভরসা। নিশ্চয়ই গজেন্দ্র কিংবা গজানন টাইপের কোনও নাম আছে।

—আর কী বলল ডাক্তার?

দুলালের মা বলল, আলাসোনা করতে হবে।

বোধহয় আলট্রাসোনোগ্রাফ বোঝাতে চাইছে।

—লিখে দিয়েছে কিছু?

একটা কাগজ দেখাল। ডা. জি সি মণ্ডল। এমডি (এএম) তিনটে চেম্বার। মোবাইল ফোন নম্বরও আছে।

অনিকেতের এখনও নিজস্ব মোবাইল ফোন নেই।

—আর কী বলল ডাক্তার? দুলালকেই জিগ্যেস করল অনিকেত।

দুলাল লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলল—পটেস ফুলেছে বলল। বলার সময় একটা হাত দিয়ে একবার লজ্জাস্থান ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করল, যদিও একটা চাদরে ঢাকাই আছে। ঢাকার তলায় কেটে ফেলা লিঙ্গস্থানের মূত্রছিদ্রটা থেকে একটা সরু পাইপ বেরিয়েছে, কন্ডোমের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া, ওখানে জমা হচ্ছে পেচ্ছাপ, ভর্তি হয়ে গেলে দুলালের মা পাল্টে দেয়। এটা নিশ্চয়ই গরিবি ব্যবস্থা। ডা. মণ্ডলের 'এএম' ব্যবস্থা।

ডা. মণ্ডলের নামের পাশে 'এমডি' লেখা ছিল, তারপর ব্র্যাকেটে 'এএম'। মানে 'অল্টারনেটিভ মেডিসিন'।

১৯৮৭-'৮৮ থেকে অনেক অল্টারনেটিভ মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়েছে। কোনও-কোনও কলেজের ক্লাস হয় মনসামন্দিরে, কোথাও-কোথাও ক্লাস হত সন্ধের পর কোনও প্রাইমারি স্কুলের বারান্দায়। 'ইস্টার্ন জোনাল ইউনিভার্সিটি অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন'-এর অ্যাডমিশন সেন্টার-টা বারাসত রেল প্ল্যাটফর্ম-এর একটা হকার ইউনিয়নের ঘরে। 'সাউথ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন'-এর কর্পোরেট অফিসটা রয়েছে আমতলা বাজারের বকুল গাছের তলায় নকুলের চায়ের দোকানে। ওসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ছিলেন অভিজ্ঞ হাতুড়েরা। তাঁরা পেট খারাপ হলে থানকুনি পাতার রসে এন্ট্রোকুইনল-এর গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়ানোর বুদ্ধি দেন। ডায়াবেটিস সন্দেহ হলে গরিব

মানুষকে প্যাথোলজি টেস্ট করতে পরামর্শ দেওয়ার আগে রোগীর প্রস্রাবে শুকনো ইটের টুকরো ভিজিয়ে বাইরে রেখে লক্ষ করেন পিঁপড়ে ধরে কি না। ইঞ্জেকশন দেওয়া, সেলাই, ব্যান্ডেজ এসব অবশ্য ভালই শেখানো হয়। 'ঋতুবন্ধে পাঁচ মিনিটে আরোগ্য'—বিজ্ঞাপন দেয় যেসব নার্সিংহোম, সেখান থেকে অ্যাবোরশন মাস্টারদের ধরে আনা হয়। ওঁরা ওঁদের অভিজ্ঞতার ঝুলি উজাড় করে পড়ান। দাই-রা গাইনোকোলজি-র কিছু-কিছু ক্লাস যত্ন-সহকারে নিয়ে থাকেন, সঙ্গে কিছু অ্যাডিশনাল সাইকো-টেকনিক। যেমন কোনও মেয়ে গর্ভ-যন্ত্রণায় খুব চেঁচাচ্ছে। থামানোর উপায় হল—'এখন চ্যাঁচাচ্ছ কেন? করার সময় মনে ছিল না?' ধমকে বলতে হবে, এবং বলার সময় 'করা' ব্যাপারটাকে আঙুলের মুদ্রায় দেখিয়ে দিতে হবে। তা হলেই ওরা চিৎকার থামিয়ে দেয়। এরকম নানা ধরনের টিপ্‌স ওঁরা দিয়ে থাকেন।

আমাদের দেশ-গাঁয়ের হাসপাতালে পাস-করা ডাক্তাররা যেতে চান না। এঁরাই যা হোক করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা টিকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু খাজাইতলা তো এমন কিছু দূর নয়। ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ছ'সাত কিলোমিটার মাত্র দূর। বিরাট-বিরাট বেসরকারি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। ক্যাপসুল লিফ্‌ট-এ চড়ে মানুষজন ওসব হাসপাতালের ওপরে উঠে যায়, ওসব হাসপাতালের সামনে হলঘর থাকে, ওখানের মেঝে চকচকায়। দুলালের 'আলাসোনা'-টা ওরকম কোনও বড় জায়গায় গিয়ে করতে হবে। দেখতে হবে 'পটেস' কতটা ফুলেছে।

'পটেস' মানে হল প্রস্টেট। প্রস্টেট গ্ল্যান্ড। এটা নিতান্তই পুরুষের সম্পত্তি। মেয়েদের থাকে না। মূত্রথলি, মানে ব্লাডারের একটু তলায়, নারকোল কুল আকৃতির এই গ্ল্যান্ডটা গোপনে থাকে। বাইরে থেকে এই পুং-যৌনাঙ্গ দেখা যায় না। যারা 'ছিবড়ি' হয়, মানে ক্যাস্ট্রেশন করে, তারা দৃশ্যমান পুরুষ-যৌনাঙ্গই কেটে ফেলে। প্রস্টেট-টা রয়ে যায় ভিতরে। থেকে গিয়ে ভালই হয়, ক্ষতি করে না কোনও। প্রস্টেট-এর অনেক কাজ। শুক্র তৈরির কারখানা হল অণ্ডকোষ। ওখান থেকে শারীরিক বৈশিষ্ট্য বহন করার দায়িত্ব-সম্পন্ন জিনগুলো থাকছে ২৩টা ক্রোমোজোম-এ। শুক্রকীট ওই ২৩টা ক্রোমোজোম বহন করে। প্রস্টেট-এর মধ্যে তৈরি হয় শুক্রকীট-কে আশ্রয় দেওয়ার প্রশ্রয়-তরল। সামান্য ক্ষারীয়। এই প্রস্টেট তৈরি করে পিচ্ছিল তরল, যা কামভাবাচ্ছন্ন পুরুষের শিশ্ন ভেজায়। ক্যাঁচড়া বইয়ে যার নাম 'মদন জল'। যারা 'ছিবড়ি' হয়, যাদের দু'পায়ের ফাঁকে কিছু মায়াময় অন্ধকার শুধু, অন্ধকারের আহ্লাদ মাখিয়ে রাখে ত্রিকোণ ভূমিতে, ওখানে কর্তিত পুংলিঙ্গের স্মৃতিচিহ্নের মতো ছিদ্রমাত্র—সেই ছিদ্র দিয়েই তো প্রস্রাব আসে।

'ছিবড়ি'-মানুষেরা নারীর মতো বসে-বসে প্রস্রাব-কর্ম করতে পারে বলে মনে-মনে পুলকিত থাকে। আর ওই মায়াবী স্মৃতির মতো ছিদ্রটিও কখনও-কখনও সিক্ত হয়ে ওঠে কামনায়, যৌন-ইচ্ছায়। প্রস্টেট-ই তো পাঠায় সেই কামনার গূঢ় রস।

এই ছোট যন্ত্রটার আরও কত কাজ। প্রস্টাগ্লান্ডিন নামে একটা হরমোন তৈরি করে। তা ছাড়া এটা একটা অদ্ভুত ভাল্‌ব। মূত্রথলি থেকে মূত্রনালী প্রস্টেটের ভিতর দিয়েই আসে, তারপরে পেচ্ছাপের পাইপে যায়, পুরুষের ক্ষেত্রে এটা একইসঙ্গে জনন নল এবং মূত্র নল। দু'টো শুক্র থলি থেকেও দু'টো শুক্রনালী প্রস্টেট-এ এসেই থামে। তারপর প্রস্টেট-ই তো নিজের ছোট্ট শরীরে চাপ দিয়ে বীর্যক্ষেপণ করায়। প্রস্রাব এবং বীর্যক্ষেপণ দু'টো ব্যাপারই চালিত করে প্রস্টেট। মেয়েদের এই ঝামেলা নেই, কারণ ওদের মূত্রছিদ্র আলাদা।

প্রস্টেট নানা কারণে বড় হয়। কর্মক্ষমতা কমতে থাকলে বেড়ে যায়। ক্যানসার হলে হয়,

অন্য সংক্রমণেও হয়। প্রস্টেট-এ ক্যানসার হলে অনেক ক্ষেত্রে অণ্ডকোষ বাদ দেওয়া হয়। দেখা গিয়েছে অণ্ডকোষ যাদের নেই, তাদের প্রস্টেটে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। এসব অনিকেত জেনেছে এধার-ওধার পড়াশোনা করে।

তবে আর একটা চমকপ্রদ জিনিস জেনেছিল পবন, রঞ্জন এসব শিক্ষিত 'গে'-র সঙ্গে কথা বলে, এবং 'গে'-দের পত্রিকা পড়ে। সেটা হল Male G Point। 'G' পয়েন্ট-টা নাকি সুখের উৎস। যেসব 'গে' বটম, যারা পায়ুমেহন করিয়ে সুখ পায়, তাদের সুখের অনেকটাই দেয় 'জি' পয়েন্ট। পায়ুনালীর ভিতরের দেয়ালের ওধারে যেখানে প্রস্টেট গ্ল্যান্ড লেগেছে, সেখানে যদি ঘর্ষণ হয়, তখন নাকি প্রস্টেট-এ একটা জাগরণ হয়, একটা কম্পন হয়, 'গে'-দের কেউ-কেউ এই অনুভূতিকে বলে 'মিস্টর্গ'। মানে মিস্টিক অর্গ্যাজ্‌ম। কী করে পায়ুনালীর দেওয়ালের ওধারে প্রস্টেট-এর স্পর্শস্থল বোঝা যাবে, ওসব বইতে ছবি দিয়ে বর্ণনা করা আছে। ডাক্তারবাবুরাও তো প্রস্টেট বড় হয়েছে কি না বোঝেন পায়ুছিদ্রের ভিতরে আঙুল চালিয়েই।

অনিকেতের ওপরই দুলালের 'আলাসোনা' করার দায়িত্ব। ও না নিয়ে গেলে কে নিয়ে যাবে? দুলালের ওপর রাগ হয়। যত্তসব ঝামেলা পাকাচ্ছে। তার আগে গজা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

গজা ডাক্তারের টিনের চালার চেম্বারে টিনের সাইনবোর্ডে রেড ক্রস, লেখা ডা. জি সি মণ্ডল এমডি, এএম। জটিল রোগ ও গুপ্ত রোগের চিকিৎসা করা হয়, আয়া সরবরাহ করা হয়, ঋতুবন্ধের সমাধান করা হয়। চেম্বারের সামনে কয়েকটা সাইকেল ও ভ্যান, এবং একটা লাল ক্রস লাগানো মোটরসাইকেল। বোঝাই যাচ্ছে ওটা ডাক্তারবাবুর গাড়ি। কচুঝোপের পাশে একটা মাছি-ভনভন প্লাস্টিকের বালতি। ভিতরে দু'টো বেঞ্চি পাতা। ওখানে চার-পাঁচজন রোগী বসে আছে। সামনে বাঁশের বেড়ার পার্টিশন, দরজা নেই, পরদা। পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল অনিকেত। একটা রোগীর পেটে হাত দিয়ে টিপছেন গজা ডাক্তার, লাগছে?

—খুব লাগছে।

—লাগবেই তো। পেটের পাঁচ-নম্বর ট্যাঙ্কি তো জ্যাম। ক'দিন হাগো না?

—চার-পাঁচদিন।

—মাল খাও?

—আজ্ঞে।

—কতটা?

—বেশি না, এক পাঁইট।

—কী চাট খাও?

—এই দু'টি ছোলা, বেগুনি, ফুলুরি—

—ওসব চলবে না। পাকা বেল দিয়ে খাবে।

—বেল দিয়ে?

—খুব ভাল। খারাপ লাগবে না। ঢ্যাঁড়শ সেদ্ধ খাও। জল বেশি করে খাও। সকালে হাগতে বসার আগে আঙুলে করে পোঁয়ার ভিতরে নারকেল তেল দিয়ে দ্যাখো, যদি না হয়, পোঁয়ায় গ্লিসারিনের স্টিক ঢোকাতে হবে। বলি কত—বাংলা না-খেয়ে মাঝে-মধ্যে রাম খা। বাংলা মাল গু শুকিয়ে দেয়।

অনিকেতের দিকে তাকিয়ে গজা ডাক্তার কপাল কুঁচকে জিগ্যেস করলেন, কী চাই? ওকে দেখে সম্ভাব্য পেশেন্ট মনে হল না ডাক্তারবাবুর।

অনিকেত বলল—ওঁকে দেখে নিন, পরে আসছি। ডাক্তার বললেন—দেখা হয়ে গিয়েছে। আপনার কী চাই?

ডাক্তারের পিছনের দেওয়ালে একটা মা কালীর ছবি। ছবিতে মালা। একটা চামড়া-খোলা মানব শরীর। শরীরে ভিতরের যন্ত্রপাতি দেখা যাচ্ছে, সেই ছবিতেও মালা। এক বৃদ্ধের ছবি। ওঁর বাবা, না শিক্ষাগুরু, না কি দীক্ষাগুরু বোঝা যাচ্ছে না। সেই ছবিতেও মালা। আর একটা পোস্টার, 'আজ নগদ, কাল ধার। ধারের পায়ে নমস্কার।' ওটায় মালা পরানো নেই।

অনিকেত বলল—খাজাইতলায় দুলাল নামে এক পেশেন্ট-কে দেখেছিলেন? ওকে ক্যাথিটার পরিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন আল্ট্রাসোনোগ্রাফ করতে হবে, আমি ওখান থেকেই আসছি। দুলালের মা আমাদের বাড়িতে কাজ করে।

ডাক্তারবাবু রোগী দেখার টুল দেখিয়ে বললেন, বসুন, বসুন স্যর, এখানে বসুন। আপনি তো দেখছি মহাপুরুষ লোক মশাই।

ডাক্তারের পরনে নীল ফুল প্যান্ট, লাল ফুল শার্ট, গলায় মাফ্লার এবং স্টেথো।

উনি বলতে থাকলেন—আমি তো আল্ট্রাসোনো করতে লিখে এসেছি, জানি ওসব করা হবে না, মূত্রকৃচ্ছ হয়ে মরবে। তা, আপনি ওর তত্ত্বতালাশ করছেন না কি?

—ওই একটু। কী হয়েছে?

—হয়েছে তো অনেক কিছুই। প্রস্রাব বন্ধ। ওই যন্তরটা তো কেটে ফেলেছে, জানেন নিশ্চয়ই। ওই গর্তের ভিতরে কিছু মাংস গজালো কি না, কে জানে। আঙুল তো ওখানে ঠিক ঢোকে না, ব্যাটাছেলেদের ওই ছ্যাঁদাটা সরু কিনা, তবে ক্যাথিটার ঢোকানোর সময় বাধো-বাধো লাগছিল। এছাড়া সুপুরিটাও দেখলাম। মানে, প্রস্টেটের কথা বলছি। ওর বডিতে সুপুরির সাইজ বোঝাটা খুব সুবিধে। পেছনটা তো একেবারে হাঁ করা। নিশ্চয়ই বোঝেন কেন এমন হয়েছে। ওখানে আঙুল ঢুকিয়ে 'প্যালপিটিশন' করেই বুঝে গেলাম।

'প্যালপিটিশন' করলেন? অনিকেত অবাক হয়ে জিগ্যেস করে।

—না, মানে প্যালপেট, প্যালপেট। আঙুল চালিয়ে বুঝে গেলাম সুপুরি ফুলেছে। কেন বড় হয়েছে, কী বৃত্তান্ত—ওসব তো দেখতে গেলে খরচা আছে। আর কোন দিক সামলাবেন ওর? ওর সব ট্যাঙ্কিতেই গোলমাল। সাত জায়গায় ফুটো, তালি মারবেন ক'টা? মোক্ষম রোগটা তো বাঁধিয়ে এসেছে। ও গাঁয়ে তো আমার পেশেন্ট আছে, সব জানি। আমি বলেই ও-বাড়ি গিয়েছি। পাস করা ডাক্তার হলে যেত? তা ছাড়া নোপেনিস পেশেন্ট দেখিনি কিনা, তিরিশ বছর ডাক্তারি করছি..., কত কেস আসে, নোপেনিস কেস পাইনি।

—নোপেনিস মানে? কোন অসুখ?

—অসুখ বললে অসুখ, না বললে নয়...

—বুঝলাম না ডাক্তারবাবু।

—বুঝলেন না? নো-পেনিস, মানে 'ধন' কেটে ফেলা পেশেন্ট আর কী...। ডোন্ট মাইন্ড।

—তি-রি-শ বছর ডাক্তারি করছেন। যেটা পাস করেছেন, 'এমডি', ওরকম এমডি তো বেশিদিন বেরয়নি...

—ধুর! নিকুচি করেছে এমডি। ওসব পড়ে কি ডাক্তারি শেখা যায় নাকি? যাদব ডাক্তারের কম্পাউন্ডারি করেছি দশ বছর। হাতটা মাথায় ঠেকালেন, ছবিটার দিকে তাকালেন।

উনি তা হলে শিক্ষাগুরু। বোঝা গেল।

—উনি নিজে হাতে ধরে ইনঞ্জেকশন দেওয়া শিখিয়েছেন, প্রেশার মাপা, পেট-খসানো, ডুস দেওয়া, স্যালাইন চালানো—সব শিখিয়েছেন। পেট টিপে আমি বুঝতে পারি রোগীর কত নম্বর ট্যাঙ্কিতে ব্যাগড়বাই। যাকগে যাক, নিজের কথা কইব না। সবাই জানে গজা ডাক্তার কেমন ডাক্তার। তবে আপনার পেশেন্টের হ্যাপা আছে। গায়ে চাক-চাক দাগ, সারা শরীরে মটর ফুলেছে। মানে, লিম্ফ গ্ল্যান্ডগুলোর কথা বলছি। ওর পেছনে টাকা ঢেলে কোনও লাভ নেই।

গজা ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে অনিকেত ফাঁপরে পড়ল। ওর কী করা উচিত? যাকগে, মরুকগে, বলে হাত ধুয়ে নেবে? না কি কোনও বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে?

আকাশবাণী-তে কাজের সূত্রে বেশ কিছু ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় আছে অনিকেতের। ওঁরা স্বাস্থ্য-টাস্থ্য নিয়ে প্রোগ্রাম করেন। কেউ-কেউ আবার জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত, কেউ-কেউ জনস্বাস্থ্য আন্দোলন করেন। এরকম একজন ডাক্তার—সমীর প্রধান। সমীর প্রধানের ভিতরে একটা গবেষক মনও রয়েছে। মূলত মেডিসিনের ডাক্তার, গবেষণাপত্রও নাকি লেখেন। সমীরবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করল অনিকেত। সব জানাল। সমীরবাবু বললেন—হাসপাতালে নিয়ে আসুন।

ট্যাক্সিতে দুলালের সঙ্গে দুলালের মা-ও ছিল। এই সুযোগে দুলালকে অনিকেত জিগ্যেস করল—তুমি মাজারে এসেছিলে কেন? বলবে বলেছিলে, কিন্তু বলোনি।

—পুলিশকে বলেছি।

—পুলিশকে বললে কী হবে? আমি জানতে চাইছি; আমাকে বলো। আমাকে বলছ না কেন?

—আপনার শুনে কী হবে?

—তোমার মা-কে বলেছ?

দুলালের মা বলল—আমাকেও কয়নি কো, শুধোলে গুম মেরে থাকে।

অনিকেত বলল—তোমাকে ঘটনাটা বলতেই হবে। তোমার জন্য এত করছি দেখছ না? এসব তো জানা দরকার আমার।

দুলাল বলল—বউটা একবারের জন্যও এল না...।

অনিকেত বলল—বউ আসবে কেন? ওর সঙ্গে কি যোগাযোগ আছে নাকি? ও কি জানে তোমার কী হয়েছে? দুলাল মাথা নাড়ে।

—তুমি কি তোমার বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে?

দুলাল মাথা নাড়ে।

—তবে?

আমি গুরুমার কাছে শুনেছিলাম, খাজাইবাবা খুব জাগ্রত। বললে কথা শোনে। আমাদের গুরুমা একসময় এদিকে বাঁধাই খাটতে আসত। তাই শুনে বাবাকে মনস্কামনা জানাতে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম এরপর বাড়ি যাব। বাড়িতেই থাকব। বউটাকে খবর দেব, যদি আসে। কিছু 'ঝলকি' নিয়ে এসেছিলাম, ভেবেছিলাম দিয়ে দেব।

'ঝলকি' মানে পয়সা-কড়ি, তাই তো? বউটাকে কী করে খবর দেবে? তুমি তো জানো না বললে ও কোথায় আছে।

—সন্তোষ জানে। সন্তোষ তো আসত। আমি তো ভাল পারতাম না, সন্তোষ ধুরে যেত। আমি কিছু বলতাম না। সন্তোষ আমার মহাজন। বলেছিলাম না?

—সন্তোষ কোথায় আছে?

ঠোঁট উল্টে দিল দুলাল।

—তা হলে যে বললে সন্তোষের খোঁজ করবে?

—সেটা খোঁজ-খবর নিয়ে জানা যেত।

মা বলেছিল, তুই চলে যাওয়ার পর সন্তোষ তো আসতই, সে বাদে আরও দু-তিনজন আসত। বেশি আসত একটা কেলে মতো। ওদের নাম জানি না।

দুলাল বলল, সন্তোষকে জিগ্যেস করলে সব জানা যেত।

অনিকেত প্রায় বলতে যাচ্ছিল—'তা হলে সন্তোষকে খুঁজে বার করি, ওর ডেরা কোথায়? কোথায় থাকে বলো'—বলবে নিজের মনের ভেবে 'প্লে'-টা টিপেই আচমকা 'স্টপ' বোতাম টিপে দিল। আবার কেন ঝামেলায় জড়াতে যাচ্ছে? অনেক হয়েছে, আর না। এরপর রি-ওয়াইন্ড-টা টিপে বলল—মাজারে তোমাকে ছুরি মেরেছিল কেন?

দুলাল বলল—সঙ্গে টাকা ছিল কিনা। শায়ায় ক'টা পকট বানিয়ে রেখেছিলাম কিছু টাকা, বেলাউজের ভিতরে রেখেছিলাম কিছু। ওরা বলল, মালকড়ি দিয়ে দে। আমি বললাম কেন দেব, তিল-তিল করে জমিয়েছি। ওরা বলল—পালিয়ে এসেচিস, গুরুমা-র টাকা-পয়সা ঝেঁপেছিস—দিয়ে দে। আমুও দেব না, ওরা দু'জন ছিল, তখন কাড়াকাড়ি হচ্ছিল, হঠাৎ ছুরি মেরে দিল পেটে, আমার শায়াটা টেনে খুলে নিল। শায়ায় অনেকগুলো পকট ছিল। দশ-বিশ-পঞ্চাশ-একশো—টাকার নোট। পাঁচশোর কাগজ বেশি ছিল না। ওইজন্য বান্ডিল মোটা হয়ে গিয়েছিল। তাই জন্য ভাগ-ভাগ করে রেখেছিলাম। বিশ হাজারের ওপর। তিল-তিল করে জমিয়েছিলাম। সব 'ঝিটে' নিল।

—কখন নিল টাকাগুলো?

—তখন রাত হয়েছে, বেশি না, সাড়ে সাতটার মতো হবে। দুপুরের দিকে খোল থেকে বেরিয়েছিলাম কিনা...।

—যারা টাকাটা কেড়ে নিয়েছে ওদের চিনতে পেরেছিলে?

—ঠিক চিনতে পারিনি। পুলিশও বহুত শুধিয়েছিল, মিথ্যে বলব কেন?

—আন্দাজ করতে পারো দুলাল? সন্দেহ হয় না কাউকে?

—সন্দেহ একটু যাকে হয়, সে আমার 'পারিক'। সেই আমাকে এড্স রোগটা দান করেছে মনে হয়।

দুলাল ট্যাক্সির মাঝখানে বসেছিল। একদিকে অনিকেত, অন্যদিকে ওর মা। দুই পাশে দুই কলাগাছ, মধ্যিখানে মহারাজ।

দুলাল অনিকেতের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ওর বাট্টু-চিপটি সব চলত। বউ আছে ওর।

অনিকেত বলল, তুমি কি কেবল ওকেই বাট্টু দিতে নাকি?

—শেষের দিকে ওকেই একা। বেশি ধুরপট্টি করতাম না। ওরও আমার অসুখ হয়েছে বোধহয়। খুব শরীল খারাপ যাচ্ছে।

—সেটা তো তোমার থেকেও ওর হতে পারে। অনিকেত বলল।

—কে জানে? লোকটা তো এক লম্বরের ধুরবাজ ছিল, যেখানে খুশি ঝিন্নি ঝরাত। ওর তো খুব জ্বরজারি, পেটখারাপ হত।

—তোমার যে এই রোগ হয়েছে বুঝলে কী করে?

—এটা তো আপনারা বললেন। এখানে আসার পর।

—তোমার ওখানে শরীর খারাপ লাগত না?

—খুব। গায়ে মটরদানা বেরল। তারপর জ্বর। সবসময় ভোঁ-ভোঁ করত। তখন মনে হল, আর বাঁচব না। ভাবলাম, এখানে না-মরে দেশে গিয়েই মরি। বউ না পাই, মা আছে, ছেলেটা আছে। ছেলেটা আমার না সন্তোষের কে জানে, সন্তোষেরই হবে হয়তো, হোক গে। নিজের ভাবলেই নিজের।

মনের কথা যদুকে বলেছিলাম। যদু আমার 'পারিক'। লছমন যাদব। ওকে যদু বলে ডাকতাম। আর কাউকে বলিনি।

—ওকে কি বলেছিলে কবে তুমি খোল ছাড়ছ?

—না, যদুই বলেছিল এদিককার লীলা খতম করে ঘর ওয়াপস চল যাও। যদুই বলেছিল, ওই দিনটা শুভদিন। কী একটা ভাল তিথি আছে।

অনিকেত বলল, বুঝেছি। ও-ই তা হলে লোক পাঠিয়ে তোমার টাকা কেড়ে নিয়েছে। ওরা তোমাকে 'ফলো' করেছিল। দুলাল চুপ করে থাকে।

অনিকেত জিগ্যেস করল—পুলিশকে বলোনি যদুর কথা? পুলিশ তোমাকে জিগ্যেস করেনি কাউকে সন্দেহ করো কি না।

দুলাল মাথা নাড়ে। বলে, পুলিশকে বলেছি কিছু জানি না।

—কেন, পুলিশকে তোমার সন্দেহের কথা বললে না কেন?

—বললে কি টাকা ক'টা ফিরত পেতাম?

মাথা নাড়ে দুলাল।

বলে—বে-ফালতু গুরুমাকে হেনস্তা করত পুলিশ। যদুকে পেত না খুঁজে। আমিই কখনো ওর বাড়ি যাইনি। যদি পেত হেনস্তা করত, ওর থেকেও টাকা খেত, আমার টাকা আমি হার্গিস পেতাম না। পুলিশদের জানা আছে। আমাদের খোলে এসে মাসে-মাসে ঝলকি নিয়ে যেত। আমাদের গুরুমা আবার গাঁজাও রাখত কি না।

—গাঁজা? ওইসব ব্যবসাও করে না কি?

—গুরুমা করত। যদুই তো গুরুমার কাছে এস্টক রাখত। গব্বর, লালু, গুপে, ওরা মাঝে-মাঝে এসে নিয়ে যেত। দু'কিলো চার কিলো সবসময় থাকত। পুলিশ প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনিকো, পরে যখন বুঝল, তখন ঝলকি নিতে শুরু করল। যদুর সঙ্গে ওখানেই তো পরিচয় আমার। শেষ লাইনটার উচ্চারণ যেন 'শরম রাঙ্গা' টাইপের। যেন ওই বৈশাখে দেখা হল দু'জনায়। গান্ডু একটা...। অনিকেতও রেগে যায় দুলালের ওপর। যত্তসব ঝামেলা বাধিয়েছে।

কিন্তু এবার একটু খটকা লাগল। যদু, মানে লছমন যাদব যদি গাঁজার কারবারই করবে,

তবে—মাত্র দশ-বিশ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেবে? দুলাল কি সত্যি কথা বলছে?

অনিকেত জিগ্যেস করল কথাটা।

দুলাল বলল—না গো, যদু টাকা লেয়নি।

কী বলা যায় দুলালকে? কোন খিস্তি ঠিক? অনিকেত কপাল কুঁচকে ওর দিকে তাকায়। একটু জোর গলায় বলে—এই, ঠিক করে বলো, নকশা মারছ? এই বললে যদু নিয়েছে, এখন বলছ যদু লেয়নি কো? কী পেয়েছ আমাকে? অ্যাঁ?

দুলালের মা অনিকেতের হাঁটুতে হাত রেখে বলল—ওকে বোকোনি দাদাবাবু। রোগ-ব্যাধিতে কাতর, ওর কি মাথার ঠিক আছে?

অনিকেত বলল, তোমরাই তো আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছ। যদুকে সন্দেহ করছ, অথচ পুলিশকে বলছ না।

দুলাল বলল, আমি তো বলিনি দাদাবাবু যদুকে সন্দেহ করছি, খালি বলেছি যদু জানে আমি কবে পাইল্যে আসব। যদু হয়তো নেশার ঘোরে কাউকে বলেছিল, সে তার স্যাঙাৎ নে এসে টাকাগুলো ঝিরিয়ে নিয়েছে।

—একবার বললে 'ঝিরিয়ে' নিয়েছে, একবার বললে 'ঝিঁটে' নিয়েছে। 'ঝিরিয়ে' নেওয়া মানে তো টুপি-টাপা পরিয়ে ম্যানেজ করে নেওয়া। আর 'ঝিঁটে' নেওয়া মানে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া। আমি তো এটাই জানি। ঠিক বলেছি?

মাথা নাড়ে দুলাল।

—এবার বলো 'ঝিরিয়ে' নিয়েছে, না 'ঝিঁটে' নিয়েছে?

দুলাল বলল—বললুম তো শায়া-সুদ্ধু খুলে নিয়েছে। জোর করে।

—ওদের চিনতে পেরেছিলে?

—না।

অনিকেত চুপ করে। দুলাল বলল—আপনি যত জিগ্যেস করলেন, পুলিশ তার কিছুই শুধোয়নি।

—পুলিশ কী শুধিয়েছিল তবে?

—কী হয়েছিল, কখুন হয়েছিল এসব জিগ্যেস করেছিল, বলেছিল থানায় যেতে। থানায় যেতে একজন বলেছিল, তুই হিজড়ে? হিজড়েদের ওই জায়গাটা কেমন হয় দেখিনি কখনও, দেখা। দেখিয়েছিলাম। জিগ্যেস করেছিল জন্ম থেকেই এরকম? আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ। বলল, বসে মুতিস? বললাম, আজ্ঞে। ব্যস।

—আর কিছু জিগ্যেস করেনি?

—জিগ্যেস করছিল পাতার কাজ করি কি না। ওটা নিয়েই ভ্যানতাড়া করছিল।

—'পাতা' মানে গুঁড়োর কথা বলছ তো? হেরোইন?

—হ্যাঁ।

—তা 'পাতা'-র কথা তোমায় জিগ্যেস করছিল কেন পুলিশ? তোমার সঙ্গে কি ওসব ছিল?

জিভ কাটল দুলাল।—ও-জিনিস কখনও করিনি। শুনেছি আসানসোলের খোলে দু'জন পাতা খেয়ে মরেছে। আমি ও-লাইনে নেই। মায়ের দিব্বি। আমার শরীল খারাপ করছিল, মা স্বপ্ন দিল, ফিরে যা। মাজারে এসে বসলাম। তখনই তো দু'জন এসে গেল।

—চেঁচাওনি?

দুলাল একটু থতমত খেল যেন। বলল, একজন তো আমার মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে দিয়েছিল। এখন আর কথা বলতে পারছিনি। টায়ার লাগছে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না অনিকেতের কাছে। কিছু একটা গেরো আছে।

থাকগে। ওসব ব্যোমকেশ-ফেলুদাদের কাজ। মরুকগে।

যত তাড়াতাড়ি মরে, ততই মঙ্গল।

মেডিকেল কলেজের ভিতরে গিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামতেই তিন-চারজন লোক মন্দিরের পান্ডাদের মতো ঘিরে ধরল। দুলাল আর দুলালের মা-কে দেখে 'মুরগি পাওয়া গেল' ভেবে আশান্বিত হয়েছিল ওরা, 'কোন ডিপারমেন কোন ডিপারমেন' বলে এগিয়েও এসেছিল, কিন্তু অনিকেতকে দেখে ওদের মনে হয়—সুবিধে হবে না। —ওরা দালাল।

ডা. সমীর প্রধানকে খুঁজে বের করা গেল। মাঝবয়সি। বললেন—কিছু খাবার-দাবার নিয়ে আসতে। একটু দেরি হবে, আজই অনেকটা কাজ হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবুর নিজের একটা ঘর আছে। ওই ঘরটা খুলে দিলেন। দুলালের লুঙ্গি পরা ছিল। দুলালকে লুঙ্গির ওপর দিয়ে ওই ক্যাথিটার এবং রবারের পাত্রখানি ধরে রাখতে হয়েছিল। ডাক্তারবাবু টয়লেটটা দেখিয়ে দিলেন। পাত্রটি ভরে গিয়েছিল। নবপাত্র লাগানো হল।

সমীরবাবু বললেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, রাউন্ড মেরে আসছি। তখন এগারোটা মতো বাজে। একটা নাগাদ চলে এলেন সমীরবাবু। সঙ্গে একজন কাগজ-কুড়ুনি টাইপের লোক। লুঙ্গি, নোংরা গেঞ্জি, দুর্গন্ধ। সমীরবাবু বললেন, ও পেটব্যথার সিম্পটম নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিল। দেখলাম, গলব্লাডার-এ স্টোন আছে। অথচ আশ্চর্যটা কী জানেন, ওর অ্যাসিডিটি নেই, বমি হয় না। ও তো যা-তা খায়। পাউরুটি দিয়ে ঠান্ডা আলুর চপ খায়। রাস্তায় পড়ে থাকা খাবারও খেয়ে নেয়। আই-কিউ খুব কম। কিন্তু আশ্চর্য, ওর পেটখারাপও হয় না। ওর ফিসিজ-এর কোয়ালিটি অবাক করার মতো। ওকে কমোডে হাগিয়ে দেখেছি। ভাসছিল। ওয়ান্ডারফুলি ফর্মড। গোল্ডেন ইয়েলোইশ কালার। কী করে হয়? ওর ডাইজেস্‌টিভ সিস্টেমটা নিয়ে আমার খুব কিউরিওসিটি। আজ ওর স্টমাক থেকে কিছুটা স্যাম্প্‌ল নেব।

কিছু কাজ-খ্যাপা লোক এখনও রয়ে গিয়েছে বলে দুনিয়াটা চলছে—অনিকেত ভাবে। এবার তোমার পেশেন্ট-টাকে দেখি?

ঘরের ভিতরে একটা ছোট ঘর ছিল। ওখানে নিয়ে গেলেন। হাতে গ্লাভ্‌স পরে নিলেন।

মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে বললেন—ওর পেচ্ছাপের অসুবিধেটার কারণ প্রস্টেট নয়। ওর ইউরেথ্রায় স্টেনোসিস হয়েছে। যেহেতু লিঙ্গটাকে চেঁচে ফেলেছে, কোনও ক্রুড উপায়ে, প্রস্রাব বের হওয়ার পথটা সরু হয়ে গিয়েছে, এবং ওই পথের টিস্যু কুঁচকে গিয়েছে। প্রস্টেট-টাও বড়। কিন্তু খুব বড় নয়। আল্‌ট্রাসোনোগ্রাফ করলে বোঝা যাবে।

—কবে আসতে হবে? অনিকেত জিগ্যেস করে।

—আজই করিয়ে দিচ্ছি। এই দু'টোকেই নিয়ে যাব। টেকনিশিয়ান আমাকে খুব 'ইয়ে' করে। ওর কাজের ফাঁকে টুক করে ম্যানেজ করিয়ে নেব।

সমীরবাবু ফিরে এলেন। অনিকেতকে আলাদা করে ডেকে বললেন, কেস ভাল নয়। প্রস্টেট-টা নডিউলার মনে হচ্ছে। প্রস্টেটে ক্যানসার হলে টেস্টিক্‌ল বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু

টেস্টিকল্‌স না-থাকলে প্রস্টেট ক্যানসার হয় কি না এ নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। কারণ এরকম স্যাম্প্‌ল পাওয়াই যায় না, যারা ক্যাস্ট্রেটেড, অ্যান্ড সাফার্ড ফ্রম প্রস্টেট ক্যানসার আফটারওয়ার্ডস। একটা হালকা মতবাদ আছে—অণ্ডকোষ না-থাকলে প্রস্টেট ক্যানসার হয় না। কিন্তু সেকেন্ডারি ইনফেকশন থামাবে কে? আমার মনে হল, ওর প্রস্টেটে যদি ক্যানসার-ই হয়ে থাকে, এটা সেকেন্ডারি নয় তো? ডিওডেনাম-এর মধ্যে মনে হল একটা লাম্প আছে। হতে পারে ওটা ক্যান্‌সারাস। হতে পারে ওটা প্রাইমারি, প্রস্টেট মেটাস্টেসিস। আবার নাও হতে পারে। হয়তো ওই ল্যাম্প-টা এমনি, বিনাইন। বা ওটা অন্য কিছু। আরও পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে।

অনিকেত যেন হাতে চাঁদ পেল। বলল—তা হলে ডাক্তারবাবু, ওকে ভর্তি করে নিন না। সমীরবাবু বললেন, তাই তো ভাবছি। কিন্তু চাইলে কালই তো ভর্তি করতে পারি না...। আউটডোর-এ এসে দেখাতে হবে। ডেট নিতে হবে, তা ছাড়া ওর আবার এড্‌স। আলাদা ব্যবস্থা। কতগুলো টেস্ট বাইরে থেকে করিয়ে আনুন, আগামী সপ্তাহে বুধ-শুক্র আমার আউটডোর।

—ওর পায়খানা ঠিকমতো হয়?

দুলালের মা বলল, না ডাক্তারবাবু।

—পায়খানায় রক্ত দেখেছেন?

দুলাল বলল, জানি না তো, খেয়াল করিনি।

—খিদে?

—মোটে না।

সমীরবাবু বললেন—কেসটাতে আমার উৎসাহ আছে। নিয়ে আসুন। এই ধরনের মানুষ নিয়ে খুব একটা কাজও হয়নি আমাদের দেশে। বহুদিন আগে, ১৯৭৪-’৭৫ সালে, এই মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডা. জে বি মুখার্জি কিছু হিজড়েদের নিয়ে কাজ করেছিলেন। উনি ওঁদের কেস হিস্ট্রি রেকর্ড করেছিলেন, নানারকম প্যাথোলজিকাল টেস্ট করেছিলেন। তখন তো জেনেটিক্স-এর তেমন উন্নতি হয়নি, সুতরাং প্যাথোলজি-র ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত, স্পেশালি ব্লাড। উনি ওদের গোনাড্‌স এর ছবিও তুলেছিলেন। ওই ৪০/৫০টা স্যাম্পেলের মধ্যে ক্যাস্ট্রেটেড, নন-ক্যাস্ট্রেটেড সবই ছিল। মেডিকেল কলেজে যে কোনও রোগ নিয়ে কোনও হিজড়ে এলেই ওদের পরীক্ষা করতেন। ওই সব রিপোর্ট ছিল মেডিকেল কলেজের সম্পত্তি। উনি রিটায়ার করার পর ওইসব রেকর্ড অযত্নে নষ্ট হয়ে যায়। হারিয়েই যায়। তবে, কিছুদিন পর আমেরিকায় একটা ফরেন্‌সিক সায়েন্স কংগ্রেসে ডা. মুখার্জি একটা পেপার পড়েছিলেন। ওটার একটা কপি আমি পেয়েছি। যতদূর মনে পড়ে ডা. মুখার্জির পেপারে ছিল, এদের প্রস্টেট ছোটই হয়। একটা ভারি আশ্চর্য কথা লিখেছিলেন উনি। রেক্টামের ভিতরে আঙুল চালিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে প্রস্টেটকে উত্তেজিত করলে, কিছুক্ষণ পরে চেঁচে ফেলা পুংলিঙ্গের গোড়ার ছিদ্র দিয়ে সামান্য তরল কিছু বেরিয়ে আসে। ওটা প্রস্টেটের সিক্রিশন। শুক্রহীন বীর্য। ওরা যখন পায়ুমেহন করায়, ঠিকমতো হলে—এই তরল বেরিয়ে আসাটাই ওদের অর্গ্যাজ্‌ম। ড্রাই-অর্গ্যাজ্‌মও হয়। অনিকেতের ভয় হয়। সমীর প্রধানকে বলে, ওকে নিয়ে এসব এক্সপেরিমেন্ট করবেন না কি?

ডা. সমীর প্রধান বলেন—ও কি এই স্টেজে আছে নাকি? ওর প্রস্টেট কেন বড় হল এটা বুঝতে হবে। তবে ওর কষ্ট হবে না। চিকিৎসাও যা হওয়ার হবে।

দুলালের মা-কে বললেন—চিন্তা করবেন না, আমরা আছি তো।

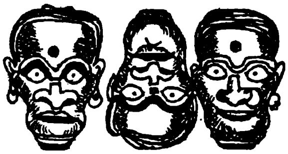

মাছওলা বলেছিল, একদম সুইমিং পুল-এর গ্র্যাজুয়েট মাছ। জ্যান্ত চারাপোনার ঝোল, কিন্তু ঝোলটা তেতো।

এত তেতো কেন? ভেড়ি-দূষণ? মাছের শরীরেও তিক্ত রাসায়নিক ঢুকে আছে? শুক্লাকে বলল অনিকেত। শুক্লা ঝোলে ডুবে-থাকা মাছ হাতায় তুলে দেখল। বলল, দুলালের মা-কে দিয়ে আর চলবে না। অন্য লোক দেখতে হবে। মাছের আঁশ ছাড়িয়েছে, অথচ পেট কাটেনি। পিত্তি রয়ে গিয়েছে। মাছের পিত্তি ঝোলে মিশে গিয়েছে।

মাছ কাটিয়েই আনে। কিন্তু আজকাল এলাকায় লোক বেড়ে গিয়েছে। মাছ কাটাতে দেরি হয়। বাড়িতে দুলালের মা আসে, তাই ভিড় হলে কাটিয়ে আনে না। দু'দিন আগে জামা কেচেছিল, জামার পকেটে টাকা ছিল। শুক্লাও দেখেনি, দুলালের মা-ও না। দুলালের মা-কে বলাই ছিল কাচাকুচি করার আগে পকেট-টকেট ভাল করে দেখে নেবে। ভুলে গিয়েছে। কিছু বললে বলে, কী করব, মন ভাল নেই।

ওকে দিয়ে আর চলবে না, অনিকেত বলে, অন্য লোক দেখে নাও। এমনিতেও ওকে ছাড়াতে হত। ট্রান্সফারের অর্ডার ঝুলছে। ট্রান্সফার হলেই চলে যেতে হবে। তখন তো বলতেই হবে, দুলালের মা, কাজ দেখে নাও। ক'টা দিন আগে বলে দেওয়া—এই যা।

শুক্লা বলে, সে নাহয় বলে দেব ওকে, কিন্তু দুলালের মা বলছিল দুলালের নামে পুরীতে জগন্নাথের পুজো করিয়ে দিতে। আমাদের পাণ্ডাকে চিঠি লিখতে পারবে একটা?

অনিকেত বলল, টাকাটা তুমিই দেবে, তাই তো?

শুক্লা বলল, আমি আর কোত্থেকে দেব? তুমিই তো দেবে। দুলালের চিকিৎসার টাকা দিচ্ছ না?

অনিকেত বলল—তা তো দিতেই হচ্ছে। উপায় কী? তবে পাণ্ডাকে যে টাকা পাঠাব, তা দিয়ে ওষুধ কিনলে কাজ হত। কাজ হত বলছি কেন? কোনও কাজই হত না। কোনও কাজই হবে না। দুলালের বাঁচার কোনও চান্স আছে নাকি? জগন্নাথদেব-এর সাধ্যি নেই।

শুক্লা বলল, জগন্নাথদেব অনেক অলৌকিক কিছু ঘটাতে পারেন।

অনিকেত বলল, তা হলে তো হাসপাতালের দরকার হত না। ডাক্তারের দরকার হত না। এর বেশি আর কথা বাড়াল না।

অফিসে একটি প্রতিবন্ধী দম্পতির ইন্টারভিউ নেওয়ার ছিল। ওঁরা ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন। পুরুষটি অস্থি-প্রতিবন্ধী। আরও ঠিক করে বলতে গেলেন মেরুদণ্ড-ভাঙা। আগেও

এরকম একজন মানুষকে পেয়েছিল। এঁর হাত চলে, মাথা চলে, পা চলে না। শুধু পা কেন, কোমরের তলা থেকে কিছুই চলে না। ইনি চিত্রশিল্পী। ওঁর স্ত্রী-ও চিত্রশিল্পী। কিন্তু কথা বলতে পারেন না, কানে শোনেন না। ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব।

—আপনারা সুখী দম্পতি?

পুরুষটি বললেন, খুব। আমরা একসঙ্গে ছবি আঁকি, একে অপরকে 'শেয়ার' করি। আলোচনা করি...।

—আলোচনা? কী করে? উনি তো কথা বলতে পারেন না।

—কথা দিয়েই শুধু কথা বলা যায় নাকি? ওর তো সারা শরীর কথা বলে, আমারও।

—সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ-টা শিখে নিয়েছেন বুঝি? ওই যে আঙুল দিয়ে কী যেন বলে?

—এমভিএসএল ও জানে। আমি জানি না। আমার সঙ্গে ওর কমিউনিকেশন-এ অসুবিধে হয় না। কমিউনিকেশন-টা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। আমাদের ছেলেটা কথা বলতে পারে। ওর বয়স এখন চার। ও জানে, ওর মা শোনে না। কিন্তু মা-ছেলের কোনও অসুবিধে হয় না। ওরা তো সর্বক্ষণ কথা বলে।

তা হলে একটা গল্প বলি। অ্যাক্সিডেন্ট-টার আগে আমি বনগাঁ-র একটা স্কুলে যেতাম আঁকা শেখাতে। ফেরার সময় দেখতাম একজন প্রৌঢ় লোক বনগাঁ থেকে উঠতেন। আর একজন প্রৌঢ়া উঠতেন গোবরডাঙা থেকে। ওঁরা চেষ্টা করতেন মুখোমুখি বসতে। ভদ্রমহিলা সারাক্ষণ উল বুনতেন কিংবা সুচ-সুতোয় এমব্রয়ডারি করতেন। ভদ্রলোক বই পড়তেন। দু'জনের মধ্যে কোনও কথা হত না। ভদ্রলোক মধ্যমগ্রামে নেমে যেতেন। যাওয়ার সময় মহিলাকে বলতেন, উঠি, কাল আবার কথা হবে। মহিলাটিও বলতেন—হ্যাঁ, কথা হবে। অথচ কোনও কথা-ই হত না।

অনিকেত জিগ্যেস করল—আপনার অ্যাক্সিডেন্ট-টা হয়েছিল কত বছর আগে?

—তা এক যুগ হয়ে গেল। বারো বছর।

—ও, তা হলে যে বলছেন আপনাদের সন্তানের বয়স চার বছর...। অ্যাক্সিডেন্ট-এর পর আপনার তো...

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন, মোক্ষম প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর অনেকবারই দিতে হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট-এর পর আমার নিম্নাঙ্গে সাড় নেই। সেক্সুয়াল অর্গ্যান ইন-অ্যাক্টিভ। তাতেও ভালবাসা কমেনি। সত্যি বলতে কী, ভিতরে, সারা শরীরে, কখনও-কখনও শিহরনও হয়, যাকে অর্গ্যাজ্‌ম-ও বলা যায়। আসলে ভালবাসায় জোর থাকলে সব হয়। ও! আসল প্রশ্নটার উত্তরটাই তো দেওয়া হয়নি। সন্তানের জন্য আমার এক বন্ধুকে অনুরোধ করেছিলাম। আমাদের কম্‌ন-ফ্রেন্ড। ও দয়া করে কাজটা করে দিল। সবাইকে বলি না। কাউকে বলি অলৌকিক ভাবে গর্ভ হয়েছিল বনানীর। মেরি মায়ের যেমন। লোকে বিশ্বাস করে না। এমনকী খ্রিস্টানরাও নয়। আমি তো নিজেই খ্রিস্টান পরিবারের। আত্মীয়স্বজন-রা আছে। আবার কাউকে বলি—আমার কখনও-কখনও কাজ করে...।

কতগুলো পেন্টিং-এর ছবি তুলে এনেছিল ওরা। অনিকেত ছবিগুলো দেখছিল।

বনানীর ছবিগুলো খুব রঙিন। চড়া রঙের। সুররিয়ালিস্টিক ধরনের। একটা মানুষ হাত উঁচিয়ে রয়েছে। বিরাট হাঁ, জিভ কাটা। ছবিটার ক্যাপ্‌শন : আ পলিটিকাল ম্যান। পাঁচটা খাটিয়া

এমনভাবে সাজানো যেন ফুলের পাঁচটা পাঁপড়ি। প্রত্যেক খাটিয়াতে একটা করে মৃতদেহ। ছবিটার নাম 'পিস'। কিন্তু ভদ্রলোকের ছবি একটু অন্যরকম। মা কালীর লোলজিহ্বায় একটা প্রজাপতি। বেশ কিছু জগন্নাথদেবেরও ছবি। নানা ভাবে, নানা রঙে।

—এত জগন্নাথ এঁকেছেন যে...

—জগন্নাথ আমার খুব ফেভারিট।

ওঁর স্ত্রী মুচকি হাসছেন। এসব কথাবার্তা ওঁর শোনার কথা নয়। কিন্তু কী করে যেন বুঝলেন জগন্নাথ প্রসঙ্গ এসেছে। উনি চোখ গোল-গোল করে তাকালেন।

জগন্নাথের চোখও গোল। বড় বড়।

শিল্পী বলতে থাকেন—জগন্নাথ কেন এত ফেভারিট জানেন? উনি বিশ্বস্রষ্টা, তাই তো ভাবা হয়, জগতের নাথ, অথচ দেখুন, উনি আমার মতো। ওঁর পা নেই। আমার তো তবু হুইল চেয়ার আছে, ওঁর তো তা-ও নেই। উনি স্থাণু। অনড়। মানে, চিরকালীন। চোখে বিশাল দু'টি লেন্স। সব দেখছেন, উপভোগ করছেন। নিজের তৈরি করা মহাবিশ্ব-টাকে এন্‌জয় করছেন। রগড়ও দেখছেন। দেখুন না, মুখে মৃদু হাসি। মোনালিসা-র হাসির চেয়েও বেশি ব্যঞ্জনাময়। ছোটখাটো স্বার্থ নিয়ে মানুষের এসব কাজ-কারবার দেখে বিদ্রুপের, কিংবা তাচ্ছিল্যের, নাকি ক্ষমা-ঘেন্নার হাসি হাসছেন। হাত দু'টো সো-কলড্ কমপ্লিট নয়। কিন্তু দেখুন দু'টো সমান্তরাল রেখা। ছোটবেলায় জ্যামিতি-তে পড়েছিলাম সমান্তরাল সরলরেখা অসীমে গিয়ে মেশে। আমরা তো অসীম বুঝি না, আহ্বান বুঝি। দুই হাত বাড়িয়ে ধরেছেন। ওঁর তো তলা-ই নেই, অথচ সৃষ্টি করে চলেছেন। পেটের তলা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে কী ঝামেলা রে বাবা...।

দুলাল, দুলালের জন্য জগন্নাথের কাছে টাকা পাঠানোর কথা বলেছিল শুক্লা...।

এ সময় শুক্লার ফোন এল। তখন বেলা একটা।

—খুব খারাপ কাণ্ড হয়েছে, জানো, দুলাল ওর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। দুলালের মা-ও দুলালকে বাঁচাতে গিয়ে পুড়ে গিয়েছে। ওদের দু'জনকেই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

দুলালের ছেলে হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বলে গেল। নীলরতন-এ আছে। দুলাল বোধহয় বাঁচবে না।

—আপদ যাবে।

—কিন্তু দুলালের মা-ও নাকি খুব পুড়েছে। কিছু পয়সা-কড়ি নিয়ে হাসপাতালে যেতে পারবে?

—পয়সার মেশিন আছে নাকি এখানে? তা ছাড়া আমি তো কাজ করছি।

—কেন, তোমাদের অফিসে নাকি কো-অপারেটিভ আছে, সময়-অসময়ে টাকা পাওয়া যায়, তুমিই তো বলেছিলে?

—হ্যাঁ। দেখছি।

ইন্টারভিউ-টা তাড়াতাড়ি শেষ করে কো-অপারেটিভ থেকে কিছু টাকা তুলে বেরিয়ে পড়ল অনিকেত। দুলাল যাই হোক, বিবেচক লোক। ডা. সমীর প্রধান আরও অনেক টেস্ট-এর কথা বলেছিলেন। যদি ক্যানসার ধরা পড়ে, তা হলে কেমো না অপারেশন, না দু'টোই, এসব পরে ঠিক করবেন অন্‌কোলজিস্ট। অনিকেত আর কোনও ঝামেলা নেয়নি। দুলালের মা-কে

বলেছে, ঘরেই রাখো, খাওয়াও-দাওয়াও। সমীর প্রধান-কে দেখিয়েছে দিন দশেক তো হল।

হাসপাতালে মন্টুর সঙ্গে দেখা হল। ও পানের পিকমাখা সিঁড়িতে বসে উদাস তাকিয়ে আছে।

—কী রে, কী হয়েছে?

মন্টু বলল, বাবা ঘর বন্ধ করে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়েছিল। তারপর নিজেই দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল। তখন ঠাকমাও পুড়ে গেল।

—ক'টার সময়?

—দশটা।

—তুই কী করছিলি?

—আমি তো নাইতে গেসলাম পুকুরে। ইস্কুল ছিল কি না...।

—তারপর?

বাড়ি ফিরে দেখি লোকজন, ভিড়। আমাদের সবাইকে গাল দিচ্ছিল, আর দু'জনের গায়ে জল ঢালছিল, নারকোল তেল মাখিয়ে দিচ্ছিল। আমি তখন ছুটে গেলাম জেঠিমার কাছে।

—খেয়েছিস কিছু?

—জেঠি রুটি-বোঁদে দিয়েছিল।

—আর কেউ এখানে আছে তোদের পাড়ার?

মাথা নাড়ল মন্টু।

ওরা বেঁচে আছে না কি মারা গিয়েছে? মন্টুকে কী করে জিগ্যেস করা যায়?

অনিকেত জিগ্যেস করল, কেমন আছে জানিস?

ঠোঁট উল্টে দিল মন্টু।

—সিট নম্বর জানিস?

—উঁহু।

মন্টুর ঘাড় নাড়া, ঠোঁট উল্টে দেওয়া, এসব যেন একটু অন্যরকম লাগল। ঘাড় নাড়াটার মধ্যে একটু বেশি ঝাঁকুনি ছিল। কানে ঝোলানো দুল থাকলে বেশিক্ষণ ধরে নড়ত। এই মন্টুর মধ্যেও কি তবে দুলালের একটু প্রপার্টি আছে? তবে কি যৌন-বিশেষত্ব বংশানুক্রমিক? এই মেয়েলিপনা-টাও বংশানুক্রনিক? অবশ্য মেয়েলিপনা ব্যাপারটাই তো পুরুষের কনসেপ্শন-এ হচ্ছে। একটু বেশি হাত নাড়া, মুখ নাড়া, একটু হেলে-দুলে হাঁটা, একটু ন্যাকামি করা...এসব মেয়েলি লক্ষণ। তা হলে মহাশ্বেতা দেবীর ক্ষেত্রে কী হবে? উনি তো মহিলা। উনি হেলে-দুলেও হাঁটেন না, হাতও নাড়েন না কথা বলার সময়, ভ্রু-ভঙ্গিও করেন না। তা হলে? সুকুমারী ভট্টাচার্য থেকে সুদেষ্ণা চক্রবর্তী কারও মধ্যেই তো তথাকথিত 'মেয়েলিপনা' নেই। তাই বলে কি ওঁরা সব পুরুষ নাকি? যাকগে—এখন মৃত্যুমুখে পড়ে আছে দু'জন মানুষ। এখন এসব তত্ত্ব থাক। আর ওই মেয়েলিপনা বংশানুক্রমে অর্জিত কি না, এসব প্রশ্নর সময় এটা নয়। আর মন্টু আদৌ দুলালের ঔরসজাত কি না, এখানেও একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন আছে। অনিকেত-কে তা হলে এমার্জেন্সি-তে যেতে হবে। ওখানে খোঁজ করতে হবে।

এ সময় একটা লোক এল। পা-জামা আর ফুলশার্ট পরা। মন্টুকে বলল, খাবি কিছু। অনিকেতের দিকে তাকিয়ে বলল, ওঃ, আপনি এসে গিয়েছেন। আমি হলাম দুলালের

ছোটবেলার বন্ধু। ওর গাঁয়ের ছেলে। কিছুদিন ওর সঙ্গে আনাজের কারবারও করেছি। আপনি আমায় চিনবেন না। আমি আপনাকে চিনি। আপনার দয়ার শরীর।

ওরা কেমন আছে এখন?

—দু'জনই বেঁচে আছে এখনও।

—হয়েছিল কী? অনিকেত জিগ্যেস করে।

—আগুন লাগিয়ে নিজের জীবনটা পুইড়ে দিতে গিয়েছিল আর কী। আমি তখন গরুর জাবনা দিচ্ছিলাম, তরুণ সংঘ কেলাবের চানু আর গুরুপদ আমাকে ডেকে বলল, চলো, তোমার বাল্যবন্ধু গায়ে আগুন দেছে। ছুটে গেলাম। কাকে সামলাব। ঘরের বিছানাতেও আগুন ধরেছে। সব জল ঢালছে। জল তো টিউকলে। পাম্প করে জল তুলতে হয়। আগে ঘরটা সামলাব, না মানুষ সামলাব। দুলালের গায়ে আর ওর মায়ের গায়ে জল ঢেলেছে, ওদের গা থেকে ধুমা উঠছে, বিছানার চাদর জ্বলছে। যা হোক আগুন নিভানো হল। মুকুন্দপুরে অ্যাম্বুলেন্স আছে, ওদের বাড়ি পর্যন্ত আসার পথ নেই। ভ্যানে চাপিয়ে গারুলগাছার মোড়ে এসে অ্যাম্বুলেন্স-এ চাপালাম। পাঁচ-ছ'জন সঙ্গে ছিল। আমুও অ্যাম্বুলেন্স-এ ছিলাম। ওদের গা থেকে কেরোসিনের গন্ধ ছাড়ছিল। দুলালের মা কেবল হরি-হরি বলছিল, বলতে কি পারে, ঠোঁট নড়ছিল শুধু। দুলালের মুখে রা ছিল না। ওদের দু'জনারই মুখ পোড়েনি। কিন্তু দুলালের তো মুখ আগেই পুড়েছিল, নতুন করে আর পুড়বে কী?

অনিকেত জিগ্যেস করল, আপনার নাম কী?

—আমার নাম বদু। বদু মণ্ডল। পুরো নাম বদরুদ্দিন মণ্ডল।

—আপনি কি এখনও আনাজের ব্যবসা করেন?

—আনাজের ফড়েগিরি করি না আর। বাড়িতে দুধেল গাই রেখেছি, সঙ্গে পোল্‌টিরি। আর আনাজের সঙ্গে কানেকশন-টা আছে বলে হাসপাতালগুলোকে আনাজ সাপ্লাই করি। অনেকগুলো হাসপাতাল হয়েছে কি না। ওপরওলার দয়ায় ভালই আছি। ছেলে ক্লাস টেন-এ পড়ে। তিনরকমের মাস্টার রেখে দিয়েছি। আনাজের ব্যবসায় একটু খাটালি আছে, কিন্তু লাভও আছে। দুলাল-টা ছেড়ে দিল, বে-ফালতু কাজে নামল। সেই একই তো খাটালি। সাইকেলে-সাইকেলে টিপ, ফিতে, বুক-বাঁধা এসব বিক্রি করত। আমি নিষেধ করেছিলাম, শোনেনি। ওর একটু গড়বড় ছিল। সবই জানেন, আমি আর নতুন কী বলব, আমি অনেক বলেছিলাম। জানেন তো, ইসলামে এটাকে বলে 'সাদোমি'। আরবের সাদোম আর ঘমোরা শহরের মানুষের এসব দুষ্কর্ম ছিল বলে ওপরওলা আকাশ থেকে আগুন আর পাথর ছুড়ে শাস্তি দিয়েছিলেন। দুলালকেও শাস্তি দিলেন। হিন্দু-মুসলমান-শিখ-ইশাই—সবার তো ওপরওলা একজনই। শাস্তির জন্য কেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না। আগেই হয়ে যায়। কী বলেন স্যর? অনিকেত মাথা নাড়ায়।

উনি বলে চলেছেন—ও যখন ফিরে এল, পাড়ার লোকজন বলেছিল গাঁয়ে থাকতে দেবে না। আমি যা হোক করে ম্যানেজ করলাম। ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলেছি, সাঁতরে শাপলা তুলেছি...।

জানেন স্যর, তখুনি দেখতাম, চ্যান করে ঘর যাওয়ার সময় গামছাটা গায়ে জড়িয়ে নেয়,

আমাদের মেয়েছেলেরা যেমন করে। আমরা তো কাঁধে ফেলে দি, নইলে কোমরে জড়াই—তাই না স্যর?

—হুঁ।

—জানেন, যখন হাসপাতালে নিলাম, পুরো জ্ঞান ছিল ওর। যখন নাম জিগ্যেস করল, আমরা বললাম দুলাল মিরধা, ও বলছে দুলালী।

—ওর মায়ের-ও কি জ্ঞান ছিল?

—ওর মায়ের তেমন জ্ঞান ছিল না। হাত নাড়াচ্ছিল, মুখ দিয়ে আওয়াজও বেরুচ্ছিল। কিন্তু কথা কইছিল না। যা হোক, ভর্তি তো হল। স্যালাইন, ওষুধ, ইনজেক্‌শন সব আমি কিনে দিলাম। দু'হাজার বেরিয়ে গেল। এই কথা বলে বদু অনিকেতের দিকে তাকাল। চোখে একটা প্রত্যাশা। ও অপেক্ষা করছে, অনিকেত কখন বলবে টাকাটা আমি দিয়ে দেব।

কিন্তু অনিকেত কিছু বলল না। অনিকেত বলল—এখন ওরা কেমন আছে জানা যায় না?

বদু বলল—থাকতে তো বলেছে। খবর হলে জানাবে। নইলে আর একঘণ্টা পর যেতে দেবে। ঘড়ি দেখল বদু।

উল্টো দিকে একটা ছোট দোকান ছিল। ওখানে জল, কোল্ড ড্রিংক এবং আইসক্রিম বিক্রি হচ্ছিল। অনিকেত একটা কোন্ এনে মন্টুকে দিল।

মন্টু কোনের ওপরে উঁচিয়ে থাকা স্ট্রবেরি-লাল গোলাকার অংশটা জিভ দিয়ে চাটছিল।

বদু ওকে নিরীক্ষণ করছিল। বদু বলল, একটা কথা বলব স্যর, যদি আইস্‌কিরিম খাওয়ান ওকে, কাপ দেবেন। কোন্ দেবেন না, কাঠিওলা গোল জিনিসও দেবেন না। দেখুন না, কেমন চুষছে। ওর বাপের তো স্বভাব ভাল ছিল না, ওর সাবধান থাকা ভাল।

অনিকেত ইঙ্গিতটা বুঝল। এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করল না। পাত্তা দিল না। অনিকেত বদুকে জিগ্যেস করল—ও যখন ঘর ছেড়ে চলে গেল, আপনি কি জানতেন ও কোথায় গিয়েছে?

—না-না-না। কোনও লিংকিং ছিল না। ও যখন আনাজের কারবার ছেড়ে ওসব ধরল, তখন থেকেই ওর সঙ্গে কাট-আপ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া এক নাপিতের সঙ্গে গুনাহ করত। তবু আমি এসেছি, ওর পিছনে খরচা করলাম। সারাটা দিন দিলাম। আর তো কেউ থাকল না। সবাই বলল, তোর ছোটবেলার দোস্ত তুই থাক। ও তো অনেকেরই ছোটবেলার বন্ধু ছিল।

মন্টু খুব তৃপ্তি করে আইসক্রিমটা খাচ্ছিল। অনিকেত মন্টুকে জিগ্যেস করল—হ্যাঁ রে, সকালবেলায় তোর ঠাকমার সঙ্গে তোর বাবার কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল না কি?

মন্টু বলল, না। বাবা সকালবেলায় খুব চেঁচাচ্ছিল। বারবার ঠাকুরের ছবিটাকে পেন্নাম করছিল। বাবার একটা ঠাকুর আছে না? ওটাতে। বলছিল, জয় মা। এতদিনে কথা শুনলে। আর চিৎকার করে, হাততালি দিচ্ছিল। ঠকঠক করে। আর ঠাম্মা বলছিল, এত রক্ত পড়ছে, ডাক্তারকে খবর দি? বাবা বলছিল আর দরকার নেই।

—রক্ত পড়ছিল? অনিকেত জিগ্যেস করে—কোত্থেকে রক্ত পড়ছিল?

—ওই বাবার যেখানে নল ঢোকানো থাকে, সেখান দিয়ে। নল খুলে ন্যাকড়া চাপা দিয়েছিল।

—তারপর?

—তারপর তো নাইতে গেলাম...।

অনিকেত বুঝল, প্রস্টেট থেকেই ওই রক্তক্ষরণ। প্রস্টেটে ঠিক কী হয়েছে ওর জানা নেই। ওটা ইনফেক্শন, না ক্যানসার, না মেটাস্টেসিস জানা নেই। রক্তক্ষরণটা ওখান থেকেই হচ্ছিল নিশ্চয়।

একটু পরে ওদের দেখতে গেল। প্রথমে দুলালকে। ওর নাকে অক্সিজেন, হাতে স্যালাইন। ওর শরীরে নুনজল ঢুকছে। গায়ে সবুজ চাদর। যেটুকু হাত বেরিয়ে আছে কালচে। গলার কাছটায় ব্যান্ডেজ করা। ওকে এমার্জেন্সি-তেই ফেলে রেখেছে।

একজন গ্রুপ ডি-কে জিগ্যেস করল অনিকেত। ও বলল, কেস খারাপ আছে। আর যা জিগ্যেস করার সন্ধেবেলা ডাক্তারবাবুকে করবেন। ও জিগ্যেস করল—ওর কি মাথার ছিট ছিল?

অনিকেত বলল, না তো?

—তবে যে উল্টোপাল্টা বলছিল—

—কী বলছিল?

—বলছিল আমার মাসিক হয়েছে...।

কিছু ডাক্তার ছুটোছুটি করছিল। একজন নার্সও ছিল। নার্সকে জিগ্যেস করাতে উনি কিছু না-বলে একটা টেবিল দেখিয়ে দিলেন। বদু বলল, ওদের কাছে রেকর্ড আছে।

অনিকেত জিগ্যেস করল—ওকে এখানে ফেলে রাখা হল কেন?

উত্তর এল, সিট নেই। একটা ফিমেল ওয়ার্ড-এ সিট খালি হল। পদ্মবালাকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। ওর মা। ফিমেল দু'শো এক। আর এর তো ঝামেলা কেস। কোন ওয়ার্ডে যাবে? মেল না ফিমেল। পেশেন্ট পার্টি বলল দুলালচন্দ্র মিরধা, আর পেশেন্ট নিজে বলল, দুলালী। তখন পেশেন্ট পার্টিরা বলল, ও হিজড়ে। কোন ওয়ার্ডে দেব? একজন সিনিয়র বলল, হিজড়ে হলে ফিমেল ওয়ার্ডেই যায়। এর তো সব পুড়ে গুড়। কিছুই বোঝা যায় না। এখানেই রাখা আছে।

—এখানেই থাকবে না কি তবে?

—ওসব ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করবেন।

দুলালের মা-কে দেখতে গেল ওরা। দুলালের মা ফিমেল সার্জিকাল ওয়ার্ডের বারান্দায়। মুখে অক্সিজেন, হাতে স্যালাইনের নল। নার্স বলল, জ্ঞান নেই।

অনিকেত জিগ্যেস করল, বাঁচবে?

নার্স বললেন, আমি কি ভগবান? কী করে জানব?

দুলালের ছেলেটা ওর বাবাকে দেখে কেঁদে ওঠেনি। কিন্তু ওর ঠাকুমাকে দেখে কেঁদে উঠল। বলল, অ-ঠাক্মা, কেন তুমি লোকটাকে নেবাতে গেলে...। এখন আমার কী হবে...কেঁদে উঠল।

অনিকেত বলল, হাসপাতালে কাঁদতে নেই। ওরা নেমে এল। ডাক্তারবাবুর জন্য অপেক্ষা। টুকরো ঘটনা আর মন্তব্যগুলোকে মেলাতে লাগল অনিকেত।

দুলালের প্রস্টেটের সংক্রমণটা বেড়ে রক্তক্ষরণ হয়, ওর লুপ্ত যৌনাঙ্গের ভিতরে, গোপনে-থাকা মূত্রছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্ত। যেন এই রক্তস্রাবের জন্যই অপেক্ষা ছিল ওর। দুলাল ভাবল, ওর নারী হওয়া হয়ে গিয়েছে এতদিনে। জীবন পূর্ণ। এবার আগুন জ্বালো।

শুক্লারও এরকম হয়েছিল। ওর যখন হিস্টোরেক্টমি করার কথা হল, গাইনি বললেন—

এছাড়া অন্য উপায় নেই, শুক্লা বলেছিল, তা হলে আর পিরিয়ড হবে না? উনি বলেছিলেন, না।

শুক্লা কেঁদে ফেলেছিল।

হাসপাতাল-এ থেকে ফিরেই আলমারি খুলে যে দু'-চারটে স্যানিটারি ন্যাপ্‌কিন ছিল, ওগুলোকে তীব্র আক্রোশে খামচে আলমারি থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। সব জঞ্জাল। জঞ্জাল। আবর্জনা। আলমারির নিচের তাকেও বোধহয় ছিল দু'-একটা। নিচু হতে গিয়ে তলপেটে কিছু হয়েছিল হয়তো। ওর ভেজা অনুভব হয়েছিল। জায়গাটা স্পর্শ করেছিল। হাতে রক্ত লেগেছিল। কোনও কারণে রক্ত ছুঁয়েছিল ওর যোনিদেশ। শুক্লা স্বগতোক্তি করেছিল—তবে? বললেই হবে শেষ?

ও ভাল করেই জানত, ওটা ঋতুরক্ত নয়। তবু আহ্লাদ পেয়েছিল। অনিকেতকে বলেছিল, সরে যাও। শুক্লা ওখানে ন্যাপ্‌কিন ধরেছিল মমতায়...

একটু পরেই ডাক্তার এল। ডাক্তার মানে হাউস স্টাফ।

—বার্ন কেসের পেশেন্ট পার্টি কে আছে...?

অনিকেত এগিয়ে এল।

—দুলালী মিরধা...

—এই তো।

—একটু আগে এক্সপায়ার করেছে। কিছুই করার ছিল না। এইট্টি পার্সেন্ট বার্ন। কিডনির কোনও ফাংশন ছিল না। লিভার এরিয়া বিচ্ছিরিভাবে পুড়ে গিয়েছিল। হার্টফেল করল।

ডেডবডি পরে পাবেন। পুলিশ কেস হবে। পোস্টমর্টেম হবে। ঝামেলা আছে।

এমনিতেই তো পুলিশ কেস আছে একটা। অনিকেত মনে-মনে বলে।

আপনার কে হয়?—ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করল।

—কেউ হয় না, মানে, চেনা, ওর মা আমার বাড়িতে কাজ করে।

—ওর মা-ও তো পুড়েছে?

—হ্যাঁ। কেমন আছে?

—জানি না। ফিমেল ওয়ার্ড বলবে। কিন্তু ওর ডেথ সার্টিফিকেট-টা লিখতে হবে তো। ওরা বলছিল নাম নিয়ে কনফিউশন আছে। দুলাল লেখা ছিল, পরে 'আই' লাগিয়ে দুলালী করা হয়েছে। শুনলাম, ও নাকি হিজড়ে। গোনাড্‌স দেখে তো কিছু বোঝার উপায় নেই, এমন বিচ্ছিরি ভাবে পুড়েছে...। রেকর্ডে কী লিখব? আর ডেথ সার্টিফিকেট-এ? মেল না কি ফিমেল?

—ফিমেল লিখুন ডাক্তারবাবু, ফিমেল। ও আসলে ফিমেলই ছিল।

—বলছেন? ও-কে...।

ওই ইংরেজি 'ও-কে' কথাটার সময় যেন পুষ্প-বৃষ্টি হল। রূপকথার রাজপুত্র-র মুখ থেকে মণিমুক্তো ঝরে। দু'টো মুক্তো ঝরল যেন।

জীবনে যা চেয়েছিলি, মরার পরে পেয়ে গেলি দুলাল। না, দুলাল না, দুলালী। ঋতু-কাঙালিনী।

দুলাল এক্সপায়ার্ড। না, মরেছে। এরা এক্সপায়ার করে না, মরে। একটা চ্যাপ্টার শেষ হল। বাঁচা গেল।

কিন্তু দুলালের মা বেঁচে আছে এখনও। রয়েছে দুলালের সো-কল্ড ছেলে মন্টু।

সকাল থেকে তিনবার ফোন এল বাড়িতে। গভর্নমেন্ট রেশন দোকানগুলোতে ঠিকমতো চাল দিতে পারে না—দেশের কোনায় কোনায় টেলিফোন বুথ করে দিয়েছে।

—স্যর, আপনাকে একটু আসতে হবে স্যর, মর্গ থেকে ঝামেলা করছে। দিচ্ছে না।

এরা মরলে মড়া, বড়জোর লাশ। অনিকেত মরলে বডি। খবর কাগজের সাংবাদিকরাও 'লাশ'-ই লিখবে, অনিকেতরা মারা গেলে 'মৃতদেহ'।

অনিকেত-টনিকেতরা মারা যায়, প্রয়াত হয়, দেহত্যাগ করে, এরা স্রেফ মরে।

—কেন, বডি ছাড়ছে না কেন?

—স্যর, বলছে হাসপাতালের কাগজে দুলালী লেখা আছে, ফিমেল, অথচ এটা ফিমেল বডি নয়, ভোটার কার্ড নিয়ে এসো। ভোটার কার্ড পাওয়া যায়নি।

—তো আমি গিয়ে কী করব?

—স্যর, ও শালারা পয়সা খাওয়ার মতলব করছে, আপনি গিয়ে দাঁড়ালে ওরা এত পাঁয়তাড়া করতে পারবে না।

—বাড়িতে ভোটার কার্ড ছাড়া অন্য কোনও কাগজ নেই? রেশন কার্ড?

—ওখানে তো দুলাল-ই লেখা আছে।

—ও, আচ্ছা!

অনিকেত চুপ করে থাকে।

অনিকেত ভাবে, যদি ও না-যায়, আবার ফোন আসবে। অনিকেতকেই গার্জেন ভেবে নিয়েছে ওরা।

শুক্লা বলল—যাও, ব্যাপারটা মিটিয়ে দাও। এটাই তো শেষ, আর তো যেতে হবে না।

অনিকেত ভাবে—ও যদি ওর ডেরায় মরে যেত, তা হলেই তো ঝামেলা চুকে যেত। এসে ছুরি খেল, রোগ বাধাল, অনিকেতকে ব্যতিব্যস্ত করল।

শুক্লা বলল—দুলালের মা যদি বেঁচেও যায়, কাজে আসতে পারবে না। একটা লোক দেখতে হবে তো।

অনিকেত বলল, ওটা তোমার ডিপার্টমেন্ট।

শুক্লা বলল—পচার মা, খুদির মা-দের বলে লাভ হচ্ছে না কিছু। গত কয়েকদিন ধরে চেষ্টা তো চালাচ্ছি। সব বাড়িতেই তো কাজের লোক চাই, কেবল তো বাড়ি উঠছে। দেখো, কিছুদিন

পর খাজাইতলা, নুড়া—এইসব গ্রামেও ফ্ল্যাটবাড়ি উঠবে। লোকগুলো কোথায় চলে যায় কে জানে? এখন এজেন্সি হয়েছে। ওরা কাজের লোক সাপ্লাই করে। ওখানে বলো।

অনিকেত বলে, আমরা তো চলেই যাচ্ছি। রিভাইস্‌ড ট্রান্সফার অর্ডার-টা চলে এলেই তো চলে যাব...।

—সে কবে আসবে ঠিক আছে? আমি তো হাঁটু মুড়তে পারি না। ঘরদোর মোছা হচ্ছে না।

অনিকেত বলে, আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখছি। তা হলে মর্গেই যাই, তুমি যখন বলছ।

বেশ ভাল হয়েছিল ফুলকপিটা। সবুজ কড়াইশুঁটিগুলো বড় মনোহর। কইমাছও আছে। ফুলকপি-কইমাছের কম্বিনেশনটা দারুণ হয়। কইমাছ আর ফুলকপির গন্ধ মিশে এক আশ্চর্য রসায়ন তৈরি করে। ট্যাংরা মাছের সঙ্গে পিঁয়াজকলি-ও। মেটে আলুর সঙ্গে মুলো। লাউয়ের সঙ্গে ছোট চিংড়ি।

কইমাছে কীরকম পচা গন্ধ পেল অনিকেত। মুখ থেকে বার করে ফেলে দিল। আবার একটু খুঁটে নিল। পচা গন্ধই তো!

মুখ বিকৃত করল অনিকেত।

শুক্লা বলল, কী হল?

অনিকেত বলল—বুঝতে পারছি না। মাছওলা কি মাছ পাল্টে দিল? আমি তো জ্যান্ত মাছ-ই এনেছিলাম। পচা গন্ধ লাগছে কেন?

শুক্লা বলল—তা কী করে হয়? তিনটে মাছই তো কাঁপছিল। কইমাছের প্রাণ সহজে যায় না। আমি একটু দেখি তো?

শখ করে খুব দাম দিয়ে বড়-বড় কইমাছ কিনেছিল। তিনটে মাছেই আড়াইশো।

শুক্লা অনিকেতের পাত থেকে সামান্য দ্বিধামাখা আঙুলে মাছ খুঁটে নিয়ে মুখে দিল।

—কী যা-তা বলো, কোথায় পচা? খুব স্বাদের মাছ। শুক্লা বলল।

আবার মুখে দিল অনিকেত। পচা গন্ধ। মর্গের গন্ধ।

অদ্ভুত ব্যাপার। অনিকেত ভাবে, এটা কীরকম ভৌতিক ব্যাপার। অনিকেত কিছুক্ষণ চুপ থাকে।

ফোন এসেছে।

শুক্লা ফোন ধরতে যায়।

অনিকেত নিষেধ করে। বলে, ও শালারা জ্বালিয়ে খাবে।

শুক্লা ফোন ধরে।

অনিকেত শোনে—হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবে যাবে, এই তো খেতে বসেছে। একটু কিছু মুখে দিয়েই চলে যাবে। টাকাপয়সা? কত? অনিকেত খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠে, শুক্লার কাছ থেকে ফোনটা কেড়ে নিয়ে রেখে দেয়।

বলে, একদম পেয়ে বসেছে। সব সময় আমরা কেন? ওর আত্মীয়স্বজন নেই? ভাই-বোন নেই?

গজগজ করতে-করতে হাত ধুয়ে নেয় অনিকেত। শখের ফুলকপি দিয়ে কই-টা খাওয়া হল না।

শুক্লা বলল, তোমার কী হয়েছে বলো তো? এরকম তো করো না। মাছটা খামোকা খেলে

না। সত্যিই কি পচা গন্ধ পেয়েছিলে?

অনিকেত বলে, আমি মিথ্যে-মিথ্যে বলতে যাব কেন? এত শখ করে আনলাম...।

শুক্লা বলল—ওটাই হল কারণ। শখ করে আনাটা। সবার মনের ভিতরে আর একটা 'মন' থাকে। সেই মনটা নিশ্চয়ই বাইরের মন-কে বলছে—তোমার এত পরিচিত দু'-দুটো মানুষ যখন মরছে, তখন এত শখ হয় কী করে? ফুলকপি, এত দাম দিয়ে কইমাছ, কড়াইশুঁটি—তার ওপর আবার নলেন গুড় এনেছ...। তোমার ভিতরের মন বাইরের মনটাকে বলছে—পচে গিয়েছ। এছাড়া তো অন্য কোনও কারণ দেখছি না। আমি তো নিজে খেয়ে দেখলাম, মাছটা বেশ ভাল।

যাকগে, ও নিয়ে আর বেশি ভেবে লাভ নেই।

যেখানে যাওয়ার কথা, গেল। একবার ট্যাক্সিও নিতে হল। কীভাবে টাকাপয়সা খরচ হয়ে যাচ্ছে ফালতু-ফালতু। ধর্মে যদি খুব বিশ্বাস থাকত, তা হলে ভাবা যেত এটা এক ধরনের ইনভেস্টমেন্ট। ওর জীবন-খাতায় পুণ্য ক্রেডিট হচ্ছে। পরলোকে গিয়ে সুখে থাকবে। যদি মুসলমান হত—অনন্ত বসন্তের জান্নাৎ বা বেহেশ্‌ত পেয়ে যেত। ওখানে গেলে সব পুরুষই তেত্রিশ বছর বয়সের হয়ে যায়, মেয়েরা ষোড়শী। সব গাছ ফলে পূর্ণ। ফল খাওয়ার ইচ্ছে হলেই গাছের ডালটা নেমে যাবে, তুমি শুধু হাত বাড়িয়ে খেয়ে নাও। বেহেশ্‌তিদের সেবার জন্য কানে দুল-পরা কিশোররা সবসময় নিয়োজিত থাকবে। তারা বারবার পানপাত্র পূর্ণ করে দেবে। কিন্তু ওই শরাব খেয়ে কেউ মাতাল হবে না। ওই কিশোর-বালকরা বেহশ্‌তিদের সবরকম সেবা করবে...। এদেরইকি ওমর খৈয়াম 'সাকী' বলেছে? কে জানে রে বাবা। কিন্তু এই সার্ভিসটায় পুণ্য ক্রেডিট হবে তো? সন্দেহ হওয়ার কারণ, ও যার জন্য সময় এবং অর্থ ব্যয় করছে সে তো ঠিক পুরুষ নয়। ও যা করেছে—তা গুনাহ্‌ করেছে। অন্যায় করেছে। বেশির ভাগ ধর্মই দুলালদের যৌন-জীবন সমর্থন করে না। মৃত্যুর পর দুলাল দোজ্‌খে যাবে, কিংবা নরকে। দু'টোই এক জায়গা অবশ্য। এই পাপাচারী পাষণ্ডকে মদত করলে পুণ্য হবে, না কি পাপ বাড়বে? এর ফয়সালা কে দেবে? ভাটপাড়ার কোনও ব্রাহ্মণ মনু-বৃহস্পতি-পরাশর থেকে কোনও উদ্ধৃতি দিতে পারবে না, কিন্তু বলে দেবে অধর্ম। ক্যাথলিক, ইহুদি এবং মুসলিম মতে তো দুলালের জীবনের ষোলো আনাই মাটি। কিন্তু হতে পারে, সবার মনের ভিতরে আর একটা মন আছে, যার কথা শুক্লা বলছিল, সেখানে একজন ধর্মগুরু বিরাজ করেন। তাকে ঠিকমতো দেখা যায় না, বোঝাও যায় না। যার কেরদানি বা ক্যারিশ্‌মা-য় টাটকা কইমাছ পচা মনে হয়; মনের ভিতরে মন, তার ভিতরে আর একটা মন, ওটা বোধহয় মনকোঠা। ওখানে কিছু একটা হয়। কী জানি কী হয়? এন্ডোক্রিন দিয়েও ব্যাখ্যা হয় না। ফ্রয়েড-পাভলভ-ইয়ুংও বোধহয় এসবের উত্তর জানেন না।

অকুস্থলে পৌঁছল অনিকেত। ওখানে বদু আছে, আর দুলালের কীরকম যেন জ্ঞাতিভাই রয়েছে। দুলালের ছেলে মন্টুও আছে। ওকেই তো মুখাগ্নি করতে হবে।

ছোট্ট একটা ঘরে একজন মাঝবয়সি লোক বসে ছিল। ওর আঙুলে রঙিন পাথরের আংটি, ডানহাতের কনুইয়ের মধ্যে দু'টো বড় সাইজের মাদুলি এবং একটা শেকড় বাঁধা। লাশ নিয়ে কারবার, তাই বোধহয় ভূত-প্রেতের হাত থেকে বাঁচার জন্য এসব সাবধানতা। বদু বলল, লাশ দিচ্ছে না স্যর।

অনিকেত গলার পর্দাটা এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে কথা শুরু করল, যেন অনুরোধ-উপরোধ না-হয়ে বাক্য-ডেলিভারিটা হুকুমায়িত হয়।

—কী হল? ব্যাপারটা কী? বডি ছাড়ছেন না কেন?

—কী করে ছাড়ব? কার বডি কাকে দিয়ে দেব? ও দুলাল না দুলালী, ওটার ফয়সালা তো আগে করতে হবে, না কি?

—কেন? ডেথ সার্টিফিকেট-এ তো দুলালী লেখা আছে।

—ডেথ সার্টিফিকেট-টা ওরই তার কী প্রমাণ? কেউ যদি রামের ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে এসে শ্যামের বডি চায়, দিয়ে দেব না কি? এটা তো পুলিশ কেস। পুলিশের কাগজে লেখা আছে দুলাল। রেশন কার্ডে দুলাল। ডেথ সার্টিফিকেটে দুলালের পর একটা 'আই' যোগ করে দিয়েছে। সব একইরকম না হলে কী করে বডি ছাড়ব? আগে কাগজপত্র ঠিকঠাক করে আনুন। লোকটা গলা চড়িয়ে বলল।

—দিন, ফোনটা দিন তো, পুলিশ কমিশনারকে একটা ফোন করি।

অনিকেত পুলিশ কমিশনারকে চেনে না। ফোন নম্বরও জানে না। একটু চমকে দেওয়ার জন্য কায়দা করেছিল।

লোকটা বলল, পুলিশ কমিশনার কেন, মুখ্যমন্ত্রী বললেও কাজ হবে না। আমি চাই পেপার। লোকটা কলম খুলে অন্য কীসব কাগজপত্র দেখতে লাগল।

একটা ডোম এল। অনিকেতকে হাতছানি দিয়ে বাইরে ডাকল।

বলল, শোনেন স্যর, সাহেব খুব কড়া। আমি বলে-কয়ে দেখি। আমাকে বকশিস দেবেন।

—কত?

—দু'হাজার।

—দু'হাজার কেন?

—এমনি লাশটা টেবিল থেকে খাটিয়ায় সরাতেই তো পাঁচশো নিই। এটা তো গড়বড় কেস। কেসটা তো হিজড়ে কেস। হিজড়ে-মড়া আমি ছুঁই না। অন্যকে দিয়ে করাব। সে আরও নিচু ডোম। লোকটার মুখ থেকে চুল্লুর গন্ধ বেরচ্ছিল।

—এক হাজার নাও, এক হাজার।

—না। তা হলে হল না।

এবার গলা পরিবর্তন করে অনিকেত। 'বাবু, এই গরিবকে ভিক্ষে দিন' বলার সময় গলার পর্দা যেখানে থাকে, সেখানে রেখে বলল, ছেড়ে দাও না বডিটা, ওর কেউ নেই। আমাকেই সব দিতে হবে।

—আপনি তো ভদ্দরলোক, ওর সঙ্গে কী?

—কিচ্ছু না, ওর মা আমার বাড়ি কাজ করত।

—তা হলে তিন থাপ্পড়।

থাপ্পড় শুনে ঘাবড়ে গেল অনিকেত।

হাতের পাঁচটা আঙুল এক করে ঠাকুর-দেবতার বরাভয় মুদ্রা, কিংবা কংগ্রেসে ভোটের হাত-চিহ্নর মতো হাতটা সামনে ধরে।

—এক হাতের পাঁচ আঙুল। মানে পাঁচশো। তিন থাপ্পড় মানে তবে দেড় হাজার?

অনিকেত জিজ্ঞাসা করল, দেড়?

লোকটা ঘাড় নাড়ল।

রফা হল।

একটা নীল পলিথিনে মোড়ানো দেহ। তলার দিকে একটু ছেঁড়া, ওখান থেকে পায়ের আঙুল বেরিয়ে আছে। পায়ের আঙুলে একটা রিং। গয়না?

—ইচ্ছে হলে মুখ খুলে দেখে নিতে পারেন মাল ঠিক আছে কি না। ডোম বলল। বাবুর সঙ্গে কোনও কথা হল না। উনি কর্মে নিমগ্ন।

এবার একটা মৃতদেহ এবং চারজন জীবন্ত। অনিকেত, মন্টু, বদু এবং দুলালের কোন জ্ঞাতি।

দুলালের জ্ঞাতিভাই বলল—শত হলেও নিজের লোক। যোগাযোগ ছিল না। তবে আমার ঘরের কেউ মরলে ওদের নেড়া হতে হয়, ওদের কেউ মরলে আমাদের। আমার বাপ যখন মরল, দুলাল তো তখন নিরুদ্দেশ। নেড়া হয়নি। কিন্তু দুলাল মরেছে, আমি নেড়া হব। ঘাটের কাজও করব।

অনিকেত জিজ্ঞাসা করল, ও কীরকম ভাই হত আপনার?

ও বলল, আমার ঠাকুর্দা আর দুলালের ঠাকুর্দা ছিল দু'ভাই।

—আপনার নাম?

—পঞ্চানন মিরধা।

—কোথায় থাকেন?

—কাছেই তো থাকি।

অনিকেত বলল—এবার তা হলে সৎকারের কাজ করুন। আপনার জ্ঞাতিভাই যখন, আপনিই যা হোক করুন। আমার আর কোনও কাজ নেই।

কোথায় পোড়ানো হবে? পঞ্চানন মৃধা মাথা চুলকাল। বলল, আমরা তো আমাদের লোকজন মরলে মুড়াগাছার শ্মশানেই পোড়াই। ওখানে হিজড়ে পোড়ালে পঞ্চায়েত থেকে আবার আপত্তি করবে কি না কে জানে? মহা গেরো হল। নিমতলা নিয়ে গেলে হয় না?

অনিকেত বলল—আপত্তি হবে কেন?

পঞ্চানন বলল—আমাকে কিন্তু আগেই দেবু মণ্ডল বলে দিয়েছিল ওকে গাঁয়ে এনো না। শ্মশান অপবিত্তর কোরো না।

—দেবু মণ্ডল কে?

—আমাদের প্রধান। আমরা আট-দশ গাঁয়ের লোক মুড়াগাছার সোঁতার ধারে শ্মশানেই তো পোড়াই। ওখানে আজ অবধি হিজড়ে পোড়েনি। কে জানে, ওরা যদি ঝামেলা করে, শহরের ভিতরে কেউ কারও খোঁজ রাখে না। আর খরচার কথা যদি ধরেন—মেটাডোরে এই শ্যালদা থেকে মুড়াগাছায় মড়া নিতে যা খরচ, তার চেয়ে কমে নিমতলায় হয়ে যাবে। বদু, মানে বদরুদ্দিন বলল—শুনেছি হিজড়েরা নাকি কবর দেয়?

অনিকেত বলল, আর হিজড়ে-হিজড়ে করছ কেন? দুলাল তো ওই জীবন শেষ করে তোমাদের কাছেই চলে এসেছিল।

পঞ্চানন মন্টুকে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ রে, তোর বাপ কিছু বলেছিল তোকে, মরলে কী করতে হবে না হবে?

মন্টু ঘাড় নাড়ে।

পঞ্চানন বলল—বডি-টা যদি না নিতাম, তা হলে সরকার থেকেই যা করার করে দিত। একবার ভেবেওছিলাম বডিটা লোবনি। আমার পরিবার বলল, না, মরার পরে সৎকার না-হলে ও ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবে, সে কি ঠিক হবে? হিজড়ে-ভূত ভাল নয়কো...।

পঞ্চানন বলতে থাকে, খুড়িমাও বোধহয় বাঁচবে না। যদি একসঙ্গে মিটে যেত, একই দিনে কাজটা করে ফেলতুম। মরলে আবার নতুন করে ঝামেলা।

মর্গের সামনেই ম্যাটাডোর দাঁড়িয়ে থাকে। ওখানে খাটিয়াও রাখা থাকে। অনিকেত চলে যাবে ভেবেও যেতে পারল না। ও সামনে, ড্রাইভারের পাশে বসল।

শীতকালের এই কয়েকটা মাত্র দিন কলকাতা শহর বড় সুন্দর হয়ে ওঠে। আকাশ থেকে নেমে আসে জরির ঝালর। বাহারি পোশাক গায়ে মানুষরা। রাস্তা জুড়ে কেমন যেন উৎসব-উৎসব ভাব।

এরই মধ্যে একটা প্রায়-অঙ্গার মৃতদেহকে নিয়ে চলেছে অনিকেত। ম্যাটাডোরের ড্রাইভার ক্যাসেট চালিয়েছে, 'ও কেন এত সুন্দরী হল।' ওরই মধ্যে ড্রাইভারটা বলল—স্যর, হিজড়ে-মড়া? বয়স তিরিশের মতো। চিমসে।

অনিকেত চমকে উঠল।

—আপনি কী করে জানলেন?

—আমায় কেউ আপনি বলে না। 'তুই', 'তুমি' এসব।

—আচ্ছা, ঠিক আছে। কে বলেছে?

—ডোম।

—কী বলেছে?

—বলেছিল মড়াটা হিজড়ে। বেশি চাইবি।

—বেশি চেয়েছিলে?

—না, স্যর। যা ভাড়া তা-ই চেয়েছি। অন্যরা হলে বলত মেটাডোরে হিজড়ে ওঠাই না, ওঠালে গাড়ি খারাপ হয়...এসব।

—বেশি চাইলে না কেন?

—বেশি চাইলাম না, সত্যি কথা বলছি, আপনাকে দেখে।

বারো বছর এ লাইনে আছি, দু'বার হিজড়ে-কেস পেয়েছিলাম। একটা ছিল সুইসাইড কেস, রেলে গলা দিয়েছিল, বডি নিয়ে শ্মশানে যাইনি, টিটাগড়ে, ওদের ঠেক-এ। হিজড়েরা দল বেঁধে নিতে এসেছিল। মেটাডোরে লাশ ওঠানোর পর ওরা তালি বাজাচ্ছিল। আর একটাও, স্যর, রেল কেস। সুইসাইড নয়, পড়ে গিয়েছিল। ওরা কিন্তু বলছিল, পড়ে যায়নি, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল কোনও পাবলিক। ওরা তো ট্রেনে উঠে পাবলিকের কাছে টাকাপয়সা চায়, বিচ্ছিরি রং-ঢং করে, ওইসব নিয়েই হয়তো কিচাইন হয়েছিল। ওদের দলের একজনকে কোনও ভদ্দরলোক ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাকি যারা ছিল ওরা পুলিশে ডায়রি করেনি? শুনলাম, পুলিশ ডায়রি নেয়নি। পুলিশ বলেছে, কে ধাক্কা মেরেছে তার নাম বলো, ঠিকানা বলো। ওরা কী করে জানবে, যে ধাক্কা দিয়েছে তার বিত্তান্ত? পুলিশ ওদের ফুটিয়ে দিয়েছিল স্যর। সেবারও ছ'সাত জনকে নিয়ে শ্মশানে যাইনি, ওদের ঠেক-এ

গিয়েছিলাম। ওটা ছিল টিকিয়াপাড়ায়।

—ওদের থেকে বেশি টাকা নিয়েছিলে?

—তা স্যর বেশিই চেয়েছিলাম। ওরা তো দরাদরি করে, কিন্তু যখন বলি হিজড়ে-বডি ওঠাই না, তখন ওরা কিছু বলতে পারে না। লাস্ট কেস-টাতে স্যর, একজন বলেছিল, আমাদের বডি তুললে কি অপবিত্র হবে? তবে আমরা শুধরানি করে দেব। মুতে দেব। আরও সব কাঁচা খিস্তি স্যর। আমিও তুলব না। পরে সেট্‌ল হয়ে যায়। কিছু বেশি তো নেবই।

ওরা স্যর শ্মশানে না-নিয়ে নিজেদের ঠেক-এ নিয়ে যায়। শুনেছি ওদের কীসব আচার-টাচার আছে। আলাদা মন্তর আছে। একজন বলেছিল—ওদের নাকি কবর হয়। যে-বাড়িতে থাকে ওখানেই পুঁতে দেয়। এটা কি ঠিক?

অনিকেত বলে, জানি না।

অনিকেত নিলয় চৌধুরী আর মলয় মজুমদারের বইটা পড়েছিল। ওখানে লেখা আছে গভীর রাতে ওরা শ্মশানে যায়। কোথাও আবার মৃত শরীরে লাঠির বাড়ি মারা হয়, ওঁরা লিখেছিলেন—আগ্রার কাছে কোথাও হিজড়েদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা, মৃতদেহকে স্নান করানো হয়, তারপর শবযাত্রা। শবযাত্রায় কোনও হিজড়ে যায়নি। কিছু পড়শি, মৃতের দুই পালিত পুত্র আর ওদের খোল-এ যাতায়াত করা লোকজন। একসময় একজন হিজড়েকে জিজ্ঞাসা করা হল, মৃতদেহের সঙ্গে আপনারা গেলেন না কেন? জবাব এল, হামে ঔরতে। ইস লিয়ে মৌত কা সাথ যানা গুনাহ্ হ্যায়। শবদেহ নিয়ে শ্মশানে বা গোরস্থানে মেয়েরা যায় না।

কেউ-কেউ ভাবে হিজড়েদের নাকি পোড়ানোই হয় না। ওদের ভাগাড়ে ফেলে আসা হয়। এরকম নানারকম গুজব, সত্যি-মিথ্যে কাহিনি আছে। মৃত্যু-পরবর্তী আচারটা স্থান ভেদে বিভিন্ন রকম হয়। দুলাল যদি এখানে না পালিয়ে আসত, ওর সেই পানাগড়ের খোলেই মারা যেত, তা হলে কী হত কে জানে?

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল—যে মারা গেছে ও কি সত্যিই হিজড়ে?

—হিজড়ে বলতে কী বোঝো তুমি?

—আমি স্যর এইটুকুই জানি, ওরা ছেলেও না মেয়েও না। ইস্কুলে ব্যাকরণ বইতে পড়তাম না স্যর, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ আর ক্লীবলিঙ্গ...। পরীক্ষায় লিঙ্গ পরিবর্তন আসত। পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গ করো, আবার স্ত্রীলিঙ্গ থেকে পুংলিঙ্গ করো। চাকর-চাকরানি, গয়লা-গয়লানি, কিন্তু ক্লীবলিঙ্গের কোনও লিঙ্গ পরিবর্তন হত না। এরা হল সেই ক্লীবলিঙ্গ। ঠিক বলেছি স্যর?

—না, ঠিক বলোনি।

—কেন স্যর?

ক্যাসেটে তখন, 'তবে কেন পায় না বিচার নিহত গোলাপ' হচ্ছে।

—সে অনেক কথা। এখন থাক।

—ঠিক আছে স্যর। কিন্তু ডোমটা যা বলেছিল, সেটা কি সত্যি? যার বডি যাচ্ছে সে হিজড়ে...

—হ্যাঁ। কিন্তু সে ক্লীবলিঙ্গ নয়, পুরুষ হয়েই জন্মেছিল। পরে হিজড়েদের দলে চলে গিয়েছিল।

—অ, আপনার কেউ হয়!

—ভাই।

—ভাই? না ভাইয়ের মতন!

—না, ভাই। দূর সম্পর্কে।

—তা হলে ভদ্দরলোকদের ঘরেও হিজড়ে হতে পারে? যাব্বাবা। আগে ভাবতাম ছোটলোকদের ঘরেই হিজড়ে জন্মায়।

—কেন এরকম ভাবতে?

—সেটা বলতে পারব না স্যর। ভাবতাম, যারা আগের জন্মে ব্যভিচার করে, মা-বোন মানে না, ওরাই পরের জন্মে হিজড়ে হয়ে জন্মায়।

—তো, ব্যভিচার কি ভদ্দরলোকরা করে না নাকি?

—করে, বেশি করে করে।

—তবে? ভদ্দরলোকের ঘরে হিজড়ে জন্মায় না বলছ কেন?

—কে জানে স্যর কেন বললাম?

এবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

ড্রাইভার বলল—আর একটা কথা জিগ্যেস করব স্যর? এই ডেডবডি-টার আপনি ছাড়া আর নিজের লোক কে আছে?

—কেন, ওর ছেলে আছে তো?

—ছেলে? নিজের?

—হ্যাঁ।

—যাব্বাবা সব গুলিয়ে যাচ্ছে স্যর। ও হিজড়েদের দলে ভিড়ল বড়বেলায়? ছেলে হওয়ার পর?

—হ্যাঁ।

—আরও গুলিয়ে যাচ্ছে স্যর। আগে ভাবতাম যারা ক্লীবলিঙ্গ হয়ে জন্মায়, যাদের এটা-ওটা কিছুই নেই, শুধু একটা ছ্যাঁদা, পেচ্ছাব করার—বাপ-মায়েরা সেই বাচ্চাটাকে হিজড়েদের দিয়ে দেয়। নইলে হিজড়েরা যখন বাচ্চা নাচাতে আসে, ওরকম দেখলে নিয়ে যায়। আবার এটাও শুনেছি, কোনও বাপ-মা যদি মায়া করে বাচ্চা লুকিয়ে রাখে, হিজড়েরা যে তালি দেয়, সেই তালির শব্দ শুনে বাচ্চারা ঘর ছেড়ে চলে যায়...। এগুলো সব বাজে কথা?

—বাজে কথাই তো।

শ্মশানে এসে থামে। নিমতলা।

লাইনে বেশি ছিল না। দু'টো মাত্র। ইলেকট্রিক চুল্লিতে চল্লিশ মিনিট করে ধরলে দেড় ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করতে হবে। অফিশিয়াল কাজকর্ম অনিকেতকেই করতে হল। ফর্ম ফিল-আপ, ডেথ সার্টিফিকেট জমা দেওয়া ইত্যাদি।

বামুন চলে এল। ওর পুঁটলিতে সবই থাকে। মূল্য ধরে দিলেই হয়। বামুন বলল, প্লাস্টিকে মোড়া কেন? পঞ্চানন বলল, পুড়ে যাওয়া কেস কিনা...।

—ও অপঘাত মৃত্যু। প্রায়শ্চিত্তির আছে।

—করে দিন...।

—প্লাস্টিক খুলতে হবে তো...।

প্লাস্টিক খুলল পঞ্চানন আর বদরুদ্দিন মিলে। কোনও মুসলমান হিন্দু-মড়া স্পর্শ করছে বলে পঞ্চানন আপত্তি করল না।

খুলতেই আঁতকে উঠল সবাই। সমস্ত দেহটা বীভৎস দেখাচ্ছে। মুখটা পোড়েনি।

নাম কী? বামুন জিগ্যেস করে।

দুলালী মৃধা। অনিকেত বলে।

দুলালী? বামুন ঠাকুর দেহটা নিরীক্ষণ করতে থাকে। আর একবার প্রশ্ন করে, দুলালী?

অনিকেত মাথা নাড়ায়। পঞ্চানন বা বদু কিছু বলে না।

গঙ্গাজলে স্নান করাতে হয়। এখানে স্নান করানো যাবে না, ছিটা দাও। বিসলারি-র সাদা বোতলটা ঝোলা থেকে বার করে।

—মুখাগ্নি করবে কে?

মন্টুকে দেখায় ওরা।

মন্টু এতক্ষণে কাঁদে।

—জল ছিটাও। বলো অপহতা সুরারক্ষাংসি বেদীসদঃ।

যা বলল তা-ই বলল মন্টু।

চাল, কলা, তিল এসব দিয়ে মণ্ড পাকানো হল। বামুন বলল, তোমার মায়ের মুখে ছোঁয়াও।

—গোত্র কী?

পঞ্চানন বলল, কচ্ছপ।

—কচ্ছপ হয় না, কাশ্যপ।

—বলো—কাশ্যপ গোত্রং প্রেতং দুলালী দেব্যাঃ এতত্তে তিলতন্ডুলোদকং তৃপ্যস্য। এসব কাজ-কর্মের পর পাঠকাঠিতে আগুন ধরানো হল।

বদু হঠাৎ একটু দূরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। দু'হাত সামনের দিকে বাড়ানো। দোয়া চাওয়ার সময় যেমন করে। বামুনঠাকুর জ্বলন্ত পাটকাঠি মন্টুর হাতে দিয়ে বলল মুখে ছোঁয়াও। ঠিক তক্ষুনি মন্টু ভীষণ জোরে 'মা, মা—মাগো' বলে কেঁদে উঠল।

মন্টু বলতে লাগল, বাবা গো, কতবার বলেছিলে 'মা' ডাক খোকা, আমাকে 'মা' ডাক। আমি ডাকিনি। 'মা' ডাকিনি। এখন তোমায় 'মা' ডাকছি, তুমি তো শুনতে পাচ্ছ না...

বামুন বললেন—শোক পরে। পড়ো—ওঁ দেবা দেবাশ্চাগ্নি মুখাঃ সর্বে হুতাশনং গৃহীত্বা এনং দহন্তু...

দহনের জন্য প্রার্থনা মন্ত্র।

মন্টু নিজস্ব দহনে কেঁদে যায়।

মৃত্যুর আগে লিঙ্গ-ছিদ্রপথে ছদ্ম-ঋতুরক্ত দেখেছিল ও। এবার মাতৃডাক-ও পেল।

শুনল না দুলালী।

শুক্লা বলল, কেক এনো।

বড়দিন কিনা, কেক খেতে হয়। রথের দিনের পাঁপড়ের মতোই বাঙালি যিশুর জন্মদিনে কেক খায়। হিন্দু-বাঙালিরা ঈদে একটু ফিরনি খেতে পারত, না হলে পায়েস। কই, খায় না তো? ঈদের আগে রাজাবাজার-মল্লিকবাজার-খিদিরপুরে রকমারি সেমুই বিক্রি হয়। অনিকেত তো কখনও কেনেনি।

যিশুর হ্যাপি বার্থডে। বাড়িতে কেক কাটা হল। অনিকেত কিছুটা খেল। বিকেলে শুক্লার পোষা কাক দু'টো আসে না। ওরা সকাল ৮টা নাগাদ একবার আসে, বেলা দেড়টা নাগাদ আর একবার। ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ। এই যে শুক্লা কেকের ভিতর থেকে কিশমিশ দু'টো খুঁটে বের করে ট্রে-র এক কোনায় রাখল, নিশ্চয়ই হাঁদা-ভোঁদার জন্য। কাক দু'টোর মধ্যে একটা বেশি চালাক, খাবারটা ঠুকরে নিয়ে আগেভাগে পালায়। ও হল ভোঁদা। অন্যটা হাঁদা। যখন ওরা চুপচাপ থাকে, শুক্লা হাঁদা-ভোঁদা'কে আলাদা ভাবে চেনে। অনিকেত চেনে না। হারু আর নাড়ুকেও শুক্লা চেনে আলাদা-আলাদা ভাবে। হারু আর নাড়ু, দু'টোই রাস্তার কুকুর। ওদের নেড়ি বলা হয়—কেন কে জানে? দু'জনই ধূসর, কিন্তু একজন, নাড়ু, প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আত্মসম্মানী। রুটি ছুড়ে দিলে খায় না। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রেখে দিতে হয়। চোখের ভাষায় বোঝাতে হয় 'ইহা তোমারই জন্য', কিংবা রুটিটা হাতে ধরে 'নাড়ু নাড়ু' বলে ডাকতে হয়, নাড়ুবাবু হাত থেকে রুটিটা কামড়ে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু হারুর কোনও আত্মসম্মান নেই। ছুড়ে দিলেও লেজ নাড়তে-নাড়তে খেয়ে নেয়। অথচ নাড়ু-হারু একই প্রজাতির কুকুর, একই পরিবেশে বড় হয়েছে। অথচ দু'জনের দু'রকমের ব্যক্তিত্ব। এর কী ব্যাখ্যা কে জানে?

দু'টুকরো কেক শুক্লা আলাদা করে রাখল কাগজে মুড়িয়ে—নিশ্চয়ই নাড়ু-হারুর জন্য। ঠিক এই সময় মন্টুর কথা মনে হল অনিকেতের। ও কী করছে একা-একা? বেচারা একেবারেই অনাথ হয়ে গেল। দুলাল মারা যাওয়ার পর, তিনদিনের দিন, দুলালের মা মারা যায়। পঞ্চাননই সৎকারের ব্যবস্থা করেছে নিজের মতো করে। অনিকেতের বাড়িতে ফোন করেছিল মন্টু। শুক্লা তখন অনিকেতকে অফিসে খবর দিয়েছিল। অনিকেত একটু অনুনয়ের সুরেই বলেছিল, ওখানে আর যেতে পারব না। যেন, দুলালের মা শুক্লার বাপের বাড়ির দিকের কেউ। শুক্লা বলেছিল—না না, আর কত করবে? তবে দুলালের মা-ও তো আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছে... সেই কতদিন... এতদিন লোক কারও বাড়িতেই থাকে না। 'ঠিকই তো, ঠিকই তো' বলে ফোন কেটে দিয়েছিল অনিকেত।

ওই যে পঞ্চানন, দুলালের মায়ের কাছে ওর নাম কখনও শোনা যায়নি। ও এখন উদয় হয়েছে। ভালই হয়েছে, নইলে সব ধকল অনিকেতকেই সামলাতে হত। দুলালের মা-কে শেষ দেখাটা হল না। পোড়ামুখ কী আর দেখবে, অবশ্য দুলালের মা পুড়ে যাওয়ার আগেই বলত—

দ্যাকো দিকি, কীরকম মুখটা পোড়ালাম। দুলালের কারণেই নিজেকে 'পোড়ামুখী' ভাবত দুলালের মা।

পঞ্চানন কি মন্টুকে নিজের কাছে রাখবে? পঞ্চাননের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হয়নি। তবে এইটুকু জানে যে, পঞ্চানন মাছের কারবার করে। কলকাতা শহরের এই পূর্বপ্রান্তে অনেক বিল, বাঁওর, ভেড়ি ছিল। বিদ্যাধরী নদী স্রোত পাল্টেছে বারবার, আর অবশেষ রেখে গিয়েছে। ওসব মরা খাতে জল থাকত, আর থাকত মাছ। জল ছিল সামান্য লবণাক্ত। এই জলে পাবদা, পার্শে, ভোলা এসব ভাল হয়। কয়েক হাতের চিংড়িও। ১২/১৪ বছর আগেও প্রচুর মাছ উঠত স্থানীয় বাজারে। এখন কমে গিয়েছে। মন্টুকে কি মাছের কারবারে খাটাবে পঞ্চানন?

যা-খুশি করুক গে।

দুলালের মা মারা গিয়েছে দু'দিন হল। একদিন যাওয়া উচিত হয়তো, কিন্তু ঠিক তার আগেই ওরা চলে আসবে। পয়সাকড়ি নেবে না?

শুক্লা বলল—দু'পিস কেক ওই মন্টুটার জন্য রেখে দিলাম। কেকটা তো ভালই এনেছিলে। মন্টু ঠিক চলে আসবে।

আমিও তো মন্টুর কথাই ভাবছিলাম—অনিকেত বলে।

ঠিক এ সময় কলিংবেল বাজে। অনিকেত খুলে দ্যাখে ধড়াচুড়ো পরে মন্টু। ওরা দু'জনই একসঙ্গে বলে ওঠে—'তোর কথাই হচ্ছিল, অনেক দিন বাঁচবি।'

'অনেক দিন বাঁচবি' বলেই অনিকেতের মনে হল—এই সব সংস্কার-কুসংস্কারে ওর বিশ্বাস নেই, যার নাম করা হচ্ছে, সে যদি চলে আসে তক্ষুনি, তবে তার পরমায়ু বাড়ে, এটা একটা লোকবিশ্বাস। অনিকেত এটা বিশ্বাস না-করেও বলে ফেলল। আসলে রক্তে থাকে।

মন্টু একাই এসেছে। একটা ধুতি পরেছে, গায়ে চাদর, গলায় ঝুলছে একটা মাছ ধরার জালের লোহা। ছেলেটার সারা মুখে মেঘ। হাতে একটা ছোট ঝোলা। ঝোলার ভিতর থেকে বের করল একটা ছোট রুমাল, আর ভাঁজ করা কাগজ। আগে কাগজটা তুলে দেয় মন্টু।

শ্রীশ্রী দুর্গা,

আমার কখন কী হয় ঠিক নাই। আমার নাতি ছাড়া কেহ নাই, আর আছো তোমরা। এই আমার বিবাহের রূপার কানফুল, সোনার নাকফুল, রূপার হার, আর কর্তার দেওয়া সোনার কানফুল। বহু কষ্টেও বেচিনি। বউদি গো, সব তোমায় দিলাম। যদি পারো নাতিটারে দেখো, ভগবান মঙ্গল করুন।

তলায় কোনও সই নেই।

মন্টু বলল, ঠাকমা আমাকে দিয়ে এটা লিখিয়ে রেখেছিল।

কবে লিখিয়েছিল? শুক্লা জিজ্ঞাসা করে।

—দু'বছর আগে। আমি আর ঠাকমা ছাড়া আর কেউ জানে না।

এবার পুঁটুলিটা দিল। পুঁটুলিটা মানে, একটা সাদা রুমাল, গিঁট খুললে কুণ্ডলী-পাকানো সম্পত্তি।

সম্পত্তি সমর্পণ করল মন্টু। আর স্বাক্ষরহীন উইল।

শুক্লা চোখের জল মুছল।

—তুই এখন কোথায় আছিস?

—বাড়িতে।

—তোর বাড়িতে, না তোর জ্ঞাতির বাড়িতে?

—আমার বাড়িতে।

—ভয় করে না?

মাথা নাড়ে মন্টু।

বলে, ঠাকমার সঙ্গে শুতাম। সেই বিছানায় শুই না। নিচে মাদুরে শুই। বাপ আসে, পায়ে আলতা। বলে 'মা ডাক, মা ডাক।'

—তোর জ্ঞাতির বাড়িতে গিয়ে থাকিস না কেন? সে তো তোর কাকা হয়।

—ওরা লোক ভাল না।

—থাকতে বলেনি?

মাথা নাড়ে মন্টু। বলেছিল।

মন্টু বলে, আগে তো এ বাড়ি আসত না, ছোটবেলা থেকে দেখিনি। এখন আসছে-যাচ্ছে। একদিন বলল, 'তোদের জন্য অনেক টাকাপয়সা খরচ হচ্ছে আমার, তোর ঘরে কী আছে দেখি...' বলে ঘরের সব কিছু উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। ঠাকমা কোথায় টাকা রাখত আমাকে জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম, জানি না। ও বলল, জানিস না? তুই তো খুব স্যায়না। কিন্তু পেয়ে গেল। একটা কৌটোর মধ্যে রাখত। কুলুঙ্গির সব কৌটো খুলে দেখছিল সেই কাকু। একটার মধ্যে পেয়ে গেল। কত ছিল জানি না। কৌটোসুদ্ধু নিয়ে গেল। আমার সামনে গোনেনিকো। গুনলে তো জেনে ফেলব কত আছে। তবে আমি জানি, ওর মধ্যে অনেক ক'টা একশো টাকার নোটও ছিল। কত দিন ধরে জমিয়েছে, তাই না?

একনাগাড়ে অনেকগুলো বাক্য বলল মন্টু। এত কথা একসঙ্গে এর আগে শোনেনি অনিকেত। অনিকেত লক্ষ করল, মন্টুর স্বরক্ষেপণের মধ্যেও একটা সুর আছে, ওর হল রেডিও-র কান, ওই কানে ধরা পড়ল—

তবে কি এই মন্টুও ওই টাইপের নাকি? সেরেছে। আগেও লক্ষ করেছিল ব্যাপারটা। তবে যে ধারণা করা হয়েছিল মন্টু দুলালের ঔরসজাত নয়, দুলালেরও এই বিশ্বাস ছিল। তবে কি ওই ধারণা ভুল? মন্টু দুলালেরই ছেলে বলে দুলালের ওইসব গুণ পেয়েছে? কিন্তু একটা তত্ত্ব আছে, সমকামিতা বংশগত নয়। জিনের প্রভাব নেই। আবার অন্য একটা তত্ত্বও আছে, সমকামিতা জিন-প্রভাবিত। পৃথিবীব্যাপী গবেষণা চলছে সে-জিন খুঁজে বের করার। একসঙ্গে একগুচ্ছ প্রশ্ন। 'মহাভারত' সিরিয়ালে কর্ণ যেমন ডজনখানেক তির একসঙ্গে ছুড়ে দিত, সেরকম ভাবে প্রশ্ন চিহ্নগুলো ধেয়ে এল।

শুক্লা আশ্চর্য হয়ে বলল, সে কী রে, তুই কিছু বললি না?

মন্টু ঘাড় নাড়ল।

—কী বলব আমি? ওরা তো নিয়ে গেল।

—আশপাশের বাড়ির কাউকে কিছু বললি না তুই? চ্যাঁচালি না?

—কী করব বলুন? আমাদের তো কেউ দেখতে পারে না, বাবার জন্য।

শুক্লা বলল, এই যে তোর অশৌচ চলছে, তোর কাকু তোকে বলেনি ওর বাড়ি গিয়ে খেতে?

—বলেচে। ওখানে মালসা পোড়াচ্চি। একবেলা খাই।

—যাক। ওদের বাড়িতেই খাচ্ছিস তবে।

—হ্যাঁ।

—ওরা আর কী বলেছে?

—কাকি বলেছে, কাকুর সঙ্গে কাজে লেগে যা। এই বাড়িতেই থাকবি, খাবি।

—তো বলেছে যখন সেরকমটা করছিস না কেন?

মন্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ওখানেই থাকতে হবে। আমার তো আর কোনও উপায় নেই, আমার তো কেউ নেই। মন্টুর গালে জল।

অনিকেত বলল, কেক-টা ওকে দিয়ে দাও না।

শুক্লা বলল, আজ বড়দিন কিনা, কেক ছিল। খাবি? না, থাক। তুই তো হবিষ্যি করছিস। কেকে ডিম থাকে।

মন্টু বলল, কেক খেলে কি পাপ হয়?

কেউ কোনও উত্তর দিল না।

—হবিষ্যি করতে হয় কেন?

কেউ উত্তর দিল না ফের।

—বাবার আত্মা আর ঠাকমার আত্মা এক জায়গায়, তা-ই না? ওরা তো একসঙ্গেই বেশ আছে। আমি পড়ে আছি। আত্মারা কি কথা বলতে পারে?

আবার। নৈঃশব্দ্য।

শুক্লা জিগ্যেস করল, তুই কি স্কুলে পড়িস মন্টু...

—পড়ি।

—কোন ক্লাস?

—সিক্স কেলাস।

নাতির বই-খাতা কেনার জন্য টাকা নিয়ে যেত দুলালের মা। কোন ক্লাসে পড়ে ঠিকঠাক জানত না।

শুক্লা ধূসর রুমালটা মুঠোর মধ্যে ধরে বলল—তোর ঠাকুমা এটা আমার জন্য কোথায় রেখেছিল রে মন্টু, যেটা ওরা খুঁজে পায়নি?

—ঠাকমা এটা আমাকে দেখিয়ে রেখে দিয়েছিল একটা কাঠের ইঁদুর-মারা কলের ভিতর। ওটা তক্তাপোশের তলায় রাখা ছিল। ঠাকমা বলেছিল, চোর এলেও কিছু টের পাবে না।

মন্টু হাসল।

এই প্রথম মন্টুর হাসিমুখ দেখল অনিকেত।

শুক্লা দু'টো কলা ছাড়া কোনও ফল পেল না। অনিকেত ফল খেতে ভালবাসে না, ও ফল আনে না। শুক্লা অপছন্দ করে না যদিও, অনিকেত খায় না বলে, ওরও খাওয়া হয় না। কিন্তু শুক্লার ঠাকুরের জন্য একটু-আধটু ফল আনতে হয়। এটা হয়তো সেই দেবভোগ্য কলাই হবে।

একশোটা টাকা হাতে দিল শুক্লা। মন্টু হাত পেতে নিল।

বলল, মাঝে-মাঝে আসিস, আর একা থাকিস না। ওদের বাড়িতেই থাকবি। ও বাড়িতে আর কে-কে আছে?

—কাকা, কাকি, ওদের দুই ছেলে, এক মেয়ে।

—ছেলেরা কত বড়?

—আমার চেয়ে সবাই বড়।

—তোর সঙ্গে ভাল করে কথা বলে?

মন্টু চুপ করে থাকে।

শুক্লা মন্টুর মাথায় হাত স্পর্শ করে একবার।

দু'দিনে আলাদা ভাবে পারলৌকিক কাজকর্ম হল। দুলালের কাজ আগে হল, ওর মায়ের কাজ পরে। গঙ্গার ধারে কাজ সারা হয়েছিল। দুলালের কাজের দিন কেউ যায়নি, তবে দুলালের মায়ের কাজের দিন শুক্লা যেতে চাইল বলে, অনিকেত নিয়ে গেল। বাগবাজারের ঘাটে। ন্যাড়া-মাথা মন্টুকে দেখল। পঞ্চাননও ন্যাড়া-মাথা হয়েছে। একটা ওড়িয়াদের হোটেলে পাঁচ বামুনকে খাওয়ানো হল। যে-বামুন কাজটা করিয়েছিল, সে, ওর ছেলে, আর এক বামুনকে গাঁ থেকে ধরে এনেছিল। দু'জন বামুন কম পড়েছিল। একজন ঘাট থেকে ম্যানেজ হয়ে গেল, আর অনিকেত পঞ্চম ব্রাহ্মণ।

শালপাতার থালায় ভাত, ডাল, ছ্যাঁচড়া পড়ল। আমিষ না নিরামিষ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে ঘাটে ম্যানেজ-করা বামুন বলল, বাঙালির কাজে মাছ চলে। খরচা কমানোর জন্যই অনিকেত জোর গলায় বলল—না, নিরামিষ। বিধবার শ্রাদ্ধে আমিষ হয় না কি?

সেই বামুন বলে উঠল—'ইলিশ খলিসাশ্চৈব রোহিত মুদ্‌গরস্তথা এবং শফরিশ্চৈব পঞ্চমৎসা নিরামিষাঃ'। মানে ইলিশ, খলসে, রুই, মাগুর, পুঁটি—পাঁচ মাছ নিরামিষ। এরা বেশ ভাল কাতলার ঝোল করে।

অনিকেত বলল—না, ওসব বললে হয় না। নিরামিষই হবে।

সে আবার বলল, কিন্তু ছ্যাঁচড়ায় যে মাছের কাঁটা দেওয়া ছিল...

—ছ্যাঁচড়া ফেলে দিন।

ধোকার ডালনা ছিল। শেষ পাতে দই। মিষ্টি দই, পাশের দোকান থেকে আনিয়ে নেওয়া হল।

শুক্লা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। ও তো মহিলা। ব্রাহ্মণী হতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ নয়। এই পঙ্‌ক্তিতে বসতে পরে না।

শুক্লা বলল—ব্রাহ্মণ-ভোজনের টাকাটা দিয়ে দাও।

কিন্তু পঞ্চানন বলল, তা কি হয় নাকি?

—আপনি তো নিজেই বামুন। দয়া করে ভোজন করেছেন। আপনি কী করে টাকা দেবেন? ধম্ম মানতে হয়।

উল্টে দশটা টাকা পেল অনিকেত। ভোজন-দক্ষিণা।

বলল, আশীব্বাদ করুন যেন খুড়িমার সদগতি হয়।

শ্রাদ্ধে বদরুকে দেখল না। কিন্তু হাসপাতালে বদরু প্রায়ই আসত। হয়তো মুসলমান বলেই বলেনি।

সপ্তাহ দু'য়েক পরে একদিন ইস্টার্ন বাইপাসের বাস স্টপে বদরু এগিয়ে এল অনিকেতের কাছে।

—চিনতে পারছেন স্যর?

—চিনব না? বদরুদ্দিন সাহেব। কেমন আছেন?

—ওপরওলা যেমন রেখেছেন। ভাল আছেন স্যর? কলকেতা যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

এসব অঞ্চলে রাসবিহারী, ধর্মতলা, শিয়ালদা, এই জায়গাগুলোকে 'কলকেতা'-ই বলা হয়। অনিকেত বলল, হ্যাঁ। অফিস যাব। আপনি কোথায়?

—আমার একটা বুন আছে পল্লব পাগলাগারদে। বেয়লা।

—বুঝেছি। পাভ্লভ মেন্টাল হোম, কতদিন আছে?

—তা আছে দু'বছর। ওর জন্য বাড়ির গাছের গন্ধলেবু নিয়ে যাচ্ছি। গন্ধ শুঁকে ঠিক বুঝতে পারে বাড়ির গাছের।

—ওর কী হত?

—ও স্যর, কালী হয়ে যেত। মুসলমান ঘরের মেয়ে। কালী হওয়া ভাল দেখায়? সমাজ নেবে কেন? জিভ বের করে দিত। জামাকাপড় খুলে ফেলার চেষ্টা করত। আমরা হাত বেঁধে দিতাম। ও তখন বলত, আমি কালী, মুণ্ডমালাধারী—আরও কী সব মন্তর-টন্তর বলত। টিভি-তে খুব বামাখ্যাপা সিরিয়াল দেখত, ওখান থেকে শিখেছে। ঝাড়ফুঁক করা হল। লাভ হল না। কালী তো আপনাদের খুব কড়া দেবতা, এমনি ঝাড়ফুঁকে যাবে? বলুন স্যর, হ্যাঁ কি না...।

—হুঁ।

—তারপর কালীর ভর বেড়ে গেল। হিন্দুরা কয়েকজন এসে প্রণামী দিতে লাগত, প্রণাম করত, কিন্তু শান্ত হয়ে গেলে সব ভুলে যেত। তারপর আস্তে-আস্তে কেমনপানা হতে লাগল, খায় না, কারও সঙ্গে কথা কয় না, শুধু ভর হলে কথা কয়। আমি দু'টো নার্সিংহোমে সবজি সাপ্লাই করি। ওখানে এক ডাক্তারকে ব্যাপারটা বললাম। সে বলল, এটা একটা মনের রোগ। কী একটা নাম বলল। সে-ই ওই জায়গাটার সন্ধান দিল। গরমেন্টের। বেশি খরচ নেই। মাসে একদিন যাই। ওখানে টাকাপয়সা যা লাগে দিয়ে আসি। এখন অনেক ভাল আছে। ভর হওয়া বন্ধ হয়েছে। ছেড়ে দেবে কিছুদিন পর। আপনার বাড়িটা আমি চিনি। সামনে দিয়ে সাইকেলে যাতায়াত করি। রাস্তার মোড় থেকে অটো এখন শুকুরপুর পর্যন্ত যায়। তার আগেই মুকুন্দপুরে নেমে যাই, সাইকেল রাখা থাকে। সাইকেলে বাকি রাস্তাটুকু চলে যাই।

পরের রবিবার বদরু এল অনিকেতের বাড়িতে। বলল, একটু কথা আছে স্যর।

—কী কথা?

ব্যবসার জন্য টাকাপয়সা ধার চাইবে না কি?

বাইরের ঘরে বসাল। বলল, কী কথা?

—মন্টু এসেছিল এর মধ্যে?

—না তো।

—ওর জ্ঞাতির মতলব ভাল নয়। ওর ধান্দা দুলালের ভিটেটা দখল নেওয়ার। দুলালদের সেরকম দলিল-পর্চা নেই। সেই জমিদারের সময়কার খাইখালাসি বন্দোবস্ত। দুলালের বাপ-ঠাকুর্দা ভোগ করত।

—খাইখালাসি মানে?

—মানে হল জমিদাররা নাপিত, কুমোর, জেলে—এদের একটু জমি দিতেন, খাজনা দিতে হত না, তার বদলে নাপিতরা জমিদার বাড়ির সবার খেরি করে দিত, জেলেরা পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরে দিত, এরকম আর কী।

—তারপর?

—ওরা বলছে, মন্টু দুলালের ছেলে নয়। দুলালের বউয়ের চরিত্র খারাপ ছিল, তায় দুলাল পারত না, মন্টু হালাল বাচ্চা নয়। যাকে বলে অবৈধ। ওর ভিটে ওরা নেবে। এরকম বলে বেড়াচ্ছে, আর মন্টুকে ওরা খুব খাটাচ্ছে।

—গাঁয়ের আর সব কী বলছে?

—কে আবার কী বলবে, সবাই যারটা নিয়ে আছে। পঞ্চাননের সঙ্গে পঞ্চায়েতের মাথাদের দহরম-মহরম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে অনিকেত। তারপর বলে, আপনার কাছে এটা ভাল মনে হচ্ছে না। আপনি কেন প্রতিবাদ করছেন না?

—গাঁয়ের পলিটিক্সটা আপনি বোঝেন না স্যর। আমি তো অন্য লোক। অন্য মহল্লায় থাকি। অন্য ধর্মের লোক। আমার নাক গলানো ওরা ভালভাবে নেবে না। দুলাল আমার ছোট বয়সের দোস্ত। একসঙ্গে খেলা করতাম...

অনিকেত আবার চুপচাপ থাকে। মনে-মনে বলে, ছোট বয়সের দোস্ত, খেলা করতাম, কী 'খেলা' করতে সোনা?

বলা যায় না দুলালের সঙ্গে বদরু হয়তো ধরাধরি খেলা করত। পুরনো যৌনতার স্মৃতি ভোলা যায় না।

—তা এক্ষেত্রে আমি কী করব?

—সে আমি কী করে বলব? যা হয় করুন। যা ভাল বোঝেন। যদি পারেন, পঞ্চাননের সঙ্গে কথা কইতে পারেন।

অনিকেত জিগ্যেস করে—একটা কথা জিগ্যেস করি। মন্টু কি সত্যিই দুলালের ছেলে? আপনার কী মনে হয়?

মাথাটা একবার চুলকে নিয়ে বলল, হতেও পারে। দুলালের বাপ হতে না-পারার কোনও কারণ ছিল না। এটুকু জানি।

তার মানে, বদরু ওর বাল্য-কৈশোরে দুলালের লিঙ্গটিঙ্গ দেখেছে। 'বাপ হতে না-পারার কোনও কারণ ছিল না'—এই সেনটেন্স-টাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

কিন্তু দুলালের বাবা হওয়ার চেয়ে মা হওয়ার ইচ্ছেটাই বেশি ছিল। এটা পরে বোঝা গিয়েছে। বদরুকে এসব বলল না অনিকেত।

অনিকেত বলল, দেখি কী করা যায়।

শুক্লা ওপরে তখনও ঠাকুরঘরে। ওকে বলল না কিছু। কাজের লোক পাওয়া গিয়েছে। কমবয়সি মেয়ে। নামের বাহার আছে। মণিকুন্তলা। 'মণি' বলে ডাকা হয়। সালোয়ার-কামিজ পরেও মাঝেমাঝে কাজে আসে। শাড়িও পরে। স্বামী কী করে জিগ্যেস করাতে বলেছিল, কাপ্‌পেন্টার।

ছুতোর নয়। কার্পেন্টার। দুলালের মা-কে যা দিত এই মেয়েটাকে ওর ডবলেরও বেশি দিতে হচ্ছে। তবে দুলালের মা প্রায়ই বাড়ি থেকে এটা-সেটা পেত। শুক্লা কয়েকবার বলেছিল, খাজাইতলায় গিয়ে একবার ওদের খোঁজখবর নিয়ে আসতে। অনিকেত যায়নি। এসব শুনলে আবার ঝামেলা পাকাবে।

ইতিমধ্যে মঞ্জুর সঙ্গে টুকটাক দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। একদিন সিনেমা দেখেছে। গায়ে গা, হাতে হাত। এখানে-সেখানে ঘুরেছে হাত। সিনেমা-ফেরত আইসক্রিম খেতে-খেতে মঞ্জু বলেছিল, আমি একটা 'জোক' শুনেছি। অফিসে। নিজের বউ হল চকলেট। যখন খুশি খেতে হয়। পরের বউ হল, আইসক্রিম। ফেলে রাখতে নেই। গলে যায়।

সে সন্ধ্যায় পরস্ত্রীর স্পর্শ-মাখা ফুরফুরে শরীরে বাড়ি ফিরে অনিকেত শুনল, বিকেলে মন্টু এসেছিল। শুক্লার মুখের দিকে এতক্ষণ তাকায়নি। এবার তাকাল।

থমথমে মুখ।

তার মানে ঝামেলা পাকিয়েছে কিছু। অনিকেত জুতোটা খুলল। জামাটা আলনায় রাখল। তোয়ালেটা কাঁধে চাপিয়ে গিজার অন করল।

—মন্টু এসেছিল।

এবার কথাটা একটু ছুড়ে দিল। বোধহয় আগের বারে প্রতিক্রিয়া না-পেয়ে।

—কী বলল মন্টু?

—ও এ ক'দিনেই রোগা হয়ে গিয়েছে। স্কুলে যেতে পারছে না। ওর খুব শরীর খারাপ হয়েছিল। ভীষণ বমি-পায়খানা হয়েছিল। গজা ডাক্তার ওকে চেম্বারের বেঞ্চিতে শুইয়ে রেখে দু'বোতল স্যালাইন দিয়েছে। মন্টু বলছে, আগের দিন রাতে ওর খাবারে কোনও খারাপ গন্ধ পেয়েছিল। ডাল দিয়ে ভাত মাখার পরই গন্ধটা পেয়েছিল। ওটা কলাইয়ের ডাল ছিল। এই ডালের রং কালো হয়। দেখে কিছু বোঝা যায় না। ও খাওয়ার সময় বলেছিল, গন্ধ লাগছে। ওর কাকা বলেছিল, পুরনো ডালের গন্ধ। খেয়ে নে। কিছুক্ষণ পরই পেটে মোচড়। বমি। সারা রাত বমি করেছে। অনেকবার পায়খানা। শেষের দিকে পায়খানায় যেতে পারেনি। ঘরেই। বমির আওয়াজ পেয়ে কেউ নাকি আসেনি। সকালে ওর কাকা ডাক্তার-বদ্যি না-ডেকেই কাজে চলে যায়। ওর কাকার ছেলে এসব দেখে গজা ডাক্তারকে ডেকে আনে।

গজা ডাক্তার যখন ঘরে ঢুকেছিল, ওর হুঁশ ছিল না। পরে, যখন স্যালাইন চলছিল, তখন গজা ডাক্তার বলেছিল—রাতে যে-খাবার খেয়েছিলি, তাতে খারাপ গন্ধ ছিল? ও বলেছিল, হ্যাঁ। খারাপ গন্ধ ছিল। তারপর একটা প্যাকেট ছিঁড়ে, হাতে নিয়ে নাকের সামনে ধরে জিগ্যেস করেছিল এরকম? মন্টু বলেছিল—হ্যাঁ, ওরকম। গজা ডাক্তার বলেছিল—এই প্যাকেটে আছে ইঁদুর মারা বিষ। ভুল করে ডালে মেখে নিসনি তো?

ও কেন মাখতে যাবে? সেটাই বলল। ডাক্তার নাকি বলেছিল, ঘরে বমি পড়ে ছিল, ওর মধ্যে এই গন্ধটা পেয়েছিল।

শুক্লা এরপর একটা বড় শ্বাস নিয়ে বলল—বুঝলে, গজা ডাক্তার খুব ভাল ডাক্তার। গাঁ-ঘরে ইঁদুর মারার বিষ খেয়ে মরে তো অনেকে, এজন্য গন্ধটা চেনে। নিশ্চয়ই ডালের মধ্যে ওরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। ওকে ওরা মেরেই ফেলবে। বারবার চেষ্টা করে যাবে। ভিটেবাড়িটা বাগাবার তাল। ওকে কি ওখানে রেখে দেওয়া যায়? দুলালের মা আমাদের চিঠি দিয়ে বলে গিয়েছিল নাতিটাকে দেখতে।

শুক্লার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অনিকেত বলল—দুলালের মা তো এর আগেও একবার ওকে এখানে গছাতে চেষ্টা করেছিল—যখন দুলালের বউ কেটে পড়ল।

শুক্লা বলল—হ্যাঁ, বলেছিল। তখন তো রাখিনি। কিন্তু এ অবস্থায় ওকে ওখানে রাখা যায়? ঠিক মেরে ফেলবে। গজা ডাক্তার ওকে বলেছে সাবধানে থাকিস বাপ।

অনিকেত বলে—মানে? তুমি বলতে চাও ওই ছেলেটা এখন এখানে থাকবে?

—থাকুক না। স্কুলে ভর্তি করে দেব।

—মানে? আমার রিভাইস্‌ড ট্রান্সফার অর্ডার এল বলে। আমরা তো চলেই যাব।

—তুমি যেও। পারবে না? ভালই হবে তোমার। স্বাধীন। যা খুশি করতে পারবে বেশ...

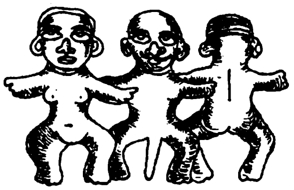

যে কোনও ব্যাপার নিয়ে কিছুদিন ঘাঁটাঘাঁটি করলে বিষয়টার ওপর একটা ধারণা জন্ম নেয়। গজা ডাক্তার যেমন হাগুর রং দেখেই বুঝতে পারেন কত নম্বর ট্যাংকিতে গন্ডগোল। অফিসের সমরেশ ঘোষ যেমন কোনও রেকর্ডিং-এ ভয়েস শুনেই বুঝতে পারেন লোকটার নস্যি নেওয়া অভ্যেস আছে কি না, কিংবা পান খাওয়ার নেশা আছে কি না। তেমনই কারও কথা শুনেই অনিকেত বুঝতে পারে তার মধ্যে 'গে'-ভাব আছে কি না। তবে কিন্‌সে-র তত্ত্ব অনুযায়ী, সবার মধ্যেই অল্পবিস্তর 'গে'-ভাব আছে। কিন্‌সে-র স্কেলে যারা 'শূন্যে' থাকে, তারা পরিপূর্ণ বিষমকামী। মানে একেবারেই সমকামী নয়। কিন্‌সে-স্কেলের এক, দেড়, দুইয়ে অনেকেই থাকে। তিন হলে উভকামী, ছয় হলে পরিপূর্ণ সমকামী।

সমকামী হলেই কথাবার্তার ধরন-ধারন, হাঁটাচলা এবং হাত-মুখের ভঙ্গি মেয়েলি হয় না। সমকামীদের মধ্যে যারা মনে-মনে নিজেদের মেয়ে ভাবে, কিংবা মেয়ে হলে ভাল হত এমনটা ভাবে, তাদের কথাবার্তার ধরন-ই মেয়েলি হয়ে থাকে সাধারণত। এরা সাধারণত যৌন-অভ্যাসে 'বট্‌ম গে' হয়ে থাকে। তবে এমন 'বট্‌ম গে'-র দেখা পবন-রঞ্জনদের ঠেক-এ অনিকেত পেয়েছে, যার মোটা গোঁফ আছে, এবং কথাবার্তায় কিছুই বোঝার উপায় নেই। 'বট্‌ম গে'-রা কমবেশি নিজেদের নারী ভাবে, ফলত পুরুষের দিকেই আকৃষ্ট হয়। এরা পুংলিঙ্গ গ্রহণ করার চেষ্টাও করে, কিন্তু নিজের লিঙ্গ কোথাও জমা দেয় না। বরং নিজের ঝুলন্ত অঙ্গটা নিয়ে মনোকষ্টেই থাকে। যারা 'টপ গে', কিন্‌সে-র স্কেলে ওরা আড়াই থেকে সাড়ে চারে থাকে। ওদের দেখে, কথা বলে, কিছু বোঝা যায় না। আর কিন্‌সে-র স্কেল তো থার্মোমিটারের মতো কিছু নয় যে, কারও শরীরের কোনও ছ্যাঁদার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে বলে দেবে ওর কত পয়েন্ট। মানুষ বড় বিচিত্র 'চিজ'। আজ যে তিন-এ আছে কাল সে পাঁচ-এও যেতে পারে। তখন তার বাক্‌ভঙ্গিমা পাল্টে যাবে না মোটেই। আর এই শূন্য থেকে ছয় পর্যন্ত কিন্‌সে-র ইউনিট তো অনেকটাই আন্দাজি ব্যাপার। 'টপ', 'বটম' ছাড়াও কেউ-কেউ দু'টোই। একইসঙ্গে।

এসব চিন্তাভাবনা মন্টুকে কেন্দ্র করেই। অনিকেত মন্টুর কথাবার্তার ধরন এবং হস্তবিন্যাসে কিছু একটা আঁচ করেছে। ওর এখন ১১/১২ বছর বয়স। বয়ঃসন্ধির কাছাকাছি। যদি এই বৈশিষ্ট্য ওর মধ্যে থেকে থাকে, পরে ওটা প্রকট হতে পারে। তবে ওর ধারণা ভুল-ও হতে পারে। অনিকেত কয়েকজন নাম-করা বুদ্ধিজীবীকে দেখেছে, যারা বড় কমনীয় কথাবার্তা বলে, নরম করে কথা বলে। মন্টুর ওই কথাবার্তার ধরন অন্য কোনও কারণেও হতে পারে না—এমন কথা নয়। এক ধরনের বিপন্নতা-বোধ বা অসহায়তা থেকেও হতে পারে।

আসলে অনিকেত নতুন কোনও ঝামেলা নিতে চাইছে না। ও অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি ফেরে। দোকান থেকে এক বাক্স প্যাঁড়া নেয়।

শুক্লাকে বলে, তোমার গোপালের জন্য প্যাঁড়া।

—ওবাব্বা! হঠাৎ?

—তুমি তো গোপালকে গুজিয়া খাওয়াও। আজ প্যাঁড়া নিয়ে এলাম।

—কখনও তো আনো না, তোমার কি প্যাঁড়া খাবার ইচ্ছে হল নাকি?

—না, আমার জন্য নয়, গোপালের জন্য। গোপাল তো আমাদের একজন ফ্যামিলি মেম্বার। রোজ গুজিয়া খেতে ভাল লাগে নাকি?

—বাঃ ভালই তো। বোঝা যাচ্ছে বয়স হচ্ছে।

—বয়সের সঙ্গে এর আবার কী সম্পর্ক?

—পুরুষের বয়স হওয়ার লক্ষণ কী জানো? গলার চামড়া ঝুলে যাওয়া নয়, বলিরেখা নয়, দাঁত পড়া নয়, যখন বউকে ভালবাসতে শুরু করে, বুঝতে হবে বয়স হচ্ছে।

—বাঃ, এটা তো একটা জোক। তোমায় কে বলল?

—সিরিয়াল। মনোজ মিত্রের ডায়লগ।

—তা বেশ। তা হলে বয়স হচ্ছে। বয়স তো হচ্ছেই। আর বয়স হচ্ছে বলেই অভিজ্ঞতা বাড়ছে, প্রজ্ঞাও বাড়ছে। আমার প্রজ্ঞা বলছে, মন্টুকে এ বাড়িতে রাখাটা ঠিক হবে না। সমস্যা হবে। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে কিছু আঁচ করতে পেরেছ?

—কী আবার আঁচ করব? হতভাগা ছেলে। মায়ের আদর পেল না, বাপের আদর পেল না, এখন ওর জীবন-সংশয়।

—ওর কথার স্টাইলটা একটু মেয়েলি না?

—মেয়েলি? আমি তো কিছু বুঝিনি...

—তুমি না- বুঝলে কী হবে, আমার কান এড়ায়নি।

—তো, মেয়েলি তো কী হয়েছে? এজন্য ওকে বাতিল করবে?

—ও যদি দুলালের মতো হয়ে যায়?

—তা কেন হবে? ওকে স্কুলে পড়াব।

—স্কুলে যদি ওকে অন্য ছেলে টিটকিরি দেয়, হেনস্থা করে, তারপর যদি স্কুল ছেড়ে দেয়...

—এ তো দেখছি, মাসির যদি গোঁফ গজায় তবে ওকে কী বলে ডাকব সেই অবস্থা। ও দুলালের মতো হয়ে যাবে কে বলল তোমায়? তুমি কি জ্যোতিষী? তুমি তো আবার জ্যোতিষে বিশ্বাস করো না।

অনিকেত একটা তর্ক থামিয়ে দেওয়ার জন্য গলাটা একটু উঁচিয়ে 'ভেটো' প্রয়োগ করে—আমার এতে মত নেই।

—ও, তোমার মতটাই চাপিয়ে দিতে চাও। এদিকে বাইরে মেয়েদের স্বাধীনতার কথা বলে বেড়াও। মেয়েদের মতামতের গুরুত্ব নিয়ে সমীক্ষা লেখো। একবার বলেছিলে না—পৃথিবীর বড়-বড় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মহিলারাই নিয়েছে—'অন এয়ার' বলেছিলে। আসলে আমি তো চাকরিবাকরি করি না, তোমার রোজগারে খাই, তাই আমার মতামতের কোনও মূল্য নেই।

—হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট দেন?

—বুঝেছি। ঘরোয়া-বউয়ের সঙ্গে হঠাৎ-হঠাৎ ইংরেজিতে কথা বলে ওঠা—এগুলো হল পুরুষ-লক্ষণ। বস্তির পুরুষ হলে এখন আমার গালে একটা চড় মারতে। যেহেতু ইয়ে, পরিশীলিত, তাই ইংরেজি।

এবার পরিবেশটা একটু লঘু করার চেষ্টা করে অনিকেত। বলে, বাব্বা, এত নারীবাদী কথাবার্তা কোত্থেকে শিখলে? কৃষ্ণা বসুর মতো কথা বলছ যে।

—নারীবাদী-টারিবাদী বুঝি না বাবা। আমি সাধারণ মানুষ। তোমাদের মতন আঁতেল প্রকৃতির নই। এটুকু বুঝি, মানুষের সঙ্গে বিট্রে করা ঠিক নয়। আমার শাশুড়ি-মায়ের আমল থেকে দুলালের মা এ বাড়িতে কাজ করে। শ্বশুরমশাইয়ের জন্য আলাদা আয়া রাখতে হয়নি। ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি, ওর বিয়ের গয়না, আমাকে দিয়ে গিয়েছে। ঘরের কোনও জিনিস এদিক-ওদিক করেনি। নাতি-অন্ত প্রাণ। ওর নাতি মন্টু। মন্টুর কেউ নেই। শুধু আমরা আছি। আমরা যদি ওকে দেখি, ভগবান আমাদের দেখবেন।

—তার মানে তুমি ওকে বাড়িতে রাখবে, ছেলের মতো করে মানুষ করবে?

—ছেলের মতো করে করতে পারব কি না জানি না। ওকে তো ছোটবেলা থেকে পাইনি। একদম শিশু অবস্থায় পেলে মা-ছেলের সম্পর্ক তৈরি হয়। এখন তো সেটা সম্ভব নয়। ওকে আমি রাখব। মানে, বাঁচাব। ছেলের মতোও নয়, চাকরের মতোও নয়। হাটবাজার করবে, পড়াশোনা করবে। যতটা পারি আমি পড়াব, মাস্টারও রেখে দেব। চাকরিবাকরি করে ও যদি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তো রাখবে, নইলে রাখবে না। ফলের আশা করতে নেই। কর্ম করে যেতে হবে।

শুক্লার বাবার দেওয়া ডায়েরিটাই যত নষ্টের গোড়া।

অনিকেত বলে, তুমি তা হলে চাইবাসা যাচ্ছ না? আমি ওখানে রান্না করে খাব?

—এর আগেও তো একা-একা থেকেছ তুমি। তুমি তো বলেছ একা থাকতে তোমার ভালই লাগে।

—কিন্তু খরচের কথাটা ভেবে দেখেছ? দু'টো আলাদা এস্টাব্লিশমেন্ট। ওখানেও আমাকে চাল-ডাল-তরকারি কিনতে হবে, এখানেও। তারপর যাতায়াতের খরচ আছে।

শুক্লা একটু মাথা চুলকে নিল। বলল, খরচ এমন কিছু বেশি হবে না। আমি কি বেশি-বেশি শাড়ি কিনি, না কি গয়না কিনি? বড় রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাওয়ার বায়নাও করি না। তোমার অনেক খরচই বাঁচিয়ে দিয়েছি আমি। ছেলেমেয়েদের জন্যও খরচ করতে হয়নি। প্রতি বছর ট্যাক্স বাঁচানোর জন্য এনএসসি করছ, ওগুলো আবার রিনিউ। বাড়ি করারও খরচ নেই। রিটায়ার করে পেনশন পাবে। রিটায়ার করার সময় টাকাপয়সা পাবে। যদি ক'টা বছর খরচ

একটু বাড়ে, তাতে আমাদের কোনও ক্ষতি হবে না।

অনিকেত আর যদি খুব জোর দিয়ে বলে যে মন্টু-ফন্টুকে রাখা চলবে না, শুক্লা হয়তো জোরজবদস্তি করবে না, জিনিসপত্র ভাঙচুরও করবে না, কিন্তু গুম হয়ে থাকবে। খাবে না। কথা বলবে না।

অনিকেত একটা নতুন বুদ্ধি করে। ভাবে, শুক্লাকে যদি একবার ওখানে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে ওখানকার পাহাড়-জঙ্গল, বোরো নদী, ফ্রেশ হাওয়া পেয়ে ওখানেই থেকে যেতে চাইবে। তখন মন্টুর ব্যাপারটা সেকেন্ডারি হয়ে যাবে।

অনিকেত বলল, শোনো, ট্রান্সফার অর্ডার হাতে পেয়ে গিয়েছি। দশ দিনের মধ্যেই জয়েন করতে হবে। আমি জয়েন করি, তুমি সঙ্গে চলো, আমার সংসারটা গুছিয়ে দাও। তারপর চলে আসবে। একসঙ্গেই ফিরব দিন সাতেক পর। তারপর না-হয় তোমার কথামতো মন্টুর একটা ব্যবস্থা করব। কিন্তু সেটা তো এপ্রিলের আগে হচ্ছে না, কারণ স্কুলের ক্লাস এপ্রিল থেকে।

শুক্লা বলে, ওসব ওজর টিকবে না। ও এখন যে স্কুলে পড়ে সেটা এখান থেকেও যাওয়া যায়। ওকে একটা সাইকেল কিনে দেব।

—দুলালকেও তো সাইকেল কিনে দেওয়া হয়েছিল। ওর আনাজের ব্যবসায় সুবিধের কথা ভেবে। কিন্তু কী হল শেষ অবদি? সাইকেল সাজিয়ে গাঁয়ে-গাঁয়ে টিপ-পাউডার-ফিতে-নেলপালিশ-ব্রেসিয়ার বিক্রি করতে লাগল।

—সাইকেল কিনে দিলে মন্টুও যে স্কুলে না-গিয়ে নেলপালিশ বেচবে এটা তোমায় কে বলল?

—না, সে কথা নয়। বলছি, মানুষের ভাল ভেবে কিছু করি, কিন্তু অনেক সময় বিফলে যায়।

—জানি, তবে এর উত্তরে যেটা বলা যায়, তা হলে তো কোনও কাজই করা উচিত নয়। আমি সে-কথা বলছি না।...

অনিকেত বেশ বুঝতে পারছে ও আমতা-আমতা করছে, এবং এটাও বুঝতে পারছে, মন্টুকে ঘরে ঢুকতে দিতে ওর আপত্তি মন্টুর 'পেডিগ্রি' নেই বলে। কিন্তু বলতে পারছে না। ও ব্যাপারটা আর কচলাতে চায় না।

অল্প কিছু মালপত্র নিয়ে রওনা হয়। ঝাড়খণ্ডের দাবিতে আন্দোলন চলছে। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই ঝাড়খণ্ড নামে আলাদা রাজ্য হয়ে যাবে। প্রায়ই হরতাল, স্ট্রাইক হচ্ছে।

২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। এখন চাইবাসার আবহাওয়া খুব ভাল।

ঝাড়গ্রামের ওপর দিয়ে ট্রেনটা গেল। শুনেছিল, সোমনাথ এখানেই কোনও কলেজে চাকরি পেয়েছে। সোমনাথ নিজেকে একটা নতুন নাম দিয়েছে। সোমনাথের সঙ্গে অনেক দিন কথা হয়নি। শেষ যেবার দেখা হয়েছিল, তখন ও নতুন চাকরিটার কথা বলেছিল। সেদিন সালোয়ার-কামিজ পরনে ছিল ওর। ও বলেছিল, কলেজে গিয়ে ছাত্রদের বলব 'ম্যাডাম' ডাকতে, আর আমি ওখানে 'লেডিজ টয়লেট' ব্যবহার করব। আমাকে পুরুষসমাজ ওটা ব্যবহার করতে দেবে না জানি, কিন্তু ওটা আমার চ্যালেঞ্জ।

ঝাড়গ্রামের লাল মাটি আঁকড়ে-থাকা শাল-পিয়ালের বন যখন ট্রেনের জানালার পাশ দিয়ে

সরে-সরে যাচ্ছিল, তখন অনিকেত বলল—জানো, এখানেই কোথাও সোমনাথ থাকে।

—কে সোমনাথ?

—ওই তো, ওর কথা বলেছিলাম তো, ছেলে থেকে মেয়ে হচ্ছে। ওর নাম এখন 'মানবী'।

—ঝাড়গ্রাম এজন্য বিখ্যাত? কোথায় আমি ভাবছি এই বনের ভিতর দিয়েই কোন রাস্তায় চিলকিগড় কিংবা ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ি... কখনও যাওয়া হয়নি।

একটু পর ঘাটশিলা। অনিকেত বলল—এই যে ঘাটশিলা। এখানেই বিভূতিভূষণের বাড়ি। এখানেই সুবর্ণরেখা। শুক্লা ব্যাপারটা বুঝে মুচকি হাসল। বেশ লাগছে ওকে।

জামশেদপুর নেমে, হোটেলে খেয়ে নিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করল। বিল করলে সবই পাওয়া যাবে। ট্রান্সফারের জন্য কিছু টাকাপয়সা পাওয়া যায়। তা দিয়ে ওখান থেকেই একটা চৌকি, তোশক, বালিশ—এসব কিনে নেবে। বাসনপত্র কিছু সঙ্গে নিয়েছে। কিছু নিয়ে নেবে। রান্নার জন্য ওখান থেকে ছোট সিলিন্ডার আর একটা বার্নার কিনে নেবে।

কোনও দিন ঘাটশিলা আসিনি। স্কুলের বন্ধুরা অনেকেই ঘাটশিলা বেড়াতে আসত, ছবি দেখাত। খুব সুন্দর। শুক্লা বলল।

—এই তো এলে। চাইবাসাও সুন্দর। কাছেই তো চক্রধরপুর। ওটাও সুন্দর। রাঁচি যাওয়া যায় পাহাড়ি পথে। ওই পথটাও সুন্দর। শুনেছি ওই পথে হিরনি নামে একটা ঝরনা আছে। ওই ঝরনাটাও সুন্দর। সব জায়গায় যাব। চার বছর তো থাকতে হবে এখানে। কিন্তু একা-একা যাব না।

শুক্লা কিছু বলল না। চাদরটা জড়িয়ে তন্ময় হয়ে বাইরে প্রকৃতি দেখছে। শহর শেষ হয়ে গিয়েছে। ঢেউ খেলানো মাঠ, মাঠ পাহারা দিচ্ছে ছোট-ছোট পাহাড়, দূরে আকাশ যেখানে মাটিতে মিশেছে, সেখানে পাহাড়ের পাড়। কিছু কিছু গাছের পাতা খসে গিয়েছে। পত্রহীন ডালপালাগুলো আকাশে মেলে ধরে আছে নাচের মুদ্রায় যেন এক-একটা ইকেবানা। কিছু-কিছু গাছের পাতা হলুদ হয়েছে। কিছু গাছ আবার সবুজ। মাঠে কোনও ধান নেই, কাটা ধানের গোড়াগুলো রয়ে গিয়েছে বলে কোনও-কোনও মাঠ হলুদ ব্রাশের মতো দেখতে লাগছে। কোথাও বিরাট পাথর ফাটিয়ে মাথা উঁচিয়েছে নাম-না-জানা গাছ। বেলা একটা মতো। তবুও কোথাও-কোথাও দুধের সরের মতো কুয়াশা লেগে আছে মাঠে। পাথর-বিছানো নদী। নদীর ওপর পুল। পুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক উদাস যুবক। এইসব দৃশ্যে মগ্ন হয়ে আছে শুক্লা। সেই কবে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর তেমন বেড়ানো হল কই? বার তিনেক পুরী, বাবা-মা-শুক্লা সবাই ছিল দু'বার, একা শুক্লা একবার। আর যেখানে ট্রান্সফার হয়েছে এর আগে, সেখানে গিয়েছে। ওর একবার দিল্লিতে একটা দিন সাতেকের ট্রেনিং হয়েছিল, ওখানে অনিকেত নিয়ে গিয়েছিল শুক্লাকে। খুব একটা বেড়ানো হয়নি শুক্লার।

মঞ্জুরও কি হয়েছে? ও তো আরও কোথাও যায়নি। অথচ একটা ভ্রমণ-সংস্থায় চাকরি করে। ভাইজাগ-আরাকু ভ্যালি-হায়দরাবাদ বুকিং করে, সিমলা-কুলু-মানালি-অমৃতসর বুকিং করে। অ্যালবামের ছবি দেখায়।

শুক্লা পাশে বসে আছে, অথচ মঞ্জুর কথা মনে হতেই মন থেকে মঞ্জুকে ছুড়ে ফেলে দিল বাইরে।

শুক্লা বলল, দ্যাখো দ্যাখো, হায় হায় করছে।

—কে?

—ওই গাছগুলো। দু'হাত আকাশে তুলে—যে-বৃক্ষশাখা সমারোহকে 'ইকেবানা' মনে হয়েছিল অনিকেতের, সেগুলোকে 'হায় হায়' মনে হল শুক্লার?

—আর ওই নদীটাকে কী মনে হচ্ছে? ওই দূরের নদীটা?

শুক্লা বলল, বিধবার দুঃখের মতন।

বাগান-ঘেরা রেডিও স্টেশন। বেশ বড় এলাকা। গাছপালা-ঘেরা। পাশেই সার্কিট হাউস, এসপি-র বাংলো, ডিএম সাহেবের বাংলো, জেলা জজের বাংলো। রেডিও-র কোয়ার্টার-টাও কাছেই। কোয়ার্টারের পিছনে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা তালগাছ। কয়েকটা ভেড়া চরছে, আর একদিকে একটা বড় জলাশয়। কয়েকটা বক মাছের আশায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। সব নিয়ে ভারি সুন্দর পরিবেশ। মনেই হয় 'চেঞ্জে এসেছি'।

—কী? কেমন?

শুক্লা বলল, বেশ ভাল।

অফিসের লোক এসে কোয়ার্টার খুলে দিল।

বড়-বড় দু'টো ঘর। একটা লিভিং-ডাইনিং। দু'টো বাথরুম। একটা ব্যালকনি। ব্যালকনিটা জলাশয়ের দিকে।

ফ্যান চালিয়ে শতরঞ্চি বিছিয়ে একটু বিশ্রাম। শুক্লা বলল, কীরকম যাযাবর-যাযাবর লাগছে। খুব ভাল লাগছে। খুব মজা লাগছে। অনিকেতকে জড়িয়ে ধরে একবার।

অনিকেত বলল, বিকেলে আমরা একটু কেনাকাটা করতে বেরব। এখন একটু বিশ্রাম করো। আমি একটু অফিস থেকে আসি।

অনিকেতের এখন একটাই কাজ। জায়গাটার প্রেমে ফেলে দিতে হবে শুক্লাকে। যেন এখান থেকে ফিরে যেতে না-চায়। কিংবা ফিরে গেলেও, আবার ফিরে আসে যেন।

মন্টু-ফন্টুকে নিয়ে আর ঝামেলায় পড়তে চায় না ও।

অফিসে গিয়ে জেনে নিল কাছাকাছি কী-কী সুন্দর স্পট আছে। নোট করে নিল। অফিসের তো গাড়ি আছেই। গাড়ি করে জায়গাগুলো শুক্লাকে দেখাবে অনিকেত।

ড্রাইভারের নাম বড়কা মুন্ডা। অনিকেতের কোয়ার্টারে এল। জিগ্যেস করল সই-সাবুদ কিছু লাগবে কি না।

মানে, ট্রান্সফারে এলে মালপত্র ওঠানো-নামানোর জন্য কুলি-খরচ পাওয়া যায়। লরিতে মাল এলে ট্রান্সপোর্টের বিল জমা দিলে খরচটা পাওয়া যায়। জামশেদপুর থেকে এখানে আসার গাড়ি ভাড়াও। কিন্তু বিল দিতে হবে। এক আজব নিয়ম করে রেখেছে। কোনও ট্যাক্সি ড্রাইভার কি প্যাড আর কলম নিয়ে ঘোরে? আর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লিখে দেয়, আমার গাড়ির নম্বর এত, অমুক জায়গা থেকে অমুক পর্যন্ত যাওয়ার জন্য তমুকের কাছ থেকে এত টাকা বুঝিয়া পাইলাম। অথচ এই কাগজটা না-দিলে হকের টাকাটা পাওয়া যাবে না। সব জায়গায় অফিস-গাড়ির ড্রাইভার-রাই এই কাগজগুলো জোগাড় করে দেয়। সই-সাবুদও করিয়ে দেয়।

অনিকেত বলল—হ্যাঁ, ও সব তো লাগবে।

—তব আপ্‌কা ঘর কা পতা লিখ দিজিয়ে।

একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিল। কোনও ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি থেকে পাকা রসিদ নিয়ে আসবে। ওদের কিছু পার্সেন্টেজ দিতে হয়।

জীবনের প্রথম চাকরিতে একটু অসুবিধে হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা চাকরিতে গিয়েছিল গ্রামে। তখনও অফিসের ফার্নিচার, চেয়ার, টেবিল—এক জায়গায় জড়ো করে রাখা। ওগুলো স্টাফরাই ধরাধরি করে সাজিয়ে দিল। তারপর বড়বাবু কতগুলো কাগজ নিয়ে এসে বলেছিল, দু'টো কাগজে টিপ-সই মেরে দিন স্যর, আমরা তো অনেকগুলোয় করেছি।

—কেন? টিপ-সই করতে যাব কেন?

—বাঃ এই মালপত্রগুলো লোডিং, আনলোডিং করতে হয়নি? লেবার পেমেন্ট, অ্যারেঞ্জমেন্ট, সুইপিং—এসবের জন্য পেমেন্ট করতে হয়েছে, তার ভাউচার।

—এসব তো নিজেরাই করে নেওয়া হয়েছে। ঘর তো যার ঘর সে ঝাড়ু দিয়ে নিচ্ছি। আমার ঘর তো আমিই ঝাড়ু দিই।

—যাব্বাবা! তাই বলে পেমেন্ট ছেড়ে দেবেন? আপনি তাড়াতাড়ি কাজটা শিখে নিন। পরীক্ষা দিয়ে ঢুকেছেন, অথচ কাজটা শেখেননি। স্যর, বলতে বাধ্য হচ্ছি। মাল এল, লোডিং-আনলোডিং হল না? ক্যাজুয়াল সুইপারের প্রভিশন আছে, দেখেননি? পেমেন্ট ভাউচার দেখিয়ে বিল করতে হবে না?

বিল হয়েছিল। ওই সব ফল্‌স বিলে সইও করেছিল অনিকেত।

এখন কাজ শিখে গিয়েছে।

শুক্লা জিগ্যেস করল, কীসের সই-সাবুদ?

এসব শুক্লাকে ব্যাখ্যা করার কোনও দরকার নেই। ও হয়তো 'অনেস্টি' মারাবে, ওর পিতৃদত্ত ডায়েরি থেকে 'কোটেশন' ঝাড়বে।

তবে এটাও ঠিক, অনিকেত শুধু হকের পাওনাটুকুই নেয়। ওটা পেতে গেলে যদি এইসব গ্যাঁড়াকল নিয়ম গভর্নমেন্টই করে দেয়, ও কী করবে? প্রাইভেট কোম্পানিতে থোক একটা টাকা দিয়ে দেয়, কোনও কাগজপত্র চায় না।

বিকেলে গাড়ি নিয়ে বেরনো। রেডিমেড খাট দেখে এল। একটু বড়ই নিল—যেন দু'জন শোওয়া যায়। তোশক-টোশক কিনে নিয়ে এল। সেদিন হাট-বার ছিল। হাটে সারি-সারি হাঁড়ি। মেয়েরা হাঁড়িয়া বিক্রি করছে। পাশে কেউ কাঁচা ছোলা, আদা-পেঁয়াজ। গোটা-গোটা কাঁচালঙ্কা। অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি থেকে টিনের বাটিতে হাঁড়িয়া তুলে দিচ্ছে মেয়েরা। ক্রেতারা বেশির ভাগই পুরুষ। মেয়েরাও আছে। হাঁড়িয়া-অঞ্চল ছাড়ালে শাক, সবজি। ওজনের বালাই নেই। সব ভাগা দেওয়া। কোনও ভাগা দু'টাকা, কোনও ভাগা পাঁচ টাকা। ভাগায় কাঁচালঙ্কা, টমেটো, শিম সবই আছে। পিঁপড়ের ডিমও ভাগা করে বিক্রি হয়। দাম একটু বেশি। পাঁচ টাকা ভাগা। পিঁপড়ের ডিমের সঙ্গে রসুন-কাঁচালঙ্কা মিশিয়ে বেটে চাটনি খায়। এটা খুব সুস্বাদু এবং ডেলিকেসি। মাঝে-মধ্যে খবর কাগজে দেখা যায়—নেতারা বলছেন জঙ্গলের মানুষরা কত গরিব! পিঁপড়ের ডিম খেয়ে ওরা বেঁচে থাকে। যেন পিঁপড়ের ডিম খুব সহজলভ্য। বাঁশের ধামা, চুবড়ি, কুলো এসব নিয়ে বসেছে বেশ কিছু মেয়ে। শুক্লা অনেকক্ষণ ধরে ঝুড়ি দ্যাখে। একটা মেয়ে বলে, দিয়েন গুল্‌পো! বা ওরকম কিছু। মুন্ডারি, না হো, না সাঁওতালি—কী ভাষা কে জানে? শুক্লার বুঝতে অসুবিধা হল না, ও কী বলতে চাইছে। শুক্লা বাংলায় বলল, দাম

কত? একটা মেয়ে শুক্লার কথা বুঝে নিয়ে হাতের পাঁচটা আঙুল দেখাল। পাঁচ টাকা দিয়ে একটা ঝুড়ি কিনল ও। ওরা কী সুন্দর হাসল। কেন হাসল কে জানে? শহরের মেয়েরা এরকম হাসে না। ওরা কিন্তু কেউ সুন্দরী নয়, যৌবনবতীও নয়। পঁচিশ-তিরিশ বছর বয়সেই অনেকের বুক শিথিল হয়ে গিয়েছে—বাইরে থেকেই বোঝা যায়। পুষ্টির অভাবই হয়তো এর কারণ। কিন্তু কিছু সিনেমা এবং কিছু গল্প-উপন্যাস আমাদের এমন একটা ধারণা দিয়েছে যে, আদিবাসী মেয়ে মাত্রই একেকটা যৌবনকুম্ভ।

একটা গাছের ডাল রঙিন হয়ে আছে। গাছের ডালে ঝুলছে রঙিন-রঙিন ব্রা। সাদা, কালো, গোলাপি। কী গাছ অনিকেত জানে না। গাছের পাতা নেই। এই শীতে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু গাছের ডাল সেজে উঠেছে রঙিন হয়ে। গাছের তলায় ভিড় জমিয়েছে বেশ কয়েকজন যুবতী, কিশোরী। তখন অধিকাংশ মেয়েই ব্লাউজ পরে। ব্রা সবাই পরে না। যে ব্রা বিক্রি করছে, তাকে দেখেই অনিকেতের মনে হল, মৌগা। স্ত্রী-বেশধারী পুরুষ। শাড়ি পরে রয়েছে বটে, কিন্তু হাতে-মুখে ওর পুরুষ-চিহ্ন প্রকট। ঠোঁটে হাল্কা লিপস্টিক দিয়েছে, চোখে কাজল। কিন্তু দাড়ি কামানোর একটা হাল্কা কালচে-সবুজ দাগ রয়ে গিয়েছে মুখে। একটা চ্যাপ্টা কাঠের তক্তায় পাশাপাশি দু'টো নারকোলের মালা আটকে রেখেছে। ও দেখিয়ে দিচ্ছে, কী করে ব্রেসিয়ার পরতে হয়। ওটাই হচ্ছে ওর ম্যানিকুইনের বাস্ট। ওটাই মডেল। সেট করা আঁটা নারকোলের মালার ওপর যখন ব্রেসিয়ার পরিয়ে দিয়ে কাঠের পিছনে হুক লাগানো শেখাচ্ছে, মেয়েরা হাসছে, আবার লজ্জা-লজ্জা মুখ করে 'লেস্‌ন'-ও নিচ্ছে। লোকটা যদি পুরুষ হত, অন্তত পুরুষ পোশাক-পরা লোক হত, মেয়েরা হয়তো কিনত না। লজ্জা পেত। মৌগার কাছে ততটা লজ্জা নেই। মেয়েরাও জানে, ও প্রকৃত-মেয়ে নয়। কিন্তু মৌগা কিনা, প্রকৃত-পুরুষও তা হলে নয়। সুতরাং লজ্জা নেই। মেয়েদের বুকের দিকে তাকিয়ে সাইজ ঠিক করে দিচ্ছে। বলছে, যদি অসুবিধে হয় নিয়ে এলে পাল্টে দেবে।

শুক্লা বলল, এটা তোমার খুব ভাল লেগেছে নিশ্চয়ই। খোরাক পেলে।

অনিকেত বলল, তা আর বলতে...

হাট থেকে বেরিয়ে ড্রাইভার নিয়ে গেল লুপুংঘুটু নামে একটা জায়গায়। ওখানে মাটি ফুঁড়ে জল ওঠে। সেই জল ছোটধারায় বয়ে গিয়ে বোরো নদীতে পড়ে। কাছেই বোরো নদী। খরস্রোতা। জলে-পাথরে সব সময় কথাবার্তা।

লুপুংঘুটু গাছে ছাওয়া। মাঝখানে বুট-বুট করে জল উঠছে। ওখানে অনেক বউ-ঝি। কমবয়সি মেয়েরাও। সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। কুয়াশা শুরু হয়ে গিয়েছে। ড্রাইভার বলল 'হো'-দের বিয়ে। জল ভরতে এসেছে। একটা মেয়েকে দেখাল। ওর মুখে হলুদের দাগ। বলল, ওরই বিয়ে। বিয়ে হবে কাল।

দু-একজনের গায়ে সোয়েটার আছে। দু-একজনের গায়ে চাদর। কেউ-কেউ বিছানার চাদর জড়িয়ে এসেছে এই পার্বণে। একটা ঘটে জল তুলল। তারপর ঘট-টাকে ঘিরে মেয়েরা বসল। উলু দিল। তারপর ওরা গান করতে থাকল। শুক্লা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা শুক্লাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। শুক্লা ওদের কাছে গেল। সধবা এয়ো। শুক্লারও কপালে সিঁদুর।

বাঙালির সিঁদুর কি এই অঞ্চল থেকেই এসেছে? এখানকার মাটির রং লাল। লাল মাটি দিয়ে ঘর রাঙায়। হয়তো লাল মাটির টিপও পরত।

অনিকেত একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়। আদিগন্ত শোভা দ্যাখে। সেই ভিস্যুয়ালে মিশেছে মায়াবী অডিও। অদ্ভুত সুরেলা গান। মানে বোঝে না। সুর শোনে।

সন্ধে হয়। ওরা সুর সঙ্গে নিয়ে গাঁয়ের পথে যায়। ড্রাইভার হর্ন দেয়। শুক্লা গাড়িতে আসে। গাড়ির কাচ ওঠানো। কোয়ার্টারে ফিরছে। শুক্লা জড়োসড়ো। অনিকেতের গা ঘেঁষে বসে।

অনিকেত বলে, তোমার চাদরটা কী হল? শুক্লা বলে না কিছু।

—আরে চাদরটা, নতুন চাদরটা কই? দু'হাজার টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছি। ফেলে এসেছ?

শুক্লা বলল, ফেলে আসিনি, দিয়ে দিয়েছি।

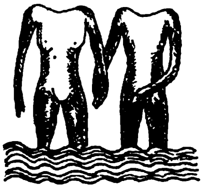

কোয়ার্টারের সামনেই একটা কাজুবাদামের গাছ। কাজুবাদামের একরকমের ফল হয়, ফলটার তলায় 'কমা' চিহ্নের মতো দেখতে একটা বীজ ঝোলে। ফলটা পাকলে বেশ নাকি মিষ্টি হয়। ফলটার তলায় যে-বীজ, সেই বীজের ভিতরেই থাকে বাদাম। পড়শিরা বলল, কিছুদিনের মধ্যেই ফলগুলো লাল হয়ে যাবে। আর একটু দূরে একটা বড় তেঁতুলগাছে ঝুলছে বাবুই পাখির বাসা। কতরকমের পাখি ওড়াউড়ি করে। ভোরবেলা কুয়াশার চাদরে ঢেকে থাকে দূরের পাহাড়। পাশের জলাশয়ে কালো-কালো পানকৌড়ি ডুবসাঁতার খেলে। সাদা-সাদা বক একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রকৃতির এত সমারোহ, তবু তিন দিন পরই শুক্লা বলে, বাড়ি যাব।

অনিকেত বলে, এটাই তো বাড়ি, এখানেই তো থাকছি। ফ্রেশ তরিতরকারি, ফ্রেশ হাওয়া-বাতাস। কী ভাল জল, গ্যাস-অম্বল সব উধাও।

শুক্লা বলে, সবই তো ভাল, কিন্তু আমি ফিরেই যাব।

অনিকেত মিষ্টি করে বলে, ফিরে তো যাবেই। আমিও যাব। এই সপ্তাহের শেষেই যাব। তারপর আবার দু'জনই ফিরে আসব, কেমন?

শুক্লা বলে, আমি আবার আসব কেন? তোমার সংসার তো গুছিয়েই দিয়েছি। পারো তো একজন রান্নার লোক দেখে নিও। তুমি নিজেও তো রান্নাবান্না মন্দ জানো না।

অনিকেত বলে, সে না-হয় প্রেশার কুকারে খিচুড়ি-টিচুড়ি করে নেব। কিন্তু তুমি কাজু ফলের ক্রমশ পেকে-ওঠাটা দেখবে না? বাবুই পাখির বাসা থেকে ডিম ফুটে বেরিয়ে সদ্য-উড়তে-শেখা বাবুই-ছানা দেখবে না?

শুক্লা বলল, তুমি দেখো।

অনিকেত বলে, পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য তো হয় জানি, কিন্তু পতি দেখলে কি সতীর দেখা হয় নাকি? 'পুণ্য' একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস, কিন্তু দেখাটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

শুক্লা সদ্য লাল-লাল পাতা-ভরা নিমগাছের ঝিরিঝিরির দিকে তাকিয়ে বলল, ও ঠিক আছে।

—তুমি তা হলে একা থাকবে ওখানে?

—কেন? মন্টু থাকবে তো।

একটা ট্যাবলেট গিলে নেওয়ার মতো করে অনিকেত বলল—ও-ও।

কোমায় থাকা কেউ হাসপাতালে। বাড়িতে ফোন এল—এক্সপায়ার্ড, তখন যেমন বলে 'ও-ও', তেমন করেই বলল। যেন ভবিতব্যই ছিল।

সপ্তাহ শেষে ওরা ফিরল। পরদিনই অনিকেতকে যেতে হল খাজাইতলা। পঞ্চাননের সঙ্গে দেখা করল। মন্টুকেও দেখল, মন্টু বাইরের টিউবওয়েলের জলে শাক ধুচ্ছিল। পঞ্চাননকে বলল, মন্টুকে আমরা নিয়ে যাব, বাড়িতে রাখব।

—কেন?

—ওখানে থেকে লেখাপড়া করবে।

—এখানে থেকেও পড়ালেখা করছে ও।

—থাকুক না আমাদের ওখানে। আমার স্ত্রী-র ইচ্ছে।

বলেই মনে হল বেশি আগ্রহ দেখানো হয়ে গেল বোধহয়। আসার আগে ভেবেছিল, ওরা যদি না রাজি হয়, তবে ভালই হয়। শুক্লাকে বলে দেবে ওরা রাজি নয়।

শুক্লা নিশ্চয়ই নিজে খাজাইতলায় আসত না। অনিকেত একটা ঢোক গিলে বলল, তবে আপনারা রাজি না-হলে কী করব? ঠিক আছে।

উল্টো দিকে ঘুরল অনিকেত।

—দাঁড়ান দাঁড়ান। রাজি নই তো বলিনি...

অনিকেত ভাবল, এ তো মহা গেরো। সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে যাওয়া মানে উষ্মা-প্রকাশ হয়ে গেল না তো? আরও দু-তিন সেকেন্ড পরে 'ও আচ্ছা, ঠিক আছে'—বলে আস্তে-ধীরে চলে এলেই হত।

ঠিক তক্ষুনি মন্টু এসে দাঁড়াল। বলল, জেঠু, আমি যাব।

কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকল অনিকেত। বলতেই পারত 'ঠিক আছে, চল তবে।' সঙ্গে করে নিয়ে গেলে শুক্লা হয়তো বেশি খুশি হত। অনিকেত বলল—ঠিক আছে, বিকেলে চলে আসিস তবে, জামা-প্যান্ট-বইপত্তর নিয়ে।

ক্যামেরায় ফিল্ম ভরে অনিকেত। চাইবাসা গিয়ে ছবি তুলবে। বড় পাতাটির নীচে বসে থাকা ভোরের দোয়েল পাখির, পল্লবের স্তূপের, কলমির গন্ধ ভরা জলের, নীলাভ আকাশজোড়া সজনে ফুলের...। ঝুলিতেছে বাবুইয়ের বাসা, ঝিকিমিকি নিমপাতা রোদের কিরণে...ধুর। জীবনানন্দ-র কোটেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে, জীবনানন্দ-র মতো কিছু ভাবতে গেলেই কেলিয়ে যায় ও। ক্যামেরায় ফিল্ম ভরে প্রথম ছবিটা তুলল—মন্টুর। থানা থেকে সবসময় বলে বাইরের লোককে ঘরে ঢোকালে ছবি তুলে রাখবেন, থানায় ছবি জমা দেবেন।

শুক্লাকে বলল, আলমারিটা হাট করে খুলে রেখো না, চাবিটা সাবধানে রেখো, গয়নাগাটি ঘরে থাকলে লকার-এ রেখে দিও।

আর অনিকেত যখন ফিরে যাচ্ছে, শুক্লাও বলল—সকালবেলা যা হোক কিছু খেয়ে নিও, ঘরে ডিম রেখো, ভেজা হাতে হিটারের সুইচে হাত দিও না, 'খারাপ জল' খেয়ো না। অ্যালকোহল-কে শুক্লা এটাই বলে।

যাদের কপালে প্রচুর নারীসঙ্গ থাকে, তাদের নির্দিষ্ট করার জন্য গ অক্ষর দিয়ে একটা বাংলা

স্ল্যাং প্রচলিত আছে। কিন্তু অনিকেতের মনে হয়, ও হল 'গে'-কপালে। যাবতীয় 'গে' ওর কপালেই জোটে। এটা মনে হল স্টেশনে সোমনাথকে দেখে। সোমনাথ আজ শাড়ি পরেছে। সোমনাথ দেখতে পায়নি অনিকেতকে। নিজেই নিজেকে সংশোধন করল অনিকেত। 'গে'-কপালে নয়, ও হল 'এলজিবিটি'-কপালে। 'এলজিবিটি' বলে একটা শব্দ চালু হয়েছে ইদানীং। পুরো কথাটা হল : লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার। মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই চার রকম সত্তাকে একসঙ্গে করে এই নাম দেওয়া হয়েছে, এবং 'এলজিবিটি' একটা কমিউনিটি হিসেবে গড়ে উঠছে। আইভি কি লেসবিয়ান? ঠিক জানে না, তবে ও মনে-মনে পুরুষ হওয়ার ইচ্ছে পুষে রাখে, এটুকু বুঝেছে। তার মানে, ও হয়তো রূপান্তরকামী। লিঙ্গান্তরকামী। এই যে সোমনাথ, সোমনাথের মেয়ে হওয়ার ইচ্ছে। সোমনাথও রূপান্তরকামী, মানে 'ট্রান্সসেক্সুয়াল'। ওর পুরুষ-শরীরের ভিতরে যদি একটা নারীসত্তা বাসা বেঁধে থাকে, তা হলে সে লিঙ্গ-অণ্ডকোষ-সম্পন্ন হয়েও নারী। অন্তত নিজে তা-ই ভাবছে। ফলত পুরুষের প্রতি তার আকর্ষণ। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ তো প্রাকৃতিক ব্যাপার, যাকে বলে 'ন্যাচারাল'। ওর দিক থেকে সত্যিই 'ন্যাচারাল'। কিন্তু আমরা 'আনন্যাচারাল' ভাবি। তার মানে সোমনাথ শরীর-সূত্রে পুরুষ হয়েও পুরুষের প্রতিই ওর যৌন-আকর্ষণ। সুতরাং 'গে'। আবার একইসঙ্গে রূপান্তরকামী। সব গে আবার রূপান্তরকামী হয় না। মানে দাঁড়াচ্ছে, সব রূপান্তরকামীই 'গে'। কিন্তু সব 'গে' রূপান্তরকামী নয়। আবার যে 'গে'-রা 'টপ', মানে ট্রান্সজেন্ডার-দের ঘাঁটে, আদর-টাদর করে, ওদের মধ্যে রূপান্তরকামিতা নেই।

ওদের দেখে ধারণাই করা যায় না। কিন্তু 'বটম গে'-দের দেখে আঁচ করা যায়। সব 'বটম গে'-রাই কিন্তু শারীরিক যৌন-চিহ্নের পরিবর্তনের পথে যায় না। বড়জোর মেয়েদের পোশাক পরে। মেয়েদের মতো সাজে। ওরা ট্রান্সভেস্টাইট। বাংলায়, বিপরীত-সাজসজ্জাকামী।

এবারে মুশকিলটা দ্যাখো। আমাদের মা-মাসি-পিসিরা শাড়ি পরতেন। কোনও-কোনও কাকিমা সালোয়ার-কামিজ। আমাদের বোনরাও অনেকেই সালোয়ার-কামিজ। কিন্তু আমাদের মেয়েরা জিন্‌স-শার্ট। এগুলো তো ছেলেদের পোশাক একালের অথচ ছেলেদের পোশাক পরা মেয়েদের 'ট্রান্সভেস্টাইট' বলছি না তো...।

কথা হচ্ছিল 'গে'-দের নিয়ে। কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল? নিজেরই সঙ্গে। নিজের ফান্ডা ঝালিয়ে নিচ্ছিল।

স্টিল এক্সপ্রেসে রিজার্ভেশন করাই ছিল। কোচ এবং সিট নম্বর দেখে উঠল। জানালার ধারে সিট পেল। জানালার ধারে বসলে স্টেশনের গন্ধ একটু বেশি করে পাওয়া যায়। শিয়ালদা স্টেশনের গন্ধটা একটু যেন উগ্র। হাওড়ার গন্ধটা তত উগ্র নয়। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে অনুষ্ঠানটা করার সময় একজন দৃষ্টিহীন বলেছিল, শিয়ালদা স্টেশনে নেমে গন্ধ পেতে-পেতে ও বৈঠকখানা বাজারে যায়। বঙ্গবাসী কলেজের গন্ধ। মশলাপট্টির গন্ধ, ফলপট্টির গন্ধ পেতে-পেতে ও ধূপকাঠির মহাজনের কাছে যায়। বনগাঁ লাইনে ধূপকাঠি বিক্রি করে ও। বামনগাছি-দত্তপুকুর-বিড়া-হাবড়া ও স্টেশনের গন্ধে চিনে যায়।

—কী অনিকেতদা, আমাকে অ্যাভয়েড করবেন ভেবেছিলেন? পারলেন না তো, দেখুন, আমার সিট আপনার পাশেই পড়েছে।

পড়বেই তো। 'গে'-কপালে যে, মনে-মনে ভাবে। কিন্তু মুখে হাস্য আনয়ন করে। 'বসুন

সোমনাথ'...বলেই থেমে যায়। 'সোমনাথবাবু' বলতে গিয়েছিল অনিকেত। প্রথম যখন আলাপ হয়েছিল, 'সোমনাথবাবু'-ই বলেছিল ও। শাড়ি-পরা অবস্থায় 'বাবু' বলা যায় না কি কাউকে?

—আমাকে 'আপনি'-'আজ্ঞে' না-করলেও হবে অনিকেতদা। আমি আপনার চেয়ে কত ছোট...।

অনিকেত বলে, আচ্ছা, ঠিক আছে। সোমনাথ অনিকেতের কাঁধে মৃদু ঠেলা দেয়।

—এই অনিকেতদা, আমায় একটু জানালার ধারটায় বসতে দিন না, প্লিজ...। আমি তো ঝাড়গ্রাম নেমে যাব, তারপর আপনি জানলার ধারে বসবেন, জঙ্গল দেখতে-দেখতে যাবেন।

অনিকেত বলে, আর আপনি তো শুধু ধানখেত দেখতে-দেখতে যাবেন। একই দৃশ্য তো কতবার দেখেছেন...

সোমনাথ একটু লাস্য মিশিয়ে হাসল। বলল, এ তো দেখছি 'তুমি'-তে আসতে পঞ্চাশের দশকের সিনেমা করে ফেলবেন। ষোলো রিল-এর সিনেমায় 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে আসতেই দশ রিল খরচ হয়ে যেত।

অনিকেত বলল—ও হয়ে যাবে। আস্তে-আস্তে হয়ে যাবে।

সোমনাথ বলল—কী যেন বলছিলেন...একই দৃশ্য বারবার ভাল লাগে কেন? কিছু দৃশ্য আছে, কখনও পুরনো হয় না। কতবার রূপনারায়ণের ওপর দিয়ে গিয়েছি, হয়তো ঝিমুচ্ছিলাম, জেগে উঠলাম। রবীন্দ্রনাথও রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠেছিলেন। এক নদী, বারবার দেখি। আমার নৈহাটির গঙ্গাটা, এক ছবি, কিছুতেই পুরনো হয় না। জানেন, বাংলার নদী-মাঠ-ভাটফুলও পুরনো হয় না। মাঠই কতরকম। কখন সবুজ কার্পেট বিছানো, কখনও ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস...আবার ধান কাটা হয়ে গেলে আর একরকম রূপ। ধান কাটা হয়ে গিয়েছে কবে যেন—খেতে মাঠে পড়ে আছে খড়। পাতা কুটো ভাঙা ডিম সাপের খোলস নীড় শীত। এইসব উৎরায়ে ওইখানে মাঠের ভিতর ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড়। কই, জীবনানন্দের একই কবিতা পুরনো হয় না তো...অনিকেত মাথা নাড়ায়।

—হুঁ। চাঁদও পুরনো হয় না। কতবার দেখেছি জীবনে, তবু দেখি।

—আর মাই পুরনো হয় না, তাই না? কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে সোমনাথ। গায়ে সামান্য কনুই-খোঁচা দেয়। ওর গা থেকে পারফিউমের গন্ধ আসে।

ট্রেনটা আন্দুল পেরতেই সোমনাথ ওর ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বার করল। বলল, দেখুন, 'অবমানব'-এর শেষ সংখ্যা। চলচ্চিত্রকার গৌতম ঘোষের একটা ইন্টারভিউ আছে, একটা কবিতা—সৌগত পালের লেখা—

দ্বিঘাত শরীরে অনেক মায়ার বাস
বাচ্চা নাচাও নেচে ওঠে একতারা
দিকে দিকে শুধু হলুদ সর্বনাশ
বেঁচে থাকা মানে মায়াময় নাড়াচাড়া
আকাশ বোঝে না কতটা জ্বালায় জল
বাষ্প হয়েছে দুনিয়াদারের চোখে
অভিশাপ মুছে যন্ত্রণা চঞ্চল...

কে এই সৌগত পাল কে জানে? কবিতাটা তো ভালই লিখেছে। কবিতাটা পড়তে-

পড়তেই অনিকেত একবার আড়চোখে সোমনাথের বুকের দিকে তাকায়। একটু পাশ থেকে। লক্ষ করে ওর বুক কতটা স্ফীত। সোমনাথ শাড়িটা পরেছিল বেশ আঁটোসাঁটো করে। বগলের তলা থেকেই একটা বর্তুলাকার ভাব। বেগুনি ব্লাউজের ওপর মেরুন আঁচল।

মেয়েদের চোখ-কান ছাড়াও একটা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আছে। ওরা কী করে যেন বোঝে, কে বা কারা—ওদের শরীরের ঠিক কোথায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। সোমনাথও বুঝে ফেলল। বাইরের ধানখেত থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অনিকেতের দিকে তাকাল। মুচকি হাসল।

অনিকেত একটু অপ্রস্তুত হল, তারপরই সামলে নিল। স্মার্ট হয়ে গেল।

জিগ্যেস করল, ভিতরে কিছু ভরেছ, না?

সোমনাথ বলল, না, গুরু। কোনও ভেজাল নেই।

—কী করে হল?

—হরমোন-থেরাপি করছি তো।

—তাই?

—হ্যাঁ। খরচা আছে। ভাল এন্ডোক্রিনোলজিস্ট-এর ট্রিটমেন্ট-এ আছি। ওষুধ খাই। বেশ উপকার হয়েছে না?

অনিকেত এবার ভাল করে তাকাল ওর বুকের দিকে।

অনিকেত বলল—তাই তো দেখছি।

সোমনাথ বুকের আঁচল টানে।

জানালা গলে হাওয়া আসে। বুকের কাপড় হাওয়ায় উড়াইয়া লইয়া যায়।

পত্রিকাটা দেখতে থাকে অনিকেত। চার পাতার কাগজ। দেখল, একটা ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছে সোমনাথ। 'প্রোষিতভর্তৃকা'।

অনিকেত পড়ে—"এরপরই মা ফটাফট হাতে তালি মেরে কোমর দুলিয়ে নাচতে থাকে—

মাগীদের বুকে বড়ো জ্বালা
হিজড়ে নিয়ে ঘুরছে দেখো বড়লোকের লালা।
মাগীদের চিপটিতে থুক ফেলছে বড়লোকের নাতি
মাগীদের গরব গেছে, মুখ শুকনো, নিভেছে দেমাক বাতি।

গান থামিয়ে মা সঞ্জুর চিবুক চুমড়িয়ে চুক করে হাতের চার আঙুল ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুমু খায়। বলে—'বেঁচে থাক বেটি, কে বলে হিজড়ে মাগীদের বাঁধা ভাতার হয় না। আর বাঁধা ভাতারেই কাম কি মা—নতুন-নতুন পারিক ধরবি, পুরনো হলে ছেড়ে দিবি। পারিককে বাটলির ভুখ্‌খা ধরিয়ে ছেড়ে দিবি। যত বয়স বাড়বে, দেখবি সঞ্জু, তোর কচি কচি ছোঁড়া খেতে ইচ্ছে করছে।'—শ্যামলী মায়ের এই অসংলগ্ন কথা থেকেই সুবীর বুঝতে পারে কত যন্ত্রণার নিরেট পাথরে ইট সাজিয়ে শ্যামলী মায়ের বুকের পাঁজর গড়া। হিজড়েদের একমাত্র জ্বালা-যন্ত্রণা-প্রতিহিংসার বিষয় হল নরনারীর 'স্বাভাবিক' জীবন। বেশ্যাপাড়ার সত্যিকারের মেয়েদের হারিয়ে সঞ্জু যে পারিক ধরতে পারছে, মেয়েদের চেয়েও সঞ্জুর যে বেশি ডিমান্ড—এটা মায়ের কাছে এক চরম জয়।"

এটা তো উপন্যাসের অংশ। ধারাবাহিক ভাবে বেরচ্ছে। অনিকেত বেশ বুঝতে পারছিল এইসব খুঁটিনাটি। বোঝাই যাচ্ছে সঞ্জু নামের ছেলেটাকে মা, মানে গুরুমা, বেশ স্নেহের চোখে

দেখে। ছেলেটার অনেক খদ্দের জুটছে, কিন্তু প্রেমিক জুটছে না। 'পারিক' হল অস্থায়ী প্রেমিক। সঞ্জুকে মনের মতো করে তৈরি করতে চাইছে। বলছে : পারিককে বাটলি-র ভুখ্‌খা ধরিয়ে দিবি। 'বাটলি' তো পশ্চাদ্দেশ। অন্য কথায় 'বাট্টু'। অনেকদিন ধরেই জানে। প্রথমেই কোমর নাচিয়ে যে-ছড়াটা বা গানটা গেয়েছিল গুরুমা, ওখানে বলা আছে বড়লোকের ছেলেরা নারী-যোনিতে আসক্ত না-থেকে হিজড়ে নিয়ে ঘুরছে দেখে স্ত্রী-বেশ্যাদের খুব কষ্ট। এই মর্মার্থ বা সরলার্থ বা ভাব সম্প্রসারণে নিজেই সন্তুষ্ট হয়ে নিজেকে ফার্স্ট ডিভিশন নম্বর দিয়ে দিল। তারপর অবাক হল সোমনাথের কথা ভেবে—যে জীবনানন্দের কবিতা মুখস্থ বলতে পারে, সে এত খুল্লমখুল্লা লিখতেও পারে?

সোমনাথ জিগ্যেস করল, কেমন লাগল?

অনিকেত বলল—অল্প একটু তো পড়লাম। আমাকে গ্রাহক করে নাও, পুরোটা পড়ব। বোঝাই যাচ্ছে অভিজ্ঞতার ওপর...।

অনিকেত জানত, সোমনাথ এ বিষয়ে ফিল্ড-ওয়ার্ক করেছে। সোমনাথকে নিয়ে হিজড়েদের সঙ্গে কথা বলতেও গিয়েছিল। অভিজ্ঞতা তো ওর আছেই।

অনিকেত জিগ্যেস করল, উপন্যাসটা কত বড় হবে?

সোমনাথ বলল—এটা তো এই 'অবমানব'-এর ওপর নির্ভর করছে। 'অবমানব' যদি উঠে যায়—উপন্যাসটাও শেষ হয়ে যাবে। উপন্যাসটা তো বাইপ্রোডাক্ট। বিয়ারের গ্লিসারিন, বা রাম-এর ভিনিগার। যেখানে রাম তৈরি হয়, সেইসঙ্গে ভিনিগারও তৈরি হয়, জানেন তো। আমি নিজেকে বোঝার তাগিদে, নিজেকে জানার তাগিদে হিজড়ে-খোলে ঘুরেছি, আমার এই চেহারা আর কথাবার্তার জন্য গুরুমা-রা আমায় ফোটায়নি। 'কোতি' ভেবে কথা বলেছে। মানে—ভেবেছে চান্স আছে, ওদের দলে ভিড়ে যাব। কিন্তু সাধারণত 'ঠুংঠাং'-রা ওদের দলে আসে না। 'ঠুংঠাং' মানে হল লেখাপড়া জানা ভদ্রলোক। জানেন তো?

—এই তো জানলাম।

—এরকম আরও অনেক কিছু জানবেন। যদি জানতে চান।

—উপন্যাস-টার নাম 'প্রোষিতাভর্তৃকা' কেন? কথাটার মানে তো যাদের স্বামী বাইরে থাকে।

—হ্যাঁ, তাই তো, আমি তো হিজড়েদের নিয়েই লিখছি, 'হিজড়ে' শুনতে খারাপ লাগলে—বলা যায় তৃতীয় সত্তার মানুষদের নিয়েই। ওরা বাহ্যিক লিঙ্গ-চিহ্নে যা-ই হোক, ভেতরে-ভেতরে নারী। একটা স্বামী খুঁজে যাচ্ছে। মনের মানুষ। 'মনের মানুষ' না-বলে 'মনের পুরুষ' বলাই ভাল। কখনওই পায় না। কিন্তু ভাবে আছে, কোথাও আছে, তার 'মনের পুরুষ'। বলা যায়, ওরা অন্তহীন 'প্রোষিতভর্তৃকা'। যদি এটা কোনওভাবে শেষ করতে পারি, তা হলে নামটা পাল্টে দেব। ওরা কিন্তু অন্তরিনও বটে। নিজেদের ভাবনায়, বিশ্বাসে, পাগলামিতে নিজেরাও অন্তরিন। ওরা-ওরা করছি কেন। আমিও তো তা-ই। এই তো আজ শাড়ি পরেছি। কলেজে যখন প্যান্ট-শার্ট পরে যেতাম, তখন লেডিজ টয়লেটে ঢুকতে পারতাম না। এরপর সালোয়ার-কামিজ ধরলাম। কলেজের কর্তারা কী গেরোয় পড়লেন ভাবুন তো? পেটের তলায় তো একটা পাইপ আছে। দাঁড়িয়ে হিসি করার ব্যবস্থা ভগবান করে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু পোশাকটা? সালোয়ার কিংবা শাড়ি পরে ছেলেদের বাথরুমে ঢুকতে দেওয়া যায়? আবার

সবাই জানে, পেটের তলায় পাইপ ঝুলছে, তা সত্ত্বেও মেয়েদের টয়লেটে ঢুকতে দেওয়া যায় কীভাবে? টয়লেটের শ্লীলতাহানি হবে না? আমাকে কিন্তু আমার 'হেড' আগেই বলে দিয়েছিলেন, আপনি কিন্তু জেন্ট্স টয়লেট 'ইউজ' করবেন। মানে, যখন আমি হরমোন করাচ্ছি, আস্তে-আস্তে দাড়ি ওঠা কমে যাচ্ছে, চামড়াটা লিলি হচ্ছে, মানে পেলব হচ্ছে, সরি, ব্রেস্ট ডেভেলপ্ড হচ্ছে, জিন্স-এর সঙ্গে গেঞ্জি পরছি, তখনই বলেছিলেন জেন্ট্স টয়লেট 'ইউজ' করার কথা, কারণ ওঁরা ভেবেছিলেন এবার হয়তো লেডিজ টয়লেটে যাব। আমাকে বললেন, আপনি একজন অধ্যাপক, পোশাকে শালীনতা বজায় রাখবেন। ঠিক আছে, সালোয়ার পরতে শুরু করলাম। এবার? এবার আমারে ঠেকায় কে রে? লেডিজ টয়লেটে গেলাম। রিপোর্ট চলে গেল। আমাকে বললেন, 'মিস্টার ব্যানার্জি'—ইচ্ছে করেই মিস্টার ব্যানার্জি বললেন। কী করব, আমার অ্যাডমিট কার্ডে তো সোমনাথ ব্যানার্জিই লেখা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার-এও তাই। আমি মনে-মনে নিজের নাম পাল্টেছি। 'মানবী' রেখেছি। কিন্তু ওঁরা শুনবেন কেন? আমাকে তো 'সোমনাথবাবু' বলেই ডাকছেন। আমি এবার এফিডেবিট করে নামটা চেঞ্জ করব। যাকগে, যা বলছিলাম—যেবার প্রথম মেয়েদের বাথরুমে গিয়ে বসে হিসি করলাম, সেদিন মনে-মনে যে কী তৃপ্তি হয়েছিল...কী আনন্দ কী আনন্দ, তা-তা-থৈ-থৈ। দেখি সেখানে গোপন জল ম্লান হয়ে হীরে হয় ফের; সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে; গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন হেমন্তের কুয়াশায়...।

লেডিজ টয়লেট ব্যবহার করার সামাজিক সম্মতি পাওয়াটা ওর নীলাভতম ইচ্ছা। ওঃ জীবনানন্দ!

এমন সময় হাততালির শব্দ। হিজড়ের দল এসেছে 'ছল্লা' তুলতে। মানে 'মাংতি' করতে—মানে 'তোলা' তুলতে।

ওরা অনিকেতদের সিটের কাছাকাছি এসে গিয়েছে। অনিকেত ওদের লক্ষ করতে থাকে। একজন চৌকো মুখের, দাড়ি কামানোর খরখরে ভাব রয়ে গিয়েছে। একজন লম্বা মুখের, শ্যামলা গড়ন। রোগা-রোগা। একজনের বেশ মেয়ে-মেয়ে ভাব। মুখ লক্ষ করে। মসৃণ মুখ। বুকটাও বেশ। চোয়াড়ে মুখের লোকটা সোমনাথকে বলল, গোর লাগি। সোমনাথও বলল, গোর লাগি।

দু-তিনজন উচ্ছ্বাস-মাখানো তালি মারল। একজন বলল, ঠুংঠাং টোন্যা? পারিক না কি?

সোমনাথ হাসল। বলল, সাংবাদিক।

সোমনাথের কাছে পয়সাকড়ি চাইল না ওরা।

ওকে সমীহ করে বোঝা গেল। ওদের একজন হাতটা নাড়াল—বাই-বাই করতে যেমন হাত নাড়ায়।

সোমনাথ বলল—যদি লেখাপড়াটা না-চালিয়ে যেতাম, হয়তো আমিও ছল্লায় নামতাম...।

অনিকেত আস্তে-আস্তে সোমনাথকে বলল—একজনকে দেখে মনে হল সত্যিকারের মেয়ে...। এদের কি 'জেনানা হিজড়ে' বলে? নিলয় চৌধুরীদের বইতে পড়েছি...।

সোমনাথ বলল—মেয়ে-হিজড়েদের 'জেনানা' বলে না। মেয়ে-হিজড়ে হয় না। জানানউলিদের অনেকে 'জেনানা' বলে। 'জানানউলি' মানে যার 'জানান' আছে, মানে, যাদের পেটের তলায় পাইপ আছে, এবং সেটা মাঝে-মাঝে জানান দেয়। জানিয়ে দেয়, আমি আছি।

শাড়ি পরলেও সে আসলে পুরুষ। 'আকুয়া' বলতে যা বোঝায় প্রায় তা-ই। তবে আপনার চোখ ভালই বলতে হবে। ওদের দলে সত্যিই একটা মেয়েমানুষ আছে। মানে, 'চিপটি-ওলা' মেয়েমানুষ। আসলে কী জানেন, সব বাউল যেমন বাউল নয়। বাউল একটা 'স্কুল অফ থট'। ওদের কিছু ফিলোজফি আছে, এবং ওদের জীবনচর্চাকে গাইড করে ওই ফিলোজফি। গানগুলো সেই দর্শনটাই 'এক্সপ্রেস' করে। তবে কেউ যদি তালি-মারা আলখাল্লা পরে একতারা বাজিয়ে ওইসব গান গায়, আমরা ওদেরও 'বাউল' বলি। আসলে ওরা হল 'বাউল গায়ক'। এটা পেশা। বাউল-গান গেয়ে পয়সা রোজগার করে। আবার হিজড়েদের মধ্যে যারা ছল্লা তোলে, ট্রেনে তালি বাজিয়ে তোলা তোলে, তাদের মধ্যে দু-একজন মেয়ে চলে আসে আজকাল। ট্রাডিশনাল খোলে মেয়েদের অ্যালাউ করা হয় না। এদের দলে যে-মেয়েটা আছে, ওকে রোজ দেখি না। কোনও-কোনও গুরুমা হয়তো ওদের খোলে মেয়েদের অ্যালাউ করছে। আজকাল মেয়েরা ওখানে খুব সেফ। ধর্ষণের কোনও ভয় নেই। যাদের সঙ্গে আছে, ওরা কেউ চিপ্‌টি ভুখ্‌খি নয়। তবে কোনও 'আকুয়া', মানে লিকম্‌ধারী যদি ওর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে, সেটা কিন্তু লেসবিয়ানিজ্‌ম-এর নামান্তর। এবং পারস্পরিক সম্মতিতেই হয়। তবে ওসব খোলে অনেক ডাব্‌লডেকার খদ্দের আসে, মানে 'বাইসেক্সুয়াল'। যারা হিজড়ে সম্ভোগও করে। আবার রেডি চিপ্‌টি পেয়ে গেলে, সেটারও সদ্ব্যবহার করে। তবে এরা এক্সেপশনাল। বেশির ভাগ খোল-ই নারীবর্জিত, অথচ সবাই নারী। আমরা সবাই নারী আমাদের ওই মায়ের রাজত্বে। এরপরে আর একটা দল আসবে, খড়গপুর থেকে উঠবে। ওদের দলের দু'জনকে দেখে একদম মনে হবে মেয়ে। আসলে ওরা মেয়ে নয়। ছিন্নি। ছোটবেলায় ছিব্‌ড়ি হয়ে গেলে ওদের গোঁফ-দাড়ি ওঠে না, মুখটাও পেলব টাইপের হয়ে যায়।

—ছোট বয়সে কী করে আসে? অনিকেত জিগ্যেস করে। এখানেও কি ট্রাফিকিং আছে? ছেলেদের বিক্রিবাট্টা করার কোনও চক্র-টক্র?

সোমনাথ বলল—ছেলেধরারা এদের কাছে বিক্রি করে—এরকম কোনও ঘটনা জানি না—আমি অন্তত জানি না। তবে কমবয়সে কী করে আসে—পরে একদিন বলব।

সোমনাথ আর অনিকেত এভাবে গল্প করছে। অনেকেই ওদের দিকে তাকাচ্ছে। সোমনাথের শাড়ি-পরা পুরুষালি চেহারা দেখছে অনেকেই।

অনিকেত বলল, গল্প করতে-করতে যাচ্ছি—ভালই লাগছে। অন্যদিন কী করো সোমনাথ? সঙ্গী জোটে?

সোমনাথ বলল—আমার পাশের সিটটা অনেকক্ষণ খালি পড়ে থাকে। কেউ বসতে চায় না তো। সব সিট ভরে গেলে, বা কোথাও সিট না-পেলে কেউ আমার পাশে বসে। ছেলে হোক, মেয়ে হোক, সবাই 'অ্যাভয়েড' করে। আমি বই পড়তে-পড়তে চলে যাই।

অনিকেত জিগ্যেস করে, স্টুডেন্টরা কীভাবে দ্যাখে তোমাকে?

প্রথম-প্রথম প্যাঁক দিত। এখন দেয় না। 'ভাল শিক্ষক' বলে নাম হয়েছে। পড়ানোর জন্য আমি মাইনে পাই। ওই কাজটা ভাল করে করি। এর বাইরে কী পোশাক পরি, বাথরুমে গিয়ে কী করি, এসব তো ওদের দেখার কথা নয়। কলেজের মেয়ে-স্টুডেন্টরা কিন্তু আমাকে খুব ভালভাবে নিয়েছিল। ছেলেরা একটু রেজিস্ট্যান্ট ছিল, এখন অনেক ঠিক হয়েছে।

—'স্যর' বলে না 'ম্যাডাম'?

—'স্যর'-ই বলে। 'ম্যাডাম' আনতে টাইম লাগবে।

এরপর একটা ফোন এল। রিং টোনে 'ভালবাসি—ভালবাসি'। রবীন্দ্রসংগীত। ওরও মোবাইল আছে? অনিকেত ভাবে ওকে এবার সত্যি-সত্যি কিনতে হবে। মঞ্জু বলেছিল, ওকেও একটা কিনে দিতে। মোবাইল ছাড়া কথা হবে কী করে? শুক্লার সঙ্গে তো অফিসের ফোনেই কথা বলা যাবে বাড়ির ল্যান্ড-ফোনে।

সোমনাথের মুখটায় ধানের খেতের শ্যামলিমা লাগে।

—হ্যাঁ, বলো বলো।

... ...

—এই তো আর দশ মিনিটের মধ্যেই খড়গপুর পৌঁছে যাব।

... ...

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, পুরি-আলুর দম খেয়ে নেব। তুমি কিছু চিন্তা কোরো না।

... ...

—লক্ষ্মীর পাঁচালি? আরে, আজ তো সবে সোমবার।

... ...

—আমি সোজা কলেজে চলে যাব।

... ...

—বিকেল হবে। পাঁচটা। চাবি তো আছে আমার কাছে।

... ...

—না বাবা, রসগোল্লা রাখতে হবে না। অত কষ্ট করতে হবে না সোনামণি...।

... ...

—ঠিক আছে। রাখছি। চু-চু-চু-চুম্‌মা।

সোমনাথের মুখ যেন রেডিয়াম লাগানো এখন। আল্‌ফা, বিটা বেরচ্ছে। ছোট্ট করে বলল, লাভার। আশ্চর্য, 'পারিক' বলল না। 'লাভার'। কৌতূহল হলেও আর কোনও প্রশ্ন জিগ্যেস করল না অনিকেত।

সোমনাথ নিজে থেকেই বলল—আমায় খুব ভালবাসে। মাস ছয় হল আলাপ হয়েছে।

অনিকেত বলল, প্রতি সোমবারই তুমি যাও এই ট্রেনে?

সোমনাথ বলল, হ্যাঁ। প্রতি সপ্তাহেই আসি। বাড়িতে বুড়োবুড়ি আছে তো...।

ফোন নম্বরটা চাইল না। কী হবে?

ওর তো মোবাইল নেই। এবার কিনতে হবে একটা। পাহাড়ের টিলায় জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে মঞ্জুকে ফোন করবে। বলবে, চলে এসো মঞ্জু।

চাঁদ তো পুরনো হয় না কখনও। আর?

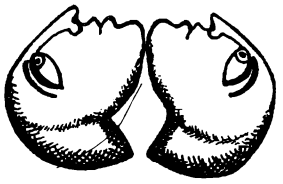

মোবাইল ফোন কিনল অনিকেত। তিন হাজার টাকা দাম। হাচ কোম্পানি-র কানেকশন। টেস্ট করার জন্য বাড়িতে ফোন করল ল্যান্ড-ফোনে।

—শুক্লা, মোবাইল কিনেছি, প্রথম ফোনটা তোমাকেই করছি।

—জেঠিমা পুজো কচ্চে।

ঘড়িতে দেখল বেলা সাড়ে এগারোটা। এখন আবার কী পুজো? পুজো তো সকালে হয়, স্নান করে। তারপর সন্ধেয়, আর রাতে শোওয়ার আগে। শোওয়ার আগে প্রার্থনা টাইপের কিছু করে, কারণ তখন ওর ঠোঁট নড়ে। একই তো প্রার্থনা। রেকর্ডেড প্রার্থনা প্রতিদিন রি-ওয়াইন্ড করে-করে বলা। এত রিপিট ব্রডকাস্ট, ঠাকুর রাগ করেন না? বোর হন না? আগেও তিনবার করেই করত শুক্লা, কিন্তু ডিউরেশন কম ছিল। ক্রমশ ডিউরেশন বাড়ছে। এছাড়া করবেই বা কী? অনেক আগে, হয়তো এক যুগেরও বেশি আগে, কোত্থেকে একটা 'জোক' শুনে এসে অনিকেত শুক্লাকে বলেছিল : প্রার্থনার চেয়ে সেক্স ভাল, অনেকগুলো কারণেই ভাল। একনম্বর কারণ, প্রথম ক্ষেত্রে উভয়ের সম্মতির দরকার হয় না, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দু'জনেরই সম্মতির দরকার হয়। সেক্স-এর সময় 'ওহ্ গড' বলা হয়, কিন্তু প্রার্থনায় কখনও 'ওহ্ ফাক' বলা হয় না।

এরকম করে চার-পাঁচটা পয়েন্ট শোনার পর শুক্লা বলেছিল—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি দু'ঘণ্টা ধরে প্রার্থনা করছি, তুমি দু'ঘণ্টা ওই কম্মো করো তো দেখি... আমি দু'বেলা প্রার্থনা করছি, কিংবা তিনবেলা। তুমি তিনবেলা করো তো দেখি? প্রার্থনার পর ফ্রেশ হয়ে যাই, আর ওসবের পর কেতরে যাও। কোনটা ভাল?

ফোন ধরে আছে মন্টু। মোবাইলের প্রথম ফোনটা মন্টুকেই করা হয়ে গেল। অনিকেত বলল, এখন কেন ঠাকুরের কাছে?

—ফুলের জন্য।

—ফুলের জন্য মানে?

—আমাকে ফুল দেবে তো...ঠাকুরের ফুল। আমার পরীক্ষা কিনা...।

—বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে, কখন পরীক্ষা?

—বেলা একটা থেকে...।

কথা বাড়াল না অনিকেত। পয়সা উঠবে। এবার মঞ্জুকে। ওর অফিসের ফোনে। 'হ্যালো' শুনেই মঞ্জু গলা চিনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল—ডাবুদা, কবে এলি?

—কাল রাতে। একটা মোবাইল কিনলাম, এইমাত্র।

—এইমাত্র? আমাকেই প্রথম ফোন করছিস?

—হ্যাঁ।

—উঃ, কী ভাল লাগছে! কেমন লাগছে নতুন জায়গায়?

—বেশ ভালই তো লাগছে। ভাল জল-হাওয়া, বড়-বড় গাছ, পাখি, কিন্তু তোকে 'মিস' করছি।

—ইঃ, ঢং, বাজে কথা বলার জায়গা পাস না? কলকাতায় যখন ছিলি, কত যেন দেখা করতিস...। পাত্তাই দিতিস না।

—পাত্তা দিতাম না মানে? যা কিছু পাত্তা—সে তো তোকেই দিতাম। তুই ছাড়া আমার আর কোনও 'গার্লফ্রেন্ড' আছে না কি?

—আবার বাজে কথা? আইভি ঘোষ না কী যেন? ওর কথা তো খুব বলতিস...

—ও 'গার্লফ্রেন্ড' না 'বয়ফ্রেন্ড' নিজেই জানি না।

—যাক গে। এখন তো ছুটিতে। এখন তো আর অফিস দেখাতে পারবি না...।

—কাল একবার অফিসে যাব ভাবছিলাম, একটু দরকার ছিল।

—যেতে হবে না অফিসে। কাল আমিও যাব না। ডুব মারব। কাল সারা দুপুর আমার...মানে কালকের দুপুরটা আমাকে দে ডাবুদা।

—কোথায় যাব? রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরতে ভাল লাগে না। এই বয়সে মাঠে-ঘাটে বসলে ছেলে-ছোকরারা প্যাঁক দেয়।

—দক্ষিণেশ্বর গেলে হয় না?

—আর জায়গা পেলি না?

—এখনও তো গরম পড়েনি। গঙ্গার ধারে বসা যায়। কেউ কিছু বলবে না।

—ধুর, ওখানে কী যাব, তারচে' ওখানে যাবি? ওই চেম্বারে?

—যা বলবি...।

'ওই চেম্বার' মানে হল একটা কেবিন। সাধারণ কেবিন নয়, বার-এর কেবিন। মধ্য কলকাতায় দু-একটা বার-কাম-রেস্তোরাঁ আছে, যেখানে এখনও 'খোপ' পাওয়া যায়। পর্দা-ঢাকা। ভারী পর্দা, বাতাসে খুব একটা ওড়ে না। একবার ওখানে গিয়েছিল। সেবারও দুপুরে। ওখানে লাল জামা পরা বেয়ারা আছে এখনও। স্যালুট দিল। ওখানে খুব একটা রং-এ ঢুকেছিল, এমন নয়। মঞ্জু যদি সুন্দরী হত, তা হলে রং-এ ঢুকত। যদি কমবয়েসি হত, তা হলেও। মধ্যবয়স্কা এক মহিলা, প্রসাধনেও পরিপাটি নেই। চাকরিটা করে বলে এক ধরনের স্মার্টনেস আছে—এই যা। 'বাজারের মেয়ে' বলে মনে হয় না। বেয়ারা যে স্যালুট-টা মেরেছিল তাতে সম্ভ্রমের চিহ্ন ছিল না। যান্ত্রিক ছিল। আরও কয়েক বছর আগে বেতার নাটকে জাতীয় পুরস্কার পাওয়া এক অভিনেত্রী বলেছিল, চলুন অনিকেতদা, খাওয়াব। এখানেই ঢুকেছিল। সেদিন স্যালুটের কায়দাটাই আলাদা রকমের ছিল। পায়ে শু ছিল না বেয়ারার। চটি। তাতেই পা ঠোকার শব্দ হয়েছিল।

সেদিন পর্দা-ঢাকা কেবিনে একটু অবাক চোখে চারদিক তাকাচ্ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল, এসব জায়গায় যাওয়া-আসার খুব একটা অভ্যেস নেই মঞ্জুর। ওর অফিস কলিগ-রা কতই বা মাইনে পায়? এসব ছোটখাটো ট্যুরিজম-এর কোম্পানি বেশি মাইনেপত্তর দেয় না। ওর পুরুষ-কলিগ'রা বড়জোর অনাদি-তে মোগলাই পরোটা খাওয়াতে নিয়ে যেতে পারে। আর মালিক স্বয়ং? কে জানে? তবে ওরা যদি এসব করতে চায়—আরও সুন্দরী পাবে।

অনিকেত জিগ্যেস করেছিল, বিয়ার খাবি?

ও ঘাড় নাড়িয়ে ছিল। নিষেধের। মৃদু। 'বিয়ার' শুনেই ঘটঘট করে 'না' বলা বা নাক ওঠানো, বা কপাল কুঁচকোনো—ওরকম কিছু নয়। অনিকেত জিগ্যেস করেছিল, খাসনি কখনও?

মঞ্জু বলল, আমার বর আনত। বেশির ভাগ দিন বাইরে খেত, মাঝে-মাঝে বাড়িতেও। আমাকেও খেতে বলত। ওটা বিয়ার নয়, হলুদ। সোনালি রং। ওটা বোধহয় হুইস্কি। চকোলেট রঙেরও একটা জিনিস আনত। ওকে ওর কোনও বন্ধু বলেছিল, বউকেও একটা খাওয়াবি, তা হলে ওর হবে। তোকে তো বলেছি, আমার ইচ্ছে হত না। শুধু ওর জন্যই শুতে হত। ওকে গায়ে নিতে হত। ও ব্লু-ফিল্ম দেখাত। ওখানে মেয়েরা যেসব কাণ্ড করত, ওসব দেখে ঘেন্না হত আমার। দেখতে পারতাম না। ও চাইত, আমিও ওরকম করি। আমি পরতাম না। ওর ধারণা হয়েছিল, হুইস্কি খাইয়ে দিলে আমি ওরকম করব। আমার খেতে ভাল লাগত না। কীরকম ঝাঁঝ লাগত। একটু তিতকুটে। ও একটু সোডার জল ঢেলে দিয়ে বলত 'আস্তে-আস্তে খেয়ে নাও'। আমি তাই করতাম। আমার ঘুম এসে যেত। আমি চিত, দু'পাশে দু'হাত। আমার দু'পাশে দু'টো হাত শুকনো বাঁশের মতো পড়ে আছে। ও আমার হাত দু'টোকে ওর দু'হাতে ধরে ওর পিঠের ওপর উঠিয়ে বলত, চেপে ধরো। খামচাও। আমি ওর কথা মান্য করার চেষ্টা করতাম, কিন্তু ঘুম-ঘোরে শুনতাম—আজব মাগি। ভেজেও না। ঘা হয়ে যাবে। ভেতরে থেঁতো ট্যাঁড়স ঢুকিয়ে দেব। সেটাও করেছিল। ট্যাঁড়স কেটে, জলে ভিজিয়ে, সেই পিছল জল...। এমনি-এমনি আমাকে ছেড়েছে ও?

—ডাক্তার তো দেখিয়েছিল, মনের ডাক্তার। কী বলেছিল ডাক্তার?

—ডাক্তারবাবু ছবিতে বুঝিয়েছিল অনেক কিছু। সারা শরীরে কম্পন কীভাবে হয়, 'অর্গ্যাজ্‌ম' নামে একটা শব্দ বারবার বলত। বলত, ওটা আপনাকে পেতেই হবে।

আজ একটু বিয়ার খা। অল্প করে। ভাল না-লাগলে খাবি না। অনিকেত বলে।

বেয়ারা ঝপ করে ঢোকে না। 'মে আই কাম ইন' বলে ঢোকে। মেনু নিয়ে ঢুকেছিল। দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অনিকেত বলে, পাঁচ মিনিট পরে আসুন।

—কী খাবি? কার্ডটা মঞ্জুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

—আমি কী জানি? মঞ্জু ঠেলে দিল ফের।

—চপ সোয়ে?

—আমি ওসব জানি না। আমি শুধু চাউমিন জানি, আর চিলি-চিকেন। যা রাস্তায় বিক্রি হয়।

—তা হলে চাউমিন-ই খা। হাক্কা।

ইচ্ছে করেই এসব 'জার্গন' উচ্চারণ করছিল অনিকেত। মঞ্জু যে এসব জানে না এবং স্বীকার করবে সেটা, আর তা এক ধরনের আনন্দ দেবে।

—হাক্কা না পাক্কা, যা খুশি বলে দে।

চাউ, মাঞ্চুরিয়ান, আর দু'টো বিয়ার বলেছিল। মঞ্জু বলেছিল, আমি কিন্তু খাব না।

অনিকেত বলেছিল—যতটা পারবি খাবি, আমি তো আছিই।

—তুই রোজ এসব খাস?

—এসব মানে? চাউ, চিকেন—এসব?

—না, মদ।

—কালেভদ্রে। বিয়ার কি মদ নাকি? চিরতার জল।

—তোর বউ জানে?

—বউ রাগ করে। বাড়িতে একদম না।

—বাইরে খেয়ে গেলে মুখে গন্ধ পায় না?

—না।

—কেন? আমি তো খুব পেতাম।

—ও বেশি খেত। আমি তো বেশি খাই না, এছাড়া খাই কোথায়? আজ তোর অনার-এ...।

হাফ গ্লাস বিয়ার ঢেলে দিয়েছিল মঞ্জুকে।

মঞ্জু বলল, এত ফেনা কেন? তারপর বলল, লস্যির ফেনা অনেকক্ষণ থাকে, এটা মিলিয়ে যায়।

একটু চুমুক দিল। বলল, তেতো, কিন্তু খেতে খুব খারাপ না তো...।

অনিকেত বলল, আরে—এ তো চিরতার জল...

মঞ্জু একটু-একটু করে পান করছিল। মঞ্জুর গ্লাস অর্ধেক শেষ হওয়ার আগেই অনিকেতের দু-গেলাস হয়ে গেল। আবার ঢালল। ফেনা।

অনিকেত বলল, অর্গ্যাজ্‌ম হচ্ছে, দ্যাখ...।

—কোথায়?

—এই গেলাসে। এই ফেনায়।

—ওই ব্যাপারটা কী রে?

—আমি তোকে বোঝাব। একদিন বোঝাব।

—বোঝা...।

—এখানে হবে না। বোঝাতে গেলে প্রথমে...

কথা না-বলে মঞ্জুর উরুতে হাত দিল। হাত-কে গতি দিল। 'হারমনিক মোশন' নয়, কিছুটা 'ক্যাওটিক মোশন' বরং। অনিকেত লক্ষ করল, মঞ্জু চোখ বুজেছে। হাল্কা আলোয় মদির মুখখানি দেখতে থাকে। বরং বলা যায়—অবলোকন করতে থাকে। কাঁধে হাত দেয়। মঞ্জু কিছু বলে না। গালে ঠোঁট ছোঁয়ায়। ঠোঁটেও। মঞ্জু চোখ বুজে আছে। অনিকেতের অন্য হাত উরুদেশে চঞ্চল।

—ও, সরি সরি। বেয়ারা ঢুকে বলল।

নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল অনিকেত।

মঞ্জু বলল, এ মা, ছিছি।

অনিকেত বলল, ছিছি-র কী আছে? কিন্তু অনিকেত বুঝতে পারছিল ওর বুকের ধপধপ। গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে আবার হাতটা কাঁধে রাখে। মঞ্জু হাত সরিয়ে দেয়।

বলে, চল, এখান থেকে চলে যাই।

অনিকেত বলে, এখন কেন যাব? শেষ করি...।

মঞ্জু বলল, ওরা কী ভাবল...

অনিকেত আবার স্পর্শ করার চেষ্টা করল। মঞ্জু সরে গেল।

আবার বলল—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চল।

অনিকেত, যাব না। তোর ফ্রিজিডিটি-টাকে দেখে নেব। এদিকে আয়। মঞ্জু উঠে দাঁড়ায়।

অনিকেত বলে, তোর বর এমনি-এমনি ফুটেছে?

মঞ্জু মুখ নিচু করে থাকে। প্লেটে খাবার পড়ে থাকে। বেয়ারা এলে বিল মেটায়। দশ টাকা টিপ্‌স দেয়। বেয়ারা জিভ কেটে বলে, দশে হয়? পঞ্চাশ...। অনিকেত মনে-মনে খিস্তি দেয়। একটা পঞ্চাশ-ই বের করে।

মঞ্জু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। যেন বেরতে পারলে বাঁচে। বেরিয়েই অনিকেত বলে—তুই কোথায় যাবি যা। আমি চললাম।

মঞ্জু বলেছিল, রাগ করলি?

অনিকেত উত্তর দেয় না।

মঞ্জু বলে, ঠিক আছে, আর একদিন। আমাদের বাড়িতে। পরিমল তো থাকে না দুপুরে...।

লোভ দেখাচ্ছে? যেন ওর শরীরের জন্য কাতর। যেন খুব লোভ আছে...। ইচ্ছে করলে আর চেষ্টা করলে অনেক পেত। নেহাত ছোটবেলার একটা 'ইয়ে' আছে, তাই।

ক'দিন পর মঞ্জু-ই ফোন করেছিল আবার। অনিকেত ফোনটা তুলতেই ও শুনতে পেয়েছিল—রাগ করে না রাগুনি, টেকোমাথায় চিরুনি, আমি আসব এক্ষুনি, নিয়ে যাব তক্ষুনি...।

—কোথায় নিয়ে যাবি?

—ময়দানে।

—না, ময়দানে বসে বাদামভাজা খেতে আমি রাজি নই। তা ছাড়া পুলিশ আছে।

এই কথাটার মধ্যে কয়েকটা 'মেসেজ' ছিল। ময়দানে যেসব 'ফ্লাইং-মেয়ে' ঘোরে, তোমাকে ওদেরই একজন ভাবতে পারে পুলিশ, তার মানে তুমি মোটেই ভাল নও মঞ্জু। তবু আমি রাজি, কিন্তু শুধু বসে-বসে গল্প করতে নয়। ওসব অনেক হয়েছে।

—ময়দানে যাবি না? মঞ্জু বলে, তা হলে আমাদের বাড়িতেই চল।

—এখন বেলা একটায় বেরব কী করে? তোর অফিস?

—এলাকায় গন্ডগোল। অফিস বন্ধ।

—কেন?

—আমাদের এই এলাকার একটা পেপার মার্চেন্ট-কে কাল কারা ছুরি মেরেছিল, আজ সে মারা গিয়েছে। তাই এলাকার ব্যবসায়ীরা থানায় যাচ্ছে।

অনিকেতের তেমন কাজ ছিল না অফিসে। তা ছাড়া, ওর কাজের ধরনটাই এমন, ইচ্ছে করলে বেরতে পারা যায়।

ওরা দেখা করল, মৌলালির মোড়ে।

মঞ্জুর বাড়িতে কখনও যায়নি আগে। মঞ্জুও বলেনি কখনও।

এন্টালি বাজারের পিছনে একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে একটা গলির মধ্যে পড়ল। পুরনো শিশি-বোতলের আড়ত, সস-তেল এসবের চেয়ে মদের বোতলই বেশি। মদের বোতলের ছিপি খুলে বোতলের তলায় পড়ে থাকা কয়েক ফোঁটা ঢেলে রাখছে একটি বছর দশের ছেলে। বলা ভাল—সংগ্রহ করছে। প্রতিটি বোতল থেকে দশ-বারো ফোঁটা করে ক্রমশ

এক বিচিত্র ককটেল। সিনেমার পোস্টার আঁকছে বড় কাপড়ে। দিল তো পাগল হ্যায়...। তেলেভাজার দোকানের নোংরা কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যায় রুগ্‌ণ ফুলুরি। ছোট-ছোট টিনের কিংবা খোলার চালার ঘরের ফাঁকে-ফাঁকে দু'টো-একটা তিন-চারতলা বাড়ি। ধপ করে সামনে পড়ল এক পলিথিন নোংরা। পলিথিনটাতে গিঁট দেওয়া ছিল না, একটা নেংটি ইঁদুর বেরিয়ে আসতেই একটা কাক ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল। একটা শনি মন্দিরের পাশ থেকে গান বাজছিল 'কলকাতা, কলকাতা—ডোন্ট ওয়্যারি কলকাতা'। ওরা আর একটা আরও সরু গলিতে ঢোকার আগে মঞ্জু একটু দাঁড়িয়ে পড়ল।

ও বলল, দেখতেই তো পাচ্ছিস কীরকম পাড়ায় থাকি। এদিকে অবাঙালিই বেশি, কিন্তু আমি যে-বাড়িতে থাকি, ওখানে চার ঘরই বাঙালি। আমার বাড়িতে বাইরের লোক খুব একটা আসে না, শুধু ছেলের বন্ধুরা। আমার কোনও পুরুষ-বন্ধু নেই। এখানে ও আসেনি তেমন। ভরদুপুরে হঠাৎ কেউ এলে কৌতূহল তো হতেই পারে। যদি কেউ কিছু জিগ্যেস করে, ট্যুর-সংক্রান্ত কথা বলবি। আমার আশেপাশে যারা থাকে, ওদের কারও চায়ের দোকান, কেউ সবজির ব্যবসা, একজন ছাপাখানায় কাজ করে, কেউ ছোটখাটো ব্যবসা করে—এরকম।

দরজা খোলা। কিন্তু দরজা দিয়ে ঢুকলে একটা উঠোন। উঠোনে একটা জলের কল। উঠোনের চারদিকে চারটে টিনের চালের ঘর। ঘরগুলো পাকা। বাইরে বারান্দা। ওরা ঢুকতেই একটা নেড়িকুকুর তুমুল ডেকে উঠল। কুকুরের ডাক শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল একটা বুড়ি, আর একজন মোটামতো প্রৌঢ়া। ওদের দেখল। মঞ্জু একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল। গ্রিলের দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। বারান্দার একদিকে পার্টিশন করে রান্নাঘর, বারান্দার অন্যপাশে একটা ছোট ঘর।

মঞ্জু বলল—ছেলের ঘর।

ওর ঘরে ঢুকল। ঘরের দেওয়ালে একজন পুরুষ-সংলগ্ন মঞ্জু। বোধহয় বিয়ের পরে তোলা। ঘরটা ছোট। একটা খাট, আলনা, একটা আলমারি। একটা ফ্রিজ, টিভি। মাঝখানে সামান্য লাল সিমেন্টের মেঝে—অবশিষ্ট।

মঞ্জু বলল, বোস। এভাবেই থাকি। কখনও ভেবেছিলাম, আমার ঘরে তুই আসবি। কত বড় চাকরি করিস...।

অনিকেত বলল—এসব বাজে কথা রাখ। তোদের বাথরুম কোথায়?

মঞ্জু বলল, বাইরে। কলের পাশে। দু'টো আছে। চৌবাচ্চায় জল থাকে। ছেলেরা বাইরেই করে। মেয়েরা ভেতরে। টিন দিয়ে ঘেরা। কেন, বাথরুম যাবি?

অনিকেত মাথা নাড়ায়।

মঞ্জু হাত-পা ধুয়ে এসে মুখ মোছে। খাটে বসে। দূরত্ব রেখে। এ-কথা সে-কথা হয়। হতে-হতে স্বামী-প্রসঙ্গে আসে।

অনিকেত জিগ্যেস করে, মনে কর তোর স্বামী এখন যার সঙ্গে আছে, সে নেই। চলে গিয়েছে, বা কিছু হয়েছে। তারপর ওর অসুখ হয়েছে খবর পেলি। কী করবি?

মঞ্জু হাসে। বলে—অসুখ তো? রুগ্‌ণ। উইক। তখন নিশ্চয়ই করতে-টরতে চাইবে না। আমি যাব, সেবা করব।

—তারপর ভাল হয়ে গেলে?

—জানি না—যাঃ। এই বলে ভ্রু-ভঙ্গি করে। কাছে এসে অনিকেতের থুতনিটা নাড়িয়ে দেয়।

অনিকেত জানে, ওটা গ্রিন সিগন্যাল। কাছে যায়। বাৎসায়ন-নির্দেশিত উপযুক্ত স্থানে স্পর্শাদি করতে গেলে মঞ্জু বলে, দাঁড়া চা করে নিয়ে আসি।

এগুলোকে কী বলে? ছলনা, ছেনালি, না ছমকানো? না কি মনোবিজ্ঞান-মতে, ফ্রিজিডিটি-র সিম্প্টম?

—ডিমের অমলেট খাবি?

জোরে মাথা নাড়ে অনিকেত।

মডার্ন হয়েছে, এখন মামলেট নয়, অমলেট।

চা নিয়ে এল মঞ্জু।

চা-টা তো খেতে হল।

অনিকেত বলল—চা এনে ভালই করেছিস। মাথা ধরেছিল।

মঞ্জু বলল—আয় মাথাটা টিপে দি। শুয়ে পড়।

মঞ্জু ছিটকিনিটা টেনে দিল।

মঞ্জুর কোলে মাথা রাখল অনিকেত।

মঞ্জু মাথা টিপছিল। পাতলা হয়ে-আসা-চুলে বিলি কেটে দিতে-দিতে বলল—সেই ছোটবেলায় ঝপ করে বাথরুমে ঢুকে, খপ করে না-ধরে যদি দু'টো ভাল-ভাল কথা বলতিস...

অনিকেত বলল—আজ আর খপ করে ধরব না। আস্তে-আস্তে...।

আস্তে-আস্তেই উন্মোচন করছিল অনিকেত। চেষ্টা করছিল উষ্ণতা এনে দেওয়ার।

এমন সময় দরজায় ধাক্কা।

তাড়াতাড়ি শাড়ি ঠিক করল মঞ্জু। ভাগ্যিস বেশি কিছু হয়নি। অনিকেত খাটের কোনায় চলে গেল।

বলতে লাগল, জব্বলপুর ঠিক আছে। কিন্তু জব্বলপুর থেকে ভীমবেটকা যেতে চাই, আর ইয়ে ইয়ে...যেখানে শোন, নর্মদা এসব নদীর উৎস...মহানদীও...অমরকন্টক নামটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না। ঝরনা, ঝরনা, খাজুরাহো...ফ্যামিলি নিয়ে যাব। গাড়ি...বিদিশা...শ্রাবন্তী...

দরজাটার ছিটকিনি খুলল মঞ্জু। মোটামতো প্রৌঢ়া মহিলাটি বাইরে। চেঁচিয়ে বলল—গ্যাস জ্বলছে হাউ-হাউ করে, এদিকে দরজা বন্ধ। আমি নিব্যে দিয়েছি। কী করিস, অ্যাঁ? খেয়াল থাকে না? আগুন লেগে যেত...।

মঞ্জু বলল—ইশ গো, একদম ভুলে গিয়েছি তাড়াতাড়িতে গ্যাস নিভাতে। অফিস তো বন্ধ, খুলতে দিল না, ও-পাড়ায় ঝামেলা হয়েছে। ক্লায়েন্ট এসেছে বাড়িতে।

অনিকেত ওর বিদিশা—শ্রাবন্তী থামিয়ে বলল—কত টাকা তা হলে দিতে হবে বলুন?

বলার পরই, নিজের কানে কথাটা খারাপ শোনাল। দরজার ছিটকিনি বন্ধ, ব্লাউজের পিছনের হুক খোলা, যদিও দেখতে পাচ্ছেন না ওই মহিলা, 'কত টাকা দিতে হবে' এই পরিস্থিতিতে খুব খারাপ কথা।

অনিকেত বলল, যেখানে-যেখানে যাব বললাম, সেগুলো যেন ট্যুর-এ থাকে। টাকাটা বলুন। মহিলা চলে গেল।

মঞ্জু দরজাটা ভেজাল না আর।

অনিকেত বলেছিল—তোকে খারাপ ভাবল?

মঞ্জু স্বর নামিয়ে বলল—কে জানে? আগে তো কখনও দেখেনি এমন। আমার বর কেন আমার সঙ্গে থাকেনি, কিছুটা জানে। ওটার জন্য আমার প্রতি সম্ভ্রম আছে। আমার 'ইয়ে' কম, ওটা আমার প্লাস পয়েন্ট।

ও একদিন বলেছিল—তোর কী সুন্দর আঁটো-গড়ন, তোকে ছেড়ে তোর স্বামী অন্য মেয়ের ঘর করে। তুই রোজ জায়ফলের গুঁড়ো খা। দেখবি এমন হবে, স্বামীকে ছিঁড়ে খাবি।

অনিকেত বলে, খেয়েছিলি?

ও বলে, উঁহু।

—চলি রে...। অনিকেত ওঠে।

ওই ঘটনা মাস ছয় আগের। ওসব লাইনে আর ভাবেনি। দুলাল-টুলাল...ঝামেলা কম ছিল না কি?

মঞ্জুর আহ্বানে আবার বেরল অনিকেত।

মঞ্জুর বাড়িতে আর যাওয়া নেই। ওই মুটকি-টা মুখ চিনে রেখেছে। ক্লায়েন্ট সেজে বারবার তো যাওয়া যায় না। একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবে আজ। একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে।

কিন্তু বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তটার কথা ভাবলেই, বুকটা ধুকপুক করে ওঠে কেন?

বলতে গেলে। সচ্চরিত্র ছিল ও। বিশেষত বিয়ের আগে। এজন্য মঞ্জুই দায়ী। মঞ্জুকেই থ্যাঙ্কস জানাতে হয়। কিংবা ওকেই দোষ দিতে হয়। সেই বয়ঃসন্ধিতে মঞ্জু ওকে যে-অপমানটা করেছিল, এবং পরবর্তী বহু দিন ওর মুখে, দেহের ভাষায় ঘৃণা বজায় রেখেছিল, সেটাই ওকে মেয়েদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। বহুকাল একটা অপরাধ-বোধ কাজ করে গিয়েছে। লোকে ওকে 'চরিত্রবান' কিংবা 'সচ্চরিত্র' বলে জানে। আর চরিত্রটার অবস্থান প্যান্টের তলাতেই। কিন্তু ওর 'চরিত্রবান' হওয়ার কারণটা তো জানে না।

আজ সে-চরিত্র খোয়াবেই। পুরোপুরি। 'চরিত্র'-টা এমনি ওঠানামা করলে তেমন কিছু হয় না। 'প্রোথিত' হলেই চরিত্র নষ্ট হয়। আজ এই বসন্তে 'চরিত্র' নষ্ট করতে চলেছে ও।

ওর এক বন্ধুর খালি ফ্ল্যাট আছে। ওদিকে যাবে না। মিথ্যে বলতে হবে। মিথ্যের পেট থেকে আরও ডিম পড়ে। তা ছাড়া সত্যিটাও বলা যাবে না। হোটেল-ই ভাল। শিয়ালদা অঞ্চলে অনেক হোটেল আছে। হোটেলের লোকজন বুঝলে—বুঝুক। ওখানে এসব কম্মো খুব হয়।

ওরা তো ভাববে মেয়েছেলে 'ফিট' করে এখানে এসেছে। ওরা তো বুঝবে না, আর জানবেও না—এই লোকটা নিছক ফুর্তি করতে একজন ভদ্রমহিলাকে আনেনি। একটা...'মহৎ উদ্দেশ্য' আছে ভাবতে যাচ্ছিল, কিন্তু 'মহৎ' শব্দটা যেন একটু প্যাঁক দিল। তা হলে 'বৃহৎ'। 'বৃহৎ উদ্দেশ্য'। একজন মহিলাকে ফ্রিজিডিটি থেকে মুক্ত করতে হবে। মুক্ত করতে পারুক, না-পারুক চেষ্টা করতে হবে।

মঞ্জু বেশ সেজেগুজে এসেছে। লাল টিপ, হাল্কা লিপস্টিক, মিনু শাড়ি। যখন এল, ঘড়ি দেখল বারোটা পঁয়ত্রিশ। কোনও ষড়যন্ত্রের অংশীদার রেডিও-নাটকে যেমন প্রশ্ন করে, তেমন করেই অনেকটা, প্রশ্ন করল মঞ্জু—কী প্ল্যান?

অনিকেত কাঁধ ঝাঁকায়। বলতে চায়—কে জানে? বলতে চায়, ও প্ল্যানহীন। সবই ভবিতব্যে ছাড়া, কিংবা হাওয়ায়।

অথচ ও ভেবে রেখেছিল, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে এয়ারপোর্ট অঞ্চলে যাবে। ওখানে হোটেল আছে, যারা বহরমপুর, গাইঘাটা, চাকদা, রানাঘাট, স্বরূপনগর—এসব অঞ্চল থেকে আসে, প্লেন ধরে কোথাও যায়, বেশির ভাগই আগরতলার যাত্রী ওরা, কেউ-কেউ শিলচরের, ওরা বেশ কিছুটা আগে আসে। দু'তিন ঘণ্টা হোটেল থাকে, খাওয়া-দাওয়া করে, ওরা ঘণ্টা হিসেবে হোটেল ভাড়া দেয়। ওরা ওখানে যাবে, যেন যাত্রী। কিন্তু এজন্য তো একটা পেট-মোটা ব্যাগ চাই সঙ্গে, নইলে ক্যামুফ্লাজ হবে না। শিয়ালদা বরং ভাল।

কিন্তু হোটেলের কথা বলল না মঞ্জুকে।

তুই কিছু প্ল্যান করেছিস? অনিকেত জিগ্যেস করে।

মঞ্জু বলে, না। চ' ময়দানে ঘুরে বেড়াই, আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। এখনও গরম পড়েনি। তারপর বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম-এ ঢুকে যাব বেশ...।

ওটাই তো হিন্ট। প্ল্যানেটোরিয়াম বলল যখন, 'প্ল্যান' আছে।

অনিকেত বলে, প্ল্যানেটোরিয়াম-এ তো আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট মাত্র অন্ধকার। বলেই চোখ মারে।

মঞ্জু বলে, অসভ্য।

বাঃ, ভাল লক্ষণ। এই তো...। পথে এবার নামো সখি পথেই হবে এ পথ চেনা...।

অনিকেত বলল—চ' হাঁটি।

মৌলালি থেকে হাঁটতে-হাঁটতে শিয়ালদা। ওখানে ভিড়ের ফাঁকে হোটেলে দরজা। তরুণ হোটেল...রিজেন্ট হোটেল...ঢোকে না। পার হয়ে যায়।

মঞ্জুকে বলে—রাস্তায়-রাস্তায় কোথায় ঘুরব? আর কেবিনেও সুবিধে হয় না। হোটেলে চল, কেমন? আমরা বেশ হ্যাজব্যান্ড-ওয়াইফ, অ্যাঁ...

মঞ্জু বলল, ভয় করছে...।

অনিকেত বলল, কীসের ভয়?

বাঁ দিকে একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল। 'পরিচ্ছন্ন পরিবেশে এ্যাটাচ বাথরুম সহ'...ছেঁড়া ধুলোমাখা লাল কার্পেট। ঢুকে গেল। সামনের কাউন্টারে চোখ-ফোলা একটা লোক।

অনিকেত বলল, একটা ভাল ঘর দিন। তারপর মঞ্জুকে বলল, কোনও মানে হয় বলো, একটা-র সময় বন্ধ হয়ে গেল, খুলবে সেই পাঁচটায়...। লোকটাকে বলল, ফ্যানট্যান আছে তো? চার ঘণ্টা কাটাতে হবে তো...।

লোকটা বলল, সব আছে। তবে যতক্ষণই থাকেন না কেন, একদিনের চার্জ। চারশো।

অনিকেত বলল, কী আর করা যাবে।

দোতলায় ঘর। বিছানার চাদরটা নোংরা। বাথরুমের গন্ধ আসছে। যে-খুলে দিয়েছিল ঘরটা, সে বলল, পাঁচ মিনিট বসেন। আসছি।

একটা ফিনাইলের বোতল আর একটা চাদর নিয়ে এল। বাথরুমে ফিনাইল ঢেলে দিল। জানালার পাল্লা খুলে দিল, আর বাস-ট্রাম-লরি-হকার-বাজারের কলরব নিয়ে কলকাতা ওই ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মঞ্জু বলল, জল।

একটা প্লাস্টিকের জার ছিল, ঢাকনায় হলুদের দাগ। হয়তো মাংসের শুকনো ঝোল। হাতলের খাঁজে নোংরা।

অনিকেত এক বোতল মিনারেল ওয়াটার কিনে নিয়ে এল বাইরে থেকে।

তারপর ঘরে ঢুকে-পরা কলকাতাকে তাড়াল। জানালা বন্ধ করে দিল।

দেওয়ালে একটা আয়না। আয়নার কোনায় সেঁটে আছে একটা লাল টিপ।

দেওয়ালের রং হলুদ। বিচ্ছিরি রকমের হলুদ। দেওয়ালের গায়ে মনোজ—রেখা ইত্যাদি লেখা। দু-এক জায়গায় মানব-অঙ্গের ডটপেন স্কেচ।

ওসব যাকগে যাক।

অনিকেত বলল, এবার?

এবার যা হতে লাগল, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়ার দরকার নেই। অনিকেত চেষ্টা করে চলেছে। বেশ কয়েকবার বাহুতে বন্ধন করেছে মঞ্জু। কম্পনও টের পেয়েছে। অনিকেত কানে গরম নিশ্বাস মিশিয়ে জিগ্যেস করেছে, মেন্‌স তো রেগুলার হচ্ছে। তাই না?

মঞ্জু বলে, হুঁ। পরশু শেষ হল।

অনিকেত বোঝে 'সেফ'। অনিকেত টের পায়, মঞ্জু ঘামছে। ওর ঘাড়, গলা এবং যোনিদেশও। সিক্ততা অনুভব করে। মেলে দেওয়া শরীরটাকে আদর করতে থাকে নানা ভাবে। অনিকেত দ্যাখে, ওর হাতের চামড়া আর ততটা টানটান নেই। হাতের শিরাটা যেন কোনও গ্রাম্যপথ, যেন কোনও শ্মশানের দিকে চলে গিয়েছে—যেন 'পথের পাঁচালী'-র 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল' ধ্বনিত হচ্ছে, সেই শিরাটার ওপর বুলিয়ে দেয়—পুষ্প বনে পুষ্প নাহি রে, আছে অন্তরে। মুখের ছোট্ট মেচেতা-চিহ্নকে মনে হল নীলাঞ্জন ছায়া। ওখানে চুম্বন। এবার উপগত হতে গেল, আর তখনই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মঞ্জু।

মঞ্জু নিজের পশ্চাদ্দেশে হাত রেখে মৃদুস্বরে বলল, তা হলে এখানে, এখানে।

চমকে গেল অনিকেত। সে কী, পেছনে কেন? তবে কি মঞ্জুও পায়ুকামী?

অনিকেত বলে—কেন? এখানে কেন?

মঞ্জু বলল, প্লিজ, প্লিজ ডাবু, এখানে।

এখানে পারব না। অনিকেত বলে।

মঞ্জু বলে, পরে সামনে করিস। প্লিজ ডাবু, তোর পায়ে পড়ি।

সো? ইউ আর দ্য কালপ্রিট? তোর জন্যই তোর ছেলে এমন হয়েছে। তোর এক্স-ক্রোমোজমের খেলায়?

অনিকেতের শিথিল হয়ে যায়। বলে, অসম্ভব। ইম্‌পসিব্‌ল।

মঞ্জু লেহন ইত্যাদিতে উপযুক্ত করে তোলে ওকে। আবার উপুড় হয়। নিজেই নিতম্বের দু'পাশের পেশি টেনে উন্মুক্ত করার চেষ্টা করে। অনিকেত প্রবিষ্ট হয়।

মঞ্জু বলে, আরও জোরে।

অনিকেত প্রায়-সম্মোহিতের-মতো তাই করে।

মঞ্জু কাতরে ওঠে। উঠে বসে। দু'হাতে মুখ চাপা দেয়। বলে, ইশ, কী ভীষণ কষ্ট কাঁদতে

থাকে। ওর উন্মুক্ত-শরীর কান্নায় কাঁপে। বলে, ছেলেটা কতটা কষ্ট পায় সেটা দেখছিলাম রে ডাবু। ভীষণ কষ্ট। কেন ও এসব করে?

একটা ছবি দেখেছিল অনিকেত। পেন্টিং। কার আঁকা মনে নেই। মা মেরি নিজের হাতে পেরেক ফোটাচ্ছেন। রক্তাক্ত হাত। মেরি-র মুখের অভিব্যক্তিতে কষ্টের সঙ্গে মিশেছিল আরও কিছু। অনেকটা মমতা, কিছুটা ক্ষোভও বোধহয়। দূরে ক্রুশবিদ্ধ যিশু। মা বোঝার চেষ্টা করছেন সন্তানের ক্লেশ। যিশুর শিষ্য জন ছুটে আসছেন মেরি-র দিকে।

অনিকেত প্যান্ট পরে নেয়। জামা গলিয়ে নেয়। মঞ্জু তখনও বিছানায়। উপুড়। কম্পন। ফোঁপাচ্ছে। কান্না-মেশানো গলায় মঞ্জু বলতে লাগল—সেই যে গঙ্গার ধারে...মনে আছে? কৃষ্ণকথা হচ্ছিল...মা যশোদা নিজের পায়ে কাঁটা ফোটাচ্ছিল...কৃষ্ণের খেলতে গিয়ে কাঁটা ফুটেছিল বলে। মা জানার চেষ্টা করছিল গোপালের কষ্ট...। সেটা মনে পড়ে গেল রে...। মুডটা খারাপ করে দিলাম তোর, তাই না?

অনিকেত বলল, বড্ড গুমোট লাগছে। জানালা খুলে দিল।

কলকাতা ঝাঁপিয়ে পড়ল আবার ওই ঘরে। মাইকে কোথাও মান্না দে-র গান—পথের কাঁটায় রক্ত না ঝরালে কী করে তোমায় ভালবাসব...

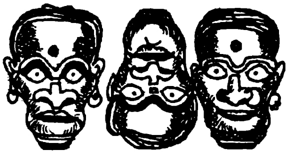

মন্টুকে নিয়ে শুক্লা নাকি বেশ আছে। মন্টু বাজার করতে পারে। এখন তো বাজারে যেতে হয় না কলকাতার 'আবাসন' এলাকায়, বাজার নিজেই আসে। চার চাকার ভ্যানে তরি-তরকারি দোরগোড়ায় চলে আসে। মন্টু বেছে-বেছে বেগুন, ঢ্যাঁড়শ এসব কিনতে পারে। শুক্লা তো উচ্ছ্বসিত।

—জানো, পুঁইশাক নিয়েছিলাম, সঙ্গে তো কুমড়োও নিতে হয়। বললাম, কুমড়োও দাও। মন্টু বলল, ও কুমড়ো নিও না জেঠি। কাঁচা। জানো, ও বলেছে, যে-কুমড়োর চোকলার পরই সবুজ পাড় হয়, সে-কুমড়ো ভাল হয়। জানো, ও কতভাবে হেল্প করে, বিছানার চাদর পেতে দেয়...কাজের লোক কামাই করলে ও ঘর ঝাঁট দিয়ে দেয়। সব পারে...।

অনিকেতও মন্দ নেই এখানে। এটা হল 'এলআরএস' মানে 'লোকাল রেডিও স্টেশন'। কেন্দ্রীয় সম্প্রচার দপ্তরের মাথায় এসেছিল বড়-বড় শহর ছাড়াও, জেলা শহরগুলোতে রেডিও স্টেশন করা উচিত, সেখানে স্থানীয় সংস্কৃতি, স্থানীয় সমস্যা ইত্যাদি প্রতিফলিত হবে। কিছু দিন আগে এই অঞ্চলের গ্রামে-গ্রামে 'বাহা পরব' হয়ে গেল। 'বাহা' মানে মুন্ডারি ভাষায় 'ফুল'। 'বাহা পরব' নিয়ে দিল্লিতে কোনও অনুষ্ঠান হয় না, পাটনাতেও নয়। রাঁচিতে কিছুটা হয়, কিন্তু এখানে পরপর তিনদিন ধুম করে 'বাহা পরব'-এর গান হল। সাঁওতাল, হো, মুন্ডা—সবাই 'বাহা পরব' করে। বসন্তে শুকনো ডালে নবকিশলয়। পলাশ এবং নানারকম ফুলে ভরে থাকে জঙ্গল। রবীন্দ্রনাথ লেখেন—ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা ঝরল যত, তারা আজ কেঁদে শুধায়

সেই ডালে ফুল ফুটল কিগো। আর এদিকের কোনও অজানা গ্রাম্যকবি কুরমালি ভাষায় গান বাঁধে—

শুকনা শুকনা ডালে ও দেখ ফুল ফুটে গো
ফুল ফুটেছে নাচের জন্য নাচবি চল
শুকনা শুকনা শরীরেও ফুল ফুটে গো।
যৌবন তোর ঘরে এল নাচবি চল...

রবীন্দ্রনাথ লেখেন, আজি কমল মুকুলদল খুলিল—দুলিল রে দুলিল।

এরা গায়,

এত যে শালফুল ফুটেছে
গাছে গাছে দুলেছে
কেন বা গাছেই ফুল থাকবে
সারা গায়ে তোরা ফুল ফোটা

বাইরে থেকে রেকর্ড করে এনেছে কিছু গান। এখন গরম পড়েছে। এপ্রিল মাস চলছে। বুদ্ধপূর্ণিমা-য় শিকার উৎসব। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে এই উৎসব খুব ধুম করেই হয়। দূর-দুর থেকে সাঁওতাল পুরুষ আসে। রাত থেকেই জঙ্গলে ঢুকে যায়। সারা রাত ধরে শিকার চলে। তারপর পাহাড়ে উঠে যা শিকার পাওয়া গেল, সেটা রান্না হয়। চাল-ডালও সেদ্ধ হয়। সঙ্গে থাকে মহুয়া কিংবা হাঁড়িয়া। রাতে চলে নাচ-গান। সেইসব নাচ-গানের মাধ্যমে নাকি যৌবন-দীক্ষা হয়। দু-একটা লোকসংস্কৃতি-র প্রবন্ধে এরকমটাই পড়া গেছে।

এখানেও একটা পাহাড়ে ওইদিনে এই ধরনের উৎসব হয়। অনিকেত ওটা 'মিস' করতে চায় না।

যে-পাহাড়ে এই উৎসব-টা হয়, সেটার নাম 'কাঁদরবুরু'। যে-ম্যাপটা অফিসে আছে, সেটা দেখলে দেখা যায়, এই পাহাড়টার নাম লেখা আছে 'কানাডা হিল্স'।—CANADA HILLS। এই ম্যাপটার কপি আনানো হয়েছিল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর অফিস থেকে। ব্রিটিশ আমলের তৈরি ম্যাপ। কী আশ্চর্য ব্যাপার, একটা পাহাড়কে সবাই কেমন কেড়ে নিতে চেয়েছে। 'কাঁদর' মুন্ডারি ভাষায় ভাম জাতীয় একটা প্রাণী। পাহাড়টাকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ের একটা মাথা এবং একটা লেজ আছে। হতেও পারে, ওই পাহাড়ে এরকম জন্তু প্রচুর ছিল। তবে এরকম হয় না যে, একই এলাকার অমুক পাহাড়ে হাতি থাকে, তমুক পাহাড়ে শেয়াল থাকে। এই পাহাড়ে খরগোশ, ওই পাহাড়ে শজারু। তবে এসব অঞ্চলে অনেক পাহাড়ই জীবজন্তুর নামে হয়। সাহেবরা ম্যাপ তৈরি করেছিলেন। 'কাঁদরবুরু'-কে বানিয়ে দিলেন 'কানাডা হিল্স'। 'কাঁদর' লিখতে গেলে CANDAR লিখতে হয়। ওঁদের মনে হয়েছিল তার চেয়ে কানাডা ভাল। না কি ছাপার ভুল? কিন্তু ভদ্রলোকরা ওই পাহাড়টাকে বলে 'কন্দর্প পাহাড়'। কাঁদর-কে 'কন্দর্প' করে নিয়েছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। এদিকে বেশ কিছু বাংলা ভাষাভাষী মাহাতো সম্প্রদায়ের মানুষ আছে। বাংলার ডায়লেক্ট-কে 'কুর্মালি' বলতে চান অনেকে। এই অফিসেও একজন মাহাতো আছে। সেও ওটাকে 'কন্দর্প পাহাড়'-ই বলে। গাড়ি নিয়ে বাইরে কিছু রেকর্ডিং করতে গিয়ে একবার সঙ্গে নিয়েছিল পায়েস মাহাতোকে। ও-ই খবরটা প্রথমে দেয়। উটা 'কন্দর্প পাহাড়' স্যর, বৈশাখ পূর্ণিমা লাগলে উখানে দমে উঝালপাঝাল হয়...।

পাহাড়টা সরাইকেল্লা-র দিকে। বৈশাখের আকাশে চাঁদটা বাড়তে থাকলেই নাকি ছেলে-ছোকরাদের মন হাঁকুপাঁকু করতে থাকে কবে পূর্ণিমা আসবে। ছোট-ছোট ছেলে তির-ধনুক নিয়ে খেলতে নামে। কিন্তু ওরা শিকার উৎসবে যাওয়ার অনুমতি পায় না। বছর বারো বয়স হতে হবে। ওসব ছেলে-ছোকরার তো বার্থ সার্টিফিকেট থাকে না, বয়সটাও ঠিকঠাক জানা থাকে না। সুতরাং নিয়ম হল, গোঁফের রেখা না-উঠলে শিকার উৎসবে যাওয়া যাবে না। ওই উৎসবে মেয়েদের কোনও অধিকার নেই। অধিকার নেই তার কারণ, ছেলেরা সবাই নেশা-টেশা করে ঠিক থাকে না। ওই জন্যই গ্রামসমাজ বিধান দিয়েছিল পাহাড়ের গ্রামের মেয়েরা সেদিন বেরবে না। ঘরের বাইরের উঠানেও নয়।

ভোরবেলা রওনা হয়ে গিয়েছিল অনিকেত। সঙ্গে নিয়েছিল মাইকেল পুরতি-কে। চাইবাসা খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলের শিক্ষক। ওই স্কুলেই একসময় বিরসা মুন্ডা কিছুদিন পড়েছিলেন। বছর তিরিশের মতো বয়স মাইকেল পুরতি-র। অনিকেতের চেয়ে অনেক ছোট। চাইবাসা বেতার কেন্দ্রের হো ভাষার ক্যাজুয়াল অ্যানাউন্সার। ও হিন্দিতে বলেছিল, ওখানে গেলে একটা অভিজ্ঞতা হবে। অনিকেত বলেছিল, তুমিও চলো। ও বলেছিল, আমি গেলে আপনার কাছে অস্বস্তিতে পড়ব। খুব খিস্তি-খেউড় হয়, অনেক নোংরা ব্যাপার স্যর...।

অনিকেত বলেছিল—না ভাই, কোনও অস্বস্তির ব্যাপার নেই। তুমিও শাদিসুদা আদমি, আমিও তাই। কোনও অসুবিধে নেই।

মাইকেল হিন্দি, হো, মুন্ডারি ভাষা জানে। হো ওর মাতৃভাষা। মুন্ডারি ভাষার সঙ্গে হো ভাষার খুব একটা তফাত নেই। মাইকেল আবার সাঁওতালিও কিছু-কিছু বোঝে। কিন্তু অনিকেত লক্ষ্য করল, ও আদিবাসীদের এই উৎসবটাকে একটু অবজ্ঞাই করল। খ্রিস্টান হয়েছে বলে? মিশনারিরা কিছু সাঁওতালকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল, কিছুটা মুন্ডাদেরকেও। হো-দের মধ্যে এই প্রভাব খুবই কম। অল্প কিছু খ্রিস্টান-হো-দের মধ্যে থেকেই মাইকেল এসেছে। ওর পুরো নাম মাইকেল কিনুয়া পুরতি। এম কে পুরতি। 'এম কে পি' নামেই পরিচিত। অনিকেত জিগ্যেস করেছিল, তুমি কখনও ওই উৎসবে যাওনি? ও বলেছিল, দশ-বারো বছর আগে গিয়েছিল। কিন্তু ও শিকার-টিকার করে না। আর একবার রগড় দেখতে গিয়েছিল। অনিকেত বলল, এবারও রগড় দেখতে চলো।

পাহাড়ে গাড়ি ওঠে না। নীচে রেখে হেঁটে উঠতে লাগল ওরা। গরম, কিন্তু বৃক্ষছায়ার ঠান্ডা প্রলেপ। কত জংলা ফুল। মাইকেল বলছিল, এই হলুদ ফুলগুলোর নাম গলগলি। এগুলো টেঁশ। পিয়ালের পাকা ফল খাচ্ছে পাখি। কেঁদ ফলও পড়ে আছে ভুঁয়ে। মহুল ফলও পড়ে আছে। সুগন্ধি আতপের মতো আশ্চর্য গন্ধ। গাছে-গাছে এক ধরনের লম্বা ডাঁটা ঝুলছে। বাঁদরলাঠি তো চেনা। এছাড়াও সজনের চেয়ে অনেক মোটা, কিন্তু সজনের ডাঁটার চেয়ে একটু ছোট, মাথার দিকটা ফোলা এবং লালচে। কী ফল জিগ্যেস করাতে দু'বার এড়িয়ে গেল মাইকেল। তৃতীয়বারে জবাব দিল। বলল, পুংগা—বলেই জিভ কাটল।

পাহাড়ের খাঁজে গ্রামও আছে। গ্রাম যেন শুনশান। কোনও মহিলাকে দেখা গেল না, এমনকী উঠোনে মেয়েদের কোনও পোশাকও শুকোতে দেওয়া নেই। ধামসা-র শব্দ শোনা যাচ্ছে ধিদিম ধিম। মাদলের টুংগুল টুংগুল।

মাইকেল বলল, পাহাড়ের ওপর অনেকটা সমান জায়গা। মাঠের মতো। ওখানে এখন

উৎসব চলছে। গত রাতে পূর্ণিমা গিয়েছে। পূর্ণিমার আলোয় ওরা শিকার করেছে। আজকাল টর্চও নেয়। তারপর পাহাড়ের ওপরে উঠে খাওয়াদাওয়া হবে।

—কী শিকার পাওয়া যায়?

—উঠলেই দেখতে পাবেন। তেমন কিছুই পাওয়া যায় না। জঙ্গলে জানোয়ার নেই। ওই দু-একটা বেজি, ভাম। যদি বুনো শুয়োর জুটল তো তকদির ভাল বুঝতে হবে।

ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছিল। বাজনার শব্দও বাড়ল। একটা ঝোরা আছে। ওখান থেকে প্লাস্টিকের বালতিতে জল নিয়ে যাচ্ছে। দু'আঁজলা পেতে জল খেল ওরা। ঠান্ডা। ব্যাগের মিনারেল ওয়াটারের বোতলটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভরে নিল ফের।

পাহাড়ের ওপর বেশ চাতালের মতো। বড়-বড় কিছু গাছও আছে। গাছের তলায় গোল হয়ে বসেছে মানুষ। নানা আকৃতির পাথর ছড়ানো। পাথরের ওপরও বসা যায়। হাঁড়িয়া নেই। কারণ হাঁড়িয়া মেয়েরাই বানায়, এবং বিক্রিও করে মেয়েরা। এখানে মেয়েদের যোগদান নিষিদ্ধ। মহুল পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। মহুল মানে মহুয়া।

সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, খেড়িয়া, কুর্মি... এক মিলনমেলা। এরা আলাদা ঠেক-এ বসলেও নিজেদের মধ্যে হাসি ও আনন্দ-বিনিময় হচ্ছে। পাগলামি বিনিময়ও। বলা যায়, অশ্লীলতা বিনিময়ও। এই ঠেক থেকে কেউ একটা হাতের আঙুল গোল করে সেই বৃত্তের মধ্যে অন্য হাতের আঙুলটা নাড়িয়ে দিল, অন্য ঠেক থেকেও অন্যরকম প্রত্যুত্তর এল শারীরিক মুদ্রায়। শিকার বলতে কয়েকটা রক্তফেনা মাখা ধেড়ে ইঁদুর হয়ে আছে চিৎ। কেউ পেয়েছে সাপ, কোথাও শজারুও দেখা গেল কাত হয়ে পড়ে আছে রক্তমাখা মুখে। খরগোশ কিছু-কিছু। মুরগি বিক্রি হচ্ছে। পয়সা দিয়ে কেনা মুরগি ছেড়ে দেওয়া হল, তারপর ওকে তির মারা হল। শিকার। এক জায়গায় দেখা গেল, গাছের ডালে দড়ি ঝুলিয়ে বেশ কয়েকটা কন্ডোম ফুলিয়ে বেলুন বানিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রান্না হচ্ছে, কোথাও খিচুড়ি। শিকারের মাংসও রান্না হবে।

মহুল নিয়ে আসা হয়েছে, বোতলে। কাচের বোতলও আছে, পলিপেট-এর বোতলও, যে-বোতলে ভদ্রলোকরা মিনারেল ওয়াটার খায়। বহু ব্যবহারে বোতলগুলোর স্বচ্ছতা কমে এসেছে। ওরা মহুল বিক্রি করছে, কিন্তু বোতল দিতে চাইছে না। বোতলের বড় অভাব। ওরা তো হাঁড়িয়া খায় টিনের বাটিতে কিংবা শালপাতার টুঙিতে। ওরা মহুল নিয়ে যাচ্ছিল জঙ্গল থেকে জোগাড় করা বেলের খোলায় কিংবা পাতার ঠোঙায়। কেউ বা রান্নার জন্য নিয়ে আসা হাঁড়িতে। হাতা করে মুখে ঢালছিল।

অনিকেতের কাছে মিনারেল ওয়াটারের বোতল ছিল। মাইকেলকে দিল। বলল, ভরে নাও।

মাইকেল বলল—এসব খাবেন স্যর?

অনিকেত বলল, সবাই তো খাচ্ছে। তুমি খাও না এসব?

মাইকেল বলল—খাই না বললে ভুল হবে। ইংলিশটাই খাই। তবে এরকম ফেস্টিভ মুডে খাওয়া যায়।

খেল।

অনিকেত আজই প্রথম মহুয়া পান করল—এমন নয়। এখানে এসে দু-একবার খেয়েছে। ভালই বেশ। গন্ধটা দারুণ।

মাদল আর ধামসার শব্দে শরীর নেচে ওঠে। ওর ভদ্রলোক-সত্তা নাচতে নিষেধ করে।

ঘুরে বেড়ায় অনিকেত ও মাইকেল। বৈশাখের রোদ্দুর। যেখানে গাছের ছায়া, সেখানেই মানুষ। একটা গাছের ছায়ায় একটা লম্বা পাথরে বসে আছে একজন বয়স্ক মানুষ। মুখে দাড়ি। চুলে জটা। ওকে ঘিরে কিছু মানুষ। বয়স্ক মানুষটা কিছু বলছে। মাইকেল বলল, লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে জানগুরু। দেওড়া ভি হো সাক্‌তা হ্যায়।

দেওড়া আর জানগুরু-র মধ্যে তফাত কী? অনিকেত জিগ্যেস করে।

মাইকেল বলে—সব সেম ক্যাটিগরিকা হ্যায়।

মাইকেল বোঝায়—জান, ভকত, মাতি, দেওড়া—সবাই মন্ত্রতন্ত্র জানে, গুপ্তবিদ্যা জানে বলে বিশ্বাস করে এই অঞ্চলের মানুষ।

ভিড়ের মধ্যে ঢোকে অনিকেত। বাতাসে মদির গন্ধ। সবাই খেয়ে আছে।

মাইকেল বলে—ওই যে লম্বা পাথরটা, ওটাকে আমরা বলি শ্মশানদিরি। মৃত্যুর পর, কবরের ওপর একটা পাথর চাপা দেওয়া হয়। এই পাহাড়ের ওপর নিশ্চয়ই কোনও গাঁ-মাঝি'র কবর হয়েছিল। গাঁ-মাঝিই হচ্ছে গ্রামের প্রধান। নিচে কয়েকটা গ্রাম দেখলাম, সেরকম কোনও গ্রামেরই হবে হয়তো। আমাদের বিশ্বাস, শ্মশানদিরি-র ওপর বসে কেউ মিথ্যা কথা বলে না।

ওই লোকটা শ্মশানদিরি-র ওপরই বসে আছে। কিছু বলছে, সবাই শুনছে।

মাইকেল অনিকেতকে অনুবাদ করে হিন্দিতে বলে—যে বসে আছে, সে মুন্ডা নয়, সাঁওতাল। ওদের লোককথা বলছে। বলছে—অনেক বছর আগে স্ত্রী-রা পুরুষদের খুব অত্যাচার করত। মেয়েছেলেরা খুব কামুক ছিল। দিন রাত রমণ চাইত...। মাইকেল অবশ্য ওই বাক্যটা ইংরেজিতে বলেছিল—দে অলওয়েজ প্রেশার্‌ড ফর ফাকিং স্যর...। ইসকে লিয়ে আদমি লোগ বহুত কমজোরি হো যাতা থা। এছাড়াও আরও অত্যাচার করত। দুধের ছানা করে নিজেরা খেয়ে নিত, পুরুষদের দিত ছানার জল। মুরগির ঠ্যাং আর বুক নিজেরা খেত, পুরুষদের দিত কাঁকাল। তখন সাঁওতাল পুরুষরা দল বেঁধে মারাংবুরু-র কাছে গেল। বলল, কিছু একটা বিহিত করুন। মারাংবুরু বলল, ঠিক আছে ওদের 'কাম' কমিয়ে দেব। পুরুষরা বলল, শুধু 'কাম' কমালেই হবে না, ওদের অত্যাচার থেকে বাঁচান। মারাংবুরু বললেন, আজ হবে না, আজ অন্য কাজে ব্যস্ত আছি, সামনের পূর্ণিমায় এসো, 'তোমাদের ত্রাণমন্ত্র দিয়ে দেব।' কিন্তু মেয়েছেলেগুলো জানতে পেরেছিল যে, ব্যাটাছেলেরা মারাংবুরু-র কাছে যাতায়াত করছে। একটা 'বহুত সেক্সওয়ালি উওমেন' ওর নিজের কিছুটা সেক্স আর আত্মার কিছুটা অংশ কয়েকটা ব্যাটাছেলের মধ্যে চালান করে দিয়েছিল। তখন কয়েকটা ব্যাটাছেলের পেটের তলায় থলিয়া-ডান্ডা ঝুললেও ভিতরে-ভিতরে ওদের গড়বড় হয়ে গেল। ওরা গুপ্তচর বনে গেল। ওরা মেয়েদের খবর দিয়েছিল যে, পূর্ণিমার দিন মরদ-রা যাবে মারাংবুরু-র কাছে। মেয়েরা তখন করল কী, পূর্ণিমার আগের দিন থেকে ছেলেদের খুব করে হাঁড়িয়া খাওয়াল। ভাল-ভাল চাখনা খাওয়াল। খুব করে চুষে দিল, আর হাঁড়ি-ভরা হাঁড়িয়া আর কুঁকড়ার কালিজা রেখে দিল। মরদগুলো সারাদিন খুব করে খানাপিনা করে পুরা বেহুঁশ হয়ে গেল, আর জেনানা-রা করল কী, পুরুষের পিরান গায়ে চাপাল, ছাগলের দাড়ি কেটে গোঁফ তৈরি করল। তারপর মারাংবুরু-র কাছে গেল। মারাংবুরু-ও ওদের মরদ মনে করে 'ত্রাণমন্ত্র' দিয়ে দিলেন।

অনিকেত জিগ্যেস করে, মারাংবুরু-ও কি খেয়েছিল?

মাইকেল বলে, প্রব্যাব্লি। ওরকমই তো হিন্ট পাওয়া যাচ্ছে।

শ্মশানদিরি-র প্রাজ্ঞ মানুষটা ইতিবৃত্ত বলতে থাকে...। মেয়েরা ওই মন্ত্রটা পেয়ে গেল, তারপর ওই মন্ত্রটাই পুরুষদের ওপর প্রয়োগ করতে থাকে। পুরুষরা আরও অত্যাচারিত হতে থাকে।

মরদগুলোর মনে পড়ে—মারাংবুরু-র কাছে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যায়নি। এরপর ওরা ভুল বুঝতে পেরে মারাংবুরু-র কাছে যায়। মারাংবুরু ভীষণ আশ্চর্য হন। বলেন, তুমকো তো ত্রাণমন্ত্র দিয়া চুকা। মরদ-রা বলে, সরি, সেদিন আসতে পারিনি, বহুত হাঁড়িয়া খেয়ে ফেলেছিলাম, অন্যায় হয়ে গিয়েছে...। মারাংবুরু তখন বুঝতে পারেন নারীরা সব চাতুরি করে গিয়েছে। তখন তিনি নারীসমাজের ওপর রেগে যান। প্রতিবিধান হিসেবে ডাকিনীদের বিরুদ্ধে 'জানবিদ্যা' দান করে। যে-ক'জন মরদ 'জানবিদ্যা' জেনেছিল, ওরাই শিষ্যদের শিখিয়ে দেয়। এবার বলব, ডাকিনীদের 'কাম' কেমন করে দমাতে হয়।

প্রাজ্ঞ মানুষ বলতে থাকেন। ছড়া কেটে। মাইকেল বলে, চলুন স্যর।

খুব খিস্তি হচ্ছে এখন। পরিবেশটা আর একটু উত্তাল হয়েছে। নাচটাচ চলছে। অনেকেই দড়ি দিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েছে বাঁদরলাঠি কিংবা পুংগা।

পুংগা ঝুলছে দুই পায়ের মাঝখানে। আট-দশ ইঞ্চি লম্বা। বাজনার তালে-তালে হাতে ধরে নাচাচ্ছে ওই লাঠি। গানও চলছে কোথাও-কোথাও। কোনও-কোনও রসিকপ্রবর দু-চার কলি ছড়া কাটছে। বুড়ো-বাচ্চা সবাই হাসছে, হুলাহুলি দিচ্ছে।

কী বলছে ওরা? অনিকেত জিগ্যেস করে।

মাইকেল মহুয়া-ভরা বিস্‌লারি বোতলে লম্বা চুমুক দিয়ে বলে, বোলতা হ্যায়—যব অন্দর ঘুসেগা তো সমঝমে আয়্‌গা, ক্যায়া চিজ হ্যায় ইয়ে।

মাইকেলও কাঁধ নাচায়।

পায়ের স্টেপিং পাল্টে যায় মাইকেলের। বাকি মহুয়াটুকু গলায় ঢেলে দেয় অনিকেত। মাইকেলের বলা বাক্যটার বঙ্গানুবাদ করে—'এ যে বড় দণ্ড জাদু এ যে বড় দণ্ড।' আর মেলাতে পারে না। মেলাতে গেলেই অণ্ড এসে যাচ্ছে। 'কোথায় যেন লুকিয়ে আছে ছোট্ট দু'টো অণ্ড'...এরকমই ভাবে। বোঝে, নেশা হয়ে গিয়েছে।

একটা গাছতলায় দেখল—একজন কেউ মেয়ে সেজেছে। জামার ভিতরে বোঁটাসমেত বুনোফল, মাথায় গামছার ঘোমটা। সে বাঁদরলাঠিটা চেপে ধরছে, কোথাও কেউ-বা হাতে লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে তাড়া করছে কোনও নারী-সং-সাজা পুরুষকে। এবং সেই সং-সাজা পুরুষ সেটা উপভোগ করছে।

মাইকেল বলল, এদিকে ওড়িশার শূন্যবাদী ভীম ভই-এর একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে। ওঁর একটা গানে আছে, আমি যখন পুরুষ তো পুরুষ আছি, যখন নারী তো নারী ভি আছি। দুই হলেও আমি এক। ওড়িয়ায় গাওয়া হয়।

অনিকেত বলে, বৈষ্ণব পদাবলিতেও আছে শ্রীচৈতন্য বলছেন আমি ক্ষণে রাধা, ক্ষণে নারী।

খিদে পাচ্ছে। কোথাও ভাব জমিয়ে বসে গেলেই হল। মাইকেল তো আছেই। আবার

মহুয়ার সন্ধানে যায় অনিকেত। মাত্র দেড় হাজার ফিট ওপরে একটা অন্য রাজ্যে অবস্থান করছে ওরা।

আর একটা জায়গায় বসেছে আর একজন। চোখ লাল-লাল। বাবরি চুল। ও বোধহয় কথকতা ধরনের কিছু করছে। গলায় মালা। কী ফুলের মালা, বোঝা যাচ্ছে না। ও কুর্মি উপভাষায় কথা বলছে।

...লকটার ধানগোলা ছিল, ঝিলিক-মারা বউ ছিল, কিন্তুক কুন ছেল্যা-ছুলু লাই। এক বছর চাষের গতিক দমে খারাপ হঁএে গেল। সে বচ্ছর আষাঢ় শরাবন মাসে টুকুন জল হল নাই। মাটি শুখা হএে গেল, ঘাসটুকু লাই। ঘরের গরুগুলা কুছু না খিতে পেয়ে ভুখা মরে গেল। উয়ার তবু গোলায় ধান ছিল, কিন্তুক গরিব লকরা কী খাবে? একদিন গোলা ভেঙে সব ধান লিয়ে গেল। লকটার নাম ছিল মহীরাম। মহীরাম একদিন ঘুরতে-ঘুরতে জঙ্গলে গিয়ে সূর্য দ্যাব্‌তাকে খুব বাখান করল। এক্কেবারে খ্যাপা হয়ে মুখখিস্তি করল দ্যাব্‌তার বাপ-মা তুলল। এত বাখান দ্যাব্‌তা সইবে কেনে? সে রেগে গিয়ে মহীরামকে শাপ দিয়ে বল্যেন, ধুর শালা—তুই পাত্থর হয়ে যা। মহীরাম পাত্থর হয়ে জঙ্গলে পড়ে রইল। মহীরামের বউ-এর নাম রূপামতী। রূপামতী বড় সতী। ক'টা কেঁদফল আর শুখা মহুল সাজিয়ে বসে আছে কখন স্বামী আসবে, টুকু খাবে। স্বামী খেলে রূপামতী খাবে। কিন্তু স্বামী আর ফিরে না। সারা দিন বিতে গেল। রাতও বিতে গেল। পরদিন স্বামী ঢুঁড়তে এপটে-সিপটে বুলতে লাগল। বুলতে-বুলতে জঙ্গলে। ওই জঙ্গলে রূপামতীকে দেখে, একজন ব্যাটাছেলের দমে কাম উগলাল। সে রূপামতীর সামনে এসে বলে, হে প্রিয়ে, মেরা প্যার কি রানি, মাই ডার্লিং, আসো ডান্স করি।

সমবেত লোকজন হেসে উঠল। লোকটা এবার ওই কাম-উগলানো লোকটার অভিনয় করতে লাগল।

দড়ি দিয়ে বাঁদরলাঠি বাঁধল কোমরে। বলতে লাগল, লকটার পুংগাটা এই সাইজের হঁএে গেল।

বাঁদরলাঠিটাকে সোজা করে ধরল। রূপামতী তখন বলল—তুই দূর যা পাপিষ্ঠ। আমার ধারে আসবি না। সেই লকটা বলল, এমন কথা বলে না সুন্দরী, আসো আমার কোলে বস পিয়ার করি। আসো আমার বুকে আসো। মুখে আসো। আমার ইটার ওপর চেপ্যে বসো। লকটার জিভ বের হএে গিয়েছে। সে দু'হাত দিয়ে পেইচ্যে ধরতে আসে রূপামতীকে। সে মেঁএ্যা তখন সূর্যদ্যাব্‌কে ডাকে। বলে, হে দ্যাব্‌তা, আমি সতী নারী। এই বেথুয়া লকটা আমার সতীত্ব কাড়ছে। হে দ্যাব্‌তা, কোথায় তোমার তেজ? তুমি পুড়িয়ে দাও।

রূপা তখন ছুটে পালাতে যায়। সামনে ওই পাথরটা। যে-পাথরটা আসলে উয়ার স্বামী বটে। পাথরটাকে দুই হাত দিয়ে পেইচ্যে ধরে। আর ওই লকটা উয়াকে ছাড়াতে পারে না। সে পাথর পেইচ্যে থাকে। লকটা তখন মেঁএ্যাটার পিছনে পুংগা ঘষে। লকটা পুংগা ঘষছে, আর রূপামতী দ্যাব্‌তা ডাকছে। দ্যাব্‌তা কথা শুনল। পুংগা-য় বান মেরে দিল, পুংগা খসে গেল। লকটা পাইল্যে গেল।

—ইবার তুমাদের শুধাই, রূপামতী সতী রইল না কি সতীত্ব লষ্ট হল?

কথকমশাই নিজেই জবাব দিল—সতী রূপামতী সতী-ই রইল। কারণ? কারণ টুনটুনির বাসায় সাপ ঢুকতেই পারল না। সতী রূপামতী পাথর জড়িয়ে পড়েছিল। টুনটুনির বাসা তো লেপ্টেছিল পাথরে।

আহা রে, কত অনুরাগে, কত অনুভবে স্ত্রী-অঙ্গের কতরকম নাম দিয়েছে পুরুষ।

কথক বলে, হাগার গর্ত মিছা। ওটায় ইঁদুর-বেজি-সাপ মুখ গলালে কিছু যায় আসে না।

সতীত্বের এক নব ব্যাখ্যা শুনল ওই গ্রাম্য-কথকের কাছে। এ যেন আইপিসি ৩৭৭ ধারারই। আইন অনুযায়ী, স্ত্রী-যোনিতে পুরুষ জননা! প্রবিষ্ট না-হলে ধর্ষণ হয় না।

সতী রূপামতীও সতী থেকে গেলেন।

কথকমশাইয়ের কথা শেষ হয়নি। উনি বলতে থাকল—ওই মেঁঞাটা সারা রাত আর বের হল না। সারারাত পাথর আঁকড়ে পড়ে থাকল। ওই পাথরের গা থেকে একটা বাস বেরুতে থাকল। গন্ধ। মেঁঞাটার মনে হয়, ওর স্বামীর গায়ের গন্ধ পাচ্ছে। মেঁঞাটা কেমন যেন ধুকপুকির শব্দও শোনে। আস্তে-আস্তে ওই পাথরটা প্রাণ ফিরে পায়। মানুষ হয়ে উঠে দাঁড়ায় মহীরাম। চাঁদের আলোয় ওরা খুব সঙ্গম করে। আর তখনই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে।

—উঃ দ্যাখো মাইকেল, 'ফার্টিলিটি কাল্ট' কাকে বলে।

তারপর সারারাত বৃষ্টি চলল। পরদিনও। ফসল ফলল মাটিতে। আর রূপমতীরও ছেল্যা হল।

বলো পম পমাপম।

লোকজন নাচতে লাগল—পম পমাপমচমচমাচম। চদরবদর চুম। পুম পুমাপুম পুম।

পশ্চাৎ-প্রহারে সতীত্ব যায় না। এটাই কি এই লোককাহিনির নীতিবাক্য?

মঞ্জু এই বিশ্বাসেও উপুড় হয়ে গিয়েছিল না কি সেই হোটেল-বিছানায়?

প্রশ্নটা হঠাৎ চক্কর খেল মহুয়া-জমাট অনিকেতের মাথায়।

ঘড়িতে দেখল বেলা আড়াইটে বাজে। মাইকেল বলল, আরও ঘণ্টা তিনেক চলবে এই হইহই। ঢোল-ধামসা-কাঁসর আর গালাগালিতে গলাগলি করে আছে মুন্ডা-হো-সাঁওতালি-কুর্মি'রা। উত্তর-পূর্বের রাজ্যে নাগা-মিজো-কুকিদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি আছে। এখানে নেই।

কথক-ঠাকুরের গল্পটার টুকরো ঘটনাগুলো ঢোল-কাঁসরের শব্দের সঙ্গে নাচছে। পাথরের মধ্যে ধুকপুকি শুনল মেয়েটা। বলে কী? এ তো কবিতা মাইরি! ওর পাথর স্বামীকে দীর্ঘ আলিঙ্গন করেছিল বলে স্বামীর পাথর-শরীরে প্রাণ এল।

তারপর ওরা মিলিত হল, পৃথিবী রসবতী হল, ফলবতী হল।

কামাখ্যাতেও তো পাথর-যোনিতে ঋতুরক্ত আসে। মানুষ কী সুন্দর ভাবতে পারে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মাইকেল-কে। মাইকেল বলল, ক্যা হুয়া সার?

—কুছ নেহি।

একটা পাথরে বসল, অনিকেত।

অনিকেত কথক-ঠাকুরের মতোই বলতে লাগল, দুনিয়া বড়া আজিব হ্যায় মাইকেল, সুন্দর ভি হ্যায়...।

আলিঙ্গন প্রাণ দিতে পারে। আলিঙ্গন মানে তো ভালবাসা মাইকেল...। ডাক্তারের ভালবাসা

রোগীকে প্রাণ দিতে পারে, বিডিও-র ভালবাসা কয়েকটা গ্রামকে প্রাণ দিতে পারে, আমাদের ভালবাসাও এই রুগ্‌ণ রেডিও স্টেশন-টাকে প্রাণ দিতে পারে...। বহুত বড়া-বড়া বাত বোলতা না? তব ছোড়।

অনিকেত বুঝতেই পাচ্ছে নেশা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বলতে থাকে। কথা বলতে ভাল লাগছে।

বলছে—মাইকেল, দ্যাখো মাইকেল, মানুষ পশ্চাৎদেশকে গুরুত্ব দেয় না। মেয়েটার কেমন সতীত্ব রয়ে গেল দেখলে তো? অনেক গান্ডুলোক আছে। যারা প্রস-কোয়ার্টারে গিয়ে সামনে করে না, পেছনে। চরিত্র বাঁচায়। মাইকেল মধুসূদন...।

মাইকেল বলে, উঠিয়ে স্যর। আউর মাত পিজিয়ে। আইয়ে।

বলে—আমরা কোথাও কিছু খাবার জোগাড় করতে পারি কি না দেখি...।

মাইকেল আর অনিকেত হাঁটতে থাকে উৎসবের পাহাড়ে। কাঁদুর পাহাড়ে। ভদ্রলোকেরা যাকে বলে 'কন্দর্প পাহাড়'। কামদেবতার নাম কন্দর্প। তাঁর স্ত্রী রতি।

ওড়িয়া কথাও শুনতে পাচ্ছে।

ওড়িয়া ভাষাভাষী মানুষও বেশ কিছু আছে।

একটা উচ্চস্বর—আফুটি বিয়া...

কোরাস—যতনে ঠিয়া

উচ্চস্বর—ফুটিলা বিয়া...

কোরাস—নিতি ঘিয়া।

এর মানে নিজেই বুঝতে পারে অনিকেত। 'বিয়া' মানে স্ত্রী-যোনি। 'পদ্মানদীর মাঝি' চলচ্চিত্রে একটা গানে 'বিয়া' শব্দটা বারবার আছে। জাতীয় চ্যানেলে এই পুরস্কার-পাওয়া-ছবিটা দেখানো হচ্ছিল। অনিকেত তখন কটকের একটা হোটেলে। তখনও কেব্‌ল আসেনি। দূরদর্শন-ই দেখতে হত। টিভি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হোটেল ম্যানেজারই সব টিভি স্তব্ধ করে দিয়েছিল এই অশ্লীল গানের জন্য।

এই খর-রোদে যৌন-শিক্ষা চলছে। অপরিণত যোনি যত্নে রেখো। পরিণত যোনি সংগম যোগ্য।

আরও সামনে যায়। এক জায়গায় কিছু বড়-বড় পাথর পড়ে আছে। সে-পাথরে মুখ ঢেকে যায়। সেখানে পাথরে শেকড়-বসানো-গাছ। ওখানে কয়েকজন শাড়ি-পরা মানুষ।

অনিকেত বলে, ওখানে মেয়েমানুষ? তোমরা যে বলো এখানে মহিলারা আসতে পারে না...।

মাইকেল বলে—আমিও তো তাই জানতাম...।

কাছে যায়। অনিকেত বোঝে ওরা মহিলা নয়। মহিলা-পোশাকে কিছু পুরুষ।

মাইকেল বলে, লন্ডা স্যর। ওরা লন্ডা।

ওরা হাঁড়িয়া বিক্রি করছে।

কিছু পুরুষমানুষ ওখানে। হাতে শালপাতার ঠোঙা। হাঁড়িয়া পান করছে।

মাইকেল বলে—হাঁড়িয়া ছাড়া আমাদের কোনও উৎসব হয় না স্যর। যে কোনও অনুষ্ঠানে প্রধান উপকরণ হাঁড়িয়া। হাঁড়িয়াটা মেয়েরাই বানাতে পারে। ওরাই পরিবেশন করে। আবার এখানে নিয়ম অনুযায়ী, মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ। এজন্যই এই আইন বাঁচানো। মেয়েলি-

পুরুষরা শাড়ি পরে হাঁড়িয়া বিক্রি করছে। লিঙ্গচিহ্নে এরা পুরুষ। সুতরাং আইন বেঁচে গেল। আবার এরা মেয়েও বটে। তাই হাঁড়িয়া বিলি করতে পারছে। সব জায়গায় আইনের ফাঁক আছে স্যর। স্যর লিঙ্গটা বড় গড়বড়িয়া কেস। হিন্দিতে কম নম্বর পেতাম লিঙ্গটা ঠিক হত না বলে। লিঙ্গর সঙ্গে সঙ্গে ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ সব পাল্টে যায় স্যর। একটা জোক বলছি স্যর। এখন তো আমরা মাইডিয়ার হয়ে গিয়েছে। বলতেই পারি।

একজন টিচারকে কনফিউজ্‌ড স্টুডেন্ট জিগ্যেস করেছিল, কাঁঠাল কী লিঙ্গ স্যর?

স্যর বললেন, ওটা পুংলিঙ্গ হবে। কারণ কাঁঠালের বিচি আছে।

—তা হলে হোমগার্ড?

—হোমগার্ডও পুংলিঙ্গ। কারণ হোমগার্ডের ডান্ডা আছে।

—তা হলে আইন কী লিঙ্গ?

—ওটা নির্ঘাত স্ত্রী-লিঙ্গ। কারণ আইনের ফাঁক আছে।

মাইকেল হাঁড়িয়া খেতে গেল।

'এই জানালার ধারে বসে আছি, করতলে রেখে মাথা'—এই গানটার কথা মনে হল শুক্লার। ও সত্যিই 'জানালার ধারে' বসে আছে। আকাশে বর্ষার মেঘ। এক পশলা হয়ে গিয়েছে আজ সকালেই। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি এখন। কদম গাছটার সারা গায়ে ছোট-ছোট গুটি। কিছুদিনের মধ্যেই হলুদ-সাদায় সুন্দর করে সেজে উঠবে। নববরষার কদম ফুল। এই যে আষাঢ়, 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' না-হলেও, নববরষা তো বটে। এই যে জানালার ধারে বসে আছে মাথায় হাত দিয়ে, কই, বিরহের কথা তো মনে হচ্ছে না একবারও? মনে হচ্ছে না তো—'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশ কুসুম চয়নে...।' নিজেকে প্রোষিতভর্তৃকাও মনে হচ্ছে না। প্রোষিতভর্তৃকাদের একটা আলুথালু ভাব থাকে। মাথাটা ঠিকমতো আঁচড়ায় না, সাবান-টাবানও ঠিকমতো দেয় না, হয়তো মাথায় উকুনও হয়।

উঁহু, ভুলভাল ভাবছে। প্রোষিতভর্তৃকা হলেই যে বিরহিনী হতে হবে, এমন কথা কে বলেছে? বিরহিনীর একটা 'জ্বালা' থাকে। বিরহ-জ্বালা।

আচ্ছা, 'জ্বালা' বলা হচ্ছে কেন? ছোটবেলা থেকেই তো শুনতে হচ্ছে 'বিরহ-জ্বালা'। বিভিন্ন গানে, কবিতায়, কথায়...। 'জ্বালা'-টা কোথায়? 'বিরহদুখ' বললেই তো হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। দুঃখ। ছোটবেলায় বাংলায় মানে লিখতে হত। 'প্রোষিতভর্তৃকা'-র মানে হচ্ছে 'যাহার স্বামী বিদেশে থাকে।' কারও স্বামী বিদেশে থাকলেই তো স্ত্রী বিরহ-জ্বালায় জ্বলবে বা বিরহ-দুঃখে কাতর হবে—এমন কথা নেই। কোনও-কোনও 'প্রোষিতভর্তৃকা' স্বামীকে দূরে পাঠিয়েই বরং ভাল থাকে। স্বাধীন থাকে।

শুক্লার কোন পর্যায়? ভাল-থাকা 'প্রোষিতভর্তৃকা', না কি খারাপ-থাকা?

নিজের অবস্থানটা নিয়েই ভাবতে লাগল।

ও নেই বলে খুব যে দুঃখে আছে এমন নয়, আবার খুব যে আনন্দে আছে এমনও নয়।

ও থাকলে ভালই লাগে। লোকটা খারাপ না। খুব একটা বায়না নেই। অত্যাচারও করে না, মদ খেলে চেঁচামেচি দূরের কথা, সিঁটিয়ে থাকে। কিন্তু কিছুদিন ধরে, মনে হয়, কিছু একটা গোপন করছে। খোলা আলমারির ভিতরে একটা ছোট্ট 'ভল্ট' থাকে। সেই 'ভল্ট' হল আলমারিটার গোপন কুঠুরি। ওর জীবনেও আছে। থাক। সেই মন-লকারের চাবিটা অনিকেতের কাছ থেকে নিতে চায়নি। সেই লকার খুলতেও চায়নি শুক্লা। কিন্তু একটা কৌতূহল থেকেই যায়।

ছোটবেলার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। ওর একটা কীরকম যেন জ্যাঠামশাই ছিলেন। সেই জ্যাঠামশাই ছিলেন ব্যাচেলর। রিটায়ার করে ঝাড়গ্রামে একা-একা থাকতেন। একটা বাড়িও বোধহয় কিনেছিলেন। উনি মারা গিয়েছেন খবর পেয়ে সব ভাইপো ওখানে গেল। ওদের কাউকেই তো মুখাগ্নি করতে হবে। মুখাগ্নির আগেই সবাই তোশক উল্টে দেখতে লাগল, তোশকের তলায় পয়সাকড়ি আছে কি না। একজন কাজের লোক গোছের ছিল, মধ্যবয়সি মহিলা, সে-ই মৃতদেহটা আগলে বসেছিল। টেবিলে কিছু বইপত্র, ওষুধের শিশি এসব ছিল। ড্রয়ারে আলমারির চাবি পাওয়া গেল। আলমারির মধ্যেও দামি কিছু ছিল না। বেশ কিছু 'ঝাড়গ্রাম বার্তা'। ওইসব কাগজে ওঁর কবিতা ছাপা হত।

লকার খোলা হল।

লকারের মধ্যে একটা কৌটো, কৌটোর মধ্যে একটা চাবি। ওটা ব্যাঙ্কের লকারের চাবি। সেই মহিলা বলেছিল। দেহ সৎকারের পর ব্যাঙ্কে যাওয়া হল। ব্যাঙ্কের লোকজন কেন লকার খুলতে দেবে? অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কোর্ট-আদালত করে ওঁর ভাইপো রা লকার খোলার অধিকার আদায় করল। এদিকে ব্যাঙ্কের 'পাশ-বুক' দেখে ভাইপোরা জানতে পারল, প্রতি মাসে বেশ ভাল টাকা আশালতা মাইতি নামে একটা অ্যাকাউন্ট-এ জমা হচ্ছে। কিছু টাকা এই আশ্রম ওই আশ্রমে দানছত্র হয়েছে। অনেক আশা নিয়ে লকারটা খোলা হল। লকারে একটা মুখবন্ধ প্যাকেট। প্যাকেটের ওপরে লেখা : 'পাইবেন শ্রীমতী আশালতা দাস।' বুকটা ধক করে উঠেছিল। নিশ্চয়ই উইল। জ্যাঠামশাই কি বাড়ি, টাকাপয়সা সব কিছু আশালতাকে দিয়ে গিয়েছেন? খামটা খোলা হল। খামের ভিতরে কিছু কবিতা। আশালতাকে নিয়ে। বোঝো, কার ভল্টে যে কী থাকে।

অনিকেতের ভল্টে যা খুশি থাকুকগে যাক। পৃথিবীতে অনেক কিছুই দেখা যায় না। দেখার চেষ্টা করেও দেখা যায় না। রাত্তিরে প্যাঁচা, বাদুড় ওরা সব কিছু দেখতে পায়, মানুষ কি পারে? মুনি-ঋষি, যোগীরা না কি পারেন। এসব অবশ্য অনিকেত মানে না। সাতটা রঙের বাইরেও অনেক নাকি রং আছে। মানুষ জানে না। যে-শব্দ শুনতে পায় মানুষ, এর বাইরেও অনেক শব্দ আছে। মানুষ জানে না। মানুষের মধ্যেও কত কী হয়? মানুষ নিজেও সব জানে না। একটা বড় ব্যাগের মধ্যে মাঝারি ব্যাগ, মাঝারি ব্যাগের মধ্যে ছোট মানিব্যাগ।

শুক্লার নিজের ভল্টেও কি কিছু নেই? ওর সব খবর কি অনিকেত জানে? কেউ কাউকে

উজাড় করে সব কিছু দিতে পারে না। কিছু-কিছু নিজের কাছেও রাখতে হয়।

অনিকেত প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসে। শনিবার। সোমবার ফিরে যায়। বাজার-টাজার সবই করে যায়। হাঁটুর অসুবিধের জন্য একটা ওষুধ খেতে হয়, জিগ্যেস করে—ওষুধ আছে কি না। জানলার কাচ-টাচও পরিষ্কার করে কোনও সময়। কর্তব্য-কর্মগুলো নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু কোনওদিন তো কাঁধে হাত রেখে জিগ্যেস করে না, ভাল আছো তো? কপালে হাতের স্পর্শ পায় শুধু জ্বর হলে। জ্বর-জারিও তো বহুদিন হয় না। একটু স্পর্শ চায় প্রিয় কারও। শরীরের বিশেষ-বিশেষ জায়গায় নয়, হয়তো শরীরেও নয়, কিন্তু স্পর্শ। লেখায় কিছু ভুলভ্রান্তি হলে, রবার ঘষে পেনসিলের দাগ ওঠানো যায়। তেমনই সত্তার কোনও কালিমা মোছার জন্যও, একটু রবার লাগে। 'রবার' মানে ভালবাসা, মানে সহানুভূতি। আলতো করে গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেই মনে হয় কত ক্লান্তি মুছে গেল, কত গ্লানি মুছে গেল। এরকম হাতের স্পর্শ পাওয়া যেত বহু আগে। অপারেশনটার আগে। পরেও কিছুবার। একটা হার ছিনতাই হয়েছিল, তখনও। আজকাল যদি স্পর্শ পায়—সেটা বিশেষ স্থানে। ওগুলো তো স্পর্শ নয়, আঙুলের মাস্তানি। আঙুল কম্যান্ড করছে—ওঠো ওঠো। জাগো জাগো। কামবতী হও। স্কুলের ড্রিল-পিরিয়ডের 'সা-ব-ধা-ন', 'আ-রা-ম'-এর মতো কম্যান্ড। আঙুলের হুকুমে কখনও-কখনও কামবতীর অভিনয় করেছে। বিছানায় দু'জনের ভিতরের দেড়ফুট দূরত্বকে আগে দেড় কিলোমিটার বানিয়ে পরে অভিসারিকা হয়েছে। পথের কাঁটায় গায়ে রক্ত ঝরিয়েছে। কিন্তু সেই রাতটা বড় অদ্ভুত ছিল, যেবার দুলালটাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে এসেছিল ও। কে জানে কী হয়েছিল। একজন কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর সঙ্গে কামের কী সম্পর্ক? সেই ছোট্টবেলায় দেখা কী যেন একটা সিনেমা, 'পলাতক'? ওখানে একটা গান ছিল, এখনও রেডিওতে মাঝে-মাঝে হয়, 'আহা রে বিধি গো তোর লীলা বোঝা ভার।'

মহিলাদের জন্য কত কাগজ আজকাল। তাতে মহিলাদের নানা সমস্যা। নিয়মিত রাখে না, মাঝে-মাঝে একটা-দু'টো কেনা হয়। ওইসব কাগজ পড়ে মনে হয়, মহিলারা যেন আলাদা কোনও প্রাণী। ঠিকঠাক মানুষ নয়। একটা লেখা ছিল, পুরুষদের সন্তুষ্ট করার কিছু 'টিপ্‌স'। ওখানে যা-যা বলা হয়েছিল, তার অনেকগুলো মরে গেলেও পারবে না শুক্লা।

এই যে স্পর্শের কথা ভাবছিল শুক্লা, যা ওর শরীর ও সত্তা চায়, সেটা কি অনিকেতও চায় না? অন্য কিছু না। সহানুভূতি। যে-হাত বলবে, ও গো, তোমার কী কষ্ট? তোমার কষ্ট তো আমি বুঝি, কিন্তু আমি কী করব বলো? ইশ, কত দিন আঁচল দিয়ে ঘামটুকু মুছিয়ে দেয়নি ওর। না-ঘামলেও। একবার জল খেতে গিয়ে একটু বিষম লেগে কাশছিল অনিকেত। শুক্লা ওর মাথায় মৃদু চাপড় দিয়ে বলছিল, ষাট-ষাট...।

অনিকেত বলেছিল—থাক, মা-গিরি করতে হবে না। 'মা-গিরি' শব্দটায় বেশ কিছুটা অভিযোগ কি ছেটানো ছিল না? আসলে ওর দরকার 'বউগিরি', 'মা-গিরি' নয়। আরও ঠিক করে বলতে গেলে...ইয়ে। ঠিক আছে। কাল তো ও আসছে, কাল একটু অভিসারিকা হওয়া যাবে'খনে। আজ থেকে মাটি কাদা করে পিছল-পথে হাঁটা প্র্যাকটিস করবে।

অনিকেত আসে বলে রোববার লুচি হয়। আগেকার রোববারগুলোতে নিয়ম করে লুচি হত না। রুটি-আলুর চচ্চড়ি বা দই-চিঁড়ে—যা হোক কিছু। রাত্তিরে একটু যত্ন করে ভাল রান্নাবান্না

করার চেষ্টায় ও থাকে। এগুলোও তো কর্তব্যকর্ম। শুক্রবারটা এলেই মনের ভিতরে 'ও আসবে, ও আসবে' এরকম একটা ভাব হয় ঠিকই, কিন্তু বুকের ভিতরে কোনও কোকিল ডাকে না। আগমনি গানও তৈরি হয় না। সোমবার ভোরবেলা যখন ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায়, শুক্লা দরজা পর্যন্ত আসে, কিন্তু তেমন কোনও করুণ সুর বাজে না। কিন্তু সতী-নারীর তো এমন হওয়া উচিত নয়। বিদায়বেলায় আঁখি ছলোছলো হবে, আঁচলে চোখের কোনার জল মুছবে—এমনটাই তো সঙ্গত। শুক্লা কি আবেগ-বর্জিত হয়ে গিয়েছে? কই, আগে তো এমন ছিল না...। ওকে তো 'আহ্লাদী' নাম দিয়েছিল মামাতো দাদারা। আহ্লাদিপনা করত বলে নয়, বেশি করে হাসত, তা-ই। সুকুমার রায়ের কবিতার ওই 'আহ্লাদী'-দের একজন বলে ওই নাম দিয়েছিল। 'হাসছি মোরা হাসছি দেখ হাসছি মোরা আহ্লাদী তিন বোনেতে যুক্তি করে ফোকলা হাসির পাল্লা দি'।

সোডার মতো নাকি হাসি আসত ভসভসিয়ে পেট থেকে, আবার কান্নাও নাকি খুব ছিল ছোটবেলায়। অল্পে হাসত, অল্পে কাঁদত, আবার অল্পতেই কান্না থেমে যেত। একবার, মনে পড়ছে, ভীষণ কাঁদছিল, কান্না থামাতে পারছিল না কেউ, ছোটবেলার কথা, শুক্লার এক মামা কাজ করত একটা ছোট স্টেশনে, কী সুন্দর নাম জায়গাটার, রূপসা। ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে যেত ওখানে। সারা দিনে একটা ট্রেন যেত, সেটাই ফিরত। রেলের লাল কোয়ার্টারের সামনে একটা মাঠ, মাঠ পেরোলেই রেললাইন। রোজ সকালে ঝমঝম রেলগাড়ি চলে যেত, আর রেলগাড়ির শব্দ শুনেই মাঠে দাঁড়াত শুক্লা। একদিন রেলগাড়ি এল না। ট্রেন তো কখনও-কখনও 'লেট' করেই। মামা বলল, আজ রেলগাড়ি যাবে না। হরতাল। 'হরতাল' মানে কী, শুক্লা জানত না। ও বলেছিল, তা হলে বিকেলে? বিকেলেও রেলগাড়ি যাবে না জেনে ও নাকি পা ছড়িয়ে কান্না জুড়েছিল। কেউ ওর হাতে পুতুল, কেউ নারকোল নাড়ু এসব দিয়ে কান্না থামাতে চেয়েছিল। ও বলেছিল, আমাকে রেলগাড়ি এনে দাও। একটা খেলনা রেলগাড়ি কেউ জোগাড় করে দিয়েছিল। ওটা ছুড়ে ফেলেছিল, বলেছিল ওইখানে রেলগাড়ি এনে দাও। ওর হাতের আঙুল ছিল রেললাইনের দিকে তাক করা।

মানুষের কত পরিবর্তন হয়। ওর মত হাসুনে-কাঁদুনে মেয়েটা হাসে না, কাঁদেও না। ওই যে 'গীতা'-য় কী একটা শ্লোক আছে না—দুঃখে যার দুঃখ নেই, আনন্দে যার হাসি নেই...কী যেন, ডায়রিতে আছে। বাবার দেওয়া ডায়েরিতে। ডায়েরিটা খোলে। ডায়েরিটা খুললেই কেন যে অদ্ভুত অথচ অস্পষ্ট একটা ছবি আর কিছু শব্দ ভেসে আসে! আয়-আয়-আয়। চইচইচই। কুয়াশা-মাখা একটা সন্ধে। একটা পুকুর, সেখানে কলমি শুশনি ল'ল' করে। জল থইথই। আয়-আয়-আয়, চইচইচই।... দূর থেকে ভেসে আসে। মাথা-থেকে-ঘোমটা খুলে যাওয়া কোনও বউ আকুল হয়ে ডাকছে ওর হাঁসগুলোকে। জল বেয়ে পাড়ে আসে ধূসর রঙের হাঁস। ডায়েরি খুলে সেই গ্রাম্যবধূর 'আয়-আয় চইচই' যেন নিজের ভিতর থেকেও শোনে। কাঠের মিস্ত্রি দিয়ে খাট বানাচ্ছেন বাবা। বিয়ের খাট। একদিন সন্ধেবেলা হাতে করে নিয়ে এলেন বিছানার চাদর। খাটে পাতা হবে। একদিন নিয়ে এলেন বালিশের ওয়াড়। মা বলছেন—রং যে মিলল না। বাবা বলছেন, এক রঙের ঢাকনা দিয়ে দিও দুই বালিশে, রং মিলে যাবে। দু'টো আলাদা রঙের বালিশে একই রঙের ঢাকনা। ঢাকা দিয়েই তো আছি। দিব্য আছি। শুক্লা মনে-মনে ভাবে।

সেই সব পুরনো ছবি হাঁস হয়ে আসে। পুজোর নতুন ফ্রকের গন্ধ, লাল ফিতে, সাইকেলে ঠেস দিয়ে স্কুলের সামনে তরুণদার দাঁড়িয়ে থাকার ছবি হাঁস হয়ে আসে। একসঙ্গে খেতে বসা, থালায় আধখানা ডিম। সাদা ফ্রেমে বাঁধানো আধখানা উজ্জ্বল সোনা-রং ডিমের কুসুম। মা খাইয়ে দিচ্ছেন ভাত। ভাতের গরস ডিমের কুসুমটা স্পর্শ করছে, আর শুক্লার মুখে ঠেলে দিচ্ছেন মা। আর ভাইয়ের মুখে দিচ্ছেন ডিমের কুসুম। শুক্লার জন্য মিছিমিছি ডিম, ভাইয়ের মুখে সত্যি-সত্যি ডিম। রোজ-রোজ। খুব অভিমান। মেয়ে বলে ডিম দেবে না? ছেলে বলে ডিম দেবে? বাবাকে নালিশ করে সব বলেছিল। মা আমাকে মিছিমিছি ডিম দেয় বাবা, ভাইকে সত্যি-সত্যি। ঝুলনের মেলায় বাবা নিয়ে গেলেন। একটা গোটা ডিমের অমলেট। শালপাতায়। হালকা ধোঁয়া বেরোচ্ছে ডিমের শরীর থেকে। একটু-একটু করে ভেঙে খাচ্ছে, আর বাবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বাবার মুখে কী সুন্দর হাসি। একাদশীর চাঁদের মতো। স্মাইলি-স্মাইলি 'আয়-আয়-আয় চইচই...'। ডায়েরির পাতা উল্টোয় শুক্লা। সুখেও সুখ নেই, দুঃখেও দুঃখ নেই—কোথায় যেন আছে। পেয়ে গেল।

দুঃখেষুবনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।

দুঃখে যিনি স্থির, উদ্বেগহীন—সুখেও যাঁর স্পৃহা নাই, যিনি যে কোনও বিষয়েই আসক্তিহীন, ভয় ও ক্রোধশূন্য, তিনিই স্থিরপ্রজ্ঞ বলিয়া খ্যাত। তলায় ব্র্যাকেটে লেখা 'গীতা'।

ও কি তবে স্থিরপ্রজ্ঞ নাকি? নিজের প্রশ্নে নিজের মুখেই 'স্মাইলি' এল শুক্লার।

ওসব বড় কিছু নয়। তবে আজকাল কেমন যেন হয়েছে ওর। আনন্দ হয় না কেন? দুঃখ হয় না কেন? ক্রোধ হয় না কেন?

'ক্রোধ' একটা ভারী-কথা। রাগ। রাগ হয় না তো, এই যে সপ্তাহান্তে বাড়ি আসে অনিকেত, বাজার-টাজার করে, ফ্রিজ পরিষ্কার করে দেয়, ওষুধ শেষ হলে ওষুধ কিনে এনে দেয়, কিন্তু রোববারটা বিকেলে বাড়ি থাকে না। সেই রাত করে বাড়ি ফেরে। মোবাইলে কথা বলার সময় দূরে চলে যায়। কখনও ছাদে। কার সঙ্গে কথা বলে ও? ও না কি সেই ওর ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া কোনও বাল্যবান্ধবীর খোঁজ পেয়েছিল। ওর সঙ্গে তবে? বলুকগে যাক। ওর জীবনেও 'আয়-আয় চইচই' থাকতে পারে।

তরুণদার কথাও তো মনে পড়ে শুক্লার। খবর কাগজে পুলিশ নিহত শুনলেই তো বুকটা ধক করে ওঠে। সেই যে কবে সাইকেল থামিয়ে বলেছিল, পুলিশে চাকুরি পেয়েছি, ট্রেনিং-এ যাচ্ছি, পরে এলে দেখা হবে। আর দেখা হয়নি। তখন ক্লাস টেন। একটা ছোট্ট কাগজের প্যাকেট দিয়েছিল, খুলে দেখেছিল লিপস্টিক। ওটা লুকিয়ে রেখেছিল কত দিন। তারপর ওটা হারিয়েই গিয়েছিল। এরপরই ঠোঁটে লিপস্টিক বোলালেই সাইকেলের ঘন্টির উচ্ছ্বাস শুনতে পেত : টিরিং টিরিং টিরিং। একদিন দেখেছিল টিভিতে। কোথায় কী যেন গন্ডগোলের পর কোনও পুলিশ অফিসার বিবৃতি দিচ্ছিলেন। ঠিক চিনতে পেরেছিল শুক্লা। টিভির মানুষটা তো ওকে দেখতে পায়নি, তবুও টিরিং টিরিং শুনেছিল শুক্লা, সত্যিকারের। বেল-টা টিপেছিল যে, কাউকে ডাকার জন্য যে-বেল'টা থাকে টেবিলের ওপর। ভালই লেগেছিল এটা জেনে যে, লোকটা এই পৃথিবীতেই আছে। হ্যাঁ। বলছিল তো কসবা থানার ওসি, কসবা থানা খুব একটা

দূর নয় এই বাড়ি থেকে। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করার কোনও ইচ্ছেই তো হল না শুক্লার। কোনও তাগিদই নেই মনের ভিতরে। যদি দেখা হয় এই বাড়িটার ঠিক সামনে কখনও? হয়তো খুব জলতেষ্টা পেয়েছে, জিপ থেকে নেমেছে 'একটু জল পাই কোথায়' দেখতে... যদি ওর বাড়িতেই বেল টিপে জিগ্যেস করে, 'একটু জল পাই কোথায়' বলতে পারেন? ও কি বলবে, 'এখন তো জলপাইয়ের সময় নয়, কাঁচা আম চান তো দিতে পারি।' তখন কি তরুণদার মনে পড়বে পাড়ার প্যান্ডেলে 'অবাক জলপান' নাটকটার কথা? তরুণদা অবাক চোখে তাকাবে। চিনতে পারবে? হয়তো কিছু বলবেই না। শুধু মন্টুকে বলবে—ভদ্রলোককে এক গেলাস জল দিয়ে দে তো? ব্যস।

মন্টু ছেলেটা বেশ কাজের। ওকে মোটেই কাজের ছেলে হিসেবে রাখা হয়নি, নিজের ছেলে হিসেবেও নয়। নিজের ছেলে হিসেবে দেখলে তো পাশেই শোয়াত। স্নান করিয়ে দিত...। না না, এই বয়সে বোধহয় স্নান করানো যায় না। বারো বছর তো বয়স হল ওর। গলাটা একটু ভাঙছে। হালকা একটা গোঁফের রেখা উঠেছে। ওর জন্য বাথরুমে আলাদা সাবান। নিজের ছেলে ভাবলে কি আলাদা সাবান রাখত? তবে মন্টু কী-কী খেতে ভালবাসে শুক্লা জেনে ফেলেছে। ফুলুরি-মুড়ি। ফুলুরি বাড়িতে বানাতে পারে না শুক্লা। পয়সা দেয়, ও কিনে আনে। ও রসগোল্লা অদ্ভুতভাবে খায়। প্রথম জিভ দিয়ে একটু করে চাটে। 'লিক' করা যাকে বলে। তারপর অর্ধেকটা মুখে রাখে। কামড়ায় না। বেশ কিছুক্ষণ পরে কামড়ায়। ওর কি কামড়াতে মায়া লাগে? কী সুন্দর দুলে-দুলে পড়ে ও। ঘরটা কীরকম 'আলোয় ভুবন ভরা' হয়ে যায়। এ দৃশ্য আগে দ্যাখেনি কখনও। ওই ঘর থেকে কখনও ভেসে আসে ব্যাবিলনের সভ্যতা, বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য, নীলনদের যাত্রাপথ, সিঁড়িতে ধপধপ শব্দ, জেঠিমা...কাপড়টা কোথায় মেলব? 'জেঠিমা' শব্দটার শেষে একটা 'মা' আছে। ওখানটায় কী সুন্দর একটা সুর। শুক্লা বলেনি, মন্টু-ই শেষ শব্দটায় সুর মিশিয়ে দেয়।

শুক্লার কাজেও সাহায্য করে ও। কাচা কাপড় মেলে দেয়, বাজার থেকে কাঁচা তরকারিগুলো প্যাকেটে ভরে ফ্রিজে গুছিয়ে রাখে, চা-ও করতে পারে। বলে, তরকারিগুলো ধুয়ে দিই? কথা-টথা বলার সময় একটু কেমন যেন 'সুর' থাকে ওর। হাতের কবজি এবং কনুই একটু বেশি নড়ে। অন্য ছেলেদের এরকম হয় না। বল কিনে দিয়েছে। বল খেলে না। অথচ বিকাশদার ছেলেটা কীরকম খেলোয়াড় হয়েছে এই বয়সে। বিকাশ ক্রিকেট খেলার ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। ছেলেটা অনেক ব্যায়াম-ট্যায়াম করে। ওর নাকি ছেলেটাকে সৌরভ বানানোর ইচ্ছে।

শুক্লার অত ইচ্ছে-টিচ্ছে নেই বাপু। ছেলেটা বিপদে পড়েছিল, ঘরে এনে রেখেছে। ওর ঘরে যখন আছে—ঠিকমতো মানুষ হোক। ভাল ছেলে হোক। ভাল ছেলে বলতে উকিল-ব্যারিস্টার-ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এমন কেন? সৌরভ, কপিল দেবও হতে হবে না।

যা হোক কিছু করুক। সৎ ছেলে হোক, ব্যস। একটা মোটামুটি চাকরি-বাকরি কি পাবে না? যতটা পড়তে চায়, পড়াবে শুক্লা। ইশ, ও কী করে পড়াবে? ওর কি নিজের উপার্জন আছে? ওর বরের টাকায় ওর ইচ্ছাপূরণ। কী আর করা যাবে, তবু যা হোক, ইচ্ছেটা আছে। ইচ্ছে মানেই তো জীবন।

মন্টুর বউ শুক্লাকে কী বলে ডাকবে? জেঠিমা। না কি মা-ই ডাকবে? মন্টুর বউটাকেই ওই

মোটা হারটা দেবে। কুলো ঘুরিয়ে বরণ। উলু। 'আয়-আয়-আয় চইচই'...।

এইসব আকাশকুসুম চয়নে বেলা যায়। বিরহের বেলা যায়। আবার 'বিরহ' শব্দটা কেন আসে? বিরহ না, বরাহ। এমনি-এমনি ভাবছে এসব। যা হওয়ার হবে। ভগবান যা করে।

ভগবান কোথায় থাকেন? কে জানে? স্বর্গ বলে কিছু আছে না কি ওই মহাকাশে? আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম। সব কেমন গুলিয়ে যায়। কিন্তু কিছু একটাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে যে, একটা আশ্রয়। এই যে ছোট্ট গোপালটাকে সাজায়, স্নান করায়, খেতে দেয়, ঘুম পাড়ায়—মানে 'অদৃশ্য' কিছুকে সেবা করে। আসলে স্মরণ করে। কৃতজ্ঞতা জানায়। এই অনন্ত রহস্যর মাঝখানে বিস্ময়ভ্রমণ। এই ভ্রমণে কী এক আনন্দ। বৃষ্টিফোঁটার টাপুর-টুপুরে কী এক আনন্দ। রাস্তার গর্তে জমা জলে মেঘের ছায়া। ছোট-ছোট জুঁই ফুল ফুটে উঠলে ওরা কী কথা বলে? ঠিকই বলে, ও শুনতে পায় না। মেঘেদেরও কথা আছে। তারাদেরও। রাতের আকাশের দিকে তাকালে সহস্র নক্ষত্র-তারার মধ্যে কীরকম যেন হারিয়ে যায়। তখন কি মনে পড়ে, উচ্ছে-বেগুন-ধামা-কুলো? তখন কেন যে ইচ্ছে হয়, সারা শরীর অঞ্জলিবদ্ধ করি। এই মহান, বিরাট, অনন্ত সৃষ্টিকে প্রণাম করি। স্রষ্টা-কে নয়, সৃষ্টিকেই। সৃষ্টিই ঈশ্বর। দুর্জ্ঞেয় অবগুণ্ঠনটাই ভগবান। মুগ্ধতাই—আনন্দ। হে ভগবান, আমাকে মুগ্ধতা দাও।

অনিকেত ভগবান মানে না। ভগবানের সঙ্গে সবসময় ও 'টগবান' মেশায়। সব কিছু যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চায়। সব যুক্তি তুমি জানো? কেন গান ভাল লাগে, তুমি বোঝাতে পারবে যুক্তি দিয়ে? ভোরবেলাটা কেন ভাল লাগে পারবে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে? কথায়-কথায় বিবর্তন তত্ত্ব, ডারউইন, মার্কস-এঙ্গেল্স, জিন, ক্রোমোজম...। আমার ওসব দরকার নেই। আমার বাবা সেই প্রাচীন তত্ত্বটাই ভাল—'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।' এসব ভাবছিল শুক্লা। ভাবনার কোনও ক্রমপর্যায় নেই। কিন্তু এই স্বপন-বপন ভালই লাগছিল শুক্লার।

এ সময়ে জানলা দিয়ে সেই মেয়েটাকে দেখল। রিকশায়।

একটু দূরে কোথাও থাকে। ওর পা দু'টো অপরিণত। বোধহয় শৈশবে পোলিও হয়েছিল। ওকে দেখেছে হাঁটুর তলায় হাওয়াই চটি বেঁধে ছেঁচড়ে চলতে। কোথাও ও বই-বাঁধানোর কাজে যায়। বই-বাঁধাতে পা লাগে না। দুলালের মায়ের কাছে জেনেছিল। পা না-থেকেও নিজের পায়ে দাঁড় করাতে চেয়েছিল নিজেকে।

রিকশায় ওর পাশে একটি পুরুষ। ওই মেয়েটির কোলে একটি শিশু। শিশুর হাত দু'টো আকাশ নাড়াচ্ছে। উঃ মুগ্ধতা। আনন্দ? আনন্দ কি টের পাওয়া যাচ্ছে ভিতরে? প্রচণ্ড ভাল লাগার একটা অনুভব তো হওয়া উচিত ছিল এখন। একটি পা নেই, অথচ মেয়ে বর পেয়েছে, ঘর পেয়েছে, সন্তানও...।

তবে কি হিংসে?

পা-নেই-মেয়েটার কোলেও সন্তান, অথচ...।

দুঃখে কষ্ট না-পাওয়া, সুখে আনন্দ না-পাওয়া, বা আনন্দে সুখ না-পাওয়াটা প্রাজ্ঞতার লক্ষণ নয়। জড়তার লক্ষণ তবে।

এক-রিকশা সুখ চলে গেল। সুখ-লাগা বাতাসে জলের গন্ধ। আনন্দধারা এই ভুবনে বইছে তো, আমার ঘরেও একটু এসো গো, প্লিজ।

তার চেয়ে উচ্ছে-বেগুন-পটল-মুলো ভাল। বেতের বোনা ধামা কুলো ভাল।

ও আসবে। কাল। ও এলে, পাখিগুলোও বেশি শিস দেয় না, কদম গাছের ডালও নড়ে ওঠে না, জুঁই ফুলও বেশি গন্ধ দেয় না, তবে রান্নাঘরের গন্ধটা পাল্টে যায়। রোববার সকালে লুচি হয়। বেচারা খালি সেদ্ধ-সেদ্ধ খায়, নইলে খিচুড়ি। আগের দিন মাছ কিনে আনে বেশি করে। সকাল হলেই যেন ওর মা বলেন, বউমা, কাঁচামুগের ডাল রেঁধো, পারো যদি লাউয়ের খণ্ড দিও। বেগুনের গায়ে একটু ব্যসন মাখিয়ে ভেজে দিও। মনের কথা মিশিয়ে দিও মাছের ঝোলটায়। ছোটমাছ যদি থাকে, একটু টক কোরো তেঁতুল দিয়ে। দই পাতোনি বুঝি? ভুলে গিয়েছ?

আজ শুক্রবার। মন্টু স্কুল থেকে এলে এক প্যাকেট দুধ বেশি আনতে বলবে। দই পাততে ভুলে যায় বড়।

শুক্রবারই অনিকেত চলে এল। রাত আটটা নাগাদ। মুখে অনেকটা হাসি ফোটাল শুক্লা। ও জুঁইগাছ, বেশি করে গন্ধ দে। ও বৃষ্টি-বাতাস, বও, বও, বও। ওগো উতল হাওয়া।

একদিন আগেই? বাঃ!

শুক্লা বলল। ফোন করে দিলে না কেন?

—ফোন করলে কি সারপ্রাইজ-টা হত?

—সেটা ঠিক, কিন্তু বাজার তো কাল করব ভেবেছিলাম।

—ছাড়ো তো, ডাল আর আলুসেদ্ধ মেখে দিও।

যথেষ্ট ভালবাসা দেখানো হল না মনে হল। তাই জুড়ে দিল 'তোমার হাতের'।

এই জুড়ে দেওয়াটার মাঝখানে সামান্য 'পজ' রয়ে গিয়েছে, অনিকেত বোঝে। রেডিও-র কাজে দু'টো কথা জুড়তে হয়। জোড়ার সময় 'পজ' খুব ইম্পর্ট্যান্ট।

'পজ' মেক-আপ করার জন্য বলল—তুমি দারুণ আলুসেদ্ধ মাখো—শুকনো লঙ্কা ভাজা, কালোজিরে দিয়ে। আমি তো এমনি একটা কাঁচালঙ্কা মেখে খেয়ে নি।

জল এনে দিল শুক্লা। লেবু-চিনি দিয়ে।

কী খবর বলো? অনিকেত বলল।

—চলছে।

—মন্টু?

—ঠিক আছে।

—পড়াশোনা করে?

—হ্যাঁ, করে।

—অন্য কোনও ঝামেলা নেই তো—ওকে নিয়ে?

—না না, কী আর ঝামেলা...

মাঝখানে মন্টু একবার এসে উঁকি দিয়ে গেল। অনিকেতের মনে হল টু-উ-কি...।

শুক্লার মনে হল, অনিকেত খুব শ্রান্ত। বলল, দুপুরে বেরিয়েছ, না?

অনিকেত বলল, মাথা নাড়ল।

—চা খাও।

চা এনে দিল শুক্লা। বলল, খুব ভিড় ছিল বুঝি বাসে? জামাটা কীরকম কুঁকড়ে গিয়েছে। না কি ইস্ত্রিটাও করো না।

শুক্লা দেখল, জামার একটা বোতাম ছেঁড়া। একটু অপরাধী লাগল নিজেকে। ও যদি ওখানে ওর কাছেই থাকত...।

অনিকেতেরও একটু অপরাধী লাগছে নিজেকে।

আজ সকালবেলাতেই বেরিয়েছিল। সারাটা দুপুর মঞ্জুর সঙ্গে। আজ বড্ড পাগলামি করছিল মঞ্জু। বোতামটা ওখানেই ছিঁড়েছে।

রাতে শুয়েছিল ওরা। দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে অনিকেত। দু'জনের মাঝে দেড়-দু'ফুট ব্যবধান। শুক্লার হাত অভিসারে যায়। এই পঙ্কিল দু'ফুট পার হয়ে... 'আয়-আয়-আয় চইচই...।'

মনের ভিতরে একটা মেঘ জমে থাকে। একটা অস্বস্তিকর অনুভব। শুক্লার কাছে লুকিয়ে-রাখা গোপন-জীবনের অংশগুলোই একটু অস্বস্তিতে রাখে। শুক্লা জানলে দুঃখ পাবে। শুক্লার কোনও গোপন-জীবন নেই সেটা অনিকেত খুব ভাল করে জানে। ও হল পুরো সতী নারী। সতীর কি পুংলিঙ্গ হয়? বোধহয় নেই। 'সৎ' বললে ঠিক বোঝায় না। স্ত্রী-র প্রতি একান্ত বিশ্বস্ত পুরুষকে কী বলে? বাংলা, ইংরেজি কোনও ভাষাতেই কি আছে? স্ত্রী-র প্রতি বিশ্বস্ত থাকাকে অনেক সময় স্ত্রৈণতা বলা হয়। জাহানাবাদিকে জিগ্যেস করেছিল হিন্দিতে সতীর কোনও পুংলিঙ্গ হয় কি না। জাহানাবাদি বলেছিল, ভেড়ুয়া।

জাহানাবাদি একজন অবসরপ্রাপ্ত রেডিও-কর্মী। এখানে লোকজন কম, বহু বছর কোনও নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে না। ঘোষকের কাজটা ক্যাজুয়াল দিয়েই করানো হচ্ছে—দৈনিক মজুরিতে। কিন্তু সম্প্রচার চলার সময় একজন তত্ত্বাবধায়ক দরকার হয়, যিনি ঘোষকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন, বা দরকার মতো পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠান সূচি পরিবর্তনও করেন। ক্যাজুয়াল কর্মীদের দিয়ে এসব হয় না। জাহানাবাদি আবার কবিও বটেন। ওদিকে, কবিদের নামের সঙ্গে অনেক সময় নিবাসটাও যোগ করা হয়। যেমন, এঁর নাম হচ্ছে লছমীশংকর দুবে জাহানাবাদি। এরকম মোরাদাবাদি, কানপুরিয়া, মজফ্‌ফরপুরিয়া, এলাহাবাদি এসব হয়। ওঁর অনেক নিজস্ব তত্ত্ব আছে। যেমন যিশু খ্রিস্ট ভারত থেকেই ওধারে গিয়েছিলেন। ঘরের ঈশান কোণে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে নাম হয়েছিল ঈশা। যিশুর অন্য নাম। খ্রিস্টান মানে কৃষ্ণান। 'গীতা'-র অনুকরণই হল বাইবেল। বেথলেহাম আসলে বেতলাইসান। ওটা বিহারের মজফ্‌ফরপুর জেলায়। মধ্য এশিয়ার লোকজন 'স'-কে 'হ' উচ্চারণ করে, যেমন সিন্ধু-কে বলে 'হিন্দু'। হিব্রু আসলে 'শিবরু'। শিবের ভাষা। আর মিশরে সভ্যতা তো ভারত থেকেই গিয়েছে। ওদের নদীর নাম নীল। একেবারে সংস্কৃত শব্দ। জাহানাবাদি রোজ সকালে একটা শিশি থেকে দু'চামচ কী একটা আরক ধরনের খায়। শিশিটার গায়ে গরুর ছবি। হিন্দিতে লেখা গোমৃত।

জানাহাবাদি এলে অনিকেতের কোয়ার্টারেই থাকেন। অনিকেত যেহেতু একা, ওর

কোয়ার্টারটা বড়-ই। একটা ঘরে জাহানাবাদি থেকে যান। মাসে দশ-পনেরো দিন করে ডিউটি। দিনে তিনশো কুড়ি টাকা করে দেওয়া হয়। কাজ চালানোর জন্য জাহানাবাদিদের রাখতে হয়। আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে গেলে এই টাকায় পোষাবে কেন? জাহানাবাদি থাকলে রান্নাবান্নাটা উনিই করে রাখেন। রাত্রে মাঝে-মধ্যেই গল্পগাছা হয়।

জাহানাবাদির মতো আর একজনও আছেন। ওঁর নাম মেরিলিন লাকড়া। 'ওরাওঁ' উপজাতির মহিলা, খ্রিস্টান। কখনও লাকড়া ম্যাডাম, কখনও জাহানাবাদি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে থাকেন।

ওঁরা চলে গেলে, ওঁদের ঘরে কিছু-কিছু অবশেষ রয়ে যায়। যেমন, জাহানাবাদি-র ঘরে একটা ফাঁকা 'গোমূতে'র শিশি। শিশির গায়ে হিন্দিতে লেখা ছিল এটা কোন কোন বিমারি থেকে ইলাজ দেয়। খুদি-খুদি অক্ষরে 'অ'-এ অর্শ থেকে শুরু করে হ-এ হাঁপানি, এবং 'স'-এ সবকুছ পর্যন্ত বহুরকম অসুখের নাম ছিল। শিশিটা ও নিয়েছিল খুচরো তেল কিনবে বলে। ছিপিটা খুলতেই অ্যামোনিয়ার তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ। আবার শোঁকে। অ্যামোনিয়াই তো। ইউরিয়ার দ্রবণ ভেঙে গেলে অ্যামোনিয়া হয়। তবে কি ওই শিশিতে গরুর হিসি ছিল? পরে, জাহানাবাদি এলে অনিকেত জিগ্যেস করেছিল। জাহানাবাদি বলেছিলেন জি হাঁ। সফেদ মাঈ কা। গাই নয়, উনি বললেন, 'মাঈ'। 'গো'-মায়ের পেচ্ছাপ পান করেন উনি। জানা গেল এটা অনেকেই খায়। শুধু রাঁচি কেন, হাজারিবাগ, টাটানগর, পাটনা সর্বত্রই পাওয়া যায়।

—কোথায় পাওয়া যায়?

—কেন? দাবাখানায়।

রেড ক্রশ লাগানো ওষুধের দোকানে গরুর পেচ্ছাপ 'সিল' করা শিশিতে বিক্রি হয়। ভাবা যায়? চাইবাসার বড় ওষুধের দোকানেও পাওয়া যায়। অনিকেত খোঁজ নিল। দেখল আলমারিতে নানারকম ওষুধের সঙ্গে 'গোমূত' সাজানো, পাশেই সান্ডা তেল। শিশিতে বলীয়ান পুরুষের ছবি, খালি গা, জাঙ্গিয়া পরা, জাঙ্গিয়াটা ফোলা। কলকাতার রাস্তায় বেদেনি-বানজারা এইসব তেল বিক্রি করে। ও দেখেছে। গিরগিটি-র মতো দেখতে কী একটা প্রাণীকে তেলের মধ্যে ফোটায়। সেই তেলটা বিক্রি করে ওরা। এই তেলের আর একটা নাম 'পালঙ্কতোড় তেল'। মানে, এই তেল ঠিকঠাক অঙ্গে মর্দন করলে রমণকালে পালঙ্ক ভেঙে যাবে।

জাহানাবাদি-র বয়স পঁয়ষট্টির মতো। ধুতি এবং খদ্দরের জামা পরেন। অনিকেতের চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড়। 'সান্ডা' বিষয়ে ফান্ডা নেওয়ার মতো সম্পর্ক এখনও তৈরি হয়ে ওঠেনি। সবরকম কথা বলার পরিবেশ তৈরি হল, যখন মাসখানেক পরে এসে ছেলের বিয়ের কথা জানালেন। বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ১০৮টা হাউইবাজি উড়েছে আকাশে, আর এগারোজন 'লওন্ডা' নাচিয়েছে। 'লওন্ডা' নাচানোটা উৎসবের অঙ্গ। তা ছাড়া বিয়ে বাড়িতে 'লওন্ডা' এলে নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রী সুখে থাকে। অনিকেত বলল জাহানাবাদি সাহেব, 'লওন্ডা' নাম থেকেই কি লন্ডন শহরের নাম হয়েছে?

উনি ইয়ার্কিটা বুঝলেন। বললেন, ইয়ার্কি কোরো না। লন্ডনের সাহেবরাও ওদের বাড়িতে 'লন্ডা' নাচাত। সে একটা সময় গিয়েছে। সাহেবরা এদেশে এসে মেম পেত না। নারী-শরীরের জন্য ভুখ তো ছিলই। এদেশের মেয়েদের লুকিয়ে-চুরিয়ে, কিংবা দালালের মাধ্যমে ওদের বাংলোয় আনত, কিন্তু পাটনা-র মতো শহরে সহজে যেটা পাওয়া যেত, সেটা হল লন্ডা।

পাটনায় মারুফগঞ্জের কাছে এখনও একটা লন্ডা বাজার আছে, সেখানে তিন-চার ঘর নাচুনে আছে, ওদের বলা হয় 'লন্ডনিয়া'। কহবত আছে, কোনও সাহেব নাকি ওদের নাচে এমন মোহিত হয়ে গিয়েছিল যে চার-পাঁচজন লন্ডাকে বিলেত নিয়ে গিয়েছিল। ওদের ছেলে চার্চ থেকে বিয়ে করে ঘরে এল, তখন ফুর্তিতে 'লন্ডা' নাচিয়েছিল। ওরা ওখানে গিয়ে বিলিতি নাচও শিখেছিল। ওরা কিছুদিন পর দেশে ফিরে আসে। ওদের 'খ্যামটা' জাতীয় নাচের সঙ্গে বল নাচের মিশ্রণ ঘটায়। মানেটা হল, ওরা নিজেরা নাচতে-নাচতে দর্শকদের ভিতর থেকে কাউকে পার্টনার বেছে নেয়, তারপর হাত ধরে, পায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুরে-ঘুরে নাচে। এখনও নাকি 'লন্ডনিয়া' নাচের কদর আছে। অনিকেত ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে। এটা হল, একটা 'স্কুল অফ লন্ডা' ড্যান্স। বলা যায় 'লন্ডন স্কুল অফ লন্ডা ড্যান্স'।

জাহানাবাদি বলছিল—শুধু বিয়ের উৎসব নয়, অন্নপ্রাশন, ছটপুজোতেও ওদের নাচ খুব দরকার। আর হোলি-র আনন্দ তো 'লন্ডা' ছাড়া বেকার। কিন্তু সকালবেলায় এদের মুখ দেখতে নেই, দেখলে সারাদিন খারাপ যায়। এরা অপবিত্র।

বিয়ের সময়, পবিত্র, শুভ। কিন্তু অন্য সময় অশুভ—এর কী ব্যাখ্যা? অনিকেত জিগ্যেস করে।

জাহানাবাদি বলেন, বহুত আচ্ছা কোয়েশ্চেন কিয়া হ্যায় আপনে। ইয়ে তো 'ফাক সোসিওলজি' কা মামলা হ্যায়।

একটু ভুল শুনেছিল। ওর উচ্চারণ দোষে। 'ফোক সোসিওলজি' হবে।

জাহানাবাদি ওঁর ঘর থেকে মহুয়ার জ্যারিকেনটা নিয়ে আসেন। বলেন, গেলাস দিজিয়ে।

দু'টো চুমুক দিয়ে জাহানাবাদি বলতে লাগলেন—এরা আগের-আগের-আগের জন্মে ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভার নর্তকী। মুল নর্তকী হচ্ছে রম্ভা-মেনকা-উর্বশী। এঁদের অনেক অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগে। দেখতে নেহি হ্যায় সিনেমা-উনেমা মে? এক লেড়কি নাচতি হ্যায় তো উসকি সাথ-সাথ এক ডজন লেড়কি ভি পায়েল লাগাতি হ্যায়? স্বর্গে উর্বশীদের ওপর দেবতাদের আশীর্বাদ আছে। ওঁদের কখনও 'হায়েজ' হয় না। 'হায়েজ' মতলব 'মেন্‌স'। কিন্তু সহকারিণীদের তো এতটা স্ট্যাটাস নেই। সহকারিণীরা হল ফালতু। ওদের জ্বর, সর্দি, পেটখারাপ, ঋতুস্রাব সব হয়। মাঝে-মাঝেই ওদের ভিতরে কারও-কারও শরীর খারাপ হয়, নাচতে পারে না, ইন্দ্র ওদের অভিশাপ দেয়। ইন্দ্র তো নাচ-টাচ দেখার সময় প্রচুর সোমরস খেয়ে থাকেন, আর ওইসময় ওঁদের 'রাজা' ভাব অতি প্রবল হয়। 'তমো'-গুণ সমঝতে হ্যায়? ওহি গুণ কা প্রভাব মে। অভিশাপ দিয়ে বলে—তোমার মধ্যে একটা পুরুষ অঙ্গ দিয়ে দিলাম। উসি লিয়ে উনকা দো পয়ের কা বিচ মে এক ছোটা সা ল্যাওড়া পয়দা হো গিয়া হ্যায়। লেকিন, আসল মে ই লোগ লেড়কি যেইসাই হ্যায়। দেখিয়ে স্যর, ক্যায়া মুসিবত। কপালে হাত রাখলেন।

জাহানাবাদিজি এবার বলতে থাকেন, আরে বাবা ইন্দ্র মহারাজ হল গিয়ে আমাদের এমপি মহারাজদের মতো। ওদের ক্ষমতা আছে, যা-খুশি-তাই করেছে। ওই বেচারা মেয়েগুলোর ওপর নিজের জ্বালা মিটিয়েছে।

—সেটা আবার কীরকম?

—আপ জানতে হ্যায় ইন্দ্রমহারাজ কা পেলহড় কা বারে মে?

—পেলহড় ক্যায়া হ্যায়?

—নেহি জানতে হ্যায়? বৃষন বৃষন।

—বৃষন ক্যায়া হ্যায় জি?

—ইঃ বাবা, বৃষন ভি নেহি জানতে হ্যায়। অণ্ডকোষ। অণ্ডকোষ। নিজের আঙুলগুলো বলের মতো করে দেখালেন।

—ক্যায়া হুয়া থা ইন্দ্রজি কো?

জাহানাবাদি যা বললেন—মহর্ষি গৌতমের পত্নী অহল্যা ছিলেন খুব সুন্দরী, আর সুন্দরী দেখলেই ইন্দ্রের মাথা খারাপ হয়ে যেত। একবার দুই দৈত্য—সুন্দ-উপসুন্দকে মারার জন্য সব দেবতারা তাঁদের সব রূপ আর শক্তি দিয়ে তিলোত্তমা নামের এক নারী তৈরি করেছিলেন। তিলোত্তমা ত্রিভুবনের সেরা সুন্দরী। অ্যাকশনে যাওয়ার আগে তিলোত্তমা মহাদেব আর ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছিলেন। ইন্দ্রের দু'চোখে প্রাণ ভরছিল না। উনি নিজের সারা শরীরে এক হাজার চোখ পয়দা করে নিলেন। সেই ইন্দ্র, সুন্দরী মেয়েছেলে দেখলেই যাঁর সবকুছ গড়বড় হয়ে যায়। গৌতম মুনির বউ অহল্যাকে দেখে ওঁর বহুত লোভ হল। একদিন গৌতম মুনির রূপ ধারণ করে অহল্যার সঙ্গে সঙ্গম করলেন। গৌতম মুনি হঠাৎ ঘরে এসে ডুপ্লিকেট গৌতমকে দেখে সব সমঝে গেলেন। ইন্দ্রর ওপর রাগ করে অভিশাল দিলেন—গির যা বৃষণ। আর অমনি ইন্দ্রের ওটা খসে গেল।

যেই না অণ্ডকোষ খসে গেল, তখন ইন্দ্র কি আর মরদ রইলেন? তখন ইন্দ্র কী করতেন? ওঁর কি তখন সেই বড়িয়া মোচটা ছিল? তখন স্ত্রী-সঙ্গম করতে পারতেন? ওসব কোনও কিতাবে লেখা নেই। ওসব নিয়ে একটা 'বিগতবৃষণ' কাব্য লেখার ইচ্ছা বহু দিনের, এখনও হল না।

ইন্দ্র মহারাজ 'বিগতবৃষণ' হয়ে যাওয়ার পর দেবতারা মহা মুশকিলে পড়লেন। এমন লোক কী করে রাজা থাকবেন, যিসকো আসলি চিজ নেহি হ্যায়? উসকো বাদ বহুত ক্লোজ ডোর মিটিং হুয়া, আউর নির্ণয় লিয়া গিয়া—পাট্‌ঠা কা অণ্ডকোষ ইন্দ্র কা বডি মে জোড় দিয়া যায়গা। ইসকে বাদ প্লাসটিক সার্জারি হুয়া, ইন্দরজিকা বডিমে পাট্‌ঠা কা পেলহড় জোড় দিয়া গিয়া। উসি লিয়ে না হাম লোগ ইন্দরজি কা পূজা নেহি করতা হ্যায়।

বাব্বা। এসব তো কিছুই জানত না অনিকেত। দেবরাজ হয়েও ইন্দ্রর তো কোনও পুজো নেই। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় ইঁদ পরব বলে একটা অনুষ্ঠান হয়। ওটা নাকি ইন্দ্রের স্মৃতি। ইন্দ্রের কোনও মন্দির নেই—শুধু ওই একটা কারণেই। জাহানাবাদিজী এরপর যা বলেন, তার সারমর্ম হল : ইন্দ্রের কিছু মাথার ঠিক ছিল না কি? শরীরে যদি মানুষের বদলে পাঁঠার বিচি ঝোলে, তা হলে যা হওয়ার তা-ই হয়। ওই একটি কম্মো ছাড়া আর কিছুই জানত না, দৈত্যদের কাছে বারবার হারত, আর ব্রহ্মা-মহেশ্বরের কাছে গিয়ে হাতজোড় করত। একবার হল কী...ইন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্তের দিকেই চলে যাচ্ছেন জাহানাবাদি।

অনিকেত বলে—কিন্তু লন্ডারা নাচলে শুভ হয় কেন বললেন না তো...।

ও আর বলার কী আছে? সারকথা তো বলেই দিয়েছি। লন্ডারা হচ্ছে শাপভ্রষ্টা নর্তকী। মৌগাদের মধ্যে সবাই লন্ডা হয় না। মৌগা-রা নিজেরাই বুঝে যায় ওরা লন্ডা। ওদের কোমর সরু হয়। নাচতে ভালবাসে। ইন্দ্র যখন অভিশাপ দিলেন, ওরা বলল প্রভু, শাপ তো দিলেন,

শাপমুক্তি কী করে হবে? ইন্দ্র বললেন, এখানেও নাচতিস, এবার পৃথিবীতে গিয়েও নাচবি। আগে দেবতাদের আনন্দ দিতি, এবার মানুষদেরও আনন্দ দে। আনন্দ হল সবসে বড়িয়া দান। আনন্দই সর্বোৎকৃষ্ট দান। মানুষ আশীর্বাদ করবে। মানুষের আশীর্বাদে পরের জন্মে আবার নারী হয়ে জন্মাবি। ওরা নাচে, আনন্দ দেয়, আর পাপ খণ্ডায়।

—ওরা নাচলে গৃহস্থের কল্যাণ হয় কেন? জাহানাবাদি একটু গম্ভীর, তারপর বলতে থাকেন—দেখিয়ে সাহাব, দুনিয়া মে দো চিজ হ্যায়, যেতনা ভি খর্চ, খ্ছয় নেহি হোতি হ্যায়। যতই খরচা করো না কেন, ক্ষয় হয় না। বিদ্যা, আর আনন্দ। ওরা তোমাকে আনন্দ দিচ্ছে, তুমি ওদের আশীর্বাদ দাও, শুভ কামনা দাও, শুভেচ্ছা দাও...। তোমাকে আশীর্বাদ দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে ওরা। ওদের প্রত্যেক পায়ের ধাক্কায় গৃহস্থের অশুভ-শক্তি দূরে সরে যায়। আর যেখানে আনন্দের জন্য সবাই জড়ো হয়, সেখানে ওরা শুভ।

অনিকেত বলে, তা হলে ওরা বিয়ে বাড়িতে শুভ, পরদিন সকালে নববধূর পক্ষে ওদের দেখা অশুভ, এটা কেমন হল? এখানে কী তত্ত্ব দেবেন?

জাহানাবাদি বলল—এগুলো চলে আসছে যুগ-যুগ ধরে। সকালবেলায় কুকুর, শকুন, হিজড়া, বিধবা অশুভ। প্যাঁচা শুভ, কিন্তু একাদশীতে অশুভ। ওসব যে, নিয়ম হয়েছে, এর একটা স্ট্যাটিস্টিকাল বেস আছে। অনেকদিন ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা দেখেছেন, হিসেব রেখেছেন, তারপর অঙ্ক কষেছেন। যদি দেখা যায়, একশোজন লোক সকালবেলায় যাত্রা করার সময় হিজড়া দেখল এবং তাদের মধ্যে বিশজন বিপদে পড়ল, আর ২৫ জন লোক সধবা সতী নারী দেখে যাত্রা করে সাকসেসফুল হল, তা হলে কী সিদ্ধান্ত হয়? শুনিয়ে জি, সনাতন ভারত মে ইসটাটিসকিকস্ কা চর্চা বহোত হোতা থা। আপ, বেঙ্গলি লোগ মানতা নেহি। খনা দেবী তো আপই কা থী না?

যাককে যাক, এরা কিন্তু নাচে ভাল। আমার ছেলের শ্বশুরবাড়ি হল আমার বাড়ি থেকে এগারো কিলোমিটার দূর। এগারোজন লঅন্ডা এই এগারো কিলোমিটার রাস্তা নাচতে-নাচতে গিয়েছে। বরাতি-রা গাড়িতে। গাড়ি ওদের পিছন-পিছন। লঅন্ডাদের সঙ্গে ব্যান্ডপার্টি। ওরা আংরেজি গানা, ফিল্মি গানা বাজায়, লঅন্ডা-রা নাচে। ওই এগারোজনের মধ্যে ছিল দু'জন চমচম।

'চমচম' মানে জিগ্যেস করায় অনিকেত জানতে পারল, যারা একটু বেশি মেয়েলি, এবং স্বাস্থ্য ভাল। লন্ডাদের বেশির ভাগই নিচু জাতের, তাই রং কালো। ভাল খাওয়া-দাওয়া করতে পারে না। রোগা। তাই চমচমদের কদর বেশি। বরাতিরা নেশা করে থাকে। এদের সঙ্গে নাচে। দু-একটা চমচমকে জড়িয়েও ধরে। খামচেও দেয়। এগারো কিলোমিটার নাচতে-নাচতে একজন মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। দুবলা কিনা, তাই। মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়া ঘর্মাক্ত মানুষটাকে চোখের সামনে যেন দেখতে পায় অনিকেত। দুলালের মুখটা ওর দেহে বসানো। দুলাল 'চমচম' নয়। ও হয়তো রসহীন কটকটি। দু-একটা চমচমের খাবলানো শরীরও ভেসে ওঠে। ওগুলো ধর্ষণ নয়। শ্লীলতাহানি নয়। ৩৭৬ ধারায় শুধু নারীই ধর্ষিতা হতে পারে। এরা পারে না। অনেকটা-মহুয়া-নেওয়া জাহানাবাদিজি বলে যাচ্ছে চমচমিয়া-বরাতি বৃত্তান্ত।

দুলালের কথা মনে হয় ফের। দুলালের ছোটবেলাটা ও জানে না। শেষ-জীবনটা তো জানে। ওকে তো দেখেছে। ওর জীবনটা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলে কেমন হয়? দুলালের

কাছ থেকে তো অনেকটাই শুনেছে ও। চাঁদতারা হিজড়ানির কথা শুনেছে, দুলালের প্রেমিক লছমন যাদব...। জাহানাবাদি-র কাছ থেকেও কিছু ইনপুট পাওয়া যাবে। এছাড়া সোমনাথ তো এদের নিয়ে কাজ করেছে, ওর সঙ্গেও দেখা হয় মাঝে-মাঝে। জানা যেতে পারে অনেক কিছু। এখনই শুরু করা উচিত, নইলে পরে মনে থাকবে না। হয়তো সাহিত্য টাহিত্য কিছু হবে না, না লিখলে বাংলা সাহিত্যের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। তবু লিখতে ইচ্ছে করছে। উপন্যাস না লিখে নিবন্ধ গোছেরও কিছু লেখা যেতো হয়তো, কিন্তু ওতে কল্পনার কোনও সুযোগ নেই। চোখের সামনে দেখা দুলাল কি গায়ক হতে পারে না? কবিতা সিংহের পৌরুষ উপন্যাসের সখী সোনার চাইতে দুলালের নায়ক হবার গুণ কম কীসে?

কোথা থেকে শুরু করবে?

ছোটবেলাটা থাক।

কাঁচা আনাজের ব্যবসাটা ছেড়ে দিয়ে ফিতে-নেলপালিশ-কুমকুম, শায়ার দড়ির ফেরি করার কাজ থেকে শুরু করলে হয়। এই ইচ্ছেটা ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে, এবং সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলে যে দুলালকে নিয়ে লিখে ফেলবে কিছু একটা।

পরের সপ্তাহে বাড়িতে দু'দিন থেকে ফিরছে। রিজার্ভ করা নেই। সোমনাথকে খুঁজছে, ওর সঙ্গে কথা আছে। 'অবমানব'-এর পরের সংখ্যাটা যদি বেরিয়ে থাকে, নিয়ে নেবে। লেখার কিছু টিপ্‌সও চাইবে। ওকে পেয়ে গেল। অনিকেত দেখল, সোমনাথ জানালার ধারে একটা সিটে বসে মন দিয়ে একটা বই পড়ছে। অনিকেত উল্টোদিকে বসল। বইটার মলাট দেখল 'প্রাচীন ভারত, সমাজ ও সাহিত্য'। এখন কথা বলবে না। পড়ুক। ঠিকই দেখতে পাবে। পড়ছে বলে মুখটা বইয়ে ঢাকা। প্লাটফর্মের ছাউনি ছিটকে একটা ঝলকা রোদ্দুর ওর ঝোলা দুলে। মেয়েদের মুখে এক ধরনের আভা হয়। আভা, না বিভা? ছ'টা ফুচকা খাবার পর রুমালে হাত মুছলে মুখে একটা খুশির ছটা, ওটা একরকম বিভা, আবার ওরা প্রগাঢ় পাঠিকা হলে মুখটা অন্যরকম।

সোমনাথ ওর এমফিল-এ যে-গবেষণাটা করেছে, সেটার বিষয় আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। চেপে রাখা মেয়েদের জেগে ওঠা, ফুঁড়ে ওঠা। এই ধরনের বিষয় সাধারণত মেয়েরাই বেছে নেয়। ট্রেনটা ছাড়ার পর ও দেখতে পেল। এতক্ষণ মুখ ঢেকেছিল কঠিন বইয়ে। বেশ দেখাচ্ছে ওকে। ক্রমশ নারী হয়ে উঠছে ও। কথাবার্তা বলার সময় মহিলাদের মুখের দিকে, শরীরের দিকে বেশিক্ষণ না-তাকানোটাই শালীনতা। মাঝে-মাঝেই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার সময় এটা হয় না। অনিকেত যখন সোমনাথের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন কখনও জানালার বাইরের গাছ, মাঠ, ঝুপড়ি, কখনও ট্রেনের গায়ে লেখা ধূমপান নিষেধ দেখছিল। যদিও ও এখনও সোমনাথ-ই।

—নামটা পাল্টাবেন না আপনি? অনিকেত ঝপ করে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল।

—ও মা! আমাকে আবার 'আপনি' কবে থেকে।

আসলে অনিকেত একটু নার্ভাসই হয়ে গিয়েছিল। হয়তো কোনও অপরাধ বোধ থেকে। বক যখন যুধিষ্ঠিরের ক্যুইজ মাস্টার হয়ে প্রশ্ন করছিল, তখন একটা প্রশ্ন ছিল—ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে দ্রুতগামী কী? যুধিষ্ঠির সহি জবাব দিয়েছিল—মন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মন যে কোথায়-কোথায় যায়? সোমনাথের সুন্দর ভ্রু দেখে মনে হল, ওটা কি প্লাক করা? ও কি পার্লারে যায়? পরমুহূর্তেই আফ্রোদিতি। তারপরই রাজা ভঙ্গাসন। রাজা ভঙ্গাসন তো সরোবরে

ডুব দিয়েই পুরুষ থেকে নারী হয়ে গিয়েছিল মুহূর্ত মধ্যেই। কিন্তু এই যে ক্রমান্বয়, এই যে ক্রমশ, এই যে হয়ে ওঠা...। যারা সিলিকোন স্তন ইমপ্লান্ট করে, ওটা তো সত্যিকারের স্তন নয়, ওটার ক্ষেত্রেও কি ওদের সেই ব্রীড়া-ব্রীড়া ভাব থাকে?

—হ্যাঁ। নামটা পাল্টে মানবী করব। প্রচুর ঝামেলা। কোর্টে যেতে হবে, ভোটার কার্ড পাল্টাতে হবে, কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারির সার্টিফিকেট...।

—সুকুমারী ভট্টাচার্যের বইটা পড়া হচ্ছিল খুব মন দিয়ে?

—হ্যাঁ। দেখছিলাম। অনেকে বলেন না প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান খুব উঁচুতে ছিল, খুব মান-সম্মান পেত মেয়েরা, সুকুমারী ভট্টাচার্য পড়লে বোঝা যায়, ওগুলো কতটা ফাঁপা কথা। ফোলানো কথা। এই তো, এই জায়গাটা পড়ছিলাম, চাণক্য থেকে কোট করেছেন—আত্মানং সততং রক্ষেৎ। দারৈরপি ধনৈরপি। নিজেকে সবসময় রক্ষা করবে। প্রয়োজন হলে ধন কিংবা স্ত্রী'র বিনিময়ে। ঘুষ দিয়ে যদি কাজ সিদ্ধ না-হয়, স্ত্রী-কে দিয়ে দাও। পান্ডাবরাও দিয়েছিল। এদেশে ধর্ষণ হবে না তো কী হবে? যজ্ঞের প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, যজ্ঞ শেষে যজ্ঞীয় হবি-কে লাঠি দিয়ে মেরে যজ্ঞের অবশিষ্ট আগুন নেভাতে হবে। অগ্নি পত্নীবৎ। বলা হচ্ছে লাঠি দিয়ে নারীকে মেরে দুর্বল করা উচিত, যজ্ঞশেষের আগুনকেও। সন্তানসম্ভবা নারীর একটা অনুষ্ঠান করতে হত, পুংসবন। দেখবেন, পঞ্জিকায় আছে দশবিধ সংস্কারের তালিকায়, পুংসবন। চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, গর্ভাধান, তারপর পুংসবন। যার উদ্দেশ্য হল গর্ভের ভ্রূণটি যাতে পুরুষ হয়। অথচ দেখুন...।

'অথচ দেখুন'-এর পর অসম্পূর্ণ বাক্যে কী বলতে চাইছিল মানবী, কিংবা আধা-মানবী?—অথচ দেখুন কী বিপন্ন বিস্ময়, যে নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ অথবা জিনের, আমাকে অন্যরকম করে দিল। সকল লোকের মাঝে বসে আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা? আমার চোখেই শুরু ধাঁধা? আমার পথেই শুধু বাঁধা? —না, সোমনাথ আর কিছু বললনা।

একটা দীর্ঘশ্বাস মতো পড়ল সোমনাথের শরীর থেকে। ট্রেনের জানলা দিয়ে আসা ধানখেতের হাওয়ায় মিশে গেল।

ও বলল—অথচ দেখুন—আমার মা পরপর কন্যাসন্তানের জন্ম দিল। বউ হিসেবে ফেল। আত্মীয়রা দুয়ো দিচ্ছে। তারপর আমি জন্মালাম। আমার কাকিমা-জেঠিমারা আমার লিঙ্গ-পরিচয়ের জায়গাটা ঠিকঠাক করে দেখে নিয়েছিলেন—আমার মা পরিবারকে আবার ঠকালেন কি না। রেজাল্টে কোনও ভুল নেই তো?

বাবা শুনেছিলেন। বাবার মনে হয়েছিল যেন লটারির টিকিট জিতেছেন। শুনেছিলাম, বাবা একটা ইলিশ মাছ কিনে মামাবাড়ি গিয়েছিলেন পুত্রর মুখদর্শন করতে। বাঙাল বাড়িতে ইলিশ মাছ হল শুভ। বাবা বাঙাল, মা ঘটি ছিলেন। আমার আগে মা কয়েকটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন বলে বাঙাল বাড়ি ভাবত ওটা ঘটিদের 'দোষ'।

কিন্তু অনিকেতদা, আমি তো অন্যরকম হয়ে গেলাম। বাড়ির চাতালে কলকে ফুল তুলতে আসা রিফিউজি বীরুদার বুড়ি মা আমার কথা শুনে বলত, 'পোলা কেমন কথা কয়, এক্কারে মুগ্ধা মুগ্ধা' আমাদের পরিবারের ঠিকে-ঝি সেও বলত, ব্যাটাছেলে মাগিদের মতো করলে গা জ্বলে।

আমি, মাগিদের মতো কী করতাম? দু'টো কাঁটা আর উলের বল নিয়ে বোনার চেষ্টা

করতাম। পুতুলদের জামা পরাতাম। আমার বাবা-কাকারা ফুটবল হাতে ধরিয়ে বলত, যাও মাঠে। যেতামও। ছেলেগুলো আমায় চাটি মারত, ঠোকরাত। তাই যেতে চাইতাম না মাঠে। মাঠে না-গেলে গুরুজনরাও মারত। বাড়িতে বলত, এটা ঘটি-রক্তের প্রভাব। বাঙালরা নাকি খুব সাহসী হয়। চেঁচিয়ে কথা বলে। ঝগড়া-মারপিট করে। ঘটিরা মেনিমুখো। আরে বাবা নেতাজি, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী এঁরা সবাই তো ঘটি। ঘটিদের মধ্যে একটা চালু কথা আছে : 'মেয়ে ন্যাংড়া'। 'কুমড়ো কাটা বড়্ঠাকুর'—কথাটাও ঘটিদের মধ্যে। মেয়েদের নাকি কুমড়ো কাটতে নেই। ওইসব করার জন্য একটা ভাসুর ঠাকুর থাকত। গেরস্থালি কাজ করত। ওসব ঘটিদের সংসারে হত। সুতরাং বাঙাল বাড়ির বিশ্বাস আমার ওই স্বভাব মায়ের দিক থেকেই এসেছে, সুতরাং মা'কে গঞ্জনাও সইতে হত।

কিশোর হলাম। বড় তো হতেই হয় সবাইকে। রোগ গেল না। সাইকায়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যওয়া হল। উনি ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিলেন। তারপরই যখন অসুখের রুট পেয়ে গিয়েছেন ভেবে 'ইউরেকা' করে উঠলেন—বাড়িতে এতগুলো দিদি, হবেই তো। দিদিদের সাজগোজ করতে দেখে—

আমি বলেছিলাম, আপনি ভুল করছেন ডাক্তারবাবু। আমার দিদিরা কোনও দিন এতটুকু সাজে না। বিনুনি করা কি সাজা? একটু পাউডার মাখতেও দেখিনি। ওরা সারাদিন জল তোলে, ঘর ঝাঁটায়, চাল বাছে, আটা মাখে, সময় পেলে পড়ে, আর অনেকগুলো বোন হওয়ার বিড়ম্বনায় গুটিয়ে থাকে। ওদের জীবন আমি চাইনি। আমার জীবনে ওদের জীবনের ছাপ পড়েনি। ওরা সাজে না, আমি সাজি। প্রকৃতি সাজাতে ভালবাসে। গাছকে ফুল দিয়ে সাজায়, প্রজাপতির ডানাকে রঙে সাজায়, আমিও আমাকে সাজাই।

অনিকেত এর মধ্যে একটা প্রশ্ন জুড়ে দেয় দুম করে,

—আচ্ছা, যখন একসঙ্গে মা ভাইবোনদের খেতে দিত, তখন কি আলাদা কিছু খাতির পেতে, মনে করতে পারো?

সোমনাথ হাসলেন। বেশ কিন্তু দেখতে লাগল। হাসিতে সামান্য বিদ্রুপ ছিল যদিও। সেই বিদ্রুপ স্বাভাবিক মানুষদের উদ্দেশেই নিবেদিত।

ও বলল, খুব খাতির। ব্যাটাছেলে কিনা, আমার পাতে বড় মাছের টুকরো, একসঙ্গে খেতে বসেছি, মা খাওয়াচ্ছেন, থালায় আধলা ডিম। আমার মুখে যখন ভাত ঢুকছে, ডিমের কুসুম মেশানো, আর বোনদের মুখে মিছিমিছি ডিম। বোনেরা বুঝেও কিছু বলছে না। যখন মেয়ে-ন্যাংড়া বা বড়্ঠাকুর টাইপ হয়ে গেলাম, তখন দুচ্ছাই হয়ে গেলাম।

—কিন্তু আমি নিজেকে দুচ্ছাই মনে করতে রাজি নই অনিকেতদা। ও থামল।

অনিকেত এখন কোনও কথা বলতে পারছে না। ওর সম্পর্কে কথাও জিগ্যেস করতে পারছে না, যা ও শুধু নিজেই জানে। ওর শরীর সম্পর্কিত। ওর যৌনতা সম্পর্কও। সোমনাথের কমনীয়তার মধ্যেও লুকিয়ে থাকা প্রতিজ্ঞার ছটা দেখতে পেল।

অনিকেত জিগ্যেস করল—পিএইচডি-টা কত দূর?

ও বলল কাজ শুরু করে দিয়েছি তো। নবনীতাদি-র আশীর্বাদ আছে। আনন্দবাজার-এ তৃতীয় সত্তা চিহ্ন নিয়ে একটা লেখা লিখেছিলাম, নবনীতাদি ওটা দেখে বলেছিলেন এই বিষয়টা নিয়ে আরও কাজ করো। আশাপূর্ণার থিসিস-এর গাইড ছিলেন নবনীতা দেব সেন আর

শর্মিলা বসুদত্ত। শর্মিলাদি আর নেই। নবনীতাদি উসকে গেলেন—বললেন, এটা নিয়ে কাজ করো। কিন্তু গাইড পাচ্ছিলাম না। একজনের কাছে গেলাম, তিনি বড় অধ্যাপক। উনি বিষয়টা দেখেই নাক কুঁচকোলেন। আমি প্রথমে নাম দিয়েছিলাম 'বাংলা সাহিত্যে বৃহন্নলা'। উনি বললেন 'বৃহন্নলা' শব্দটার গা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে যে। উনি রাজি হলেন না। আমি দেখেছিলাম—তারাশংকর 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় নসুবালা সৃষ্টি করেছিলেন, সমরেশ বসুর 'বান্দা', সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ', কবিতা সিংহের 'পৌরুষ', নারায়ণ সান্যালের 'রূপমঞ্জরী', কমল চক্রবর্তীর 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ'। মানব চক্রবর্তীর 'সন্তাপ' এসব নিয়ে লিখব। এসব উপন্যাসের চরিত্রগুলো ঘেঁটে দেখব। গাইড পেলাম না। রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জির কাছে যাব। শুনেছি ওঁর শুচিবায়ু নেই। 'বৃহন্নলা' শব্দটার বদলে তৃতীয় সত্তা-চিহ্ন রাখতে বলেছেন আমার অন্য একজন স্যর বিমল মুখার্জি। দেখি কী হয়।

একটু থেমে বলল—কেন যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়—এত সব লিঙ্গ-চিহ্নে ভাগ করে যাই? কোনও মানুষের এই অংশটা এইটুকু এক্সটেন্ডেড, ওইটুকু কভার্ড, এটা বেরনো, ওটা লুকোনো, এইটুকু বর্তুলাকার, ওইটুকু দণ্ডাকার—এমনি করে চতুর্থ-পঞ্চম এরকম লিঙ্গচিহ্নও হতে পারে।

কিন্তু 'সোল' তো একটাই, বলুন...।

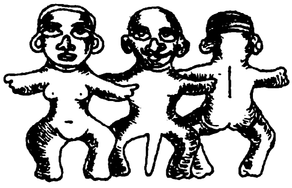

কীভাবে শুরু করা যায় দুলাল-উপাখ্যান? উত্তমপুরুষে লেখাই ভাল। "আমি দুলাল, সাইকেল চালাচ্ছিলাম, সাইকেলের হ্যান্ডেল থেকে ঝুলছে শেকলের মতো সেফ্‌টিপিন, ক্লিপ, টিপের প্যাকেট। পিছনের ক্যারিয়ারে বাক্‌সো রেখেছি কয়েকটা। তার মধ্যে ভাঁজ করা ব্রেসিয়ার। রডের দু'পাশে গেরস্থালি। রোদ্দুর লাগছে। মাথায় একটা টুপি থাকলে ভাল হত।' না, মাথায় টুপি পরার মতো স্মার্টনেস দুলালের নেই। রোদ্দুর লাগবে, তবু টুপি পরার কথা ভাববে না।

'গাঁয়ের ভিতরে চলে যাই সাইকেল নিয়ে। ঘন্টি মারি। যেসব বাড়ির উঠোনে বড়-বড় ধানের গোলা আছে, সেসব বাড়িতে আমার তেমন খদ্দের নেই। যেসব বাড়ির গোলা ছোট, কিংবা গোলা নেই, গোয়াল ছোট—ওরাই আমার খদ্দের। বড়লোকের বিটিরা আমার কাছ থেকে এসব 'কমা মাল' নেয় না।

কমা মালের মহাজন আছে, ওদের থেকে মাল নিই। লোশনের নাম 'লাইকমি'। সবুজ খাপে 'বোরোনীল'। এক নম্বর মালের নাম 'বোরোলিন'। কিন্তু 'বোরোনীল'-এর টিউব-টা কিন্তু 'বোরোলিন'-এর মতোই দেখতে। এগুলো সব নকল জিনিস। 'নকল' জিনিসেই লাভ বেশি।"

কলমটা কামড়ে রাখে অনিকেত। দুলাল কি নিজে বলবে, ওটা 'নকল' মাল? তা ছাড়া, ওইসব গাঁ-ঘরের বউ-ঝি'দের দেখে ওর পার্সোনালিটি 'স্প্লিট' করে এটা তো দুলাল জানে না, কীভাবে ওইসব গাঁয়ের বধূর সঙ্গে ওর 'সই'-সম্পর্ক হয়, তার ব্যাখ্যাও দুলাল দেবে না। অন্য

কেউ একজন তার ব্যাখ্যা দেবে। এভাবেই তো আখ্যান রচিত হয়। সেই বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই দেখা গিয়েছে লেখক অন্তর্যামী। রোহিণীর মনের কথাও জানেন, গোবিন্দলালেরও। কখনও অন্দর-মহলে ঢুকে যান, আবার দরজা বন্ধ করে কী গোপন ষড়যন্ত্র হল—বলে দেন সেটাও। লেখক হলেন ঈশ্বর। সর্বত্রগামী। সারা পৃথিবীই এটা মেনে নিয়েছে। সুতরাং উত্তমপুরুষে না-লিখে প্রথমপুরুষে লেখাই ভাল।

দুলাল 'ঘরগিরস্তি-সাজার জিনিস-ফিতে-কিলিপ-মাথার উকুন-ফরসা হওয়া-আ-আ' হেঁকে সাইকেলের ঘন্টি বাজায়। দু'টো জিনিসের খুব চাহিদা। মাথার উকুন মারার বিষ আর ফরসা হওয়ার ক্রিম। ওটার নাম 'ফেয়ার অ্যান্ড লাভিং'। 'ফেয়ার অ্যান্ড লাভ্‌লি'র মতোই টিউব-টার রং। বউগুলোর কাঁখে বাচ্চা। রান্নাঘর থেকে রান্নার গন্ধ আসছে। দুলাল জিগ্যেস করে, কচুর ফুল চচ্চড়ি করছ না কি গো দিদি?

—হ্যাঁ। ঠিক কয়েছ। খুব আনজাদ আছে দেখি তোমার...।

—আমি কচুর ফুলের চচ্চড়ি খুব খাই, রসুন বেশি করে দিতে হয়। আর কী রান্না হচ্চে দিদি?

—অই তো, একটা কুঁচে মাছ ধরে এনে থুয়ে দিয়ে মাঠে গেল খুকির বাপ। প্যাজ দে করব। তবে তেলের কী দাম। অ্যাইটুকু শিশিতে তেল এনি বলে—সাতদিন চালাতি হবে।

আঙুলে শিশির আকৃতি দেখায় ঘরের বউ।

দুলাল সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরেই কথা বলছিল। এবার উঠোনের একটা কাঁঠাল গাছে ঠেস দিয়ে রাখল।

বলো গো, কার কী লাগবে?

—টকঝাল নজেন আচে?

দুলাল দেখল, ওর পেট-টা বেশ ফুলেছে।

—ছোট খুকি বুঝি? বাপের বাড়ি এয়েচে? দুলাল অনেককেই চিনে গিয়েছে—ছোটর তো একুনো বে হয়নি। এটা মেজোটা।

দুলাল বোঝে, পোয়াতি মেয়ের টকঝাল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু ছোট সাইকেলটায় এত আইটেম রাখবে কী করে?

ঠিক আছে, এইভাবেই লেখা যাবে। ছাপানোর কথা ভাবছেই না। দুলালের নিরুদ্দিষ্ট জীবনের দশ বছর। আজই শুরু করা উচিত। আর দেরি নয়।

ট্রেনে যেতে-যেতে এই সব ভাবছিল অনিকেত। আজ সোমনাথকে দেখতে পায়নি। একা-একা এসব ভাবতে-ভাবতে যাচ্ছিল। কাশফুল ফুটেছে ইতি-উতি। বর্ষা শেষে বসুন্ধরা সাত মাসের পোয়াতির মতো।

এখন জাহানাবাদি নেই। চলে গিয়েছেন। আগামী কাল বিকেলে মেরিলিন লাকড়া আসবেন। লাকড়া ম্যাডাম বাড়িতে থাকলে একটু অসুবিধেই হয়, কিন্তু কী করা যাবে, কাজ চালাতে গেলে রাখতেই হবে। অন্য লোক তো পাওয়া যাচ্ছে না। ম্যাডাম এলে রান্নাঘরটা ছেড়ে দিতে হয়। উনি ওঁর মতো রান্না করেন। ওর নাকি নানারকম রোগব্যাধি আছে। প্রেশার আছে, গ্যাস-অম্বল আছে, হাল্কা-হাল্কা স্যুপ খান। গলা-ভাত খান। বাইরে আর একটা প্লাগ পয়েন্ট আছে, ওটা ব্যবহার করে অনিকেত। ওখানে হিটারে প্রেশার কুকারটা চাপিয়ে

কোনওরকমে চাল-ডাল সেদ্ধ করে নিতে হয়। কিছু সবজি দেওয়া যায়। রাত্তিরে রুটি আর সবজি আনিয়ে নেয়। কখনও-কখনও এক কিলোমিটার দূরের একটি হোটেলে গিয়েও রুটি চিবিয়ে আসে। রাত্রের নির্জন পথ মন্দ লাগে না। কখনও শেয়ালের ডাকও শোনা যায়, কিছু-কিছু রাতের পাখির ডাকও। ওসব পাখিদের নাম জানে না। মাথার ওপর জেগে থাকে তারাভরা আকাশ। কলকাতার আকাশে ভাবাই যায় না, এত তারা জ্বলে আকাশে।

যখন অফিসের কাজ চালানোর জন্য হন্যে হয়ে রিটায়ার্ড অফিসার খুঁজছিল অনিকেত, তখন রাঁচির স্টেশন ডিরেক্টর তিন-চারজনের নাম বলেছিলেন। ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত এই দু'জনকে পাওয়া গিয়েছে।

মেরিলিন নামটা শুনেই মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল অনিকেতের। মেরিলিন মনরো-কে নিয়ে। তবে অনিকেতদের কৈশোর-যৌবনে প্রচুর স্বপ্নদাত্রী মুম্বই নায়িকারা এসে গিয়েছিলেন বলে স্বপ্ন অতটা দূরগামী হয়নি। ম্যাডামের সঙ্গে প্রথম দেখা; বড় আশাহত করেছিল অনিকেত-কে। নাকের ওপর দিকটা প্রায় নেই। বাংলায় এঁদের বোঁচা নাক বলে। চোখ ছোট। ঠোঁট পুরু। রং কালো। ইনি ওরাওঁ। 'লাকড়া' মানে নেকড়ে। ওরাওঁ-দের অনেক গোত্র হয় পশুপাখির নামে।

জানালেন, ওঁর একটি মেয়ের এমন একটা অসুখ যে মাসে-মাসে অনেক খরচ হয়। স্বামী মারা গিয়েছেন। ছেলেটা পুনে-তে পড়াশোনা করে। ওঁর আর একটি বিধবা বোন আছে। মিশনারি ছিল। নান। চরিত্র ঠিক রাখতে পারেনি বলে চার্চ থেকে বিতাড়িত।

—বিতাড়িত কেন? যিশু ক্ষমা করলেন না?

—কতবার ক্ষমা করবেন যিশু? ম্যাডাম বলেছিলেন। সেই সুকুমারী বোনটিও এখন ওঁর আশ্রিতা। টিউশনি করে। বিহার ইংরেজিতে বেশ উইক। ওঁর বোন ইংরেজির টিউশন করে। যা আয় করে, সেই অনুপাতে টাকা সংসারে দেয় না। নিজের ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখে। আর এদিকে, লাকড়া ম্যাডামের সর্বদা টেনশন, হাই প্রেশার। পেনশন-এর টাকায় সংসার চলে না। তাই এখানে আসা। ক'টাই বা টাকা, তবু এই টাকায় ওষুধের খরচটা যদি উঠে যায়....।

ম্যাডাম প্রথম দিন এসে সব জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। অনিকেতের বাড়িতে কে আছে, স্ত্রী চাকরি করে কি না, স্ত্রী কেন এখানে থাকল না ইত্যাদি।

তারপর সহানুভূতিশীল হয়ে বলেছিলেন—আমি যখন এখানে থাকব, যদি স্পেশাল কিছু রান্না করি, আপনাকে বলব। আপনি সেদিন রান্না করবেন না।

—'স্পেশাল' মানে?

—চিকেন, ফিশ, রুগড়া...।

—রুগড়া-টা কী?

—ও গড, রুগড়া ঈশ্বরের একটা ওয়ান্ডারফুল সৃষ্টি। এটা হয় জঙ্গলে। যে-মাটিতে লোহা থাকে, সেখানে যদি শালপাতা পড়ে, সেই শালপাতা পচে মাটিতে মিশে গেলে, সেখানে এক ধরনের মাশরুম হয়। মাটির তলায় থাকে। দেখতে অনেকটা ছোট-ছোট আলুর মতো। কোথায় রুগড়া আছে, সেটা অভিজ্ঞ ট্রাইবাল-রা বোঝে। মাটি খুঁড়ে বার করে। অপূর্ব স্বাদ। বর্ষার পরই পাওয়া যায়। এই সময়টাতেই পাওয়া যাবে। একবার হাটে গিয়ে দেখব। তোমাকে রুগড়া খাওয়াব।

পরদিনই ম্যাডাম বলেছিলেন, সকালে চিকেন এনেছি, রাতে তুমি হোটেলে খেয়ো না, শুধু রুটি আনিয়ে নিও, চিকেন দিয়ে রুটি খেয়ো। রাত্তিরে চিকেন সাজিয়ে দিয়েছিলেন ম্যাডাম।

অনিকেত খেতে পারল না। মাংসটার ঝোলে জবাকুসুম তেলের গন্ধ।

জবাকুসুম তেল মাখতেন অনিকেতের মা। এই গন্ধটা খুব পরিচিত।

অনিকেত জিগ্যেস করেছিল, কী তেলে রান্না করেছেন ম্যাডাম?

—কেন? সাদা তেল। সানফ্লাওয়ার। আমার একটু হার্টের প্রবলেম আছে। সানফ্লাওয়ার ছাড়া কিছু খাই না।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল না—মাংসের ঝোলে কী করে জবাকুসুম তেলের গন্ধ এল? ভুল হওয়ার কথা নয়। জবাকুসুম তেলের রংটা লাল, শিশিও আলাদা।

ব্যাপারটা পরে বোঝা গিয়েছিল। ম্যাডামের একটা অভ্যেস আছে, কিছুক্ষণ পরপরই একটা শিশি থেকে কিছুটা তেল হাতের তালুতে নিয়ে মাথায় থুপে দেন। তেলটার নাম শিরশান্তি। হিন্দিতে লেখা। তেলটার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করাতে—ম্যাডাম বলেছিলেন—এটা একটা আয়ুর্বেদিক তেল। অনেক শক্তিশালী জড়িবুটি আছে। মাথা ঠান্ডা রাখে, প্রেশার কন্ট্রোল করে।

বোঝা গেল, ম্যাডাম ওই জড়িবুটিওলা 'শিরশান্তি' মাথায় লাগিয়ে, সেই হাতেই মুরগির টুকরোগুলোতে নুন-হলুদ মাখিয়েছিলেন। শক্তিশালী জড়িবুটির গন্ধ ধারণ করেছিল মুরগির বেচারা টুকরোগুলো।

এরপর থেকে আর 'স্পেশাল আইটেম' খায়নি অনিকেত।

অনিকেত টাটানগরে নেমে একটা শেয়ার ট্যাক্সি পেয়ে গেল। অন্যসময় বাসে যায়। ট্যাক্সিতে অনেক আগেই পৌঁছে গেল। সোমবার। আজ থেকেই লেখাটা শুরু করে দেবে। কোয়ার্টারের দরজায় বাইরের তালাটা নেই। তার মানে, ভিতরে কেউ আছে। তালাটার তিনটে চাবি আছে। একটা নিজের কাছে, একটা জাহানাবাদি-র কাছে, আর একটা মেরিলিন ম্যাডামের কাছে থাকে। দরজাটায় ধাক্কা দিল। ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। খুলে যেতেই এক আশ্চর্য, অভাবনীয়, অদৃষ্টপূর্ব, নয়ন-বিদারী, দৃশ্য! অচিন্ত্যনীয়-ও বলা যায়।

একই সঙ্গে সাংঘাতিক এবং ভয়ঙ্কর। যৌনদৃশ্য অথচ যৌনতা উপশমকারী।

ডাইনিং স্পেসে একটা জানালা দিয়ে বাইরের রোদ্দুর আসে।

সেই শারদ রোদ্দুরে, একটা জলচৌকির ওপর বসে, মেরিলিন ম্যাডাম গায়ে কুটোটি না-রেখে, আয়ুর্বেদিক তেল মালিশ করছেন। অনিকেত যখন দরজাটা খুলেছিল, ঠিক সেই সময় উনি উরু অঞ্চলে তেল মালিশ করছিলেন। অনিকেত কী করবে, বুঝতে পারে না। দরজাটা জোর ধাক্কায় অনেকখানি ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। শৈশবে একটি ক্যালেন্ডারের খোপে-খোপে নরকের বিভিন্ন দৃশ্য দেখেছিল। ওরকম কোনও দৃশ্য যেন।

ওই সময় কী করা উচিত? তক্ষুনি উল্টো দিকে মুখ করে চলে যাওয়া? তা হলে তো দরজাটা খোলাই থেকে যাবে। খোলা দরজাটা বন্ধ করতে গেলে আবার কিছুটা সময় যাবে। 'সময়' মানে হয়তো তিন সেকেন্ড। কিন্তু এখানে, এই পরিস্থিতিতে, সময়ের হিসেব হয় মাইক্রো-সেকেন্ডে। করণীয় কী, সেই সিদ্ধান্ত নিতেও চলে গেল কয়েক মাইক্রো-সেকেন্ড।

দরজাটা পুনরায় বন্ধ করে দেওয়াটাই ঠিক মনে হল। বন্ধ করতে গেল। ইতিমধ্যে মেরিলিন মনরো হাত দু'টোকে ডুমুর পাতা করে ঘরের দিকে চলে গেলেন। বলা ভাল, চলে যেতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিঞ্চিৎ ঘুরিয়ে। অনিকেত দরজাটা বন্ধ করে রাস্তায় নেমে গেল ফের। গেটের সামনে দাঁড়ানো লোকটা জিগ্যেস করল, কী হল? এই গেলেন, এই ফিরে এলেন? চাবি নেই না কি?

অনিকেত বলল, সিগারেট কিনব। ছিল না একটাও।

সিগারেট কিনতে গেলেও মিনিট দশেক হাঁটতে হয়।

মেরিলিনের তো আজ আসার কথা ছিল না, ওর তো আগামী কাল আসার কথা। একদিন আগে চলে এলেন কেন? ঘরে তেল মাখছেন মাখুন। ছিটকিনিটা দেবেন তো। আজকে তো অনিকেত আসবে, এবং এই ট্রেনেই আসবে—সেটা জানা ছিল।

তবে?

কিন্তু যা দেখল, নারীরূপ সম্পর্কে সমস্ত মোহ ভেঙে গেল এই কয়েক মাইক্রো-সেকেন্ডে।

বুদ্ধদেব, মানে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, কি এরকমই কিছু দেখে ফেলেছিলেন সংসার-ত্যাগের প্রাক্কালে? এরই জন্য কত যুদ্ধ, রক্তপাত, হেলেন, ক্লিওপেট্রা, হেমা মালিনী, মাধুরী দীক্ষিত, শুক্লা, মঞ্জু—সবাইকে এই সুযোগে এক সারিতে বসিয়ে দেওয়া গেল।

কালীপুজোয় কালীমূর্তির পাশে ডাকিনী-যোগিনী থাকে। শিল্পীরা কত চেষ্টা করেন মূর্তি দু'টোকে যতটা পারে কুৎসিত তৈরি করতে। গালটা ভেঙে দেয়, দাঁত ভেঙে দেয়, চোখ গোল-গোল করে, স্তন দু'টো ঝুলিয়ে দেয়, চামড়া কুঁচকে দেয়...। মহিলাদের চামড়ার নাম 'ত্বক'। ত্বক ঢিলা হলে 'চামড়া'। নারীর শরীর আঁটো, যখনই তা ঢিলা, সংজ্ঞা পাল্টে তিনি হলেন 'মহিলা'। মহিলাদের এই করুণ অবস্থা হয় চামড়া কুঁচকোলে, স্তন অতি ঢিলা হলে, দাঁত পড়ে গেলে... ইশ্‌শ, কী সব হয়।

মোহমুদ্গর হয়ে গেল যেন। মনের সব কলুষ ধুয়ে গেল যেন। এই তো নারীশরীর। এর জন্য এত কামড়াকামড়ি, মারামারি, হানাহানি? সাধে কি কামিনীকাঞ্চন সম্পর্কে বিতৃষ্ণ ছিলেন মহাপুরুষগণ?

পৃথিবীর নিয়মই এই। যতদিন সন্তান ধারণ করতে পারে নারী, ততদিনই জীবন। কত ছোট গাছ একবার ফল দিয়েই মরে যায়। কত বড় গাছ আছে, যখন ফল ফলে না, শুকিয়ে মরে যায়। জীবজন্তুরাও তাই। শুধু মানুষই যেন ব্যতিক্রম। মেয়েমানুষদের উর্বরতা শেষ হয়ে যায় পঞ্চাশের পর। এরপরেও বাঁচে। কিন্তু পুরুষের উর্বরতা থেকে যায় আরও বেশ কিছুকাল। কামনাও। তবে পঞ্চাশোর্ধ্ব উর্বর পুরুষ-সমাজের জন্য প্রকৃতির বিধান কী? অন্য কোনও কামশীলা? এসব গূঢ়, গূঢ়তর প্রশ্ন। কিন্তু কোনটা কেন সুন্দর এর জবাব কে দেবে? কেন সবুজ সুন্দর, ঊষর সুন্দর নয়? কেন ফড়িং সুন্দর, আরশোলা সুন্দর নয়? কেন টাইট সুন্দর, লুজ অসুন্দর, উন্নত-স্তনা সুন্দর, কুঞ্চিত-স্কিনা অসুন্দর। তার মানে যতক্ষণ যা কিছু উর্বর, ততক্ষণই তা সুন্দর। কাদের চোখে? উর্বর-কুকুরের চোখে অনুর্বর-কুকুরী অসুন্দর। উর্বর পুরুষ-মানুষের চোখে অনুর্বর-মেয়েমানুষ অসুন্দর। উর্বর-মদ্দা তালগাছটির চোখে অনুর্বর মাদি তালগাছটি...।

কুকুরটুকুরও কি চামড়ার কুঞ্চনে, শিথিলতায়, রোম উঠে যাওয়ায় সৌন্দর্য বিচার করে? না কি ওদের যাবতীয় আকর্ষণ ফেরোমোন-এর? শরীর-নির্গত গন্ধে? শরীর উর্বর হলে একটা গন্ধ বেরয়...

এসব উল্টোপাল্টা ভাবা মানে সময় পার করা। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, কখন শুনতে পাবে—'প্লিজ কাম ইন ব্যানার্জি', কিন্তু কিছু বলছেন না। ম্যাডাম লজ্জা পেয়েছেন।

আরও কিছুক্ষণ আকাশ-গাছ-পাখি-পাউরুটির ঠোঙা-মরা-আরশোলা দেখে টেখে দরজায় টোকা মারল। কয়েকবার টোকা মারার পর ম্যাডাম কণ্ঠে শুনল—ইয়েস, ডোর ইজ ওপেন...। অনিকেত ঢুকল।

ম্যাডাম ম্যাক্সি-ট্যাক্সি পরে নিয়েছেন। অনিকেত বলল, সরি।

ম্যাডাম বলল, হোয়াই ইউ, আই অ্যাম সরি। বলার সময় ম্যাডাম কেমন মাথা নিচু করলেন? নতুন বউয়ের গলায় দাগ দেখে বড়-জা যেমন বলে, 'আঁচলে গলা ঢেকে রাখ, দাগ পড়েছে' এবং সেটা শুনে নতুন বউ যেভাবে মাথা নিচু করে সরমে—সেরকম ভাব কতকটা।

ম্যাডাম ম্যাক্সি খুঁটছেন। কী করবেন, আঁচল নেই তো—আঙুলে জড়াবেন কী?

ম্যাডাম আবার বললেন—আগামী কাল সাউথ বিহারে বন্‌ধ ডাকা হয়েছে। তাই আপনার তকলিফ হবে ভেবে আজই চলে এসেছি। এখন তো ঝাড়খণ্ডের দাবিতে হঠাৎ-হঠাৎ বন্‌ধ হচ্ছে।

অনিকেত বলল, ভালই করেছেন। তবে ছিটকিনিটা লাগাবেন তো...

ম্যাডাম বললেন, কী করব বলুন, দু'হাতেই ফ্রোজেন সোলডার। হাত ওঠাতে পারি না।

যাক কে যাক। শুভ কর্মানুষ্ঠানের আগে দধি, ধেনু, মধু এসব দেখার বিধান আছে। এই লোল, কুঞ্চিত, নিরাবরণা নিরাভরণাকে দেখে মোহমুদ্‌গরিত হয়ে লেখাটা শুরু করা যাক। অফিসে যাওয়ার আগে, ক'টা লাইন অন্তত লিখে যাবে।

দুলাল সাইকেলে যাচ্ছে। রাস্তায় পিচ কবে কখনও পড়েছিল। এখন স্মৃতি। এবড়োখেবড়ো রাস্তা। কাছেই গ্রাম। গ্রাম যে কাছেই, তার প্রমাণ হল রাস্তার ধারের মোটা গাছের গায়ে আলকাতরায় লেখা 'গদাধর মল্লিককে ভোট দিন।' আর একটু এগিয়ে রাস্তাটায় বাঁক নিতে গিয়ে দেখল, একটু দূরে একদল মেয়ে। রাস্তায় একটা মেয়ে বসে আছে, হাত দু'টো একটু পিছনে দিয়ে শাড়ি উঠিয়ে বসে আছে। নিশ্চয়ই হিসি করছে। ও সাইকেলটা থামাল। হিসিরত কোনও মহিলার পাশ দিয়ে সাইকেলে চড়ে যাওয়াটা উচিত নয়। একটু পরই মেয়েটা উঠে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে হাততালি দিল। এই শব্দটা দুলালের কাছেও এল। শব্দটা তো 'ঠিকরি'-র মতো। হিজড়েদের তালির শব্দ। দুলালও চেষ্টা করেছে ওরকম শব্দে তালি দিতে। এমনিই। দেখেছে, ও পারে কি না। অনেকটাই পারে। কিন্তু ওদের মতো 'ঠিকরি' দেয় না। নিজেকে ওদের সঙ্গে একাত্ম করতে চায় না। তবু একা থাকলে, তালি দিয়ে মেপে নিয়েছে ওদের মতো হয় কি না।

সামনে যারা যাচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে : ওরা কারা। হাঁটা দেখেই বোঝা যায়। ওদের সঙ্গে এর আগেও কয়েকবার কথা হয়েছে বাজারে। সবজি-মাংতি করতে আসা ওদের ক'জনের সঙ্গে

গল্পগাছাও হয়েছিল। ওখানেই প্রথম 'নুনে নুন' শব্দটা শোনে। এর মানে হল, 'তুমি আমাদেরই লোক।'

জিগ্যেস করেছিল, ঘরে বউমাগ আছে কি না, ছানা-পোনা আছে কি না। জিগ্যেস করেছিল, বসে মোতো, না দাঁড়িয়ে? দুলাল লাজুক হেসে বলেছিল, দাঁড়িয়ে।

আসলে ওরা বাচ্চা নাচাতে এসেছিল এদিকে। ফেরার সময় হাতের কাছে একটা বাজার পেয়ে কিছু বিনি-মাগনার বাজার নিয়ে যাচ্ছে।

ওদের দেখে বেশ লাগত।

ওদের কখনও মুখ-ব্যাজার দেখেনি। হাসছে, লাফাচ্ছে, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছে, কচুরি-জিলিপি খাচ্ছে। ওদের তো সুখ-দুঃখের কথা বলার সঙ্গী আছে। দুলালের কেউ নেই। কার সঙ্গে বলবে? বউয়ের সঙ্গে কি বউয়ের বিরুদ্ধে কথা বলা যায়? এক আছে বদু। বদরুদ্দিন মণ্ডল। বদু যখন দুলালের কথা শুনতে-শুনতে দুলালকে কাছে টেনে নেয়, দুলালের ভাল লাগে। ওকে সঙ্গী মনে হয়। দুলালের কাঁধে হাত রাখলেও, ভাল লাগে। মনে হয়, বদু-র সঙ্গে একসঙ্গে থেকে যায়।

চাইলেই হবে? বদু মোসোলমান। বদুর বউ আছে। বদুর সঙ্গে দুলালের যা হয়, বদু ভাবে, এসব ঠিক নয়। গুনাহ হচ্ছে। অনেকরকম নেকি-র কাজ করে, পুণ্য করে—এসব মেকআপ করতে হবে। বিয়ের পরপরই বদু বেশি করে এসব বলত, কিন্তু ওর বিয়ের আগে তো বলেনি।

দুলাল জানত, ওরা মেয়েছেলে নয়। কিন্তু অনেক আগে জানত, ভগবান ওদের মেয়ে করতে-করতেও পুরো মেয়ে করেনি। কিন্তু অনেক বড় হয়ে জেনেছিল—কাপড়-চোপড় খুলে দিলে ওদের দেখে ব্যাটাছেলেই মনে হবে।

আস্তে-আস্তে সাইকেল চালাচ্ছে দুলাল। খানাখন্দে সাইকেলের চাকা লাফাচ্ছে। ঝুমুর-ঝুম শব্দ হচ্ছে। ক্যারিয়ারে বসানো টিনের বাক্সটা থেকে কাচের চুরির শব্দ, সেফ্‌টিপিনগুলোর সমবেত শব্দ, মাথার চুলের ক্লিপ ও কাঁটার শব্দ মিলে গিয়ে ঝুমুর-ঝুম শব্দে মেয়েলি আহ্লাদ। ওরই মধ্যে মিশে আছে না-গাওয়া গান।

অনিকেত লিখছে। কবে কোন বাঁকুড়ার গ্রামে 'জেলা প্রোগ্রাম' রেকর্ড করতে গিয়ে শোনা একটা গানের কথা মনে এল—

আমায় তুমি দাও গো কিনে
রুপো বাঁধানো চিরুনি
বউবাজারের মটরমালা
লালবাজারের হারমনি
হারমনি না দিলে পরে
বাপ ঘর যাব এখুনি
বাপের ঘরে গেলে পরে
কে মিটাবে জ্বলুনি?

ওই গানটাকে বেশ লাগিয়ে দিল অনিকেত। লিখল, ওই টিনের বাক্সের ভিতরে না-গাওয়া ওই সব গান। তারপর গানটাকে 'ফিট' করে দিল।

—হ্যাগো, ও মিনসে, ড্যাঁড়াও দেখি, কী রয়েছে সাইকিলে?

ওদের একজন হাত-ঝামটা দিয়ে বলল।

সাইকেল থামিয়ে, দুই হ্যান্ডেলে হাত দিয়ে দাঁড় করাল।

একজন দুলালের মুখের দিকে তাকাল। বলল, চেনা মুখখানা লাগচে? তুমি সেই বেগুনটা না?

আর একজন বলল, মুলোটা।

ওদের একজনের নাম 'হাসি'।

দুলালের সঙ্গে তো ওরই গল্প হয়েছিল আগে।

দুলাল বলল, হ্যাগো দিদি, বেগুন-টেগুন। ছেড়ে দিইচি।

—কেন গা? বেগুন টিপে-টিপে কি হাতে কড়া পড়ে গেল নাকি?

—না গো। যেন লজ্জা পেল দুলাল।

কী বলবে বুঝতে না-পেরে বলল—বেগুন তো পোকা।

—বারে বোকা ধুরি। তোমার বউয়ের পেটেও তো গু।

নার্ভাস দুলাল বলল, ওই জন্যই তো...।

—ওই জন্যই তো কী?

—যাই না।

—নাঙা বাবা হয়ে গঙ্গাসাগর যা-না তবে।

একটু ফিক করে হাসল দুলাল।

হাসি বলল, এই যে দ্যাখো, আমার বডি-টা ভাল করে দ্যাকো। নীল শাড়ি পরিচি, বেগনে বেলাউজ। কপালের ওরম ম্যাচ করা টিপ বার কর দেখি, অনেকরকম টিপের পাতা তো রেকেচো। আর চুড়ি আচে?

—আচে, আচে।

—কাচের না পেলাস্টিক?

—কাচ-প্লাস্টিক সবরকম।

—তারপর কাচের চুড়ি দিও। নিজে হাতে পরিয়ে দিও, ক্যামোন?

দুলাল বলে, থালে তো পশরা সাজাতে হয়। সামনের গাছ তলে চল।

সামনে ছিল একটা শিরীষ গাছ। গ্রাম্য রাস্তায় এই ধরনের বড় গাছ খুব একটা থাকে না আজকাল। চুরি হয়ে যায়। ওই গাছটার গায়ে অনেক টিনের পাতে অনেক কিছু লেখা। খান জাহান পিরের খাদেম আসিফ আলির আশ্চর্য মাদুলি, গোবৈদ্য তারিণী মণ্ডল। মানুষের চিকিৎসাও করা হয়। ব্যাংক লোন, কৃষি লোন, বৃদ্ধ ভাতা ইত্যাদি কাজ করিয়া থাকি।

ওখানে জড়ো হল।

—এই যে চুড়ি।

—এই যে টিপ।

—এই যে সোনো।

হাসি বলল, নীল চুড়ি হাতে পরিয়ে দাও। ও উবু হয়ে বসেছে। মাটিতে লেপ্টে বসেনি। একটা হাত বাড়িয়ে দেয় হাসি দুলালের দিকে।

দুলাল হাতটা চেপে ধরে।

দুলালের হাতের ভাষা কি পড়তে পারল হাসি?

হাসি, ওর আর একটা হাত দিয়ে দুলালের কাঁধে দু'বার আঙুলের চাপ দিল। এবং আঙুলগুলো নাড়াল, এবং ওই আঙুলের খেলায় দুলালের গায়ে তবলার বোল বেজে উঠল। আমিও আছি তুমিও আছো। তোমার জন্য আমি তো আছি।

চুড়ি হল। টিপ হল। ছোট্ট আয়নাটা বের করে দিল দুলাল।

হাসি খুশি হল।

আর খুশি হল বলেই যেন জিভ-টা বের করে দু'বার নাচিয়ে একটা শব্দ করল—ই-ই-ই-ই।

বুঝল খুশি হয়েছে।

একজন বলল, দ্যাখ না, ওয়াড়টার পিছনের হুক খুলে পড়ে গিয়েছে। হুক আছে। সেলাই করে দিতে পারবি।

দুলাল মাথা নাড়ায়।

—তবে সেপটিনি লাগিয়ে দে।

দুলাল বলে, একটা খুচরো সেপটিনি বিক্কির করি না। একপাতা নিতে হবে।

—একপাতা নিয়ে কী করব? দু'টো দিয়ে নাক, দু'টো দিয়ে চোখ, আর একটা দিয়ে নাক আটকাব না কি?

দুলাল বলে, ঠিক আছে, একটা দিচ্ছি, পয়সা লাগবে না।

ও বলল, তবে লাগিয়ে দাও—আমার পেছনে কি চোখ আছে? দুলালের সামনে পিছন ফিরে দাঁড়ায়।

দুলাল দ্যাখে, ব্লাউজের একটা হুক ছেঁড়া। ফাঁক হয়ে আছে। ঘামে-ভেজা ব্লাউজ। ভিতরের সাদা ফিতে দেখা যাচ্ছে। ও সেপ্‌টিপিন-টা দিয়ে আটকে দেয়। কায়দা করে সেপ্‌টিপিন-টা এমনভাবে লাগায় যেন বাইরে থেকে বোঝা না যায়। ও পিছনে হাত চালিয়ে সেফটিপিনের অবস্থানটা দেখে খুশি হয়ে দুলালের থুতনি নাড়িয়ে দেয়।

আর কী-কী আছে দেখি?

ডালা খুলে দেয় দুলাল। ওরা টাকা দিল। পঁচিশ টাকার বিক্রি হয়ে গেল ওখানে বসেই।

তারপর ওরা ওঠে। দুলালও ওদের সঙ্গে-সঙ্গে যায়। সাইকেলে বসে না। হাঁটিয়ে নেয়।

একজন জিগ্যেস করে, তোমার নাম কী গো?

দুলাল নাম বলে।

—ও বলে আমার নাম, চাত্তারা।

অন্য একজন শুধরে দেয়। চাঁদতারা।

চাত্তারা বলে, তুমি কোতি?

'কোতি' মানেটা ঠিকঠাক জানে না দুলাল, আন্দাজ করতে পারে। কথাটা শুনেছে আগে এক নাপিতের কাছে। মেয়েদের হাবভাব-সম্পন্ন ব্যাটাছেলে বোঝাচ্ছে। দুলাল মাথা নাড়ায়। চাঁদতারা বলে, নিজেকে 'কড়ি' করে রাখো কেন গা?

মানে না-বুঝে তাকায়।

একজন বলে—নুইকে রাখো তুমি। নিজেকে নুইকে রাখো।

মনে সুখ আছে? একজন দুলালকে জিগ্যেস করে।

চাত্তারা বলে, সুখ কী লো? কাকে বলে সুখ? সুখ হল গে মুরগির কচিকচি ছ্যানা। মায়ের শরীলের ওম-এ ওদের জম্মো। পায়ের পাশে-পাশে গুটি-গুটি সুখ হাঁটে। সুখের মালিক উল্টো করে সাইকেলে ঝুলিয়ে হাটে গিয়ে বেচে আসে। সুখের মাংস খেয়ে তখন অন্যের সুখ হয়।

দুলাল বলে, তবে কি এ দুনিয়ায় সুখ নেই?

একজন বলল, সুখ স্বপনে শান্তি শ্মশানে।

একজন বলল, সুখ মাইরি, আজব চিজ। আচে বললে আচে, নেই বললে নেই। একজন গেয়ে উঠল—সুখ পুকুরে নাইতে গেলাম, নেয়ে এয়েচি। কত ডুব দিলাম তবু বডি ভেজেনি। সবাই 'ঠিকরি' দিয়ে উঠল।

ওদের মনে কত আনন্দ। দুলাল ভাবে। ওরা কতটা হাঁটছে, একসঙ্গে। গল্প করে। একসঙ্গেই খায়। যদি কাঁদে, একসঙ্গেই। দশে মিলি করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ।

কোথায় থাকো তোমরা? দুলাল জিগ্যেস করে।

হাসি বলে, আমাদের পারমেন খোল অনেক দূর। পানাগড়। বড় গুরুমা-র একটা বড় 'চেলি' থাকে কসবায়। আমরা এখন ওখান থেকে 'ছল্লা' করছি।

টেম্পোরালি ঠেক-কে বলে 'আটপুর'। এখন কসবার আটপুরে-তে আছে।

যেতে-যেতে কত কথা হল। ওর বউয়ের কথা হল। সন্তোষ মহাজন ওর বউয়ের কাছে আসে, সেই দুঃখের কথা জানাল। ওর যে দু-একটা পারিক আছে, সেটাও গোপন করল না।

চাত্তারা বলল—আমাদের সঙ্গে ঠিপে যা। সবার কথাই ভাব। দ্যাক্‌না, তোর চিপ্‌টিধারী বউ যদি কোনও আকখাট মদ্দর সঙ্গে ধুরপিট্টি চায়, তাতে তুই কেন কাঁটা হবি? ওকে ওর মতো চলতে দে, তুই তোর মতো চল। ভিড়ে যা এখানে। একই তো কতা। এখনও ঘুরচিস, পরেও ঘুরবি। সবার আগে পেট। পেটের তলা সেকেন—থার্ড। আমরা কিন্তু হেবি মস্তিতে থাকি। ছল্লায় যাই, ছমকাই, ছেমো-ছেনালি করি। বিলকুল ছক্কা লাইফ।

দুলালের বাড়িতে দুলাল যা বলেছিল, পুরোটা বসিয়ে দিল অনিকেত। এবার একটা গান বসিয়ে দিলে ভাল হয়। একটা জুতসই গান ভাবতে থাকে অনিকেত।

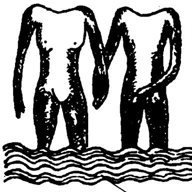

দুলাল সাইকেলটাকে হাঁটিয়ে ওদের সঙ্গে-সঙ্গে গেল। গ্রামটা আসতেই ওদের তালি বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে কয়েকজনের নাম জানতে পেরেছে দুলাল। হাসি, চাত্তারা, ফুলি, চামেলি। ওদের আসল নাম জানতে চাইল দুলাল। চাত্তারা বলল, সন্ন্যেসীরা কি ওদের পূর্বাশ্রমের নাম বলে?

এই লাইনটা লিখেই অনিকেত কেটে দিল। ওদের মুখে ‘পূর্বাশ্রম’ শব্দটা মানায় না। এবার লিখল, ফেলে আসা জেবনের নাম-ধাম-কাম জানতে চেও না বাপু।

ফুলির গলায় ঢোল ঝুলছে, চাত্তারা-র কাঁধে একটা ব্যাগ। ব্যাগের ভিতর থেকে ঠুনঠুন শব্দ হচ্ছে। ওখানে কত্তাল আছে। একজন বলল, কাচ্চাবাচ্চার আকাল। এখন এই লাল তেকোণের ঠ্যালায় আমাদের রোজগারপাতি কমে গিয়েছে, জানলে...। গরমেন বিনি পয়সায় বাচ্চা বন্ধ করার অপ্‌রেশন করিয়ে দিচ্চে, আবার অপ্‌রেশন করালে লগদা ঝলকি দিচ্চে। পয়দা বন্ধ, গয়দা তো বন্ধ করেনি বাপু। গয়দা বলার সময় আঙুলের মুদ্রায় ব্যাপারটা বোঝাল।

গুরুমা-র ব্যাগে একটা ডায়রি আছে। ওটা হাসিকে দিয়ে বলল—পড় দেখি। হাসি পড়ল—রেবা প্রামাণিক, স্বামী সুরেন প্রামাণিক, সুচপুর, টোনা। অণিমা নন্দী, স্বামী তরুণ নন্দী, সুচপুর, টোনা। জবা গায়েন, স্বামী সনাতন গায়েন, কদমগাছি, টুনি।

একজন বলল, দেখবি ওই নন্দী বাড়িতেই ঝামেলি হবে। নামটা দ্যাখ না, অণিমা। ঠুংঠাং বাড়ির বউ। ওসব বাড়ি খুব ভেল করে।

হাসপাতালের খাতাপত্তর থেকে এসব নাম-ধাম ওরা জোগাড় করে। দশ-বিশ টাকা পান খাবার জন্য দিতে হয়। বাচ্চা হওয়ার পর বেশির ভাগ বউরা বাপের বাড়িতে থাকে। খাতায় বাপের বাড়ির ঠিকানা কমই থাকে, শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাই দেয়। সেই ঠিকানায় গিয়ে শোনে, বাচ্চা মামার বাড়ি। মামার বাড়ির ঠিকানা দিতে চায় না। এ জন্য মাস ছয় পরে যায়। মুখেভাত-টা শ্বশুরঘরেই হয় কিনা।

বলছিল, আগে এত ঝামেলি ছিল না। মানুষের ধম্মো ছিল। ওরা ভাবত হিজড়ের কোলে বাচ্চা গেলে বাচ্চার ফাঁড়া কাটে, ভূত-জিনে নজর লাগা কেটে যায়। কেন ভাবত জানো? বিষে বিষে বিষক্ষয়। বাচ্চাদের কপালে কালো টিপ পরিয়ে দেয়, কখনও কান ফুড়ে খুঁতো করে দেয়, তখন নজর লাগে না। হিজড়ের কোলে গেলেও জিন-ভূত পালায়। হিজড়ে কোলে নিলে পুত, ছেড়ে যায় জিন-ভূত। এখন আর ওসবে বিশ্বাস নেই। আমাদের পোঁদে লাগে অনেকে। আরে, আমাদেরও খেতে হবে তো, আমাদের ভাতার চাগরি করে বিকেলে হাতে প্যাকিট ধরিয়ে তো বলবে না, ওগো, তোমার জন্য বিরিয়েনি এনিচি, খাও। যারা আমাদের দেখে মুখ করে, ওদের সুখ করে খিস্তি দিই। খিস্তি দিয়ে বড় সুখ।

অন্য একজন বলল, যদি যায় বিগড়ে, বিলা করে হিজড়ে।

হাসি বলল, একবার কি হয়েছিল জানো? একটা কৈবর্ত বাড়ি গিয়েছি। তিন টুনির পর টোনা হয়েছে। খুব খিঁচে নেব ভেবেছি। ওরা বলল, বাচ্চা এখানে নেইকো, মামাঘর। মামাঘর বহুত দূর। অন্য জেলায়, সেটা আমাদের হাতে নেই। আমরা জানি ওকেনেই আচে, পাকা খবর ছেল। ঘরে ঢুকে গেছি, বাচ্চা নেই, এমন সময় বাচ্চা কেঁদে উঠল ধান গোলার তলা থেকে। আমরা আসছি দেখে ধানগোলার তলায় নুইকে রেকেছিল। যখন বার করল, ওর হাতে-মুখে রক্ত। সাপে কাটলে মুকে কাটে না। ইঁদুরে কেটেছিল। ধাড়ি ইঁদুর হবে। বাড়িতে তখন ব্যাটাছেলে ছিল না কোনও। এই আমাদের ফুলি বাচ্চা কোলে নিয়ে ছুটল হাসপাতাল। বাড়ির ব্যাটাছেলেরা খবর পেয়ে পরে এল। এর মধ্যেই একটা সুঁই পড়ে গেল বলে বাচ্চাটা বেঁচে গেল।

ঢোল বাজাতে বাজাতে প্রামাণিক বাড়ি ঢুকল। ব্যাটাছেলেরা খেয়ে-দেয়ে আঁচাচ্ছিল উঠোনে। ফুলি ঢোল বাজাতে লাগল, হাসি গাইতে শুরু করে দিল।

প্রামাণিকের ঘরে এবার মানিক এসেচে
রেবা দিদি শিব ঠাকুরের বর পেয়েছে।
দাও দেখি, ছেল্যা দাও, কোলে করি
রোগ ব্যাধি বিপদ আপদ জিন ভূত দূর করি।

একটা ব্যাটাছেলে বাবলা গাছের একটা মোটা কাঁটা ভেঙে নিয়ে দাঁত খোঁচাতে-খোঁচাতে হেঁকে বলল—ওদের তাড়াতাড়ি বিদেয় করো। বোধহয় বাড়ির কর্তা। একটা বউ কাঁথায় জড়ানো একটা বাচ্চাকে নিয়ে আসতেই চাত্তারা ওকে প্রায় কেড়ে নিল।

মাথায় হাত বুলোল, নুনুতে ছোট্ট একটা চুমো খেয়ে ফুঁ দিল। বলল, যা করে দিলাম না, ওর বউ এলে বুঝবে। রেবা প্রামাণিকের বয়স বছর কুড়ি হবে। কচি মুখ। জিগ্যেস করল, পেরথম পোয়াতি? মাথা নাড়ল বউ। ওর চিবুক ধরে চাত্তারা বলল, রাজপুত্তুর বিইয়েছ গো।

এবার বাচ্চাটা কোলে নিয়ে নাচাতে লাগল, ওর ব্যাগের কত্তালটা অন্য কেউ বাজাচ্ছিল, আর ফুলি ঢোল বাজাচ্ছিল—আর গান গাইছিল —

মাটিতে চাঁদের উদয় হল রে হল
আকাশ থেকে ফুলের বিষ্টি হল রে হল
মায়ের কোলে সোনামণি এল রে এল
টোনার গায়ের বালাই যত গেল রে গেল।

এবার অ দিদিরা, এসো গো, বিদায় দাও গো...হিলি হিলি বিদায় দাও। পান-সুপুরি, সোনার গয়না, পাঁচপো চালের মূল্য ধরে দাও, আর পাঁচশো এক টাকা বকশিশ।

ব্যাটাছেলেটা খেঁকিয়ে ওঠে। সোনার গয়না? নিজের মেয়ের বে'তে সোনা দিতে পাল্লুম না, তোমাদের দেব?

—তা হলে, এক টুকরো গোটা হলুদ দিয়ে দাও। সোনার বদলে কাঁচা হলুদ চলে। শাস্তরে আছে, নইলে গোটা। কিন্তু বকশিস কিছু কম হবে না।

—এজন্য তোমাদের তাড়িয়ে দেয় লোকে। পাঁচশো টাকা? বলো কী?

—এই ছেলে বড় হয়ে অনেক হাজার রোজগার করবে। টেক্সি করে বাপ-মা'কে চিড়েখানা ঘোরাবে। খুশি করে দাও, দিল দিয়ে আশীর্বাদ করব।

—পঞ্চাশ টাকা দেব, ব্যস।

—পঞ্চাশ? কী বলছ গা? এই দ্যাকো দাদুর কতা শুনে নাতি হাসছে। ও সোনামণি, ওদের কয়ে দাও, কয়ে দাও...

বাচ্চার গায়ে একটু সুড়সুড়ি দেয় চাত্তারা, বাচ্চাটার মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের হয়। চাত্তারা বলে—অই শোনো, সোনার চাঁদ কইছে, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। দিলে আবার আসবে। সৎপাত্রে দান বাড়ায় ধন-মান। উঠানে বাড়ির বাচ্চাকাচ্চারা জড়ো হয়েছে। আরও একটা বউ। ছেলের মা কোনও কতা কইছে না, বাড়ির বড় গিন্নি বলল—বড় খোকার সোময় একান্ন ট্যাকা দিয়েছিনু।

—সে কইলে হয়? প্যাঁজ ছিল ছ'টাকা কিলো এখন বিশ। একটা গামছা কিনতে বাপু পঞ্চাশ বেইরে যায়।

এভাবে দরদরাদরি করে ১৫১ টাকা নগদে রফা হল, এছাড়া পাঁচপো চালের দাম কুড়ি টাকা। সব শেষে ওরা বলল, এবার শাড়ি দাও।

—শাড়ির কথা তো হয়নি...

—ছেলে হয়েছে শাড়ি তো পাওনা, শাস্তরে আছে। ওরা বলছে মাপ করো দিদি, আমাদের অবস্থাও ভাল নয়। ঘরে কোনও নতুন শাড়ি নেই, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ১৭০ টাকা দেওয়ার পর ঘরে কোনও পয়সাও থাকবে না।

দুলি বলে, শাড়ি চাই না, একটা ম্যাক্সির দাম দাও। পরার কিছু তো তোমরাই দেবে। নইলে কি উদোম থাকব নাকি? বলে দু'হাতে শাড়ির দু'প্রান্ত তুলে ওঠাতে গেল। হাঁটুর কিছুটা ওপরে উঠিয়ে শাড়িটা ধরে বলল, কী করবে বলো। চল্লিশ ট্যাকায় একটা ম্যাক্সি হয়ে যাবে।

ছেলের মা বলল, ঘরে একটা আচে। এনি দিইছিল, পরিনি। ওটা দিয়ে দিচ্ছি।

তাই হল। ওরা খুব আশীর্বাদ করল। ঢোল বাজিয়ে দিল ডুমুডুমু ডুমুডুমু। আনন্দের উচ্ছ্বাস। হাতে-হাতে ঠিকরি তালি।

ওই আনন্দের ছটা যেন দুলালেও লেগেছে। তালি দিয়ে ফ্যালে, ওদের মতো ফটাং-ফটাং শব্দ অবশ্য হয় না।

গান শুরু হয়—

খেলা থেকে কেষ্ট সোনা ফিরে এসেছে
খেলতে গিয়ে নরম পায়ে কাঁটা ফুটেছে
ছেলে কষ্ট পেয়েছে।
কেষ্ট ঠাকুর কদম ডালে উঠে বসিল
গোপীদিগের শাড়ি, বেলাউজ গাছে ঝুলাইল
ছেলে রগড় দেখিছে...

—আর একটু রসের গান হবে না কি গো...?

বাড়ির কর্ত্তা বলে, থাক, থাক। খুব হয়েচে।

ওরা মায়ের হাতে ছেলেকে দিয়ে বলল—ছেলে তোমার পালোয়ান হোক, কলকলানো নাগর হোক, ছেলের জম্মু লিক্‌ম হোক, আমার যত বাল আছে তত পেরমায়ু হোক।

ওরা বেরিয়ে যেতেই দুলাল সাইকেলের কিড়িং দিল। সোনো-পাউডার-ফিতে-কিলিপ-লেলপালিশ-টিপ-দুল চুড়ি-ই-ই।

একটা বালিকা এগিয়ে এল।

ওর মা বলল, চলে আয় বড় খুকি। কিচ্ছু লিতে হবেনে। বড় খুকি তবু আসে না। রুপো রঙের নেল পালিশ আছে? দুলাল বলে আছে। সোনা রং, রুপো রং, লাল নীল চকলেট রং সব আছে। বাক্সের ডালা খোলে। নতুন বাচ্চার মা ছেলে ঘরে রেখে এগিয়ে আসে। বলে, ভাল নিপুল আছে, নিপুল, রবাটের?

দুলাল বলে, নিপিল? নিপিল কেন? বোতলের দুধ দিও না। যতদিন বুকের দুধ আছে, অন্য

দুধ দিও না। দুলাল স্বাস্থ্যসেবিকা হয়ে যায়। বাচ্চার মা বুকে আঁচল টেনে দেয়। লজ্জা পায়। দুলাল বলে, নিপিলের থেকে বাচ্চার পেটখারাপ হয়। আমি ওসব রাখি না।

একটা রুপো রং নেলপালিশ বিক্রি করে সাইকেলে এগোয়। ওদের ঠিক ধরে ফেলল।

ওরা যা বলেছিল, তাই হল। নন্দী বাড়িতে ঝামেলা হল। ওদের পাকাবাড়ি। প্রাচীর আছে। প্রাচীরের সামনে দরজা। হিজড়ে আসছে শুনে ওরা দরজা বন্ধ করে রেখেছে। দরজা ধাক্কাল, কেউ খুলল না। ওদের মধ্যে কেউ রাস্তার ধারের ইটের পাঁজার ওপর উঠে পাঁচিলের দিকে মুখ বাড়িয়ে চ্যাঁচাল, বাড়িতে সব মরেছে নাকি গা, কারও দেখি সাড়া নেই। হায় হায় হায়— নন্দী বাড়ির সব লোকজন মরে গেল, হায় হায়—নন্দী বাড়ির সব লোকজন মরে গেল, হায় হায় হায় হায়। নন্দীবাড়ির কি হাল হল গো...। সোনার চাঁদ বাচ্চাটাকে কে দেখবে, কে মাই খাওয়াবে গো...।

এধার থেকে একজন দুলালকে বলল, যেমন নন্দী তেমন ফন্দি।

শেষ অবদি দরজা খুলল। বাড়িতে ব্যাটাছেলে ছিল। দরজা খুলে বলল—চ্যাঁচাচ্ছ কেন, অ্যাঁ? আজব দেশে বাস করি। কেউ কিছু বলার নেই এদের। যাও। বিদেয় হও। ছেলেকে ছোঁবে না।

তা ঠিক আছে। হাজার এক টাকা দিয়ে দাও, নতুন শাড়ি দাও, দানসামগ্রী দিয়ে দাও, চলে যাব। ঢুকতে দাও বা না দাও, বাছাকে কিন্তু আশীর্বাদ দিয়ে যাব।

শেষ অবদি চারশো এক টাকায় রফা হল। ওরা কিন্তু বাড়ির ভিতর ঢোকাল না। গান-বাজনাও হল না। ওরা খিস্তি দিতে-দিতে বেরিয়ে গেল।

আর একটা বাড়ি ছিল ওদের লিস্টে। অনেক সময় এর বাইরেও নবজাতক থাকে। অনেক সময় বাড়িতেই প্রসব হয়। গাঁয়ের মানুষের কাছ থেকেই খবর পেয়ে যায়। চায়ের দোকান, মুদি দোকান বা দিনমজুরদের কাছ থেকে খবর পেয়ে যায় ওরা। এখন আর সে দিন নেই, তালি বাজিয়ে 'কার হোলো গো' হাঁক দিলেই বাচ্চা কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসত।

গায়েনদের বাড়িটা খুঁজে বার করল ওরা। বাড়ির সামনে গিয়ে যখন তালি ও ঢোল বাজাচ্ছিল, বাড়ি থেকে একটা বুড়ি বেরিয়ে এসে বলল—দু'মাস হল বাচ্চাটা মরে গেছে গা। ওদের বাচ্চাটা ছিল মেয়ে। মেয়ে হলে পয়দা ভাল হয় না। জোরজবস্তি করে নিতে হয়। রেট-ও অনেক কম। বুড়ি এমন করে বলল, যেন ল্যাটা চুকল। বুড়ি বলল, আশীর্বাদ করে যাও যেন ছেলে হয় এবার...। দু'হাতে আশীর্বাদ করি মা, দোয়া করি, যেন টোন্যা হয়, যেন ছেল্যা হয়, যেন বগবগি ছেল্যা, পালোয়ান ছেল্যা হয়।

চাত্তার গেয়ে উঠল,

একটা বচ্ছর গেলে পরে
পুত বিরোয়ক বউ আলো করে
ছেলে নাচবে উঠোনে
পাঁচপো চালের মুঠো নে...।

এবার সুর পাল্টে গান ধরে—প্রভাত সময়ে শচীর আঙিনা দিয়াকার গৌর নাচিয়া বেড়ায় রে। একে গোরার রাতুল বেশ দোলাইয়া মোহন কেশ সোনার অঙ্গ ধুলায় লুটায় রে...।

—দাও, আশীর্বাদী দাও।

বুড়ি বলে, আশীর্বাদী আবার কী গো, বাড়ির বাচ্চা মরে গেল, আবার পয়সা চাইছ?

চাত্তারা বলে, পাঁচপো চালের মূল্য ধরে দাও, তবে না আশীর্বাদী-টা জায়েজ হবে। মন্তরে তো বলে দিলাম পাঁচপো চালের মুঠোর কথা। বিশ টাকা ধরে দাও, আর কথা নেই। সামনে ছেলে হলে, সামনের বার এসে মাংতি নিয়ে যাব।

বুড়ি বলে, পাঁচপো চাল বিশ টাকা বলছ কেন গা? আমরা তো আট টাকা কিলো চাল খাই। পাঁচপো কত হয়? অ বউমা, আট টাকা হিসেবে পাঁচপো কত?

ভিতর থেকে জবাব আসে, দশ। দশটা টাকা আদায় করল। যাওয়ার সময় বলে গেল, ছেলেকে বোলো ভাল করে যেন 'কাজ' করে। স্বামীর কাজ।

দুলালের বেশ রগড় লাগছে। ওরা পয়সাও ইনকাম করছে, অথচ রগড়ও করছে।

চাত্তারা দুলালকে বলল—হ্যাঁ গো, ভালই তো মজেছ। তোমাতেও মজেছি। তোমাকে ছাড়ব না গো। আমাদের খোল-এ এসো। আজ যাবে?

ওদের আস্তানার নাম-ও খোল, আবার বৈষ্ণবদের সংকীর্তনের জায়গাটার নামও খোল। যেমন শ্রীবাসের খোল, নিত্যানন্দের খোল—অনিকেত ভাবে।

দুলালকে এবার ওদের ডেরায় নিয়ে যাবে অনিকেত। দুলাল বলেছিল, কসবায় ওদের একটা 'আটপুরে' ছিল। দুলাল প্রথমে গিয়েছিল ওখানে, তারপর পানাগড়। পানাগড়টা অনিকেত জানে। সোজা দুলালকে পানাগড়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু দুলাল কি সেইদিনই ওদের সঙ্গে চলে গেল? এসব দুলালের কাছ থেকে জানা যায়নি। কী করে যাবে? সাইকেল ছিল না? পরের দিনই গেল। গিয়ে বেশ লাগল।

সবাই একটা সঙ্গ চায়। অ্যাসোসিয়েশন। কোনও গুরুর শিষ্যরা গুরুর নামে একত্রিত হয়। ওরা গুরু-ভাই, গুরু-বোন। গুরু-ভজনার ফাঁকফোকরে সুখ-দুঃখের কথা আদান-প্রদান। কবিরাও গুরু-ভাই। একসঙ্গে কবিতা পড়তে যায়, কবিতার পর এক সঙ্গে চা-সিগারেট সহ অন্য কবির নিন্দা করে। মূক ও বধির মানুষও একসঙ্গে আড্ডা মারে সাংকেতিক ভাষায়। সবাই সমাজ চায়। দুলালের সমাজ নেই। সমাজ থেকে দুরছাই আছে। বউটাও দুরছাই করে। বাইরের ব্যাটাছেলেদের ঘরে ঢোকায়, ওকে তো মানুষ বলেই মনে করে না। মাঠের ব্যাঙের সামনে পোঁদের কাপড় তুলে হাগতে লজ্জা হয় না। দুলাল তো ব্যাঙ। ব্যাঙের অধম। নিজের পেটে-ধরা মা, সেও কি আর ভালবাসে? কতদিন কেউ দুলালের গায়ে হাত বুলোয়নি। ওর গা-টা নবাবগঞ্জের শ্মশান মাঠ। কেউ যায় না। যে সব ব্যাটা ছেলের কাছে গিয়ে মাঝেমধ্যে উপুড় হয় দুলাল, তারাও কেউ হাত বুলিয়ে দেয়নি ওর শরীরে। মা ঘুম পাড়িয়ে দিত। গায়ে সাবান ঘষে দিত—সেই কবেকার কথা। সেদিন বলেছিল, খুব পিঠ চুলকোয় মা, মা একটা হাতপাখা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল ডাঁটি দিয়ে চুলকে নে।

আর ছেলেটা? ধুর, ওটা ওর ছেলেই না। কী জন্য এই সংসারে থাকবে দুলাল? কোন সুখে?

এর আগে টুকটাক লিখেছে অনিকেত। বেশির ভাগই রেডিও-র জন্য। নানারকমের স্ক্রিপ্ট। ডায়রিয়ার ওআরএস, মাতৃদুগ্ধের মাহাত্ম্য, হিরোসিমা স্মরণ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-র

অবদান—এরকম কত। দু-একটা গল্পও যে ছোট কাগজে ছাপা হয়নি এমন নয়। কিন্তু তেমন কিছু কখনও লেখেনি। এটা লিখতে গিয়ে বোঝে, লেখাটাকে ভালবাসার চেয়ে বড় কথা হল চরিত্রগুলোকে ভালবাসতে হবে। চরিত্রগুলোর সুখ-দুঃখ আনন্দ-শোকের মধ্যে নিজেতে মেশাতে হবে। যে-চরিত্র খারাপ, ঘৃণ্য, সেই ঘৃণাটাকেও ভালবাসতে হবে। এই দুলালকে কখনও ভালবাসেনি যখন সে জ্যান্ত ছিল। দুলালের জন্য যা করেছে, সেটা এক ধরনের ডিউটি। কর্তব্যকর্ম। গীতা-টা পড়েনি অনিকেত, ওখানে আছে কাজ করে যাও, ফলের আশা কোরো না। গীতা 'ফলো' কতটা করেছে কে জানে, শুক্লাকে 'ফলো' করেছে। যে-ডিউটি কর্তব্যবোধে দুলালের জন্য করেছে, তার চেয়ে বেশি ধর্তব্যবোধে করেছে। শুক্লাই তো ধর্তব্য। শুক্লাই তো ঠেলে দিয়েছে। এখন এইটুকু লিখেই মনে হচ্ছে জ্যান্ত-দুলালের চেয়ে মৃত-দুলালকে বেশি ভালবেসে ফেলেছে অনিকেত। সত্যি বলতে কী, মৃত-দুলালটাই বেশি 'জ্যান্ত' হয়ে উঠছে।

পানাগড় বাজারটা ঘিঞ্জি জায়গা। রেল লাইনটা চলে গিয়েছে, দুর্গাপুর, আসানসোল ছাড়িয়ে বহু দূরে। দিল্লি-এলাহাবাদ-অমৃতসর কত জায়গায় ট্রেন যায়। দুলালরা এসেছিল তুফান মেলে। তুফান মেল-এর কত নাম শুনেছে আগে। সেই তুফান মেল। বাজার ছাড়িয়ে একটা রাস্তা জিটি রোডের দিকে গিয়েছে। জিটি রোডটাও একটা লম্বা রাস্তা। কত বাস যায়। বাসের কতরকম নাম। অন্নপূর্ণা, মা সারদা, সুচিত্রা, মা মনসা, বিনোদিনী, সাবিত্রী। এই সাবিত্রী সতী সাবিত্রী না সিনেমার সাবিত্রী? বাসগুলো বেশির ভাগই মেয়েদের নামে। বাস কি মেয়ে? হতে পারে। বাসের ভিতরে মানুষ ঢুকে যায়। এই এলাকায় সর্বদা হইচই। বাসের মাথায় আনাজের ঝুড়ি চাপিয়ে চাষিরা আসে, মুরগির ঝাঁকা নিয়ে আসে পোলট্রির পাইকার। রুগি আসে হাসপাতালে, ইলামবাজার-বোলপুর—যাওয়ার বাসও এখানে। কাছেই বিরাট গাড়ির বাজার। মিলিটারির পুরনো গাড়ি নিলাম হয়। ওখানে আসে ভিনদেশি মানুষ, কত ভাষায় কথা বলা লোক আসে। ওইসব গাড়ি কিনে গাড়ির সারাই-মেরামতের কাজ করতে হয় বলে অনেক গাড়ির গ্যারেজ। কত মেকানিক। কাছেই বিরাট মিলিটারি এলাকা। এত লোকজন বলে হোটেল, নানারকমের দোকান এবং বেশ্যাপাড়াও। তারই পিছনে একটা বস্তিতে কয়েকটা ঘর হিজড়ে। হিজড়েদের ঘরগুলো লাইন-বাঁধা পরপর ছোট-ছোট ঘর নয়। একটা দরজা দিয়ে ঢুকলে উঠোন, উঠোনের চারদিকেই ঘর। ওই ঘরগুলোতে হিজড়েরা সব থাকে। একসঙ্গেই রান্নাবান্না হয়। ১০/১২ জনের রান্না একা করতে পারে না কেউ, এজন্য একজন মহিলা রাখা আছে, স্থানীয়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সাহায্য করে সবাই। সবার ঘরেই রেডিও আছে। গুরুমা-র ঘরে একটা টুইন ওয়ান। রেডিও চলে, টেপ চালিয়ে গানও শোনা হয়। বেশ ভাল লাগল দুলালের। দুলাল-কে শাড়ি পরতে হয়।

দুলালকে তো পানাগড়ে এনে ফেলল অনিকেত। কিন্তু এর আগে আবেগঘন দু-একটা পৃষ্ঠা লেখার স্কোপ ছিল—যখন দুলাল বাড়ি ছেড়ে চলে আসে। ঘর ছাড়ার আগের দিন মা-কে একটা সরুপাড়ের কাপড় কিনে দিয়েছিল, ঝুপ করে পেন্নাম করেছিল, মা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করেছিল, কী হল রে হঠাৎ।

দুলাল কিছুই বলেনি, শুধু দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়েছিল। ছেলেকে কি কিছু বলেছিল? মন্টুকে? এখানে মোক্ষম দু'টো ডায়লগ দেওয়া যেত। রাত্তিরে ঘুমন্ত স্ত্রীর মুখের

দিকে চেয়ে শূন্যে চুম্বন শুধু। বউ জানল না। না জানুক গে। তোমার মহা বিশ্বে প্রভু হারায় না তো কভু। ভোরবেলায় ঘরের সামনের পেয়ারা গাছ থেকে একটা পেয়ারা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে ঘ্রাণ নিয়েছিল, সারা গায়ে মেখেছিল পাতাটা। নিমগাছের ছায়াটাও গায়ে মেখেছিল।

এসব লিখল না। পারত না ঠিকমতো। তাই ডাইরেক্ট পানাগড়।

ওরা শিখিয়ে দিয়েছিল গুরুমা-কে প্রণাম করতে হবে। বলতে হবে, আমি মায়ের পাও পড়তি। চেলি বলব।

চাত্তারা বলেছিল—আমাদের গুরুমা-র নাম নাগেশ্বরী। নামটা খটমট বলে আমরা নাগীমা বলে ডাকি। নাগীমা যেমন রাগী, তেমন সোহাগি। গেলেই বুঝবে। আমি হলাম ওর ভাল চেলি। কেউ কেউ আমাকে ছোটমা-ও বলে।

এটা বলে—অন্যদের কাছে থেকে সমর্থন আদায় করল। কী লা ঠিক না?

কয়েকজন ঘাড় নাড়ল। দু'জন ঘাড় নাড়ল না।

অনিকেত সমর্থন আদায় করা নিয়ে একটা লাইন লিখল—অজয় মজুমদার আর নিলয় রায়চৌধুরীর 'হিজড়েদের সমাজ ব্যবস্থা' পড়া ছিল বলে। ওঁরা ক্ষেত্র-সমীক্ষায় দেখেছেন—গুরু মায়ের প্রিয় চ্যালা বলার একটা প্রতিযোগিতা থাকে। ইন্টারনাল স্ট্রাগ্‌ল। যে এক নম্বর চ্যালা হবে, তার হাতেই খোলের দায়িত্ব যাবে। হিজড়েরা বাঁধাই খেটে যা রোজগার করে, তার অর্ধেকই গুরুমা-কে দিয়ে দিতে হয়। তার মানে গুরুমা'র রোজগারপাতি বেশ ভালই। গুরুমা'র বয়েস হয়ে গেলে, কিংবা রোগ-ব্যাধি ধরে গেলে প্রধান শিষ্যাকেই দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দেয়। এরপর নতুন হিজড়েরা প্রধান গুরুমা-কে 'দিদিমা' বলে ডাকে, আর প্রধান শিষ্য বা শিষ্যা হয়ে যান 'গুরুমা'। এরকমও দেখা গিয়েছে, মৃত্যুর আগে গুরুমা ওর একনম্বর চেলিকে সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গিয়েছে। গুরুমা যদি হঠাৎ মারা যান, গুরুমা হওয়ার জন্য শিষ্যাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝামেলা হয়। অনেক সময় 'সংঘ' ভেঙে যায়। হিজড়ে বাড়িতে তিন ধরনের শিষ্য দেখা যায়! একজন প্রধান শিষ্য, কয়েকজন সাধারণ শিষ্য। ওরা পরস্পরের গুরু-বোন। এছাড়া ঠিকে-হিজড়ে বা জন-হিজড়েও কিছু থাকে। 'জন' হল শ্রম-দুনিয়ার একটা বহুল প্রচলিত শব্দ। দিনমজুর। জন-হিজড়েরা হিজড়ে খোলের সবচেয়ে কম আদৃত মানুষ। ওরা বাড়ির কাজ করে, রান্নাবান্না, বড় পরিবারের অন্যান্য বহু কাজ, কিন্তু জন-হিজড়েরা কোনও নির্দিষ্ট খোলে বেশিদিন থাকে না। না-পোষালে অন্য খোলে চলে যায়। ওরা হিজড়ে খোলই পছন্দ করে। তবে অনেক সময় কোনও হোটেল বা চায়ের দোকানেও এদের কাজ করতে দেখা যায়। ওখানে প্রচুর গঞ্জনা এবং খদ্দেরদের টিপ্পনি শুনতে হয় বলে হিজড়ে খোলে কাজ করাই পছন্দ করে। যে-খোলে কাজ করে, সেই খোলের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। জন-হিজড়েরা কথাবার্তায় একটু দুর্বল। বাঁধাই খাটতে গেলে যেসব ছল-চাতুরি করতে হয়, সেটা তারা ভাল পারে না। দেখতেও ভাল হয় না। হিজড়ে সমাজে এরা একটু শোষিত। দুলাল কোনও পর্যায়ে যাবে সেটা এখনও ঠিক হয়নি। মানে, অনিকেত ঠিক করেনি।

তুমিও আমাকে ছোট মা বলবে, বুইচ? চাত্তারা বলেছিল। দুলাল বাধ্য শিশুর মতো ঘাড় কাত করেছিল।

—আর একটা কথা শোনো। আমরা হলাম 'হাওড়াইয়া'। আমাদের নিয়মকানুন মেনে চলবে।

'হাওড়াইয়া কী'? দুলাল প্রশ্ন করেছিল।

এটা হল আমাদের ঘরানা। অনেকরকম ঘরানা আছে। দিল্লিওয়ালা, লালনওয়ালা, ইব্রাহিমওয়ালা, লখ্নউ, শ্যামবাজারিয়া, হাওড়াইয়া...আমরা হাওড়াইয়া। আমরা দেখাটেখা হলে সেলাম আলাইকুম বলি না। গরু-শুয়োর খাই না। কিন্তু পারলে রমজান মাসে রোজা রাখি। সব বুঝতে পারবে আস্তে-আস্তে। প্রথমে দুলালকে নিয়ে গিয়ে ওর পায়ে এক ঘটি জল দেওয়ার হুকুম করল চাত্তারা। ও পা ধুয়ে নিল। একটা টিনের চালের ঘরে নিয়ে গেল। একটা খাটে বসে সিগারেট টানছে ম্যাক্সি-পরা একজন মহিলা। ঘরে একটা স্টিলের আলমারি আর একটা ড্রেসিং টেবিল। ঘরের ভিতরে একটা ফ্রিজ এবং টিভিও দেখতে পেল। চাত্তারা বলল, একটা লতুন গয়না নিয়ে এলাম গো মা। দুলালকে দেখাল। দুলাল বলল—পাও লাগি। গুরুমা জিজ্ঞাসা করল—কোতি না ধুরানি?

চাত্তারা বলল, ধুরানি। কড়ি ড্রেস।

কোতি হল নারী-স্বভাবের পুরুষ। 'ধুরানি' এর চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি। পশ্চাদ্দেশ ব্যবহৃত হয়ে গিয়েছে। এবং কিছুটা রূপান্তরকামীও বটে। 'কড়ি ড্রেস' মানে—এই পাজামা আর শার্ট আসলে ছদ্মবেশ। খোলের অন্যান্যরাও এসে গিয়েছে। দুলালকে দেখছে।

নাগেশ্বরী বিছানায় ঠ্যাং-টা লম্বা করে দিল। ওর পুরুষ-পুরুষ পায়ের গোড়ালির বেশ কিছুটা ওপরে ফুল-ফুল ম্যাক্সির শেষ প্রান্ত গুটিয়ে রয়েছে। পায়ের আঙুলেও রুপোর আংটি। পায়ের নখে নেলপালিশ। পায়ের লোমগুলো যেন ধান কাটার পর সারা মাঠে পড়ে-থাকা ধান গাছের স্মৃতিচিহ্ন। মা পায়ের লোম চাঁচেন। আবার ওঠে। পায়ের পাতার ফাটা দাগে-দাগে তৈরি হয়েছে কোনও অজানা দেশের ম্যাপ। ওখানে মাথা ছুঁয়ে প্রণাম করে দুলাল। আর তক্ষুনি চোখ ফেটে জল বেরুল।

নাগেশ্বরী বলল, সঙ্গে কিছু ঝলকি এনেছ? টাকাপয়সা?

দুলাল বলল, বেশি তো আনিনি, দু'শো টাকা আছে। নাগেশ্বরী বলল, দু'টো ছাপা শাড়িও হবে না। চাত্তারাকে বলল, একটা সিনথেটি শাড়ি কিনিয়ে দে, বেলাউজ, শায়া, বুকবাঁধা। এখন আমি দিচ্ছি এক পোস্ত।

—লাচতে পারিস?

দুলাল মাথা নাড়ে।

—গান গাইতে পারিস?

আবার মাথা নাড়ে দুলাল।

—একটা গান গা দেখি...

দুলাল কী গান গাইবে? প্রথমেই মনে এল 'জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে'। ওটা কি গাওয়া যায়? গান মনে করতে থাকে। মাথা চুলকোতে-চুলকোতে আর একটা গান মনে পড়ে—'আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব, হারিয়ে যাব আমি তোমার কাছে'...এরপর আর মনে পড়ে না।

এটা গাইতে লজ্জা করে। তারপর একটা ভাল গান মনে পড়ল। কিন্তু গাইতে লজ্জা করল।

—কী রে, গানটা ধর...।

দুলাল গেয়ে দিল, এ আমার গুরুদক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম, যার শুভ কামনায় আমি এখানে এলাম...।

সবাই হইহই করে উঠল।

—তোর হবে। তোর গানের গলাটা তো খারাপ নয়...। তোর হবে। কিন্তু এসব গানে চলবে না। লতুন-লতুন গান শিখতে হবে। এখন একটু আরাম করে লে।

দুলালের একটা ঘর দেখিয়ে দেওয়া হল। ছোট একটা ঘরে দু'পাশে দু'টো তক্তাপোশ ফেলা আছে। ওকে মাঝখানে মাদুর বিছিয়ে শুতে হবে আপাতত। দড়িতে ঝুলছে শায়া-শাড়ি, একটা কাঠের তাক রয়েছে, ওখানে সাজগোজের জিনিসপত্র।

হাসি বলল, তোর সঙ্গে দু'টো আকুয়া আছে। ওরা বাঁধাই খাটতে গিয়েছে। খেয়েদেয়ে জিরেন করে নে, বিকেলে তোর নববস্তর হবে।

বিকেল হতে আর কতক্ষণ। গুরুমা-র ঘরে গেল। স্টিলের আলমারি খোলার ক্যাঁচাৎ শব্দ। একটা ছাপছাপ সিনথেটিক শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ বের করল গুরুমা। বলল, এক পোস্ত আমি দিচ্ছি, এক পোস্ত তুই কিনে নিবি, বাকিটা রোজগার করে কিনবি। এখন পাজামাটা খোল।

পাজামা খুলল দুলাল। জাঙ্গিয়াও ছিল। জাঙ্গিয়াটা না-পরলেও চলে। অনেক সময় পরেই না। আজ পরা ছিল। জাঙ্গিয়াটা টেনে খুলে দিল গুরুমা। তোর তো প্যাতপ্যাতে লিকম। তোর তো লিকম পতাতে সুবিধে হবে। গুরুমা-র ঘরে চান্তারা, হাসি, ফুলি, আরও দু'জন ছিল। তাদের একজনের নাকে সুতো। নতুন নাক বিঁধোলে ফুটোর মধ্যে সুতো বেঁধে রাখতে হয়, সেই সুতো। গুরুমা বলল, হাসি, ওকে লিকম পতানোটা দেখিয়ে দে তো?

হাসি দুলালকে বলল, আয়, আয়নার সামনে দাঁড়া। তোকে দ্যাখ। কেমন লাগছে?

দুলাল বলল, ভাল না।

কেষ্টঠাকুর হ। বাঁ পায়ের উরুর ওপর ডান পা-টা চাপিয়ে দে। এবার ঠ্যাং-টা আড়াআড়ি রাখ। এবার দ্যাখ তো আয়নায়—

দুলাল দেখে।

হাসি বলে, তোর ধন কোথায় গেল?

দুলাল বলে, চাপা পড়েছে।

—এখন দেকতে কেমন লাগছে?

দুলাল মৃদু হাসে।

—ওটা আচে?

—আছে কিন্তু নেই।

এবার দ্যাখ, কেষ্টঠাকুরের 'পোজ' না দিয়েও কেমন করে পতানো যায়। দুই উরুর তলায় গুঁজে দিয়ে থাই দু'টো টাইট কর। দ্যাখো, কী মনে হচ্ছে? চিপটি-র মতো লাগছে না? শুধু চেরা নেই। ও বোঝা যাবে না, বালে ঢাকা যে।

—এটা প্যাকটিস করবে কেমন?

—নাও। এবার শাড়ি পরো। জাঙ্গিয়াটা পরে নাও, ওটা এখন আর জাঙ্গিয়া না, প্যান্টি।

শাড়ি পরানো হচ্ছে, দুলি ঢোল বাজাচ্ছে। শাড়ির পর বডিজ পরানো হল। ভেতরে দু'টো

জলভরা বেলুন ঢুকিয়ে দেওয়া হল, এরপর ব্লাউজ।

দাড়িটা ভাল করে কামিয়ে নাও এবার। এমনিতেই দুলালের দাড়িটাড়ি পাতলাই। মাকুন্দ বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই নয়, তবে বেশ কম। বুকে লোম নেই। কামাতে বেশিক্ষণ লাগল না। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা সন্না বার করল নাগেশ্বরী। বলল, এটার নাম দর্শন। একটা কিনে নিবি। সন্না দিয়ে একটা একটা করে মুখের চুল টেনে তুলে ফেলবি। তা হলে গজানো বন্ধ হয়ে যাবে। দোকানে 'মালা ডি' কিনতে পাওয়া যায়, পেট হওয়া বন্ধ করার পিল, রোজ একটা করে খাবি, তা হলে গোঁপ-দাড়ি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে, বুকেও একটু-একটু করে মাই গজাবে। নে এবার খারি-টা বার কর।

একটা পরচুলা বার করা হল।

ঠোঁটে লিপস্টিক, মুখে পাউডার, চোখে কাজল। এবার একটা পরচুলা পরিয়ে দেওয়া হল মাথায়। ঢোল বাজল।

উলু দিয়ে উঠল বাকিরা।

উলুর অন্য নাম 'জোকার'। পূজো শেষে পুরোহিত বলতেন এবার জোকার দাও... শব্দটা নাকি 'জয়জয়কার' থেকে এসেছে।

চাত্তারা বলল—কয়েকদিন বাঁধাইয়ে চল, আমাদের সঙ্গে থাকতে-থাকতেই প্যাক্‌টিকাল হয়ে যাবে। তারপর মাঝে-মাঝে দুর্গাপুর ইস্টিশন-এ পাঠাব। ওখানে সারাদিনে ভাল আমদানি।

—ওখানে কী?

—ওখানে রেলের টিকিটের লাইন পড়ে কি না, লেডিজ লাইন ছোট থাকে। লেডিজ লাইনে দাইড়ে মদ্দাদের টিকিট কেটে দিবি। আমাদের রোজগারের বহুত লাইন। ইস্টিশনে একটা মদ্দা কুলি সারাদিন খেটে, নিরখা ঝরিয়ে যা রোজগার করে, টিকিট কেটে তারচে' বেশি রোজগার। পয়সা কামাবি, মস্তি করবি, খিলুয়া-খোবরা খাবি...।

ওরা ঢোল নিয়ে বাঁধাইয়ে বেরোয়। গুরুমার ঘরে একটা ঢোল আছে, ওটা ওখানেই থাকে। পুজো হয়। ঢোলের ওপর ফুল পড়ে, ঢোলের গায়ে সিঁদুর পড়ে। একটা কাঠের সিংহাসনে, একটা মুরগির ওপরে বসা ঠাকুর মূর্তি আছে। মেয়ে-ঠাকুর। ওর নাম বহুচেরা।

গুরুমা বলেছে—এখন দু'-চারদিন এমনি-এমনি ঘুরুক, তারপর 'দীক্ষে' হবে। দীক্ষের খরচা আছে, কিছু রোজগার করে নিক আগে।

বাঁধাইয়ের কাজে ঘুরল দুলাল। পানাগড় ছাড়িয়ে ইলামবাজারের দিকে এক কিলোমিটার গেলেই গ্রাম, তিন কিলোমিটার গেলেই জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতরে-ভিতরে গ্রাম। ওইসব গ্রামে বড়লোক নেই। কিছু-কিছু সাঁওতাল ঘর আছে। ওদের বাড়ির উঠোন-দেয়াল খুব তকতকে হয়।

অনেক দেয়ালে ছবি আঁকা থাকে। এগুলো দেখতে খুব ভাল লাগছিল। দুলালও গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরেছিল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামগুলোর সঙ্গে এদিকের গাঁয়ের মিল নেই। মাটির রং আলাদা। এধারে কত শাল-সেগুন গাছ।

সাঁওতাল ঘরে গেলে ওরা এক বাটি করে হাঁড়িয়া খেতে দেয়। ওরা দুরছাই করে না। বেশ হাসে। ওদের সমাজে এসব নেই। সাঁওতাল ঘর থেকে কেউ হিজড়ে-সমাজে নাম লেখায় না। ওদের 'চক্ষুদান' বলে একটা ব্যাপার আছে। কেউ মরে গেলে, মৃত্যুর কয়েকদিন পর পটুয়া-রা যমপট নিয়ে বাড়িতে আসে, ওখানে একটা চোখহীন ছবির চোখ এঁকে দেয় পটুয়ারা। ওরা ভাবে, চোখটা আঁকা হলে মৃত-মানুষের আত্মাটা দেখতে পাবে। আদিবাসী ঘরে জন্মের পর এবং মৃত্যুর পর তোলা তুলতে আদিবাসীরা নয়, অ-আদিবাসীরাই আসে।

সাঁওতালদের ঘর থেকে বেশি আদায়পত্র হয় না। ওরা নিজেরাই ভাল নেই, ঠিকমতো জামা-কাপড় নেই, এখানে নতুন কাপড় চাওয়া যায়? এসব এলাকায় বেশি আসে না—চাত্তারা জানাল। তবে এক্কেবারে না-এলেও চলে না। এই এলাকাটা আমাদের কিনা, হামসি লেগা কম বহুত ঝলখা বাকর তো করতে হবে।

এই ধরনের সাংকেতিক কথা ওরা মাঝে-মাঝেই বলে। দুলালের ঘরে যে দু'জন থাকে, ওরা বলেছিল, হামসি ময়না মাহিয়া, অন্যজন বলেছিল হামসি ঝুমকা মাদিয়া। হামসি কে গুরুমা বহু 'চিস্যা' করে। ঝুমকা বলেছিল। 'চিস্যা' মানে পছন্দ। দক্ষিণের গ্রামগুলো বেশ ভাল। ওখানে অনেক 'আগুড়ি' আছে। 'আগুড়ি'-রা বড়লোক। ওদের উঠোনে বড়-বড় ধানের গোলা। গোয়ালঘরে হাম্বা-হাম্বা। গরুদের পেচ্ছাপের ছরছর শব্দ। হাসি এই অঞ্চলটা খুব ভাল জানে। কোনটা বামুন বাড়ি, কোনটা কৈবর্ত বাড়ি, কোনটা 'আগুড়ি বাড়ি' দেখেই বুঝতে পারে। বাউড়ি-বাগদি-মুচি এরা গাঁয়ের একধারে থাকে। ওসব গরিব বাড়িতে ছেলে নাচাতে গিয়ে খুব একটা ফয়দা নেই। যেহেতু এলাকাটা ওদের, রাজার কর্তব্য প্রজাদের দেখা, তেমনই হিজড়েদেরও কর্তব্য নবজাতকদের আশীর্বাদ করা। বাচ্চা নাচিয়ে ওদের কাছ থেকে কিছু নেয় না। নিয়মরক্ষার জন্য পাঁচ সিকে, বা কখনও পাঁচ টাকা। ডাক্তাররা যেমন অনেক গরিব রুগিকে ফিরিতে দেখে দেয়, তেমনই।

কিন্তু আগুড়ি বাড়িতে পয়দা হয় 'আগুড়ি বাড়ি'র জন্য আলাদা বাচ্চা নাচানোর গান বেঁধেছে ফুলি।

ঘরে ছেলে জন্মালে গানটা এরকম—

ওরে গাছে গাছে ফল পেকেছে
গুলাব গাছে ফুল ফুটেছে
টিয়া কুকিল কলকলাচ্ছে
কী হয়েছে কী হয়েছে—
বড় বউয়ের ব্যাটা হয়েছে।
রাঙা পানা ব্যাটা হয়েছে
ধন ধনা ব্যাটা হয়েছে
গন গনা ব্যাটা হয়েছে
এক লিটার দুধ খাবে

মারুতি চড়ে শহর যাবে
শতাব্দী রায় বউ আনবে
লাখ টাকা পণ লিবে
বউ মাকে সুখ দিবে

এরপর সুযোগ থাকলে, মানে কড়া ব্যাটাছেলে না-থাকলে, বউকে কেমন করে 'সুখী' করবে তারও 'ঘতাঘত', 'চপাচপ' এসব শব্দমণ্ডিত বর্ণনা থাকে, কিন্তু ওইসব লাইন বুঝে-সুঝে গাইতে হয়। ঘরের বউরা খিস্তি, গালাগাল এসব শুনতে ভালবাসে। কিন্তু যদি সেইসঙ্গে বালক-বালিকা থাকে, তখন ওরা চেপে যায়। যদি ব্যাটাছেলেরা না-থাকে, তখন অনেক সময় গিন্নিবান্নিরা বালক-বালিকা সরিয়ে দেয় শুধু খিস্তি-লোভে। যদি মেয়ে হয়, তবে গানের প্রথম দিকটা একই থাকে প্রায়, ব্যাটার বদলে 'বেটি' বলে, কিংবা 'খুকি' বলে। কিন্তু শেষের দিকে থাকে—

সতী লক্ষ্মী মেয়ে হবে
রূপের ছটায় চাঁদ হারাবে
ভাল ঘর বর পাবে
বিনা পণে বিয়ে হবে।

সকালবেলায় রুটি-তরকারি চা খেয়ে, পথে-পথে ঘোরা। দুপুরবেলায় বাইরে কোথাও খেয়ে নেওয়া, গাছতলায় বিশ্রাম করা, খিস্তি-খেউড় করা, বেশ 'তাইরে নাইরে নাইরে—চিন্তা কিছুই নাইরে' জীবন। তবে এর মধ্যে যে খারাপ কিছু শোনেনি, এমন নয়। বাচ্চারা দল বেঁধে একটা গাঁয়ে বলেছে হিজড়ে-হিজড়ে, ধনের জায়গায় ছিবড়ে...এসব নিশ্চয়ই ওরা বড়দের কাছ থেকে শিখেছে। পানের দোকান-চায়ের দোকান থেকেও কানে এসেছে—যদি দ্যাখো হিজড়ে, দিন যাবে বিগড়ে।

চার-পাঁচদিন দুলালের অ্যাপ্রেন্টিস-পর্ব গেল। আরও কয়েকদিন হবে, তারপর 'দীক্ষা'। ময়নার সঙ্গে দুলালকে দুর্গাপুর স্টেশনে পাঠাল। ময়না আর দুলাল দু'জনই শাড়ি পরেছিল, মুখে পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক। ময়না দু'বছর হল এখানে এসেছে। খুব একটা পাকা হয়নি। ময়না বাউড়ি ঘরের ছেলে ছিল। এক চায়ের দোকানে কাজ করত। চা খেতে-খেতে 'গুরুমা' বুঝে গেল—ও 'কোতি'। ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে জানল, ওর বাবা সাপের কামড়ে মরে গিয়েছে। ওর মা অন্য একজনকে বিয়ে করেছে। ওর বাবা যখন মরে, ওর বয়েস ছিল দশ। ওর আর দু'টো বোন আছে। বাবা মরার পরই ও চায়ের দোকানে কাজ করে। যা রোজগার হয়, ওর মা এসে নিয়ে যেত। আগে মাঝে-মধ্যে বাড়ি যেত, পরের দিকে আর বাড়ি যেত না। ওর মায়ের আবার একটা মেয়ে হল। ওর বাবা মা-কে ছেড়ে দিয়েছে। বলেছে, তোর পেটে শুধু মেয়েই হবে। তোর তো চারটেই মেয়ে। তার মানে, ওকে 'ছেলে' বলে মনে করত না। ওর দুই দিদির একজন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, তার খোঁজ নেই। বাড়িতে মায়ের জন্য কষ্ট হয়, কিন্তু যেতে ইচ্ছে করে না। চায়ের দোকানেই সারা দিন থাকে। রাতেও। মালিকের এক শালা আছে। সে মাঝে-মাঝে রাতে এসে ওকে দিয়ে খেলাত। তারপর সেই লোকটা ওর এক বন্ধুকে নিয়ে আসে। বাটুবাজি করত। এমন সময় 'গুরুমা'-র চোখে পড়ে। দু-চারদিন কথা বলে ওকে খোলে ভিড়িয়ে নেয়। ওর আগে নাম ছিল মনুয়া। এখন ও ময়না।

দুর্গাপুর স্টেশনে ময়না আগে বহুদিন ডিউটি করেছে। এই ডিউটিটা ওর ভাল লাগে না।

কোনও মস্তি নেই। সারাদিন খালি লাইনে দাঁড়াও। ও বাঁধাই খাটতেই চায়। কিন্তু ওখানে কাউকে না-পাঠালে ঠেক হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই ওখানে ছবিদি যায়। ছবিদি বেশি হাঁটতে পারে না। হাঁটুতে ব্যথা। ছবিদি তাই ইস্টিশন ডিউটি করে। 'এখন ছবিদির জ্বর হয়েছে বলে আমায় পাঠিয়েছে।'

ময়না দেখিয়ে দিল—কী-কী করতে হয়। ওরা যেতেই একটা খাকি পোশাক-পরা পুলিশ এল। ময়নার দিকে তাকিয়ে চোখ মারল। ময়না দুলালকে দেখিয়ে দিল। 'ও কিন্তু মাঝে-মাঝে এখানে ডিউটি করবে।'

ময়না বলল, মাসের বেবস্থা আছে।

একটা লেডিজ কাউন্টার আছে। ওখানে ভিড় কম থাকে। এদিকে বর্ধমান আর ওদিকে আসানসোল পর্যন্ত টিকিট কেটে দিলে দু'টাকা করে লিবি, আর দূরে গেলে পাঁচ টাকা। হাওড়ার প্যাসেঞ্জার-রা পাঁচ টাকা দিতে চায় না। দু'টাকা ধরিয়ে চলে গেলে খপ করে হাত ধরবি। গয়া প্যাসেঞ্জার, মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে ভিড় বেশি। ভাল আমদানি। যখন ভিড় থাকবে না নীচে বসে থাকবি।

বিকেল চারটে নাগাদ ঘুগনি-পাউরুটি খেয়ে নিল ওরা। সাতটা পর্যন্ত ডিউটি দিল। গুনে দেখল একশো আশি টাকা কামাই হয়েছে। বাইরে বেরিয়ে শিঙাড়া-রসগোল্লা খেল। সব টাকা গুরুমা-র হাতে তুলে দিতে হবে। গুরুমা খুশি হয়ে টাকায় সাড়ে ছ'আনা, মানে চল্লিশ পয়সা দেবে। দেড়শো টাকায় ষাট টাকা ওরা পাবে। খাবার পয়সাটা এখান থেকেই যায়।

দিন দশেক পরে দীক্ষার দিন পড়বে। পূর্ণিমা-অমাবস্যায় দীক্ষা হয়। দীক্ষার দিন সকালবেলা 'বাবা' এসেছে। 'বাবা' মানে গুরুমা-র প্রধান 'পারিক'। বা গুরুমা যাকে বলে—দ্যাক্, এই হচ্ছে আমার স্বামী। তোদের বাপ।

নাগেশ্বরী মায়ের বয়স এখন পঁয়তাল্লিশের এধার-ওধার। কিন্তু ওর এই স্বামীর বয়স তিরিশের বেশি হবে না। বেশ ফরসা রং। একটা জিন্স-এর প্যান্ট আর বুকে কুমির আঁকা গেঞ্জি পরে এসেছে। মোটা-সোটা, থলথলে। পানপরাগ খায় বলে মুখে থুথু জমে। মায়ের মেয়েদের ওর মুখের সামনে পিকদানি ধরতে হয়। 'বাবা' নাকি মাঝে-মাঝে আসেন। বাবা এলে কোনও মেয়েকে পা ধুয়ে দিতে হয়। সোজা মায়ের ঘরে চলে যান। বাবা-কে খবর দেওয়া হয়েছে আজ আসতে। নতুন কোনও 'কোতি' দীক্ষা নেবে। দীক্ষা নিয়ে 'আকুয়া' হবে। তারপর হয়তো লিঙ্গচ্ছেদ করে, মানে 'ছিন্নি' হয়ে 'নির্বাণ' হবে কোনওদিন। আজ 'আকুয়া' হবে, এবং দুলালী নাম আনুষ্ঠানিক ভাবে ধারণ করবে।

ঝুমকা নামের হিজড়েটা খোসাওলা লাল বাদাম এনে দু'হাতে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে হালকা ফুঁ দিচ্ছিল। বাদামের লাল জামা হাওয়ায় উড়ছিল। ছবি মুরগি কুটছিল। ছবি নাকি 'আকুয়া' নয়। 'ছিবড়ি'। দুলাল জেনেছে ছবি অল্প-অল্প মেয়েছেলে। শরীরেও। ওর কোনও ঝোলা বল নেই। নুনুটা নাকি ঠিক একটা হত্তুকির সাইজ। আসলে ওটা নাকি ব্যাটাছেলের লিকম-ই নয়। ওটা চিপটি-র ওপরে যে ছোট নাক থাকে, ছোলার মতো, ডাক্তার বাবুরা যাকে বলে ক্লিট, ওটাই বড় হয়ে গিয়েছে। ও-বেটির মধ্যে মাগীর অংশ বেশি বলে এখনই হাঁটু ব্যথা। মেয়েদেরই তো হাঁটু ব্যথাটা বেশি হয় মাসিক শেষ হওয়ার আগে। ছবিদির নাকি অল্পস্বল্প মাসিকও হত।

ছবিদি মন দিয়ে মুরগি কুটছে। আজ 'ছোট খোবরা' হবে। 'ছোট খোবরা' মানে মুরগি। 'বড় খোবরা' খাসি।

একটা প্লেটে করে জামা ছাড়ানো বাদাম আর খিলুয়া-র সাদা বোতল নিয়ে বাবার ঘরে গেল ঝুমকা।

একটু পরেই নাগেশ্বরী মা দুলালকে ডেকে পাঠালেন। ময়না বলে দিল দু'জনকে পেন্নাম করবে।

দুলাল দু'জনকেই প্রণাম করল। পাও লাগি মা, পাও লাগি বাপ।

দুলাল ওর বাপকে দেখছিল, যে-বাপ দুলালের চেয়েও ছোট। চোখটা লাল। গালেও লালের আভা। গেঞ্জিটার দু'টো বোতাম খোলা। বুকের লোম দেখা যাচ্ছে।

নাগেশ্বরীমা বলল—হাঁ করে গিলছিস দেখছি, বাপ-ভাতারি হয়ে বসিস না যেন। সবাই শোন। শোন, তোরা যদি কখনও বাপের গতরের দিকে লোভের দিষ্টিতে তাকিয়েছিস দেখি, একদম আঁশবটির কোপ ঝেড়ে দেব গলায়।

বাবা পেন্নাম হয়ে গিয়েছে। এবার দীক্ষা-র কাজ শুরু হবে।

বাবাকে ঘর ছেড়ে বেরুতে হল। দীক্ষার সময় আকখাট-রা থাকতে পারে না। আকখাট হল পূর্ণ মদ্দপুরুষ। গুরুমা-র এই পারিক আক্‌খাট। হিজড়েরাও আকখাট-ই পছন্দ করে। একজন হিজড়ে যৌন-সঙ্গী হিসেবে আর একজন হিজড়েকে পছন্দ করে না।

চাত্তারা, ময়ূরী, ময়না, হাসি, ফুলি, ছবি, ঝুমকা, ঝরনা, সফি, সবাই এল। সবাই শাড়ি পরেছে। বেশির ভাগই লাল পাড়। তবে অন্য শাড়িও আছে। সবাই স্নান সেরে নিয়েছে। যারা খারি পরার পরে নিয়েছে। ব্লাউজের তলায় জলভরা বল নিয়ে 'বাংলার বধূ বুকে তার মধু' হয়ে রয়েছে। চাত্তারা-র হাতে একটা কুলো। সেই কুলোর ভিতরে চকমকি কাগজ সাঁটানো। কুলোর মধ্যে একটা ছোট রেকাবিতে দু'টো লাড্ডু, একটা পাকা কলা, একটা আয়না, ছোট বাটিতে একটু চুন, একটু নুন, এক গ্লাস জল, আর এক শিশি আলতা। দুলালের মুখ এখনও জ্বালা করছে। দর্শন, মানে সন্না দিয়ে অনেক্ষণ ধরে ওর গোঁপ-দাড়ি ওপড়ানো হয়েছে।

দুলালকে একটা আসনে বসানো হল। আসনটা এক টুকরো হরিণের চামড়ার হলুদের মধ্যে কালো-সাদা বুটি। মাঝে-মাঝেই লোম উঠে গিয়েছে। এই আসনে ওর আগে আরও কতজন দীক্ষা নিয়েছে। এই আসনের লোমে-লোমে স্মৃতি। কুলোটা রাখা হল বহুচেরা দেবীর ছবিটার সামনে। এবার কুলোটা দুলালের মুখের সামনে সাতবার ঘুরিয়ে দুলালের সামনে রাখল নাগেশ্বরী। দুলাল নতুন শাড়ি পরেছে। শাড়ির সঙ্গে যা-যা পরতে হয়। দুলাল যেন কনে বউ। কুলোটা নাড়ানোর সময় লাড্ডু দু'টো গড়িয়ে দু'পাশে চলে গিয়েছিল। চাত্তারা লাড্ডুটাকে কলার দু'পাশে রাখল। একটা আখাম্বা কলার দু'পাশে দু'টো লাড্ডু।

চাত্তারা বলল, নাও, কলাটাকে ধরো।

দুলাল কলাটাকে ধরল।

নাগেশ্বরীমা মিটিমিটি হাসছে।

—এবারে জোরে চেপে ধরো। খুব জোরে।

দুলাল বলল, গলে যাবে।

—গলে যাক। গালিয়ে দাও।

দুলাল মুঠিটা শক্ত করে কলাটার মাঝখানটা 'ভর্ত্তা' করে দিল।

—বলো, কলা কলা কলা, তোকে কল্লাম গলা।

দুলাল বলল।

—বলো, এই কলার জন্য আমার কোনও মায়া নেই।

দুলাল বলল।

—এবার ছুলে, এই রেকাবিতে রেখে, ছুরি দিয়ে ছোট-ছোট টুকরো করো।

—তাই করল।

—এটা হল পেসাদ। আমরা সবাই খাব।

এবার গুরুমা নাগেশ্বরী একটা-একটা করে দু'টো লাড্ডুই খাইয়ে দিল দুলালকে।

—বল,

লাড্ডু লাড্ডু লাড্ডু খাই

লাড্ডুর জন্য মায়া নাই।

নাও, এবার জল খাও বাছা।

দুলাল জল খেল।

চাত্তারা আয়নাটা দেখিয়ে প্রশ্ন করে, ওটা কী?

দুলাল বলে, আয়না।

বাকিরা কোরাসে বলে—

আয়নায় থাকে পারা।

গুরুমাকে ঠকাবে যে-হারামি হতচ্ছাড়া

তার গা ফুঁড়ে বেরবে পাপের পারা।

এবার চুনের বাটি দেখিয়ে, এটা কী?

দুলাল বলল, চুন।

সবাই কোরাসে—

যে করবে মায়ের বদনাম আর খোলের অনিষ্ট, তার গা ফুঁড়ে বেরবে চুনের মতো শ্বেত কুষ্ঠ।

এবার আর একটা বাটি দেখিয়ে বলল, এটা কী?

এটা নুন।

খোলে থেকে খাবি নুন

সদা গাইবি মায়ের গুণ।

পুরো প্রক্রিয়াটা মোট তিনবার হল।

দুলালকে বলা হল বহুচেরা মা-কে প্রণাম করতে, তারপর ঢোল-কে, এবার ফের নাগেশ্বরীমাকে।

নাগেশ্বরীমা দুলালের মাথায় হাত রাখল। আঁচল দিয়ে মুখ মোছাল। বলল, তোর নাম হয়ে গেল দুলালী। দুলালী হিজড়ানি। সবাই কোরাসে বলল, দুলালী, দুলালী হিজড়ানি। নাগেশ্বরী একটু সুপুরির কুচি দিল দুলালের হাতে। বলল মুখে দে।

দুলাল মুখে দিল।

নাগেশ্বরী বলল—তুই আমার চেলী হলি। বেঁচে থাক বেটি। আমার যত চেলাচেলি তোরও তত হোক। শরীল যেন ভালো থাকে ধরেনা রোগ পোক। নে, আশীর্বাদ লে।

দুলাল মাথা নিচু করে।

নাগেশ্বরী মাথায় হাত রাখে।

মা এবার বলল, খিলুয়া দে।

চান্তারা মা-কে বোতল থেকে মদ ঢেলে দিল। আজ দেশি মদ নয়। ইংলিশ। গেলাসে হলুদ রঙা পদার্থ। দুলাল জানে, ওটা হুইস্কি।

—একটু টাকনি দিলি না?

ঝুমকা তাড়াতাড়ি বাদাম নিয়ে এল। বলল, একটু পরেই পকোড়া ভেজে দিচ্ছি মা।

মা আজ রাজরানি।

মা দুলালকে বলল—শোন, তুই হয়ে গেলি দুলালী হিজড়ানি, কিন্তু মনে ভাববি তুই রাজরানি। যদি পাস নাগরবাবু, ধমক মেরে করবি কাবু, দোলাবি কোমর, করবি খোমর। লিক্‌ম ভাড়া করবি নে, পারলে বাট্টু ভাড়া দিবি। খাবিদাবি কলকলাবি। মনখারাপকে কলা দেখাবি। ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া যাই পুষিস না কেন—ছ'টা ছ পুষতে ভুলবিনে। ছলনা, ছেনালি, ছাপান, ছেমো, ছেলেমি আর ছ্যাঁচড়ামি। 'ছল্লা' তুলে ছমকাবি। ছেমো মানে বুঝলি? পারিককে একটু রাগ দেখাবি। বেশি কথা কইবিনে, গোঁসা দেখাবি। আর ছাপান মানে অধিকার পিতিষ্টে করবি। পকট থেকে ফট করে কলম তুলে লিয়ে সুর করে বলবি, দেবো-ও-ওনি, রুমাল তুলে লিয়ে বলবি দেবো-ও-ওনি। যদি ঘরে বসে খিলুয়া খায়, দু'পেগ খাবার পর বোতল সরিয়ে লিবি। বলবি আর খাবেনি, আর মাল খেলে আমার মাথা খাও।

যখন বাঁধাই খাটতে যাবি, দেখতে চাইলে দেখাবি না। হাঁটু অবদি কাপড় তুলেই লাবিয়ে দিবি। লোকে জানতে চাইলে বলবি আমি জম্মো খুঁতো। জম্মো থেকেই নেই। লোকের মনে যত আহা আহা, তোদের মনে তত হাহা-হাহা।

আর শোন বলি। রেলে লেডিজে উঠবি। মনের মধ্যে নারী-ভাব আনবি। দুগ্গা মায়ের কথা ভাব, কী তেজ। কালী মা এক-এক কোপে এক-একটা মদ্দা মেরেছে। শিবকে পায়ের তলায় চেপে রেখে দিয়েছে।

নাগেশ্বরী মা খিলুয়া খেতে-খেতে এইসব বলছিল, আর সবাই মন দিয়ে শুনছিল। শুধু ছবি ওখানে ছিল না। ছবি রান্নাঘরে। কারণ ছবির ছিন্নি হওয়ার দরকার হয়নি কখনও, কারণ ছবিই কিছুটা মেয়েছেলে, ওর একসময় একটু-একটু মাসিক হত। সুতরাং ছবি রান্নাঘরে। মেয়ে কিনা। ওখানের ওর ডিউটি। কাজের মেয়েটা যদিও আছে, কিন্তু দেখভাল করার দায়িত্ব ছবির। গেরস্ত বাড়ির এই নিয়মের হিজড়ে-খোলেও ব্যতিক্রম হয় না।

খিলুয়া খাওয়াটা গুরুমা আগে শুরু করেছে। পরে পাশের সিনিয়াররা। দুলালকেও অল্পকারে দিল। গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে ঠং শব্দ করল। কে যেন বলল চিয়ার্স।

গুরুমা বলল এই চিয়ার্স বলা কে শুরু করেছিল জানিস?

সবাই জানে, কিন্তু বলতে নেই। গুরুমার মুখে এই একই গল্প বহুবার শুনেছে ওরা। কিন্তু 'জানি' বলতে নেই। শুনতে হয়।

গুরুমা বলছে—কামের দেবতা মদন দেব এটা চালু করেছিল। সগ্‌গে সবাই যখন খিলুয়া

পিটছিল, তখন মদন দেবতা বডিপার্টগুলো নিজেদের মধ্যেও 'বাহাস' করতে শুরু করল। মন বলছে মাল খেলে সবচেয়ে লাভ হয় আমার। খুব আনন্দ হয়। মুখ বলল না আমার। আমি মাল খেলেই খুব খিস্তি দিই। চোখে বলল আমি কিসে কম! আমি সব গোলাপি দেখি। জিভ বলছে আমার খুব ঝাল মশলা খেতে ইচ্ছে করে। হাত বলছে আমার খুব সেক্স করতে ইচ্ছে করে। বেচারা কান কিছু বলছে না। কান কাঁদতে কাঁদতে মদন দেবকে বলল আমার কী হবে?

মদন দেব বলল দাঁড়া, তোর জন্য ব্যবস্থা করছি। মাল খাওয়া শুরু হওয়ার আগে গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকিয়ে যে আওয়াজটা হবে, সেটা তোকে দিলাম। যাঃ।

এবার দুলালের দিকে তাকিয়ে বললেন—দুলালী, একটা সিব মার।

অনিকেত ঠিক করে, এবার থেকে দুলালকে দুলালীই লিখবে।

দুলালী আস্তে-আস্তে এই জীবনে অভ্যস্ত হতে থাকে। মাথায় লাগানো খাপড়িকে কখনও বিনুনি করা, কখনও উঁচু করে খোঁপা বাঁধা। ঘরে এলে ঠিক করে গুছিয়ে রেখে দেওয়া। চাত্তারা বলেছে, চুল কাটা বন্ধ করে দে, আস্তে-আস্তে চুল লম্বা হয়ে যাবে। তোর চুলের গোছ ভাল। কতগুলো আকুয়া-র বেশ ঝামেলা হয়। মাথায় টাক পড়ে। টাকটা মদ্দাদেরই বেশি হয় কিনা। তুমি তো বাবা লিকমধারী মদ্দা। বাইরের বডি ভিতরের মেয়েটার খড়খড়ি দিয়ে ডাকা কথা শুনবে কেন? ভিতরের মেয়েটা বাইরের বডিকে বলে, আমি মেয়েমানুষ, আমার মাথায় টাক ফেলো না গো, বডি শুনবে? ওদের সব সময় খাড়ি পরে থাকতে হয়, শুধু শোয়ার সময় ছাড়া। খারি পরে শুলে ঘুম আসে না। চাত্তারা দুলালীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, আমাদের গুরু মায়ের মাথায় মস্ত টাক। সবাই জানে। চ্যান করে ঘরে আসার সময় মাথায় গামছা দিয়ে আসে। তবুও বোঝা যায়। কম বয়সে ছিবড়ে নিলে নাকি টাক পড়ে না। গলার স্বরটাও খ্যারখ্যারে হয় না। দ্যাখ না, হাসির গলার আওয়াজটা কেমন ভারি মিষ্টি।

অনেক সময় সন্ধেবেলায় খিলুয়া-র আসর বসলে মাথা থেকে খাড়ি ফেলে দেয়। শাড়ি ছেড়ে শুধু সায়া পরে থাকে। যাদের ব্লাউজের তলায় ইলু ইলু বল থাকে, খুলে রাখে। যেন নিজের প্রত্যঙ্গ খুলে রেখেছে। সে এ আজব দৃশ্য। খিলুয়া-র ঘোরে কোনও-কোনও 'আকুয়া' দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে শুরু করে দেয়। কেউ দেখে ফেললে চার অক্ষরের গালি ছুড়ে মারলে বসে পড়ে। সকালে সবাই স্নান করে শাড়ি-শায়া মেলে দেয় উঠোনের তারে, গামছা বা শায়া বুক পর্যন্ত উঠিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে যায় যেন কেউ দেখে ফেলবে। এগুলো সব মায়ের শেখানো ছেনালি। ঘরে গিয়ে দাঁতে কাপড় কামড়ে দু'হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ লাগানোর চেষ্টা। আর বেচারা ব্রেসিয়ার, তার ওই কাপড়ের ঠোঙাটা তেমন কিছু না-পেয়ে হতাশায় দুমড়ে থাকে। ঘরের মধ্যে থাকলে সচরাচর ওর মধ্যে কিছু ভরে দেয় না। বাইরে বেরনোর সময় ভরে রাখে, কিংবা 'পারিক' বসাবার সময়। সব সময় যে জল-ভরা গোল বেলুন বা ইলু রাখে তা নয়। ইলু-টা বড্ড নড়ে, আর হালকা একটা জলের শব্দ করে ছলছল, ছলছল। ওই শব্দটা বড় করুণ। নদীর ঘাটের কাছে জলগুলো এই শব্দই করে। বড় বিষণ্ণ, বড় করুণ।

এই হল মুশকিল। দুলালের মধ্যে অনিকেত ঢুকে গেল। দুলালের পক্ষে ওই অনুভূতিটা দিলে বোধহয় ঠিক হয় না। বরং লেখা যায়—ইলু-র ওই ছপরছপ শব্দ শুনে মনে হয় ওর বুকে যেন অন্য কেউ বসে আছে।

এজন্যই তো অনেকে জল-ভরা বেলুনের বদলে রবারের বল রাখে। ওতে শেপ ভাল হয় না। তাই অনেকে বলটা মাঝখান দিয়ে চির অর্ধেক করে নেয়, কেউ-বা স্পঞ্জ বা ফোমের টুকরোর পুঁটুলি ঢুকিয়ে নেয়। অনেকের আবার হরমোনের গুণে, বা ছিন্নি হওয়ার কারণে, বা ট্যাবলেটের কারণে কিছুটা বুক তৈরি হয়ে যায়। তার ওপর ওরা প্যাডওলা ব্রেসিয়ার পরে।

গোঁপ-দাড়িগুলো এখনও মুশকিল করছে। সন্না দিয়ে কিছুটা গোঁপ-দাড়ি গোড়া থেকে তোলা হয়। ওর ঘরের সঙ্গী ময়না বা ঝুমকাই তুলে দেয়। আবার ময়নারও কিছু-কিছু তুলতে হয়। দুলাল পারে না, ঝুমকা তুলে দেয়। দুলালের খুব লাগে। ওই সময়টা মায়ের কথা মনে পড়ে দুলালের। গরমের সময় ফোঁড়া উঠত, সবাই বলত আম খাওয়ার ফোঁড়া। মা গরম জলে ন্যাকড়া দিয়ে ফোঁড়ার ওপর ধরত ফোঁড়া ফাটানোর জন্য। ফোঁড়ার পাশে দু'আঙুলে টিপত ফাটানোর জন্য। আর ব্যথা ভোলানোর জন্য বলত—ব্যথা কই? উড়ে গিয়েছে। ক্যামনে উড়ল? পাখা দিয়ে। কোথায় গেল? পান্তাভাতে। পান্তাভাত খেয়ে দুলুর পেট ঢাইঢাই। ওমা! ফোঁড়া দেখি নাই। আর এত বছর পরে গোঁপ-দাড়ির রোঁয়া টানার সময় ঝুমকা বলছিল, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, এই তো সোনা বেটি হল। এই তো সোনা স্বামী পেল। সোনা পাবে জম্মু লিকম। সোনার স্বামীর পকেট ঝমঝম।

তারপর একটু বোরোলিন মাখিয়ে দেওয়া মুখে।

সেজে-গুজে সকালবেলায় বাঁধাইয়ে বেরনোর সময় গুরুমা দরজায় দাঁড়ায়। ওরা দু'টো দলে ভাগ হয়ে কাজে যায়। দুলালী চাত্তারার দলেই আছে। সঙ্গে হাসি আর ঝুমকা। বাকি দু-তিনজন বাজারে বা ট্রেনে 'মাংতি' তোলে। যদি তিনটে দল হত, মা খুশি হত। একজন মায়ের 'ক্যালি' নির্ভর করে কতজনকে দীক্ষা দিয়েছে তার ওপরে। এই বিশ্বে সৃষ্টির নিয়মই হল সংখ্যা বাড়ানো। হিজড়েরা জন্ম দিতে পারে না, তবে তাদের সংখ্যা বাড়ে হিজড়ে-মা'র দাগ খেয়ে। দীক্ষাকে আদর করে ওরা বলে 'দাগ-খাওয়া'। গুরুমা ওর রোজগেরে দাগি মেয়েদের দেখে তৃপ্তি পায়। মা হাত নাড়ে। যেন বলছে, দুগ্গা দুগ্গা। যেন বলছে, জয় করে ফিরে এসো।

চাত্তারা-র ঢোলে ওর আঙুল নড়ে, খেলা করে। মৃদু শব্দ তৈরি হয় বুদুম বুম। বুদুম বুম। উত্তরের হাওয়া বয়। বসন কাঁপে।

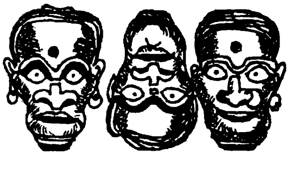

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি-র সামনে ম্যারাপ বেঁধে কবিতা উৎসব চলছে। প্রচুর কবির ভিড়। যাঁরা শ্রোতা, ওঁরাই কবি। আজ দু'টো পর্বে কবিতার অনুষ্ঠান। প্রথম পর্বের নাম 'দূরে নির্জনে', দ্বিতীয় পর্বের নাম করা হয়েছে 'উদ্ভাস'। 'দূরে নির্জনে' পর্বে মফস্‌সলের কবিদের ডাকা হয়েছে। 'উদ্ভাস' পর্বে নবীন, নতুন কবিদের।

এখন বিকেল পাঁচটা। শীতকাল, সন্ধে নেমে গিয়েছে। দর্শকাসনে ভিড় মোটামুটি ভালই। দূরদূরান্ত থেকে কবিরা এসেছেন, সঙ্গে স্ত্রী, কেউ-বা সন্তান নিয়ে। বাঁকুড়া-বীরভূম-

মেদিনীপুরের কবিরা অনেকেই প্রবল প্রেমের কবিতা লিখলেও প্রেমিকা নিয়ে কলকাতা আসার সাহস দেখাতে পারেন না। তবে অধিকাংশ কবির প্রেমিকা-ই হল 'মানসী'। মনের গহনে থাকে।

এখন যেমন, একজন অতি নিরীহ কবি বলছেন—'আমার রতি-প্রার্থনা ফিরিয়ে দিয়েছ তুমি, আমি সন্ত্রাসবাদী হয়ে উপড়ে দেব ট্রেন লাইন। মাইন পুঁতে রাখব পথে-পথে, তারপর এক আশ্চর্য মেশিনগানে ট্রিগার টিপব, যেখান থেকে ধাবিত হয় চুম্বন।' লোকটি পাজামার ওপর একটা কাজ করা পাঞ্জাবি পরেছেন। চুল বড়। রোগা শরীর। বয়স চল্লিশের মতো হবে। চামড়া কুঁচকে গিয়েছে।

একজন মহিলা-কবি, মেদিনীপুর থেকে এসেছেন। আধুনিকা হওয়ার চেষ্টায় চোখে কালো চশমা। কবিতা পাঠের পূর্ব মুহূর্তে কালো চশমা খুললেন। ওঁর কবিতা পাঠকালীন ঘন-ঘন ফ্ল্যাশ জ্বলতে লাগল। একজন বালক ও এক প্রায়-প্রৌঢ়ের মধ্যে ক্যামেরা টানাটানি চলছে। বালকটি কেবল বলছে, বাবা, আমায় দাও, আমি তুলব।

পরের পর্বের তরুণ কবিরা পেছনের দিকে জটলা করছে। অনেকের গায়ে বাহারি পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবের সন্ত্রাস এখন পাঞ্জাবিতে চালান হয়েছে। কোনও পাঞ্জাবিতে লেখা—'হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমাবে সে শিশিরের জলে'। লম্বা পাঞ্জাবির তলায় পাজামা-মোড়া লিকপিকে 'হলুদ কঠিন ঠ্যাং' দেখা যাচ্ছে। কোনও-কোনও পাঞ্জাবিতে লেখা 'শুধুই নীরার জন্য'। অন্য কোনও তুর্কি-কবি অন্য তুর্কিনীকে বললেন—এরা এখনও নীরা নিয়ে পড়ে আছে।

অনিকেত কলকাতা 'মিস' করে। মানে, এই সব অনুষ্ঠানগুলো। একাই ঘুরছে। দু'-একজন পরিচিতের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। এমন সময় ঘোষণা হল—এবার বর্ধমানের ভাতার থেকে আসা প্রেমার্থ কবি কবিতা পড়বেন।

'প্রেমার্থ কবি'? এই কবিকে মনে পড়ল অনিকেতের, কবিতা পাঠাতেন রেডিও-র সাহিত্য অনুষ্ঠানে পাঠ করার জন্য। অমোঘ লাইন কয়েকটা এখনও মনে আছে। 'তুমি নারী নিউটন-ফেল আকর্ষকরণী তুমি নারী আলফা বিটা গামিনী...'। ওখানে বারবারই রিজেক্টেড হয়েছেন, কিন্তু কাব্যসাধনা চালিয়ে গিয়েছেন।

একটা হুইলচেয়ারে বসে আছেন একজন ছোটখাটো মানুষ। একজন মহিলা ঠেলছেন। মঞ্চের সামনে নিয়ে গেলেন হুইলচেয়ার-টা। মঞ্চের ওপর হুইলচেয়ার ঠেলে তোলার ব্যবস্থা নেই। সিঁড়ি আছে। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠানো যাবে না।

ঘোষক বললেন, আমাদের এই কবি শারীরিক প্রতিবন্ধী। উনি মঞ্চে উঠতে পারবেন না। উনি মঞ্চের সামনেই হুইলচেয়ারে কবিতা পড়বেন।

প্রেমার্থ কবি-র কবিতা সম্পর্কে একটা ব্যঙ্গভাব ছিল অনিকেতের। এক মুহূর্তে নিজেকে ছোট মনে হল। মানুষের কত দিক থাকে। একদিক দিয়ে দেখলে একটা মানুষকে বোঝা যায় না। পিরানদেলো-র কথা মনে পড়ল। পিরানদেলো বলতেন, সামগ্রিক সত্য খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। একটা দৃষ্টিকোণে যেটা 'সত্য' বলে মনে হয়, অন্য দৃষ্টিকোণে সেই 'সত্য' পাল্টে যায়। প্রেমার্থ কবি-র সামনে মাইক্রোফোন রাখা হল। উনি পড়ছেন—

তোমায় নিয়ে চাঁদে গেছি। চাঁদেতে কম 'জি'
তোমায় আমি কাঁধে নিয়ে কেবল লাফাচ্ছি
যেই না তোমায় চুমু খেলাম অমনি কী হল—

বিদ্যুৎ মোক্ষণে তৈরি অশান্ত এইচ টু ও।
তৈরি হল জলের ধারা আমরা সাঁতরাচ্ছি
চাঁদেতে খুব সাঁতরে মজা ওখানে কম 'জি'

অনিকেত এবার 'জি'-র মানেটা বুঝল। ওটা 'G' : গ্র্যাভিটেশন। মাধ্যাকর্ষণ এর ধ্রুবক-কে 'G' শব্দে চিহ্নিত করা হয়। কবিতাটা বেশ বড়ই। কম করে কুড়ি লাইন। কোমরের তলা থেকে বাকি অঙ্গগুলো কাজ করে না। ও কবিতায় লাফাচ্ছে, সাঁতরাচ্ছে, উড়ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে চন্দ্রলোকে। অনিকেতের খুব ইচ্ছে হল কবিটির সঙ্গে আলাপ করে।

—আপনি বুঝি খুব বিজ্ঞান-মনস্ক, তাই না?

কবি বললেন, ঠিক ধরেছেন। আমি প্রেমের সঙ্গে সায়েন্স-টা পাঞ্চ করে লিখি। এই কবিতার ওই জায়গাটা বুঝতে পেরেছেন তো, যেখানে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে জল তৈরি হল। এজন্য বিদ্যুতের স্পার্ক লাগে। চুম্বন হল সেই পার্ক।

অনিকেত বলল, হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু চাঁদে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন কোত্থেকে এল সেটা বুঝতে পারিনি।

প্রেমার্থ কবি হাসলেন। বললেন, ওটা কবি-কল্পনা।

—'প্রেমার্থ' তো ছদ্মনাম। একটা আসল নাম আছে তো?

—এটাই আসল এখন। এই নামেই সবাই চেনে।

—'প্রেমার্থ' মানে কী?

—'প্রেমই অর্থ যার'। অর্থ মানে 'মানি' নয়। 'মানে'।

—ও, আপনি সায়েন্সের স্টুডেন্ট?

—ওই আর কী, বিএসসি-তে ভর্তি হয়েছিলাম। তারপর তো অ্যাক্সিডেন্ট। আমি সাইকেলে, মোটরগাড়ি ধাক্কা মারল। শিরদাঁড়াটা গেল, শিরটা ঠিকঠাক রয়ে গেল ভাগ্যিস!

—কবিতা লেখা ছাড়া আর কী করেন?

—সারের দোকান আছে। 'প্রেমার্থ সার সম্ভার'। প্রেমই সকল কিছুর সার। আর জীবনে পটাশ বলুন, ইউরিয়া বলুন, সবই তো প্রেম। এ নিয়ে আমার একটা কবিতা আছে। চারদিকে তাকান 'প্রেমার্থ কবি'। যে-মহিলা হুইলচেয়ার ঠেলছিলেন, তিনি বললেন, ওটা এখন থাক। শোনা যাবে না। নতুন কবি উঠে গিয়েছে।

'প্রেমার্থ কবি' পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার স্ত্রী। রঞ্জনা।

রঞ্জনা হাসলেন। সবচেয়ে ভাল, দিব্য কবিতাটি রচিত হল যেন, অথবা বলা যায়, কবিতা উৎসবটাই ঝলমল করে উঠল।

এই যে প্রেমার্থ কবি, যাঁর নিম্নাঙ্গ অবশ, তিনি উদ্দাম প্রেমের কবিতা লেখেন। যাঁর নিম্নাঙ্গ ক্রিয়াহীন, তাঁর প্রেমিকা আছে। স্ত্রী আছে। প্রেম নেই নয়, প্রেম-ও আছে। হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে। কেমন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস পড়ল অনিকেতের। অনিকেত এবার একটু পিছনের দিকে যায়। কয়েকজনের একটা জটলা। দেখেই বোঝা যায়, ওদের 'কোতি' ভাব। ওখানে পরিমলকে দেখতে পেল অনিকেত। মঞ্জুর ছেলে। পরি। অনিকেত দূরে সরে গেল।

পরিমল কবিতা পড়ার ডাক পেয়েছে। পরিমল 'প্রবর্তক' পত্রিকায় দু'টো কবিতা লিখেছিল—'পরি' নামে। নিজের অনুভূতির কথা লিখেছিল ওখানে। মামার বাড়ি গিয়ে জিম করতে দেখা পেশি-শরীরের পুরুষ, যার গায়ে ঘামের শিশির, সেরকম পুরুষ-শরীরের মুগ্ধতার কথা লিখেছিল, জয় গোস্বামীর 'বেণীমাধব বেণীমাধব' কবিতাটার ছন্দ চুরি করে। পরে বুঝেছিল ওগুলো কিছু হচ্ছে না, কবিতার ধরন পাল্টে ফেলেছিল। নামটাও পাল্টে ফেলেছিল। নাম নিয়েছিল সৌগত পাল। সৌগত পাল নামে 'অবমানব' পত্রিকায় কবিতা লিখেছিল দু'টো। ওই সব কবিতায় নিজের অস্তিত্বের সংকট ও লিখতে চেষ্টা করেছিল। ও লিখেছিল—'দ্বিঘাত শরীরে অনেক মায়ার বাস...।' এখন শুধু নিজের লিঙ্গ-প্রবণতার কথাই লেখে না, ও বুঝেছে কবিতার আরও অনেক বিষয় আছে। নিজের যৌন-পরিচয়ের সমস্যা নিয়েই লিখবে কেন? একজন কবির অনুভূতিতে পৃথিবীর নানা বিষয় নাড়া দিতে পারে। নানা পত্র-পত্রিকায় কবিতা পাঠিয়েছে পরি 'সৌগত পাল' ছদ্মনামে। ছাপাও হয়েছে কিছু-কিছু। 'দেশ' পত্রিকাতেও পাঠিয়েছিল দু'টো। ছাপেনি।

'চক্রবাক', 'মায়ামৃদঙ্গ', 'সোনার তরী' এসব পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ওর কবিতা। সম্পাদকরা দেখাও করতে চেয়েছে কফি হাউসে, কিন্তু ওসব দেখা-সাক্ষাৎ সুখের হয়নি। কারণ ওর মেয়েলিপনা। প্যাঁক খেয়েছে। কখনও মৃদু, কখনও জ্বালা-ধরা। আঁতেলদের নানা স্তর আছে। উচ্চস্তরীয় আঁতেল-মন্তব্য এরকম—তুমি তো দেখছি পৌরাণিক কবি। 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ' থেকে উঠে এসেছ মনে হয়। 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ' মানে—কমল চক্রবর্তীর লেখা হিজড়েদের নিয়ে একটা উপন্যাস। উপন্যাসটা পড়েনি পরিমল, তবে নাম শুনেছে। আর একেবারে পেতি-আঁতেলদের মন্তব্য, এরকম লিরিক লেখো?

—কেন বলুন তো?

—কয়েকটা আধুনিক লিরিক লিখে তবে ওদের দিয়ে দাও, যারা ঢোল বাজিয়ে গান করে।

আর এই দুই ধরনের মাঝমাঝি অনেক মন্তব্য শুনতে হয়েছে ওকে। ওরা কফি হাউস ছেড়ে যখন অন্যত্র আড্ডা মারতে গিয়েছে, ওকে নেয়নি।

যখন টেবিলে পুঁজিবাদের সংকট কিংবা ফান্ডামেন্টালিজ্ম সম্পর্কে কোনও আলোচনা হত, সবাই যে যার মতো ভাট বকত, তখন ও কিছু বলতে চাইলেও, থামিয়ে দেওয়া হত। যেন এসব বিষয়ে কথা বলার মতো 'ফান্ডা' ওর নেই।

ও 'সৌগত' নামে লেখার আগে 'পরি পাল' নামেও লিখেছে দু'-একটা কবিতা। সেক্ষেত্রে আবার অন্য সমস্যা। একটা কবিতা লিখেছিল এরকম :

ও বাবু, মাথায় পালক টুপির বাবু,
ফের কেন বউ আনবে ঘরে
আমার মতন মেয়েকে যখন
রেখেছো আদর করে
আরও মাংস চাও তুমি, তুমি মাংসভুক
কোথায় কতটা মাংসে তোমার শরীরে আসে সুখ...

সম্পাদক একটা পোস্টকার্ড ছেড়েছিল :

প্রিয় পরি, আসুন না কোনও শনিবার। বসন্ত কেবিনে বসি, কলেজ স্ট্রিটে। কফি হাউসের

ভিড়ভাট্টায় বসি না। বসন্তে নিজেরা ক'জন স্বজন থাকি। আরও ভাল লিখুন। সৌরভ রায়, সম্পাদক। চারুশিল্প।

পরি দেখা করতে গিয়েছিল। ব্যাগে আরও দু'টো কবিতা ছিল।

কতদিন পর 'বসন্ত কেবিন'-এ এল পরি। লাস্ট অরূপদা নিয়ে এসেছিল বছর খানেক আগে। ব্রেস্ট কাটলেট খাইয়েছিল। 'ব্রেস্ট' বললেই কী যেন মনে হয়। কেমন যেন।

বসন্ত কেবিনে খুব বেশি ভিড় থাকে না। ভিতরে একটা টেবিলে দেখল পাঁচ-ছ'জন। দু'জন মহিলা। জায়গাটা ধোঁয়াময়, মানে কয়েকজনের সিগারেটের সমবেত ধোঁয়া। পরি জিগ্যেস করেছিল, এখানে কি সবাই চারুশিল্প-র লোকজন?

—হ্যাঁ। কাকে চাই?

—সম্পাদক আছেন? সম্পাদক আমাকে দেখা করতে লিখেছিলেন।

বাহারি ফতুয়া পরা একজন অবাক চোখে তাকায় পরির দিকে। বয়স বছর চল্লিশ।

—আপনার নাম?

—পরি পাল।

—আপনি পরি পাল?

অবাক চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে সম্পাদক। ওর শরীরটা জরিপ করতে থাকে।

সেদিন পরি প্যান্ট-শার্ট পরেই গিয়েছিল। একটু ঢোলা শার্ট। ভেতরে-ভেতরে কিন্তু 'ব্রেস্ট' একটু করে তৈরি হচ্ছিল ওর। 'প্রবর্তক', 'বম্বে দোস্ত' এসব পত্রিকার উপদেশ-মতো রোজ একটা করে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বড়ি খাচ্ছিল। ওসব বইতে ইস্ট্রোজেনের কথা লেখা ছিল। কিন্তু ডাক্তার না-লিখে দিলে ওষুধের দোকান ওসব ওষুধ দেবে কেন? অরূপদাকে কতদিন বলেছিল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। কিন্তু অরূপদা নিয়ে যায়নি। উল্টে অরূপদা বলেছিল, মালা-ডি খাও, ওতেই হবে। সস্তা-ও।

একটু-একটু করে হচ্ছে কিন্তু। 'গোকুলে বাড়িছে'। কিন্তু এখনই শালোয়ার-টালোয়ার পরার ইচ্ছে নেই। আর একটু হোক...।

সম্পাদকের কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! সেই দৃষ্টির তাপ খাদির কাপড় ভেদ করে ওর বুকে গিয়ে লাগে।

নাম শুনে আমাকে মেয়ে ভেবেছিলেন, না? পরি বলে।

সম্পাদক বলেছিলেন, হ্যাঁ, তাই। এছাড়া কবিতাটাও তো নারীবাদী কবিতা...।

একটি দাড়িওলা ছেলে বলে উঠল, সে কি সৌরভদা, নতুন লোক দেখে ভদ্র হয়ে গেলেন? আপনি তো 'মাগিবাদী' বলতেন...।

সম্পাদক হেসে বললেন—ওই একই হল। পরির দিকে তাকিয়ে বললেন, বসুন বসুন।

কোথায় বসবে? টেবিলের তিন দিকেই চেয়ার। দু'জন মহিলা পাশাপাশি বসে আছেন। ওঁদের পাশে একটা বেঞ্চি আছে। ওখানেই বসল। ও বসতেই, মেয়েরা একটু করে সরে গেল।

সম্পাদক বললেন, এই নামগুলো বেশ কনফিউজিং। নন্দিনী, পরি—এগুলো কখনও ছেলেদের নাম হয়? আচ্ছা, ডোন্ট মাইন্ড, আপনি কি পিওর ব্যাটাছেলে?

একটি মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলেন। পিওর ব্যাটাছেলে...হিহি, হিহি। অন্য একজন

বললেন, লালিমা পাল (পুং)। পরি বলল, লালিমা পাল (পুং) হই বা মুং হই, কবিতাটা কি ভাল হয়েছিল?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়ই ভাল হয়েছিল, নইলে আসতে বলব কেন?

পরি তখন ব্যাগ থেকে দু'টো কবিতা বের করে। ওদের টেবিলে রেখে একটা গেলাস চাপা দেয়। বলে, ভাল লাগলে ছাপবেন। উঠে পড়ে পরি। বেরিয়ে যায়।

বেশ তেজ দেখাল পরি, কিন্তু যখন ও বসন্ত কেবিন থেকে বেরচ্ছিল, তখন বেশ বুঝতে পারছিল মোটেই খটমট খটমট করে স্মার্ট ফুট স্টেপ পড়ছে না। ও যেমন হাঁটে, তেমনই হাঁটল। একটু বঙ্কিম। কোমর এবং হাত দোলে।

ওই কবিতাগুলো ছাপা হয়নি কখনও। আগে 'প্রবর্তক' পত্রিকায় শুধু 'পরি' নাম দিয়ে যা লিখেছে, ওগুলো হাবিজাবি। বাংলা অনার্সের ছাত্র হয়ে ও বেশ বোঝে। ওই লেখাগুলো থেকে নিজেকে কিছুটা আলাদা করার জন্য 'পরি পাল' নামে লিখতে গেল। ও বুঝল, সম্পাদকরা ওকে মহিলা ভাবছে, মহিলা ভেবে আহ্বান করছে, কিন্তু ওরা তো ভিতরের মহিলা-সত্তাটাকে দেখতে পাচ্ছে না, যেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট, যেটার মূর্তি নেই, ওরা তো বাইরেটাই দেখছে, দেখে আশাহত হচ্ছে। আর এটাও বেশ বোঝে যে, মেয়ে হলে কবিতা ছাপাতে সুবিধে হয়। সম্পাদকরা প্রায় সবাই পুরুষ, এবং মেয়েদের ওপর একটা বিগলিত ভাব দেখায়। ওসব সুবিধা আহরণ করার দরকার নেই, থাক। পরি ভেবেছিল পুরুষ-নামেই লিখবে—যতদিন না পরিপূর্ণ নারী না-হতে পারছে। 'পরিপূর্ণ' মানে বাইরের পূর্ণতা। 'বাইরের পূর্ণতা' মানে নারীসুলভ মাংস-সংস্থান। মাংস ব্যবস্থাপনা।

কিন্তু পরিমল নামটা ব্যবহার করতে ইচ্ছে করল না একদম। এই নামটা ওর স্কুল-কলেজে। আইডেন্টিটি কার্ডে। এই নামটাকে ভালবাসে না ও। একটা নতুন নামে লিখবে। হঠাৎ 'সৌগত' নামটা মনে এল ওর। হাতের কাছে 'অবমানব' পত্রিকাটা ছিল। ওটা কিনত 'পাতিরাম' থেকে। সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যার সম্পাদক। কবিতাটা ছাপা হয়েছিল। এরপর সৌগত পাল নামে আরও কবিতা লিখেছে বেশ কিছু কাগজে। সেই সুবাদেই আজকের কবিতা উৎসবে ডাক পাওয়া।

অরূপদাকে আসতে বলেছিল, অরূপদা আসেনি। কবিতা লিখেও তেমন কবি-বন্ধু হয়নি ওর। ওর 'মেয়েলি' চালচলন আধুনিক, পোস্টমডার্ন, বারদুয়ারি-খালাসিটোলা ফেরত মুক্তমনের কবিরাও মেনে নিতে পারেন না।

সৌগত পালের নাম ঘোষণা হল। মঞ্চে ওঠার সময় ওর মনে হচ্ছিল, ও আসলে কে? পরি? পরিমল? না কি সৌগত?

ও একটা অন্যরকম কবিতা এনেছে। নারীবাদীও নয়, ওর দ্বিখণ্ডিত সত্তারও নয়, অন্যরকম। অন্যরকম মানে 'সাধারণ'। পাঁচ পাবলিকের কবিতা :

আমার প্রথম কবিতার নাম 'ঋণ'।
সব ঋণ শোধ করে দেব একদিন।
যা কিছু শুশ্রূষা পেয়েছ, তার
হিসেব রেখেছি রুমালের গিঁটে।
যা কিছু অপমান, সেটাও সঞ্চয়

শরীরে ব্লেডের দাগে হিসেব রেখেছি।
যত ঋণ আছে কাশে, কিংশুকে
হিসেব রেখেছি ছোট এই বুকে
বহে যাওয়া জল, কেশে যাওয়া বুড়ো বাস
সবাইকে বলি আয়, আয়, আয়
ভালবেসে সব ঋণ শোধ করা যায়।...
দু'টো করে কবিতা পড়ার কথা ছিল। পরের কবিতা :
একটা পদ্য লিখে ফেলে দেখছি রে ভাই
ভুলে-ভরা পদ্যখানা শোধরানো চাই
আসলে তো পদ্যখানা নিজের কথা
জীবনটাতে ভর্তি কত ছাতা-মাথা
শোধরাব কী? পাণ্ডুলিপি নয়তো জীবন
কিংবা কোনও চিত্রনাট্য, যেমন-তেমন
বদলে দেব কেটে-জুড়ে এমন করে
মহান পাঠক পড়েন যাতে শ্রদ্ধাভরে...

পড়তে গিয়ে ওর মনে হচ্ছিল, এটাও তো নিজের কথা বলা হয়ে গেল, পরির কবিতা এটা, সৌগত পালের নয়। এ এক মহা মুশকিল, নিজেকে একবার বিভক্ত করা, আবার বিভক্ত-সত্তাকে জোড়া দেওয়া। পরিমল বা পরি বা পরি পাল বা সৌগত কবিতাটা পড়ল। তেমন হাততালি কিছু পড়ল না। কবিতা পাঠের আসরে এক অদ্ভুত ব্যাপার। কে যে শোনে, কী যে শোনে...। কবিতা-পাঠ চলাকালে পাশের লোকের সঙ্গে গল্প করে। আবার কবিতা শেষ হলে যন্ত্রের মতো হাততালি দেয়। ওই তালিতে যে খুব উচ্ছ্বাস থাকে তেমন নয়। দিতে হয় বলে 'তালি' দেওয়া। কোন মানে নেই। হিজড়েদের 'তালি'তে তবু মানে থাকে।

কবিতা পাঠ করে প্রথম টাকা পেল আজ। একটা খামে কড়কড়ে পাঁচটা পাঁচশো টাকার নোট। একটা ব্যাগ। এই ব্যাপারটা বেশ ভাল লাগল।

সামনে দু-একজন ওকে দেখে কেমন করে যেন তাকাল। ওর মনে হল। এসব জায়গায় কিছু মানুষ আসে নেহাত সময় কাটাতে। করার কিছু নেই। কিছুটা সময় বেশ কেটে যায়। বাংলা আকাদেমি সভাগৃহে কিছু মুখ সব অনুষ্ঠানেই থাকে। পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠান হোক, হিরোশিমা দিবস উদ্‌যাপন হোক, তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা হোক, বা কবিতা পাঠের আসর হোক। দু-একজন মহিলাও আছেন এই দলে। কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরা, হালকা লিপস্টিক দেওয়া একজন ষাট ছুঁইছুঁই মহিলা পরিমলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। ওই মহিলা আগের জন্মে ব্রাহ্ম ছিলেন নির্ঘাত। না কি মোনালিসা? ওই হাসিটা প্রশংসার না ব্যঙ্গের ঠিক বোঝা গেল না।

হয়তো প্রশংসারই হবে, মুগ্ধতারই হবে। কিন্তু ওর কেন যে এরকম মনে হয়...।

ও আবার সেই আগেকার ঠেক-এর দিকেই যায়, যেখানে পরি আড্ডা মারছিল। আগের ছেলেগুলোর সঙ্গে আরও দু'জন যুক্ত হয়েছে এখন। যে-দু'জন এসেছে, ওরা মেয়েলি পোশাকে

এসেছে। একজন জিন্‌সের সঙ্গে টাইট গেঞ্জি পরেছে। ওর নাম অলোক। ও একটা এনজিও-তে কাজ করে। বিদেশি এনজিও। ওর বয়স সাতাশ-আটাশ। খুব সেজেছে। দু'কানেই চকচকে আমেরিকান ডায়মন্ড। ঠোঁটে চকোলেট-রং লিপস্টিক। বুকটা বেশ স্ফীত। এবং এই স্ফীত বক্ষে সে বেশ গর্বিত, এটা প্রকাশ করছে। আর একজন এসেছে, তার নাম ছিল রতন। সে নিজেকে 'রত্না' বলে প্রকাশ করে। সে কুর্তি-পায়জামা পরেছে। একটা বেগুনি ওড়নাও আছে। বারবার ও ওড়না দিয়ে বুকটা ঢাকার অছিলা করছে। ওর মুখে উজ্জ্বলতা নেই। ধূসর পাণ্ডুলিপির একটা পৃষ্ঠা ওর মুখের ভিতরে মিশে আছে। ওরা এসব জায়গায় আসে। সোমনাথের সঙ্গে এরা অনেকেই পরিচিত ছিল। সোমনাথ যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন এখানে আসত, ও যেহেতু সংস্কৃতি-মনস্ক, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী, গানমেলা, কবিতা উৎসব—এসব অনুষ্ঠানে আসত, এসব ছেলে-ছুকরিরাও আসত। সোমনাথ এখন আর আসতে পারে না, কিন্তু এরা আগে। বলা যায় নন্দন চত্বরে এদের একটা ঠেক হয়।

পরি আসতেই দু'জন একসঙ্গে বলে উঠল—অ্যাই, কত পেলি? পাঞ্জা? না কি ডবল পাঞ্জা?

পরি বলল, যাই পাই না কেন, তোদের খাওয়াব বলেছি, খাওয়াব।

একজন বলল, অলোকদাও খাওয়াবে। কী বানিয়ে এনেছে দ্যাখ না বম্বে থেকে।

টাইট গেঞ্জি-পরা অলোক বুকটা নাড়িয়ে বলল, দেখলে হবে? খরচা আছে। কত দিনের সাধনা জানিস? সেই কবে থেকে হরমোন নিচ্ছি বল, মুদি দোকানের মালা ডি নয়, রীতিমতো এন্ডোক্রিনোলজিস্ট দেখিয়ে। তারপর বোম্বে গেলাম। আমি ভাই 'মুম্বই' বলতে পারি না, বোম্বে বলি। 'বোম্বে দোস্ত' পত্রিকা পড়তাম তো, একদম বোম্বাই মাল বানিয়ে এনেছি, বাড়ি এলে খুলে দেখাব। সবাইকে নয়, কবিকে।

—কেন? কবিকে কেন?

—ওটা দেখে ও দু'লাইন লিখে দেবে। 'দেখলাম আহা দু'টো চাঁদ—ফেঁদেছে কী আজব ফাঁদ...' পরির থুতনি নাড়িয়ে দিল।

অন্য একজন বলল, ওর কি চাঁদে লোভ আছে? ওর গাজরে লোভ।

অলোক বলল, ওর এখনও চাঁদে লোভ আছে, পেয়ারা-বাতাবি সব কিছুতেই, গাজরেও। তাই না রে ভাই?

আবার থুতনি নাড়িয়ে দিল পরির।

অলোক টাইট গেঞ্জি পরেছে বটে, উঁচিয়ে আছে, কিন্তু গলাটা ঘরঘরে।

তুলনায় রতনের গলাটা অনেক কোমল। সরু। রতন নাকি একটা নির্দিষ্ট খাদে গলা সাধে। রতন বলল, অ্যাই শোনো, কী খাওয়াবে খাইয়ে দাও। অলোকদা, টাকা বার করো, পরি, টাকা বার করো। ঠান্ডা লাগছে। গলা খারাপ হয়ে যাবে।

অলোক ওর খরখরে গলায় বলল, উঃ, খুব যে গলা কনশাস, তোর ওড়নাটা দিয়ে গলাটা পেঁচিয়ে নে না। না কি বুক থেকে ওড়না ওঠাবি না। কেউ মাই দেখে ফেলবে? আরে এটা তো পাঁচ টাকার মাই। আমার সব নিয়ে ষাট হাজার খরচা হয়েছে। ব্যাংক লোন করেছি। আরে ভাই, মন চাই, দিল চাই। যেটা চাইব, করে ছাড়ব। তাই না রে পরি?

পরির হাতটা চেপে ধরল। হাতটা টেনে নিজের বুকে ঠেকাল অলোক, বলল, ষাট হাজার। কেমন? সিলিকোন। দামি সিলিকোন। পরির হাতটাই ফের টেনে নিয়ে রতনের বুকে ঠেকাল। ন্যাকড়া। ন্যাকড়া। তাই না পরি?

রতন খুব অপমানিত হল।

বলল, ছিঃ, তোমাদের ঘেন্না করি। আই হেট। অলোকদা, তোমার সব অহংকার একদিন বিলা হয়ে যাবে। আমি এখানে থাকব না। তুমি পারলে সবার সামনে ন্যাকড়া বলতে? থপথপ করে তো হেঁটে যায় রতন। ওদের সঙ্গ ত্যাগ করে। 'নন্দন' ছাড়িয়ে শিশির মঞ্চের দিকে চলে যায়।

এর মধ্যে কেন আমায় জড়ালে? পরি অলোককে বলল, তুমি কী, অ্যাঁ?

পরিও ঠেক ছাড়ল। কী অসভ্য দ্যাখ, না খাইয়ে পালাল। পেছনে শুনতে পেল ফিসফিস।

রতন পরির খুব ভাল বন্ধু। রতনকে নানা কারণেই পরির বেশ ভাল লাগে। খুব ভাল সফ্‌ট টয় করে। খুব ভাল আর্টিস্টিক সেন্স। দোকানের লোকজন এসে ওর ঘর থেকে টেডি বেয়ার, তুলোর বার্বি, হাতি, পাখি এসব তৈরি করে। ফেব্রিক-ও করে। ওর সফ্‌ট টয়ের ঝড়তি-পড়তি তুলো আর স্পঞ্জ দিয়ে ইলু বানায়। বেশ ভাল হয়। পরিকেও একটা সেট প্রেজেন্ট করেছিল রতন। কলেজে বেশি দূর পড়াশোনা করতে পারেনি রতন।

ওর বোনকে কলেজে পড়ায়। ওর বাবার রোজগারপাতি ভাল নয়। স্ট্রাগ্‌ল তো করছে রতন। 'রত্না' হওয়ার স্ট্রাগলটা চালাচ্ছে। কত কষ্ট করে গলাটাকে এরকম সফ্‌ট করেছে, ভাবা যায় না। পরি গিয়ে রতনের পাশে বসল। পিঠে হাত দিল। হাত বুলোতে থাকল। পরি রতনের পিঠের ব্রা-এর স্ট্র্যাপ টের পায়।

রতন বলল, অলোকদার বাপের টাকা আছে, ভাল করে ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট করিয়েছে, তাতে আমাকে প্যাঁক দেবে কেন? আমি আমার মতো করেছি, যা পেরেছি করেছি। আমি তো আর ওর মতো টাইট গেঞ্জি পরে, লোক দেখাচ্ছি না, কিন্তু আমি যদি টাইট গেঞ্জি পরি, ওর চেয়ে মোটেও খারাপ দেখতে হবে না। তাই বলে 'ন্যাকড়া' বলবি? এটা 'এলজিবিটি ইউনিটি'? আমি একদম একা-একা থাকব। তোদের কারও সঙ্গে হার্গিস মিশব না। চোখ দিয়ে জল বের হয় রতনের।

পরি ওর চোখের জল মুছিয়ে দেয়—রুমালে।

বলে, ভ্যাট, এ নিয়ে এত সেন্টিমেন্টাল হচ্ছিস কেন? ওর কথা উড়িয়ে দে। আমার খারাপ লাগছে ও আমাকে ব্যবহার করল বলে। আমার হাতটা ধরে টেনে নিয়ে তোর বুকে লাগিয়ে দিল। আমি কী করে বুঝব বল যে, ও আমার হাতটা ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে? রাগ করিস না, হ্যাঁ? পরি রতনের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে অন্য হাত কাঁধে।

এই সময় পুলিশ আসে। সাদা ইউনিফর্ম পরা পুলিশ। কী হচ্ছে এখানে?

অনিকেতের সঙ্গে তথ্য দপ্তরের একজন অফিসারের দেখা হয়ে গিয়েছিল। নন্দন-এর ভিতরে ঢুকে গল্প করছিল। যখন বেরিয়ে এল, বাড়ি যাবে, তখন দেখল, একটা পুলিশ, দু'হাতে একজনের কলার, অন্যজনের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একজন কুর্তি-পায়জামা পরা। অন্যজনের ছেলের পোশাক। পিছন দিক থেকে মনে হল-পরিমল হতে পারে।

অনিকেত দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে আসে। দেখল সত্যিই পরিমল। এবং অন্যজন মেয়েদের পোশাকে-থাকা পুরুষ।

অনিকেত বলল, এদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? পুলিশটির ইউনিফর্ম থেকে ঘামের গন্ধ আসছিল। ওর গলায় মাফলার ছিল। মাফলারটা গলা থেকে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দুই হাতে দু'জন—মাফলারটা পড়েই গেল। অনিকেত মাফলারটা উঠিয়ে দিয়ে পুলিশের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, ওদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

—থানায়।

—কেন?

—নুইসেন্স করছিল। থ্রি সেভেনটি সেভেন-এ রীতিমতো অফেন্স।

—নুইসেন্স? নুইসেন্স মানে?

—বোঝেন না? জাপ্টাজাপ্টি চলছিল।

অনিকেত বলল, ওখানে আরও কত ছেলেমেয়ে বসে আছে। ওরাও তো কত কী করে। এদেরই ধরলেন কেন?

—ওরা থ্রি সেভেনটি সেভেন-এ পড়ে না। এরা দু'জনই ব্যাটাছেলে। বুকের ভিতরে স্পঞ্জ ঢুকিয়ে মেয়ে সেজে আছে। খুলে ফেললেই স্পঞ্জ-এর দলা বেরবে। দু'টো ব্যাটাছেলে এরকম করতে পারে না। আইন আছে।

অনিকেত 'আইপিসি ৩৭৭' ধারাটা জানে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে পশু কিংবা পুরুষের সঙ্গে যৌনতাও অপরাধ হিসেবে দেখা হয়। কারনাল ইন্টারকোর্স এগেনস্ট দ্য অর্ডার অফ নেচার উইথ এনি ম্যান, উওমেন অর অ্যানিম্যাল শ্যাল বি পানিশ্ড। ৩৭৭ বলছে, যদি স্ব-ইচ্ছাতেও কারনাল ইন্টারকোর্স হয়, তা হলেও অপরাধ হবে। এর বিরুদ্ধে 'প্রবর্তক' পত্রিকায় লেখা পড়েছে। 'অবমানব'-এও লেখা পড়েছে অনিকেত। ১৯৯৬ সালে 'ইক্নমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি'-তে বিমল বালসুব্রহ্মন্যম নাকি একটা মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন, অনিকেত পড়েনি যদিও, কিন্তু অনেকেই ওই লেখা থেকে নানারকম পয়েন্ট উদ্ধৃত করে। কাগজে পড়েছে কোনও এক ফাউন্ডেশন নাকি মামলা করবে, যেখানে এই প্রাচীন ধারাটাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হবে।

অনিকেত বলে—দেখুন পুলিশ সাহেব, আমি একজন সাংবাদিক। ৩৭৭ ধারা কিছুটা জানি। ওখানে কারনাল ইন্টারকোর্স বেআইনি বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে কোথায় ইন্টারকোর্স দেখলেন?

পুলিশ বলল, কারনাল ছাড়া কী করবে ওরা? দু'টোই তো ব্যাটাছেলে। পেছন ছাড়া ওদের আছে কী? সরি। আপনি আমাদের কাজে ডিস্টার্ব করবেন না। রেড করতে এসেছি, মাল রেড হ্যান্ড ধরেছি, থানায় যাবে, কোর্টে তুলব, তারপর যা হয় হবে।

অনিকেত বলল, কিছুই হবে না কোর্টে। ওদের কারনাল রিলেশনশিপ প্রমাণ করতে পারবেন?

—কারনাল না বার্নাল সেটা কোর্ট বুঝবে।

অনিকেত পকেটে হাত দেয়। পুলিশটা একটু থমকে দাঁড়ায়। ভাবে টাকা বের করছে। কিন্তু

অনিকেত বের করে একটা আইডেন্টিটি কার্ড। ওখানে একটা অশোক স্তম্ভের ছবি ছিল। ওটা সামনে ধরে।

পুলিশ সাহেব বলে, ও কার্ড দেখাচ্ছেন? থানায় গিয়ে কার্ড দেখাবেন। একবার থানায় ঢোকালে ছাড়াতে অনেক খরচ। তার চেয়ে এখানেই মিটমাট করে নিন।

দু'শোটা টাকা বের করে অনিকেত। ওখানেও অশোক স্তম্ভ এবং গান্ধীজি আছেন।

পুলিশ ওদের ছেড়ে টাকাটা ধরে। বলে, কে হয়?

অনিকেত পরিমলের কাঁধে হাত দিয়ে বলে, আমার ছেলের মতো।

পুলিশ বলে—সাবধানে থাকতে বলবেন। এসব অভ্যেস যেন না করে। পারলে মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুক, বসুক না এখানে, কিচ্ছু বলব না। এখানে ছুঁড়িদের অভাব আছে কোনও? কেন স্পঞ্জ-মারা ছেলেদের সঙ্গে বসবে।

পুলিশটি সামনে এগিয়ে গাড়িতে ওঠেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন একবার থানায় ঢোকালে দু'হাজারের কমে হত না।

গাড়ি ছেড়ে দিল। পুলিশের গাড়ি। কালো ধোঁয়া। ক্রূর শব্দ।

কবিতা পাঠ চলছে। এখন যশোধরা রায়চৌধুরী।

সমুদ্রের তলে এই খেলা
যাপনে যাপনে। জলে জল।
আলাদা আলাদা করে কী করে সে
বলে দেবে বলো
কোনটা জননক্রিয়া, কোনটা প্রণয়
কোনটা ছল।

পরিমল অনিকেতের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। সঙ্গের কুর্তা পরা ছেলেটিও। ওদের চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা।

...তোমরা কেউ জানো না কীভাবে আটকে রেখেছি
লাল-টেপ বন্দি ফাইলের মতো।
দপ্তরে দপ্তরে
এই কলসাকৃতি অন্ধকার, এবং অন্ধকার বিচ্ছিন্ন কলসিটির
বিষয়ে
যা কিছু ক্লিপ দিয়ে এঁটে রাখা হয়েছিল
সেসব নেংটি ছিঁড়েখুঁড়ে আজ বেরিয়ে এসেছে
আমার নিজের কথা
ঝলকে ঝলকে আমি বমি করে দিচ্ছি তোমাদের
সন্তানদের অনুদ্‌গত ভ্রূণ...

অনিকেত বলল, তোমরা যাও এবার। সাবধানে। ভাল থেকো।

কুর্তা-পরা ছেলেটি বলল, কী করে ভাল থাকব স্যার?

পরিমল বলল, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে কাকু...

টাকা দিতে হয় মাসে-মাসে। থানা থেকে নিয়ে যায়। পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা চাত্তারা-ই চালায়।

দুলালকে দেখে থানার লোক বলল, নতুন আমদানি? চাত্তারা ঘাড় নাড়ে।

—তবে ওর 'লাইফ'-টা থানায় জমা দিয়ে দিও।

'লাইফ'-টা লেখার সময় মনটা কেমন যেন করে উঠল। ওর বাড়ির ঠিকানা, কে আছে, বাবার নাম, মা-র নাম, এসব লিখে দিতে হল। অনেক খুনি-ডাকাতরা নাকি গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্য হিজড়ে দলে ভিড়ে যায়। এত দিন হয়ে গেল, মা-কে একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল। মায়ের জন্য, ছেলেটার জন্য মনটা চিরচির করে। মা নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করেছে। পুলিশে কি খবর দিয়েছে? পুলিশে-পুলিশে নিশ্চয়ই ভাব আছে। ও যে পুলিশকে ওর 'লাইফ' জমা দিল, তার সঙ্গে যদি মা-র করা ডায়রি মিলে যায়? এখানকার পুলিশ আবার জোর করে ঘরে দিয়ে আসবে না তো? চাত্তারা-কে এই আশঙ্কার কথা জানাল দুলালী।

চাত্তারা বলল, ধুর, ওদের ভারি দায় পড়েছে। তবু যদি তোর মনে খোঁচ থাকে, ঠিকানা ভেল করে দে। সত্যিকারের গাঁয়ের নাম যদি দিতে না-চাস তো দিসনে।

ও মা-র নামটা ভুল লিখল, কিন্তু বাবার নামটা ভুল লিখতে পারল না। গাঁয়ের নামও ভুল লিখল।

চাত্তারা-কে কাগজটা দিল। আবার যখন থানা থেকে 'থাপ্পু' নিতে আসবে, তখন এটা দিয়ে দেবে।

তবে দুলাল একটা পোস্টকার্ড কিনে, একটা চিঠি লিখেই ফেলল—মা গো, চিন্তা করিও না, আমি ভাল আছি। প্রণাম নিও।

এইটুকু লিখে অনিকেত কলমটা কামড়ে ধরে আছে।

এবার কী লিখবে? কোন দিকটা নিয়ে। এই যে পানাগড়ের খোল-টা, এখানে বারো-চোদ্দোজন একসঙ্গে কমিউন করে রয়েছে, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করছে, রোজগারপাতির ধরনটাও এক, কিন্তু সবাই তো এক নয়। প্রত্যেকেরই আলাদা-আলাদা ইতিহাস-ভূগোল এবং বিজ্ঞান।

অনিকেতের লেখার উৎস তো দুলালের আত্মকথন। সে আর কতটুকুই বা? বাকিটা তো কল্পনা। কল্পনারও একটা খাদ্য দরকার। খাদ্য পেলে কল্পনা হাসে, নাচে, জীবন্ত হয়। বিভূতিভূষণ 'চাঁদের পাহাড়' লিখেছিলেন কল্পনায়, কিন্তু সেই কল্পনার শরীর গড়েছে আফ্রিকা নিয়ে পড়াশোনা। পানাগড়ের এই খোল, এই হাসি, ফুলি, ঝুমকো, মহুয়া, ময়না, চপলা, মাধুরী—এরাও তো কল্পনার শরীরই পাচ্ছে, কিন্তু কল্পনাটা অকল্পনীয় হত যদি বইপত্রের

সাহায্য না-পেত। যদি ইন্টারনেট সার্ফিং-টা না-জানত। বেশ কিছু ওয়েবসাইট পত্র-পত্রিকা। বইপত্র পড়া হয়েছে। একটা পুরনো ধারণা মন্ থেকে সরাতে বেশ সময় লেগেছে। ধারণাটা হ'ল হিজড়েদের উভলিঙ্গত্বের বিষয়ে, জন্মগত ত্রুটির বিষয়ে। অনেক উপন্যাস, কাহিনি ইত্যাদিতে দেখানো হয়েছে হিজড়েদের শারীরিক ত্রুটির কথা। কোথাও হিজড়েদের দিয়ে কাঁদানো হয়েছে। বাবা জগন্নাথ, আর জনমে ছাইলা কর

জন্ম সুরাই লেওহে—
আর জনমে ছাইলা, ছাইলা, ছাইলা,
আর জনমে মাইয়া মাইয়া, মাইয়া...।

তা তো নয়, এরা তো মেয়েই হ'তে চায়। অপূর্ণ লিঙ্গ বৈশিষ্ট নিয়ে কেউকেউ জন্মায় ঠিকই, ওদের মধ্যে কেউ কেউ হিজড়েদের দলেও যায়, কিন্তু বেশিরভাগই পুরুষ। নব্বইভাগ। হার্মাফ্রোডাইট বা উভলিঙ্গ ওরা নয়। ওরা শরীরে যতটা, তার চেয়ে বেশি মনে। জিনেটিক কারণও দেখায় অনেকে। বলা হয় ক্রোমোজোমের গন্ডগোল এজন্য দায়ী। এখন সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছে, ওই তত্ত্ব ঠিক নয়। একটা মানুষের কোষের ক্রোমোজোম-সজ্জাই হল তার 'ক্যারিওটিক টাইপ'। ৪৬ xy হল একজন পুরুষমানুষের স্বাভাবিক 'ক্যারিওটিক টাইপ'। ৪৬ xx একজন স্বাভাবিক নারীর।

'স্বাভাবিক পুরুষ' কাকে বলা হবে? যার ব্যাকরণসম্মত পুং-গোনাড আছে। একটি ঝুলন্ত পুঁটুলিতে একজোড়া শুক্র-উৎপাদক গোলক, শৈশব ও বাল্যে যা প্রায় নিষ্ক্রিয়, যৌবনাগমনে ক্রিয়াশীল। সেইসঙ্গে একটি নল, যা শুক্রনিক্ষেপে সক্ষম। পুরুষ-কোষে একটা y ক্রোমোজোম থাকে, যা স্ত্রী-কোষে থাকে না। y কেমন যেন প্রতীকের মতো লাগে। y অক্ষর-টিকে উল্টো করে লিখলে যে-ছবিটা তৈরি হয়, সেটা যেন নর-গোনাডের প্রতীক। নারী-কোষে y ক্রোমোজোম থাকে না। দু'টিই x ক্রোমোজোম। এর মধ্যে একটি পিতার কাছ থেকে পাওয়া, একটি মায়ের দান। একটি ডিম্বাণু ২৩ টা ক্রোমোজোম বহন করে, এর মধ্যে একটি সেক্স-ক্রোমোজোম, এবং সেটা x। একটি শুক্রাণুও ২৩টি ক্রোমোজোম বহন করে, তার মধ্যে একটি সেক্স ক্রোমোজোম। শুক্রাণুর বেলায় একটা সমস্যা আছে। কিছু শুক্রাণু y ক্রোমোজোম বহন করে, কিছু শুক্রাণু x ক্রোমোজোম বহন করে। কোন জাতের শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলন হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করছে ভ্রূণের লিঙ্গ। y ক্রোমোজোম বহনকারী শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর সংযোগে পুত্রসন্তান, এবং x ক্রোমোজোম বহনকারী শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলনে কন্যাসন্তান জন্মাবে, এটাই নিয়ম।

কিন্তু আকাশভরা সূর্য-তারায় যে নিয়ম অনড়, বিশ্বভরা প্রাণের ক্ষেত্রে সে-নিয়মের অত কড়াকড়ি নেই। প্রাণের ধর্মই তো তাই। মহাকাশে বিভিন্ন বল ও গতিবেগের এদিক-ওদিক হলে অনর্থ হয়ে যাবে। সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর মধ্যেও নিয়মের কড়াকড়ি। সেখানে বেনিয়মেরও একটা নিয়ম আছে। কিন্তু প্রাণিজগতের নিয়মটা বড়ই কেমিস্ট্রি-নির্ভর। শরীরের নানারকম গ্রন্থি থেকে নির্গত হয় রাসায়নিক পদার্থগুলো। আবার গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক, আবার মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব আছে মনের, মুডের, পরিবেশের...। সব প্রাণীর মন নেই, চৈতন্য নেই। চৈতন্যহীন কীটপতঙ্গের জীবন সম্পূর্ণ রসায়ন নিয়ন্ত্রিত। একঘেয়ে, একইরকম। মৌমাছি, পিঁপড়ে, উইপোকা সবার। এটাকেই অনেকে বলে ডিসিপ্লিন। চৈতন্য-সম্পন্ন প্রাণীর কেমিস্ট্রি-

টা বড় ভজঘট ব্যাপার, বড় গোলমেলে।

ভাবা যায়, লক্ষ-লক্ষ শুক্রকীট দৌড়চ্ছে ফ্যালোপিয়ান টিউবের সূক্ষ্ম নালিকায়। কারও ঘাড়ে চেপে আছে y ক্রোমোজোম, কারও ঘাড়ে চেপে আছে x ক্রোমোজোম। একটি মাত্র ডিম্বাণুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একটি শুক্রাণুরই মিলন হবে, এবং ৪৬টি ক্রোমোজোম-সম্পন্ন একটি 'জাইগোট' তৈরি হবে। যদি দু'টি ডিম্বাণুর সঙ্গে দৈবাৎ দু'টি শুক্রকীটের মিলন ঘটে যায়, তবে দু'টি 'জাইগোট' তৈরি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে যমজ সন্তান হচ্ছে। যমজের একটি কন্যা, অপরটি পুত্র হতে পারে। দু'টিই কন্যা বা দু'টিই পুত্র হতে পারে। আবার যদি একটি 'জাইগোট' ভেঙে যায়, এবং কোষ বিভাজিত হয়ে দু'টি আলাদা 'জাইগোট' তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে যমজ সন্তান হবে একইরকম। দু'টিই পুত্র, বা দু'টিই কন্যা। এরা একইরকম দেখতে হয়, প্রায় একই চরিত্রের হয়ে থাকে, কারণ ওদের দু'জনের 'ক্যারিওটিক টাইপ' একই। একটা 'জাইগোট' ভেঙে দু'টি 'জাইগোট' তৈরি হয়েছে বলেই এরকম ঘটেছে, এদের বলা হয় 'আইডেন্টিক্যাল টুইন্‌স'।

কিন্তু কখনও-কখনও নিষিক্ত জাইগোট-টিতে ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে না। ৪৫টি ক্রোমোজোম নিয়ে মানুষ জন্মেছে। যাদের ৪৬টির পরিবর্তে ৪৫টি ক্রোমোজোম থাকে, তাদের সেক্স-ক্রোমোজোম হল x। ওদের ক্যারিওটাইপ ৪৫x। এদের স্ত্রী-জননাঙ্গ থাকে। কিন্তু স্ত্রী-জননাঙ্গ থাকলেই কি কন্যা হয়? নারী হয়? নারী তো গর্ভধারণ করে। আবার সব নারী তো গর্ভধারণ করতে পারে না। জরায়ু ও ডিম্বকোষ থাকা সত্ত্বেও কোনও আভ্যন্তরীণ ত্রুটির কারণে গর্ভধারণে অক্ষম। তা বলে কি সে নারী নয়? এবার কেউ যদি বলে জরায়ু ও ডিম্বকোষ থাকলেই সে নারী, সেক্ষেত্রে বলার, যদি কোনও অসুখের কারণে ওইসব বাদ দিতে হয়, তা হলে কি সে নারী থাকছে না? পুরুষরা যখন স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে অণ্ডকোষ কেটে ফেলে, তখন তাকে আর 'পুরুষ' বলে না। পাঁঠা হলে খাসি। ষাঁড়কে বলদ, মানুষকে 'খোজা'। কী গন্ডগোল রে বাবা! এই যে এই খোলে কতজন রয়েছে—কয়েকজন লিঙ্গধারী, কয়েকজন ছিন্নি, মানে নির্বাণ হয়ে যাওয়া, মানে বহির্লিঙ্গ ছিন্ন করে দেওয়া, ওদের মধ্যে তফাত করা হচ্ছে না, ওরা সবাই হিজড়ে। কিন্তু হাসি, কিংবা ঝুমকো, কিংবা চাত্তারা, কিংবা আরও যারা আছে, তারা সবাই কী-কী ক্যারিওটাইপ নিয়ে জন্মেছিল? জানার কোনও উপায় নেই। এখন কি অনিকেত ওদের সব জটিল পরীক্ষা করাতে যাবে নাকি?

কথা হচ্ছিল ৪৫x-ওলা মানুষ নিয়ে। ওদের বাইরের জননাঙ্গ স্ত্রী-যোনির মতোই। কিন্তু কখনও অপুষ্ট হয়। ভিতরের ভাঁজটা নাও থাকতে পারে। জরায়ু হয় থাকে না, নয়তো খুব ছোট। ডিম্বাশয় থাকে না। এদের বুক চওড়া হয়। বুকে রোম গজাতে পারে, এই বুকেই কৈশোরে স্তনোদ্‌গম হয়। এদের চোখ ছোট হয়। ১৯৩৮ সালে একজন বিজ্ঞানী এদের ক্রোমোজোমের এই অসামঞ্জস্য আবিষ্কার করেন, এই আপাত-নারীদের লক্ষণগুলোকে বলা হল 'টার্নার সিনড্রোম'। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে ওদের কিডনির গন্ডগোল হয়। কথাতেও জড়তা থাকে, বুদ্ধিসুদ্ধিও কম হয়। 'টার্নার সিনড্রোম'-এ আক্রান্ত মানুষরা হিজড়ে-সমাজে সুবিধে করতে পারে না। ওরা বেশিদিন বাঁচেও না।

ক্রোমোজোম-ঘটিত আর একটা গন্ডগোলের নাম 'ক্লাইনেফেল্‌টার সিনড্রোম'। এদের ক্যারিওটাইপ ৪৭xxy মানে স্বাভাবিকের তুলনায় একটা ক্রোমোজোম বেশি। ৪৬xy হলে ব্যাটাছেলে হত। একটা এক্সট্রা x-এর জন্য পুরোপুরি ব্যাটাছেলে হয়ে-ওঠা হয় না। কৈশোরে

এদের 'গাইনিকোমাস্‌টিয়া' হয়, মানে স্তন বেশ ফুলে ওঠে। এদের শিশ্ন থাকে, কিন্তু ছোট। কখনও বেশ ছোট। অণ্ডকোষও ছোট। সাধারণত বাইরেই ঝুলে থাকে। কিন্তু শুক্রাণু তৈরি হতে পারে না, মুখে দাড়িগোঁফ কম গজায়, এরা একটু লম্বা প্রকৃতির হয়। কোমরের তলার অংশটা ওপরের তুলনায় বেশি লম্বা হয়। এটাকে বলে 'ইউনিকয়েড গ্রোথ'। মানে, ইউনাক-সুলভ গ্রোথ। কারও একটু মানসিক জড়তাও থাকে। ১৯৪২ সাল নাগাদ আমেরিকান বিজ্ঞানী ক্লাইনেফেল্‌টার এই শারীরিক লক্ষণগুলোকে ব্যাখ্যা করেন। সেই থেকে বইপত্রে ৪৭xxy বা ৪৮xxxy মানুষদের অস্বাভাবিকত্বকে 'ক্লাইনেফেল্‌টার সিনড্রোম' বলা হয়।

অনিকেত এসব তথ্য সংগ্রহ করেছিল বিভিন্ন বইপত্র এবং ইন্টারনেট থেকে। কিন্তু একটা প্রশ্ন ছিল : যেখানে ৪৬টা ক্রোমোজোম থাকার কথা, সেখানে বেশি আসবে কোত্থেকে? ডিম্বাণু থেকে ২৩টা, শুক্রাণু থেকে ২৩টা। নিষিক্ত হওয়ার পর ৪৬টাই তো থাকার কথা। বেশি আসবে কোত্থেকে?

জবাব পাওয়া গেল এমব্রায়োলজি-তে। মানব শরীরের কোষের ৪৬টা ক্রোমোজোম অর্ধেক হয়ে বিরাজ করে শুক্র ও ডিম্বাণুতে। ডিম্বাণু-র তুলনায় শুক্রাণু কয়েক হাজার গুণ বেশি তৈরি হয়। লক্ষ-লক্ষ শুক্রাণুর মধ্যে মাত্র একটাই শেষ পর্যন্ত মিলিত হবে একটি ডিম্বাণুর সঙ্গে। কী কঠিন সংগ্রাম। মেয়েরাই তো বেছে নেয়। জীবজগতে সবচেয়ে বলশালী পুরুষকেই বেছে নেয় নারী। পুরুষরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, যে জেতে, সেই কাম্য-নারী পায়। বাইরেও সংগ্রাম, ভিতরেও সেই শুক্রকীটদের সংগ্রাম। যে-শুক্রকীট সবার আগে ফ্যালোপিয়ান নালিকায় পৌঁছে ডিম্বাণুর কাছে যেতে পারছে, সে-ই শেষ পর্যন্ত ডিম্বাণুকে পায়। শুক্রকীটের কোনও পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নেই, অথচ ডিম্বকুমারী রেস-এ ফার্স্ট হওয়া মি. শুক্র-কে পছন্দ করে।

ওই যে, 'গোটা' কোষ ভাগাভাগির কথা হচ্ছিল, পুরুষের ৪৬টা ক্রোমোজোম অর্ধেক হয়ে শুক্রের শরীরে অবস্থান করে, নারী-কোষের ৪৬টার অর্ধেক ডিম্ব-শরীরে, কিন্তু ভাগাভাগিতে যদি গন্ডগোল হয়ে যায়? পৃথিবীর কোনও জৈব ভাগাভাগি ঠিক মতো হয়েছে? অজৈব জগতে যে কঠোর শৃঙ্খলা, জৈব জগতে তার অভাব। ভাগাভাগির গন্ডগোলে কোনও-কোনও ডিম্বাণুতে একটা x ক্রোমোজোম বেশি চলে আসে। ফলে সেই ডিম্বাণুটায় ২৪টা ক্রোমোজোম। বিজ্ঞানের ভাষায় ২৪xx-এর সঙ্গে ২৩ ক্রোমোজোম-সম্পন্ন y-ধারী শুক্রের মিলনে তৈরি হয় ৪৭xxy ক্যারিওটাইপ। এদেরই 'ক্লাইনেফেল্‌টার সিনড্রোম' হয়। ভাগাভাগির সময় একটা ভাগে বেশি পড়লে, অন্যভাগে কম পড়বেই। যদি x ক্রোমোজোম কম পড়ে যাওয়া ২২ ক্রোমোজোম ডিম্বাণুর সঙ্গে x-বাহক ২৩ ক্রোমোজোমের শুক্রের মিলন হয়, তবে ৪৫x ক্যারিওটাইপ তৈরি হবে। এরাই 'টার্নার সিনড্রোম'-এ আক্রান্ত। অথচ কী আশ্চর্য, ৪৫x হয়, কিন্তু ৪৫y হয় না। y হল পুরুষ-প্রতীক। কোনও শুক্রাণুর কাঁধে y চড়ে থাকে, কোনও শুক্রাণুর কাঁধে x। সেক্স ক্রোমোজোম-হীন ২২ অটোজোমের ডিম্বাণুর ভিতর y-ওলা শুক্রকীট মাথাই গলাতে পারে না। ফলে ৪৫y হয় না।

কেন পারে না?

কে জানে?

বইপত্রে সদুত্তর পাওয়া যায়নি। 'রিসোর্স পার্সন'-রাও ঠিকমতো বোঝাতে পারেনি।

এই যে চলমান হিজড়ে সমাজ, এদের মধ্যে 'টার্নার সিনড্রোম'-ওলা মানুষ খুব একটা থাকতে পারে না। কিন্তু খুব কম হলেও তো টার্নার শিশু জন্মায়। ফোলা-ফোলা শরীর, ছোট-ছোট চোখ, যোনিটাও ঠিকমতো বোঝা যায় না। সাধারণ মানুষ ভাবে, হিজড়ে বাচ্চা হল বোধহয়। হেলাফেলায় দিন কাটে। চিকিৎসা কি ঠিকমতো হয় ওদের? এরা বেশিদিন বাঁচে না। কেউ কেউ যৌবন আসার আগেই মারা যান। কেউ কেউ আরও বেশ কিছুদিন বাঁচেন, কিন্তু ৫০/৫৫ বছরের মধ্যেই হয় হার্টের গন্ডগোলে কিংবা কিডনির গন্ডগোলে ওরা পৃথিবী থেকে চলে যায়। 'ক্লাইনেফেল্টার সিনড্রোম'-যুক্ত শিশুরা, যাদের একটি ছোট শিশ্ন আছে, অণ্ডকোষ নেই, কিংবা খুব অপরিণত, ঠিকমতো পুরুষ হয়নি বলে ওদের মা-বাপরা কষ্ট পায়, কোনও-কোনও বাপ-মা ওদের মেয়েদের পোশাক পরিয়ে রাখে, বড় হয়ে ওরা না-পুরুষ। ওদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো চলমান হিজড়ে সমাজে চলে যায়। কিন্তু এদের সংখ্যা খুবই কম। আজকের সার্জারি এবং চিকিৎসার এই উন্নতিকালে এদের অপরিণত অণ্ডকোষ কেটে ফেলে, উরুসন্ধিতে অস্ত্রোপচার করে নারী-জননাঙ্গের একটা চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করা যায়। বিদেশে হয়। 'নারী' পরিচয়ে এরা বেঁচে থাকতেই পারে, সমাজের কাজেও লাগতে পারে। বোঝা না-হয়ে সম্পত্তিও হতে পারে। কয়েকজন শিল্পী এবং অধ্যাপক ছিলেন এবং আছেন এই পৃথিবীতে, যাঁদের এই সিনড্রোম রয়েছে। এগুলো তো সব ক্রোমোজোমের ভাগাভাগির গোলমাল। জেনেটিক খুঁতও বলা যায়। পরিপূর্ণ স্ত্রী-জননাঙ্গ বা পুরুষ-জননাঙ্গ তৈরি হতে পারল না যে-কারণে। বাইরের জননাঙ্গের বিকাশ না-হলেও তো ওদের মধ্যে প্রেম থাকে, ভালবাসা থাকে, দুঃখবোধ থাকে, ছন্দ-প্রভাবে নাচ জাগে, চাঁদের আলো সমুদ্রের ঢেউ ভাল লাগে, একসঙ্গে সবার সঙ্গে ফুচকা খেতেও ইচ্ছে হয়। জিন ওখানে কিছু করতে পারে না। কিছু মানুষের আবার অন্য একটা গন্ডগোল হয়। একই দেহে পুরুষ ও নারী-চিহ্ন। যদিও খুব কম। ৩০ হাজারে একজন। জিনের কারণেও হয়, আবার ভ্রূণাবস্থায় হরমোন সরবরাহের গন্ডগোলের কারণেও হতে পারে।

কিছু মানুষ দেখা গিয়েছে, যাদের শরীরে শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় দু'টোই থাকে। কখনও একটা-একটা করে, কখনও বা জোড়ায়। শুক্রাশয় থাকে পেটের ভিতরে। ছোট্টমতো একটা শিশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু মূত্রছিদ্রটা ঠিকঠাক থাকে না। শিশ্নের শেষে না-থেকে গোড়ার দিকে থাকে। কারও শিশ্নও থাকে না, থাকে যোনি-র মতো কিছু। কোনও ক্ষেত্রে আপাত-যোনির ভগাঙ্কুরটি এতটাই বড় হয় যে, শিশু-নুনুর মতো দেখায়। কারও পেটের ভিতরে ছোট জরায়ুও তৈরি হতে পারে। কৈশোরে স্তনগ্রন্থি কিছুটা বিকশিত হয়। কখনও ঋতুচক্রও দেখা দেয়। আর কী আশ্চর্য, যাদের প্রায়-যোনির পরিবর্তে প্রায়-শিশ্ন আছে, তাদেরও রজঃস্রাব হতে দেখা গিয়েছে। এই সময় গোপনে-থাকা বেচারা শুক্রাশয়টি বেদনায় টনটন করে। মানুষটা ব্যথায় কষ্ট পায়।

স্বাভাবিক জিনগ্রস্ত ৪৬xx বা ৪৬xy মানুষদের ক্ষেত্রেও লৈঙ্গিক ত্রুটি দেখা গিয়েছে, যারা ৪৬xx হয়েও নারী নয়, কিংবা ৪৬xy হয়েও পুরুষ নয়। মানব-ভ্রূণে জননাঙ্গ বিকশিত হয় বেশ কিছুদিন পরে। ভ্রূণ-শরীরে একটা অংশকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাকে বলা হয় 'গোনাড'-অঞ্চল। এখান থেকেই পুরুষ-জননাঙ্গ এবং স্ত্রী-জননাঙ্গ বিকশিত হয়। কিছু টিস্যু হয় শুক্রাশয় কিংবা ডিম্বাশয়ে পরিবর্তিত হয়। ৪৬xx হলে ডিম্বাশয় হবে, ৪৬xy হলে শুক্রাশয় হবে—এটাই সাধারণ নিয়ম। জিনগত খুঁত থাকলে গন্ডগোল হয়ে যায়। পাঠ্য বইতে লেখা থাকে

'অ্যাম্বিগুয়াস জেনেটালিয়া'। কিন্তু স্বাভাবিক জিন থাকলেও, কখনও এখান থেকে উল্টোপাল্টা টিস্যু তৈরি হয়ে যেতে পারে।

গোনাড অঞ্চলে উল্‌ফিয়ান ডাক্‌ট এবং মুলেরিয়েন ডাক্‌ট তৈরি হয়, এখানে নিঃসৃত হয় কিছু রাসায়নিক, যা লিঙ্গ-চিহ্ন তৈরি করে। উল্‌ফিয়ান ডাক্‌ট ও নালি পুরুষ প্রজননতন্ত্রের বিকাশ ঘটায়, মুলারিয়ান ডাক্‌ট স্ত্রী-তন্ত্রের। ভ্রূণের দু'মাসের মাথায় দু'টোই থাকে। তিন মাসের পর, xx-দের ভ্রূণ-এর ক্ষেত্রে, ক্রমে উলফিয়ানের অবলুপ্তি ঘটে, মুলেরিয়ান তন্ত্রের বিকাশ ঘটে। পুরুষ xy-দের ক্ষেত্রে মুলেরিয়ান তন্ত্র লুপ্ত হয়, উলফিয়ানের বিকাশ ঘটে। যদি xx ভ্রূণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উল্‌ফিয়ান তন্ত্র পুরোপুরি বিলুপ্ত হল না, কিছুটা রয়ে গেল, এবং মুলেরিয়ান তন্ত্র থেকে জরায়ু, ডিম্বাশয়, ফ্যালোপিয়ান টিউব ইত্যাদি তৈরি হয়ে গেল, অথচ ঠিকমতো তৈরি হল না, উপরন্তু ভিতরে একটা বা দু'টো অপরিণত শুক্রাশয়ও রয়ে গেল। আবার xy ভ্রূণের ক্ষেত্রে মুলেরিয়ান নালি বিলুপ্ত হল না, বরং উলফিয়ান নালির বিকাশ ঘটল, এবং শেষ অবধি দেখা গেল যে-শিশুটি জন্মাল, তার শিশ্ন খুব ছোট, কিংবা প্রায় নেই। শুক্রাশয় বোঝা যাচ্ছে না। বড় হলে ওদের বাহুমূলে লোম হচ্ছে না, ভিতরে হয়তো একটা ডিম্বাশয়ও রয়ে গিয়েছে। কিংবা অপরিণত জরায়ু। স্তনগ্রন্থিরও বিকাশ হচ্ছে। ৪৬xy হয়েও পুরুষ হতে পারল না সে।

আবার, মুলেরিয়ান বা উলফিয়ান ডাফ্‌ট ঠিকমতো কাজ করে গেল, ক্রোমোজোম-সজ্জাও ঠিকঠাক। তা সত্ত্বেও আর এক ধরনের লিঙ্গ-অসংগতি হতে পারে—এর জন্য দায়ী হরমোন এবং এন্‌জাইম। জৈব শরীরের সবই তো রসায়ন-নির্ভর। মুলেরিয়ান এবং উল্‌ফিয়ান নালি শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি নেবে, সেটাও ঠিকঠাক রাসায়নিক পদার্থের জোগান এবং অভাবের ওপর নির্ভর করে। ভ্রূণাবস্থায় আম্বিলিক্যাল কর্ডের ভিতর দিয়ে মায়ের শরীরের রক্ত ভ্রূণ দেহে যায়। রক্তের সঙ্গে যায় এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি। ডেসমোলেজ, বিটা হাইড্রক্সিস্টেরয়েড, আল্‌ফা হাইড্রোক্সিলেজ—এই রাসায়নিকগুলোর ভূমিকা নাকি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সব রাসায়নিকের জোগান ঠিকমতো না-হলে যৌনাঙ্গের পরিপূর্ণ গঠন হয়ে ওঠে না। একই দেহে দু'রকম লিঙ্গচিহ্ন তৈরি হয়ে যায়। এদের বলা হয় 'উভলিঙ্গ' বা 'হার্মাফ্রোডাইট'।

কোনও-কোনও প্রাণী তো উভলিঙ্গ-ই। সমস্ত রকম কেঁচো, নানা ধরনের কৃমি, অনেক জাতের শামুক ও ঝিনুক—উভলিঙ্গ। কেঁচোদের একই দেহে শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় আছে। দু'টো কেঁচো পরস্পরের উল্টোদিকে মিলন করলে দু'টো কেঁচোর ডিমই নিষিক্ত হতে পারে। নিচু জাতের প্রাণীদের মধ্যে উভলিঙ্গত্ব থাকলেও উচু জাতের প্রাণীর ক্ষেত্রে এটা দুর্ঘটনা। মানব শরীরে দু'রকম লিঙ্গচিহ্ন একসঙ্গে থাকাটাও খুব বিরল। কিন্তু হয়। জন্ম বড় জটিল প্রক্রিয়া। পুরো কোষ ঠিকমতো দু'ভাগ হয়ে ডিম্বাণু ও শুক্রকীট তৈরি হওয়া, ওদের ঠিকমতো ক্রোমোজোম ঠিকভাবে থাকা, ভ্রূণ তৈরি হওয়া, এরপর কতরকম রসায়নের খেলায় ধীরে-ধীরে তৈরি হয় একটা শিশু। কোথাও কোনও গন্ডগোল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু খুব আশ্চর্য, গন্ডগোলটা কমই হয়। এসব গন্ডগোলের কারণে যে-শিশুটি লিঙ্গত্রুটি নিয়ে জন্মাল, সে কেন, কেউ কি জানতে পারল, কোথায় গন্ডগোলটা ছিল?

এক গাইনি-র ডাক্তার কথাপ্রসঙ্গে অনিকেতকে ওর জীবনের দু'টো অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। একবার একটি সদ্যোজাত বাচ্চাকে দেখে নার্স বলেছিল, মেয়ে হয়েছে। বাচ্চার

অভিভাবক ছেলে হয়েছে জানলে বেশি খুশি হতেন, তবে মেয়ে হয়েছে—আচ্ছা ঠিক আছে—কী করা যাবে—এভাবে চলে গিয়েছিল। পরে ডাক্তারবাবুর চোখে পড়ল, এ তো ঠিক মেয়ে নয়। ছোট্ট একটা শিশ্ন আছে মনে হল। এটা একটু ভাল করে দেখতে হয়। অনেক সময় যোনি অংশের ক্লাইটোরিস-টা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বড় হয়। ওটাও লৈঙ্গিক ত্রুটি, তবে ওরা মেয়েই। বর্ধিত ক্লাইটোরিস অনেক সময় অপরিণত শিশ্নের মতো মনে হয়। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বুঝলেন, ওটা বর্ধিত ক্লাইটোরিস নয়, শিশ্ন-ই। কিন্তু যোনি ছিদ্রও আছে। ভিতরে হয়তো শুক্রাশয় আছে, বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না, হয়তো আলট্রাসোনোগ্রাম-এ বোঝা যাবে। কিন্তু শিশ্ন-টা নিশ্চিত। তার মানে ওই শিশুটি লিঙ্গ ত্রুটি যুক্ত। শিশুর অভিভাবকদের এটা জানানো হল। তারপর বাচ্চার মায়ের ছুটি হয়ে গেল। বাড়ি থেকে কেউ নিতে এল না। গ্রামের হাসপাতাল। বেশ দূরে বাড়ি। জোর করে বলাও যাচ্ছে না, ছুটি হয়ে গিয়েছে বাড়ি যাও। হাসপাতালের খাতায় ঠিকানা লিখতে হয়। সেই ঠিকানায় লোক পাঠিয়ে দেখা গেল—বাড়ির লোকজন উধাও। একটি হার্মাফ্রোডাইট শিশুর ভয়ে মদ্দ xy স্বাভাবিক পুরুষরা সব পালিয়েছে। শেষ অবধি থানা-পুলিশ করতে হয়। পুলিশ ওই বউটির স্বামীকে ধরে আনে।

তারপর বাচ্চাটির কী হল? 'ফলো আপ করেছিলেন?'—অনিকেত জিগ্যেস করেছিল।

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—ওর মা বছরখানেক পর বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছিল। বাচ্চাটার নাম রেখেছিল শিবগঙ্গা। পড়শিদের কেউ নাকি বলেছিল বাচ্চাটাকে হিজড়েদের দিয়ে দিতে। ওর মা দেয়নি। সর্বস্ব দিয়ে আগলে রেখেছিল। যখন হাসপাতালে নিয়ে এল, বাচ্চাটার পেটটা বেশ বড়, মানে পিলেটা খুব বেড়ে গিয়েছে, অ্যানিমিক। বেশিদিন বাঁচেনি বাচ্চাটা। আসলে হার্মাফ্রোডাইট বাচ্চারা আদর না-পেয়েই মরে যায়। ওদের কিন্তু ঠিকঠাক চিকিৎসা করা যায়।

কী করে?

দেখতে হয় বাচ্চাটা মূলত কী। ক্রোমোজোম পরীক্ষা করা সবসময় সম্ভব হয় না। যদি xx হয়, তবে ভিতরে একটা ওভারি ঠিকই থাকবে। সঙ্গে যদি টেস্টিস থাকে, ওটাকে সার্জারি করে বাদ দিতে হয়। পেনিস বা মাইক্রো-পেনিসটাও। তারপর ঠিকমতো হরমোন থেরাপি করে ওকে পরিপূর্ণ নারীর রূপ দেওয়া যায়। সে গর্ভধারণেও সক্ষম হতে পারে। যদি xy হয়, তবে একটু ঝামেলার। ওখানে উলফিয়ান প্রি-ডমিনেটিং কিন্তু মুলেরিয়ান-ও আছে। মানে সে মূলত পুরুষ। যদি ভিতরে ডিম্বাশয় থাকে, ওটা বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু অপূর্ণ টেস্টিসকে কিছু করা যায় না। বরং থাকলেই ক্ষতি। ওটাও বাদ দেওয়া উচিত। অপূর্ণ শিশ্নটাও অপারেশন করে স্বাভাবিক করা যায় না। কৃত্রিম যোনি তৈরি করা সম্ভব হলেও, কৃত্রিম পুরুষ-লিঙ্গ তৈরি করা যায় না। মেল ফ্যালাস-টা বড় জটিল। কত ক্যাপিলারি, ভাল্ব, কখনও ছোট হচ্ছে, কখনও বড় হচ্ছে, কোনও প্লাস্টিক সার্জেন ঠিকমতো পেনিস বানাতে পারেনি। তাই xy হার্মাফ্রোডাইট-দেরও বাঁচাতে হলে মেয়ে বানিয়েই বাঁচাতে হয়। ও ফ্রক পরে, পায়ে নূপুর পরে বড় হবে। কিন্তু এরকম সার্জারি আমাদের দেশে ক'টা হয়? আলোকপ্রাপ্ত বড়লোকের ঘরে এরকম বাচ্চা হলে বেঁচে যায়, নয়তো...

'আসলে কী জানেন?...'—ডাক্তারবাবু বলছিলেন, 'হার্মাফ্রোডাইট' শব্দটাই আধুনিক মেডিক্যাল সায়েন্স আজকাল আর ব্যবহারই করে না। এখন বলা হয় 'ইন্টারসেক্স'।

'হার্মোফ্রোডাইট' কথাটার উৎস তো সেই গ্রিক পুরাণ। দেবতা হার্মেস আর দেবী

অ্যাফ্রোদিতি-র যোগফল। এসব না-জেনেই অশিক্ষিত মেয়েটা ওর সন্তানের নাম রেখেছিল 'শিবগঙ্গা'। ডাক্তারবাবু চুপ করলেন।

আর একটা কী ঘটনার কথা বলছিলেন—অনিকেত জিগ্যেস করেছিল।

—হ্যাঁ। এটা তো ট্রু হার্মাফ্রোডাইটিজ্‌ম। একটা সিউডো হার্মাফ্রোডাইট-ও পেয়েছিলাম। ছদ্ম-উভলিঙ্গ। তখন আমি বাসন্তীতে কাজ করি। একটা বাচ্চা হল। বললাম, ছেলে। বেডে শুয়ে ওই অবস্থায় বাচ্চার মা উলু দিয়ে উঠল। আকাশে তাকিয়ে হাত কপালে ছোঁয়াল। আকাশ তো নয়, ফল্‌স সিলিংওলা অ্যাসবেস্টস-এর চালা। বাড়ির লোকজন আমাকে আর সিস্টারকে বাইরে ডেকে নিয়ে একটা পলিথিনের প্যাকেটে রসগোল্লা আর রস-মাখানো পেটা-পরোটা ধরিয়ে দিল। তিন মেয়ের পর ছেলেটা হল বলে।

একটু পরে নার্স জানাল, স্যর, বাচ্চাটা হিসির জায়গা দিয়ে হিসি করছে না, হিসিটা তলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বোঝার জন্য জেনিটালিয়া ভাল করে দেখি।

দেখে তো শক্‌ড। ও তো ছেলে নয়, মেয়ে। ক্লাইটোরিসটা লম্বা হয়ে বেরিয়ে আছে। ল্যামিনা মিজোরা নেই, ল্যামিনা মিনোরা নেই—একদম প্লেন। একটা মূত্রছিদ্র আছে শুধু। ইউরিনারি ট্রাক্ট-টা ওখানে এসে শেষ হয়েছে।

কী মুশকিল! তবে একে ম্যানেজ করা যেত। কিন্তু বাসন্তীতে কিছু করার ছিল না। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ওকে হয়তো ঠিক করা যেত। সেটাই বলেছিলাম। কিন্তু ওরা কী করল জানেন? বাচ্চাটাকে শীতের মধ্যে বাইরে ফেলে রেখে মেরে ফেলল। হয়তো একটা ইনসারশন দিলেই ওর ভ্যাজাইনাল ক্যাভিটি বার করে দেওয়া যেত। হয়তো ওর সবই ছিল, নারীর যা থাকে, চামড়ায় ঢাকা ছিল বলে জানা যায়নি। ক্লাইটোরিস-টা এমনিতেই হয়তো কিছুদিন পরে ছোট হয়ে যেত, বা সামান্য সার্জারি। কিন্তু ওরা মেরে ফেলল!

এখন অনিকেত বোঝে, এসব কেস হল সিউডো হার্মাফ্রোডাইটিজ্‌ম। ছদ্ম-উভলিঙ্গত্ব। একটা শিশুকন্যাকে শিশুপুত্রের মত মনে হয়, বা পুত্রকেও কন্যা মনে হতে পারে। একটি স্বাভাবিক xy ছেলে, কিন্তু ফিটাল কেমিস্ট্রি-র কারণে লিঙ্গটি খুব ছোট, অণ্ডকোষ বা শুক্রাশয় পেটের ভিতরে গোপনে রয়েছে, বাহ্যিক পুংলিঙ্গত্বের বেশ অভাব, ওকে মেয়ে বলে মনে হতে পারে। এক ধরনের হায়না আছে, ওদের গায়ে ছিট-ছিট দাগ, ওদের বলে 'স্পটেড হায়না'। এই জাতের স্ত্রী-হায়নাদের ক্লাইটোরিস স্বাভাবিক ভাবেই বেশ বড়। দেখে মনে হয় পুরুষ-লিঙ্গ। পুরুষদের লিঙ্গ-সংস্থানের সঙ্গে খুবই দৃশ্যগত মিল। এদের স্ত্রী-পুরুষ আলাদা করা বেশ মুশকিল।

ইন্টারনেটে 'শী-মেল'-দের ছবিও দেখেছে অনিকেত। পাটেয়া, ব্যাংকক, ম্যাকাও-তে এরা যৌন-ব্যবসা করে। এদের বেশ পরিণত পুংলিঙ্গ, এবং সুডৌল বক্ষ। একই সঙ্গে এরা নারী ও পুরুষ কামক্রেতাদের সেবা করে। এরাও কি xxy? xxy হলেও সার্জারির সাহায্য নিতেই হয়েছে ওদের। পুরুষ লিঙ্গ থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম স্তন বানাতে হয়েছে। বিচিত্র ধরনের কামুকদের মনোরঞ্জনের জন্য।

পানাগড়ের যে-খোলটির কথা অনিকেত লিখতে চাইছে, সেখানে দুলালী আছে। দুলালীকে কেন্দ্র করেই ওদের কথা লিখবে বলে ভেবেছে। ওরা কারা? ওদের কি সবারই লিঙ্গ-পরিচয়ে গন্ডগোল আছে?

লিঙ্গ-পরিচয় কি বাহ্যিক চিহ্নই শুধু? না কি লিঙ্গচিহ্নের বাইরে ও অন্তরে, বা মনেও, কোনও লিঙ্গ-পরিচয় থাকে? মনের ভিতরে যেটা থাকে সেটা অভিলাষ। অভিলাষও লিঙ্গসত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বাহ্যিক লিঙ্গ-পরিচয়ে সমস্যা কী-কী কারণে হতে পারে, তার একটা লিস্ট করে নেয় অনিকেত।

ক্রোমোজোম-সজ্জার ত্রুটির কারণে যা-যা হতে পারে, তা হল—

টার্নার সিনড্রোম : ৪৫x

ক্লাইনেফেল্টার সিনড্রোম : ৪৭ xy/৪৮xxxy

৪৭ xy পুরুষ

৪৮xx পুরুষ

৪৬xx কিংবা ৪৬xy উভলিঙ্গ, ছদ্ম-উভলিঙ্গ

৪৭ xx সুপার-ফিমেল। শিমেল।

জিন-বাহক যে প্রোটিন কুণ্ডলীগুলি, তার মধ্যে যারা বাবা-মা'র বৈশিষ্ট্য বহন করে, ওরাই প্রকৃত পক্ষে ক্রোমোজোম, বাকিরা অটোজম। কিন্তু সাধারণভাবে সবাইকে একসঙ্গে ক্রোমোজোম-ই বলা হয়। বাবা-মা'র বৈশিষ্ট্যবাহী x বা y-কে সেক্স ক্রোমোজোমও বলা হয়। লিঙ্গ-নির্ধারণে অটোজমের ভূমিকা আছে। সাধারণভাবে একটা জাইগোটে ক্রোমোজোম ও অটোজোম মিলে ৪৬টি কণা থাকতে পারে। ৪৬xy মানে ওই সেল-এ অটোজোম ও ক্রোমোজোম মিলে ৪৬টি কণা আছে, এর মধ্যে ৪৪টি অটোজোম এবং দু'টি সেক্স ক্রোমোজোম। একটি x অপরটি y। ৪৬xx মানে, দু'পাশ থেকে ২২টি করে ৪৪টি অটোজোম এসেছে, এবং দু'টি সেক্স ক্রোমোজোম। মানে, ৪৪টি অটোজোমই স্বাভাবিক ব্যাপার।

কিন্তু ৪৮xx পুরুষে ৪৪টির বদলে ৪৬টি অটোজোম এবং দু'টি সেক্স ক্রোমোজোম। অটোজোম কী করে লিঙ্গ-নির্ধারণে ভূমিকা নিয়ে ফেলতে পারে, সেটা আজও পরিষ্কার নয়। আবার একই জিন পৃথক দেহের ওপর আলাদা-আলাদা কাজ করে। কেন করে? উত্তর নেই। এছাড়া বিজ্ঞানী এম. ও. স্যাডেজ বলছেন—অনেক নন-এন্ডোক্রিনাল ফ্যাক্টরও আছে, যারা গোনাড বা লিঙ্গ-চিহ্ন নিয়ন্ত্রণ করে। এ নিয়ে এখনও কিছুই কাজ হয়নি।

এবার, এই খোলের বাসিন্দা যারা, অনিকেতের হাতেই ওদের লিঙ্গ-ইতিহাস। ও কাউকে টার্নার আক্রান্ত করে দিতে পারে, কাউকে ক্লাইনেফেল্টার, কাউকে xx পুরুষ...। কিন্তু করবে না। কারণ ওর অভিজ্ঞতায় জেনেছে, এসব ছল্লাবাজ খোলগুলিতে বিশেষ সমস্যা-আক্রান্তদের নেওয়া হয় না। হ্যাপা সামলাবে কে?

টার্নার সিন্ড্রোম আক্রান্তদের দেখলেই বোঝা যায়। ওরা খুব একটা এসব খোলে থাকে না। ক্লাইনেফল্টার অল্প কিছু থাকতে পারে। xx মেলও থাকা সম্ভব।

আর থাকতে পারে ছদ্ম-উভলিঙ্গ। যাদের মনে হচ্ছে উভলিঙ্গ, আসলে নয়। লিঙ্গ-বিকৃতি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হ'ল ১০০ জনের মধ্যে ৮০/৮৫ জনই থাকে সম্পূর্ণ পুরুষ। একেবারে ৪৬xy, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে নারী। ওদের নিজেদের পুং-চিহ্নকে পছন্দ করে না, কিন্তু অন্য মানুষের পুং-চিহ্নকে পছন্দ করে।

অনিকেত এবার পানাগড় খোলের গুরুমা নাগেশ্বরী এবং ওর শিষ্যাদের ক্রোমোজোম বিতরণ করে। অনিকেত যা বলবে, যা লিখবে, তাই হবে। ওই তো ঈশ্বর।

গুরুমা নাগেশ্বরী একদম স্বাভাবিক ৪৬xy পুরুষ। আগেই দেখানো হয়েছে ওর মাথায় টাক আছে। পরচুলা পরে।

চাত্তারাকে ৪৭ xxy করে রাখা যেতে পারে। ও একটু লম্বা প্রকৃতির, 'ইউনিকয়েড গ্রোথ' আছে। হাসির গোনাড-গঠনের ত্রুটির কারণে ওই সব উল্‌ফিয়ান-মুলেরিয়ান ডাক্ট-এর কিচাইনে একটা ছোট শিশ্ন ছিল। অণ্ডকোষ ছিল না। চার বছর বয়সে ছল্লায় গিয়ে এক গরমকালে নাগেশ্বরী ওকে উলঙ্গ দেখে। গরিবের ঘর। ওর মা-কে নানারকম ভয় দেখিয়ে ওকে নিয়ে আসে। ও যদিও সবচেয়ে পুরনো, কিন্তু প্রধান 'চেলি' বনল চাত্তারা। হাসির ক্যারিওটাইপ হয়তো ৪৬xx—মেয়েই হওয়ার কথা ছিল। কম বয়সেই ওকে ছিন্নি করা হয়। ছোট্ট শিশ্নটি কেটে ফেলা হয়। কেটে ফেলা শিশ্ন ছিদ্রের তলায় ওর মূত্রছিদ্র ছিল। কৈশোরে ওর স্তনোদগম হয়েছিল। কেটে ফেলা শিশ্নের বেচারা ছিদ্রটি দিয়ে রজরক্তও প্রকাশিত হয়েছিল বার কয়েক। তখন ঢোল বেজেছিল। এখন ওসব আর হয় না। ঝুমকোর এখানে বেশিদিন হয়নি। ওর ছোট্ট একটি শিশ্ন আছে। মাইক্রো-পেনিস বলা যায়। অণ্ডকোষ বা শুক্রাশয় নেই। হয়তো ভিতরে আছে। ওর দাড়ি-গোঁফ ওঠে ভালই। শরীরে পেশি আছে। তার মানে, শুক্রাশয় পেটের ভিতরে থেকে টেস্টোস্টেরন নিঃসরণ করে চলেছে। ও কিন্তু পুরো ৪৬xy আর ছবি হচ্ছে ৪৬xx সিউডো ফিমেল হার্মাফ্রোডাইট। এনলার্জড ক্লিট উইথ ইম্‌ম্যাচিওর্‌ড ওভারি।

আর সব যারা আছে, ওদের কারও তেমন লিঙ্গ-পরিচয় সংক্রান্ত গন্ডগোল নেই। সবাই পুরুষমানুষ। অনেকেই 'ছিন্নি' হয়েছে। এবার আবার গল্পটা শুরু করা যাবে।

আরও বেশ কিছুদিন কেটে গেল অনিকেতের। বিহার থেকে বেরিয়ে আলাদা প্রদেশ হল ঝাড়খণ্ড—২০০০ সালের নভেম্বরে। আকাশে বাজি চমকালো, বাজনা ঝমকালো, বাজারের ব্যবসায়ীরা লম্ভা নাচাল। আবার 'ক্যালকাটা'-ও হয়ে গেল কলকাতা। বাঙালিরা উচ্চারণ করে 'কোলকাতা'। কিন্তু টিভিতে অবাঙালিরা বলছে 'কঅল্‌কাতা'। শুনতে কেমন যেন লাগছে।

অনিকেতের আরও কিছুদিন পেরিয়ে যাওয়া মানে তো দুলালেরও আরও কত কী ঘটে যাওয়া। দুলাল তো নয়, 'দুলালী'। অনিকেত দুলালীকে নিয়ে লিখছে।

নাগেশ্বরী চাত্তারা-কে বলল—অনেকদিন তো হল, দুলালীর 'নথ-ভাঙা' কবে হবে লো?

চাত্তারা গত রাতে অনেকটা 'খিলুয়া' খেয়েছিল। ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে। হাই তুলে বলল—এখনই করে দাও, এধারে তো 'বাঁধনা পরব' চলছে।

'বাঁধনা পরব' হল সাঁওতাল-কুর্মিদের উৎসব। গরুদের খুব খাতির করা হয় এই সময়, ওদের গায়ে চটের জামা পরানো হয়, ক্ষুরে জল পড়ে, গুড়-ছোলা খাওয়ানো হয়। বাঁধনা পরব-

এর মধ্যে যদি কোনও গাই 'পাল' খেতে চায়, সেটা ভাবা হয় খুব ভাল লক্ষণ। লক্ষ্মীমন্ত গাই বাঁধনা-য় পাল খায়।

নাগেশ্বরী বলল, তবে রবিবার করে দে।

রবিবার দিন রোজগারপাতি ভাল হয় না। দুর্গাপুর-পানাগড়ের গেরস্ত পাড়ায় ব্যাটাছেলেগুলো ঘরে বসে থাকে। হুমদো মদ্দা ঘরে থাকলে রোজগার ঢিলে যায়। রোববার-ই ঠিক হল 'নথ-ভাঙা' হবে। হাতে দু'দিন।

'নথ-ভাঙা' অনেকটা কৌমার্য ভঙ্গের মতো।

অ ছবি... গুরুমা ডাকেন।

—রোববার দুলালীর 'নথ-ভাঙা'। তোরা পারবি, না কি বাইরে বলাব?

ঝর্না-টর্নারা বলল—ধুর। বাইরে বলবে কেন, নিজেরা করব। বড় খোবরা, কপি ভাজার টাকনি।

মহুয়া বলল, ট্যাংরা মাছ খুব উঠেছে।

নাগেশ্বরী বলল, ছুঁড়িদের শখ কত, ট্যাংরা খাবে। ট্যাংরা পোঁদে দে।

মহুয়া বলল, নথ-ভাঙার দিনে মাছ খেতে হয়। আমার সময় হয়েছিল।

—কী মাছ হয়েছিল যেন?

—তেলাপিয়া।

—ঠিক আছে, দেখা যাবে। চাত্তারা যা বলবে।

চাত্তারা বলল, কত হাতি গেল তল, মশা বলে কত জল। বেড়ালকে মাছ খাওয়ানো শেখানো। দুলালী পাক্কি মাল। বহুত চুয়া খা চুকা বিল্লি।

ওরা সবাই জানে, এসব খোলে যারা আসে, তারা এর আগে ভালমতো পুরুষ-সঙ্গ করেছে। তবু এটা একটা 'প্রথা'। নথ-ভাঙার নামে একটু নাচা-গানা, খিলুয়া-খোবরা খাওয়া।

এখানে আসার পর এখনও পারিক বসায়নি দুলাল। অন্যরা বসায়। দুলাল দেখে। মুখ ফুটে কিছু বলেনি। ও জানে, 'নথ-ভাঙা' না-হলে স্বাধীনভাবে পারিক বসাতে পারবে না। মেয়েরা যেমন মা-কে বলতে লজ্জা পায়, 'মা আমার বিয়ে দিচ্ছো না কেন?'—তেমনই দুলালীও বলেনি—'আমার নথ-ভাঙা কবে হবে মা?'

তবে গুরুমা-র নজর আছে।

তবে এ ক'মাস যে একদম উপোসী ছিল দুলালী, তা নয়। রেল স্টেশনের ডিউটিতে গিয়ে রেল পুলিশ ওকে একবার বসিয়েছিল। খুব লাগছিল। দুলালী দেখছিল, ওর ঘরে ভেন্ডি আছে। ভেন্ডি ছেঁচে, একটু জলে মিশিয়ে নিলে, বেশ একটা হড়হড়ে জিনিস তৈরি হয়। ওতে কাজ হয়েছিল।

এখানে লাল-হলুদ-সবুজ রঙের কাঠের তৈরি বিভিন্ন সাইজের 'লোলা' রাখে কেউ-কেউ। 'লোলা' হল বাচ্চাদের মুখে দেওয়ার জন্য কাঠের তৈরি একটা জিনিস। একটা ছোট্ট হাতল, সামনের মুখটা গোল। বাচ্চারা যা পায় মুখে দেয়। ফ্রয়েডের চিন্তায় ওটা 'ওরাল ফেস'। মায়ের স্তন খাওয়ার সময় ওদের মুখে একটা সুখানুভূতি হয়। সেই অনুভূতি পাওয়ার জন্য ওরা আঙুল চোষে, কলম-পেন্সিল—যা পায় মুখে দেয়। বাচ্চাদের জন্যই তৈরি করা হয়ে থাকে ওই 'লোলা'। গ্রাম্য বাজারে কিংবা মেলায় পাওয়া যায়। ওগুলো রঙিন হয়। হয়তো খুব খারাপ

রং। শিশুদের জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত রং। কিন্তু এসব দেখছে কে। গ্রাম্য মেলায় বড় মাথাওলা লোলা-ও পাওয়া যায়। বোঝাই যায়, ওগুলো শিশুদের জন্য নয়। মাথাটাও গোল নয়। একটু ডিম্বাকার। ওগুলো তবে কাদের জন্য বিক্রি হয়? যাদের জন্য বিক্রি হয়, ওরা কিনে রাখে। এসব ওদের টুল্স। ভেন্ডি ভেজানো জলে, কিংবা কাঁচা ডিমে ভিজিয়ে ওরা পায়ু-ব্যায়ামটা করে। প্রথম দিকে তো করতেই হয়। বিদেশে 'গে'-দের জন্য এসব ব্যায়ামের জিনিসপত্র পাওয়া যায়। ইন্টারনেট-এ দেখেছে অনিকেত। খোজাদের সম্পর্কে পড়তে গিয়ে দেখা গিয়েছে, অটোমান সম্রাটরা ওদের হারেমে অন্যান্য রাজার মতোই খোজা রাখতেন। হারেম পাহারা ছাড়াও সম্রাটদের কাম-ক্রিয়ায় সাহায্য করত। বালিশ সেট করে দেওয়া, পা দু'টো ঠিক জায়গায় 'সেট' করে দেওয়া ইত্যাদি। কখনও-কখনও সমকামী সম্রাটরা এদের যৌন-সঙ্গী হিসেবে ব্যবহার করতেন। ওদের পৌরুষহীন, যৌনতাহীন বলেই ভাবা হত। অথচ খোজাদেরও একটা যৌন-জীবন ছিল। ওরা নিজেদের মতো করে কামকলা উপভোগ করত। সুতো দিয়ে বাঁধা ডিম সেদ্ধ বা কাঠ বা ধাতব দণ্ড সুতোয় বেঁধে, পায়ুপথে প্রবেশ করিয়ে সুতো ধরে নাড়াত। পায়ুনালীর অপর পাশে প্রস্টেট। প্রস্টেটের সঙ্গে ঘর্ষণ হত, কিন্তু ওরা তো জানত না—ওটা প্রস্টেট, ওরা জানত সুখানুভূতি। কেটে ফেলা লিঙ্গের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা এবড়োখেবড়ো মাংসপুঁটুলির মাঝখানে লুকিয়ে থাকা ছিদ্রপথে নেমে আসত সুখরস। যেটা প্রস্টেট থেকে নিঃসৃত। এরকমও গল্প আছে, একে অন্যের সুতোর ওপর ছড় দিয়ে ভায়োলিন জাতীয় বাজনা বাজাত। একটা অদ্ভুত শব্দ তৈরি হত। সেই শব্দঝংকার বা ধাতব কম্পন প্রস্টেটে পৌঁছত। এবং ওই অদ্ভুত শব্দকে বলা হত 'ক্যাফ্রিয়ান প্যাথোজ'। ওই আওয়াজটা পরে ভায়োলিনে ঢুকে গিয়েছিল।

দুলাল যখন নতুন-নতুন—সিনিয়ররা ওকে একটু-আধটু র‍্যাগিং করত। গুরুমা দুলালকে ডেকে গা-হাত-পা টেপাত। চাত্তারাও মাঝে-মাঝে। দুলালকে বলত, লিক্‌ম ঠেকাতে। কিন্তু দুলাল ওই কাজটা করতে পারত না বলে বকাবকি করেনি। বলেছে, আহা লো...। ওই ডাক শুনে দুলাল আর দুলাল থাকত না, 'দুলালী' হয়ে যেত।

ফুলিও ডেকে নিয়ে ঘরে এটা-ওটা করতে বলে। একদিন তেল মাখিয়ে দিতে বলেছিল। ম্যাক্সি খুলে দিয়েছিল ফুলি। বলেছিল, সারা গায়ে মাখা। ফুলির হাতে-পায়ে লোম ছিল, বুকটায় লোম ছিল না, সামান্য উঁচু। মাঝখানে ছোট-ছোট কিশমিশ। তার দু'উরুর মাঝখানে চুলে ঢাকা একটা ছোট্ট পুটুলি। 'ছিন্নি' হলে দুলালীরও ওরকম হবে। ঘাবড়ায় না ও। সবার যা হয়, ওরও হবে। এটাই হল লিক্‌ম-টার গোড়া। একদম গোড়া থেকে কাটলেও, আধ আঙুল পরিমাণ মাংস রয়েই যায়। ওখানে তেল মাখায় দুলালী, যত্নে। কী আশ্চর্য ওই আধ আঙুল পরিমাণ সমাধি ফলকের মতো মাংসখণ্ড কেমন জেগে ওঠে, কঠিন হয়ে ওঠে, শক্ত হয়ে ওঠে। কাঁপে। মুঠোয় চেপে ধরে দুলালী। ফুলি হাসে। বলে, চড়াই পাখি ডিম পেড়ে গিয়েছিল। বেশি চাপিস না ফেটে যাবে।

দুলালীরও ওটা খসাতে হবে। এটা না-খসালে, কদর নেই। কেটে ফেলাই ভাল। এ শালা মাঝে-মাঝে জ্বালাতন করে। কষ্ট তো একটু পেতেই হবে। সব ধর্মেই কষ্ট আছে। ধর্মরাজের থানে যারা কাঁটা ঝাঁপ দেয়, যাঁরা জিভে লোহার কাঠি ফোঁড়ে, জ্বলন্ত আঙারে হাঁটে—ওদেরও তো কষ্ট হয়।

দুলালীকে দিয়ে শুধু গা-টেপানো তেল-মাখানো নয়, আরও কতরকম রসিকতা করে ওরা। একদিন সকালবেলা ঘুম ভেঙে দেখে, ওর লিক্‌মের মাথায় কী যেন সাদা-সাদা। 'নিরখা' এত ঘন হয় না কি? মাঝেমধ্যে একটু-আধটু 'নিরখা' খসে। কিন্তু এটা অন্য কিছু। হাতে নিয়ে শুঁকে দেখে। ও হরি! টুথ পেস্ট। তখন সবাই হাসাহাসি করে। বলে, তোর খোকা দাঁত মাজবে। তোর ম্যাক্সির তলায় দ্যাখ গে, একটা ব্রাশ রেখে দিইচি। সত্যিই দেখল একটা ব্রাশ আছে।

এসব ঠাট্টা-ইয়ার্কি ছাড়া অন্য ট্রেনিংও হয়েছে। চাত্তারা, ফুলি সবাই কিছু-না-কিছু ট্রেনিং দিয়েছে গুরুমা-র হুকুমে। পুরুষ পারিককে গা টেপার ট্রেনিং দিয়েছে। চাত্তারা বলেছে, টেপাটিপিতে মদ্দারাও খুব আরাম পায়। দোষ দেয় মাগিদের। কানের কাছে গরম ভাপ দেওয়া শিখিয়েছে, কানের লতি আস্তে করে কামড়ানো, পুরুষের বুকে ছোট করে জিভের কাজ করা—সব।

—আর মুখের কাজ কী শেখাব, ওটা না-করলে পারিক ধরে রাখতে পারবিনে। ফুলি বলেছিল—কোনও-কোনও পারিক দেখবি হাবার মতো তোর আদর খেল কিছুক্ষণ, তারপর তোকে আদর করবে। তোর শাড়ির তলায় হাত চালাবে, তোর লিক্‌ম-টা খুঁজবে। নাড়িয়ে ফড়কে দেবে। ও তোকে উপড় করে যেমন ধুরবে, তোকেও বলবে 'ধুরে' দিতে। ওরা হল ডুপ্লি। দেয় আবার নেয়।

দুলাল বলেছিল, অ্যা-মা। ওসব আমি পারব না।

ফুলি বলেছিল, ওসব তো আমারও ভাল লাগত না। ওই জন্যই তো আমি ছিবড়েছি।

দুলালের নথ-ভাঙতে আজ আসবে লছমন যাদব। গাড়ি সারাইয়ের কারবারি। ওর নিজের একটা কিংবা দু'টো গ্যারাজ আছে। পানাগড়ে এই ব্যবসাটা খুব ভাল চলে, কারণ মিলিটারি গাড়ি নিলাম হয় এখানে। যারা কেনে, ওরা সারাই করে। বডি তৈরি করে।

লছমনের দেশ বিহারের কোথাও। ওখানে ওর বউ-সংসার, মকাই খেত, গেঁহু খেত, বক্‌রি-ভঁইস সব আছে। পানাগড়েও দোতলা বাড়ি, বিলাইতি কুত্তা, জেনানা, নোকর—সব আছে। আজকের 'বড় খোবরা' মানে পাঠার মাংস, আর বিলাইতি মালের খরচ যাদবই দেবে। যাদব ঝুমকোরও 'নথ' ভেঙেছিল। নাগেশ্বরীকে বলেছে—কীসব মাল আনছ, আকখাট, একটা 'নাগিন' আনতে পারো না?

'নাগিন' মানে বেশ মিষ্টি-মিষ্টি দেখতে পুতুপুতু পুরুষ। চোখ বড়-বড় হবে, রং ফরসা হবে, ঠোঁট লালচে হবে, পেটে ভুঁড়ি থাকবে না, একটু ন্যাকা-ন্যাকা কথা বলবে—মানে মেয়েদের মতো দেখতে মেয়েলি-পুরুষ। নাগেশ্বরী এখনও 'নাগিন' জোগাড় করতে পারেনি। নাগেশ্বরী জানে, 'নাগিন' পেলে যাদব বহুত খরচ করবে।

'নথ-ভাঙা' যাদবের হবি। শুধু হিজড়েদেরই 'নথ' ভেঙেছে এমন নয়, বর্ধমানের বেশ্যা পল্লিতে গিয়ে কিশোরী-বালিকারও 'নথ' ভেঙেছে। ওর লোক ফিট করা আছে। নথ-ভাঙার বরাত পেলে এই শুভকর্মটা করে আসে। এজন্য যাদব খরচাও করে।

খরচা মানে ওখানে আনন্দ-ফুর্তির খরচা ছাড়াও, নিজের শরীরেরও মেন্‌টেনেন্স আছে। ভোরবেলা ছোলা ভেজানো খায়, একটু পর পেস্তা-কাজু বাটার শরবত মধু দিয়ে। কে যেন বলেছিল, পাঁঠার অণ্ডকোষ দুধে সেদ্ধ করে খেলে খুব 'তাকত' হয়। সেটাও খায়। শিলাজিৎ

দুধে গুলে খেয়েছে। বাজার থেকে পালঙ্কতোড় তেল মালিশ করে পুংদণ্ডে। যদি গন্ডারের শিঙের গুঁড়ো পায়, যত টাকা লাগুক—খরচ করতে রাজি।

সকালবেলা পার্বতী হোটেলের হেড রাঁধুনি এসে বলে গিয়েছে, যাদবজি আসবে। খবর দেওয়া হয়েছে। ওই লোকটার নাম লসুন পাইক। দালালির কাজ করে। হিজড়ে খোলে খদ্দের নিয়ে যায়। অনেক ট্রাক ড্রাইভার কিংবা গাড়ির মিস্ত্রি মেকানিক খেতে আসে হোটেলে, লগন ঠিক বুঝে যায়। কীভাবে বলবে, কখন বলবে—এ ব্যাপারে বাহাদুর। নতুন খদ্দের নিয়ে গেলে কমিশন পায়।

লছমন যাদব এই খোলের নিয়মিত খদ্দের নয়। কমই আসে এখানে। কারণ ঠিকমতো কেউ নেই। কাউকেই খুব একটা পছন্দ নয়। নাগেশ্বরী এখনও একটাও 'নাগিন' এনে দিতে পারেনি।

লছমন আসবে সন্ধে নাগাদ। দুপুরে একটু গড়ানো হল। চোখ ফুলো করা হল। ফুলশয্যার দিন নতুন শাশুড়ি-মা আজকাল বলে, একটু ঘুমিয়ে নাও মা। এটাকে মেয়েদের ম্যাগাজিনে বলে 'বিউটি স্লিপ'। চারটে নাগাদ ওঠা হল। উঠানের বাইরে তিন-চারটে কুকুর বসে আছে। ওরা ছল্লায় বের হল কি না কুকুররা ঠিক খবর পায়। না-বেরলে দুপুরে খাওয়াদাওয়া হয়। কিছু এঁটোকাঁটা পড়ে থাকে। দরজাটা খুললেই কুকুরগুলো সে সবের ওপর হামলে পড়বে।

এবার প্রসাধন। দর্শন দিয়ে দাড়িগোঁফ টেনে-টেনে তোলা। এতদিনে গোঁফ-দাঁড়ি অনেকটাই কমে গিয়েছে। গত ক'মাস ধরে গর্ভনিরোধক বড়ি খাচ্ছে দুলাল। চামড়াও বেশ নরম-নরম হয়েছে। বুকের ওপর অল্প-অল্প মাংসও গজিয়েছে। গুরুমা-র ঘরে নানারকম সাজগোজের জিনিসপত্র আছে। দুলালীর তেমন কিছু নেই। পাউডার, ক্রিম, লিপস্টিক আর কাজল কাঠি। হাসি বেশ সাজাতে জানে। ও গুরুমার ঘর থেকে এটা-ওটা কত কী নিয়ে এসে, মুখে মাখাল। ভ্রু টেনে দিতে-দিতে একবার বলল, মাধুরী দীক্ষিত। চোখের ওপর কী একটা মাখিয়ে গুনগুন করে গাইছিল, আঁখ মার দে। নখে রুপোলি নেলপালিশ লাগাল, সঙ্গে গান, 'মেহেন্দি লাগাকে রাখ না।' মেহেন্দি হলে ভালই হত, কিন্তু এখানে মেহেন্দি করবে কে? একটা লাল শাড়ি কিনতে হয়েছিল দুলালীকে। ওটা বার করল। শায়া পরার আগে জাঙ্গিয়া পরে নিল। ওরা বলে, প্যান্টি। দুলালী এখনও প্যান্টি কেনেনি। প্যান্টি আর জাঙ্গিয়ার মধ্যে তফাত কতটুকুই বা? বোধহয় একটু ছোট আর বড়। এরপর শায়া এবং শাড়ি। বেশ সুন্দর করে পরিয়ে দিল ওরা। সুন্দর দু'টো 'ইলু' ভরে দিল বুকে। জল ভরা মোটা রবারের বেলুন। এই বেলুন ওজন দরে কিনে আনে, পিচকিরি দিয়ে জল ভরে রাখে। আয়নার সামনে দাঁড়াল দুলালী। চেনাই যাচ্ছে না। ওপাশ থেকে যেন দুলালী শুনল : তুই কে এলি?

দুলাল যখন বিয়ে করতে গিয়েছিল, এরকমই লাল শাড়িতে সেজেছিল ওর বউ। কপালে চন্দনের ফোঁটা ছিল। দু'জনে দুলালীর দু'হাত ধরে গুরুমা-র কাছে নিয়ে গেল। গুরুমা'কে দুলালী প্রণাম করল। গুরুমা দুলালীর থুতনিটা ধরে নাড়িয়ে দিয়ে বলল—বারেব্বা, একদম গাল-ভাঙা হেমামালিনী।

ঘর থেকে বেরনোর সময় ঢোলে পা লেগে গেল দুলালীর। এ কী করলি—গান্ডুনি, বোকাচুদি—কানা খানকি—এসব খিস্তি করতে লাগল সবাই মিলে। মহা অন্যায় হয়ে গিয়েছে। ঢোলে পা লাগা পাপ। তাও আজকের মতো শুভদিনে?

লাজে মরে যায় দুলালী। দেখতে পায়নি। মাথায় ঘোমটা ছিল যে। যে-ঢোলটা পায়ে

লেগেছিল, দু'হাতে স্পর্শ করে নমস্কার করল। গুরুমা বলল—এমন করে পেনাম করলি যেন 'আয়াম সরি, আয়াম সরি'। এস্‌টাইলের মাগিরা যেমন পায়ে পা লাগলে করে। লম্বা হ, দণ্ডবৎ হয়ে পেনাম কর।

তাই করল দুলালী। 'ঢোল'-কে কী বলে সম্বোধন করবে—বুঝতে পারছিল না। এটুকু বুঝেছিল, ওদের এই সমাজে ঢোল খুব পবিত্র। বেস্পতিবার ঢোলের গায়ে সিঁদুরের ফোঁটা পড়ে। ঢোল-ই তো লক্ষ্মী। কিন্তু ঢোল কি দেবী না দেবতা? হে 'ঢোল বাবা' বলবে, না কি 'হে মা ঢোল' বোঝেনি—দুলালী বলেছিল, হে ঢোল, ক্ষমা করো। ইচ্ছে করে পা ছুঁইনি।

পরে যখন দুলালের অসুখ করেছিল, দুলালের মনে হয়েছিল ওটা সেই 'নথ-ভাঙা'-র দিনে ঢোলে পা লাগার ফল।

উৎসবের আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে হয়ে গেল। এরই মধ্যে লছমন যাদব এসে গেল। টেরিকটের ঘিয়ে পাঞ্জাবি এবং সরু পাজামা পরে এসেছে। গা থেকে আতরের গন্ধ বেরচ্ছে। লোকটার বেশ মোটা গোঁফ আছে। কান থেকে লোম বেরিয়েছে। কাশছে লোকটা।

গুরুমা ওকে নিজের ঘরের চেয়ারে বসাল। হাসি আর ফুলি দুলালীকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। এখন, যাওয়ার আগে বহুচেরা-র ছবিটাকে প্রণাম করার ছলে আড়চোখে পারিক-কে দেখে নেয়। 'পুরীর স্মৃতি' লেখা রেকাবিটা থেকে কালো পিঁপড়ে ঝেড়ে একটা নকুল দানা উঠিয়ে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বলল, পাপ খণ্ডন করো মা।

ঘরে আসর বসে গেল। বেচারা দুলালী বাইরে। তবে গুরুমা-র ঘরে সবাই ঢুকতে পারেনি। গুরুমা যাদের বলেছে তারাই এসেছে। সিনিয়রদের মধ্যে চাত্তারা তো আছেই, ফুলি, ঝর্না আর মহুয়া আছে। মহুয়ার নথ-ভাঙার কাজটা যাদব-ই করেছিল, তাই জুনিয়ার হয়েও ও অনুমতি পেয়েছে। তা ছাড়াও, একটু ঝলবলানি আছে। নাচতে পারে। হাসিও থাকছে, কিন্তু ও বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। খাবারদাবারের দিকটা সামলাতে হবে ওকে। লালুকে খবর দিয়ে ডেকে আনা হয়েছে। ও একজন আকখাট মদ্দ। গুরুমা একটা সাইড বিজনেস চালায়। গাঁজার। লালুকে ফোকটে খিলুয়া খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

কাচের আলমারি খুলে গেলাস বার করল ঝুমকো। বোতল বার করল যাদব। ঝর্না থালায় সাজিয়ে চানাচুর আর আলুভাজা এনে দিল। গেলাসের ঠুংঠাং শব্দ। 'টু ইন ওয়ান'-এ ক্যাসেট ঢুকিয়ে দেওয়া হল। গান বাজল 'রূপ তেরা মস্তানা'। ভিতরে হাহা হিহি চলতে লাগল, খিস্তি-খেউড় চলতে লাগল, গালাগালি-মাখা গানও। মাঝখানে হাসি এসে একটু গরম জল চেয়ে নিয়ে গেল। যাদব গরম জল দিয়ে রাম খাবে। ওর খুব কাশি হয়েছে।

একটা ঘর ফাঁকা রাখা হয়েছে। ওখানে দুলালীর নথ-ভাঙা হবে। চাদরটা পরিষ্কার। চাদরের ওপর কেউ মজা করে কয়েকটা গাঁদা ফুল ছিঁড়ে ছড়িয়ে রেখেছে।

দুলালীর হাতে একটা গেলাস ধরিয়ে দিল চাত্তারা। বলল, তিনবার ফুঁ মারতে হবে। এক ফুঁয়ে সদা যেন থাকি চনমন, দুই ফুঁয়ে পারিকের সদা টাইট ধন, তিন ফুঁয়ে পারিকের সদা থাকে মন।

খাওয়াদাওয়া হল। দুলালী কনে বউয়ের মতো খাটে বসে আছে। গুরুমা এলেন। 'অম্বার পাঁচালি'-টা পড়বেন এবার—

জয় জয় নম নম পুণ্য কাশীধাম

কাশী রাজের কন্যা ছিল অম্বা তাঁর নাম।
গুণবতী কন্যা সে, রূপবতী নারী
রূপের বর্ণনা তার দিতে নাই পারি।।
যেমন নাই তার তেমনি মাই
এ মেয়ের তুলনা ত্রিভুবনে নাই।
শাল্ববদেশে এক রাজা সুন্দর চেহারা
বড় মন্দ জম্মু লিকম সদা থাকে খাড়া
অম্বা রানী তাহাকেই মনটা দিয়াছে
কিন্তু ভীষ্ম রাজা তাকে হরিয়া নিয়াছে।।

কিন্তু শোনো, ভীষ্ম হল ব্রহ্মচারী ন্যাকড়া লিক্‌ম। ওর নিজের জন্য অম্বাদেবীকে লেয়নি কো। ওর জ্ঞাতি বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বে দেবে বলে হরণ করেছিল। পরে জানতে পারল যে অম্বা অন্য একজনকে মন দিয়ে রেকেচে। ভীষ্ম তখন অম্বাকে ছেড়ে দেয়। অম্বা শাল্ব রাজার কাছে যায়—ওগো রাজা, আমি ফিরে এলাম, আমায় আলিঙ্গন দাও। শাল্ব বলল—আলিঙ্গন? আমি তোকে ছুঁব না। শালা ভীষ্ম তোকে অপবিত্র করেছে। অম্বা বলল মায়ের দিব্বি। ভীষ্ম কিছু করেনি। ও ব্রহ্মচারী।

শাল্ব বলল,
ব্রহ্মচারীর গান্ডি মারি
তুই হলি কুলটা নারী
তোকে আমি ঘিন্না করি
তুই ফুটে যা হতচ্ছাড়ি।
মনোদুখে অম্বা দেবী চলে গেল বনে
শিবঠাকুরের ধ্যান করে ভক্তিমনে।
মনে ভাবে ভীষ্মের জন্য তার এই হাল।
ভীষ্ম যদি মরে তবে মেটে গায়ের ঝাল।
নমো নমো শিব শিব করিছে অম্বা
হেনকালে শোনা গেল ষাঁড়ের হাম্বা
ষাঁড়ে চড়ি মহাদেব অম্বা সকাশে
ষাঁড়ের উপরে বসে মহাদেব কাশে।

অম্বা তখন করল কী, কতগুলো তুলসী পাতা নিয়ে এসে মহাদেবের হাতে দিয়ে বলল, আপনার খুব কাশি হয়েছে, প্রভু, খেয়ে ফেলুন। কমে যাবে। মহাদেব দেখলেন, মেয়েটার তো তাঁর প্রতি খুব আড়িয়াল আছে, অম্বার হাত থেকে তুলসী পাতা নিয়ে চিবিয়ে খেলেন। মনে হল, গলায় আরাম হয়েছে। এরপর বললেন, কী চাস বল।

অম্বা বলল, আমি ভীষ্মকে শায়েস্তা করতে চাই।

শিব মাথা চুলকে বলল, এ জন্মে হবে না। পরের জন্মে তোকে হাফ-নারী করে পাঠাব দেখতে ব্যাটাছেলের মতো। নইলে রথ চালাবি কী করে, ভেল করবি কী করে। তুই হবি শিখণ্ডী।

অম্বা জন্মালো রাজা দ্রুপদের ঘরে
শিশুকালে তারে সব শিখণ্ডী নাম করে
দেখিতে ছেলের মতোই লিক্‌ম তাহার
বড় হলে তার হল নারীর বাহার।

হিজড়ে যেমন হয় আর কী, অর্জুন জানত, ভীষ্ম পুরুষ ছাড়া কাউকে যুদ্ধ করে মারে না। অর্জুন ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ মারাতে গিয়ে শিখণ্ডীকে রথের সামনে সেট করে রাখল। তির মারতে গেলেই শিখণ্ডীর গায়ে লেগে যাবে। এদিকে শিখণ্ডী তো আকখাট মন্দ নয়। হিজড়েই। ভীষ্ম কিছু করতে পারল না, অর্জুন ভীষ্মকে কাত করে ফেলল। শিখণ্ডী পরের জন্মে আবার নারীজন্ম পেয়েছিল।

গুরুমা-র গলা জড়িয়ে এসেছে। ভালই নেশা হয়েছে। বলছে, আমরা হলাম অম্বা, জগদম্বা—কী সে কম-বা।

অল্প ক'দিন শিখণ্ডীর মতো এসেছি। নাচব, গাব, মস্তি করব। আবার ফুল মাগি হয়ে জন্মাব। ব্যস। জয় অম্বা মাইকি।

নথ-ভাঙার দিন এই কাহিনিটা নাকি শুনতে হয়। সবাই শুনল।

দু'জনে ধরাধরি করে নথ-ভাঙা ঘরে পৌঁছে দিল দুলালীকে। একটা জগে জল। দু'টো গেলাস, একটু তুলো। একটা ভেজলিন-এর কৌটো।

ফুলি বলল, দিয়ে গেলুম গো। আমাদের মেয়েকে সাবধানে রেখো।

দরজা বন্ধ করল একটু জোরে।

'লে গয়ি দিল, গুঁড়িয়া জাপান কী।'—'লাভ ইন টোকিও' বাজছে ক্যাসেটে।

এরই মধ্যে উলু দিল ওরা।

আজকের মস্তির পুরো খরচ ছাড়াও গুরুমাকে পাঁচশো টাকা দিয়েছে যাদব। যাদব এবার উশুল করবে।

যাদব খাটে বসে আছে। ও ডাকল, আ যাও পেয়ারি। দু'হাত মেলে দিল।

দুলালী ওর পাশে বসল।

—নাম দুলালী আছে, হ্যায় না?

—হুঁ।

—আগে দুলাল ছিল? সাচ্ না?

—হুঁ।

—ডান্স আতি হ্যায়? ডান্স?

—থোড়া-থোড়া।

—শাদিসুদা?

—হুঁ।

—আমি ভি শাদিসুদা। দেশ মে হ্যায়। ইধার ভি এক রাখ দিয়া। বাঁচো মস্তি মে। হামকো সব চলতা হ্যায়। শ বুর গলাকে বন্‌তা হ্যায় এক গাঁড়। বলতে-বলতে কেশে ফেলে।

—থোড়া সা পানি পি লিজিয়ে। দুলালী বলে।

—পানি ক্যায়া হোগা, বোতল মে থোড়া রাম বাচা হুয়া হ্যায়।

ওর মুখ থেকে খুব মদের গন্ধ পাচ্ছিল দুলালী। কথাটাও জড়ানো ছিল।

দুলালী বলল, আর মদ খেয়ো না।

যাদব বলল, থোড়াসা। মুঝে সার্ভ করো।

দুলালী সামান্য একটু ঢেলে দেয়।

যাদব খায়। তারপর সদ্য মদ-খাওয়া জিভ দুলালীর ঠোঁট ছুঁতে যায়, তখন আবার কাশির দমক আসে।

—অত কাশি হল কেন? দুলালীর প্রশ্নে একটা অন্তরঙ্গতা।

—ঠান্ডা লেগে গিয়েছে। পরসোঁ বাইক লিয়ে বাডোয়ান গেলাম কিনা।

দাঁড়াও। তোমার কাশি কমিয়ে দিচ্ছি। দরজার ছিটকিনি খুলল, দুলালী। বাইরে তখন খিলুয়া খাওয়া চলছে। গান বাজছে,

চান্দা হ্যায় তু, মেরা সুরজ হ্যায় তু।

দুলালীকে দেখে ওরা কলকলিয়ে উঠল। কী রে? হয়ে গেল? ধুতে এলি না কি?

—না, তুলসী পাতা।

—তুলসী পাতা কী হবে?

—ওর বড় কাশি হচ্ছে। তুলসী তুলব।

—রাতে তুলসী তুলতে নেই।

—নেই তো নেই। পাপ আমার হবে। ও কাশছে খুব। দুলালী উঠানে নেমে কোণের গাছগুলো থেকে কয়েকটা তুলসী পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এল। অম্বাও তো শিব ঠাকুরকে তুলসী পাতা খাইয়েছিল। এরপর রান্না ঘরে গিয়ে একটু আদা থেঁতো করল, সঙ্গে তুলসী পাতা। ওরা বলল, খুব সোহাগ লো...

যাদবকে বলল, আদা-তুলসী পাতা থেঁতো করে এনেছি। আরাম হো জায়েগা। একটু খেয়ে নাও।

একটু অবাক চোখে দুলালীর দিকে তাকিয়েছিল যাদব।

তারপর হাঁ করে দিল।

দুলালী আদা-তুলসি বাটা একটু-একটু করে খাইয়ে দিয়েছিল। খাওয়ানোর সময় দুলালীর মুখটা কেমন ছুঁচোলো হয়ে গিয়েছিল—বাচ্চাকে খাইয়ে দেওয়ার সময় যেমন হয়, মুনু-মুনু বলার সময় যেমন হয়।

যাদব বলেছিল—চিজ বহুত আচ্ছি হ্যায়। তারপর জড়িয়ে ধরে বলেছিল, চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত-মস্ত। যাদবের বুকে জল-ভরা বল লাগছিল। জল-ভরা বল লাগুক। সেটা যখন খুশি লাগতে পারে। কিন্তু 'চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত-মস্ত' কী করে হবে? দুলাল-কাহিনি তো ফ্ল্যাশ ব্যাকে বলা হচ্ছে। ১৯৮৭-'৮৮ সাল। তখনও তো এই গানটা সৃষ্টিই হয়নি বলিউডে। না হোক গে স্থান-কাল মিশিয়ে দেওয়া হল। আর, একটু ব্রেখ্‌টিয়ান অ্যালিয়েনেশনের কায়দাও করা গেল।

যাদব বলল, ও বল উতার দো। বকোয়াস হ্যায়। খুলে দাও।

দুলালী বলল, তুমিই খোলো।

যাদব বলল, না, তুমি।

দুলালী বলল, না, তুমি-তুমি।

যাদব তখন ব্লাউজের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে, বল দু'টো বের করে আছাড় মারল।

ওরা কেউ ফাটল না। লাফাতে-লাফাতে খাটের তলায় ঢুকে গেল।

যাদব বলল, ওসব ঝুটমুট মাগি সেজে কী লাভ? লেড়কা হল লেড়কা, লেড়কি হল লেড়কি। গাঁড়, বুর, দু'টো দু'রকম। দু'টোই ভাল। বলতে গিয়ে আবার কাশল।

দুলালী যাদবকে শুইয়ে দিল। বুকে হাত বুলিয়ে দিল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। ঘুম পাড়াতে লাগল।

যাদব বলল, তুম বহুত প্যায়ারা হ্যায় দুলালী, বহোত।

কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকল যাদব। বলল, বহুত পি লিয়া দুলালী। ক্যায়া করু?

দুলালী তলপেটে হাত বুলোতে-বুলোতে আরও নীচে নিয়ে গেল। দেখল লিক্‌ম ঘুমিয়ে আছে।

থাক। নাড়াচাড়া করার দরকার নেই।

যাদব গাইল—ক্যায়া করু সজনি...।

এরপর উঠে বসল। বলল, নথ-ভাঙা আছে, তাই না?

দুলালী ছদ্ম-লজ্জায় মাথা নাড়ে। আঁচল দিয়ে ঢাকতেও গিয়েছিল রিফ্লেক্স বশে। কিন্তু ইলু দু'টো তো খাটের নীচে।

যাদবের চোখ লাল। পা জামার দড়ি খোলে। দুলালী বলল, তোমার শরীর খারাপ সোনা, কাশি হয়েছে। কিচ্ছু করতে হবে না। ঘুমু করো। শুধু একবার ঠেকিয়ে দাও, তা হলেই হবে।

দুলালী উপুড় হয়ে শোয়।

অনেক দূর থেকে আসা শঙ্খধ্বনি শুনতে পাচ্ছে দুলাল। খাজাইতলা থেকে। মা বাজাচ্ছে।

আসলে রাতের ইলেকট্রিক ট্রেন পানাগড় স্টেশনে ভোঁ দিল।

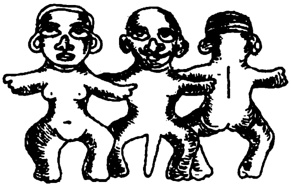

বৈষ্ণব পদাবলি-টা বেশ। 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে'—কী দারুণ শুনতে লাগে। বলতেও কী ভাল লাগে। 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।' 'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। পরান-পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।' এই কথাগুলো জ্ঞানদাস কৃষ্ণকে দিয়ে নয়, রাধা-কে দিয়ে বলিয়েছেন। চণ্ডীদাসের রাধা বলছে—'কলঙ্কি বলিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ। তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।' নিজেকে কেমন 'রাধা'-'রাধা' মনে হয় আমার। 'প্রেম করেছি বেশ করেছি করবই তো। রাধার মতো মরতে হলে তো মরবই তো।'

আচ্ছা, রাধার কী হয়েছিল? সেই যে কৃষ্ণ মথুরা-বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেল, তারপর তো আর রাধার পাত্তাই নেই। কেউ রাধাকে নিয়ে কিচ্ছু লেখেনি। কৃষ্ণ দ্বারকায় গেলেন, রাজপাট করলেন, পাণ্ডবদের সখা হলেন, কত বিয়ে-টিয়ে করলেন, কিন্তু রাধাকে ভুলেই গেলেন। রাধার

নাম পর্যন্ত নিল না লোকটা। পুরো ইরেজ করে দিল...।

অরূপদা-ও তাই করবে? ও কি সত্যিই ফুটে গেল? এখন কীরকম অ্যাভয়েড করে। আমার কবিতা পড়া ছিল, আসতে বলেছিলাম। কই, এল না তো...!

আমার এখন তেমন করে জন্মদিন হয় না। আগে হত। ছোটবেলাটায়। এখন মা নাকি আমার জন্মদিনের দিন কালীমন্দিরের বাক্সে টাকা ফেলে আসে। কতই বা, ম্যাক্সিমাম দশ? অন্য সময় মাঝেমধ্যে কয়েন ছুড়ে দেয়। একটাকার। একটাকা যদি লাল প্লাস্টিকের পার্সে না-থাকে তো পানের দোকান থেকে খুচরো করে নেয়। কী চায় মা ঠাকুরের কাছে? একটাই তো চাওয়া ছিল—ছেলেটাকে 'ছেলে' করে দাও মা, ঠিকঠাক ছেলে। এখন বোধহয় ওইসব প্রার্থনাকে শুয়োরের মাংস করে দিয়েছে। ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হতে-হতে শুয়োরের মাংস হয়ে যায়—জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন। ওই প্রার্থনা শনি-কালী-সত্যনারায়ণ সবাই 'রিজেক্ট' করে দিয়েছে। মৌলালির পিরের মাজারেও দু-একবার চাদর চড়িয়েছিল মা, খবর আছে। জন্মদিন যখন হত, তখন লুচি হত, পায়েস হত, বস্তির পাঁচ-সাতজন লুচি-তরকারি পায়েস খেত। মনে পড়ে, একবার জন্মদিনের বিকেলে মা খেলনা কিনতে নিয়ে গিয়েছিল, মা বলেছিল বন্দুক নে, আমি বলেছিলাম পুতুল। তখন আমি ক্লাস ওয়ান। আমার সব বন্ধু ফটাফট বন্দুক ফাটাত। আমি কোনও দিন বন্দুকের জন্য বায়না করিনি। তবু মা নিজে থেকেই বন্দুক কিনে দিয়েছিল। ওটায় ক্যাপের রিল পুরে দেওয়া যেত। বেশিদিন ওটা নিয়ে খেলিনি। ভুলেই গিয়েছিলাম। পরে, অরূপদা বন্দুক দেখাল। বললাম, এত বড়? একদম বন্দুক। সেই চামড়ার বন্দুক নিয়ে খেলতাম।

মা জন্মদিন বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু অরূপদা আমাকে জন্মদিনে বেড়াতে নিয়ে যেত। গিফ্‌ট দিত। কলম, কবিতার বই, একটা সিডি দিয়েছিল—'নো মিল্ক টু ডে'। এটা নাকি বিটল্‌স-দের গান। 'গে'-রা গাইত। আমার তো সিডি প্লেয়ার নেই, রোহিতের বাড়ি গিয়ে শুনেছিলাম। এবারের জন্মদিনে অরূপদা শুধু একটা কার্ড পাঠিয়েছে। তা-ও ক্যুরিয়ারে। সেই কার্ডে 'লাভ' শব্দটা একবারের জন্যও নেই। একটা ছাপানো কার্ড, আর ওইসব কার্ডে যা-যা লেখা থাকে আর কী। একই লেখা হাজার-হাজার খামে ঢোকে, হাজার-হাজার বাড়ি যায়। নিজের হাতে লিখে দিলে সেটা আলাদা। সেটা নিজের কথা।

অরূপদা তো পড়াত আমাকে। আমার চেয়ে অন্তত ছ'-সাত বছরের বড়। ও যখন আমাকে ভালবাসতে লাগল, তখন জানতাম না—ওর একটা বান্ধবী আছে। বান্ধবী তো থাকতেই পারে, একটা কেন, এক ডজনও থাকতে পারে। কিন্তু ওই মেয়েটা হল অরূপদার বিশেষ বান্ধবী। 'প্রেমিকা'-ই বলা যায়। ওই মেয়েটার নাম তৃষ্ণা।

যখন ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে বলল, 'ওর নাম তৃষ্ণা, আমার বান্ধবী'—তখন বুঝলাম কেন এত ওই গানটা গাইত অরূপদা—'কণ্ঠে আমার তৃষ্ণা, ও গো তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।' ফুচকা-টুচকা খাওয়া হল, হাঁটছি, বলা-কওয়া নেই হঠাৎ গেয়ে উঠল—কণ্ঠে আমার তৃষ্ণা...।

আগে কক্ষনও বলেনি তৃষ্ণার কথা। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বলে বলতে হল। দেখা হয়েছিল ফ্যান্সি মার্কেটে। অরূপদা বলেছিল আমাকে কিছু কিনে দেবে। খিদিরপুরের ফ্যান্সি মার্কেটের একটা গলির মধ্যে গিয়েছিলাম আমরা। যেতেই দোকানদারগুলো ফিসফাস শুরু করে দেয়।

সিডু-ডিডু-কিডু...। 'সিডু' মানে তো সিডি। বোঝাই যাচ্ছে ওগুলো ব্লু। 'ডিডু' মানে ডিল্‌ডো। কৃত্রিম পেনিস। অরূপদা বলেছিল, এখানে এসব ভাল পাওয়া যায় না। বিদেশে, মানে ইউরোপ-আমেরিকায় এসব খুব ভাল পাওয়া যায়। লেসবিয়ান-রা এসব কেনে। বেল্টের মতো করে কোমরে বাঁধে। অ-লেসবিয়ান, মানে ঠিকঠাক মেয়েরাও কিনতে পারে। 'গে' ছেলেরাও যদি প্র্যাকটিসের জন্য কেনে—বাধা কী? কলকাতায় দু-এক জায়গায় পাওয়া যায়। ওখানে ভাইব্রেটার-ও আছে। ওরা দেখাল। একটা রড। রবার-টবারের হবে। ভিতরে ব্যাটারি পোরা। সুইচ আছে টর্চের মতো। সুইচ অন করলে কাঁপতে থাকে। 'কিডু' মানে 'অ্যানাস ডায়ালেটর'। লিপস্টিকের মতো দেখতে, তবে লিপস্টিকের তুলনায় অনেক মোটা। খুব স্মুদ পদার্থ দিয়ে তৈরি। ওরা বলছে, অ্যাবোনাইট। ওটাতে কে ওয়াই জেলি লাগিয়ে পায়ুতে ঢুকিয়ে রাখতে হয়। পুঁই শাকের ক্যাশমেমো-র মতো পায়ু বলছি কেন? ওটা যা, সেটা বললেই তো হয়। আমি একবার বলেছিলাম, 'বড্ড লাগছে অরূপদা'—ও তারপর বলেছিল—'আজ একটু ম্যানেজ কর, আমি কিডু কিনে দেব।' সেদিন বড্ড বাড়াবাড়ি করছিল অরূপদা। অরূপদা তো টপ। আমি তো তাই জানতাম। আর 'টপ'-রা তো ওরকম দুষ্টুমি করবেই। 'প্রবর্তক' পড়ে জেনেছিলাম—'গে'-রা নানা ধরনের হয়। টপ, বটম, ভার্সেটাইল। টপ-রা পেছনে দেয়, বটম-রা নেয়। মানে 'নেওয়া'-টাই পছন্দ করে। টপ-রা নেয় না। এছাড়া ভার্সেটাইল-ও আছে, কখনও দেয়, কখনও নেয়। ওরা ডুপ্লি। দু'টোই ঠিক আছে ওদের ক্ষেত্রে। 'টপ'-দের মধ্যে আবার একটু ভেদাভেদ আছে। 'পাওয়ার টপ' আর 'সার্ভিস টপ'। 'পাওয়ার টপ'-রা অ্যাগ্রেসিভ। খুব দুষ্টু। 'সার্ভিস টপ'-রা 'বটম'-দের কথা শোনে। কো-অপারেট করে। কোনও-কোনও 'টপ' হয়, যারা মূলত দেয়, মাঝে-মধ্যে, একটু-আধটু নেয়ও। ওরা 'ভার্সেটাইল টপ'। 'ভার্সেটাইল বটম'-ও হয়। ওরা মূলত নেয়, মাঝেমধ্যে নেয়-টেয়। বই না-পড়লেও ব্যাপারটা ও বোঝে। ও বোঝে, ও নিজে 'বটম'। 'পিওর বটম'। আর অরূপদা 'টপ'। 'সার্ভিস টপ' বলা যায়। ও বোঝে। সুবিধে-অসুবিধে বোঝে। খুব ভাল করে আদর করে অরূপদা। ও বোঝে বলেই তো ফ্যান্সি মার্কেটে নিয়ে এসেছিল। দু'রকম সাইজের 'কিডু' কিনে দিয়েছিল। একটা লাল, আর একটা সাদা। সাদাটা লালের চেয়ে মোটা। প্রথমে সাদাটা দিয়েই প্র্যাকটিস করতাম। কে ওয়াই জেলি মাখিয়ে ঢুকিয়ে দিতাম। বেশ কিছুক্ষণ রাখতাম। মা জানত না। দুপুরে এসব করতাম। মা তখন অফিসে। তারপর সাদাটা। কে ওয়াই জেলি শেষ হয়ে গেল। অনেক দাম। নতুন কিনিনি। কিনতে পারিনি। নিজেই একটা বুদ্ধি বার করেছিলাম। নারকোল তেল দিয়ে, মায়ের ভেজলিন দিয়ে ট্রাই করতাম। মা বলত, ভেজলিন এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না। এরপর দেখলাম, ঢ্যাঁড়স টুকরো করে কেটে একটা কাপে ভিজিয়ে রাখলে কিছুক্ষণ পরে বেশ স্লিপারি জেলি-র মতন কিছু একটা তৈরি হয়ে যায়। ওটাই করেছি। কাপটা লুকিয়ে রাখতাম একটা তাকের পিছনে। মা দেখে অবাক হয়েছিল, বলেছিল, সে কী! এখানে কাপের মধ্যে ঢ্যাঁড়সের টুকরো কেন? ভাগ্যিস আমরা বস্তিতে থাকি, বড়-বড় ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকি না, ভাগ্যিস আমাদের বাড়িতে ইঁদুর হয়, মা-কে বলেছিলাম, ইঁদুর মারার বিষ। ইঁদুর ঢ্যাঁড়স খায়।

আমি এত করেছি অরূপদা তোমার জন্য। তোমার জন্য গমনপথ প্রশস্ত করেছি। ক্রমশ তৈরি করেছি নিজেকে। শুধু তোমার কথাই ভেবেছি অরূপদা। স্বপ্ন দেখেছি—রিয়েল স্বপ্ন—তোমার। তুমি তখন জাস্ট চাকরি পেয়েছ, তার পরে-পরেই স্বপ্নটা এসেছিল। তোমার বিয়ে

ঠিক হচ্ছে বাড়ি থেকে, তোমাকে মেয়েদের ছবি দেখাচ্ছে তোমার বউদি। তুমি দেখছ না। তুমি বলছ, না বউদি, আমার জন্য মেয়ে দেখো না। কী জোরে মাথা নাড়ছিলে তুমি অরূপদা, তোমার ঝাঁকড়া চুল দুলছিল।

অরূপদা, তুমি সেই কবে থেকে বলতে, সারা পৃথিবী জুড়ে আন্দোলন হচ্ছে, নরওয়ে-সুইডেনে সমলিঙ্গে বিয়ে 'লিগ্যাল' হয়ে গিয়েছে, আমেরিকার কয়েকটা স্টেটেও। আরও কয়েকটা দেশেও হয়ে যাবে। আমাদের দেশেও হবে। ৩৭৭ ধারার এগেন্স্টে 'নাজ ফাউন্ডেশন' মামলা করছে। অ্যাইসা দিন নেই রহেগা... বলতে-বলতে আমার পিঠে হাত বুলোতে... তখন কি বুঝেছি, তুমি ডাব্‌লডেকার? তুমি 'বাইসেক্সুয়াল'?

'বাইসেক্সুয়াল' কেউ হতেই পারে। আমি কিছু বলব না, কৈফিয়ত চাইব না—তুমি কেন বাইসেক্সুয়াল গো অরূপদা? শুধু দুঃখ থেকে গেল—আগে বললেই তো পারতে! এই অশ্রু-কঠিন ছুরিটাই তো গেঁথে আছে আমার চৈতন্যে। অরূপদা, তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হচ্ছে না তেমন, কথা হচ্ছে না। জানি, আমাকে নয়, তুমি তৃষ্ণাকে ভালবাসো। চোখের জলের সিঁড়ি বেয়ে তবু হৃদয়ে নেমে আসো। মেঘ হয়ে দূরে গিয়ে তাই জলের আবেগে ফের ভাসো। চোখের জলের সিঁড়ি বেয়ে হৃদয়ের দিকে নেমে আসো।

ফ্যান্সি মার্কেট থেকে 'কিডু' কিনে আমার ব্যাগে রেখেছিলাম। বেরনোর সময় একটা মেয়ে অরূপদাকে বলল, আরে অরূপ, এখানে কী করছ? অরূপদা বলল, একটা ক্যামেরা দেখতে এসেছিলাম, ওর জন্য। আমায় দেখাল। বলল, ওর নাম পরিমল। ওকে পড়াতাম। আমার ভাইয়ের মতো। অরূপদা বলল, ও তৃষ্ণা।

তৃষ্ণা বলল, আমার বাড়িতে তুমি একটা জিনিস ফেলে এসেছ।

অরূপদা মাথা চুলকোচ্ছিল।

—তেমন কিছু নয়, একটা রুমাল। ওটা দেব না। থাক, ওটা আমার কাছে থাক।

অরূপদা বলল—ছিঃ, রুমাল রাখে নাকি কেউ? নাক মোছা রুমাল...

—না না, নাক মোছা নয়, ঘাম মোছা।

তখনই বুঝে গিয়েছিলাম। তখনই।

তখনই তৃষ্ণার দিকে তীব্র তাকাই। দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম, খা। আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না।

এই অরূপদার জন্য কত মিথ্যে কথা বলেছি মা-কে, কত কলেজ কামাই করে দুপুর দিয়েছি, খুলে দিয়েছি সব। উপুড় হয়েছি।

পরে বুঝেছি শুধু তৃষ্ণা নয়, ওর আরও পুরুষসঙ্গী ছিল। সঙ্গী কেন? সাফ কথা, যৌনসঙ্গী। আরও ঠিক করে বলতে গেলে 'বাটুধারী' ছিল। নইলে কেন ওই কে ওয়াই জেলি-টা নিয়ে যেত ফের?

যখন 'কিডু' কিনে দিয়েছিল, সঙ্গে জেল-ও, ওটা তো প্র্যাকটিসে লাগত, তাই ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন ছিল না, কিন্তু এর আগে, যখন দুপুরে ওই কম্মো হত, ব্যাগে করে জেলিটা নিয়ে আসত, আবার নিয়ে যেত। বলেছিলাম থাক না এখানে, লুকিয়ে রেখে দেব। অরূপদা বলত দরকার নেই, আমি তো নিয়েই আসছি।

কিছুদিন পরই দেখতাম নতুন টিউব। আমার পিছনে তো এতটা খরচ হয় না। ততদিনে

তৃষ্ণাদির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গিয়েছে। মানে তৃষ্ণাদির কথা জেনে গিয়েছি। বুঝে গিয়েছি আমার একজন কম্‌পিটিটর আছে। বুঝে গিয়েছি অরূপদা-র চিপ্‌টি-ও ভাল লাগে। লাগুক। কতজনই তো 'ডাব্‌লডেকার' হয়। কিন্তু পরে বুঝলাম, অরূপদা-র আরও বাট্টু-পার্টনার আছে, নইলে টিউব শেষ হয়ে যাচ্ছে কেন? তৃষ্ণাদির জন্য তো এসব লাগে না। তৃষ্ণাদির অঙ্গে তো নিজস্ব জেলি আছে। সেল্‌ফ লুব্রিকেশন। কিন্তু বাট্টু-র তো 'লুব্রিকেশন সিস্টেম' নেই, লুব্রিক্যান্ট দিতে হয়।

একদিন জিগ্যেসও করেছিলাম—সত্যি করে বলো তো অরূপদা, আমি ছাড়া তোমার আর কে আছে?

অরূপদা বলেছিল, মাইরি বলছি, কেউ নেই। তৃষ্ণা? ওটা খুব একটা ভাল লাগে না। কী আছে ওতে? একটা হিন্দি প্রবাদ আছে জানিস, শ' বুর জ্বালাকে পয়দা হোতা হ্যায় এক গাঁড়। একশো চিপ্‌টি দিয়ে তৈরি হয় একটা বাট্টু। কী আছে ওদের বল? ওদের দু'পায়ের ফাঁকে হাত দিয়েছিস কখনও!

আমি মাথা নাড়িয়েছিলাম।

অরূপদা বলেছিল—পাবি না, কিচ্ছু পাবি না ওখানে। কী ধরেছিস, না ধরেছিস কিছু বুঝতেই পারবি না। আর ছেলেদেরটা ভাব। হাতের মুঠি ভরে যায়। বড় হয়, ছোট হয়...।

ছেলেদেরটা না, তোমারটা বলো। মনে-মনে বলেছিল। নিজেকে ছেলে ভাবে না তো পরিমল। এখন ওর নিজের লিঙ্গটা দেখলে নিজেরই কেমন খারাপ লাগে। আরও অনেক আগে, বয়ঃসন্ধির প্রথম দিকে দেখত, অবাক হত। নিজেকে অন্য মানুষ ভাবত। এখন মনে হয়, ওটা না-থাকলেই ভাল হত।

দু'পায়ের ফাঁকে ওসব লুকিয়ে ফেলে, পা দু'টো কোনাকুনি করে, কৃষ্ণের কায়দায় দাঁড়িয়ে, ওর পেল্‌ভিক অঞ্চলটা দ্যাখে। একদিন অরূপদার সামনে ওই কায়দায় দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করেছিল—ও অরূপদা, দ্যাখো তো, তোমার তৃষ্ণার মতো লাগছে?

অরূপদা বলেছিল—তোর মাথায় ফালতু-ফালতু তৃষ্ণা চেপে আছে। বলছি না, ওটা কিছু না। ওটা আমার ওভারটাইম। বলতে পারিস, বাই প্রোডাক্ট। তোকেই ভালবাসি আমি, তোকেই। হ্যাঁ, বলতে পারিস আমার হয়তো একটু-একটু বাই। এটা নিয়ে ভাবিস না। 'এলজিবিটি' কথাটা এল কেন তবে? লেসবিয়ান-গে-বাইসেক্সুয়াল-ট্রান্সজেন্ডার মিলে তো একটা শব্দ। আমি তোকেই ভালবাসি রে পরি। একটা মেয়ের চেয়ে একটা ছেলে অনেক ভাল। অনেক পয়েন্ট আছে। আমি একটা শ্লোক পেয়েছিলাম, সংস্কৃতে। ডায়রিতে আছে। দাঁড়া, পরদিন নিয়ে আসব। নিয়ে এসেছিল অরূপদা। বলল, এটা বররুচি-র লেখা। প্রাচীন সংস্কৃত কবি। 'উভয়সারিকা' নামের কোনও কাব্যগ্রন্থের শ্লোক। অরূপদা নাকি একটা আর্টিকেল পড়েছিল—ওখানে ছিল বররুচি-র সময়ে উত্তর ভারতে এক ধরনের মানুষ ছিল, ওদের বলা হত 'ভৃঙ্গুশ'। ওরা মেয়েদের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ পরত। মানে ওরা 'ট্রান্সভেস্‌টাইট' আর কী। হিন্দিতে এখনও 'ভুরকুস' নামে একটা শব্দ চালু আছে। 'ভুরকুস' মানে সুন্দর দেখতে 'লন্ডা'। ওদের 'নাগিন'-ও বলা হয়। একজন 'ভুরকুস'-এর একটা প্রেমিক ছিল। সেই প্রেমিক বলছে—তোমায় নিয়েই আমি থাকব। তোমার মাসিক-টাসিক হয় না। গর্ভ হওয়ারও কোনও চান্স নেই। কোনও ঝুট-ঝামেলা নেই। অরূপদার কাছ থেকে শ্লোকটা টুকে রেখেছিল,

ব্যাক্ষেপং কুরুতস্তনৌ ন সুরতে গাঢ়োপগূঢ়স্যতে
রাগঘ্নস্তব মাসি-মাসি সুভগে নৈবার্তবস্যাগমঃ
রূপশ্রী নবযৌবনোদয় রিপুগর্ভোহপি নৈবাস্তিতে
হ্যেবং ত্বাং সগুনাং বিহাস্যতি স চেদরুত্যুৎসবং ত্যক্ষতি।

পরি এর 'মানে' বোঝেনি। অরূপদা যা বলেছে, সেটাই মানে। অনেকদিন পর, এই মাত্র সেদিন, এর আসল মানেটা বুঝেছে পরি। অরূপদা যা বলেছিল ঠিকঠাক বলেনি। না জেনে বলেছিল।

অরূপদা যখন যা বলে, একদম বোল্ডলি বলে। এই বোল্ডনেস-টাই তো ভাল লাগত অরূপের। এর মধ্যে গুল মেশানো থাকতে পারে, না-জানা, হাফ-জানা মেশানো থাকতে পারে, কিন্তু ওর বলাটা খুব ম্যাস্‌কুলাইন। 'স্মার্ট' বলতে চেয়ে 'ম্যাস্‌কুলাইন' ভাবছে কেন পরি? পরি তো এরকমই ভাবে। অরূপদার বুকে অনেক চুল। চুল না, রোম। তার মানে অরূপদা রোমান। এই রোমান বডি ভাল লাগে পরি-র। পরির দু-চারজন ঠেকের বন্ধু আছে। ওরাও 'গে'। 'বটম গে'। ওদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়। পরি সব জানে না। অরূপদা-র সঙ্গে যা হয়, তার কিছুই বলে না প্রায়। অন্যরা যা বলে, সেটাই বেশি শোনে। মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। যে যত ভাল মেয়ে, তার লজ্জা তত বেশি। নয়ন কথা বলবে, মুখ বলবে না। বাংলার বধূ বুকে তার মধু নয়নে নীরব ভাষা। পরি-র কয়েকটা বন্ধু খুব 'ওয়াবাশ চেস্ট' ভালবাসে। স্মুদ, কিন্তু প্যাক্‌ড। ফোর প্যাক, সিক্স প্যাক। প্যাকের সঙ্গে, মাস্‌ল-এর সঙ্গে রোমের কী বিরোধ কে জানে? রোম থাকলেও তো প্যাক থাকতে পারে। বোধহয় রোম থাকলে প্যাকগুলো, ভাঁজগুলো ঠিকমতো বোঝা যায় না। জানা যায় না।

অরূপদা-কে জামা-প্যান্ট পরা অবস্থায় দেখতে নিপাট ভদ্রলোকের মতো। গায়ে-হাতে কোনও 'ট্যাটু' করা নেই—ইউরোপিয়ান-আমেরিকান 'টপ গে'-দের যেমন থাকে। কোনও কায়দা করা চুলও নয়। চুলে জেল নেই, কানের ওপর পর্যন্ত কামানো নেই—ওদেশে যেমন থাকে। সরু গোঁফ, ছোট চুল—সাড়ে পাঁচ ফুট হাইটের একটা লোক। গলায় পৈতে। নিরীহ চাউনি। বাজার করলে, ঢ্যাঁড়সের পোঁদ ফাটিয়ে-ফাটিয়ে কচি বেছে বাজার করবে। যখন পড়াতে এসেছিল—একদম গোবেচারা। সেই লোকটাই একদিন পরির হাতটা টেনে নিয়ে ধরিয়ে দেয়। পরি তখন ক্লাস সেভেন।

অথচ এই লোকটার এত পার্ট্‌স। তৃষ্ণা ছাড়াও আরও কেউ আছে। সে পরির মতোই কেউ। পরি এখনও সেটা বুঝতে পারেনি।

আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি অরূপদা, তোমাকে 'ফলো' করার প্রবৃত্তিও আমার নেই। তৃষ্ণার সঙ্গে আমি শেয়ার করতে পারি তোমায়। কিন্তু অন্য কোনও 'ধুরানি'-র সঙ্গে আমি পারব না। তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে আমি ডুবতে রাজি ছিলাম অরূপদা, কিন্তু তুমি ন্যাকা-ন্যাকা ভাব করে 'বাট্লু'-তে 'চিপ্‌টি'-তে ঘুরে বেড়াবে ভ্রমর? আ মরদ আ মরদ-ছিঃ, না-না-না। বেঁচে থাকো গো অরূপদা। আমি শুধু বঙ্কিম-শরতের নায়িকাদের কায়দায় অভিমান করলাম। তুমি সুখে থাকো অরূপদা, প্রজাপতি হয়ে ফুলে-ফুলে ঢলো—কিন্তু সত্যিটা বলো। তৃষ্ণাদিকে নিয়ে 'ও কিছু না' বলেছ, কিন্তু গতবার 'ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে'-তে তুমি আমার সঙ্গে ঘুরবে কথা দিয়েও আসোনি। মোবাইল অফ করে রেখেছিলে অনেকক্ষণ। পরে বললে, তোমার কোনও

রিলেটিভের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমি ঠিক বুঝি। তুমি ওখানে রুমাল ফেলে আসো, জাঙ্গিয়া ফেলে আসো, নিরখা ফেলে আসো।

আমি একটু কম কথা বলতাম। অরূপদা এসে মাঝে-মাঝে ঢং করত। কলেজে দাঁড়িয়ে থাকত। 'চল, কাটলেট খাবি চল'—বলত। আমি বিশেষ পাত্তা দিতাম না। অরূপদা বলত— 'গালফুলো গোবিন্দের মা চানতাতলায় যেয়ো না'... বলে থুতনি নাড়িয়ে দিত। আমি বলেছিলাম, কলেজে আসবে না।

ফাউ চাই, ফাউ? আসল খাবার কোথায় খাচ্ছো, সেটা কি আমি বুঝি না ভেবেছ? আমি সব বুঝতে পারি। কম ঘাটের জল খেয়েছি না কি?

তোমার তৃষ্ণাও তো আমাকে দেখেছিল অরূপদা, জানি, ও কিছুই সন্দেহ করেনি। ওকে তুমিও কখনও বলোনি যে, তুমি 'ডাব্‌লডেকার'। ওকে কখনও বলোনি, তুমি ভারতীয় দণ্ডবিধি-৩৭৭ ধারার আসামি হতে পারো।

আমি তোমাকে পাত্তা দিইনি, অভিমান করেছি, তুমি এখন আমাকে অ্যাভয়েড করছ। ওকে। ঠিক আছে। আমাকে ঠকালি যদি, নিজেকেও তো এতটা নামালি। তুমি আছো ডালে, আমি আছি জলে, তোমায়-আমায় দেখা হবে মরণের কালে। এটা ভেবো না অরূপদা, আমার কোনও প্রেমিক জুটবে না। আমি যদি ভালবাসতে জানি, আমাকেও কেউ ভালবাসবে। যাদের সঙ্গে আমি মিশি, ওদের অনেকেরই 'পারিক' ধরার জন্য 'খাই-খাই' ভাব আছে। আমি বেঁচে গিয়েছি। আমার অত কিছু নেই।

কিছুদিন আগে একজনের সঙ্গে আলাপ হল। কবিতা পড়তে গিয়ে। ও নিজে যেচে আলাপ করেছিল। ওর নাম চয়ন মল্লিক। বলেছিল, খুব ভাল লেগেছে। আমার একটা কবিতার একটা লাইন ছিল—'যদিও বামন, চুম্বন করি চাঁদ'। চয়ন বলেছিল, লাইনটার সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের একটা কবিতার খুব মিল—'ঘরে ফেরার রাতে'-তে আছে, 'বামন চায় চাঁদে খুচরো চুম্বন'।

আমি কিন্তু ওই কবিতাটা পড়িনি। কী-ই বা এমন পড়েছি, আমার কিন্তু খুব আনন্দ হয়েছিল। শঙ্খ ঘোষের মতোই আমি ভেবেছি—ভাবতে পেরেছি? অন্তত একটা লাইনও। অনেক কথা হল এরপর। প্রথম দিনেই বুঝেছিলাম, লোকটা নুনে নুন। কী একটা প্রশ্ন জিগ্যেস করতে গিয়ে হাঁটু ধরে ঝাঁকাল।

অনেক কবিই তো 'গে' হয়। আমার সঙ্গে চয়নের যদি রিলেশন তৈরি হয়, তবে কি কবিতার জন্য হবে? আমাদের রিলেশনের ব্রিজ-টা কী?

কবিতা না কি টপ-বটম?

এখনই বকমবকম

তবে অস্বীকার করব না, চয়ন-কে বেশ লেগেছে। দু-তিনবার কথাবার্তা হয়েছে। অরূপদা-র সঙ্গে কবিতা-টবিতা নিয়ে বিশেষ কথা হত না। চয়নের সঙ্গে হয়। চয়ন অরূপদারই বয়সি। হয়তো ছোটই হবে। ওকে চয়নবাবু বলে ডেকেছিলাম। ও হাত ধরে বলেছিল, শুধু চয়ন। বয়স কোনও ফ্যাক্টর নয়।

চয়ন এখনও চাকরি পায়নি। খুঁজছে। কে জানে চয়নের কোনও গার্লফ্রেন্ড আছে কি না। থাকতেই পারে। 'টপ'-দের মধ্যে ক'জনই বা পরিপূর্ণ 'গে' থাকতে পেরেছে? বরং বট্‌ম-রা 'গে' থেকে যায়। মেয়েদের দিকে লোভের দৃষ্টি দেয় না। নিজেকে দিয়েই তো বুঝি।

কলেজে আমার ছেলে-বন্ধু কই? ছেলেরা তো প্যাঁক দেয়, তাচ্ছিল্য করে। কেউ-কেউ 'হিজু' বলে ডাকে। এত ভাল রেজাল্ট করেছি, তবুও। মেয়েরাও তেমন বন্ধু হল না। ওরা আমাকে 'মেয়ে' বলেও ভাবতে পারে না, 'ছেলে' বলেও না। 'হিসি' করতে গেলে ছেলেদেরটাতেই যাই। খুব ইচ্ছে করে মেয়েদেরটায় যেতে। দু-একদিন অপেক্ষা করেছি, শুধু মেয়েদের টয়লেটে ঢোকার জন্য। ছুটি হয়ে যাওয়ার পর, ফাঁকা হয়ে গেলে...। একদিন টয়লেটে ঢুকেছি, ভেবেছি কেউ নেই, দরজা খুলেই দেখি আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে। ওর নাম তৃপ্তি। ও একটু ডানপিটে টাইপের। ইউনিয়ন করে, খুব চেঁচিয়ে স্লোগান দেয়। একদিন জিন্স পরে এসেছিল। আমাদের হেড বলেছিলেন, জিন্স পরে এসো না কেউ, আমার দেখতে ভাল লাগে না। ও বলেছিল, আমার তো পরতে ভাল লাগে স্যর। এ নিয়ে এরপর আর বেশি কথাবার্তা হয়নি। তৃপ্তি নামটার মধ্যে একটা সাদামাঠা গ্রাম্য-গ্রাম্য সরল-সরল ভাব আছে। আসলে তৃপ্তি কিন্তু সেরকম নয়। একটু কাঠ-স্মার্ট।

তৃপ্তি আমাকে দেখে মুচকি হাসল।

বলল, এখানে কেন? ইচ্ছে হল?

আমি বোকার মতো ঘাড় নাড়িয়ে ঢুকে গেলাম ভিতরে।

এই যে তৃপ্তি, মেয়ে, কিন্তু ততটা 'মেয়ে' নয়, লাজুক লবঙ্গলতা নয়, পুতু-পুতু ভাব নেই, একটু ছেলে-ছেলে—এ নিয়ে কিন্তু ওকে হ্যাটা খেতে হয় না, প্যাঁক খেতে হয় না। মেয়েরাও পাত্তা দেয়, ছেলেরাও।

আমি টয়লেট করে বেরিয়ে এসে দেখি তৃপ্তি দাঁড়িয়ে আছে।

তৃপ্তি বলল, তোকে আমার ইন্টারেস্টিং লাগে।

আমি বলি, কেন?

—স্যর যখন 'রাধা-ভাব' জিগ্যেস করল—তুই পুরো রাধার মতোই উত্তর দিলি।

এটা ভাল বলল, না খারাপ বলল—বুঝতে পারলাম না।

—চ' ফুচকা খাই। আমিই খাওয়াব।

এভাবেই আলাপ হয়েছিল তৃপ্তির সঙ্গে। তখন ফার্স্ট ইয়ার।

তৃপ্তি বলেছিল, তোর এই মেয়েলি ভাবটা খারাপ না, ভালই তো। উদয়শংকরের একটা সিনেমা দেখেছিলাম, ওঁরও তো যেন একটু এরকম ছিল। নাচের কোরিওগ্রাফার, ফ্যাশন ডিজাইনার—এঁর কত ট্যালেন্টেড বল, ওঁরাও তো অনেকটা তোর মতন করে কথা বলেন। ইংরেজিতে এফিমিনেট না কী যেন বলে, যে যা বলুক, ও সব গায়ে মাখিস না। আমাকেও তো মাগি-টাগীরা সব 'দজ্জাল', 'মদ্দা' এসব বলে। ওগুলো 'গুণবাচক বিশেষণ' মনে হয় আমার।

তৃপ্তি বলেছিল, ওর বাবাও মাস্টারমশাই। একটা স্কুলের। সংস্কৃত পড়ান। ওর বাবার ইচ্ছে ছিল সংস্কৃত নিয়েই ওকে পড়ানোর। কিন্তু এই কলেজে সংস্কৃত অনার্স নেই, বাড়ির কাছাকাছি এটাই তো কলেজ। বেশি দূরে যাব না। প্র্যাকটিস আছে তো...।

—কীসের প্র্যাকটিস?

—আমি তো দৌড়ই। অ্যাথ্লেট। জুনিয়র-এ মেয়েদের মধ্যে বেঙ্গল সেকেন্ড হয়েছিলাম, জানিস না?

—না, জানি না তো...।

—অনেকেই জানে না। কেউ-কেউ জানে। ন্যাশনালে খেলতে যাব। ওইজন্যই তো বেশি ক্লাস করতে পারি না। ভেবেছিলাম, খেলাটাকেই 'প্রফেশন' করব। কিন্তু বাবা বলল, খেলাধুলো করে ভাত জুটবে না। চাকরি করতে হবে। যদি স্পোর্ট্স কোটা-য় চাকরি জুটে যায় তা হলে তো ভালই, নইলে স্কুলে-টুলে পড়াব। এজন্যই বাংলায় ভর্তি হয়েছি। সব স্কুলেই তো বাংলার টিচার লাগে। চাকরি আমায় করতেই হবে। আমার তো বিয়ে হবে না।

—কেন? বিয়ে হবে না কেন? খেলিস বলে?

—হুঁ। মানে, শুধু খেলি বলে নয়, অন্য কারণ আছে। তোকে পরে বলব।

তৃপ্তিই আমার মেয়ে-বন্ধু। ওর সঙ্গেই কথাবার্তা বলি। গল্পগাছা করি। মনের কথাও।

তৃপ্তি পরিমল বলেই ডাকত। আমি বলেছিলাম—'পরি' বলে ডাকিস হ্যাঁ? ও 'পরি' বলেই ডাকে। একদিন জিগ্যেস করেছিল, তোর লাভার আছে, পরি?

আমি অরূপদার কথা বলেছিলাম।

ও কিচ্ছু মনে করেনি।

জিগ্যেস করেছিল—সব কিছু হয়?

'হ্যাঁ' বলেছিলাম—লজ্জা-লজ্জা সম্মতি।

ও বলেছিল, আমার কেউ নেই। একটু যেন দীর্ঘশ্বাসও ছিল।

একদিন তৃপ্তি বলেছিল, ছুটির পর থাকিস একটু। ছিলাম। ফাঁকা ঘর। ও আমাকে জড়িয়েছিল তিনতলায়।

কলেজ ফাঁকা। ও বলল, পরি প্লাস তৃপ্তি ইকোয়াল টু পরিতৃপ্তি।

ওই মুহূর্তের ওই আলিঙ্গন-টা কী ছিল? কে জানে? ও 'জিন্স' পরা, আমিও প্যান্ট-পরা। পোশাকে দু'জনই পুরুষ। 'গে' কেস? ও এমনিতে মেয়ে, আমি 'মনে-মনে' মেয়ে। তবে কি 'লেস্বিয়ান' কেস? ও যদি মেয়ে, আর আমি লিঙ্গ-চিহ্নে ছেলে। তবে কি এটা 'হেট্রো' কেস? কোন কিছুই তো স্ট্যাম্প মারা যায় না।

তৃপ্তি আমার শরীরের এখানে-ওখানে কিছু খুঁজছিল। ওকে আমার মেয়ে মনে হচ্ছিল না, ছেলেও না। একটা মানুষ। রক্তমাংসের মানুষ শুধু।

আমি জিগ্যেস করেছিলাম, তুই আমাকে মেয়ে ভেবে চুমু খেলি, না কি ছেলে ভেবে?

ও বলল, পরি-ই-ই ভেবে।

তৃপ্তির বুকটা খারাপ ছিল না। আমার চেয়ে অনেক বেশি ভাল। একবার হাত দিয়ে সরিয়ে নিয়েছিলাম।

তৃপ্তি বলেছিল—জানিস পরি, আমি ঠিকঠাক মেয়ে না। মেন্স হয়নি। ডাক্তার দেখিয়েছিল আমার ১৫/১৬ বছর বয়সেই। অনেক পরীক্ষা-টরীক্ষা করা হল। কাউকে বলিস না, আমার না ইউটেরাস নেই। ওভারি-টোভারিও নেই। মেয়েদের আর একটা জিনিস থাকে ওটা আমার আছে। ছোট্ট। ওটার প্যাসেজ-টা নাকি খুব ন্যারো। প্লাস্টিক সার্জন-রা নাকি অপারেশন করে বাড়িয়ে দিতে পারবে। কিন্তু অপারেশন করে তো ইউটেরাস-ওভারি ঢুকিয়ে দিতে পারবে না...।

—তবে কি অপারেশন করাবি?

—কী হবে বাপের টাকার শ্রাদ্ধ করে? যখন কোনও ব্যাটাছেলে জানবে ওসব পেটের ভিতরে নেই, আর এটা অপারেশন করা, কেউ বিয়ে করবে না।

—বিয়েই কেন? বিয়ে ছাড়াও তো হতে পারে। ও কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর বেঞ্চে শুয়ে পড়ে। জিন্‌স-এর জিপারে হাত দিয়ে বলে, তুই একটু ট্রাই করে দেখবি কতখানি ঢোকে?—তোকে বলেই বলছি। কোনও ছেলেকে বলতে পারতাম না, এটা দেখলেই ওরা প্যাক দেবে। তুই তো একটু কম-কম ছেলে, একটু ট্রাই করে দেখবি?

আমিও কিছু বলতে পারলাম না। আদর করে হাত রাখলাম শুধু। সেই হাতে সহানুভূতি ছিল। কিন্তু ও যেটা চেয়েছিল, সেটা পারিনি। উঠলই না। ইচ্ছেই হল না। এক পলকে দেখলাম কষ্টকুঞ্চিত লজ্জাস্থান গোপন আলোয় দংশায়।

তৃপ্তি আমার বন্ধু? না কি বান্ধবী? ও অ্যাথ্‌লেট, আমি একদম না। ও জোরে কথা বলে, আমি আস্তে। আমি ওর গোপন জানি, ও আমার।

সেদিন ও বলল—চ' পঞ্চবটিতে বসি। কলেজের কাছাকাছি একটা জলাশয়ের ধারে কয়েকটা সিমেন্টের বেঞ্চি আছে। একটা বট গাছও। ওই জায়গাটার নাম পঞ্চবটি কীভাবে হল কে জানে? ওখানে বসলাম। ওখানে ছেলেমেয়েরা বসে। পেয়ার। আমরাও পেয়ার, কিন্তু পেয়ার নয়। অথচ পেয়ার—মানে প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া-র 'প্যায়ার'। 'প্যায়ার' তো ভালবাসাই। ওর সঙ্গে আমার ভালবাসারই সম্পর্ক। কিন্তু যৌনতাহীন। ওকে আমি চয়নের কথা একটু-একটু বলেছি। মা-র কথাও বলেছি। মা যে এখন 'অনিকেতবাবু' নামে একজনের সঙ্গে একটু মাখামাখি করে, সেটাও বলেছি। এতে আমার কী? বাবাকে তো তেমন করে পাইনি। অনিকেতবাবু অথবা কাকু-র সঙ্গেও আমার তেমন কিছু আঠা নেই, তবে রবীন্দ্রসদনে আমাকে খুব সেভ করেছিল। সবই বলেছি। অরূপদাকে ভুলতে পারছি না, সেটাও।

তৃপ্তি বলেছিল, ওসব সেন্টু ছাড়। পিরিতি কাঁঠালের আঠা—এটা একটা বাজে কথা। পিরিতি-কে চাঁয়ের ভাঁড় ভাব। খেয়ে ফেলে দে।

আমি বলেছিলাম—তা হলে তুই-আমি?

ও বলেছিল—এখানে কোথায় খাওয়ার সম্পর্ক? আমরা দু'জনে মিলে তো 'পরিতৃপ্তি'।

ও বলেছিল, আজ আর প্র্যাকটিসে গেলাম না। গা-টা একটু ম্যাজম্যাজ করছে। ব্যাগে ডিম আছে, খেয়েনি চ। ওর পিঠে ব্যাগ থাকে। ওখান থেকে কাগজে মোড়ানো দু'টো ডিম সেদ্ধ বার করল। কাগজটা মোড়া। কাগজ থেকে ডিম নিয়ে ছুলছে, দেখি ওই কাগজটায় একটা সংস্কৃত শ্লোক। 'ব্যাক্ষেপং কুরুতস্তনৌ ন সুরতে'...সেই শ্লোকটা না?—যেটা অরূপদা দিয়েছিল...। একটা প্রবন্ধ। বররুচি-র 'উভয়সারিকা' নিয়ে লিখেছেন কৃষ্ণচন্দ্র আচার্য।

—কোথায় পেলি এটা?

তৃপ্তি বলল, বাবার কত ম্যাগাজিন আসে। একটার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে মা বোধহয় ডিম মুড়ে দিয়েছে।

উজ্জয়িনী নগরীতে এক স্ত্রী-ভাবাপন্ন পুরুষের এক প্রেমিক কোনও এক নারীর মোহে পুরুষ-বান্ধবটিকে ত্যাগ করে। অতঃপর সেই পুরুষের কোনও বয়স্য তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলে, স্তনহীন বিধায়, বাধাহীন আলিঙ্গনাদি হইতে পারিত। তোমার ঋতুস্রাব হয় না, ফলে প্রতি নিয়ত সঙ্গমে কোনও বাধা ছিল না। তোমার গর্ভ হয় না। ফলে গর্ভপাত ঘটাইবার প্রশ্ন নাই। সে নির্বোধের মতো তোমায় পরিত্যাগ করিল। সে এই 'পুরুষ-শরীরের মাহাত্ম্য বুঝিল না...।

পরি এই কাগজটা পকেটে রেখে দিল ভাঁজ করে। তৃপ্তি বলল, অরূপ-ফরুপকে ভুলে যা। নে, ডিম খা।

পিঠে হাত দেয় তৃপ্তি। সেই উজ্জয়িনীর সুবান্ধবের হস্ত কয়েক সহস্রবর্ষ পথ অতিক্রম করে পরির পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে এই কংক্রিট বেঞ্চিতে।

দুলালী উপাখ্যান আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে অনিকেত। ওকে ঢোল বাজানো শিখিয়েছে, একটু-আধটু গানও। গান বলতে ওর 'জনগণমন অধিনায়ক' একটু জানা ছিল, আর 'গুরু দয়া করো প্রভু দীন জনে'। ও এখন নতুন কয়েকটা গান শিখেছে। 'সখী আমার রসের গাছে গোটা দুই ডালিম আছে। এ ডালিম জ্যান্ত কাছিম কামড়ে যেন না দেয় পাছে। খানিক এসে বসো পাশে হাত দিও না ডালিম গাছে। কাঁচা ডালিম ছিঁড়লে তুমি মজা পাবে না'... এইসব গান আর কী। আরও অশ্লীল গান সংগ্রহ করা আছে, কিন্তু লেখার সাহস নেই অনিকেতের। ঢোল পুজো নিয়েও কিছুটা লিখেছে। এখন যে-জায়গাটায় আছে, এখানে গুরুমা ওকে প্রায় রোজই 'ছিন্নি' হওয়ার জন্য জপাচ্ছে। 'ছিন্নি' মানে ক্যাসট্রেশন। লিক্‌ম-গোর্খা কেটে দেওয়া। 'গোর্খা' মানে অণ্ডকোষ। 'ছিন্নি' করাকে কয়েক ডিগ্রি মাহাত্ম্য দিয়ে ওরা বলে 'নির্বাণ'।

যে কোনও হিজড়ে খোলের ডিরেক্টর, তথা গুরুমা, চান যেন নতুন আমদানি 'কোতি'-টা খোলে পাকাপাকি ভাবে থেকে যায়। একবার ছিবড়ে দিতে পারলে আর আগের সংসারে ফিরে যেতে পারবে না। যারা একটু লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী, খুব ছোট লিঙ্গ নিয়ে জন্মেছে, ওদের 'ছিন্নি' হতে মনের ভিতর থেকে খুব একটা বাধা আসে না। যেমন হাসি। হাসির 'ছিন্নি' হয়েছিল। অবশ্য খুব ছোটবেলায়। ঝুমকোরও ছোট লিক্‌ম। ওর ক্যারিওটাইপ ৪৬xy পুরুষ। কিন্তু অণ্ডকোষ দেখা যায় না। পেটের ভিতরে আছে। ঝুমকো বলেছে, 'ছিন্নি' হবে। ছবিকেও বলেছে গুরুমা। ও কেবল পরে-পরে করছে। কেন চাইছে না, সেটা ছবির চেয়ে ভাল জানে অনিকেত। কারণ অনিকেত ওকে তৈরি করেছে ৪৬xy উইথ এন্‌লার্জড ক্লিট। এই 'ক্লাইটোরিস' ওকে স্পর্শ-সুখ দেয়। যদিও ওর যোনি-মুখ খুব সরু। সম্মুখ-সঙ্গম হয় না। কেবল পশ্চাৎ, কিন্তু ও ওর মজাদার ইঁদুর ল্যাজটার মায়া ছাড়তে পারে না।

দুলালীকে গুরুমা বলছে—বলি দুলালী, অ দুলালী, কাশী এসে গঙ্গা চ্যান করবিনে? এই সিরিখোলে এলি, ছিবড়ি হয়ে যা, সামনের অঘ্রানের অমাবস্যায় দিন ঠিক করি, কেমন?

দুলালী বলে, এখন থাক না ওটা। অসুবিধে তো করছে না।

নাগেশ্বরী বলে, 'ছল্লা' করতে গিয়ে যখন কাপড় উঠাবি মা, তোর ওই ঘণ্টা দেখতে পেয়ে লোকে কী ভাববে বল? মান থাকবে?

দুলালী জানে, নাগেশ্বরী নিজেই 'ছিবড়ি' হয়নি। ওর কাছে গালফুলো একটা ভেড়ুয়া আসে। ওর নাগিন। পকেট থেকে তেরঙ্গা বার করে। তেরঙ্গা মানে আমাদের জনগণমন

অধিনায়ক নয়, পানপরাগের প্যাকেট। ওর সঙ্গে ধুরপিট্টি করে। তখন গুরুমা নিশ্চয়ই দেয় না, নেয়। কিন্তু গুরুমা নিজে লিক্‌ম রেখে সবাইকে জোর করছে। এটা কি ঠিক?

আসলে অন্যভাবে ভাবতে গেলে, মা-র লিক্‌ম রাখাটা দরকার। এত বড় একটা সংসার চালাচ্ছে। সবার ওপর হুকুম দিচ্ছে। যাই বলো আর তাই বলো, মেয়েছেলের চেয়ে ব্যাটাছেলের তেজ বেশি। দেহটা ব্যাটাছেলের হলেও, মনটাকে তো মেয়েছেলের করা যায়। গুরুমা-র ওসব থাকুক গে যাক, ও নিয়ে আমাদের চিন্তা করার দরকার কী?

তবে দুলালের নিজের লিক্‌মের প্রতি কোনও দরদ নেই। কী হবে ওটা দিয়ে? শুধু কেটে ফেলার সময় ব্যথা লাগবে, এটাই ভয়। তা ছাড়া 'মায়া' বলে একটা কথা আছে তো, এতদিন নিজের সঙ্গে ছিল...।

গুরুমা একদিন সবাইকে ডেকে 'খিলুয়া' টানতে-টানতে বলে দিল, যারা-যারা 'আকুয়া' আছে—সবাইকে টাকায় দশ পয়সা বেশি দিতে হবে। 'ছিন্নি'দের দিতে হবে না।

'ছিন্নি' যারা আছে, দুলালী ওদের কাছে শুনেছে, ওরা খদ্দের ভাল পায়। অনেক খদ্দের আছে, যারা আসল হিজড়ে চায়। লিক্‌মওলা হলে ওদের মন ভরে না।

আবার কিছু 'নুনে নুন' খদ্দের আছে। ওরা লিক্‌ম চটকাতে ভালবাসে, কিন্তু দুলালের ওটা তো মরা-ইঁদুর। থেকেও কী, না থেকেই বা কী। ছিবড়াতে শুধু ব্যথা লাগবে। ওটাই ভয়।

নাগেশ্বরী মা বলেছিল, ভয় কি লো? ওটা কেটে ফ্যাল, নাং-সোহাগি হবি। তোদের তো আর কেউ বলবে না পেটের তলায় যে-ধন আছে ভাঙিয়ে-ভাঙিয়ে খাবি, বরং পেটের তলায় যা নেই সেটাই ভাঙিয়ে খেতে হয়। ছ্যাঁচড়া পাবলিককে ভয় দেখাবি কী দিয়ে? অন্ধকার গুহা দিয়ে। ওই 'কিছু নেই'-কেই ওরা ভয় পায়। পেটের তলায় কিছু নাই মিছা আছে। ওই 'মিছা'টা বাগিয়ে ফ্যাল দুলালী। তুই না মাগি, সোনো-পাউডার মাখিস, বুকে বডিজ বাঁধিস, তোর লজ্জা করে না একটা লিক্‌ম ঝুলিয়ে রাখতে?

—ব্যথাটা...

—ধুর বোকাচুদি, ব্যথা আজকাল আর লাগে নাকি? এখন কি আর আগেকার মতো আছে? ইঞ্জেকশন মেরে দেবে, তুই চোখ বুজে থাকবি, চোখ খুলে দেখবি লংকা-টা নেইকো। ব্যস। তোর মান বেড়ে যাবে। জোরাজোরি নেই বাছা। যারা তারকেশ্বরে সন্ন্যেস নেয়, ওদেরকে কেউ জোর করে? নিজের ইচ্ছেয় নেয়। আমি নিজেই তো 'ছিবড়ি' হইনি। সেই কবে থেকে আমার ডাইবিটিস। ওষুধ খাই, দেখিস তো। আর ওই লংকাটা আছে বলেই না তড়পাই, নইলে পুলিশ-গুন্ডারা তোদের বাট্টু ফাঁক করে দিত। আমি তো তোদের মাথার ওপর আছি, তোদের মুখিয়া। হ্যাঁ কি না?

দুলালী মাথা নাড়ায়।

—করে নে 'ছিন্নি' হয়ে যাবি গিন্নি। ব্যাটাছেলের সব বদ-রক্ত বেরিয়ে যাবে। তারপর মেয়েছেলের রক্ত তৈরি হবে।

চাত্তারা, হাসি, ঝর্না, যারা 'ছিন্নি' হয়েছে, ওদের জিগ্যেস করল দুলাল—'খুব লাগে গো'।

কেউ বলল, আরাম লাগে। বলে, চোখ মেরে হাসল। কেউ বলল, ধুস। কেউ বলল, কষ্ট না-করলে কেষ্ট মেলে?

দুলাল বলে, আমি ছিন্নি হব মা...।

সুতরাং ক্যাসট্রেশন। 'ক্যাসট্রেশন' এই শব্দটা কেমন একটা শিরশির অনুভূতি তৈরি করে অনিকেতের মনে।

জাহাজ চলেছে আটলান্টিকের ওপর দিয়ে। জাহাজ-ভর্তি কালো মানুষ। আফ্রিকার দেশগুলো থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমেরিকায়। জাহাজের খোলের একটা ঘরের ভিতর থেকে তুমুল আর্তনাদ উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে মহাসমুদ্রে। ওই ঘরে ক্যাসট্রেশন-এর কাজ চলছে। খোজা করা হচ্ছে, খোজা।

শুধু ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই আড়াই কোটি আফ্রিকান চালান করা হয়েছিল দাস বানানোর জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচেবর্তে পৌঁছতে পেরেছিল এক-চতুর্থাংশ।

জাহাজের খোলে গাদাগাদি করে ঠাসা মানুষ। সেনেগাল-ঘানা-জাম্বিয়া-অ্যাঙ্গোলা এসব পশ্চিম আফ্রিকার মানুষরা আছে, আবার আরব বণিকরা পূর্ব আফ্রিকা থেকেও সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছে কত মানুষ। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে কী রমরমা। কত পরোটা-মাংসের দোকান, সরাইখানা, মদ, বস্ত্রবিপণি—কাপড়ের দোকান থেকে কাফন-ই বিক্রি হচ্ছে কত। কতজনকে কবর দিতে হয়। সেই সুদান-ইথিওপিয়া-সোমালিয়া থেকে মরুভূমি পার করে এদের নিয়ে আসা হয়েছে। পথে যারা মরেছিল, ওদের তো বালির নীচেই কবর দিয়ে দিয়েছে আরব বণিকরা। বণিকরা নিজেরা তো নয়, ওই কালো মানুষগুলোই বালি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। এত লোক মরে গেলে, মালের দাম বাড়াতে হবে তো। খোজা করে দিলে মালের দাম বাড়ে।

আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের আশেপাশে গজিয়ে উঠল খোজা বানানোর তাঁবু। ছুরির দোকান। ছুরিতে শান দেওয়ার দোকান। জড়িবুটির দোকান। আলেকজান্দ্রিয়ার কী রমরমা। মানুষগুলো তো বিক্রিই হবে, তার আগে ওদের গুণমান বাড়ানো দরকার। খোজাদের দাম বেশি তো। ষাঁড়কে খোজা করে দিলে হালের বলদ হয়। খুব খাটতে পারে। ঘোড়াদের খোজা করে দিলে ছুটতে পারে বেশি। অণ্ড-কাটা গাধারাও মাল বেশি বয়। খোজা মানুষরাও বেশি পরিশ্রম করবে। ওদের ঘর-সংসার করতে ইচ্ছে করবে না। পৌরুষহীন খোজারা হারেমের জন্যও বড় ভাল। তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে অণ্ডকোষ-সমেত জননেন্দ্রিয় কেটে ফ্যালো তবে।

তাই করতে গিয়ে মরে যেত কত। মরে গেলে একটু কাফন তো দরকার। জানাজা? ধুর? ওরা তো কাফের। তবে কবর কেন? নইলে গন্ধ হবে না? মানুষ-পচা গন্ধের ভিতরে কি পরোটা-কাবাব-সালাদ খাওয়া যায়?

পশ্চিম আফ্রিকার আক্রা, আমুস এসব বন্দর থেকেও জাহাজ যেত সমুদ্র পেরিয়ে। ষোড়শো শতাব্দী পর্যন্ত বহু কালো মানুষ ভরে নিয়ে গিয়েছে জাহাজ। সেইসব জাহাজের খোলে লেগে থাকা রক্ত ধুয়ে নিত আমেরিকান বন্দর-শ্রমিকরা। জাহাজের খোলের কোনও অংশে চলত একের-পর-এক ক্যাসট্রেশন। দশজনের মধ্যে ছ'জনই মরে যেত। সমুদ্রে জাহাজের পিছনে-পিছনে ঘুরত মাংসখেকো হাঙর। সাহেবরা বলত, সি-হায়েনা। খোজা করতে গিয়ে মেরে ফেলা মানুষগুলোকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হত সমুদ্রনীলে। হাঙররা ধেয়ে আসত।

দুলাল। মানে দুলালী। দুলালীও রাজি হয়েছে। ওকে জোর করে খোজা করা হচ্ছে না। ওর ভিতরে, চৈতন্যের নিঃস্তব্ধতার ভিতরে, বিপন্ন বিস্ময়ের মতো লুকিয়ে থাকা নারীসত্তাকে উস্কে দিয়ে ওকে রাজি করানো হয়েছে।

আর পরিমল? মানে পরি? পরি একদিন ফোন করেছিল অনিকেতকে। বলেছিল, খুব দরকার আছে কাকু, কথা বলতে চাই। অনিকেত বলেছিল, কী বলবে বলো।

ও বলেছিল, সামনাসামনি বলব। কবে আসবেন?

—কী ব্যাপার রে? অনিকেতের সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

—একদম পার্সোনাল। আপনি রবীন্দ্রসদনে আমাকে অনেক হেল্প করেছিলেন। সেদিন বলেছিলেন, কোনও দরকার লাগলে বোলো। মনে আছে?

—আছে। কী দরকার বলে ফ্যালো...

—ফোনে হবে না কাকু। সামনাসামনি...

অনিকেত বলেছিল, কবে সামনাসামনি হতে পারব তার কোনও ঠিক নেই। কী বলবে বলে ফ্যালো। সামান্য বিরক্তিও মিশিয়েছিল।

পরি কিন্তু শান্ত গলায় প্রায় প্রার্থনার মতোই বলেছিল—আমি আর এরকম থাকতে পারছি না, আমাকে ভাল করে দিন।

কথাটা শুনে মনে হয়েছিল এসব কথা ফোনে হয় না। একবার বলেছিল, তোমার এই মনোভাব তোমার মা জানে?

ও বলেছিল, মা-কে বলে লাভ নেই।

অনিকেত বলেছিল, মানে? মা তো তোমাকে সেই কবে থেকে তোমার ওইসব ওরিয়েন্টশন পরিবর্তন করিয়ে তোমাকে ভাল করতে চাইছে। মা-কে বলো...।

—সেইরকম ভাল নয়—আপনি যেরকম ভাবছেন—পরি বলল।

—হেঁয়ালি করছ কেন? কীরকম ভাল হতে চাও তুমি?

—সামনাসামনি বলব। একদিন প্লিজ সময় দিন, কাকু।

একটা রবিবার বসেছিল সামনাসামনি। একটা ছোট কেবিনে। যেখানে এখনও মাংসের ঘুগনি পাওয়া যায় এবং দেওয়ালে মেনু চার্টের তলায় লেখা থাকে 'আজ নগদ কাল ধার, ধারের পায়ে নমস্কার।'

পরি বলেছিল, কাকু আমি আর কোনও ঝামেলার মধ্যে থাকতে চাই না। আমার সম্পর্কে আপনি সবই জানেন—না, সব নয়, অনেকটাই। আমার গায়ে 'গে'-স্ট্যাম্প লেগে থাকুক—এটা ভাল্লাগে না। আমি 'গে' না কাকু, আমি মেয়ে। বাইরের খোলসটা ছেলের। রাস্তায় যে-বহুরূপী ঘোরে, কালী সাজে, ও কি কালী? কালীর খোলসের ভিতরে নিমাই কিংবা পাঁচু বা অন্য কেউ। আমি সত্যি-সত্যি মেয়ে...

চুপ করে পরি।

অনিকেত শুনতে পায়; যেন ও বলছে—আমার এখন বিয়ের বয়েস হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ না—ও বলছে—সহে না যাতনা। কবেকার পাড়া-গাঁ'র চাল-ধোয়া হাতের নখে চকলেট রং নেলপালিশ—পরির হাত টেবিলে। টেবিলের কাঠের ওপর সাদা রঙের পাথর। পরি কথা বলছে না, অনিকেত শুনতে পাচ্ছে, 'যখন উঠে যৌবন জ্বালা জড়িয়ে ধরি কলসির গলা পিতলের কলসি তো কথা বলে না। সে তো কথা শুনে না। কথা বলে না।'

কথা বলল, পরি। কাকু, আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, আমি ওসব এল্‌জিবিটি-টেল্‌জিবিটি বুঝি

না। আমি পুরো মেয়ে। নিজেকে তাই মনে হয়।

ও জোরে-জোরে শ্বাস নিচ্ছিল, আর বুকটা ফুলে-ফুলে উঠছিল। ও জিন্‌স আর গেঞ্জি পরে আছে। ছোট হাতার।

—তো?

অনিকেত কপাল কুঁচকে শব্দটা এমন করে ছুড়ে দিল যেন বিয়ারের বোতলের ছিপিটা খোলা হল হঠাৎ। 'তো' শব্দটার পর বিরক্তির অদৃশ্য ফেনা বেরুচ্ছে।

—তো, আমি আমার খোলসটা ফেলে দিতে চাই। আপনি হেল্প করুন।

—শোনো পরিমল, তুমি এসব উল্টোপাল্টা ভেবো না। পড়াশোনা নেই? পরীক্ষা কবে?

—পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে কাকু। পরীক্ষা ভাল হয়েছে। এমএ পড়ব না। মাস্টারি করতে গেলে অপদস্থ হব। যদি মেয়ের শরীর পেতাম, তা হলে দিদিমণি হয়ে যেতাম। সেটা অনেকদিনের ব্যাপার। যদি হতে পারিও, আমার শরীরের ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান ঘুরবে সবার মুখে-মুখে। কেরানিগিরি করলে আরও প্যাঁক খাব কাকু। আমি ফ্যাশন ডিজাইনার হব। অনেক ফ্যাশন ডিজাইনার আছেন, যাঁরা সো-কল্‌ড গে। মিনার্ভা মুর কত ফেমাস। আগে তো ছেলের শরীর ছিল। লালি সিং, ছেলে ছিল। আমিও তাই হব কাকু...

পরি খোলস পাল্টাবে। তার মানে, কেটে ফেলে দিতে হবে ওর পুরুষচিহ্ন। ক্যাসট্রেশন। পরিকে কেউ জোর করছে না। ওর চৈতন্য-গভীরে পুষে রাখা নারীসত্তার মায়া-পুঁটুলিটাকে বাইরে থেকে খোঁচাচ্ছে না কেউ। ও নিজেই নিজের অভিলাষকে 'তা' দিয়ে যাচ্ছে—রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছের মতন।

'আমাদের জানালায় অনেক মানুষ চেয়ে আছে দিন মান হেঁয়ালির দিকে।'

সেই কবে, কোন আদি-অতীতেও, পুরুষ নারী হতে চেয়েছে বারবার। নারীকেই ভেবেছে সৃষ্টির প্রতীক। নারীই তো জন্ম দেয়। সৃষ্টি বেঁচে থাকে। আফ্রিকার কোনও-কোনও উপজাতি এখনও বিশেষ উৎসব উপলক্ষে নারী সেজে নাচে, লিঙ্গস্থানে লাল কাপড় বাঁধে। যেন ঋতু। শিব তো নিজেকে শক্তির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে অর্ধনারীশ্বর হয়েছিলেন। প্রাচীন মিশরের সূর্যদেবতা নিজের লিঙ্গদণ্ড কেটে ফেলেছিলেন একবার। কর্তিত লিঙ্গরক্ত থেকে জন্ম নিয়েছিল নতুন মানুষরা, একটা নতুন জাতি।

কোনও-কোনও পুরুষের মনে নারী হওয়ার আদিম ইচ্ছের চোরকাঁটা বিঁধে আছে এখনও।

দুলালের 'ছিন্নি' হওয়ার দিন এসে গিয়েছে। ঘোড়ুই ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার, যদিও পাস করা নয়। অর্শ-ভগন্দর অপারেশন করে। পেট-খসানোর কাজও করে। আগে সাইকেল ছিল। এখন মোটর সাইকেল কিনেছে ঘোড়ুই ডাক্তার।

আগের দিন নিরামিষ খেতে হয়েছে দুলালীকে। যে-ঘরে ছিল, সেই ঘরে ধূপ জ্বলেছে। চাত্তারা ওর সঙ্গে শুয়েছিল। বলেছে, এটা আমাদের পৈতে। বামুনদের পৈতে হয় না? বামুন ঘরের ছোঁড়াদের যদ্দিন পৈতে না-হচ্ছে, তদ্দিন আসলি বামুন হচ্ছে না। তুই এবার আসল হিজড়ে হয়ে যাবি। দুলালী কেন যেন ওর ধোন চেপে ধরে। বহুদিনের আপদ, কিন্তু বহুদিনের সঙ্গী। ওর একটা গান মনে পড়ে—তুই ছাইড়্যা চইল্যা গেলে সোহাগ করমু কারে। এই না

মুখে কইছি কথা খাইছি ক্ষীর ননী। এই না মুখে ঠাইস্যা দিব আগুন, জানি, জানিরে। জীবন জীবন রে...।

হুশ ... দুর যা... কাক তাড়ানোর মতো চিন্তাগুলো তাড়ায়। গানও তাড়ায় দুলালী।

পাশের ঘরগুলো থেকে হুল্লোড়ের শব্দ আসে। ওরা 'খিলুয়া' খেয়েছে। চাত্তারা-ও। ওর মুখেও মদের গন্ধ।

দুলালী আবার বলে—খুব ব্যথা লাগে?

চাত্তারা বলল—সেই এক ভ্যানর-ভ্যানর। বলছি তো ইঞ্জেকশন মেরে দেবে। পেটের টিউমার বের করার সময় যে-অপরেশন হয়, তখন কি ব্যথা বোঝা যায়? অথচ পেট তো চিরে দেয়। এটা তো কিছুই না।

পুরনো দিনের হিজড়েরা যদি থাকত তো বলত—সে এক টাইম গিয়েছে আমাদের কালে। আগের দিন রাতে খুব করে মশলা খাইয়ে দেওয়া হত। যদি বলো, সেই মশলায় কী থাকে? বলেই দিচ্ছি গাঁজার দানা বাটা, সিদ্ধিপাতা বাটা আর আফিম। তারপরে ভাল করে বাল কামানো। সকালে পুজো। বহুচেরা মা আর প্রভু হরি। পুজোর পেসাদ মুখে দেওয়ার জন্য হাঁ করাতে হয়। সহজে হাঁ করে না। ঝিমোয় কিনা, তারপর আর একটু আফিম-গোলা জল। পেটে 'চাপ' দিয়ে মুতিয়ে নিতে হত। তারপর শুইয়ে দিয়ে হাত দু'টো বেঁধে দিতাম। দু'জন দু'পা চেপে ধরত। পোঁদের তলায় একটা পিঁড়ে সেঁধিয়ে দিতুম। গোর্খার গোড়ায় শক্তসুতলির দড়ি দিয়ে ভালো করে পেঁচিয়ে বেঁধে দেয়া হ'ত, ধাইমা নিজেই অস্তর নে আসত। দু'বার খ্যাঁচাৎ হত। বাঁ হাতে লিকমের মাথাটা টেনে ধরে ডান হাতের ছুরিটা দিয়ে খ্যাঁচাৎ। মশলা-খাওয়াটা চিল্লিয়ে উঠলে মুখে হাত চাপা দিতুম কেউ, নইলে কাপড় গুঁজে দিতুম মুখে। বাইরে খুব ঢোল বাজত—'বুড়ুম ডা বুড়ুম ডা। ব্যাটাছেল্যার বদরক্ত বুরুম বুরুম বেরয় যা।' বুরবুর করে রক্ত বেরত। তারপরই বাঁ হাতে থলেটা ধরে ডানহাতে খ্যাঁচাৎ। থলের ভিতর থেকে সাদা-সাদা দু'টো গুটি রক্তমাখা। মাটির হাঁড়িতে ভরে ফেলতুম। এবার গরম জল। ফরফর করে রক্ত বেরুতে কিনা, চোখে সহ্য হ'তনা, গরম জলের ধারা দিলে রক্ত পাতলা লাগতো। ওসব হাঁড়িতে জমতো। তারপর গ্যাঁদাপাতা থুপে লাগিয়ে দাও, নইলে দুব্বো। রক্ত কিছুটা বন্ধ হয়ে গেলে ঘুঁটে-পোড়া ছাই। ছাই দিলে রক্ত বন্ধ হবেই। ছাইয়ে রক্তে মিশে গিয়ে জায়গাটা ঘুঁটের মতো শক্ত হয়ে যেত। নিমের ডাল দিয়ে একটা ফুটো করে দিতুম, নইলে শুধরানি হবে কী করে? মোতার ব্যবস্থা রাখতে হবে নে? মুখে দুধ খাইয়ে দিতুম, মাড়। দুধের মধ্যে অল্প-অল্প সিদ্ধি-বাটা চিনি দিয়ে। দশ দিনের মাথায় গরম জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে আস্তে-আস্তে ওই ঘুঁটের মতো পলেস্তারাটা নরম করে খসিয়ে নিতে হত। তারপর পুরনো ঘি মালিশ করে দিতুম দু'হপ্তা ধরে। তারপর আস্তে-আস্তে ঘা শুকোত, নতুন চামড়া তৈরি হত। কোথাও-কোথাও শুনিচি গরম তেল ঢেলে দিত। যদি বলো ক্যানো? গরম তেলে ফোস্কা পড়ে পুরনো চামড়া উঠে গিয়ে নতুন চামড়া গজাত, তা-ই। এতো তাও ভালো। আরও আগে তো যায়গাটাকে পচিয়ে দিত গো। তেঁতুল-বেগুন-চিংড়িমাছের ঝোল বানিয়ে খাইয়ে দিত। এসব খেলে ঘা বাড়ে, যায়গাটা সেপিটিকি হয়। তবে না ভিতরটা ফাঁক হবে। যখন জায়গাটা পচত, কী কষ্ট না হ'ত। কোনও-কোনও কমজোরি কল্‌জের কোতি এসব সহ্য করতে পারে না। মরে যায়। সে তো জম্মো নিলে মরতেই হবে। কলেরায় মরাও যা, কুষ্ঠে মরাও তা, ছিবড়োতে গিয়ে মরাও তা। আগের

দিনে দেড় মাসের মাথায় ধুম করে অভিষেক হত। একুনো হয় কোনও-কোনও খোলে। সেদিন ঘিয়ে ভাজা সেরা বানাতে হত। গজার মতন। সেদিন নতুন নাম হত। আজ-কাল তো দীক্ষের দিনেই নাম হয়ে যায়। সবাই 'ছিন্নি'-ও হয় না। গুরুমা-রাও কিছু বলে না। ট্যাংট্যাঙে ধোন নিয়ে কত মিনসেই তো শাড়ি পরে ঠোঁটে লিপিস্টিক মেরে হিজড়ে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গো। পাঁচু, পটলা, মদনা—সবাই হিজড়ে হয়ে যাচ্ছে। লুঙ্গি-পাজামা, প্যান্টালুন পরে গা-জোয়ারি মস্তানি না-করে, হিজড়ে হয়ে মস্তানি করছে। সে হিজড়ে আর নেই কো। ঠিকমতো নিয়ম পালন করলে শরীলে ভগমানের দৃষ্টি পড়ত, বাচ্চার গায়ে হাত বুলোলে বাচ্চারা ভাল হয়ে যেত। আর রাগ করে কাউকে শাপান্ত করলেও ফলে যেত সেটা। আগকার দিনে গেরস্ত বাড়িতে বাচ্চা হলে হিজড়ে ডেকে নিত। মিষ্টি দিত। নতুন শাড়ি দিত। এখনকার দিন দূর-দূর করে। এখন সবেতেই ভেজাল। এখনকার দিনে সেই হিজড়ে আর নেইকো...।

এটা তো এখনকার দিন। সকালবেলা দুলালকে মায়ের পেসাদ খাওয়ানো হয়েছে। বহুচেরা-র ছবি-ছোঁয়া ফুল লাগানো হয়েছে মাথায়। লিঙ্গস্থানে ফুল নয়, লিঙ্গস্থানে ফুল ছোঁয়ানো যায়? ওখানে দুব্বো। কামানো হয়েছে। ডেটল দিয়ে মোছাও হয়েছে। ঘরে ধূপকাঠি জ্বলছে। ঘোড়ুই ডাক্তার এসে গিয়েছে। ডাক্তারের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। ডাক্তারের চুলে ও গোঁফে কলপ। চুলের কলপ উঠে গিয়ে কিছুটা বাদামি। গোঁফ কুচকুচে কালো। দুলালীকে বলল, কোনও ভয় নেই। ঘরে একটা ছোট জানালা ছিল। ওটা একটু ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার ওদিকে একবার তাকাতেই একজন কেউ বন্ধ করে কাঠের ছিটকিনি এঁটে দিল। একটা নতুন ম্যাক্সি পরেছিল দুলালী। ওর হাতটা উঠিয়ে একটা ক্যাম্পোজ ইঞ্জেকশন দিয়ে দিল। এখন 'মশলা' তৈরি করা যায় না। আফিম জোগাড় করা খুব মুশকিল। কেউ-কেউ 'পাতা'-র ধোঁয়া নিয়ে নেয়। 'পাতা' মানে হেরোইন। পাতলা স্টিলের বাটিতে গুঁড়ো রেখে তলায় মোমবাতি ধরলে গুঁড়ো থেকে ধোঁয়া তৈরি হয়। সেই ধোঁয়া টেনে নিতে হয় নাক-মুখ দিয়ে। দুলাল 'পাতা'-র নেশা করেনি কখনও। এই খোলে কেউ করে না। গুরুমা-র আদেশ আছে—'পাতা' নিবি না কেউ। 'পাতা' হল জাঁতা। শরীর পিষে দেয়।

ইঞ্জেকশনটা দেওয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা। ঘোড়ুই ডাক্তার ছবি, ঝুমকো, ফুলিদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করতে লাগল।

ডাক্তার বলল, বুঝলে, একটা কুত্তা একটা বিল্লিকে বলছে তোমরা যখন লাগাও, কেন মানুষের আড়ালে গিয়ে লাগাও? আমরা কুত্তারা তো মানুষের সামনেই লাগাই। বিল্লি তখন কী বলল বলো তো?

একজন বলল, বিল্লি কুত্তাকে বলল আমরা কত খোমর-টোমর করি, টাইম লাগে। তাই ফাঁকায় যাই। অন্যজন বলল, মানুষ শালা বড় হারামি। ওরা শান্তি দেয় না। তাই মানুষের সামনে করি না।

ঘোড়ুই বলল—হল না। বিল্লি বলল, তোমাদের কায়দাটা মানুষ শিখে নিয়েছে। আমরা আমাদের কায়দা মানুষকে শেখাতে চাই না।

সবাই হেসে উঠল। ঠিকরি দিল। দুলালী হাসল না।

আর এক কাপ চা খেল ঘোড়ুই।

বলল, বাতাও তো ফুটবল ক্যায়া হ্যায়? লেড়কা না কি লেড়কি?

একজন বলল, লেড়কা-ই হবে। বড্ড লাফায় কিনা।

আর একজন বলল, লেড়কি। কত ব্যাটাছেলের বুকের হাওয়া ভিতরে এঁটে রেখেছে।

ঘোড়ুই বলল, আরে, জিসকি পিছে এগ্যারা লেড়কা আন্ডারপ্যান্ট পিহিন্দকে দৌড়তা হ্যায়, ও সায়েদ লেড়কিই হোগি।

আবার ঠিকরি। ঢোল-ও।

এবার কাজ শুরু।

তক্তাপোষে এমন করে শোয়ানো হল যেন পা দু'টো ভাঁজ হয়ে নীচে ঝোলে। দুলালীর ম্যাক্সিটা খুলে দেওয়া হল। নাভির তলা থেকে সবটাই পরিষ্কার করে কামানো। দুলালী একবার চোখ খুলে চোখ বুজে ফেলল। ওর পাছার তলায় একটা নীল পলিথিনের চাদর রাখা হয়েছে।

ডাক্তার বলল, লিঙ্গকেনি আনা হয়েছে? হ্যাঁ। এই তো।

একটা ছোট্ট ইঞ্জেকশনের ভাইল দিল চান্তারা। ওটা একটা অ্যানাসথেসিয়া। 'লিগ্‌নোকেন'। ঘোড়ুই আসল নামটা নিশ্চয়ই জানেন। তবু এই নামেই ডাকেন হয়তো।

নতুন সিরিঞ্জটা কপালে ছোঁয়ালেন ডাক্তার। চোখ বুজলেন।

ঢোল বাজা শুরু হল।

ডাক্তার হাত দিয়ে নিষেধ করলেন।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে কিছু বিড়বিড় করলেন।

তারপর নেতিয়ে থাকা বেচারা লিঙ্গটির গোড়ায় দু'জায়গায়, এবং অণ্ডকোষের চামড়ায় পুশ করলেন। তারপর ম্যাক্সিটা দিয়ে ঢেকে দিলেন। কোমরে আর একটা ইঞ্জেকশন দিলেন। বোধহয় অ্যান্টিবায়োটিক। হাতে না-দিয়ে কোমরেই দিলেন, ওর ধারণা কাছাকাছি বলে কাজ করবে ভাল।

ক্ষুর ধরনের ছুরি ছিল দু'টো। একটা সাঁড়াশির মতো কিছু। গরম জলে ফোটাতে বলা হয়েছিল। পাত্রসমেত ওগুলো এল। ধোঁয়া বেরচ্ছে। ওই জলে ডেটল ফেলে দিলেন।

ডাক্তার বলল, নাও। এবার ঢোল বাজাও। ঢোল বাজতে শুরু করল। সঙ্গে গানও।

আরে দুলালীরে তুমকো খিলাইগা
তুমকো খিলাইগা রে
তুমকো পিলাই গা।
আরে দুলালীরে খিলুয়া পিলাইগা।
ম্যায়নে বুলাইগা
তুমকো বুলাইগা
ম্যায়নে মালাই খিলাইগা
মালাই খিলাইগা
তুমকো বুলাই করকে ম্যায়নে পারি পিলাইগা
তুমকো বুলাইগা
তুমকো বুলাই করকে ম্যায়নে লাড্ডু খিলাইগা
লাড্ডু খিলাই করকে ম্যায়নে সাবুন মাখাইগা

তুমকো বুলাইগা
সাবুন মাখাই করকে মায়নে পাউডার মালাইগা।
তুমকো বুলাইগা।
তুমকো বুলাই করকে ম্যায়নি সিনেমা যাউঙ্গা
তুমকো বুলাই গা...

ডাক্তার হাত দেখাল। এখন গান নয়। দু'জনকে বলল, দুলালীর দু'হাত চেপে ধরতে। দু'জন দুই থাই চেপে ধরল। ঠোঁটের ওপর লিউকোপ্লাস্ট আটকে দিলেন ডাক্তার। ডাক্তার ছুরিটাকে কপালে ঠেকালেন। নাগেশ্বরী কপালে ঠেকাল হাত। বলল, জয় মা।

দুলালী চোখ বুজে স্থির। উটের গ্রীবার মতোই নিঃস্তব্ধতা ওর শরীর জুড়ে।

ঘোড়ই ডাক্তার কালো শক্ত সুতো দিয়ে অন্তকোষটি বেঁধে ফেলেন। শক্ত গেট দেন। বাঁ হাতে দুলালীর রোগা শালিখের ঠ্যাং-এর মত শিকলিকে লিঙ্গটির শিরোদেশ দু আঙুলে টেনে ধরেন যতটা সম্ভব। ডান হাতে ছুরি। কপালে ছোঁয়ান।

এবার লিঙ্গর গোড়ায় বসিয়ে টেনে দেন। ক্যাম্পোজ এবং লিগনোকেন অ্যানাসথেসিয়া সত্ত্বেও লিউকোপ্লাস্ট ভেদ করে কেমন যেন আওয়াজ বের হয় দুলালীর মুখ থেকে। গল গল রক্ত ঝরে। গুরুমা একটা নতুন মালসা তলায় ধরে। মালসায় পড়তে থাকা রক্তস্রোতে উলুধ্বনি মেলে। উলু দিচ্ছে এয়ো-হিজড়েরা। মালসায় পড়ে থাকে কর্তিত অঙ্গ। দুলালের হাঁটুকাঁপে থিরথির। ফ্যানের বাতাস শনশন। কবন্ধ ঘোড়ুই ঠেসে ধরেন গজ। ঢোল বেজে ওঠে ধিমিক ধিমিক। তারপর ঘোড়ুই ডাক্তারের বাঁ হাতের মুঠোয় অণ্ডকোষ। দু'পাশে দু'জনের হাতে কালো সুতো। টেনে ধরেছে ওরা। ঘোড়ুই ডাক্তার টেনে ধরে অণ্ডকোষ। ছুরিটা ধরেন শক্ত করে। প্রথম ইস্তারসানে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। দুবার। না কি আড়াই পোঁচ দিতে হয় এখানেও, জবাই করার নিয়মেই। এবার মালসায় পড়ে অণ্ডস্থলী। বিচ্ছিন্ন শিশ্নটি তখনও সামান্য কাঁপছে। চামড়ার আবরণের ভিতরের ফ্যাকাসে সাদা বীজক্ষেত্র উঁকি দিচ্ছে। এখন সেটা রক্তময়। ঘোড়ুই এবার আয়োডিন মাখানো গজ ঠেসে ধরেন। চেপে রাখেন। শাঁখ বাজে তিনবার। গুরুমা বলে নিব্বান-নিব্বান-নিব্বান।

নির্বাণ হ'ল দুলালীর।

নাগেশ্বরী বলে—মদ্দা রক্ত চলে গেল
আল্লা বলো হরি বলো
আম্মা বলো কালী বলো
বহুচেরা মা বলো
এবার মেয়েমাইনষের রক্ত হবে
মেয়ে ভাল নাচবে গাবে

ঢোল বেজে ওঠে ডুডুম ডুম ডুডুম ডুডুম ডুম। ডাক্তারবাবু লাল সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেন। বলেন, বিকেলে আর একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে যাব।

গজ চুঁয়ে রক্ত পড়ে নীল পলিথিনে রাখা মালসায়। পরদিন সকালে মালসাটা ফুল দিয়ে সাজিয়ে মাথায় নিয়ে ওরা যাবে দু'মাইল দূরের দামোদরের ক্যানালে। ওখানে জলসেচের খালে

ভাসিয়ে দেওয়া হবে মালসাটা। কলমির গন্ধভরা জলে ভেসে-ভেসে চলে যাবে কোনও সবুজ করুণ ডাঙায়।

হয়তো-বা কাক খাবে। চিল বা শকুন। ওই শিশ্ন খাবে। খাবে জন্মবীজ।

উঃ! আর পারছে না অনিকেত। কলম থামায়।

চোখ বুজে থাকে। কোত্থেকে একটা হাবসি খোজা চলে আসে। পাখার বাতাস দেয় অনিকেতের গায়ে। আলখাল্লা গায়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইরানের লুরকি সুফি-সাধক। যিনি, লিঙ্গকর্তন করে 'ফানাফিল্লাহ' আর 'বাকাবিল্লাহ' বুঝতে চেয়েছেন। নিজেকে নারী না-ভাবলে যে পরম পুরুষকে সর্বস্ব দেওয়া যায় না। ঈশ্বরে সর্বসমর্পণ মানে 'বাকাবিল্লাহ'-অবস্থা। রাশিয়ান স্কপ্ট্সি-রাও আসে। ওরাও ফ্রক পরা। ওদের পুরুষরা লিঙ্গকর্তন করে, মেয়েরা স্তন। এরা অষ্টাদশ শতাব্দীর।

স্কপ্ট্সিরা বলে, আমাদের আদি পূর্বপুরুষ ঈশ্বরের আদেশ না-মেনে নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিল। সেই নিষিদ্ধ ফল এখন মানবদেহে স্তন ও অণ্ডকোষে পরিণত হয়েছে। আমরা এটা রাখি না। আমরা এসব ফেলে দিয়ে আদি-পাপ থেকে মুক্ত হব। আমরা ম্যাথু-কে মানি। ম্যাথু-র ১৯ : ১২ : 'কতক নপুংসক এমত রহিয়া আছেন যাঁহারা মাতৃগর্ভে এমত জন্মিয়াছে। কতক নপুংসক এমত রহিয়া আছেন যাঁহারা অন্য মানবদ্বারা বলক্রমে নপুংসক হইয়াছেন এবং আরও কিছু লিঙ্গকর্ত্তনকারী নপুংসক রহিয়া আছেন যাঁহারা স্বেচ্ছায় এই পবিত্র কর্ম করিয়াছেন যাহাতে পূর্বপাপ খণ্ডন হয় এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব বর্তাইয়া থাকে।' স্কপ্ট্সি-রা এখন নেই। ওরা ভেবেছিল, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লিঙ্গ যদি কাটা যায়—তবেই ঈশ্বরের রাজত্ব নেমে আসবে। সোভিয়েত রাশিয়া হওয়ার পর ওই 'স্কপ্ট্সি'-মত শেষ হয়।

কিন্তু এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার শিশ্ন কি হয়নি এতদিনে?

এক মহান পুরুষকে দ্যাখে অনিকেত। যাঁর গলায় ঝুলছে বুলেটের মালার মতো শিশ্ন-রাশি। চিনের মিং রাজত্বের একজন সৈনিকও চলে আসেন। যুদ্ধের পোশাক। বিষণ্ণ মুখ। সৈন্যদলে ভর্তি হলে, ওদের শিশ্ন কেটে ফেলা হত। যুদ্ধের আগে নগ্ন নারীর শরীর দেখিয়ে উত্তেজিত করা হত। কিন্তু ওরা শিশ্নহীন। ওদের ভাবানো হত—তোমাদের জীবনের কী দাম আছে? তোমরা শিশ্নহীন। কিছুই পারো না। যুদ্ধটাই পারো। ওরা যুদ্ধে বেপরোয়া হয়ে যেত।

আবার কতগুলো ফ্রক-পরা ছেলেকেও দেখল। সরু গলায় বলল, বুয়ন গিয়োর্নো। কমেস্তাই?

ওরা ষোড়শ শতাব্দীর ইতালির। চার্চে মেয়েদের গান গাইতে দেওয়া হত না। অথচ কয়্যার-গানে উঁচু গলায় সুর দরকার হত। ছেলেদের গলায় ওই আওয়াজ আসে না। তাই বাচ্চা ছেলেদের ক্যাসট্রেশন করা হত। বাচ্চা বয়সে ওসব কেটে ফেললে গলার স্বর ছোটদের মতোই থেকে যায়। ঈশ্বর আরাধনার কয়্যার-গান গাইত মেয়ে-গলায়। ওদের বলা হত কাসত্রাতো।

কাসাত্রাতো-দের কয়্যারের সঙ্গে হিজড়ে-ঢোল মিশে যায়। দ্যাখে, দুলালী হাসছে। কত কারণে কত পুরুষ ওদের পুরুষাঙ্গ কাটে। দুলাল কাটে দুলালীর নিজস্ব কারণে।

অনিকেতের কেমন ঘোর লাগে। ওই যত নষ্টের গোড়া একটা y ক্রোমোজম। যেটা ছেলেদেরই আছে। একটা মেয়ের শরীরে y থাকে না। y-থাকা ছেলে যদি ভিতরে-ভিতরে

মেয়ে হয়, তখন y-টাই শত্রু। y যেন একটা হাড়িকাঠ। ওই হাড়িকাঠের মাঝখানে লিক্‌ম গলিয়ে দিচ্ছে কতজন... কত কারণে

—কী খবর দুলালী? কেমন আছ?

দুলালী কাপড় ওঠায়। অনিকেত দেখে একটা কালচে, কর্কশ এবড়োখেবড়ো মাংসপিণ্ড। প্রাচীন নগরীর বিবর্ণ বিদ্ধস্ত ধ্বংসাবশেষের মতো সেই কবেকার ট্রয়, শ্রাবস্তী, বিদিশা...

এর আগে কখনও কোনও অপারেশন হয়নি দুলালীর। কী ভয়টাই না পেত। ছোটবেলায় খুব গলা ফুলত, খেতে পারত না। হাসপাতালে নিয়ে যেত মা। একবার ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, অপারেশন করিয়ে দিলেই তো হয়। ভয়ে আর হাসপাতালেই যায়নি ও। অথচ এটায় রাজি হয়ে গেল। কোথা থেকে পেল এই সাহস?

পরের দিন ওকে কিছু খেতে দিল না। জলতেষ্টায় মাথাটা ঝিমঝিম করলে, চামচ করে চিনির জল মুখে দেওয়া হচ্ছিল। জল খাওয়ানো যাবে না, কারণ পেচ্ছাপ পেলে বিপদ। পেচ্ছাপ করে দিলে শুকোতে দেরি হবে।

একটা জায়গা কাটা হয়েছে, কিন্তু সেলাই তো হয়নি। সেলাই করে দিলে জায়গাটা তো বুজে যাবে একদম। রহস্য গুঁজে দেওয়া একটা অন্ধকার গুহা তো রাখা দরকার।

'প্রস্রাব'-কে এরা বলে 'শুধরানি'। একটা 'শুধরানি'-শিঙে রাখা আছে এই বিশেষ কাজে। এটা হল একটা মোষের শিং। শিংগুলো ফাঁপা হয়। গোড়ার দিকটা মোটা, আগার দিকটা সরু। এর নাম 'ফয়রা'। হয়তো 'ফোয়ারা' থেকে শব্দটার এসেছে। খুব হিসি-কাতর হলে মূত্রছিদ্রের সামনে 'ফয়রা'-র মাথাটা চেপে ধরে রাখা হয়, এবং মোষের শিং-এর শেষ প্রান্ত দিয়ে মূত্র বেরিয়ে যায়। প্রথম কয়েকদিন বসে, সাধারণ নিয়মে মূত্রত্যাগ সম্ভব হয় না, তাই এই ফয়রা-র ব্যবহার। বয়স্ক 'ছিন্নি'-হিজড়েরা অনেক সময় হাঁটু মুড়ে বসতে পারে না। হাঁটুতে অস্টিওপোরেসিস হতেই পারে। তাই দাঁড়িয়ে হিসি করার জন্য, ওই 'ফয়রা'-যন্ত্রের ব্যবহার।

দুলালীকে বলা হল—'শুধরানি' পেলে বলিস। ব্যান্ডেজের মধ্যে মুতে দিস না আবার। ওটা খুলে 'ফয়রা' লাগিয়ে দেব।

দু'দিনের মাথায় ও আর চাপতে পারল না। ব্যান্ডেজ খোলার সময় ভীষণ যন্ত্রণা। গরম জল দিয়ে ব্যান্ডেজ খুলতে হল। জমাট রক্তের সঙ্গে ব্যান্ডেজের গজ-টা চামড়ার সঙ্গে এঁটে ছিল। টানার সময় ভীষণ যন্ত্রণা। কিন্তু ব্যান্ডেজ খোলার আগেই ওর 'শুধরানি' হয়ে গেল বলে ওকে বকাবকি করল গুরুমা। ঘোড়ুই ডাক্তার রোজ-রোজ কেন আসবে? ওর অন্য কত কাজ। পাঁচদিন ধরে 'এ্যান্টিবায়ু' ইঞ্জেকশন দিতে হচ্ছে এব্‌লা-ওব্‌লা। ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে আব্বাস। ও ইঞ্জেকশন দিয়ে যায়। ও আসার আগেই সকালবেলাটায় জোর হিসি পেয়ে গেল বলে নিজেদেরই ব্যান্ডেজ খুলতে হল। আবার রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। উঠোনের কোণে নিজে-নিজে দু'টো গ্যাঁদাফুলের গাছ গজিয়েছিল। হাসি কয়েকটা পাতা দু'হাতে ডলাডলি করে, কিছুটা

গ্যাঁদাপাতার রস বের করে পাতা-সমেত রক্তমুখে লাগিয়ে দিল। বলল, এসব টোটকা হল ডাক্তারি-ওষুধের বাপ। একটু পরেই আব্বাস এসেছিল। গ্যাঁদাপাতা নিয়ে কিছু বলল না। একটা মলমের সঙ্গে সাদা রঙের কী একটা গুঁড়ো মাখিয়ে হাল্কা ব্যান্ডেজ করে দিল।

বলল, এই ব্যান্ডেজ খুলতে অসুবিধে হবে না। 'শুধরানি'-র দরকার হলে ব্যান্ডেজ খুলে 'ফয়রা' লাগিয়ে 'শুধরানি' করিয়ে আবার মলম মাখিয়ে দিতে হবে।

দুলালীর জন্য 'ছল্লা' বন্ধ হবে কেন? ওরা সবাই যে যার মতো কাজে বেরিয়ে গেল। বাড়িতে শুধু নাগেশ্বরী রইল। নাগেশ্বরী বলল, উদোম হয়ে শুয়ে থাক মা, ফ্যান চালিয়ে দে, হাওয়ায় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে।

কিন্তু তখন তো শীতকাল। ফ্যান চালালে শীত করবে যে।

চাপা দে তবে।

দুলালী শুয়ে থাকে। গায়ে চাদর, পায়ে চাদর। মাঝখানে আলোড়িত সুবাতাস—দৃশ্যটা এরকম।

শুয়ে-শুয়ে কত কিছু ভাবে দুলাল। ওর বউয়ের কথা ভাবে। এখন দেখা হলে ওর বউকে বলবে সই। বউ কি আর সই হবে কখনও? সুখ-দুঃখের গল্প করবে? চোখ বুজে দেখে কলসি কাঁখে পুকুরঘাটে চলেছে ওরা দু'জন। পুকুরঘাট থেকে জল আনবে। পুকুরঘাটটা পাল্টে যায়। এখন কি আর পুকুরঘাটে কলসি কাঁখে যায়? টিউকল-এ যায়। টিউকলে কি গল্পগাছা হয়? ওখানে ঝগড়া হয় খালি। কাঁথা নিয়ে বরং পুকুরঘাটে যাওয়া যাক। মন্টুর হিসি করা কাঁথা। গন্ধ নিল দুলালী। শিশুর হিসি—কী ভাল লাগে। ওর গন্ধ শোঁকা দেখে নমু হাসল। পুকুরঘাটে কলমি-শুষনি। কলমি-শুষনি লল্‌লল্ করে। ওধারে শাপলা ফুটেছে। দুলালী গন্ধকাঁথা জলে ভিজিয়ে, থুপথুপ জল-কাচা করছে। নমু বলল, সরষে নেই ঘরে, বেলেমাছ কী দিয়ে হবে? দুলালী বলল, তবে একটু রসুন ছ্যাঁকা দিয়ে করে নে। দুলালী নমু-র পিঠের দিকে তাকায়। ঘামাচি। বলে, ঘামাচি মেরে দেব দুপুরে। শুয়ে-শুয়ে খাজাইতলার দুপুর দেখে দুলালী। বউয়ের পিঠের ঘামাচি মারতে-মারতে সন্তোষের গল্প করে। যে-সন্তোষ নমু-র সঙ্গে শোয়। সন্তোষের সব কিছু বলে ওর বউ। সই কিনা...

পানাগড়ের ছোট ঘরে শুয়ে থাকে দুলালী। যন্ত্রণা। সব সময় টনটন ভাব।

মা আসে। কেঁদো না মা, আমার কিচ্ছু হয়নি।

মা বলে, তুই ছেলে হয়ে জন্মেছিলি বলে কী আনন্দ হয়েছিল, সবাইকে নারকোল নাড়ু খাইয়েছিলাম। তুই এ কী করলি বাপ আমার।

দুলালী বলে, মা আমার বলো, আমি তোমার মেয়ে তো। আমায় তুমি বিয়ে দেবে? বিয়ের দিন উপোস, তুমি চুপি-চুপি দই-খই মাখা খাইয়ে দেবে, একটা সন্দেশও মেখে দিও, কেমন?

—তুমি কে এলে গো? যাদববাবু? বোসো, বোসো।

যাদব বলল, ক্যায়সা হ্যায় মেরা প্যায়ারি? বহুত আচ্ছা হুয়া। খুব ভাল হয়েছে। তুমায় লিয়ে হামি বিহার যাব। মেরা গোদ মে বৈঠাকে তোমাকে ঘোড়ার গাড়িতে ঘুমাব। ঘোড়ার গাড়িতে ছুটছে দুলালী। গাড়ি গেল বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে হোলি। কেষ্টঠাকুর হোলি খেলছে গোপিনীদের সঙ্গে। গোপিনী দলে মিশে গেল দুলালী। কেষ্টঠাকুর রুপোর পিচকিরি দিয়ে দুলালীর গায়ে রং ছিটিয়ে বলল—ছ্যা-রা-রা-রা-রা।

পুরোপুরি সুস্থ হতে সপ্তাহ তিনেক লাগল। কাটা-জায়গাটার রং প্রথমে সদ্য-হওয়া ইঁদুরের বাচ্চার মতো গোলাপি ছিল। আস্তে-আস্তে খোলস পাল্টানো আরশোলার মতো সাদা হল। সাদা যখন হল, তখন নারকোল তেলে রসুন আর নিমপাতা গরম করে আস্তে-আস্তে মাখাতে হত। সাদা রংটা ক্রমশ ধূসর হতে লাগল। তারপর কী আশ্চর্য, ওই নতুন চামড়ার ওপর রোম গজাতে থাকল।

এক মাসের সময় আবার একটা পরব হয়। আসলে বেঁচে ফেরার সেলিব্রেশন। আগেকার দিনে অনেকে মরত। কারও রক্তই বন্ধ হত না। কারও ভয়ঙ্কর রকম ইন্‌ফেকশন হত। খোজা করার আদর্শ জায়গা ছিল বিহারের সীতামারী, সাসারাম, গয়া। ওসব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হত। যদি মরে যেত, লাশ সরিয়ে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা ওরাই করত। গয়াতে কোনও অসুবিধে নেই, বিশাল ফল্গু নদী, অফুরন্ত বালি। গয়াতে যেসব হিন্দু পিণ্ড দিতে যান, ফল্গু-র বালি সরিয়ে জল বার করে সেই জলে স্নান করার একটা নিয়ম আছে। কিছুটা বালি খুঁড়লেই জল পাওয়া যায়। কেউ-কেউ বালি খুঁড়ে কঙ্কাল পেয়েছেন—এমনও শোনা গিয়েছে। না-পুড়িয়ে পবিত্র ফল্গু-র বালির গভীরে রেখে গিয়েছে এরকম ভাবা হয়। এর মধ্যে লিঙ্গচ্ছেদ করতে গিয়ে—'যাশ্‌ শালা বরবাদ হো গিয়া' লাশ—ক'টা আছে কে জানে? কঙ্কালে পেল্‌ভিক হাড় থাকে। জেনিটালিয়া থাকে না।

একমাস পর ওইসব কর্তনশালা থেকে ফিরে আসত লিঙ্গচ্ছেদকরা। এটা হল আসলে ফিরে আসার উৎসব। 'বেটি' হয়ে শেষ অবদি ফিরল।

এই একমাস দুলালী ওর 'ফয়রা' যন্তরটা ব্যবহার করেছে। এবার ফেরত দিয়ে দিতে হবে—কারণ—এখন ও উঠে, বসে-বসে, হিসি-টা করতে পারছে। যতদিন যন্তরটা ছিল, ওটা নিয়ে বাচ্চাদের মতো খেলেছে। শিংটা কিছুটা ধনুকের মতো বাঁকা হয়। গোড়াটা মূত্রছিদ্রের ওপর ঠেসে ধরে সরু দিকটা ওপরে করলে ঊর্ধ্বগামী তরল, আহা কেমন ফোয়ারা হয়ে যায়। আবার নীচের দিকে ধরলে কল। হিসি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ যন্তরটাকে দ্যাখে। এখানে কিছুদিন আগেও এমনতর কিছু ছিল।

দুলালীর খোলে আজ 'একমাসি'। একমাস হল কিনা। আজ ও আবার নতুন শাড়ি। গুরুমা বলল—তোর জন্য বহুত খরচ করলাম। রোজগার করে শোধ করে দিবি কিন্তু।

দুলালী জিজ্ঞেস করেছিল, হিসেব রেখেছ?

—হিসেব? হুঃ। হিসেবে পিসেব। আমি আমার ডিউটি করলাম। তুই তোর ডিউটি করবি।

দুলালীর একমাসিতে আবার মস্তি। আবহাওয়াটাও চমৎকার। শীত কমে গিয়েছে, কিন্তু শীত-শীত ভাব রয়েছে। টমেটো দেদার বিকোচ্ছে। কড়াইশুঁটি সস্তা। সকালবেলায় কড়াইশুঁটির কচুরির নাস্তা। দুপুরে 'খোবরা' হবে। খাসি-র 'খোবরা' আর খাওয়া চলবে না। দিনকে দিন দাম বাড়ছে। মুরগি সস্তা, কিন্তু ঘাস-ঘাস লাগে। দুপুরে ভোজ। জন-হিজড়ে হিরুয়া পেঁয়াজ ছাড়াচ্ছে, রসুন ছাড়াচ্ছে। কুকুরগুলোও বুঝে গিয়েছে আজ খাওয়াদাওয়া আছে। ঘন-ঘন লেজ নাড়ছে। উঠানের কোণের ম্রিয়মাণ গাঁদা গাছটাতেও আজ উজ্জ্বল দু'টো ফুল ফুটে আছে। কাকগুলো খুব ওড়াউড়ি করছে। রান্নার দেখাশোনার ভার ছবির ওপর। দুলালীও বারবার আসছে। আসলে ওকে নিয়েই তো উৎসব। আসানসোলের গুরুমা'কে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। অজয়ের ওপাড়টা ইলামবাজারে পড়ে। ওটা নাগেশ্বরীর এলাকা নয়। ওদের মধ্যে যতই

আচকা-আচকি থাক, একমাসি-র দিনে ওদের নেমন্তন্ন দেওয়াটা প্রথা। অথচ ছিন্নি-র সময় কাউকে বলা হল না। ছিন্নি-টা করা হয় গোপনে। ছিন্নি করার সময় যেহেতু মরে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, সেজন্যই গোপনীয়তা। ব্যাপারটা ঠিকঠাক মিটে গেলেই জানাজানি করানো হয়। এটা এক ধরনের গর্ব—দ্যাখো আর একটা 'ছিন্নি' হল আমার দলের—ঠিকঠাক। যেন বিজয়। যেন ইনখিলাপ জিন্দাভাত—বন্দেমাতরম্।

আসানসোল-ইলামবাজারের গুরুমা'কে দ্যাখেনি দুলালী। এসব এলাকার এমএলএ-দেরও দ্যাখেনি। এমএলএ-র নাম জানে না। কিন্তু গুরুমা'দের নাম জানে। আসানসোলের গুরুমা-র নাম ঝুনিয়া মা, ইলামবাজারের বাসন্তী মা।

ওরা এসে দুলালীকে কী বলবে? জন্মদিন হলে তো বলত হ্যাপি বার্থ ডে। টিভিতে গান গাওয়াও দেখেছে। এখানে বলবে নাকি : হ্যাপি ছিন্নি?—নিজের সঙ্গে করা রসিকতায় নিজেই মুচকি হাসে দুলালী।

বাবা মহারাজ একবার সকালে এসে ঘুরে গিয়েছে। বাবা মহারাজ, মানে বাবা বাহাদুর। মানে, নাগি-মা'য়ের পারিক। এসে একটা সেন্ট দিয়ে গেল। ফস টেপা। মাথায় টিপলে ফস করে বেরয়।

মা বলল, এখন দিও না। খামোকা নষ্ট করছ কেন? ওরা এলে দেব। বাবা বাহাদুর মুখ উঁচু করে বলল, কিপ্পেমি কব্বে না। মত্তি মে রহো।

ওর কথাগুলোই ওরকম। মুখে সব সময় পানপরাগ থাকে কিনা। ওদের দলের ছবি-চাত্তারা-হাসি-ঝর্না অনেকেই—পানপরাগ খায়। খৈনিও। সিগারেট-বিড়ি তো সবাই খায়। দুলালী ওসব খায় না। মেয়েদের খৈনি খাওয়াটা কেমন যেন লাগে।

দুলালীকে আজ কাঁচা-হলুদ-বাটা, নিমপাতা-বাটা দিয়ে স্নান করানোর কথা। কাঁচা হলুদ পাওয়া যায়নি। তাই নিমপাতা বাটায় হলুদ গুঁড়ো মেশানো হল। হাসি, মহুয়া, ঝর্না—ওরা সব মাখিয়ে দিল। সব জায়গায়। চাত্তারা বলেছিল, ফোঁদলে ভাল করে ঢুকিয়ে আঙুল ঘুরিয়ে দে।

'ফোঁদল' মানে 'কাটা' জায়গাটা।

বেলা বারোটা নাগাদ ঝুনিয়া মা এল। হিন্দুস্তানিদের কায়দায় শাড়ি পরা। শাড়িতে চুমকি বসানো। চৌকোমতো গাল। পায়ে নুপুর। চোখে কালো চশমা।

নাগেশ্বরী বলল, পাও লাগি।

ঝুনিয়াও বলল, পাও লাগি।

নাগেশ্বরীর গা থেকে খুব সুবাস বেরচ্ছে। বাহাদুরের আনা সেন্ট খুব করে লাগিয়েছে নাগেশ্বরী। নাগেশ্বরী বলল, বহুত দিন বাদ। সব ঠিকঠাক না? ঝুনিয়া বলল। হাঁ। বহুত দিন বাদ। তবিয়ত ঠিক বা?

—হ্যাঁ। চলতা হ্যায়।

—ইকরা-বিকরা—সব ঠিক বা?

—ঠিকই আছে।

—'ইকরি-বিকরি' মানে শিষ্য-টিষ্যদের বোঝানো হচ্ছে।

নাগেশ্বরীও ওর কুশল জিগ্যেস করল,

—চিস্স্যা ঠিকঠাক?

খুব 'ওলো সই' ভাব। কিন্তু দুলালী তো জানে, নাগেশ্বরী কতবার বলেছে ঝুনিয়ার গাঁড় মেরে ফাঁক করে দেবে। দুর্গাপুর ঝুনিয়ার এলাকা নয়, তবু ঝুনিয়ার লোক দুর্গাপুরে কাজ করছে। ঝুনিয়ার এলাকা হল রানিগঞ্জ, ঝরিয়া, রূপনারাণপুর, কুলটি এসব এলাকা। ওর এলাকায় নাগেশ্বরী কাউকে পাঠায় না। নাগেশ্বরীর দলের দু'টো কচি ছেলেকে টেনে নিয়েছিল ঝুনিয়া অনেক টাকা কামানোর লোভ দেখিয়ে। ঝুনিয়া ওদের বলেছিল, বিহারে হোলি-র সময় পাঠিয়ে দশ হাজার টাকা কামাই করিয়ে দেবে। ওদের পাঠিয়েছিল, না কি নিলাম করে দিয়েছে কে জানে? নাগেশ্বরী নিলামে পাঠায় না। ওসব লাইনে নেই। নাগেশ্বরীর একটু গাঁজা-চরসের কারবার আছে।

দুলাল শুনেছে, নাগি-মা'র নাকি নিজের বাড়ি আছে। ছোটভাইয়ের সংসারে টাকা দেয়। ছোটভাইয়ের ছেলেকে বেঙ্গালুরুতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ায়। শুধু ছল্লা-র টাকায় কি চলে?

যেসব গুরুমা 'কোতি' নিলাম করে, ওদের পোষা গুন্ডা আছে। এমনি-এমনি পেতি-গুন্ডা নয়, ইংলিশ-জানা গুন্ডা। ওরা পুলিশের সঙ্গে ঠাট্‌সে কথা বলতে পারে, অফিসারদের সঙ্গে বসে মাল খায়, পকেটেও থাপ্পু থাকে, চাপ্পুও। 'চাপ্পু' মানে 'ছোট খোকা'। মানে 'গুড়ুম'। এসব গুরুমা 'টোন্যা' নিয়ে এসে লিক্‌ম বিলা করিয়ে 'ছিন্নি' বানিয়ে বাজারে নিয়ে যায়। নিলামের জন্য। গুরুমা সব সময় নিজে যায় না। ওদের হিস্যাদার থাকে। মানে, ওইসব ঠুংঠাং গুন্ডা। দুলাল জেনেছে, পুরনো দিল্লির কোনও-কোনও জায়গায় 'কোতি' নিলাম হয়। ওখানে হাতের তালিতে দাম ওঠে। যারা 'মাল' নিতে আসে, তারা 'ঠিকরি' দেয়। ঠিকরি-র 'মানে' বোঝে ওরা। এক-একটা 'তালি' মানে এক-এক হাজার। একজন দশ তালি দিল তো অন্যজন বারো তালি, আর একজন পনেরো তালি। নাগিনদের দাম বেশি হয় অনেক। একটা 'কোতি' এভাবে এক মায়ের ডেরা থেকে অন্য মায়ের আশ্রয়ে চলে যায়।

দুলালের অবশ্য নিলাম হওয়ার ভয় নেই। ওকে কেউ নিলামে দেবে না। দুলাল তো দেখতে ভাল নয়, ওর গাল-ভাঙা। রংও ফরসা নয়। ওর বুকে এখনও লোম আছে অল্প ক'গাছা। তা ছাড়া ওর নাভির তলা থেকে পিঁপড়ের লাইনের মতো সরু-সরু লোমের সারি রয়েছে এখনও।

ঝুনিয়া সঙ্গে করে এক বাক্সো লাড্ডু এনেছে। একটা লাড্ডু দুলালীকে খাইয়ে দিল। পিঠে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করল—হো যা চমচম মেরা পেয়ারি। চাল চালালে মতবালি—জান মারলি লাগাকে তালি...। আরাম সে রহো। খাও, পিও, মস্তি মারো। ভাল লাগচে?

দুলালী রা কাড়ে না।

—ইখানে ভাল লাগচে তো?

দুলাল ঘাড় নাড়ে।

—আরে অত লোজ্জা কেন? ঠিক সে বলো, ভাল লাগছে? সব ঠিকঠাক কাম করো। মা-র কথা শুনবে সোব সময়।

তারপর নাগেশ্বরীকে বলে—ঠিকঠাক চুন লিয়া। এরকমও দরকার আছে। বেশি এস্‌মার্ট ভাল হয় না। দুলালের 'একমাসিয়া' বেশ ধুমধাম করেই হচ্ছে। সবারই একটা 'একমাসিয়া' করতে হয়, কিন্তু সবার ক্ষেত্রে লোক ডেকে ভোজ খাইয়ে হয় না। কে জানে কেন, নাগেশ্বরীর দুলালীতে মন লেগেছে।

মাংসর গন্ধ বেরিয়েছে বেড়ে। ইতিমধ্যে বাসন্তী এসে গিয়েছে।

বাসন্তীর গলায় বেশ মোটা হার। ভিতরে লাল-নীল পাথর ঝলকাচ্ছে। দেখতে বেশ ভাল। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গোলগাল চেহারা। ব্লাউজের তলায় পেটের দু'টো ভাঁজ দেখা যাচ্ছে। সাদা। মনে হয় একসময় নাগিন হিজড়ে ছিল। মুখে পান, ঠোঁট পানরসে রাঙা। বাসন্তী আর ঝুনিয়া কোলাকুলি করল।

একটা ট্রে-তে তিনটে গেলাস, ভদ্‌কা-র বোতল, আর একটা বড় লিম্‌কা-র বোতল দিয়ে গেল ছবি। হাসি প্লেটে করে নিয়ে এল ধোঁয়া-উগ্‌লোগো মাংস। ঝুনিয়া বলল, আরে, ক্যায়া বাত।

নাগেশ্বরী ঢেলে দিল গেলাসে। ওরা বলছিল—কতদিন পর দেখাসাক্ষাৎ। এসব হলে তবু দেখা হয়।

ওরা হাই লেভেল কথা বলছিল। দুলালী অতটা না-বুঝতে পারলেও, অনিকেত জানে, এই তিনজনের মধ্যে ঝুনিয়ারই ভাট-ফাঁট বেশি। কারণ ওর হাতে কয়লা-মাফিয়া আছে। ঝুনিয়ার 'বাবু' নিশ্চয়ই কোনও কয়লা-মাফিয়া। এবং ওর চেলা-চেলিদের খদ্দের যারা, ওদের মধ্যে অনেকেই কয়লার ছুটকো কারবারি। ঝুনিয়ার দলবল বাচ্চা নাচিয়ে যা পয়সা রোজগার করে, তার চেয়ে নিজেরা নেচে বেশি পয়সা পায়। জায়গাটা বিহার সীমান্তে। এখানে 'মওগা নাচ' এবং 'লন্ডা নাচ'-এর খুব চাহিদা। অশ্লীল গানেরও। ওদের কাছে ওইসব গান অশ্লীল নয়, অনিকেতদের কাছে অশ্লীল।

ঝুনিয়া বলল, কী মিটিন-এ যাবে না কি? নাগেশ্বরী বলল, চিঠি তো এসেছে। কিন্তু কী হবে গিয়ে? সব বেকার। কেবল যত বলকিবাজি। হ্যান করো, ত্যান করো। বলছে, সেলাই শেখাও, আরে আমরা কি বাচ্চা বিয়োব নাকি, খোকার ক্যাঁথা সেলাই করব, খুকির জামা সেলাই করব। বলছে, লিক্‌ম পোঁতা বন্ধ করো, এড্‌স হচ্ছে। আবার 'দুব্বার' সংগঠন—না কি যেন আছে, ওদের লোক এসেছিল, বলল, লিক্‌ম পোঁতাপুঁতি করার আগে কন্ডোম পরো। সবাই চামনাচ্ছে।

বাসন্তী বলল, একটা মিটিন হয়েছিল, ভোটের মিটিন। ওখানে একজন বলেছে, হিজড়ে পেশা উঠিয়ে দেবে। সবাইকে ধরে লিয়ে গিয়ে হাতের কাজ শিখাবে। আচার-মাচার তৈরি শিখাবে। চায়ের দোকান করে দিবে। সব ঢ্যামনা। এটা কি লেফ্‌-রাইট নাকি? বলবে আ-রাম, অমনি সবাই পিছে হাত দিয়ে ঠ্যাং ফাঁক করে দাঁড়ায়, তারপর কী যেন বলে—অমনি সব দু-ঠ্যাং জোড়া করে সাইডে হাত রেখে দাঁড়ায়। হিজড়েগুলোকে যেন লাইন করিয়ে বসিয়ে বলবে, পাঁপড় বানাও, অমনি সব যেন পাঁপড় চামনাতে লাগবে।

সব ভেল, সব ভেল—ঠোঁট উল্টে ঝুনিয়া বলে। তারপর এক ঢোঁক গেলেন।

কলকাতায় আবার একটা হিজড়ে-সম্মেলন আছে, ওই নিয়েও কথা হয়।

আসলে শিক্ষিতরা যেসব সম্মেলন করে, মানে এল্‌জিবিটি-গ্রুপ, ওরা হিজড়েদেরও চিঠি দেয়। সবাইকে দিতে পারে না। সব 'ঠেক' বা 'খোল'গুলির হদিশ ওরা জানে না। সম্ভবত কোথাও নেই। যেটুকু জানে চিঠিপত্র দেয়, বা লোকজন মারফত যোগাযোগ করে। এসবে হিজড়েদের খুব একটা উৎসাহ নেই। ওখানে সব ঠুংঠাং ট্যোনা-ট্যুনি। ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে। তবু কেউ-কেউ যায়। ইজ্জত দিয়ে ডেকেছে। কিন্তু ওখানে যা সব আলোচনা হয়—তার সব কিছু ওরা বোঝে না। ভালও লাগে না। কিছু কথা অবশ্য ভাল লাগে। যেমন : হিজড়েরা 'বুড়ি'

হয়ে গেলে ওদের পেনশন দিতে হবে। পুলিশি হামলা বন্ধ করতে হবে, এসব কথা ভালই। ওরা ভোটের কার্ড করাতে বলে। বলে, নিজেদের 'হিজড়ে' পরিচয় দিতে লজ্জা কীসের? কিন্তু যাদের ভোটার কার্ড আছে? আগে ভোটের-বাবুরা যা খুশি লিখে দিত। কিন্তু ওরা নিজেদের 'ফিমেল' বলেই ভোটের কার্ডে লেখায়। ওসব মিটিংয়ে শুনে এসেছে বাসন্তী, হিজড়ে-রা নাকি আজকাল ভোটে দাঁড়াচ্ছে। পাটনায় নাকি কালী হিজড়ে এমএলএ হয়েছে। আরও কোথাও-কোথাও নাকি হিজড়েরা ভোটে দাঁড়াচ্ছে।

হিজড়েদের বরং এলাকাভিত্তিক মিটিংয়ে উৎসাহ বেশি। বাড়িওলার সমস্যা, স্থানীয় গুন্ডাদের সমস্যা, পুলিশকে কীভাবে চামনাতে হবে।

'চামনা' একটা আশ্চর্য শব্দ। কতরকম ভাবে এই শব্দটা ব্যবহার হয়। 'খিলুয়া চামনাচ্ছে' মানে মদ খাওয়া। 'পারিক চামনাচ্ছে' মানে প্রেমিক জোগাড় করছে। এমনকী ফুল তোলা বোঝাতে 'ফুল চামানো'। এসব হিজড়ে-মিটিংয়ে 'চামানো'-টাই আসল। এরই মধ্যে হাসি, মশকরা, কোনও হিজড়ে মরে গেলে তার জন্য একটু নুন ফেলা। এক চিমটে নুন হাতে নিয়ে, ওর নাম করে মাটিতে ফেলে দেওয়া।

কথায়-কথায় ঝুনিয়া জানাল, সামনের বার ও হজ-এ যাবে। ওর বাবা মোমিন মুসলমান ছিল। হজ করার হচ্ছে ছিল, পারেনি 'হজ' সেরে এলে, ও আর খোলে থাকবে না। দেশের বাড়ি চলে যাবে। টাকাপয়সা দান-ধ্যান করে দেবে। জীবনে যত পাপ করেছে, সব খণ্ডন হয়ে যাবে। হজ থেকে ফিরলে ও 'হাজিন' হয়ে যাবে। ঝুনিয়া মুসলমান নয়। কিন্তু অনেক হিজড়েই একবার হজে যায়। হজ না পারলে আজমীর শরীফ। 'আসলে 'হিজড়ে' শব্দটা এসেছে 'হিজরত' শব্দটা থেকে। হিজরত-এর সঙ্গে হজের অবশ্য কোনও সম্পর্ক নেই। 'হিজরত' হল সরে যাওয়া। পয়গম্বর হজরত মহম্মদ মক্কা থেকে মদিনায় সরে গিয়েছিলেন। তাঁকে সরতে হয়েছিল, কারণ মক্কায় প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলেন। মদিনায় গিয়ে তিনি নিজের সমর্থক তৈরি করেন, আবার মক্কায় ফিরে আসেন। হিজড়েরাও ওদের পুরনো জীবন ছেড়ে অন্য জীবনে যায়, যে-জীবন নিজেরা নির্মাণ করেছে।

অনেক হিজড়েদের কাছে হজে যাওয়া একটা স্বপ্ন। সাধারণ হিজড়েরা এই স্বপ্ন থেকে অনেক দূর থাকে। পয়সাওলা হিজড়েদের পক্ষেই হজে যাওয়া সম্ভব। গুরুমাদেরই পয়সাকড়ি হয়। কোনও-কোনও গুরুমা হজ থেকে ফিরে 'খোল' ছেড়ে দেয়। কেউ-বা খোলেই থাকে, কিন্তু খোলের আসল দায়িত্ব অন্য একজনকে দিয়ে, গুরুমা উপদেষ্টার মতন থাকে।

হজের কথা শুনে, এই খোলের সফি-র চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সফি হল সফিউল্লা। রেশন কার্ডে ওর নাম সফিউন্নেসা। সফি জিগ্যেস করে—হজ করে এলে সব গুনাহ, সব কসুর মাপ হয়ে যায়? ঝুনিয়া বলে, তাই তো শুনি। সোজা বেহেশ্ত স্বর্গ।

বেহেশ্তে কি সফি-র হবে? কী করে হবে? ইসলামে সবচেয়ে বড় 'গুনাহ' সোডোমি। সেটাই তো করেছে। শরাবও খেয়েছে। নমাজও পড়ে না। কেয়ামত হবেই। কবর থেকে মুর্দাদের উঠিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ-র কাছে বিচারে যেতে হবে। দোজ্খ বড় কষ্টের। আর বেহেস্ত? কালার সিনেমা। গাছে-গাছে ফল, পাড়ো আর খাও। সবুজ ঘাসের গালিচা। আ-যা...তু আ-যা...। নদী। পাহাড়। ফুল। দিলরুবা... দিলরুবা। ঝরনা। ঝরনার জল নয়, ড্রিংক্স। যত খুশি পিও। ওখানে কত হুরি। খুব সুন্দর দেখতে, আর অ্যায়সান ফরসা যে, ওদের রক্তের

নালি দেখা যায়। ওদের সঙ্গে দিনরাত 'ধুরপিট্টি'। ওখানে পেচ্ছাব-পায়খানা কিচ্ছু হবে না। কেবল মস্তি।

কিন্তু সফি যদি বেহেশ্‌তে যায়, কোন শরীর পাবে ও? এই শরীর? না কি আগের শরীর? এই শরীরে হুরি কী হবে? তবে কি গেলমান নেবে, গেলমান? মেজচাচা খুব বলত। চাচা ছিলেন মুয়াজ্জিন। মসজিদের ছাদে উঠে আজান দিত। মাইক ছিল না। ওঁর গলায় খুব তেজ।

মেজচাচা বলতেন, সাত তবক আসমান, হাসরের ময়দান, জিন-ফরিস্তাদের কথা। দোজ্‌খ-বেহেশ্‌তের কথাও তো বলত। বেহেশ্‌তের কত কিসিমের খাওয়ার কথা বলত—যেসব খাবার চোখেও দ্যাখেনি। কাজু-পেস্তা-আখরোট-কিসমিস-খেজুর। এসব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গেলমান। গেলমান-রা সব ষোলো বছরের ব্যাটাছেলে। ফরসা রং। আপেলের মতো গাল। মুক্তোর মতো দাঁত। কমলা-কোয়ার মতো ঠোঁট, ঘোড়ার কেশরের মতো চুল, সিঙ্গাপুরী কলার মতন লিকম্‌... না না, লিক্‌মের কথা চাচা বলেননি, এটা এই মুহূর্তে মনে হল সফি-র। মনে পাপ। মনে পাপ। তবে মনের ভিতরের কোন গর্তে বসে থাকা কে যেন বলল—যদি এই শরীরেই বেহেশ্‌তে যাও, ঈশ্বর তোমার জন্যও ব্যবস্থা রেখেছেন। গেলমান। গর্তে বসে যে আছে, ও শয়তান। চাচা বলতেন, শয়তানরা নানা রূপ ধরতে পারে। নাকের গর্তেও ঢুকে বসে থাকে, এজন্যই তো 'ওজু' করার সময় ভাল করে নাকের গর্তেও পানি দিতে হয়।

ঝুনিয়া বলল—দালালের সঙ্গে বাতচিত হয়ে গিয়েছে। হজের বেওয়াস্তা করে দেবে। নমাজ-উমাজ তো জানি না। ওখানে নমাজ না-পড়লেও চলে। খালি কাবার চারদিকে ঘুরতে হয়। কাবাঘর ঘুরলে খুব সওয়াব হয়। ভগওয়ান নিজে ওই ঘর বানিয়েছিলেন। দুনিয়ার সবচেয়ে পুরনো ঘর। ওই ঘরের পাত্থর ছুঁতে হয়। ওই পাত্থর সব পাপ শুষে লেয়। উখান থিকে ফিরে এসে, আমি আর ইসব কাজ করব না। আমি, আমার সব কুছ আমার এক নম্বর 'চেলি' সাধনাকে দিয়ে দিছি। তুমরা সব ইখানে আছো, এই মওকায় আমি ডিকলিয়ার করে দিলাম। কাগজও বানিয়েছি, কোর্টের কাগজ। এপিটআপিট না কি যেন বোলে। উটার জেরগ বানিয়ে এনেছি। একটা করে রাখো।

ঝুনিয়া ওর ব্যাগ থেকে ভাঁজ-করা কাগজ নাগেশ্বরী আর বাসন্তীকে দিল। ঝুনিয়া বাসন্তীকে বলল, বাসন্তী মাঈ তো লিখাই পঢ়াই আছে। একবার পঢ়ো। বাসন্তী পড়তে থাকে—

অত্র মিদং ঘোষণাপত্র বরাবর পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষে বর্ধমান কালেক্টার বাহাদুর আসানসোল মহকুমা থানা আসানসোল ঘোষণাকারিণী শ্রীমতি ঝুনিয়া হিজরানি পিতা উল্লট রাম জাতি হিন্দু পেশা ডেন্‌সার—নবজাত শিশুসন্তান-সহ নাচগান সাকিন তাঁতিয়া বস্তি, কলাবাগান, আসানসোল জিলা বর্ধমান কস্য পত্রমিদং কার্য্যা। তাঁতিয়া বস্তি নিবাসী মৃত ধলা হিজরানির এলেকা আসানসোল পৌর এলাকা, কুলটি, বার্নপুর সমেত বিহার বর্ডার চিত্তরঞ্জন রূপনারানপুর সমেত সমস্ত গ্রাম এবং পুর এলাকা। সোনামুখীর ময়না হিজরানির বর্ধমান-ভুক্ত চাঁচর ও আদ্রাহাটি পঞ্চায়েত এলাকা ছাড়া সমগ্র অন্ডাল ব্লক, আউরিয়া হইতে জিটি রোড বরাবর বিহার বর্ডার পর্যন্ত দু পাশের সমস্ত গ্রাম, একুনে যাহা ধলা হিজরানির এলাকাভুক্ত ছিল তাহার সহিত বার্নপুর ও চিত্তরঞ্জন, যাহা আমি পরবর্তীকালে গ্রহণ করিয়াছি। যেখানে আমার শিষ্য ও চেলাগণ নবজাত সন্তান হইলে ডেন্‌স করে, এইসব অঞ্চলের দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডেন্‌স করার হক আমার একান্ত অনুগতা এবং নিজ-ঘরে পালিতা সাধনা

হিজরানিকে দিলাম কারণ ধলা হিজরানির এলাকার মালিক আমি হইতেছি। আমি আমার হক, ঘর, এবং অধিকার সাধনা হিজরানিকে অত্র দলিল বলে দিলাম। কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না। নিজ দখলীয় এলাকাতে নবজাত পুত্র ও কন্যাদের কোলে করিয়া নাচগান করা, আদর যত্ন ও আশীর্বাদ করা এবং এই বাবদ নবজাত সন্তানের পিতা-মাতার বখশিস গ্রহণ করা এবং চাউল, ডাইল, সবজি, ফল, কলাদি গ্রহণ করা চলিবে। মান্যবর সরকার বাহাদুরের হিজড়া প্রতিপালন আইন অনুযায়ী আমি এই কার্য গত তেত্রিশ বৎসর যাবৎ করিতেছি এবং গত ষোলো বৎসর যাবৎ ধলা হিজরানির অধিকার ভোগ করিতেছি। অত্র এই দলিল দ্বারা যাহা সাধনা হিজরানিকে অধিকারী করিতেছি, তাহার এলাকায় অন্য কেহ কাজ করিতে পারিবে না। এবং এই ঘোষণাপত্রকে প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। আমি সুস্থ শরীরে সরল মনে এই ঘোষণাপত্র সম্পাদনা করিলাম।

চাত্তারা এটা শুনল। হাসিও শুনল। ওরা কেউ পরস্পরের দিকে তাকাল না। চাত্তারা-ই নাগেশ্বরীর সব কিছু হয়তো এভাবে পাবে, অথচ হাসি সবচেয়ে পুরনো।

নাগেশ্বরী বলল, শুন ঝুনিয়া দিদি, তুমি ভাল কাজে যাচ্ছো যাও। তোমার যা-ইচ্ছে তাই হবে। আমরা কোনও ঝামেলা করব না। আমার মেয়েরা খুব নক্ষী।

বাসন্তী বলল, আমি তো নদীর ওপারের লোক। বীরভূম জেলা। আমার সঙ্গে কোনও খটরমটর হবেনি।

ঝুরিয়া বলল, সে তো জানি। তবু সোবাইকে জানিয়ে দিলাম। ভাল কি না?

এসব তো হল। এসব ধানাইপানাই তো একমাসি-র মধ্যে হওয়ার কথা ছিল না। ওসব হল বৈষয়িক ব্যাপার। তারপর 'খিলুয়া' আর গান। দুলালীকে নাচ করতে বলল। দুলালী এখন এসব বেশ করে। ফুলি হাতে ঠিক্‌রি মেরে গান ধরল—

ছিন্নি হুয়ি রে।

পানাগড় বাজার মে ছিন্নি হুয়িরে।

এ ছিন্নি, এ ছিন্নি, ছিন্নি হুয়ি রে।

দুলালি দিব্যি নেচে দেয়।

এরপর অন্যরা নাচে। 'আঁখ মারকে দেখা দো ফাঁক করকেঁ দেখা, দো লাথ মারকে হাঠা দো—হাথ মারকে দেখা দো'—যা খুশি মদের নেশায় যা খুশি তাই। ওদের মধ্যে হাসি তো ঠিক আকুয়া নয়, অপরিনত লিঙ্গচিহ্নের অর্দ্ধনারী। ওগাইল—

যৌবন পুড়ে আঙার হ'ল মনের জ্বালা মিটল নাই
ডজন মরদ খেলা করল মনের মানুষ মিলল নাই
শরীল খোজে সবার আগে মনটা কেউ খুজে নাই
প্যাটের জন্য ঘুরছি কিন্তু দিলটাকে কেউ বুঝে নাই

চাত্তারা বলে এসব কাঁদন গান থামা হাসি,
মস্তির গান কর।

মস্তির গান চলল—ঠাপ দে ঠাপ দে ঠাপ দে ইয়ার...। মদের নেশায়—যা খুশি তাই।

সন্ধের আগে-আগে অতিথিরা চলে গেল। বাসন্তী ধরল 'সতী সাবিত্রী' বাস। ঝুনিয়া ধরল 'জয় বাবা তারকনাথ'।

সন্ধের পর লিক্‌ম-বসা। 'ছিন্নি' হওয়ার একমাস পর, এটা করতে হয়। একটা কাঠের তক্তার মধ্যে সাতটা কাঠের লিঙ্গ-আঁটা আছে। সাতটার সাতরকম 'সাইজ'। ছোট থেকে বড়। প্রথমটা দু'ইঞ্চি। পরেরটা তিন, এর পরেরটা চার, সপ্তমটা প্রায় সাড়ে সাত ইঞ্চি। সাতটার সাত রং। প্রথমটা সাদা, পরেরটা কমলা, তারপরেরটা লাল, এরকম সবুজ-নীল-বেগুনি। সাত নম্বরটা কালো। এখন আর সেরকম রং নেই। রং মুছে গিয়েছে। নিয়ম ছিল, নির্বাণ হওয়ার একমাস পর থেকে সাতদিনে সাতটা কাঠ-লিক্‌ম বাট্টুতে ঢোকাতে হবে। এটা হল পায়ুপথ ঠিকঠাক করার প্রক্রিয়া। দুলালীর পায়ু পথ ঠিকঠাকই আছে বলা যায়। তবু নিয়ম হল, নিয়ম। বামুনদের পৈতের পর বারো বছর ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে হত। পরে ওটা এক বছরে দাঁড়ায়। এখন পৈতে হওয়ার তিনদিনের দিন মাছ-মাংস খাইয়ে দেওয়া হয়। অনিকেতের ভাগনের পৈতে হয়েছিল কালীঘাটে। মাথা ন্যাড়া করেনি ভাগনে। পুরোহিতকে মূল্য ধরে দিয়েছিল। পৈতে হল, ব্রহ্মচারীর দণ্ড হাতে নিল, তারপর কালীঘাটের গঙ্গায় ভাসিয়ে ফেরার সময় চাইনিজ দোকানে চাউমিন-চিলি চিকেন খেয়ে ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত করল। নিয়ম হল নিয়ম। তবু লিক্‌ম-পোঁতা করতে হবে।

তক্তায় বসানো কাষ্ঠ-লিঙ্গগুলিকে ভাল করে দুধ-ঘি মাখানো হল। তারপর দুলালী প্রথম সাদাটার ওপর চেপে বসল। পায়ুপথে ওটা প্রবিষ্ট হল। ঢোল বেজে উঠল। ওরা গান গেয়ে উঠল—এই তো বাবার সাদা গেল রে... এই তো বাবার কমলা গেল রে...। পাঁচ নম্বর পর্যন্ত হয়ে গেল। ছয় আর সাত পারবে না। ভয় করছে। নাগেশ্বরী দুলালীর পিঠে হাত দিয়ে বলল, থাক বাছা। কাল দেখা যাবে।

বিকাশ ঠাকুরপো ওর ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে। শুক্লা ফোনে জানিয়েছিল।

এটা অবিশ্বাস্য। বিকাশ ওর ছেলেকে অসম্ভব ভালবাসে। ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ওকে যোগব্যায়াম শেখায় বেশি মনোযোগ আসবে বলে। সাঁতার শেখায় বডি 'ফিট' থাকবে বলে। ফিট না-থাকলে ক্রিকেটটা খেলবে কী করে?

ক্রিকেটের কোচিং সেন্টারে নিয়ে যেত ছোটবেলা থেকে। লেখাপড়ার মাস্টারও ছিল। ল্যাঙ্গোয়েজ আর অঙ্কের জন্য সব আলাদা-আলাদা। বলত, ইংরেজিটা খুব ভাল জানতে হয় একজন ক্রিকেটারকে। ওদের সারা পৃথিবী ঘুরতে হয় তো, কত চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিতে হয়, ম্যাচ জিতলে, 'ম্যান অফ দ্য সিরিজ' হলে রি-অ্যাকশন দিতে হয়। আমাদের সৌরভ গাঙ্গুলি কী সুন্দর ইংরেজি বলে, তাই না? আমাদের বুকুনও ইংলিশ-টা ভালই বলে। ও নিয়ে চিন্তা করছি না—তবে ও সেরকম লম্বা হচ্ছে না। লম্বা না-হলে ভাল ক্রিকেটার হয় নাকি? এ জন্য ওকে রোজ একশোটা করে স্কিপিং করতে বলেছি, 'টলারেন' নামে একটা লম্বা হওয়ার ওষুধের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। কিনে দেব? অনিকেত বলেছিল, ওসব আজেবাজে ওষুধ খাওয়াস না। তা

ছাড়া বেশি লম্বা না-হলে অসুবিধে কোথায়? শচীন কি লম্বা? গাভাসকর, বিশ্বনাথ কেউ লম্বা নন।

বিকাশ বলেছিল—আরে, শচীন তো ব্যাটস্‌ম্যান। আমাদের পুকাই তো মেন্‌লি উইকেটকিপার। ও হল উইকেটকিপার কাম ব্যাটস্‌ম্যান। ফারুক ইঞ্জিনিয়ার যেমন ছিলেন। ওর আইডল হচ্ছে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট।

অনিকেত বলেছিল, উইকেটকিপার'রা তো বেশি লম্বা হয় না, বরং বেশি লম্বা হলেই অসুবিধে। ওদের উঠ-বোস করতে হয় কিনা খুব—তাই তো জানি।

বিকাশ বলেছিল, আরে বললাম না, ওর আইডল হচ্ছে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। ও তো লম্বা। তা ছাড়া ব্যাটসম্যানদের ফুটওয়ার্ক দরকার। পেস বল খেলতে ব্যাক ফুট, স্পিন খেলতে ফ্রন্ট ফুটওয়ার্ক লাগে। লম্বা পা হলে খেলতে সুবিধে কত... প্যারালাল রিং করলে নাকি লম্বা হয়।

অনিকেত বলেছিল, দ্যাখ না, এখন তো ওর টিনএজ, হতেও পারে লম্বা।

বিকাশ বলেছিল, ধুর, আমি তো এভরি উইকে ওর হাইট মাপছি। রেকর্ড রাখছি। ব্যাটা বাড়ছেই না। ওই যে, বিজ্ঞাপনে থাকে না, টলার আর স্ট্রংগার হওয়ার হেল্‌থ ড্রিংক্‌স, সেটাও তো দিচ্ছি। জানি, ওগুলো ওদের বাতেলা, তবু কিনে খাওয়াই, যদি বাড়ে। তা ছাড়া রেগুলার আখরোট খাওয়াই। আখরোট হল কাশ্মীর, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের ফল। ওরা খুব লম্বা হয়। কে যেন বলেছে আখরোটের মধ্যে এমন একটা পদার্থ আছে, যার মধ্যে লম্বা হওয়ার 'মাল' রয়েছে।

ছেলের জন্য এক্কেবারে পাগল, আর ওই পাগলামিতেই ছেলেটা মরল।

•

বাড়ি ফিরছে। মোবাইলে মেসেজ। বেশ লম্বা মেসেজ। রোমান অক্ষরে : Ami Totota Jubati Noi... গোদা বাংলায়—'আমি ততটা যুবতী নই যতটা ছিলাম আগে, কিন্তু তত তো বৃদ্ধ নই যত আমি হব। তোমার পরশে যদি এ শরীর জাগে... শোব।' এটা তসলিমা নাসরিনের কবিতা। 'কাঁপন' সিরিজের। বেশ ক'টা এরকম কবিতা 'দেশ'-এ বেরিয়েছিল। মঞ্জু আবার 'দেশ' পড়ে না কি? কেউ হয়তো দেখিয়েছে এটা, ভাল লেগে গিয়েছে। এটা কি থাকবে? 'ডিলিট' করতে গেল। করল না। থাক। শুক্লা মেসেজ বক্স-টক্স খোলে না। জানেও না।

কাঁপন নিয়েই বাড়ি ঢুকল অনিকেত। ফিরতে রাত হয়। মন্টু গেট খুলে দিল। শুকনো মুখ। হাসল না। শুক্লারও শুকনো মুখ। হাসল না।

—কী, মনখারাপ? বিকাশের ছেলেটার জন্য, তাই না?

অনিকেত জিগ্যেস করল।

শুক্লা কোনও কথা বলল না। শুক্লার পিছন-পিছন ঘরে গেল। ঘরের দেওয়ালে একটা সানমাইকার বোর্ড ঝোলানো, ওখানে লেখা—

অ—অন্ধকার

আ—আলো

ই—ইচ্ছে

ঈ—ঈশ্বর

—এসব কী শুক্লা?

—পড়াই না? ঝট করে মাথাটা তুলে বলল, শুক্লা।

কিছুটা অহংকার। হ্যাঁ, কী একটা সংস্থা বানিয়েছে শুক্লা। না, সংস্থা বানানোর ক্যাপাকাইডি নেই ওর, একটা সংস্থা হয়েছে, ওখানে ও যুক্ত হয়েছে—এটা জানা ছিল। ক্লাস করতে যেত। গরিব ছেলেমেয়েরা পড়ে। রিকশাওলাদের, কাগজ-কুড়ুনিদের, কাজের মাসি-পিসিদের ছেলেমেয়েরা। এখন কি ঘরের মধ্যেই ক্লাস নিচ্ছে নাকি শুক্লা? অনিকেতের কেমন যেন মনে হয়, ও কিছুটা বিপদের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। কিছুটা অসহায় লাগে। 'অ' দেখলেই তো অজগর মনে পড়ে। একটা অজগর সাপ যেন... 'অ-য় অজগর আসছে তেড়ে...'

—আচ্ছা শুক্লা, 'অ'-তে অন্ধকার কেন লিখলে? 'অ'-তে তো অজগর। 'আ'-তে আম। তাই তো জানি ছোটবেলা থেকে। .

শুক্লা বলল, ওসব পরে হবে। রাত হয়েছে।

তারপর সিঁড়ির পাশের ঘরটায় গিয়ে বলল, অন্ধকার তো সবাই দেখতে পায়। অজগর চোখে দেখা যায় নাকি? ওদের অন্ধকার নিয়ে কিছু বলতে বলি। আলো নিয়েও। তাড়াতাড়ি হাত-পা ধুয়ে নাও। গিজারে গরম জল আছে।

'ই'-তে ইচ্ছে। শুক্লা নিশ্চয়ই 'ইচ্ছে'-র কথা জিগ্যেস করে ওর ছাত্রছাত্রীদের। ওরা কী বলে? একদিন ওর পড়ার ক্লাসটা দেখতে হয়।

'অ্যাই, তোর কী ইচ্ছে রে?' অনিকেতকে বাথরুমের মধ্যে কে যেন বলল। কেউ না। নিজেই। সাবানের ফেনার মধ্যে কতগুলো ইচ্ছে বুজকুড়ি কাটছে। সাবান-ফেনা ফাটছে। ইচ্ছে মরছে। 'তোমার স্পর্শে যদি এ শরীর জাগে'... তুমি যে হও সে হও কোনও দ্বিধা নেই—'শোব'। মোবাইলের অন্ধকারে শুয়ে আছে ইচ্ছে। থাক, এখন শুয়ে থাক। কিন্তু ওই মেসেজের শেষ-শব্দ 'শোব' উঠে আসে বারবার। অথচ বিকাশের ছেলেটা...

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে অনিকেত বলে, বিকাশের...

—না, এখন থাক।

শুক্লা একটা হাত সামনের দিকে এগিয়ে দেয়—রাস্তা পার হওয়ার সময় চলন্ত বাসের দিকে যেমন করে আমরা হাত দেখাই।

বলল, খেয়ে নাও আগে। আমি একটা-একটা করে রুটি সেঁকে দিচ্ছি। একদম গরম-গরম। ওলকপির ডালনা, আর চিকেন। তুমি আসবে বলে।

একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দৃশ্য। শুক্লা আলো, অনিকেত অন্ধকার। অন্ধকারের মতো অনিকেতও 'অ' দিয়ে শুরু।

এখন ওলকপির ডালনা খাবে অনিকেত। মৃত্যু-সম্পর্কিত কোনও কথা নয়। মাংস-সম্পর্কিত কথা বলল।

—আর একটু সেদ্ধ হলে ভাল হত গো। 'হ্যাঁগো'-'ওগো' তেমন বলে না অনিকেত। বলে ফেলল।

—এবার তা হলে তুমিও বুড়ো হচ্ছ, শুক্লা বলল, তুমি তো বেশি সেদ্ধ হওয়া মাংস পছন্দ করতে না।

—হুঁ। আগে টাইট মাংস পছন্দ করতাম। এরপর 'এখনও করি' বলতে গিয়েও চেপে গেল।

এবার মৃত্যুর কথা। বিকাশের ছেলেটির কথা। আদরের ছেলেটার কথা। অনিকেত বলে, বিকাশের ছেলেটার...

আবার হাতটা সামনে রাখল শুক্লা।

বলল—খুব খারাপ লাগে বলতে। এত ভাল ছেলেটা। জানো, বিকাশ ঠাকুরপোর বড্ড লোভ। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

এসব গ্রাম্যপ্রবাদ আজকাল শিক্ষিত মহিলারা বলে না। যেমন, 'যত হাসি তত কান্না—বলে গেছে রাম সন্না', কিংবা 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর...'। কিন্তু শুক্লা বলে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলে।

ছেলেকে নিয়ে কী না কী ভেবেছে।

—জানো, পুকাই লম্বা হচ্ছিল না বলে ওর গায়ে হাত তুলত। মারত। তা ছাড়া পুকাইয়ের কোচ বলেছিল, ওর ফুটওয়ার্ক না কী বলে, সেটা ভাল নয়, তাতেই কেমন যেন হয়ে গেল বিকাশ ঠাকুরপো। ছেলের সঙ্গে কথা বলত না, পারমিতার সঙ্গেও কথাবার্তা বন্ধ করে দিল। পারমিতা বেহালার কোন চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে মঙ্গলচণ্ডীর ডোর নিয়ে এল কয়েকটা। ছেলের হাতে ডোর বেঁধে দিল। এবার চুপ করল শুক্লা।

মন্টু একবার ওদের ঘরে সামনে দাঁড়িয়ে একটু কাঁচুমাচু স্বরে বলল, গ্যাস মুছে দিই?

—না, তোকে কিছু করতে হবে না। শুতে যা।

রান্নাঘরের কাজটাজ করে দেয় মাঝে-মাঝে। শুক্লা বলেছিল। ভালই তো। শুক্লা তো ওর সঙ্গে এখন যেভাবে কথা বলল, তার মধ্যে বিরক্তি মিশে আছে—অনিকেত বেশ বুঝতে পারল।

—হ্যাঁ বিকাশ, বিকাশের ছেলে পুকাই... শুক্লার এবারের হাতটা পুলিশের গাড়ি থামানোর মতো নয়, প্রাচীনা পিসিমা টাইপের। পিসিমাদের কাছ থেকে আমসত্ত্ব বা নাড়ু খাওয়ার বায়না করলে হাতটার পাঁচ আঙুল জোড়া করে সামনে রেখে যেমন বলতে চায়—'হ্যাঁ, হবে, হবে'—অনেকটা সেরকম।

একটা মৃত্যুর ধারাবিবরণী শুনতে চাইছে অনিকেত, আর শুক্লা সাসপেন্স দিয়ে যাচ্ছে। শুক্লা বলল, শোব।

'শোব' শব্দটা অনিকেতের মোবাইল-গহ্বর থেকে শিয়ালের ডাকের মতো নিঃশব্দ চিৎকার করে।

শোয়া হল। আলো নেভানো হল। পাশাপাশি। ওর উরুতে অনিকেত হাতটা রেখেছে, অনিকেতের মাথায় ওর হাত। এভাবে ভাই-বোনের মতো, টোনা-টুনির মতো, শুক-সারির মতো...। সেই কবে চড়াইপাখির খেলা দেখে, ওদের গায়ে ওঠাউঠি দেখে আমাদের ঠোঁট... পূর্ণিমা দেখে আমাদের হাত... শিমুল তুলো উড়ল বলে আমাদের মন...। আমাদের পূর্বকথা। পূর্ব-স্মৃতি বড় বেশি জ্বালাতন করে প্রতিবার। প্রতিবার ঘরে এসে পাশাপাশি শোয়ার মধ্যে শিমুল তুলো আসে, পদ্মবনের ঢেউ এবং অলি-ভ্রমর ইত্যাদি এসে জ্বালাতন করে।

অনিকেত শুক্লার উরুদেশে হাত রেখে বলে, তারপর?

—তারপর আর কী, ওষুধ খাওয়াচ্ছিল লম্বা হওয়ার জন্য, রিং, স্কিপিং—পারমিতা

বলেছে। লম্বা হচ্ছিল না। কী করবে, শরীর কী নিজের ইচ্ছেয় হয়?

বর্ণালী গড়াইয়ের কথা মনে পড়ল অনিকেতের। যে কিশোরীটির স্তন ছিল খুব গরিব। একটা স্তন বাড়ানোর মালিশ কিনতে গিয়ে ধর্ষিতা, পরে খুন। পূজা ঘোষালের কথা মনে পড়ল। মেয়েটা স্বাস্থ্যবতী ছিল। এ জন্য ওর কষ্ট ছিল, দুঃখ ছিল। মেয়েটা খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিল। বিজ্ঞাপনে দেখেছিল রোগা হওয়ার 'পিল' পাওয়া যায়। একসঙ্গে অনেকগুলো খেয়ে ফেলেছিল মেয়েটা। বাঁচেনি।

শরীর কি নিজের ইচ্ছেয় হয়? পাঁচ-পাবলিক যা বলে, মিডিয়া। কখনও 'স্তনভারে ঈষৎ ন্যুব্জ'-দেরই সুন্দরী বলা হত, ভাবা হত। খাজুরাহো-কোনারকের মন্দির গায়ের সুন্দরীরা সবাই পৃথুলা। এখন তো 'জিরো' ফিগার। পূজা ঘোষাল 'জিরো' ফিগার চেয়ে মরল, আর বর্ণালী?

—পারমিতা অনেক বোঝাত বিকাশকে, আমাকে বলেছিল পারমিতা—ও এজন্য থাপ্পড় খেয়েছে। জ্ঞান দিতে এসো না... এসব বলেছে। পুকাইটা ওদের স্কুল-টিমে চান্স পেল না। ওদের স্কুলের একটা ক্রিকেট টিম আছে। সাউথ পয়েন্ট, নব নালন্দা, ডিপিএস—এসব স্কুলের সঙ্গে খেলা হয়। পুকাই বাড়িতে জানায়নি। ও প্যাড-ট্যাড নিয়ে সকালবেলা বেরিয়ে যেত। বিকাশ ঠাকুরপো জানতে পারল যে...

অনিকেত শুক্লার শরীর থেকে হাতটা সরিয়ে নেয়।

—তারপর?...

—মোবাইলে ফোন করে জিগ্যেস করেছিল।

—তারপর?

—মেট্রোতে।

—ঝাঁপ!

—অপঘাতে মৃত্যু। তিন দিনে কাজ। আজ হয়ে গেল।

—গিয়েছিলে?

—পারমিতার সঙ্গে ছিলাম। ওরা গঙ্গায়...।

তিনদিন আগে শুক্লা জানিয়েছিল। এতটা বলেনি। খালি বলেছিল, বাড়ি এসো, বলব। ফোনে শুনেই অনিকেত জিগ্যেস করেছিল—মেরে ফেলেছে? কী যা-তা বলছ? নিজের ছেলেকে মেরে ফেলেছে?

ঠিকই তো বলছি—শুক্লা বলেছিল।

—তো, বিকাশ কোথায়? পুলিশ ধরেছে?

—শুক্লা বলেছিল, পুলিশ জানতে পারেনি যে বিকাশ ঠাকুরপোই মেরেছে।

—কী করে মারল? খুন?

—না, ছেলেটা সুইসাইড করেছে।

—কোনও সুইসাইড নোট ছিল?

—ওর পকেটে একটা নাকি কাগজ ছিল। ওখানে লেখা ছিল, আই অ্যাম ওয়ার্থলেস। নো রাইট টু লিভ। ব্যস।

—কী করে সুইসাইড করেছিল?

—বলতে ভাল লাগছে না। এলে বলব।

বিকাশের ফোন নম্বর ছিল। মোবাইলে করেছিল। সুইচ অফ ছিল। ল্যান্ডলাইন-এ পারমিতা ধরেছিল। 'আমি অনিকেতদা বলছি' বলতেই পারমিতা বলেছিল—'আমার কিচ্ছু বলার নেই।' ফোন ছেড়ে দিয়েছিল।

চাইবাসায় কলকাতার খবরের কাগজ আসে সন্ধের সময়। সন্ধের সময় গিয়ে কখনও কিনে আনে অনিকেত। দেখেছিল বটে একটা খবর—হেডলাইন ছিল—'আবার মেট্রোয় বিভ্রাট।' ভিতরে আত্মহত্যার ব্যাপারটা হয়তো লেখা ছিল কোথাও। পড়া হয়নি। মেট্রোয় যারা আত্মহত্যা করে, ওদের ওপর একটা বিরক্তিই পোষণ করত অনিকেত। আবার ঘণ্টাখানেক ট্রেন বন্ধ। ট্রেন-বিভ্রাটটাই আসল। যেন মৃত্যুটা কিছু নয়। ওই খবরের ভিতরে পুকাইয়ের নামটাও ছিল কি না, কে জানে? পুকাইয়ের ভাল নাম জানে না অনিকেত।

অনিকেত পাশ ফিরে শোয়। তাল-পাকানো মাংসপিণ্ড। হাত-পা-মাথা-পাকস্থলি সব দলা পাকিয়ে গিয়েছে। মাথা থেকে বেরিয়ে পড়েছে ঘিলু। মস্তিষ্ক। যে-মস্তিষ্কের মধ্যে কিছু উচ্চাশা ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। একটা দলা-পাকানো রক্তফেনা-মাখা বালক—যে সৌরভ গাঙ্গুলি হতে চেয়েছিল। ওর বাঁহাতে তখনও প্যাঁচানো ছিল লাল ইচ্ছের সুতো। মঙ্গলচণ্ডীর ডোর।

কেবল মুহূর্তের মৃত্যু। এই আমাদের জীবন। মৃত-ইচ্ছেরা অলৌকিক জলের তলায় প্রবালের মতো কণায়-কণায় জড়ো হচ্ছে। একদিন জলের ভিতর থেকে, জল ছিঁড়ে, ডুবো-পাহাড়ের মতো জেগে উঠবে মৃত-ইচ্ছের কালোপাহাড়।

তেষ্টা পায়। বিছানায় শুক্লা শুয়ে আছে। জানালার কাচ চুঁইয়ে এক ধরনের ম্যাদামারা আলো এসেছে ঘরে। কম্বল-মোড়া শুক্লা ঘুমোচ্ছে। ঠোঁট সামান্য খোলা। শুক্লা, তুমিও তোমার ইচ্ছে পুষেছ। ইচ্ছে মেরেছ। বোর্ডে 'ই'-তে ইচ্ছে লিখেছ। 'ঈ'-তে ঈশ্বর। 'ঈ'-টা তোমার 'ই'-টাকে প্রশ্রয় দিল না। এ নিয়ে তোমার কোনও ক্ষোভ নেই। তবু তুমি নিত্যনতুন তৈরি করে যাও। ইচ্ছের জন্ম দিয়ে যাও। এটাই জীবন। ক্রমাগত ইচ্ছে বিয়োনো, আর মৃত-ইচ্ছের জন্য সামান্য শোক।

বিছানা থেকে ওঠে। মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে ছাদে উঠে যায় অনিকেত। সিঁড়ি ক্রমশ উঠে যাচ্ছে। সিঁড়ি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। মহাপ্রস্থানের মতো সিঁড়ি। একসময় সিঁড়ি শেষ হলে হাহা ছাদের দরজা। বাইরে আকাশের এক কোণে গুটিসুটি মারা চাঁদ। কুয়াশা। কুয়াশাকেই তো 'কুহক' বলে। আকাশের তলায় শহর। ঘরে-ঘরে পোষা ইচ্ছে, রুগ্‌ণ ইচ্ছে, কোমায়। ইচ্ছের শব। মৃত পশুদের মতো আমাদের মাংস লয়ে আমরাও পড়ে থাকি ... যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায় হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এলো যাহাদের ডিশে তাহারাও তোমার মতন... মৃত মৃগদের মতো আমরা সবাই।

দেখা হলেই তো ছেলেটার কথা বলত। ওর বুদ্ধি, ওর দীপ্তি, ওর প্রতিভার কথা। সেই কবে ছোটবেলায় প্রশ্ন করেছিল, মেয়েদের 'গো গো' হয় কেন? ছেলেদের কেন হয় না? আবার এমন প্রশ্নও করেছিল : আপেল যদি মাটিতে পড়ে, চাঁদ কেন পড়ে না?

বিকাশ বলেছিল, জানিস অনি, পুকাই ক্যালকুলেটরে গুণ-ভাগ করে না। কুড়ি পর্যন্ত ওর নামতা মুখস্থ। এমনকী সতেরো, উনিশের নামতাও।

পুকাইয়ের জন্মদিনে একটা ‘সুকুমার সমগ্র দিয়েছিল অনিকেত। বিকাশ বলেছিল, ক্যাশ মেমো আছে? পাল্টে আনব। শচীনকে নিয়ে একটা ভাল বই বেরিয়েছে শুনলাম। অনিকেত বলেছিল, তুই কিনে দিস ওটা। আমি সুকুমার রায়ই দেব।

খুব বিচ্ছিরি লাগছে অনিকেতের।

ছেলেটার এই মৃত্যুর জন্য প্রতিশোধ নিয়ে ইচ্ছে করছে। দাঁতে দাঁত ঘষে। কীভাবে প্রতিশোধ নেবে? শীতের মধ্যে কাঁপে অনিকেত। কাঁপন। কাঁপনের গাঁড় মারি। মোবাইলটা পকেট থেকে বের করে। প্রথমেই মঞ্জুর মেসেজটা ‘ডিলিট’ করে দেয়। মঞ্জুর আরও কিছু মেসেজ ছিল, ‘ডিলিট’ শব্দটার পরে একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন থাকে। যতটা জোরে বোতাম টেপা উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি জোরে বোতাম টিপে ‘ডিলিট’ করতে থাকে। মেসেজ মুছে যাওয়ার করুণ শব্দ হয়।

এর বেশি প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা নেই অনিকেতদের। বড়জোর থুথু ফেলতে পারে। পেচ্ছাপও করতে পারে। ছাদের কোনায় দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করল, ভাসিয়ে দেব শালা। মধ্যরাত্রির কোনও গাড়ি হর্ন দিল। হর্ন নয়, প্যাঁক দিল।

পেচ্ছাপ করার পর যেন মনের ভার কিছুটা নেমে গেল। অনিকেত, অনিকেতদের মতো সাধারণ যারা, যারা বেঁচে আছে বলেই মুগ্ধ, ওরা গরমের দিনে সামান্য দখিনা সমীরণেই মুগ্ধ। বৈশাখী বৃষ্টির দু-চার দানা শিল পেলেই মুগ্ধ। কোষ্ঠ খোলসা হলে মুগ্ধ। পেচ্ছাপ করলেই মনের ভার নেমে যায়।

অনিকেত বিছানায় ফেরে। একটা ঘুম চাই। প্রগাঢ় ঘুম।

বিকাশের বাড়ি গেল। যেতে-যেতে বিকেল। বাড়িতেই ছিল। বউ অন্যথা। বেশ কিছুক্ষণ বেল টেপার পর খুলল। মুখে দাড়ি। অনিকেতের দিকে তাকিয়ে চোখটা নামিয়ে নিল।

বলল, ঘরে চল।

বিছানায় বসল। মদ খেয়ে আছে বিকাশ। অনিকেত বলল, পারমিতা কোথায়?

—বাপের বাড়ি।

—কবে ফিরবে?

—ফিরবে না বলেছে। আমি খুন করেছি। খুনির সঙ্গে থাকবে না।

—তুই তো আর ইচ্ছে করে... মানে, তুই কী করে জানবি... মানে তুই তো ভালর জন্যই... কথা গুলিয়ে যায়। কথা এলোমেলো হয়ে যায়।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। হাতটা সামনে তুলে ধরে। যেমন কতকাল শুক্লা করেছিল। অনিকেত চুপ করে যায়।

বিকাশ বলে—পুকাইকে নিয়ে স্বপ্ন ছিল। না, স্বপ্নদোষ ছিল। ওকে বুঝতে পারিনি। ও কিন্তু আমাদের বুঝেছিল। পকেটে কোনও কিছু লিখে রাখেনি। লিখতেই পারত আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমার বাপ। গান্ডু বাপ। লিখতেই পারত বাবার অত্যাচার সহ্য করতে না-পেরে আমি...। লিখতেই পারত। ও লেখেনি। ও যদি আমার সত্যিকারের ছেলে হত, যাকে বলে বীর্যজাত সন্তান, তা হলে এরকম করতাম? অ্যাডপ্টেড বলেই এরকম করেছি। ক্যাচ মিস করেছে—

খেলার পরই থাবড়া মেরেছি। স্ট্যাম্প করতে পারেনি—থাবড়া মেরেছি। মায়াটা শরীরে আসেনি। মনের ভিতরে একটা পোকা পুষে রেখেছি। ভেবেছি, একটা অনাথালয় থেকে বাচ্চা তুলে এনেছি, যার বাপের ঠিক নেই। আমি হলাম শালা উদ্ধারকর্তা বোকাচোদা। আমার সব সাধ মেটাতে হবে ওকে। ওকে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট হতে হবে—গিলক্রিস্ট। মাথা থাবড়ায় বিকাশ।

অনিকেত বলে—এভাবে ভাবছিস কেন? ওকে কত ভালবাসতিস, সেটা ভাব, কত খাবার এনে দিতিস।

—আমাকে পচাস না অনি, ভালবাসতাম? আসলে ইনভেস্ট করতাম। পরে সুদে-আসলে তুলে নেব বলে। ছেলে অ্যাডপ্ট না-করে যদি মেয়ে করতাম... তা হলে হয়তো এরকম করতাম না। ওকে তো গিলক্রিস্ট বানাতে চাইতাম না...।

—হয়তে পিটি উষা বানাতে চাইতিস তখন...

—না। পিটি উষা-ফুসা বানাতে চাইতাম না। ওখানে গ্ল্যামার নেই। পয়সা নেই। মডেল বানাতেও চাইতাম না—ঘরের মেয়ের 'মডেল' হওয়া মানতে পারতাম না। হয়তো গানটান শেখাতাম—

—লতা মুঙ্গেশকার করতে চাইলেও তো সমস্যা হত।

—না রে... একটু নরম গলায় বলল, বিকাশ। মেয়ে নিলে পারমিতার ইচ্ছেতেই মানুষ হত ও। ওর আমার মতো স্বপ্নদোষ নেই। মেয়ে নিয়ে অত উচ্চাশা আমারও হত না। মেয়ে তো...। ওই একটু গানটান... ঘরের কাজ... একটু না-হয় কম্পিউটার... ব্যস। বিয়ে দাও ভাল ছেলে দেখেটেখে। পারমিতা মেয়েই চেয়েছিল। আমিই জোর ফলিয়েছি। আমার 'মত' চাপিয়ে দিয়েছি।

অনিকেত বলে, তুই তোর ব্যাটাছেলেত্বটা চাপিয়ে দিয়েছিল। মানে, মর্দানিটা।

বিকাশ বলে, এবার তা হলে আমি কী করব বল?

অনিকেত বলে, আগে তুই বল পুলিশের খপ্পর থেকে কীভাবে ছাড়া পেলি?

বিকাশ বলল—পুলিশ ডেকেছিল। একজন বলল, এক সন্তান হওয়ার এই হচ্ছে ব্যাড এফেক্ট। জিজ্ঞাসা করেছিল বকাবকি করেছিলেন? আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম। বলেছিল, পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ করত? বললাম, মন্দ করত না। একজন বলল, আজকালকার ছেলেপিলেগুলো আজব। কখন যে কী করে বিশ্বাস নেই। কোমরের সার্ভিস রিভলবারটা টেবিলে দু'বার ঠুকে বলল, সবই মায়া। বলল, বাকি জীবনটা ঠাকুরের নাম করে কাটিয়ে দিন। থানা থেকে আমাকে হ্যারাস করেনি। একজন কনস্টেব্‌ল কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, হাজার পাঁচেক টাকা রেখে যান—ঝামেলা আছে তো, মর্গে পাঠাতে হবে, রিপোর্ট, তারপর হ্যান্ডওভার...।

পুড়িয়ে এলাম।

একটা বস্তায় কিছু থেঁতলানো ইচ্ছে। মরা ইচ্ছে।

—জানিস অনি, স্কুল টিমে চান্স না-পেয়ে আমার ভয়েই বাড়ি ফেরেনি। আমার জন্য। আচ্ছা, পারমিতা কি সত্যি ফিরবে না? আমার কি ওর কাছে ক্ষমা-টমা... তোর কী মনে হয়?

আমি বলি, ফিরবে। ঠিক ফিরবে। এখন ক'দিন চুপচাপ থাক।

শোক থাকলেও গৃহকর্ম থাকে।

শোক-বাড়ি ছেড়ে বেরতেই মঞ্জুর ফোন। ধরল না। দু'বার। এবার ইলেকট্রনিক্সের দোকান। আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন মাঝে। তবুও এসব দোকানে যেতে হয়। অল্প সময়ের জন্য কলকাতা আসা। বাড়ি, অফিস, বাজার, মঞ্জু, সংস্কৃতি—সবই সামলাতে হয়। একটা মাইক্রো আভেন কেনার কথা ভাবছিল অনিকেত। ওর অনেক বন্ধুর বাড়িতে এসে গিয়েছে। গরম করতে খুব সুবিধে হয়। শুক্লা খুশি হবে। একটা মাইক্রো আভেন কিনে নেয়। ভাল করে বুঝে নেয়। শোক-কে আগেই ডিউটিতে রূপান্তরিত করে দিয়ে এসেছিল। এবার ডিউটি-কে রূপান্তরিত করবে সুখে। সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে। ট্যাক্সিতে অনিকেতের কোলে মাইক্রো আভেন দোলে। সঙ্গে একটা স্যান্ডউইচ-মেকার ফ্রি।

—শুক্লা, মাইক্রো আভেন। গরম করার জন্য ঢালাঢালি করতে হবে না। ফ্রিজ থেকে সোজা মাইক্রো আভেন-এ বসিয়ে নব ঘুরিয়ে দাও। গরম হয়ে যাবে। কত কী রান্নাও করতে পারবে মাইক্রো আভেনে। ভাপা, পাতুরি, ডাল। বই দিয়ে দিয়েছে। দেখে নাও। এটা হল হাই, এটা লো, এটা মিডিয়াম। এটা হল টাইমার। যত বেশি জিনিস গরম করবে, তত বেশি টাইম লাগবে। ধরো, এক বাটি ডাল গরম করবে... শুক্লা বলে ওসব আমার দ্বারা হবে না। বরং মন্টুকে বুঝিয়ে দাও।

বলেই বলল—মন্টুও কি বুঝবে? ওর একটু বুদ্ধিসুদ্ধিটা কম। ওকে নিয়ে প্রবলেম আছে। আচ্ছা, আমরা দু'জনেই বোঝার চেষ্টা করি।

অনিকেত ডেমনস্ট্রেট করতে থাকে...। কিছুক্ষণ পর শুক্লা বলে—এসব যন্ত্রপাতি আমাদের কাজ না। মন্টু, বুঝে নে ঠিক করে।

অনিকেত বলে—যন্ত্রপাতি তো কী হয়েছে! এটা তো রান্না। রান্নায় স্টোভ জ্বালাতে না? পাম্প করতে না? ওসব তো যন্ত্রপাতিই ছিল। বাটনা বাটতে। এখন তো মিক্সি চালাও।

—মিক্সি তো চালাই বাটনা বাটার কাজ করতেই হবে বলে। কিন্তু এটায় অনেক অ্যাড্‌জাস্টমেন্ট। তারচে' বাবা গ্যাসে গরম করে নেওয়াই ভাল।

শুক্লাও ভাবে, মেশিনপত্র মেয়েদের জন্য নয়। তবে রান্নাবান্না, ঘরকন্না সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি হলে সেসব ব্যবহার করতেই হবে। মেয়ে কিনা, তাই। কম্পিউটার বা ক্যামেরা মেয়েদের জন্য নয়। গাড়ি? না-না, ওটা এমনি মেয়েরা চালাতে পারে না। যারা পারে, ওরা হেভি স্মার্ট।

অথচ মেয়েরা কি যন্ত্রপাতি চালায়নি? ঢেঁকি তবে কী? সুতলি ঘুরিয়ে কী আশ্চর্য কায়দায় তুলো থেকে সুতো বার করত—তাঁত বুনত—এখনও বোনে মেয়েরাই। যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মধ্যেও লিঙ্গ-বৈষম্য। স্কুটার মেয়েদের, মোটর সাইকেল ছেলেদের। লেদ মেশিন ছেলেদের, সেলাই মেশিন মেয়েদের। পৃথিবীর পোশাক তৈরির কারখানার শ্রমিক অধিকাংশই মেয়ে, পাটকলের শ্রমিক ছেলে। মেয়েরা সব আর্টস পড়ত আগে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া অন্য ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে মেয়েরা খুব একটা যায় না। অথচ বাড়ির যন্ত্রপাতিগুলি মেয়েরাই চালায়। অনেক বাড়ির ব্যাটাছেলেরা ওয়াশিং মেশিনের কোন বোতাম কী কাজে ব্যবহার করা হয়, জানে না। যন্ত্রপাতির ভিতরে তো হরমোন-টরমোন নেই। লোহা-পেতল-প্লাস্টিক-নাট-বল্টু

স্প্রিং। যন্ত্রপাতির মধ্যে তো টেস্টোস্টেরন-ইস্ট্রোজেন নেই, অথচ যন্ত্রপাতিরও লিঙ্গ আছে। কম্পিউটার যেন একটা অর্ধনারীশ্বর। ছেলে-মেয়ে সবার জন্যই। শুধু যন্ত্রপাতি কেন? একটা ব্যাগেরও লিঙ্গ আছে। নইলে বলে কেন এটা লেডিজ ব্যাগ? লেডিজ ছাতা? লেডিজ ছাতা 'ছোট' হয় কেন? বৃষ্টি কি মেয়েদের শরীরে কম পড়ে? লেডিজ পার্স ছোট। বড় রোজগেরে মেয়ে হলেও পার্সটা ছোট। মেয়েদের কি শীত কম লাগে? কিন্তু গরমচাদরটা ছোট।

একটু 'ছোট-ছোট' হওয়াটাই কি মেয়েলি নাকি? গড়পড়তা মেয়েরা গড়পড়তা ছেলেদের চেয়ে লম্বায় ইঞ্চি তিনেক ছোট। তাই বলে সব কিছু ছোট হয়ে যাবে? ছাতা কেন ছোট হবে? —কমনীয়তাই হল মেয়েলিত্ব। পেলবতা। যন্ত্রপাতিগুলোও তেমন আর ম্যাসকিউলিন থাকছে না। আগেকার ভারী মোটা-মোটা ফ্রিজ আর আছে? কী সুন্দর স্লিম-ট্রিম। হোঁতকা মিক্সিও কত ছোট হয়ে গিয়েছে। জেনারেটরও। সাবমার্সিবল পাম্প-ও কেমন ফেমিনিন হয়ে যাচ্ছে...।

শুক্লা ইতিমধ্যে গরম করে ফেলেছে ডাল, ডিমের ডালনা।

বলল, না গো, তেমন কঠিন কিছু নেই। শুক্লা খুশিই হয়েছে, নইলে 'গো' বলত না এখন।

তারপর বলল, স্যান্ডউইচ-মেকার'টাও কাজে দেবে। কিছু নয় তো ঝামেলার। পাউরুটি ভরে চেপে দিয়ে সুইচ 'অন' করে দাও। হয়ে গেলে নিজেই 'অফ' হয়ে যাবে। দেখতে খুব সুন্দর।

অনিকেত বলল, যেন একটা মেয়ে, তাই না?

শুক্লা বলল, ঠিক বলেছ। কিন্তু স্লিম। হ্যান্ডেল দু'টো যেন পা। ভালই হয়েছে। মন্টুকে স্যান্ডউইচ করে দেব। মন্টুটার জন্য এত করি অথচ...

—অথচ কী?

—পরে বলব। বিকাশ ঠাকুরপোকে কেমন দেখলে?

একেই ঘরকন্না বলে। সুইসাইড ও স্যান্ডউইচ সব মিশে যায়।

আসলে, এই বাড়িটা একটা এনজিও-র ভেনু হয়ে গিয়েছে। এই যে লেখাপড়া শেখানো, ছাত্র জোগাড় করা—এসব শুক্লা একা করতে পারেনি। কল্পনা মৈত্র নামে একজন ভদ্রমহিলার অবদান। এখন ইচ্ছে হলেই হয় না। কেউ যদি ভাবে 'দরিদ্রনারায়ণ ভোজন' করাবে—সল্টলেকে—দরিদ্রনারায়ণ পাওয়াই যাবে না। বিনে পয়সায় সংস্কৃত শেখাতে চাইলেও ছাত্র পাওয়া যাবে না। সাক্ষরতা দিতে চাইলেও সাক্ষরতা নিতে আসার লোক যে থাকবেই, সেরকম কোনও গ্যারান্টি নেই।

কল্পনা মৈত্র-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল শুক্লা। ছোট-ছোট চুল, ভ্রু ছাঁটা,

স্লিভ্‌লেস—। ইনি এই অঞ্চলে ফ্ল্যাট কিনে নতুন এসেছেন। শুক্লার সঙ্গে আলাপ এখানেই, একটা বাজারে। তিনটে বাচ্চাকে জিলিপি খাওয়াচ্ছিল শুক্লা, শুক্লা নাকি বলছিল : যত খুশি খা... তাই দেখেই ওঁর মনে হয়েছিল এঁকে দিয়ে হবে...।

জিলিপির ব্যাপারটা শুক্লা বলেছিল, তিন-চারটে বাচ্চাকে নিয়ে একটা লোক মাদারি-কা-খেল দেখাচ্ছিল। এই অঞ্চলে এখনও একটু-একটু ফাঁকা জায়গা ফ্ল্যাটবাড়ি হওয়ার অপেক্ষায় রয়ে গিয়েছে। ওখানেই খেলা দেখাচ্ছিল। দু'টো বাঁশের ওপর দড়ি খাটিয়ে একটা চাকার ওপর কী সুন্দর ব্যালান্সের খেলা দেখাচ্ছিল একটা বাচ্চা মেয়ে। একটু দেখলাম। তারপর অন্য কাজ সেরে ফিরছি, দেখছি—একটা চায়ের দোকানের সামনে লোকটা চা খাচ্ছে, আর বাচ্চাগুলো দাঁড়িয়ে আছে, পিছনেই জিলিপি ভাজা হচ্ছে। আমি হঠাৎ ওদের জিগ্যেস করি, জিলিপি খাবি? প্রথমে ওরা কিছু বলে না। অবাক চোখে তাকায়। আবার বলি, তিনটে ঘাড়ই একসঙ্গে বেঁকে যায়।

কল্পনা বলেন—তখনই যেচে আলাপ করি।

শুক্লা বলে—আচ্ছা, যে তিনটে মেয়েকে দিয়ে লোকটা খেলা দেখাচ্ছিল, তিনটেই কি ওর মেয়ে?

কল্পনা বলেন, আই ডোন্ট নো। পসিবলি নো। ওর নিজেরও দু-একটা হতে পারে। তবে ওরা জোগাড় করে। অন্যদের থেকে নেয়, ট্রেনিং দেয়, গার্জিয়ান'কে টাকা দেয়। তবে ওদের একটা 'ক্ল্যান' আছে। ওরাই এসব করে।

শুক্লা বলে, বড় হলে ওই মেয়েগুলোর কী হবে?

কল্পনা ঠোঁটটা উল্টে বলেন, তা-ও জানি না। কত কিছুই যে জানি না...

কল্পনা মৈত্রর এনজিও-টার নাম 'আলো'। পুরো নাম হল 'অ্যাডিশনাল লিটারেসি অফারিং'। বিভিন্ন ধরনের লিটারেসি প্রোগ্রাম আছে ওঁদের। রেড লাইট এরিয়াতেও কাজ করে। ওদের আলাদা প্রাইমার।

অনিকেতের মনে হল, ওটা আবার কেমন? 'ক'-এ কনডোম না কি?

প্রথম আলাপে অতটা প্রগলভ হল না। তবে কল্পনা নিজে থেকেই বললেন, ক'এ কাকাতুয়ার চেয়ে কাক ওদের কাছে কাছের। চেনা। ছোটবেলা থেকেই ওরা 'খদ্দের' বোঝে। 'গ'-এ গান। গান করতে বলি, যে যেমন পারে। লেখাপড়াটাকে এন্টারটেনমেন্টের মধ্যে মিশিয়ে দিতে পারলে—সেটা আনন্দদায়ক হয়ে উঠে। আর 'লিটারেসি' মানে তো শুধু অক্ষর-জ্ঞান নয়, নাম সই করতে পারা নয়, একটা পজিটিভ ভ্যালু তৈরি করে দেওয়া।

অনিকেত ফান্ডিং-এর কথা জিগ্যেস করেছিল। ভদ্রমহিলা ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন।

বললেন, সামান্য কিছু আসে এধার-ওধার থেকে। শুক্লা কিছু টাকাপয়সা পায় না।

অনিকেত বলেছিল, ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হল সান্‌সা মাল। পয়সাকড়ি ঠিকই ম্যানেজ করছেন। অথচ তুমি কিছুই পাচ্ছো না।

শুক্লা বলল, আনন্দ পাচ্ছি কিন্তু। নানারকম আনন্দ। গরু সম্পর্কে বলতে বলেছি, একজন বলল, গরুর স্বামীর নাম ষাঁড়। কী-কী করতে নেই জিগ্যেস করায়—সবাই যেমন বলে চুরি করতে নেই, লোভ করতে নেই, নেশা করতে নেই... তেমনই বলছে সব। একটি ছেলে বলল, মা-বাবার ঝগড়া শুনতে নেই।

আমি তো পড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে ভাবা প্র্যাকটিস করাই। ঈশ্বর নিয়ে কে কী ভাবছে জিগ্যেস করেছি। একজন কাগজকুড়োনি ছেলে কী বলেছিল শুনবে? আমরা হলাম নোংরা কাগজ। সব নোংরা কাগজ গালিয়ে সাদা কাগজের রিল হয়। ওটা ভগবান। কাগজ টুকরো-টুকরো হয়, নোংরা লাগে, সেটা মানুষ। বোঝো, কত বড় কথা। মানুষ থেকেই ভগবান, আর ভগবান থেকেই মানুষ—কী সহজভাবে বলেছিল। আর একজন মা বলেছিল—ঈশ্বর হল দাঁত ব্যথার মত। যখন বিপদে পড়ি, খুব ডাকি, পরে ভুলে যাই।

এত আনন্দ নিয়ে পড়াচ্ছে শুক্লা, আগে কোথায় যেন ক্লাস হত সেখান থেকে তুলে বাড়ির ছাদে তুলে নিয়ে এল, অথচ আজ কেন এমন কথা বলছে?

—বাড়িতে ক্লাস করিয়ে বোধহয় ভুল হল—শুক্লা বলল।

—কেন? কী হয়েছে?

—শুক্লা চুপ।

—চুরি-টুরি হয়েছে কিছু?

—না।

—বাড়ি নোংরা করছে বুঝি?

—না-না, ওসব কিছু নয়।

—কী তবে?

—বলছি। আমাকে বোকো না। কারণ জোরাজোরি করে মন্টুকে আমিই এনে রেখেছি এখানে। সেই মন্টু আমার সঙ্গে 'বিট্রে' করেছে। একদিন সিঁড়ির তলার ঘরে একটা রিকশাওলার সঙ্গে দেখে ফেলেছি। একদম হাতেনাতে। ছিঃ?

—কী দেখেছ?

—আমি সেটা বিতাং করে বলতে পারব না। বাপের স্বভাব যাবে কোথায়? এর আগেও দু-একটা ব্যাপারে সন্দেহ হয়েছিল আমার। সেদিন যা দেখলাম...। ওকে ওর বাড়িতে ফিরে যেতে বলব আমি।

—কিন্তু ওর বাড়ি কোথায়? কে আছে ওর?

—সেজন্যই তো নিয়ে এলাম। ভেবেছিলাম, ভাল করে মানুষ করব।

—পড়াশোনা কেমন করে?

—সে যাই করুক। কিন্তু এই 'স্বভাব' তো যাবে না। তুমি হয়তো বলবে ইগ্‌নোর করো। আমি এ ব্যাপার ইগনোর করতে পারব না। আমি চেয়েছিলাম...

অনিকেত ভাবল ও বলবে—ছেলেটা ঘরের কাজ করে দিচ্ছে, চুরিটুরি করে না। শান্ত স্বভাবেরই ছেলে। একান্ত ব্যক্তিগতভাবে যা করছে, ওতে যদি তোমার কোনও ক্ষতি না-হয়, বা কারও কোনও অসুবিধে না-হয়, তা হলে কেন এত আপত্তি। সঙ্গের ছেলেটি রিকশাওলা বলে? রিকশাওলা না-হয়ে যদি স্কুলের ফার্স্ট বয় হত?

কিন্তু বলতে পারল না। চুপ করে রইল। নিজের মধ্যেই একটা কাঁটা আছে। ভদ্রলোক মধ্যবিত্তদের অন্তঃপুরের চৌকাঠে আগল থাকে। অনিকেতের মধ্যেও আছে। মন্টুকে ও বাড়িতে আনতে চায়নি। তখন মহত্ত্ব দেখাতে পারেনি, যেটা শুক্লা দেখিয়েছিল। আসলে শুক্লার মধ্যে যে জমে থাকা, খরচ না-হওয়া বাৎসল্য পড়ে রয়েছে, বাচ্চা মানুষ করার জৈব রসায়ন রক্তের

ভিতরে খেলা করছিল চুপে, তারই একটা প্রয়োগ—ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল—মন্টু। শুক্লার নিজের সন্তান থাকলে মন্টুকে ঘরে তোলার কোনও প্রশ্ন থাকত না। এখন মন্টুকে সরাতে চাইছে শুক্লা। মন্টুকে সরানোর একটা ইচ্ছে ওর ভিতরের মনে অবদমিত ছিল। ইচ্ছেটা বাইরের মনে এল, কিন্তু ইচ্ছেটা ইচ্ছেকুসুম হয়ে ফুটে উঠল না। খুব পুলকিত হয়ে যদি বলত—'ঠিক আছে, বেশ তো, ওকে বিদেয় করে দাও'—তা হলে শুক্লার কাছে যেন ও একটু লঘু হয়ে যেত। তাই অনিকেতও চুপ করে রইল। ভাবছিল কী বলবে। এতদিনের একটা সম্পর্কের মধ্যেও কত ভাঁজ, কত আলো-অন্ধকার, কত অভিনয়। অনিকেত মুখটা এমন করে রেখেছে যেন মন্টুকে সরাতে ওর মন চাইছে না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছে, ঝামেলা হঠানোর একটা সুযোগ এসে গিয়েছে। অনিকেত ভাবে—শুধু দু'জনের সম্পর্ক কেন? নিজের মধ্যেও কতগুলো খোপ। এই যে অনিকেত এলজিবিটি নিয়ে এত কনসার্ন, এটা কতটুকু সহানুভূতি, কতটাই বা অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট? সংখ্যালঘু যৌন-মানসিকতার মানুষগুলোকে বুঝতে চেয়েছে, জানতে চেয়েছে। যেমন জানতে চায় মাটি-চাপা বেড়াচাপার ইতিহাস, কিংবা স্ফটিকের স্বচ্ছতা বা কয়লার অস্বচ্ছতার রহস্য। সেই কবে, চাকরি করতে গিয়ে, ঘটনাক্রমে কিছু মাটি-চাপা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সেই থেকে আস্তে-আস্তে এই জগতের মধ্যে ঢুকে যাওয়া। কিন্তু শরীরে লাগিয়েছে হাঁসের পালক। যেমন বেণি তেমনি রবে বেণি ভিজবে না।

মন্টুকে নিয়ে টুকটাক অশান্তির কথা আগেও বলেছিল শুক্লা। বলেওছিল, ওকে নিয়ে একই সন্দেহ হচ্ছে। স্কুলের একটা ছেলেকে নিয়ে আসে, বলে একসঙ্গে পড়া করছে। দরজা বন্ধ করে কেন?

—বলো কী করব? শুক্লা বলল।

অনিকেত বলল, ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে ওর যে-জ্ঞাতিরা আছে, ওকে খাটাবে। একবার তো মেরে ফেলারও চেষ্টা করেছিল। ওকে বলতে হবে সাবধানে থাকতে। একটা কাজের ব্যবস্থা যদি করে দেওয়া যায়...। রাত্রে নয় পড়বে। তুমি পড়াবে না যদি তোমার কাছে পড়তে আসে?

শুক্লা বলল, ওমা, পড়াব না কেন? পড়াব, বইপত্র কিনে দেব, জামা-প্যান্ট দেব। কিন্তু বাড়িতে রাখব না।

অনিকেত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে থাকে। ওকে কোথায় পুনর্বাসন দেওয়া যায়—সেটার চেয়েও বেশি করে ভাবতে লাগল—এই স্বভাব কি দুলালের কাছ থেকেই পেয়েছে?

তা হলে তো ভেবে নিতে হয়, ও দুলালের ঔরসজাত? তবে যে দুলাল বলেছিল মন্টু ওর সন্তান নয়? সন্তোষ মহাজনের সন্তান?

ধরে নেওয়া গেল, দুলাল ঠিক বলেনি। মন্টু দুলালেরই সন্তান। দুলালের একটা ক্রোমোজোম বহন করছে। তা হলে তো মেনে নিতে হয় সমকামিতা বংশগত।

প্রথমে তো জানতে হবে, মন্টু কতটা সমকামী? ওর চলনে-বলনে কিছুটা মেয়ে-মেয়ে 'ভাব' আছে ঠিকই, এমনও তো হতে পারে, মন্টুর ওই ব্যাপারটা বয়ঃসন্ধির কৌতূহলমাত্র। বয়ঃসন্ধিতে অনেক ছেলে তো ছেলেদের সঙ্গেই গোপন-খেলা খেলে। সে রকম নয়তো? হতেও পারে। কিন্তু এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় না অনিকেত। শুক্লা যা বলেছে, যা ভাবছে তাই : ও ব্যাটা সমকামী।

মন্টু রে, তুই তোর এই স্বভাব বাপের কাছ থেকেই পেলি?

চাইবাসা বেতার কেন্দ্রে ইন্টারনেট আছে। অনিকেত মাঝেমধ্যেই ঘাঁটাঘাঁটি করে নেট।

দেখল, সমকামিতা-র কারণ 'জিন' এরকম একটা ধারণা অনেকদিন ধরেই ছিল। ওই কাল্পনিক 'জিন'-টার নাম দেওয়া হয়েছিল 'গে' জিন। ১৯৯১ সালে একটা বড় ধরনের গবেষণা হল আমেরিকায়। বিজ্ঞানী বেয়ি এবং পিলার্ড 'আইডেন্টিক্যাল টুইন্স'-দের নিয়ে কাজ করলেন।

'আইডেন্টিক্যাল টুইন্স' হল মনোজাইগোটিক টুইন। একটি ডিম্বাণু এবং একটি শুক্রাণু নিষিক্ত হয়ে একটি 'জাইগোট' তৈরি করল। কোনও কারণে এটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে দু'টি আলাদা 'জাইগোট' তৈরি হয়ে দু'টি আলাদা স্যাক-এ বাড়তে থাকে, ভ্রূণ তৈরি হয়। ওদের 'ক্যারিওটিক টাইপ' এক। জিনেটিক উপকরণও এক। একই তো ছাঁচ। যে যমজ দু'টি জন্মাল, ওরা একইরকম দেখতে হয়। যদি ছেলে হয়—দু'টি একইরকম দেখতে ছেলে।

স্কুলে যখন পড়ত, ছনি-মনি দু'ভাই ছিল। একইরকম দেখতে। একই ক্লাসে পড়ত। স্যররাও ভুল করত। শেক্সপিয়র 'আইডেন্টিক্যাল টুইন্স' নিয়েই তো 'কমেডি অফ এরর' লিখেছিলেন। বিদ্যাসাগর সেটার অনুবাদ করেছিলেন 'ভ্রান্তিবিলাস' নাম দিয়ে। সিনেমাও হয়েছিল। একইরকম দেখতে দুই বাবু। উত্তমকুমারের ডাব্‌ল রোল। একইরকম দেখতে দুই চাকর। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ডাব্‌ল রোলে। এরা 'আইডেন্টিক্যাল টুইন্স'। বাংলায় কী বলা যায়? সদৃশ যমজ? ছনি'র ঠান্ডা লাগলে মনি'রও ঠান্ডা লাগত। ছনি-মনি দু'জনই অঙ্কে কাঁচা ছিল। ছনি-মনি দু'জনেই মোটা ছিল। আইডেন্টিক্যাল টুইন্স'দের স্বভাবচরিত্র একইরকম হয়। কিন্তু ছনি ভাল ব্যাট করত ক্রিকেটে। খুব ছক্কা মারত, কিন্তু মনি অত ভাল ব্যাট করতে পারত না। তার মানে— একটু-আধটু অমিলও হয়।

আবার যদি কোনও কারণে ওভারি থেকে একটির বদলে দু'টি ডিম্বাণু ফ্যালোপিয়ান বেয়ে নামতে থাকে, এবং দু'টি শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত হয়ে যায়—তবে দু'টি আলাদা 'জাইগোট' তৈরি হবে। এ ক্ষেত্রে তিনটে সম্ভাবনা থাকে। দু'টিই ছেলে হতে পারে, দু'টিই মেয়ে হতে পারে, আবার একটি ছেলে আর একটি মেয়েও হতে পারে। এরা নন-আইডেন্টিক্যাল টুইন্স। এদের জিন-সজ্জা আলাদা।

সদৃশ যমজ, বা আইডেন্টিক্যাল টুইন্স'দের নিয়ে জড়িয়ে পড়লেন গবেষকরা। যেহেতু ওদের একইরকম জিন। ১৯৯১ সালে রিচার্ড পিলার্ড বেয়ি-কে সঙ্গে নিয়ে একটা বড় প্রোজেক্টে হাত দিলেন। পিলার্ড নিজেই ছিলেন সমকামী। ওঁর ভাইও সমকামী ছিলেন, এবং আশ্চর্য, বোনও। ওঁর মনে হতেই পারে, বংশধারার মধ্যে সমকামিতার কারণ কোথাও লুকিয়ে আছে।

'মনোজাইগোটিক টুইন্স' জোগাড় করা সহজ নয়। সারা দেশ জুড়ে শ'দেড়েক এরকম যমজ পেয়েছিলেন। এরাই ছিল ওঁর স্যাম্প্‌ল। দেখা গেল—সদৃশ যমজদের একজন সমকামী হলেই অন্যজন সমকামী হচ্ছে না। কেউ-কেউ অবশ্য হচ্ছে। ওঁর গবেষণাপত্রে দেখিয়েছিলেন, যমজদের একজন সমকামী হলে ৫২ শতাংশ ক্ষেত্রে অন্য ভাই সমকামী হচ্ছে।

এরপর ১৯৯৪ নাগাদ বেইলি, ডাগে এবং মার্টিন অস্ট্রেলিয়াতে ৪৯০টা যমজ নিয়ে গবেষণা চালালেন। ওঁরাও শতকরা ২৪ জনের বেশি পেলেন না। 'গে' জিন-এর তত্ত্ব তবু মরল না। ২০০২ সালে জার্মানির বিয়ারম্যান এবং ব্র্যাক্‌ম্যান ওই গবেষণাগুলোর পদ্ধতির সমালোচনা

করলেন। বললেন, ওঁদের স্যাম্প্‌লিং মেথড ঠিক ছিল না। উনি আরও বড় স্যাম্প্‌ল সাইজ নিয়ে কাজ করলেন। শেষ পর্যন্ত যে-ফল পেলেন, সেটাও ওঁদের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারল না। ওঁরা দেখলেন, আইডেন্টিক্যাল টুইন্স'দের একজন সমকামী হলে শতকরা মাত্র সতেরোজন অপর যমজ সমকামিত্বের কথা জানাচ্ছে। এরপর 'গে' জিন তত্ত্বটা ফিকে হয়ে গেল। গুরুত্ব কমে গেল।

জিনের গণ্ডগোলের জন্য—লিঙ্গগত ত্রুটি হতে পারে, টার্নার বা ক্লাইনেফেল্টার সিন্‌ড্রোম—এসব হতে পারে, ছদ্ম-উভলিঙ্গত্বও হতে পারে। কিন্তু যাদের ওসব কিছু নেই, পরিষ্কার ৪৬xy পুরুষ বা ৪৬xx নারী—তাদের সমকামিত্বের কারণও জিনের মধ্যেই আছে—এই তত্ত্ব দুর্বল হয়ে পড়ল। ২০০০ সালেও কাজ হল সুইডেনে। স্যাম্প্‌ল-রা যাতে সত্যিকথা মন খুলে বলতে পারে, সেরকম ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এতেও সেই একই ফল। দেখা গেল, ৩০ শতাংশ সমকামিতার ক্ষেত্রে 'জিন'-কে দায়ী করা যেতে পারে। তা হলে বাকি ৭০ শতাংশ কার কারসাজি?

ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট, বার্কলে, হার্ভার্ড, সেন্ট লুইস ইউনিভার্সিটি এনিয়ে হাজার-হাজার ঘণ্টা কাটিয়েছে। হদিশ দিতে পারেনি।

ডিন হ্যামার একটা বিরাট কাজ করলেন। উনি হার্ভার্ড-এর ডক্টরেট। একজন চলচ্চিত্র পরিচালকও। মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই বিশ্বজোড়া খ্যাতি। উনিও সমকামীদের নিয়ে কাজ শুরু করলেন ১৯৯৩ সালে। ওঁর স্যাম্প্‌ল-এ ৭৬ জন পুরুষ সমকামী নিলেন। তাদের বাবা, কাকা, মামা এদের সঙ্গে কথা বললেন। দেখলেন, কোনও সমকামী ছেলের সমকামী কাকার চেয়ে সমকামী মামা বেশি হয়। মানে 'গে'-দের 'গে'-কাকা, জ্যাঠার চেয়ে 'গে'-মামা বেশি।

৭৫ জন 'গে'-র ১৭ জন 'গে'-মামা আছে, কিন্তু মাত্র ৬ জন 'গে' কাকা-জ্যাঠা আছে। এরপর আরও বড় স্যাম্প্‌ল সাইজ নিয়ে কাজ হল। একই রেজাল্ট। এই পরীক্ষা থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়—যদি সমকামিতার কারণ জিন-ই হয়, সেই জিন বাবার দিক থেকে আসে না, মা'র দিক থেকেই আসে। যাব্বাবা!

মা'দের y ক্রোমোজোম থাকে না। দু'টোই x ক্রোমোজোম। বাবাদের একটা x একটা y। যদি মা'দের দিক থেকেই সমকামিতা আসে, তা হলে y ক্রোমোজোম থেকে আসে না। x থেকেই আসে।

y-এর তুলনায় x ক্রোমোজোম একটু বড়। y-তে ৫০ মিলিয়ন বেস পেয়ার, ২৫১টা জিন। x-এ ১৫৩ মিলিয়ন বেস পেয়ার, ১১৬৮টা জিন থাকে। ডিন হ্যামার এবার x ক্রোমোজোম নিয়ে পড়লেন। চল্লিশ জোড়া 'গে'-র x ক্রোমোজোম বিশ্লেষিত হল। দেখলেন ৩৩ জোড়ার x ক্রোমোজোমের বিশেষ অংশে একটু বিশেষত্ব আছে। জিনেটিক্স-এর ভাষায় ওই বিশেষত্বকে বলে 'অ্যালেলস'। এ জায়গাটার নাম xq২৮। এখানে ৮ মেগাবাইটের মতো 'জিনেটিক ইনফরমেশন' থাকে। এই কাজ এগিয়ে চলল। কিন্তু কানাডাতে এই পরীক্ষা আবার হল। ডিন হ্যামার ৪০টি স্যাম্প্‌লের মধ্যে ৩৩টিতে একই ধরনের বিশেষত্ব বা 'অ্যালেলস' দেখেছিলেন, যা শতকরা ৮২ শতাংশে দাঁড়ায়। কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে শতকরা ৫০-এর এদিক-ওদিক রেজাল্ট এল। সুতরাং xq২৮ তত্ত্বটার পক্ষেও জোর করে কিছু বলা গেল না, কিন্তু তত্ত্বটা রয়েই গেল খারিজ হল না। রাশিয়াতে মাসটান্‌সকি হ্যামারের নির্দেশিত গবেষণা আর একটু

সূক্ষ্মভাবে করে x ক্রোমোজোমের মধ্যে আর একটা অঞ্চলের কথা বললেন। নাম দিলেন zq36। কিন্তু এগুলো আবিষ্কার নয়। তত্ত্ব। হাইপোথিসিস।

জিনের মধ্যে যদি সমকামিতার বীজ না-পাওয়া যায়, তবে কি মাথার মধ্যে আছে? চলল চুলচেরা নয়—মাথাচেরা গবেষণা।

সাইমন লেভি, একজন আমেরিকান স্নায়ুবিজ্ঞানী এইড্‌স-এর কারণে মৃত সমকামীদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করতে থাকলেন। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের পিছনে কিছু গ্রন্থি আছে। চালের দানার সাইজের একটা গ্রন্থির ডাকনাম SCN। ভাল নামটা বেশ বড়। Supra Chiasmetic Nucleus। ডাকনামে ডাকাই ভাল। ১৯৯০ সালে অধ্যাপক সোয়াব বলেছিলেন, মেয়েদের SCN-এর আয়তন ছেলেদের দ্বিগুণ, আবার সমকামী পুরুষদের SCN-এর আয়তন বিষমকামীদের তুলনায় অনেক বড়। সাইমন লেভি'র পরীক্ষা ওই তত্ত্বকে সমর্থন দিল। SCN-এর একটি অংশ আছে, যার ডাকনাম inah৩। এই অংশটি যৌন-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। সমকামী পুরুষদের মধ্যে ওই অংশটির একটি বিশেষত্ব শনাক্ত করেছেন।

তা হলে মন্টুর ব্যাপারটা জন্মগত-ই এমন কোনও কথা নেই। যদি ধরে নেওয়া যায় ও দুলালের সন্তান এবং যদি ধরে নেওয়া হয় সমকামিতা বংশগত; তা হলে ডিন হ্যামারের তত্ত্বানুযায়ী, x ক্রোমোজোমটা এসেছে মা-র দিক থেকে। যদি জিনে না-থাকে তবে কি মাথায়? যেখানেই থাক, সমকামিতা 'বায়োলজিক্যাল হার্ডওয়ার্ড'। 'বায়োলজিক্যালি হার্ডওয়ার্ডেড' সমকামীরা ছাড়া কিছু আচরণগত সমকামীও থাকে। যেমন, জেলখানার বন্দিরা। বন্দিদশায় ওরা সমকামী হতে পারে, কিন্তু ছাড়া পেলে ওরা বিষমকামী হয়ে যায়। হোস্টেল জীবনেও হয়। এরা আচরণগত সমকামী। আবার কোনও-কোনও পুরুষ তো লন্ডা, হিজড়ে, নাগিন—এদের সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক করে ওদের পুরুষ ভেবে নয়—নারী ভেবে। মানে, নারী নয় জেনেও, মনে-মনে নারী ভেবে। এমনও তো হতে পারে, মন্টু 'বায়োলজিক্যালি হার্ডওয়ার্ডেড' নয়। ব্যাপারটা সাময়িক ছিল। কৈশোরের দুষ্টুমি। সে হোকগে যাক। অনিকেত ঠিক করেছে, সামনের সপ্তাহে গিয়েই ও একটা অনাথ আশ্রমের সঙ্গে কথা বলবে। মন্টুকে একটা অনাথ আশ্রমে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। ওর অংশের যে-জমিটা রয়েছে, সেটা যেন ওর কাকা হজম করে নিতে না-পারে, সেটাও দেখতে হবে। কোনও উকিলের সঙ্গে কথা বলা দরকার। কত যে কাজ। কাজ আর কাজ। এদিকে মঞ্জুও মেসেজে 'কাঁপন'-সিরিজ পাঠিয়ে চলেছে। 'বয়স যত বাড়ে তত বয়স খসে পড়ে। শরীর আগে স্পর্শ করো পেমের কথা পরে।' হ্যাঁ, ওটা 'পেম'-ই। ইংরেজি টাইপে R-টা বাদ চলে গিয়েছে। অনিকেত জানে, বেশির ভাগ প্রেমেই একটু-না-একটু খুঁত থাকে; এখানে যেমন R নেই। P বাদ গেলে 'রেম' হত আর কী!

এক ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল। বিজয় লামা। ওঁর সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল। রানাঘাটে 'নীহারিকা' নামে একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন উনি। উনি বলেছিলেন, বারবনিতাদের ছেলেমেয়েদের উনি লেখাপড়া শেখান, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। উনি নেপালি। মুম্বইতে চাকরি করতেন, ব্যাঙ্কের অফিসার ছিলেন। খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে জনসেবার কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তারপরে এধারে ফিরে এসে আশ্রমটা গড়ে তোলেন। রানাঘাট-শান্তিপুর অঞ্চলে বারবনিতা এলাকা আছে। ওদের ঘরের ছেলেরা অনেকেই অপরাধ জগতে জড়িয়ে যায়, মেয়েরা মা'র পেশা গ্রহণ করে। ওদের ছেলেমেয়েদের সমাজের মূল

স্রোতে নিয়ে আসার জন্য তাঁর এই চেষ্টা।

হিজড়ের সন্তানকে কি বারবনিতার সন্তান বলা যায়? কলকাতায় এসে ফোন নম্বর জোগাড় করে বিজয় লামার সঙ্গে কথা বলে অনিকেত। মাঝে একজন ছিল, যার মাধ্যমে বিজয় লামার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে অনিকেতের বন্ধু। সাধ্যমতো ওই আশ্রমকে সাহায্য করেন।

আশ্রমটা দেখতে যায় অনিকেত।

টিনের এবং টালির চালের কয়েকটা ঘর। ছেলেদের এবং মেয়েদের আলাদা-আলাদা। সেদিন রবিবার ছিল। অনিকেত দেখছিল, একটা বেদি-বাঁধানো বকুলগাছ। ওখানে মা-রা সব বসে আছে। কারও মুখে মেচেতার কালি। একজনের গালে লম্বা কাটা দাগ—ব্লেড বা ক্ষুরের স্মৃতিচিহ্ন; যা শত পাউডার প্রলেপেও অমলিন। ওদের সন্তানরা নিয়ে এসেছে নতুন বই কিংবা ড্রইং খাতা। মা'দের রাত-জাগা চোখে ভোরের পাখি ডেকে ওঠে ড্রইং খাতায় হাঁস-চরা পুকুর আর পাখি-ভরা গাছ দেখে। ড্রইং খাতায় ময়ূর, সূর্য ওঠা গ্রাম, পদ্মফোটা পুকুর, হাঁটি-হাঁটি পা-পা শিশুর হাসি মুখ, ধিতাং-ধিতাং নাচা বালিকদের ছবি। ছবির পৃথিবী কী সুন্দর! মা-রা দেখে। ঝুমঝুমি বাজে। ঝুমঝুমি বাজায় কোনও সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা। উপহার পাওয়া ঝুমঝুমি। খুশি-ভরা ফোকলা দাঁত। এই চত্বরটা কেমন যেন খুশিময় হয়ে আছে। এখানে সন্তানদের সঙ্গে সাপ্তাহান্তিক দেখা-সাক্ষাতে কোনও বাপ নেই। সবাই মা। এরই মধ্যে আলো-ছায়ায় এক মায়ের পায়ের কাছে বসেছে এক নবমবর্ষীয়া বালিকা, মা খুব যত্নে উকুন বেছে দিচ্ছে। বিজয় লামা ঘুরে-ঘুরে অনিকেতকে দেখাচ্ছেন, ওঁর আশ্রমের আনন্দরূপ। উকুন-বাছা ভাস্কর্যের সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন। '—এই যে সঙ্গীতা, ওষুধ দিসনি তো মাথায়?'

অনিকেতকে বলেন বিজয় লামা—বুঝলেন, উকুন মারার ওষুধ দেওয়া হয় সবাইকে, মাসে একবার করে ওটা দিয়ে সাবান ঘষার কথা। এই মেয়েটা কিছুতেই দেবে না। দিলেই তো উকুন চলে যাবে, তা হলে মায়ের পায়ের ফাঁকে বসার মজাটাই চলে যাবে। দু-চারটে করে চুল সরিয়ে উকুন খোঁজে ওর মা, মায়ের হাতের স্পর্শ পাওয়ার জন্য ও উকুন পুষে রাখে।

বিজয় বলেন—এই যে তুই উকুন পুষে রাখিস, তোর মাথা থেকে তো অন্যদের মাথায় উকুন যায়। কাল যদি ওষুধ না-দিস তো একমাস জিলিপি বন্ধ।

সঙ্গীতার মা'কে বলেন, সামনের সপ্তাহ থেকে উকুন বাছা চলবে না। মেয়েকে আপনি বোঝান—এই সঙ্গীতা বল তো কোনটা ভাল, উকুন না জিলিপি?

মেয়েটা মাথা নিচু করে বলে, জিলিপি।

বিজয় বলেন, প্রতি রোববার সকালবেলায় দু'টো করে জিলিপি দেওয়া হয় সবাইকে।

অনিকেত দ্যাখে, ওই বিঘেখানেক এলাকার মধ্যে দোলনা আছে, ব্যাডমিন্টন খেলার জায়গা আছে, এক্কাদোক্কার ছক আঁকা আছে একাধিক, মুরগির পোলট্রি আছে, গরুর গোয়াল আছে।

—ড্রইংয়ের মাস্টারমশাই আসেন, পয়সা নেন না। গানের দিদিমণি আসেন। পয়সা নেন না। সবাই মিলেই কাজটা করছি দাদা। বলেন বিজয় লামা।

অনিকেত জিগ্যেস করল—এরা কোন স্কুলে পড়ে?

বিজয় বললেন—স্থানীয় স্কুলগুলোতেই ভর্তি করিয়েছি।

—স্কুলে ওদের কোনও অসুবিধে হয় না?

—বাচ্চাদের নিয়ে কোনও প্রবলেম নেই। ওদের সঙ্গে যারা পড়ে, ওরা তো দিব্বি ওদের

সঙ্গে মেশে। বড়দের নিয়ে, মানে টিচারদের নিয়ে একটু-আধটু... কেউ-কেউ দু-একটা আজেবাজে কথা বলে, ও তেমন কিছু না।

অনিকেত বলে, আপনাকে বলেছিলাম তো—একটি ছেলেকে ঘরে রেখেছিলাম। ওর বাবা হিজড়েদের দলে চলে যায়। মা আগেই ছেড়ে গিয়েছিল... ওকে মানুষ করছিলাম। কিন্তু আমার তো বদলির চাকরি, আমার স্ত্রী'কে নিয়ে চলে যাব ওখানে, তাই ভাবছিলাম...

বিজয় বললেন—রাখতে পারেন এখানে, তবে এখন তো কোনও স্কুল ভর্তি করবে না। এখন তো আবার এপ্রিল থেকে সেশন্। এই ভাঙা-মাসে ভর্তি নেবে না। পরেই দেবেন না-হয়।

—টাকাপয়সা?

—ওটা আপনার ওপর। আপনি তো সরকারি চাকরি করেন। ওর জন্য যা লাগে দিতেই পারেন। এদের থেকে তো কিছু নিই না। কী করে নেব? তবে ওরাও কিছু-কিছু দেয়। জোর করে দিয়ে দেয়। পুজোর সময় এই মা-রা টুকটাক বকশিস পায়, তা থেকে কিছু দিয়ে দেয়—চাইতে হয় না। কতই-বা বকশিস পায়? এসব মা'দের খদ্দেররাও তো পয়সাওলা নয়।

অনিকেত জিগ্যেস করল, একটা ব্যাপার জানতে ইচ্ছে করছে খুব। এই যে বাচ্চাগুলো, হতে পারে ওদের বাবাদের কেউ-কেউ আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোক, মা-রাও এরকম, বাচ্চাগুলো 'ঠিকঠাক'?

—ঠিকঠাক মানে?

—প্রবলেম করে? অন্যায় করে? চুরি করে খাওয়া—মারপিট—বা অন্যান্য অপরাধ...

বিজয় লামা বললেন, আলাদা রকম কোনও প্রবলেম তো দেখি না। যেসব বাচ্চা ৮-১০ বছরে আসে, ওরা কিছু খিস্তি-গালাগাল শিখেই আসে। ওগুলোকে ওরা গালাগাল ভাবে না। একটা আট বছরের মেয়ে সাত বছরের মেয়েকে যখন বলে—এতক্ষণ ধরে কত হাগচিস লো মুখপুড়ি মাগি, এবার বেরো... তখন হাসিই পায়। একটা বাচ্চা ছেলে অন্য ছেলেকে বলে, তোকে আবার মায়ের পেটে ঢুকিয়ে দেব শালা... এগুলো, হালকার ওপর হল। আরও সব আছে। এসব একটু সামলাতে হয়। ওদের বোঝাতে হয় খারাপ শব্দ না-বলেও কী করে মনের ক্ষোভ-জ্বালা প্রকাশ করা যায়। একজন জিগ্যেস করেছিল, 'মুখপুড়ি' যদি 'খারাপ কথা' হয়, তবে 'ভাল কথা'টা কী? আমি সত্যিই সমস্যায় পড়লাম। মুখপুড়ি-র 'ভাল' প্রতিশব্দ কী হতে পারে? কিম্বা ঘাটের মড়া-র? আপনার জানা আছে? অনিকেতকে প্রশ্ন করেন বিজয়।

অনিকেত মাথা চুলকোয়।

—যাকগে। এমনি ওসব ছাড়া আর কোনও সমস্যা নেই?

—সমস্যা তো অনেকরকম হয়। আসলে কোন ধরনের সমস্যার কথা জানতে চাইছেন আপনি?

অনিকেত বলে, আসলে একটা তত্ত্ব আছে—অপরাধ জিনবাহিত। অপরাধীর সন্তানরা অপরাধপ্রবণ হয়। আর যারা ইয়ে, বারাঙ্গনা...

—বেশ্যাই বলুন না... বিজয় বলেন।

—ঠিক আছে, ওই একই হল, এই কাজে অনেকে বাধ্য হয়ে আসে, প্রতারিত হয়ে আসে, কেউ-বা স্বেচ্ছায়, জেনে-শুনে। যারা জেনে-বুঝে আসে, ওরা আর্থিক প্রয়োজনেই আসে, কিন্তু

একটা থিওরি আছে যে, ওই মেয়েরা অভাবেও আসে—আবার স্বভাবেও আসে। ওরা হয়তো পছন্দ করেই আসে। ওরা একটু বেশি কামুক হয়... জানি না... এরকম একটা কথা শোনা যায়। এই বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছেন আপনি।.আপনার এখানে বয়ঃসন্ধির বাচ্চারাও আছে। ওদের মধ্যে অতিরিক্ত যৌনতা...

বিজয় বললেন, না তেমন তো কিছু চোখে পড়েনি আমার। ওই ধরনের কোনও অভিযোগ তো শুনিনি। 'অপরাধী জিন' নামে কিছু বোধহয় নেই। যদি থাকত, রত্নাকর 'বাল্মিকী' হতে পারতেন? আমাদের এখানে যে ছেলেটি ড্রইং শেখায়, ওর বাবা এখনও জেল খাটছে। অপরাধ প্রবণতা 'ইন বিল্ট' নয়।

অপরাধ প্রবণতা ইন বিল্ট নয়, হার্ডওয়ার্ড নয়। কিন্তু সমকামিতা তো ইন বিল্ট। ওটা তো পাল্টানো মুশকিল। ওটা যে কারণেই হোক। জিনে প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কিন্তু মস্তিষ্কে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। হাইপোথ্যালামাসের SCN-এ।

কিন্তু সমকামিতা কি অপরাধ? অপরাধ তো নয়—অনিকেতের বাইরের মন তো তাই বলে। অনেক তো ভেবেছে। এই আচরণের জন্য ওরা দায়ী নয়। যারা পরিবেশের মধ্যে পড়ে গিয়ে সমলিঙ্গে যৌনতা করে—ওরা পাল্টে যায় বা পাল্টানো যায়। কিন্তু অনেককে তো কিছু করা যায় না। মন্টু হয়তো ওরকমই। কিন্তু আশ্চর্য, ও নিজেও এভাবে ভাবছে। একেবারে মনের গভীরে ঢুকে-থাকা বহু বছরের লালিত বিশ্বাস। মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং 'কালেকটিভ আনকনশাস্'-এর কথা বলেছিলেন। গভীর মন—মানে 'ইদ্'-এ ঢুকে থাকা কিছু বিশ্বাস, কিছু প্রতীক, কিছু আর্কিটাইপ উপড়ে ফেলা সহজ নয়। সমকামিতা অপরাধ নয়, কিন্তু একজন সমকামীকে নিজের পরিবারের মধ্যে 'রোল' দেওয়ার মতো ঔদার্য শুক্লার নেই, কিন্তু ও আবিষ্কার করে—ওরও নেই। তাই যখন বিজয় বলেন, এখন তো এখানে রাখা সম্ভব নয়, কয়েকটা মাস অপেক্ষা করতে হবে, তখন ওর ভিতর থেকে কেউ বলে ওঠে—'এই সেরেছে—এবার কী হবে?'

অনিকেত জিগ্যেস করে, এখানে ক'বছর বয়স পর্যন্ত রাখা হয়?

বিজয় বলেন, মাধ্যমিকটা পাশ করিয়ে দি।

—তারপর?

—তারপর তো ভাবিনি কিছু। এ বছর দু'জন মাধ্যমিক দেবে। দু'টোই ছেলে। তারপর কী করা যায় ভাবছি। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে কথা চালাচ্ছি। দু'টো মিশনারি চার্চের সঙ্গেও। কোনও টেকনিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া যায় কি না ভাবছি। আপনি যদি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারেন তো বলবেন। ভাবুন না একটু...।

মন্টুর সমকামী অভ্যাসের কথা বিজয়কে বলেনি। বললে বিজয়ও কি ওকে নিতে রাজি হতেন? কে জানে? উনি কি ভাবতেন, এই ছেলেটা অন্য ছেলেদেরও 'স্পয়েল' করবে? কে জানে। ওসব গোপন করেই অনিকেত মন্টুকে গছাতে চেয়েছিল। যেমন করে অচল পয়সা চালায় মানুষ। ছেঁড়া-ফাটা নোট কায়দা করে, বুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি করে, ব্যস্ত দোকানে গছিয়ে দেওয়া হয়।

ফিরে এসে শুক্লার সঙ্গে কথা হয়। শুক্লা বলে, সবে তো এখন সেপ্টেম্বর। এতগুলো মাস অপেক্ষা করতে হবে?

অনিকেত বলল, কী করা যাবে? আমি তো ওকে আনতেই চাইনি। তুমিই তো মহৎ হতে গেলে। দুলালের মায়ের ঋণ শুধতে গেলে। দুলালের মা বলে গিয়েছিল, নাতিটাকে দেখো...। এরকম তো কতজনই কতরকম করে বলে।

শুক্লা বলে, আমি কী করে জানব ও এরকম হবে? কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলে না।

শুক্লা বলে, যাই বলো ওই আশ্রমটা সুবিধের নয়।

যারা ওখানে থাকে, ওরাও তো ঠিক 'ইয়ে' নয়...

'ইয়ে'-র মধ্যে যা বলতে চাইছে শুক্লা, অনিকেত বোঝে। শুক্লা বলল, রামকৃষ্ণ মিশনগুলো ভাল। ওদেরও তো অনাথ আশ্রম আছে। ওরা খুব ভাল করে মানুষ করে। চার্চেরও তো অনাথ আশ্রম থাকে। মাদার টেরিজা-র ওখানে খোঁজ কোরো না।

শুক্লার মধ্যে একটা দোটানা কাজ করছে। মন্টুর প্রতি একটা স্নেহ রয়েছে, শুভ-কামনা রয়েছে। ও চাইছে, ও ভাল থাক। ওর যদি নিজের রোজগার থাকত, হয়তো ভাল কোনও হোস্টেলে রাখত। স্বামীর রোজগারের টাকায় সেই আবদারটা করতে চাইছে না। আবার বাড়িতে রাখার মানসিকতাও আর নেই। আর অনিকেত নিজে? ও তো প্রথম থেকেই ঝামেলা-বিবর্জিত হতে চেয়েছে। ও ততটা বাৎসল্য রসে ভেজেনি এখনও। তা ছাড়া এই ঘটনাগুলোর পর...।

মাঝে একবার মন্টুর সঙ্গে সোজাসুজি কথাও বলেছিল অনিকেত। শুক্লা তখন ছাদে ওর ক্লাস নিচ্ছিল।

জিগ্যেস করেছিল—মন্টু, সিঁড়ির ঘরে তুই কাকে ঢুকিয়েছিলি?

মন্টুর ঘাড় নিচু। কথা বলেনি।

—কেন ঢুকিয়েছিলি?

মাথা নিচু চোখে পিটপিট করছে।

—কী করছিলি?

ও চুপ।

—কথা না-বললে মারব। যা বলছি উত্তর দে। বল কী করছিলি?

—দেখছিলাম।

—আর কী করছিলি?

—ধরছিলাম।

—কবে থেকে এরকম করিস? সত্যি কথা বল।

—ওই একদিনই।

—বাজে কথা বলছিস। ডাকব রিকশাওলাটাকে?

—আর একদিন। মোট দু'দিন। আর করব না।

মন্টু মাথা নিচু রেখে বলে।

রিকশাওলা ছেলেটাকে ছাড়ায়নি শুক্লা। ওকে আর পড়াবে না ভেবেছিল। কিন্তু এর আগে তো কল্পনা মৈত্রকে জানাতে হয়। কিন্তু জানাতে গেলে মন্টুর কথাও বলতে হয়। মন্টু তো এই পরিবারেরই একজন। মন্টুও জড়িয়ে যাবে বলে বলেনি কিছু। তা ছাড়া বলা যায় না—উনি হয়তো বলেই বসবেন—ওসব করেছে তো কী হয়েছে? ওসব তো ওদের পার্সোনাল ব্যাপার।

অনিকেত মন্টুকে বলে, মিথ্যে কথা বলছিস। আর একদিন নয়, অনেকদিন। এছাড়া এসব কাজের আরও সঙ্গী আছে—আমি জানি। মিষ্টির দোকানের ওই ছেলেটার কথা জানি না ভেবেছিস?

মন্টু ঘাড় নিচু করে থাকে। প্রতিবাদ করে না।

এটা সম্পূর্ণ আন্দাজেই বলেছে অনিকেত। ওকে নিয়ে বাজারে গিয়েছে কয়েকবার। মিষ্টির দোকানের এক কর্মচারী, মাঝবয়সি, মন্টুর হাতে একটা পান্তুয়া তুলে দিল সাদা কাগজে মুড়িয়ে। বলল, ছেলেটা বড় ভাল। আপনি বড় মহৎ লোক, আশ্রয় দিয়েছেন। তখন কিচ্ছু ভাবেনি। এখন হঠাৎ ছবিটা মনে এল, এবং বলে ফেলল।

মন্টু কিছু বলল না। ঘাড় নিচু এবং চোখে জল।

দু'ফোঁটা জল পড়ল মেঝেতে।

তার মানে, এটাও ঘটনা? মাথা টনটন করে ওঠে অনিকেতের। একটা থাবড়া মারবে বলে হাত ওঠায়, মন্টু মাথাটা সরানোর চেষ্টা করে না। থাপ্পড়টা যেন ওর পাওনা, থাপ্পড়টা গ্রহণ করার জন্যই দাঁড়িয়ে থাকে। শেষ মুহূর্তে অনিকেত নিজেকে সংযত করে। হাতটা মন্টুর গাল পর্যন্ত পৌঁছয় না।

অনিকেত শুক্লাকে বলে—রামকৃষ্ণ মিশনে কি এই বয়সে নেবে? যত দূর জানি ওরা ছোট অবস্থায় নেয়।

শুক্লা 'ও...' বলে চুপ করে থাকে। 'ও...' শব্দটাকে কিছুটা প্রলম্বিত করে—যা এক ধরনের হতাশার ব্যঞ্জনা দেয়।

অনিকেতের ভিতর থেকে আর-একটা-অনিকেত বেরিয়ে আসে। সে আরও স্মার্ট। চুলটা ঝাঁকড়া। ও মাথা নাড়িয়ে বলে, কি অনিকেতবাবু? খুব যে তড়পাতে...

—কী তড়পাতাম...

—ওই যে...পার্সোনাল চয়েস... স্বাধীনতা। যৌন-স্বাধীনতাও। ওই কিশোর ছেলেটাকে বাড়ি থেকে তাড়াচ্ছেন তো...

—না মানে, সংসারে থাকতে গেলে...মানে আমার স্ত্রী'র কতগুলো নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা আছে। সংস্কার-কুসংস্কার যাই বলি না কেন। ওর বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করি না। ও তো পুজোআচ্চা করে। বাধা দিই না। করুক।

—ওই এক ভ্যানতাড়া করে যাচ্ছেন। বলেছিলেন না—পৃথিবীর অনেক বড়-বড় মানুষ, লেখক-শিল্পী-চিত্র পরিচালক-সমাজকর্মী-বৈজ্ঞানিক সমকামী। ওঁদের ব্যক্তিগত যৌনতার সঙ্গে সৃষ্টির কোনও সম্পর্ক নেই। নিজস্ব ক্ষেত্রে ওঁরা বিরাট মাপের।

অনিকেত একটা যুক্তি পেয়ে যায় বলার।

ও বলে—আরে এই ছেলেটা তো কোনও কম্মের না। পড়াশোনাতেও ভাল নয়। মাস্টারমশাই রাখা আছে, তবু কোনওরকম কুঁতিয়ে-কাঁতিয়ে পাস করে যায়।

অন্য অনিকেত বলে—যদি ও ব্রিলিয়ান্ট হত? পরীক্ষায় ফার্স্ট হত? অঙ্কে একশোয় একশো? সেই সঙ্গে ডিবেটে ফার্স্ট... স্কুলের মাস্টারমশাইরা বলত, একটা স্টুডেন্ট পেয়েছি বটে, রত্ন...তা হলে? ছেলেটা 'হোমো' জেনেও কি ওকে রাখতেন আপনার ফ্যামিলিতে অনিকেতবাবু... রাখতেন না?

অনিকেত—সত্যি কথা বলতে কী, আমার নিজের তেমন কোনও মানে.. .শুক্লা... ওরকম হলে শুক্লা হয়তো...

জবাবটা পুরো দিতে হয় না একটা ফোন এল বলে।

—হ্যাঁ...বলছি।

...

—সে কী! কখন?

...

—তারপর?

...

—এখন কেমন আছে?

...

—বাড়ি ফিরবে কী করে?

...

—ঠিকানা? এ বাড়ির ঠিকানা?

...

—বলছি। লিখে নিন...

আশঙ্কিত চোখে শুক্লা তাকিয়ে আছে অনিকেতের দিকে। অনিকেত ফোনটা 'অফ' করে ছুড়ে ফেলল বিছানায়—উফ...আর পারা যায় না।

—কী হয়েছে? শুক্লার উদ্বিগ্ন প্রশ্ন।

বিকাশ একটা বার-এ নেশা করে পড়ে-টড়ে গিয়েছে। বোধহয় দুপুর থেকেই খাচ্ছে। মাথায় লেগেছে। ওরা বরফ দিয়েছে। ওর ফোন করারও ক্ষমতা নেই। বার-এর কাউকে দিয়ে ফোন করাচ্ছে। ওর ফ্ল্যাটের চাবিটা পাচ্ছে না, কোথাও ফেলে-টেলে দিয়েছে। এখন ট্যাক্সির ড্রাইভারকে আমাদের বাড়ির ঠিকানা ধরিয়ে দিয়ে ওকে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিচ্ছে। উফ্‌ফফ...

—তার মানে, এখানে আসবে মাতাল হয়ে, ওকে ধরাধরি করে নামাতে হবে?

—কী করব? 'না' করব?

—তাই তো, 'না' করতে পারো না, যত ঝামেলা এখানে। আমি কিছু জানি না। ওর বিছানা-টিছানা কিচ্ছু জানি না।

অনিকেত চুপ করে থাকে।

—সব সময় তুমি আমাকে...

শুক্লা গজগজ করতেই থাকে...।

অনিকেত টিভিটা চালিয়ে দেয়। তখন সন্ধে।

সে কী! টিভি-তে কী দেখাচ্ছে?

আমেরিকা আক্রান্ত।

বিমান হানায় জোড়া টাওয়ার ভেঙে পড়েছে।

সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা।

ওরা দ্যাখে, কালো ধোঁয়া। আগুন। কীরকম রূপকথার মতো একটা বিমানপোত একটা

স্পর্ধাজড়ানো বাড়িতে এসে লাগল, বাড়িটার মুকুট ভেঙে পড়ল, তারপর মাথা, দেহ। রক্তের মতো গলগল করে আগুন। আগুন আর ধোঁয়া। ভেঙে পড়েছে ট্রেড সেন্টারের জোড়া টাওয়ার। চোখ কচলে অবাক হয়ে দেখতে থাকে। হতবাক।

কে হাততালি দিয়ে উঠল।

অন্য অনিকেত? অনিকেতের আঠারো বছর বয়সে?

—তুই যাসনি এখনও?

আবার ফোন। ভাগ্যিস ফোনটা...

—আমি বিকাশ বলছি। সরি টু ডিসটার্ব। চাবি পেয়েছি। বাথরুমে হিসি করার গামলাটাকে কী বলে যেন? হ্যাঁ, ওখানেই ফেলে দিয়েছিলাম। বাই। এনজয় ইয়োর গুডি-গুডি লাইফ।

ওই আগুন এবং ধোঁয়া সরিয়ে অনিকেত আনন্দবার্তা দিল শুক্লাকে। 'বিকাশ আসছে না।'

বারবার দেখাচ্ছে। আগুন, ধোঁয়া, ভেঙে-পড়া, ভয়ার্ত মানুষের ছুটে পালানো...। আবার ধোঁয়া...

শুক্লা কালো ধোঁয়ার এপার থেকে বলল, বিকাশ ঠাকুরপোর খুব কষ্ট না গো?...

ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে ঘরে।

শুক্লা বলে, মন্টুটাকে যদি বিকাশ ঠাকুরপোকে দিয়ে দি, কেমন হয়?

কাশি আসে। কাশছে অনিকেত।

জানা গেল, ওসামা বিন লাদেন নামে কেউ একজন আছে, যে আমেরিকায় ওই সন্ত্রাসের পিছনে আছে। লোকটা রহস্যময়। আরবে বিরাট ব্যবসা ছিল। তারপর নানা দেশে ঘুরছে। কিন্তু লোকটাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

টেলিভিশনে দেখাচ্ছে 'গ্রাউন্ড জিরো'। জায়গাটার ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বিক্ষত জায়গাটার স্মৃতি-স্তূপ পড়ে আছে, দুলালীর উপড়ে ফেলা গুপ্তস্থান যেন। ওখানে কান্না জমছে। ফুলও জমছে।

আর একটা 'গ্রাউন্ড জিরো'-তে গেল অনিকেত। বিকাশের বাড়ি। ফোন করেছিল আগেই। জড়ানো গলায় বিকাশ বলেছিল, ডোন্ট ডিস্টার্ব মি।

অনিকেত বলেছিল, অফিস যাচ্ছিস না কেন?

বিকাশ বলেছিল, কী হবে গিয়ে?

অনিকেত বলেছিল, এখন ন্যাকামি করিস না।

কিছুক্ষণ বেল টেপার পর বিকাশ দরজা খুলল। ঘর-ভর্তি সিগারেটের টুকরো। কয়েকটা মদের বোতল মানসিক প্রতিবন্ধীদের মতো শুয়ে আছে, বসে আছে। টেবিলে পুকাইয়ের একটা হাস্যমুখর ছবি, মালা দেওয়া, মালার ফুল শুকিয়ে গিয়েছে। ডাইনিং টেবিলে কয়েকটা

পাঁউরুটির খোলস পড়ে আছে। পড়ে আছে পৃথিবীর অবক্ষয়ী সহনশীলতা।

—কি বে? রগড় দেখতে এলি?

বিকাশ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল।

—আর নাটক করিস না বিকাশ। খুব হয়েছে। এবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আয়।

অনিকেত ওর বিছানায় বসে বলে।

—'স্বাভাবিক জীবন' আবার কী? আমার জীবন কী করে 'স্বাভাবিক' হবে ফের? বউ চলে গিয়েছে। আমার গায়ে থুথু দিয়েছে। সত্যিকারের থুথু। ওর থুথু আমি হাত নিয়ে চেটে মাথায় মেখেছি। শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ আমার খোঁজ নেয়নি।

—আমি তো খোঁজ নিতে এসেছি।

—মানে, কতটা মদ খাচ্ছি জানতে? নাকি বাড়িতে আবার অন্য মেয়েছেলে ঢুকিয়েছি কি না বুঝতে?

—শোন বিকাশ, আবার বলছি নাটক করিস না। তুই আমার আত্মীয়, তুই আমার বন্ধু। অনিকেত একটু হাসে। পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা করে। বলে—'সিরাজদৌল্লা' নাটকে ছিল না? সিরাজদৌল্লা বলছে বিপদের দিনে যে-ই না কাছে এসে দাঁড়ায়, সে-ই না আত্মীয়, সে-ই না প্রকৃত বন্ধু...

বিকাশ চুপ করে থাকে।

—অফিস যাস না কেন?

—গিয়ে কী বলব? সবাই তো জিগ্যেস করবে। অফিসের কয়েকজন বাড়িতে এসেছিল। সবাই গল্প শুনতে চায়। কেন ঝাঁপ দিল? এর আগের রাতে কী করেছিল? সকালবেলায় কী খেয়েছিল? তারপর কী বলেছিল...

—বলবি, একবার বলবি। তারপর আর বলবি না।

—কী বলব? ওকে বকাবকি করেছিলাম সেটা বলে দেব? মেরেছিলাম, প্রায়ই মারতাম, সেটাও বলে দেব? ওকে আমি সৌরভ বানাতে চেয়েছিলাম, ও সৌরভ হতে পারবে না ভেবে মরে গেল—মানে 'মেরে দিলাম'—বলে দেব? তা হলে সব বলে দিতে হয়, এভরিথিং। আমি যে আসলে বাঁজা, আমার স্পার্ম হয়টয় না—বাঁজা দোষটা মেয়েদেরই জোটে। আমি শালা বাঁজা। যখন আমাদের বাচ্চা হচ্ছিল না, তখন টেস্ট করিয়েছিলাম তো। প্রথমে পারমিতার। বারবার। ডাক্তাররা বলল, ওর সব 'ওকে'। তারপর আমার। তখন দেখা গেল স্পার্ম কাউন্ট কম। তোদের বলিনি...

—বলেছিলি, হিন্ট দিয়েছিলি তুই। আমি বুঝে গিয়েছিলাম। তাতে কী? এরকম অনেকেরই তো হয়।

—ওই জন্যই তো—ওই জন্যই তো আমি সন্তানের মর্ম বুঝিনি। নিজের ঔরসের সন্তান তো প্রায় আমি-ই, সে তো আমারই অংশ। আমি কি আমাকে মারতে পারতাম? আমাকে নিয়ে তোদের আর ভাবতে হবে না। আমাকে আমি চিনে গিয়েছি। তোরা শালা সোহম। 'সে-ই আমি'। সেই ঈশ্বরের অংশ তোরা। আমিও জেনে গিয়েছি 'কো হম'—কে আমি। শয়তানের অংশ। আমি বহুত বাজে লোক। স্পার্ম নেই অথচ সেক্স আছে। পুকাই'কে অ্যাডপ্ট করেছিলাম,

সেটা সবাই তো জানে। ওকে দিয়ে আমি 'খেল' দেখাতে চেয়েছিলাম। খেল। মিরাকেল দেখাতে চেয়েছিলাম।

অনিকেত বলল, এভাবে ভাবিস না বিকাশ। তুই একটা পুরো মানুষ। তোর পঞ্চ ইন্দ্রিয় ষড় রিপু—না কী বলে যেন—তার সব কিছুই আছে। যৌনতা যেমন আছে, বাৎসল্যও আছে। পুকাই'কে ওর ছোটবেলায় বেলুন ধরিয়ে দিসনি—ওর একটু হাসি দেখবি বলে? ওকে কোলে নিয়ে চিড়িয়াখানার বাঁদরের খাঁচার সামনে যাসনি? ওকে ঘুম পাড়াসনি পাশে শুয়ে? গল্প বলিসনি?

—হ্যাঁ, নিউটনের গল্প বলেছি, সেই আপেল পড়ার গল্প, যেন নিউটনের থেকে এন্‌থু পায়। ডন ব্র্যাডম্যানের গল্প বলেছি। পক্ষীরাজ-টক্ষিরাজ বলিনি।

—যা হয়ে গিয়েছে, হয়ে গিয়েছে। তোর মধ্যে ঠিকই ভালবাসা আছে। একটা অনাথ আশ্রম দেখে এসেছি রানাঘাটে। একটা লোক রাস্তার বাচ্চা ধরে এনে বাড়িতে রেখেছে। ওদের কিছু সাহায্য করবি?

—ওরা 'জেনুইন' তো? ঝেড়ে দেবে না তো?

—আমি তো দেখে এসেছি। জেনুইন। সেন্ট পার্সেন্ট।

—তুই বললে দেব কিছু।

—কেন দিবি?

—তুই বললি বলে।

—না। তোর মধ্যেও ভালবাসা আছে বলে। তোর রোজগারের টাকায় আরও কারও ভাল হোক—মনে-মনে চাস বলে। তোদের অফিসে যখন রক্তদান শিবির হয়, তুই ওখানে রক্ত দিস। আমি জানি। কেন দিস?

—ক্রেডিট নেব বলে।

—না কি ভালবাসা তোর ভিতরে আছে বলে? বিকাশ চুপ করে থাকে। কী খেলি আজ? অনিকেত জিগ্যেস করে।

—মদ ফুরিয়ে গিয়েছে। আনতে যেতে ইচ্ছে করছে না।

—এখন বেলা তিনটে মতো বাজে। কিছু খেয়ে নে। আমি নিয়ে আসছি। অনিকেত বলে।

দুর্গাপুজো হয়ে গিয়েছে। প্যান্ডেল খোলার কাজ চলছে। এ বছর আলোর খেলায় সন্ত্রাস দেখানো হয়েছিল। আলো সাজিয়ে তৈরি এক জোড়া বাড়ি... একটা এরোপ্লেন ধাক্কা দিল, আর বাড়িটার চারদিকে লাল-লাল কুচো বাল্‌ব জ্বলতে লাগল—নিভতে লাগল...। মানুষ বলছিল, দারুণ। একটা থিমের পুজোর খুব নাম হয়েছিল এবার। খুব ভিড়। 'গ্রাউন্ড জিরো'-তে দুর্গাপুজো। পোড়া গাছ থেকে হাত-পা ঝুলছে। চাপ-চাপ রক্ত। দুর্গার কাপড়টা কিছুটা পুড়ে গিয়েছে। অসুরের মুখ লাদেনের মতো। এখন প্যান্ডেল থেকে টেনে-হিঁচড়ে খুলে ফেলা হচ্ছে সন্ত্রাস। এরই মধ্যে দু'টো ঠান্ডা তন্দুরি রুটি আর এক ভাঁড় গরম তড়কা নিল। বলতে ভুলল না 'পিঁয়াজ কাঁচালঙ্কা' দিন। পলিথিন ঝুলিয়ে বিকাশের বাড়ি যাওয়ার পথে এদিন গান এল ওর মনে—'ভীরু ভীরু চোখে তুমি চলে গেলে'..., ওখানেই আছে 'এই যে যাওয়া আসা সেই তো ভালবাসা'... ওই লাইনটা সামান্য পাল্টে দিল অনিকেত 'এই যে নিয়ে আসা সেই তো ভালবাসা'... টারারে টারাটারা টাররারা...।

চোখের কোনায় তোর নোংরা। চোখ পরিষ্কার কর বিকাশ। দাঁত মেজে নে। স্নান কর। আমি তোকে খাইয়ে যাব। যখন এসব বলছিল অনিকেত, দেখছিল দেওয়ালে আটকে আছে পারমিতার চোখ। না, চোখ নয়, টিপ। কিছুটা খয়েরি। তাকিয়ে আছে। অপলক।

বিকাশের মাথায় হাত দিল অনিকেত। হাতটা ঘাড় পর্যন্ত টেনে আনল। আর তখন মুখে দু'হাত চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল বিকাশ, আর কী আশ্চর্য, দেওয়াল থেকে টিপ-টা খসে গেল।

বিকাশ কাঁদছে। ভালবাসা পেল বলে? কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসার ঘা-এ?

—এবার একটু চা খেয়ে নে।

রান্নাঘরে গেল অনিকেত।

একদম কিচ্ছু যে খাওয়াদাওয়া করেনি বিকাশ, এমন নয়। কিচেনে গিয়ে ডিমের ভাঙা-খোলা দেখল অনিকেত।

বিকাশের চোখে জল ছিল। জেনুইন। কোনও ব্যাটাছেলে সাধারণত অন্য ব্যাটাছেলের চোখের জল মুছিয়ে দেয় না। ওটা মেয়েদের। হোমো'দেরও। অনিকেত তাই ম্যাজিশিয়ানের কায়দায় হাওয়ায় হাত নাড়িয়ে চোখের জল মোছানোর মূকাভিনয় করে বলে, কাঁদিস না। বি স্টেডি। বিকাশ ফোঁপায়। যতটা স্বতঃস্ফূর্ত, তার চেয়ে কিছুটা বেশি। এ সময়ে কোনও পুরুষ নারী-কণ্ঠে শুনতে চায়, 'এরকম করে না সোনা...'

কথাটা পাড়ার এটাই শুভযোগ—অনিকেত ভাবল।

বলল—যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে বিকাশ, নতুন করে আবার জীবন শুরু কর। আমি একটা ছেলেকে বাড়িতে রেখেছিলাম, জানিস নিশ্চই। শুক্লা-ই ওকে রেখেছিল। স্কুলে ভর্তি করিয়েছিল। নরম টাইপের ছেলে, ওবিডিয়েন্ট। তোর কাছে থাক ও। রান্নাবান্নাও টুকটাক জানে, তবে ওকে দিয়ে রান্না করাতে হবে না, রান্নার লোক রেখে দে। ওই ছেলেটা তোর কাছে থেকে পড়াশোনা করুক, ওর কেউ নেই। ওকে নিয়ে নে। পরে ওকে কিছু একটা রোজগারপাতির ব্যবস্থা করে দিস। এমনও হতে পারে, ওকে ড্রাইভিং-টা শিখিয়ে দিলি, তুই যদি গাড়ি কিনিস, ও চালাবে। ড্রাইভার কাম সেক্রেটারি। আগেকার দিনে বড়-বড় বাড়িতে নায়েব থাকত। বাজারহাট থেকে গার্জিয়ানগিরি সব করত। এখন নায়েবের বদলে ড্রাইভার। অনেক বাড়িতে ড্রাইভারই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। পারমিতার সঙ্গে মান-অভিমান শেষ হয়ে গেলে, ও তো চলে আসবে, ওরও খুব উপকারে আসবে। একটা সারপ্রাইজ হবে বেশ।

—তোরা ছাড়ছিস কেন ওকে? বিকাশের গলার স্বরে একটু করে প্রত্যয় জেগে উঠছে যেন...।

—শুক্লাকে আমার ওখানে নিয়ে যাব ভাবছিলাম তো... দুলালের মা বলে যে-মহিলাটি কাজ করত আমাদের বাড়ি, ওর নাতি ও। বাবা-মা নেই। বুড়ি বলে গিয়েছিল নাতিটাকে দেখতে। শুক্লা তাই রেখেছিল ওকে। ওর জন্য শুক্লা আটকে গিয়েছে। তোর যদি উপকার হয়, তোকে দিতে পারি।

—চুরিটুরি করে পালাবে না তো? বিকাশের গলার স্বর ক্রমশ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছে।

—না না... খুব অনেস্ট। এ ব্যাপারে গ্যারান্টি।

কাপড়ের ফেরিওলার মতো কথাটা নিজের কানেই লাগল অনিকেতের। 'একদম পাকা রং মশাই, গ্যান্টি'...।

—বলছিস? একটা ছেলেটেলে হলে তো ভালই হয়... ঠিক আছে, একবার পারমিতার সঙ্গে একটু... ধুর। অভ্যেসটা গেল না। আগে সব কিছুর আগেই বলতাম তো 'পারমিতার সঙ্গে একটু কথা বলেনি' অভ্যেসটা রয়ে গিয়েছে। আমার বাবা.খাওয়ার পরে কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাত। সব দাঁত ফেলে দেওয়ার পরও খাওয়ার পর একটা কাঠি নিয়ে মুখের ভিতরে ঢোকাত। দিয়ে যাস ছেলেটাকে। ওকে একদম ছেলের মতো দেখব না। ছেলেটেলের মতো ভাবব। কোনও সেন্টিমেন্ট নয়। বয়স কত?

—চোদ্দো-টোদ্দোর মতো। অনিকেত মাথা চুলকে বলে।

—বাজে বয়স। আমার পুকাই...। হ্যাঁ, একটা কথা। ও কিন্তু পুকাইয়ের সাবস্টিটিয়ুট নয়। নেভার।

—ঠিকই তো ও কেন পুকাইয়ের সাবস্টিটিয়ুট হতে যাবে? থাকবে বাড়িতে। খাবে, লেখাপড়া করবে, দরকার হলে চা-টা করে দেবে, খাবারদাবার আনবে... এই তো...।

—ঠিক আছে। দিয়ে যাস...।

একটু আনন্দ-আনন্দ ভাব হল অনিকেতের। একটা অচল টাকা চালিয়ে দেওয়ার আনন্দ হল ওর মনে।

অটোয় উঠল। অটোয় স্টার্ট দেওয়ার শব্দে যেন শুনতে পেল আদম ব্যাপারী।

'আদম ব্যাপারী' কথাটা শুনেছিল এক বাংলাদেশির মুখে। যারা মানুষ পাচার করে ওদের 'আদম ব্যাপারী' বলে। ওই ব্যবসায়ীরা লোক পাঠায় মধ্য প্রাচ্যে, মালয়েশিয়ায়, সিঙ্গাপুরে...। শ্রমিকের কাজে পাঠায়। অটোর ঘরঘর শব্দে শোনে, দাস ব্যবসা এখনও আছে। দাদা, দাস ব্যবসা এখনও আছে... দাদা... দাস ব্যবসা... মানুষ পাচার...

বার্লিন শহরের ওপর একটা ভিডিও দেখেছিল ইন্টারনেট-এ। মনে পড়ল। আলেকজান্ডার ট্রাসে এলাকার একটা রাস্তা। পুরনো বাড়িগুলোয় বুলেটের ক্ষত। হিটলারের আমলে সমকামীদের ওখানে জড়ো করে গুলি করা হয়েছিল। তখন কে নর্ডিক, কে ইহুদি বিচার করা হয়নি। জানা গিয়েছে সমকামী, ব্যস। গুলি করে মারো। ১৯৪৩ সালের বুলেটের শব্দ এখন অটোর ইঞ্জিন থেকে বের হচ্ছে কেন? লরির কালো ধোঁয়া ওকে কি দুয়ো দিচ্ছে?

কেন এমন মনে হচ্ছে? ছেলেটাকে তো পাচার করছে না, বেচেও দিচ্ছে না নিলাম বাজারে। একটা মার্কেটের সামনে নেমে গেল অটো থেকে। মন্টুর জন্য একটা শার্ট কিনল বেশ ভাল দেখে।

পরি বলেছিল, ওর মা ওকে নিয়ে রাস্তায় বেরয় না। পরি বলেছিল, ওর মামার বাড়িতে কার যেন বিয়ে ছিল। না-গেলেই নয়। মঞ্জু একা গিয়েছিল, পরি পরি-র মতো। অনিকেত কি মন্টুকে নিয়ে খুব একটা বেরয়? বাজার-টাজার ছাড়া? বাজারে নিয়ে যায় ব্যাগটা বইবার জন্যই তো। মানুষ কেমন করে যেন তাকায়। মানুষের চাউনিকে বড় ভয়। কোনও-কোনও চাউনি আছে—নারকোল কোরানির মতো। ছেঁচে দেয়। কোনও-কোনও চাউনি—গুলতির মতো। টাঁই করে লাগে। কোনও-কোনও চাউনি—পিন ফোটানোর মতো।

অনিকেতের মনে পড়ে, একদিন ওর অফিসের কর্তাদের কনভিন্স করিয়ে নিষিদ্ধ আর গোপন ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিল, 'ট্যাবু' বিষয়গুলোর তালা খুলে দিয়েছিল, গুমরে-মরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। বেতারে। বলেছিল, সমকাম কোনও

বিকৃতি নয়। সমকামীদের সমাজের মূল স্রোতে রাখার জন্য সওয়াল করেছিল। এখন, একটা ওই-ধরনের-ছেলেকে নিজের সংসার থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। হিপোক্রিট। কথায়-কাজে মিল নেই।

বার্ডেন। বার্ডেন। হোমো-টোমো নয়, কোনওরকম ঝামেলাই আমি চাইনি আসলে। আমি তো আমার স্ত্রী'র চাপে পড়ে ওকে ঘরে ঢুকিয়েছিলাম... যেন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উত্তর দিচ্ছে অনিকেত। ওর জন্য মাস্টারও রাখা হয়েছিল পড়ানোর জন্য। আমি একটা সরকারি চাকরি করি, কতই-বা মাইনেপত্র পাই? ওর জন্য তো চেষ্টা করেছিলাম...

—কী চেষ্টা?

—পড়াশোনার... খাওয়াদাওয়া আমাদেরই মতো। বরং ও ঘরে ছিল বলেই মাছটাছ আনা হত। কচুরি-সিঙাড়া-রোল। নইলে শুক্লা খুব সিম্প্‌ল লাইফ 'লিড' করে। এই তো দেখুন না ধর্মাবতার, জামার প্যাকেট। ব্র্যান্ডেড। মন্টুর জন্যই তো কিনলাম। বাড়ি যাওয়ার সময় বেঁদে নিয়ে যাব মন্টু ভালবাসে বলে।

মন্টুর পক্ষের উকিল বলল—ওসব তো কাঁঠালপাতা মশাই। যে-পাঁঠাকে বলি দেওয়া হয়, ওর জন্য কাঁঠালপাতা এনে রাখা হয় দ্যাখেননি? কী বলবেন অনিকেতবাবু?

—তা কেন? তা কেন? ওকে তো অন্য একটা জায়গায় ব্যবস্থা করছি। ভাল থাকবে-খাবে। ও যদি ওর বাড়িতে থাকত, ওর জ্ঞাতিরা হয়তো প্রাণেই মেরে ফেলত ওকে। বলতে গেলে উদ্ধার করে বাড়িতে রেখেছিলাম। লেখাপড়ার জন্য মাস্টারও...

—লেখাপড়ায় কেমন ছিল মন্টু?

—ভাল না, একদম ভাল না। রেজাল্ট ভাল করত না একদম। আমি নিজেও ওকে পড়াতে গিয়েছি। কিস্‌স্যু মাথায় ঢোকে না।

—ছবিটবি আঁকতে পারে?

—না, সেসব গুণও নেই।

—গান গাইতে পারে?

—না, তাও না। যদি ওসব পারত, যদি জানতাম ট্যালেন্ট আছে, রেখে দিতাম ঘরে। আদর করে রেখে দিতাম। 'হোমো' তো কী হয়েছে? পৃথিবীতে কত গায়ক, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্র পরিচালকরা 'গে'। ও তো কোনওটাই না।

—বেশ। একস্ট্রা-ট্যালেন্টেড হলে ওকে ঘরে রাখতেন। মানে মূল স্রোতে রাখতেন। তেমন ট্যালেন্টেড নয় যারা—ওদের কী হবে? দূরছাই করে বিদেয় করবেন? যদি ও আপনার নিজের ছেলে হত? নিজের ঔরসজাত, এবং ওর বয়ঃসন্ধিতে বুঝতেন ও 'গে', তা হলে কি করতেন?

—এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন হয়? সিম্প্‌ল উত্তর—ওকে মানুষ করতাম।

—যদি ওর ঘরে ছেলেবন্ধু ঢুকত, এবং বুঝতেন ছেলেটির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত, কী করতেন?

—আমি কিছু মনে করতাম না, তবে শুক্লা...

—সব কিছু শুক্লার ঘাড়ে চাপাবেন না। সব দোষ শুক্লার—আর, আপনি তুলসী পাতা। মনে করুন মন্টু আপনার ছেলে, এবং সে মিডিওকার। এবং 'গে'। কী করতেন আপনি?

—আমি? আমি কাউন্সিলিং করাতাম...

—ন্যাকা? একমাত্র পরিবেশগত কারণ হলে কাউন্সেলিং-এ কাজ হয়। হোস্টেলে, জেলখানায়, মিলিটারি ব্যারাকে যেসব সমকামী সম্পর্ক তৈরি হয়, এবং পরে অভ্যেস হয়, কিংবা বয়ঃসন্ধিতে একটু-আধটু—যা নিছক কৌতূহলবশত, কাউন্সেলিং-এ তাতে হয়তো কাজ হয়। আপনি সবই জানেন অনিকেতবাবু। এখানে ওসব নিয়ে বক্তৃতা মারার জায়গা নেই।

—তবুও কাউন্সেলিং-ই করতাম। পিতা হিসেবে ওটা আমার কর্তব্য ছিল। সেটা করাতাম।

—তো, মন্টুর ক্ষেত্রে সেটা করাচ্ছেন না কেন?

—হয়তো লাভ হত না...

—দু'রকম কথা হয়ে যাচ্ছে অনিকেতবাবু। লাভ হবে কি হবে না সে তো পরের কথা। প্রথমে তো আপনি প্রাথমিক চেষ্টাটা করতেন, না কি?

—অত ঝামেলা পারব না। প্রথমে কাউন্সেলিং, তারপর ওষুধ, তারপরে শক থেরাপি, তারপরে ব্লু ফিল্ম দেখানো... তাতেও কাজ হবে কি না ঠিক নেই, আমি পারব না... আমি হাত উঠিয়ে দিলাম ধর্মাবতার। আমি ছাপোষা মধ্যবিত্ত। ব্র্যান্ডেড শার্ট কিনি না, ফুটপাথে বাজার করি, বড় রেস্তোরাঁয় ঢুকি না সাধারণত... আমি অত পারব না। যা করেছি অনেক করেছি, আমায় যা শাস্তি দেওয়ার দিন।

এজন্য তো কোনও শাস্তির নির্দেশ নেই বাবুসোনা... ধর্মাবতার হাসেন।

অনিকেত মুক্তি পায়। ওর হাঁটাটা নিজের কাছেই একটু অন্যরকম লাগছে। প্রেমার্থ কবির কবিতাটা মনে পড়ল। 'চাঁদেতে কম 'G' তাই চাঁদে লাফাচ্ছি'—এরকম কিছু। হালকা লাগছে।

'এখানে অর্শ-ভগন্দর দাদ-হাজা নারী-পুরুষের গোপন রোগ সারানো হয়।' 'মদ ছাড়ানো হয়' একটা সাইন বোর্ড দেখল অনিকেত। সমকামিতা সারানো হয় এরকম বিজ্ঞাপনও দেখেছিল কোথাও। ওয়েবসাইটে বোধহয়। লং ডিস্ট্যান্স ট্রিটমেন্ট। একজন 'যোগগুরু' বলেছিলেন প্রাণায়ামে সমকামিতা সারে। পিরের দরগায় কিংবা মন্দিরের সামনের গাছে যেসব ঢিল ঝোলে, মনোবাসনার—সেখানে কি সমকামিতা-মুক্তির ঢিলও ঝোলে? মঞ্জু কি পরির জন্য ঝুলিয়েছিল ওরকম কোনও ঢিল?

সত্যিই যদি অনিকেতের ছেলেই হত মন্টু, বা মন্টুর মতো কেউ? শুক্লা কি খুন্তির ছ্যাঁকা দিত? না না, শুক্লা ওরকম করত না হয়তো।

একটি ছেলেকে দেখেছিল, ওর হাতের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। রবীন্দ্রসদনে ওদের আড্ডায় হাত নেড়ে কিছু নিষেধ করছিল। হাতের চামড়া ছিল কুঁচকানো। কেন জিগ্যেস করেনি অনিকেত। জিগ্যেস করা যায় না। শুধু খুন্তির ছ্যাঁকায় হয় না ওরকম।

এখনও তো মৃগী রোগের ওষুধ দেওয়া হয়—একদল ডাক্তার বিশ্বাস করেন সমকামিতা এক ধরনের নিউরো এপিলেপ্টিক দশা। কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স-ও ঘটানো হয়। নগ্ন পুরুষ-শরীর দেখানো হয়, ছবিতে কিংবা ভিডিওতে, এবং ওটা দেখলেই ইলেকট্রিক শক; পুরুষ শরীরের দিকে তাকালেই শক খেতে হবে এরকম একটা রিফ্লেক্স তৈরির চেষ্টা এখনও তো চলে।

কে জানে অনিকেত কী করত?

মঞ্জুকে নাকি এক কাউন্সেলর বলেছিলেন—পর্নোগ্রাফি-র বই পড়তে দিন—মেয়েদের ছবিটবি দেখুক, পারলে ব্লু।

—মা হয়ে কী করে আমি এসব করব?

—সেটা আপনি বুদ্ধি বার করুন।

অন্য এক সাইকোলজিস্ট বলেছিলেন—গান-বাজনা শুনতে দেবেন না একদম। আর্ট-ফার্টের ব্যাপারটা থেকে দূরে রাখবেন। ওগুলো হল ফেমিনিশ। ওই নন্দন, অ্যাকাডেমি, রবীন্দ্র সদন চত্বরে যত কম যায় ততই ভাল।

ও যেখানে থাকে, সেখানকার একজন মহিলা বলেছিল—তোমার ছেলেকে আমি সাতদিনে ঠিক করে দিতে পারি। আমার এক বোনঝি আছে। ব্যাটাছেলে চরিয়ে খায়। একটু টাকাপয়সা নেবে, কিন্তু এমন করে দেবে যে, মেয়েছেলের জন্য পাগল হয়ে যাবে। ছলছাতুরি জানা মেয়ে চাই। তোমার ছেলের চেয়ে আমার ভাইঝি বয়সে বড়। তাতে কী, এক হপ্তা ওর সঙ্গে মেশামিশি করতে দাও, ঘর ছেড়ে দাও, গ্যারান্টি দিচ্ছি ঠিক হয়ে যাবে। মঞ্জু এসব বলেছিল অনিকেতকে।

অনিকেত জ্ঞান দিয়েছিল, বলেছিল, এসবে কিচ্ছু হয় না।

সেই কথাটাই আবার নিজেকে বলল।

সত্যিই বোঁদে কিনল। বাড়ি এসেই মন্টুর হাতে বাক্সটা দিল অনিকেত। বলল, বোঁদে। তুই ভালবাসিস...।

মন্টু লাজুক হাসল। বাঁ হাত দিয়ে আবার হাসিটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল।

বিকাশ ঠাকুরপোকে কেমন দেখলে? শুক্লা জিগ্যেস করল।

—ওর সঙ্গে সত্যিই কারও থাকা দরকার। একা থাকলে মরে যাবে। কথা বলে এসেছি। মন্টুকে রেখে দেব ওখানে।

শুক্লা দাঁতে ঠোঁট চাপল একটু। ওটা অনেকটা 'যেতে নাহি দিব'-র বডি ল্যাংগুয়েজ। তারপর ঠোঁট থেকে দাঁতটা ছেড়ে দিয়ে ঠোঁটটা উলটে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। এটা হল—'তবু যেতে দিতে হয়'।

শুক্লা বলল, কবে পাঠানোর কথা ভাবছ?

—এবারে পাঠিয়ে দিলেই হয়... অনিকেত বলল।

শুক্লা আবার ঠোঁট কামড়াল।

—ওর স্কুল কী হবে, স্কুল?

—ওখানে কি স্কুল নেই? কোথাও ভর্তি হয়ে যাবে...

—ভাঙা-মাসে স্কুলে ভর্তি নেবে নাকি কেউ?

—তার মানে সামনের বছর? অনিকেত বলে।

শুক্লা বলে—তা হলে আরও ক'মাস। থাকুক...। ও তো চেঞ্জও হতে পারে, তাই না? ওকে কোনও সাইকোলজিস্টের কাছে নিয়ে গেলে হয় না?

ব্যাপারটা আবার রিওয়াইন্ড হয়ে গেল।

শুক্লা বলল, একটু ভাল থাকতে চেয়েছিলাম আমি। ভাল থাকার এত ঝামেলা? আমি ভেবেছিলাম, একা-একা ভাল থাকা যায় না, ভাল থাকা অনেকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। নিজের ভাল থাকাটা কিছুটা অন্যকে দিতে হয়। অন্যের ভাল লাগার কিছুটা নিতে হয়। ওই জন্যই তো কল্পনাদির সঙ্গে কাজ করছি। তুমি বিজয় লামা-র কথা বলেছিলে না, কী সুন্দর করে

বেঁচে আছে। আমি তো এজন্যই মন্টুকে এনেছিলাম। ও ভাল করে বাঁচবে, ওকে ভাল করে মানুষ করব...। কিন্তু...

—কিন্তু কী?

—কিন্তু ও তো ভাল থাকার নয়...। ভাল থাকছে না। পরপর কয়েকটা ঘটনায়...। অনিকেত মহা সমস্যায় পড়ল। বলে ফেলেছিল প্রায়—ওর বয়ঃসন্ধির এই আচরণ, ওর যৌনতা-সম্পর্কিত ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ওপর তোমার ভাল থাকা না-থাকা নির্ভর করছে কেন?

বলল না। বাঁশ কেন ঝাড়ে... না না, কী দরকার বাবা—খাচ্ছে তাঁতি তাঁত বুনে কাল হলে এঁড়ে কিনে...।

অনিকেত বলল, মন্টুর এই স্বভাব পালটাবে না। আমি দেখেছি কয়েকটা কেস। পালটায় না।

শুক্লা বলল, কল্পনাদি-র সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলব ভেবেছিলাম... কিন্তু নিজেদের ঘরের কথা... বলিনি... যদিও কল্পনাদি খুব ভাল, হেল্পফুল। বললে নিশ্চয়ই কোনও সাইকোলজিস্ট-এর সন্ধান দিতে পারবেন।

—সে তো তুমিও খোঁজ করতে পারো...।

অনিকেত বলল, খোঁজ করে দেখতেই পারি, কিন্তু মিছিমিছি সময় যাবে। আমার এত সময় কোথায়? তুমি নিয়ে যাবে? একদিন গেলে আবার হয় না... অনেকগুলো 'সিটিং' দিতে হয়।

শুক্লা বলল, ওর সঙ্গে বাইরে বেরতেই আমার লজ্জা করে। কেমন করে যেন হাঁটে, কেমন করে যেন তাকায়...।

—তাতে কী হয়েছে? হাঁটাচলা নিয়ে এত ভাবার কী আছে? ওর যদি একটা পায়ে ডিফেক্ট থাকত? ওর সঙ্গে হাঁটতে না?

মহৎ থাকাটাও একটা লোভ। সবাই কেমন অন্যের কাছে মহৎ থাকতে চায়। নিজের স্ত্রী-পুত্রের কাছেও। এমনকী নিজের কাছেও। অনিকেত যে মন্টুকে বিদেয় করতে ততটা আগ্রহী নয়, সেটা শুক্লার কাছে দেখাতে চায়। অনিকেত শুক্লার মনটা বুঝে ফেলার পর বলে—তোমার কল্পনা মৈত্রকে বলে দ্যাখো না, উনিই নিয়ে যাবেন। উনি নিশ্চয়ই আগ্রহী হবেন...।

শুক্লা বলল—এইমাত্র তুমি যে বললে—কাউন্সেলিং করে কিছু হয় না...। আমারও তো মনে হয়, এটা জন্মগত।

অদ্ভুত একটা লুডোখেলা চলছে। কেউ সাপের মুখে পড়তে চাইছে না। একবার জোরে শ্বাস নেওয়ার সময় অনিকেতের মনে হল 'ই'-তে ইচ্ছে। শুক্লা বোর্ডে লিখে রেখেছে। একটা ইচ্ছে তৈরি হচ্ছে না তো...।

অনিকেত শুক্লার দিকেই বলটা ঠেলে দিল। বলল, তুমি যা ভাল বোঝো...। তবে এটা ঠিক, ইচ্ছে করলেই তুমি তো বলতে পারতে কাল থেকে এই বাড়িতে তোর স্থান নেই। তা তো বলছ না। একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা করে দিচ্ছ...।

শুক্লা আবার ঠোঁট কামড়ায়।

অনিকেত বলে, পারমিতার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে চাও?

শুক্লা বলে, পারমিতা কিচ্ছু বলবে না। বিকাশকে নিয়ে ওর কোনওরকম ইনভলভ্‌মেন্ট নেই ও বলেছে। ফোনে কথা হয়েছে কয়েকবার। শুধু এ কারণে নয়, পুকাইয়ের মৃত্যুর জন্যই নয়,

বিকাশকে নানা কারণে হেট করে ও। আমাকে বলেছে।

অনিকেতও কিছু-কিছু জানে। বিকাশ মহিলার সঙ্গ করে। কোনও মহিলার সঙ্গে শুতে পারাকে ও পৌরুষের প্রকাশ মনে করে। ওর স্পার্মহীনতা-জনিত হীনম্মন্যতা থেকেই হয়তো ওটা করে। বিকাশ সব কিছু খুলে বলেনি, তবে বিকাশকে একাধিকবার বলতে শুনেছে, কোনও মহিলাকে শোয়ানো আমার কাছে জলভাত। ভেরি ইজি টাস্ক।

হ্যাঁ, 'টাস্ক' শব্দটা বলে।

স্কুলের ফার্স্ট বয় উৎপলের মতোই। অনুশীলনীর শেষের কঠিন অঙ্কগুলোকে ও বলত 'ইজি টাস্ক'।

শুক্লার ঠোঁট কামড়ানো শেষ হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে।

শুক্লা এবার বলল, আমি না, তুমিই বলো। তুমি যা বলবে...

অনিকেত বলল, না, তুমিই বলো।

যেন 'সপ্তপদী' সিনেমার উত্তম-সুচিত্রার মোটরসাইকেল ট্রিপ। 'না না তুমিই বলো'। মুখে হাসি, চোখে ছল, প্রেমে ভরা মন।

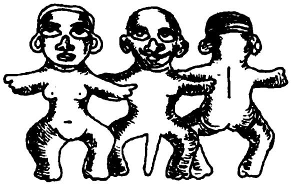

মঞ্জুর অফিসে হঠাৎ কার্তিকের আবির্ভাব। মঞ্জু দেখল, কার্তিকের চুলে দু'তিনরকম রং। কিছুটা কালো, কিছুটা সাদা, কিছুটা বাদামি। বোঝা যাচ্ছে অনেক দিন কলপ করা হয়নি। পাজামার ওপর ঝুলছে একটা হাফ শার্ট। শার্টের ওপর একটা হাফ সোয়েটার। হাতে লাল সুতোয় বাঁধা মাদুলি দেখা যাচ্ছে।

অফিসে মঞ্জু যে-টেবিলে বসে, তার উল্টো দিকে রয়েছে চার-পাঁচটা প্লাস্টিকের চেয়ার। আগে ছিল বেঞ্চি। ক্লায়েন্টদের কনডাক্ট ট্যুরের লিস্টি দেয় মঞ্জু, কাঞ্চিপুরমে মাছ-ভাত না কি ব্রেড-বাটার, ডায়াবিটিস রোগীদের চিনি ছাড়া চা সাপ্লাই করা হবে কি না—এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়। যারা খোঁজখবর করতে আসে, ওদের নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর টুকে নেয়। পরে তাগাদা দেয়। কী স্যর, কবে যাচ্ছেন? হ্যান্ডবিলে যা লেখা আছে, তার থেকে শতকরা পনেরো ভাগ পর্যন্ত কনসেশনের ক্ষমতা দেওয়া আছে মঞ্জুকে। যদি পনেরো-র বদলে দশ পার্সেন্টে ক্লায়েন্ট ধরতে পারে, বাকি পাঁচ পার্সেন্টের অর্ধেক সে পায়। ফলে অফিসে একটু দরাদরি চলে। 'কিছু করতে পারব না স্যর, এখন হেভি ডিম্যান্ড, একবার আমাদের সঙ্গে ঘুরেই দেখুন না, আবার আসবেন'—এরকম কত কথা বলতে হয়। দু-এক সময় বিনা কনসেশনেই খদ্দের শিকার হয়ে যায়। তখন বরাদ্দ পনেরো পার্সেন্টের তিনভাগের একভাগ মঞ্জুর।

তবে এরকম মার-দিয়া-কেল্লা কেস কমই হয়।

দশ পার্সেন্ট সবাইকেই দিতে হয়।

কিন্তু আশ্চর্য, কমিশনের টাকা পেলেই মনে হত, এই বাড়তি টাকাটা ছেলের জন্য খরচ করি। ছেলের চিকিৎসার জন্য। যখন পরি কথা শুনত, তখন সাইকোলজিস্টদের কাছে নিয়ে গিয়েছে। কম টাকা তো খরচ করেনি, এখন মাঝে-মাঝে লিপস্টিক, আইব্রো পেনসিল এসব নিয়ে যায়। ছেলের জন্যই, কিন্তু নিজে হাতে দিতে পারে না, বলতে পারে না যে, 'তোর জন্য এনেছি।' টেবিলে এমনি ফেলে রেখে দেয়। পরি-ও বোঝে এসব ওরই জন্য।

এখন মঞ্জুর উল্টো দিকে একজন মাত্র লোক বসে আছে। কেটারারের লোক। টাকা পাচ্ছে না, মঞ্জু বোঝানোর চেষ্টা করছে—এই বিষয়টা ও দেখে না। 'ঘোষবাবু জানেন, উনি আজ আসেননি, পরে আসবেন।' লোকটা বলছে, 'ঘোষবাবু-ফোসবাবু বুঝি না, আপনাকে পেয়েছি, আপনাকেই ধরব। ঘোষবাবু বলেছিল আজ আসতে, অথচ নিজেই এল না। একমাস ধরে ঘুরছি। নকশা-নকশা মুখ করে বলা হচ্ছে আমি কিছু জানি না? নাটক? ডাকুন আপনার ঘোষবাবুকে।'

কার্তিক এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল টেবিলের সামনে। মঞ্জুর মুখে অবাক হওয়ার ভাবটা ফুটেও উঠেছিল। মঞ্জু বাঁ হাতে একবার চেয়ারটা দেখিয়ে বসার ইঙ্গিতও করেছিল, কার্তিক বসেনি।

ওই ছোট্ট ঘরটায় তখন আর কেউ ছিল না। লোকটা কার্তিককে দ্যাখে। বলে, আপনি এই কোম্পানির লোক?

কার্তিক বলে, আমি এই কোম্পানির কেউ না। আমি ওঁর স্বামী।

'স্বামী' শব্দটা ঝম করে বেজে ওঠে। সুমনের গানে 'কণ্ঠ ছাড়ো জোরে' বলার সময় গিটারে যেমন দুর্দান্ত শব্দ ওঠে—সেরকম। মঞ্জু সেই মুহূর্তে কেমন বিহ্বল হয়ে যায়।

লোকটা একটু মিইয়ে যায়।

বলে—আপনার স্ত্রী-কে বলুন যেন আমার টাকাটার ব্যবস্থা করে দেয়। লোকটা সিট ছেড়ে উঠে যায়। বলে, পরশু আসব, যেন পেমেন্টটা পেয়ে যাই।

কার্তিক লাল চেয়ারে বসে।

মঞ্জু ওর মুখের দিকে তাকায়। ওর মুখে ধান-কাটা মাঠ, ওর মুখে পুরনো ফাইলের ধুলো। ঠোঁটের কোনায় জ্বরঠোসা। কার্তিক মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কপালের দিকে। কপালে-আঁকা সিঁদুরের চিহ্নের দিকে। মঞ্জু 'কেমন আছো?' বলতে যাবে, ঠিক সেই সময়েই কর্তিক একই কথা বলল। ছোট্ট দু'টো বাক্য মিশে গেল, কিন্তু প্রশ্নচিহ্ন ঝুলে থাকল। টেবিলে কার্তিকের দু'হাত।

মঞ্জু দেখল, কার্তিকের দু'হাতেই আংটি। আংটিতে পাথর। পাথর জৌলুসহীন। এসব পাথর ফুটপাতের। মঞ্জু দেখল শুধু পাথর নয়, আড়াই প্যাঁচ তামার তার প্যাঁচানো আংটিও আছে। ওটা অর্শের। ঘোষবাবুর আছে। আরও দেখল, একটা আংটির গায়ে লেখা ৭৮৬। ওর এন্টালি এলাকায় অনেক মুসলমান থাকে। ওদের দোকানে এরকম লেখা দেখেছে।

হঠাৎ কী মনে করে? মঞ্জু বলল।

—দেখতে এলাম।

—কেন?

—এমনি।

মঞ্জুর হঠাৎ মনে হল, টাকাপয়সা চাইবে না তো?

জিগ্যেস করে ফেলল—ব্যবসাপতি কেমন চলছে?

—একদম ভাল চলছে না। বড়-বড় কারখানা সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর একটা সামান্য লেদ কারখানা...

—চলছে তো, না কি...

—চলছে টুকটাক করে।

—আর শরীর কেমন আছে, শরীর?

কার্তিক বলল—শরীর?

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল, যেন উত্তর খুঁজছে।

কার্তিক আবার উচ্চারণ করল 'শরীইইর', যেন 'হায় শরীর' কিংবা 'ধিক শরীর'।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ফুসফুসের হাওয়াটা মুখ দিয়ে বার করে দিল—যেন 'শরীর' শব্দটাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিল কার্তিক। তারপর আবার অনেকটা নতুন বাতাস টেনে নিল ফুসফুসে। বলল, ঝুমা মারা গিয়েছে।

ঝুমা সেই মেয়েটার নাম। যে কার্তিককে ছিনিয়ে নিয়েছিল। যে ওর সতীন। কার্তিকের মুখ দেখে মঞ্জু বুঝল, ও দুঃখে আছে। একটা অলীক চামচিকে 'বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে' বলতে-বলতে উড়ে গেল। কিন্তু মঞ্জুর মনের ভিতরে ওই মৃত্যুসংবাদ কোনও আনন্দ দিল না। মঞ্জুর ভিতরে বসে-থাকা বারো বছর আগেকার মঞ্জুটাও হাততালি দিয়ে উঠল না। মঞ্জুর ভিতরে বরং তার যৌন-শীতলতার কারণে একটা অপরাধবোধ-ই ছিল। কৈশোরের যে যৌন-উৎপীড়নজনিত ট্রমা মঞ্জুকে শীতল করে রেখেছিল, যৌনভীতি দিয়েছিল—সেই ট্রমা হয়তো এখন আর নেই। তবে এই দীর্ঘ বিচ্ছেদে কখনও স্বপ্নেও কার্তিককে বলেনি—'পরশ করে দেখ দেখি রোমাঞ্চ জাগে কি...।'

—কী হয়েছিল? হঠাৎ কেন...

'মৃত্যু' শব্দটা বা ওর কাছাকাছি কোনও শব্দ মুখ দিয়ে বেরল না মঞ্জুর।

—ক্যানসার হয়েছিল... অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল...।

মঞ্জু চুপ করে রইল। এই যে এত দুঃখ লোকটার মুখে, তা বউ মরে গেল বলে, না কি টাকা খরচ হয়ে গেল বলে?

'বউ' কথাটা মনে আসতেই মঞ্জুর ভিতরের পুরনো মঞ্জু প্রতিবাদ করে উঠল—বউ না, বউ না। বিয়ে তো করেনি...।

এই মঞ্জু বলল—কে জানে করেছে কি না। আইনত তো পারে না। তবে নিশ্চয়ই কালীঘাট বা অন্য কোথাও...।

—কবে হল ঘটনাটা? মঞ্জু জিগ্যেস করল।

—মাসখানেক হয়ে গেল।

—অনেক দিন ভুগেছিল?

—ভুগছিল। অম্বল, পেট গরম, তারপর রক্ত পায়খানা। ক্যানসার ধরা পড়ার পর আর দু'মাস বেঁচে ছিল। ওই দু'মাসেই আমি ফতুর হয়ে গিয়েছি।

মঞ্জুর হঠাৎ মনে হল—টাকাপয়সা চাইবে না তো এবার? মঞ্জু আগ বাড়িয়ে বলে দিল—আমার কোম্পানির অবস্থা খুব খারাপ। মাইনেপত্র বাকি পড়ে আছে।

কার্তিক বলল—তা তো বুঝতেই পারছি। পাওনাদারগুলো আসছে...।

মাথা চুলকোল কার্তিক।

কার্তিককে এত কাঁচুমাচু অবস্থায় কখনও দ্যাখেনি মঞ্জু। মঞ্জুর সঙ্গে ছাড়াছাড়িটা হঠাৎ করে তো হয়নি, আস্তে-আস্তে হয়েছে। 'ধুর ব্যাঙ, এই কাঠের সঙ্গে শোওয়ার চেয়ে কোলবালিশ জড়িয়ে শোওয়া ভাল'—থেকে—'ধুর ল্যাওড়া, সামনের হপ্তাতেই চলে যাব' হতে সময় তো লেগেছিলই। 'এমন একটা ছেলের জন্ম দিলে তুমি, ছিঃ।' 'ঠ্যাং ফাঁক করো না কেন? অ্যাঁ? যেন মরচে পড়া প্লায়াস। মরচে পড়া প্লায়াস কি করে খুলতে হয় জানো? অ্যাসিডে চুবিয়ে। গর্তে ফানেল ঢুকিয়ে না, অ্যাসিড ঢেলে দেব। নাইট্রিক অ্যাসিড।'

ওরকম সম্পর্কের দিনে ওই মেয়েটাকে দেখেছে মঞ্জু বেশ কয়েকবার, কার্তিকের সঙ্গেই। একবারই জিগ্যেস করেছিল। উত্তরটা ছিল 'ঢালার জায়গা। এই বয়সে বউ থাকতে হাওড়া-শেয়ালদা করব না কি?' ও যখন চলে গেল বাড়ি ছেড়ে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে—বলল, 'এই ঘরের ভাড়া আমি গুনতে পারব না, তোমার মাইগা ছেলের কোনও দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি চললাম।'

আমি কী করব? মঞ্জু জিগ্যেস করেছিল। 'যা ছিঁড়বে ছেঁড়ো—আমি কী জানি?'—এটাই ছিল জবাব।

দু'টো হ্যান্ডব্যাগ আর একটা ট্রাঙ্ক রিকশায় তুলে চলে গিয়েছিল কার্তিক। এরপরও কার্তিকের সঙ্গে দেখা হয়েছে রাস্তায়। ওই মেয়েটার সঙ্গে দেখেছে রিকশায়। দেখে মঞ্জু মুখ ফিরিয়েছে। কার্তিক নয়। কার্তিক যেন ডাঁট নিয়ে, কলার তুলে বলেছে, 'দ্যাখো, দ্যাখো, আমার মেয়েছেলের অভাব হয় না।'

রান্না করে খাচ্ছো, না কি হোটেলে? মঞ্জু জিগ্যেস করল।

—রান্না-ফান্না কি ব্যাটাছেলের পোষায়?

—ও!

—আমারও গ্যাস-অম্বল হয়ে গিয়েছে।

—ও।

কার্তিক আবার মাথা চুলকোল। 'গ্যাস-অম্বল হয়ে গিয়েছে' বলার পরও মঞ্জুর নির্লিপ্ততা দেখে এবার কী বলবে ঠিক করতে পারল না। বলার কিছু পাচ্ছিল না বলেই যেন বলে ফেলল—ওর খবর কী?

'ও' মানে কী বলতে চাইছে মঞ্জু সেটা বুঝলেও, ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, 'ও' মানে?

—ছেলেটা, ছেলেটা।

—ঠিকই আছে।

—একইরকম আছে? আগের মতোই?

—আগের চেয়ে ভাল আছে। পড়াশোনায় ভাল হয়েছে। লিখছে। বড়-বড় পত্রিকায় ওর কবিতা ছাপা হচ্ছে। গলায় দৃঢ়তা এনে বলল মঞ্জু।

কার্তিক বলল, পড়াশোনার কথা বলছি না। আগের মতোই হাবভাব? না কি একটু চেঞ্জ হয়েছে?

—কী আবার চেঞ্জ হবে? আগের মতো হাবভাব তো কী হয়েছে? মস্তানি করার চেয়ে ওরকম থাকা ভাল।

মঞ্জুর কথা মঞ্জুর কাছেই নতুন শোনাল। আর এরকমভাবে বলতে পেরে মন্দ লাগছে না। মঞ্জুর এতক্ষণ পর মনে হল একটু লৌকিকতা করা দরকার। বিয়ের পর বাড়ি এলে চা করে দিত, কিংবা বুঝে নিতে হত এখন চা খাবে কি না, বুঝে নিতে হত এখন শশা কেটে দিতে হবে কি না, না কি আলুভাজা করে দিতে হবে... ওগুলো ছিল স্ত্রী'র কর্তব্য। এখন লৌকিকতা।

মঞ্জু বলল, চা খাবে তো?

কার্তিক বলল, ভালই তো হয়।

কাছেই চায়ের দোকান। দোকানদার ভাবল নতুন ট্যুরের পার্টি। দোকানদার চায় ট্যুর কোম্পানিটা টিকে থাকুক। কয়েক কাপ চা বেশি বিক্রি হয়।

চা দোকানির নাম মিঠুন। বলল—আপনাদের সাউথ ইন্ডিয়া টিরিপটার খুব সুখ্যাত করে গেল দু'জন, এইমাত্র।

মিঠুনকে এরকম শেখানো আছে।

কোনও পার্টিকে চা খাওয়াতে নিয়ে এলে এরকম দু'একটা ডায়ালগ ছেড়ে দিতে হয়। দাঁড়িয়ে রইল। বলল, গরম খেতে নিষেধ করেছে ডাক্তার। নাড়িতে ঘা হয়ে গিয়েছে কি না...। গরম খেলে জ্বালা করে।

—তবে ফুঁ মেরে খাও...মঞ্জু বলে।

—সময় দিলে সব কিছুই ঠান্ডা হয়ে যায়...বুঝলে...।

কার্তিক মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে চোখ মারার চেষ্টা করল।

মঞ্জু কোনও কথা না-বলে নিজের চায়ের গেলাসে ফুঁ দিতে লাগল।

কার্তিক বলল, বসি, অ্যাঁ?

বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসল। চায়ের গেলাসটা পাশে রাখল। আঙুল মটকাল, এবং ভক করে বলে ফেলল, আবার আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি না মঞ্জু?

মঞ্জু ভেবেছিল, রোগ-ব্যাধির কথা বলে টাকাই চাইবে। এই ধরনের প্রস্তাবও যে আসতে পারে, এমনটাও ভেবেছিল মঞ্জু? যখন কার্তিক বলছিল—সময় দিলে সব কিছুই ঠান্ডা হয়ে যায়—বোঝাতে চাইছিল ও এখন 'ঠান্ডা' হয়ে গিয়েছে, তখন ওর বলতে ইচ্ছে করছিল, সময় দিলে কেউ-কেউ গরমও হয়। ওর মনে পড়ছিল তসলিমার লাইন, 'ভাঁটার দিন তো শেষ হয়েছে জোয়ার আছে বাকি'। বলে লাভ নেই। মঞ্জু চুপচাপ চা খেতে লাগল।

—কথা বলছ না যে?

—কী বলব?

—আমি যা বললাম তার উত্তরে হ্যাঁ-না কিছু বলবে তো?

মঞ্জু বলল, আমার কথা মনে হল তোমার লাভার-টা নেই বলে, তাই তো? আগে তো দেখতাম খুব মস্তিতে ছিলে। রিকশায় ওই মেয়েটাকে পাশে বসিয়ে রঙে চলে গিয়েছ, ঠিক যেন কার্তিক ঠাকুর।

কার্তিক বলল—হুঃ, কার্তিক! কার্তিক ঠাকুর, কার্তিকের বাবরি চুল, ছাঁটা গোঁপ, মুখে মুচকি হাসি। সবাই ভাবে কার্তিক খুব ভাল আছে। ফাস্ট কেলাস আছে। এদিকে যে কার্তিকের পোঁদে

গরানকাঠ ঢোকানো আছে, আর সেটা মাথায় গিয়ে ঠেকেছে—সে-কথা কার্তিক জানে আর জানে কুমোর। আমি ওর বডির মোহে ওর সঙ্গে গিয়েছি, কিন্তু ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছি। হাজার বায়নাক্কা। তারপর ওর চিকিৎসায় তো সর্বস্ব গিয়েছে। তাই বলছিলাম আবার যদি নতুন করে... বুঝে গিয়েছি শোয়াশুয়িই শেষ কথা নয়। দিল হল আসল। দ্যাখো না, কোনও বাচ্চা করিনি। আমি ভেবেছিলাম বিজনেসে যা হয়, যা রাখতে পারব, তোমাদেরই থাকবে। কেন মিছিমিছি দু'টো ঘরের ভাড়া দিচ্ছি। এখন তো একসঙ্গেই থাকতে পারি ভাই-বোনের মতো। পারি না?

মঞ্জু চুপ করে ছিল।

কার্তিক আবার বলে, মনে আছে? বিয়ের পরে শোলা খেলা?

মনে পড়ল মঞ্জুর। বাসি বিয়ের দিনের মেয়েলি খেলা। মাটির হাঁড়িতে জল। চোখ বেঁধে দেওয়া। হিহি হাসি, হাহা হাসি। মাছ ভাজার গন্ধ আসছে। হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল একটা ছোট্ট শোলার টুকরো। এই যে বরমশাই, নৌকোটা জলে ছেড়ে দাও। মঞ্জু, তোর নৌকোটা জলে ছাড়, জলে ছাড়...। নে, এবার চোখ খোল। নাও ভাইস্যা যায়, আহা নাও ভাইস্যা যায়... এক সঙ্গে চল... এক সঙ্গে চল...। সব মনে পড়ে। শোলার টুকরো দু'টো দু'পাশে চলতে-চলতে বেশ কিছুটা পরে আবার কাছাকাছি এসেছিল। গায়ে-গায়ে লেগেছিল। সবাই বলল, বুড়ো বয়সে খুব পিরিত হবে।

মঞ্জু বলল, এখন কিছু বলছি না। এত বছর নিজের মতো থেকে একটা জীবন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। এখন আবার নতুন অভ্যেস তৈরি করতে হবে, পারব? কে জানে? পুরনো অভ্যেস তো ভুলে গিয়েছি।

—পুরনো অভ্যেসগুলো তেমন আর নেই। পেটে আলসার কি না, সেদ্ধ-সেদ্ধ খাই। দুধভাত খাই। তোমাকে ভাজাভুজি করতে হবে না আর। শশা কাটতে হবে না। আর বললুম তো রাতেও কোন ডিসটার্ব নেই। চুপ মেরে ঘুমিয়ে থাকব।

মঞ্জু বলে, এখনই এতটা এগিয়ে ভাবছ কেন? ছেলের সঙ্গে কথা বলি আগে...।

—ছেলে তো এখনও রোজগার করে খাওয়ায় না, খাওয়াবে বলেও মনে হয় না। তুমিই ওকে খাওয়াও। কেন ওর পারমিশন নিতে যাবে? তুমি যা বলবে তাই হবে।

—তাই হয় না কি? ছেলে বড় হয়েছে না? ও যদি তোমার সঙ্গে থাকতে না চায়, পারবে ওকে আলাদা হোস্টেলে রাখতে?

—কদ্দুর লেখাপড়া করল ও?

—বাংলা নিয়ে বিএ অনার্স দিল। এতক্ষণ পরে জিগ্যেস করলে, ও কী করছে...?

—ও কিছু না, ও কিছু না। তোমার সঙ্গে এতদিন পর দেখা হল কি না, এই জন্য তোমার কথাই জিগ্যেস করছিলাম। দেখছিলাম তুমি এখনও সিঁদুর দিচ্ছো মাথায়। হাতে শাঁখা, নোয়া। মনে-মনে আমাকে ত্যাগ করোনি তুমি। আর তোমার শাঁখা-সিঁদুরের জোরেই বলতে হবে আমি বেঁচে আছি। ঝুমার যখন গ্যাস-অম্বল চলছিল, তখন আমারও ওরকম চলছিল। কিছুই খাওয়া হত না। জলভাত, থানকুনি পাতার ঝোল-ভাত। তারপর ওকে যখন হসপিটালে দিলুম, তখন আমার খাওয়া নেই, নাওয়া নেই। আলসার হয়ে গেল। আমারও রক্ত পায়খানা হয়েছিল। ভাবলুম আমারও বুঝি ক্যানসার হল। তারপর পিছনে পাইপ-টাইপ ঢুকিয়ে কীসব টেস্ট হল।

বলল, আলসার। ডেলি-ডেলি চল্লিশ টাকার ওষুধ খাচ্ছি। এদিকে বাড়িতেও রান্না করা হচ্ছে না। হোটেলে ভাতে জল মেখে, চটকে একটু ডালের জল আর আলুসেদ্ধ দিয়ে কোনওরকমে ভাত খাই। তুমি আমাকে বাঁচাও।

মঞ্জুর পিঠে হাত দিয়ে দিল কার্তিক। মঞ্জু আশ্চর্য কৌণিক প্রক্রিয়ায় পিঠটা সরিয়ে নিল। বাস-টাসে এভাবে এখনও এ ব্যাপারগুলো করতে হয়—এই প্রায়-মেনোপজে এসেও।

—তবে আসি? কার্তিক বলল। চোখে ভিক্ষা।

মঞ্জু বলল, ঠিক আছে।

এরকম ডাঁট কখনও দেখায়নি। 'ঠিক আছে' বলার সময় গলাটা উঠেছিল খাদে। মঞ্জু ওর চলে যাওয়াটা দেখল। ওটা দেখতে বেশ ভাল লাগল মঞ্জুর। আজকের খবর কাগজে দেখা রাশিফলটা মিলে গেল বেশ। লেখা ছিল 'মনস্কামনা পূরণ হবে।' কার্তিকের সঙ্গে মিলন হওয়ার কোনও মনস্কামনা ছিল না ওর। কোনও ঠাকুরের কাছে এরকম চায়নি। যখন পরির জন্য ঢিল বেঁধেছে কোনও অলৌকিক বৃক্ষশাখায়, সেই সঙ্গে 'ওর সঙ্গে মিলিয়ে দাও' বলে আর একটা ঢিল বাঁধেনি যদিও কোনও দিন। ওর মনের ভিতরে যত্নে রাখা কোনও কৌটোয় একটা ইচ্ছে পোষা ছিল?—লোকটা মাথা নিচু করে আর একবার ওর কাছে আসুক।

ওই মেয়েটার মৃত্যু মঞ্জুর মনস্কামনা মেটাল। ওই মরে যাওয়া মেয়েটার প্রতি কৃতজ্ঞ রইল মঞ্জু।

এবার হাতটা নিশপিশ করে উঠল একবার। মোবাইলটা বের করল ব্যাগ থেকে। অনিকেতের নম্বরটা ফুটে উঠল। 'একটা খবর আছে ডাবুদা...।' কিন্তু সবুজ বোতামটা শেষ অবদি টিপল না।

পরিকে বললে ও রাজি হবে না। এই বাড়িতে এত বছর আছে। আগে তো এখানে ছিল না। কার্তিক যখন ওর মালপত্র নিয়ে চলে গেল, তখন ছিল নয়াপট্টিতে। রাস্তার ওপর ঘর। বস্তি বাড়ি মনে হত না। জানলা ছিল কাচ লাগানো। বারান্দা কেটে বাথরুম করা ছিল। বাইরের কল থেকে পাইপ টেনে চৌবাচ্চায় জল ভরা যেত। ওই ঘরের ভাড়া বেশি ছিল। কম ভাড়ার ঘরে এসে ঠেকেছে। রাস্তা থেকে অনেকটা ভিতরে। কার্তিক যে-বাড়িতে থাকে—সেটা কেমন দেখেনি ও। ওখানে কি দু'টো ঘর আছে? পরির তো একটা নিজস্ব ঘর লাগে। ওর বন্ধুবান্ধব আসে। পড়াশোনাই করে। কেন খারাপ ভাবতে যাব? পড়াশোনা না-করলে এত ভাল রেজাল্ট হয়?

'ঠাকুর ঠিক আছে, বুঝলি, ঠিক বিচার করে।' এই কথাটা দিয়ে শুরু করল মঞ্জু। পরি জিগ্যেস করল, কী বিচার? মঞ্জু তখন সব বলল। কার্তিকের অনুরোধটা একটু বাড়িয়েই বলল। বলল, শতবার হাতজোড় করল লোকটা...। কতবার তোর কথাও জিগ্যেস করল।

—কী বললে?

—বললাম তোর সঙ্গে কথা বলে বলব। তোর যা ইচ্ছে।

পরি বলল—দ্যাখো মা, আমি ফ্যাশন নিয়ে পড়ব। নিজের পায়ে দাঁড়াব। এটা পড়তে গেলে কিছু টাকাপয়সা খরচ হবে। অনিকেত কাকুকেও বলেছি কোনও সোর্স থেকে যদি কোনও স্পনসরশিপ জোগাড় করে দিতে পারে। তোমার হাজব্যান্ড যদি আমাকে পড়াশোনার

খরচা দেয় যেখানে থাকতে বলবে থাকব। ক'দিনই-বা থাকব? আমি তো হোস্টেলে চলে যাব।

—কলকাতা থেকে পড়া যায় না? মঞ্জু জিগ্যেস করেছিল।

বলেছিল—এখানে যেটা এনআইএফটি, ওখানে হোস্টেলেই থাকতে হয়। ওখানে চান্স পাওয়াটা খুব কঠিন। দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চণ্ডীগড় এসব জায়গায় অনেক ভাল-ভাল ইনস্টিটিউট আছে।

মঞ্জু বলল—কেনই বা ফ্যাশন-ট্যাশন পড়ছিস? বাংলায় এমএ দিয়ে কলেজে পড়া না। ওই তো তোর কাছ থেকে নাম শুনি—সোমনাথ, ও তো তাই করেছে।

—এই জন্য ওঁকে কত লড়াই করতে হয়েছে জানো? আমি পারব না। ফ্যাশন লাইনে আমাদের মতো অনেকেই যায়। ওখানে প্যাঁক দেয় না। ওখানে মন দিয়ে কাজ করতে পারব।

—কত টাকা লাগে রে ওসব পড়তে?

—মিনিমাম দু'লাখ। তিন...চার...সাত...সিমবায়োসিস-এ দশ লাখ।

—কোথায় পাব বল তো এত টাকা...

মাথা চুলকোতে থাকে মঞ্জু।

—যেভাবে হোক জোগাড় করে দিও না মা...কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেব। 'ছেলে হয়েও ঠিকমতো ব্যাটাছেলে হল না...' এই আফসোস ঘুচিয়ে দেব। ব্যাটাছেলের প্রধান কাজ কী মা? ধর্ষণ করা?

—ধুর। কী যে বলিস?

—বলো, প্রধান কাজ কী তবে?

—আগলে রাখা।

—আগলে তখনই রাখা যায়, যখন টাকা থাকে। নাই টাকা—সব ফাঁকা। মা, আমি তো তোমাদের চোখে মিনমিনে। যদি নেতাজির মতো আমি হাত নাড়িয়ে বলি তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। সবাই হাসবে। এসব ডায়ালগ যারা দেয় ওদের মাস্‌ল ফুলো-ফুলো। কিন্তু আমি বলছি মা, তোমরা আমাকে পড়তে দাও, আমি তোমাদের স্বাচ্ছন্দ্য দেব।

কোম্পানিটা ভাল চলছে না। মালিক মারা যাওয়ার পর দুই ভাই এটা দেখাশোনা করত। ভাইদের মধ্যে গন্ডগোল। এক ভাই নর্থ ইন্ডিয়া ট্যুরের দায়িত্বে, অন্য ভাই সাউথ ইন্ডিয়া। কিছু দিন আগে রাজধানীতে নিয়ে যাবে বলে কালকায় নিয়ে গিয়েছে। থ্রি স্টার হোটেলে রাখবে বলে বাজে হোটেলে রেখেছে। লোকজন এসে টাকা ফেরত চাইছে। ছোট ভাই বলছে এসব দু'নম্বরিতে ও নেই। ছোট ভাই চাইল, এই 'দেশ বিদেশ' নামটা ছেড়ে দিয়ে নতুন ট্রাভেল কোম্পানি করবে। এই কোম্পানির শেয়ার ছেড়ে দিচ্ছে। টাকা দিয়ে দাও। কিছু বোধহয় দিয়ে দিয়েছে। ছোট ভাইটা এখন আর বসে না।

পরদিন অফিসে গিয়ে একের-পর-এক ফোন পেতে লাগল মঞ্জু। দিল্লি থেকে বলছে, আপনাদের লোককে পাচ্ছি না। পার্বতী হোটেলে উঠিয়ে দিয়ে ফুটে গিয়েছে। আজ 'সাইড সিং' করার কথা...। বেশির ভাগ ক্লায়েন্ট 'সাইট সিয়িং' বলে না। ফোন আসতে লাগল—এই যে দিদি, সকাল থেকে বসে আছি, এখন বেলা সাড়ে বারোটা...

ঘোষবাবু আজও আসেনি। মুখার্জিবাবু দু'টোর পর আসেন। ছোট স্যর তো আসেই না, বড় স্যরও ফোন ধরছে না।

সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণের একটা টিম গিয়েছে দু'দিন আগে। চব্বিশ জনের টিম। দিল্লি থেকে শুরু। গেঁদু আর লোটন ওই টিমে গিয়েছে। লোটনকে একটা মোবাইল দিয়েছে কোম্পানি। সুইচ্‌ড অফ। পর-পর ফোন। ফোন ধরতে ভয় পাচ্ছে মঞ্জু। মঞ্জুর হাত কাঁপছে। অনেকক্ষণ পরে ফোনটা ধরল। হিন্দিতে গালাগাল। পার্বতী হোটেল বলছে—ওরা টাকা না-পেলে দুপুরের খাওয়া দেবে না।

বড় স্যর ফোন ধরছে না কেন? কেন গতকালও আসেনি? ঘোষবাবুও আসেনি কেন? ওর এখন কী করা উচিত? বুকের ভিতর থেকে একটা আর্ত চিৎকার বের হয়, গেঁদু, গেঁদু রে...ফিরে আয়।

গেঁদু, বিমল, লোটন, সুবলদা, অধীরবাবু এরা কেউ মাইনে করা স্টাফ নয়। এরা বহু দিন ধরে আছে। এরাই তো যায়। কেউ সাউথ-টা ভাল জানে, কেউ কাশ্মীর, কেউ নর্থ। প্রতিটা ট্যুরের জন্য টাকা পায়।

কয়েকটা হোটেলের সঙ্গে ব্যবস্থা থাকে, ওরা চেক-এ পেমেন্ট নেয়। কিন্তু ওদের হাতে অনেক ক্যাশ থাকে। ওদের কাছে লাখ দু'য়েকের মতো ক্যাশ ছিল। দু'লক্ষ টাকা নিয়ে দু'জন পালাল। এরকম আগে যে কখনও হয়নি।

ঘোষবাবু আসছে না কেন? এখন অবশ্য কোনও ট্যুর নেই। একটা দল আসাম-অরুণাচল ঘুরে এল। আর একটা দল উত্তর ভারত। ঘোষবাবুই টাকাপয়সার ব্যাপারটা দেখেন, হোটেল বুকিং করেন। কনডাক্টর ঠিক করেন। মুখার্জিবাবু বেলার দিকে আসেন। হিসেবটা দেখেন। খাতাপত্র ঠিক রাখেন। আবার ফোন বাজছে। ফোন চ্যাঁচাচ্ছে। ফোন আর্ত চিৎকার করছে। অফিস ঘরের তালা বন্ধ করে ছুটল মালিকের বাড়িতে।

দাদা-বউদি দু'জনে মিলে তারাপীঠ গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর ফোনে পেল বড় স্যরকে। ওঁদের 'স্যর' বলতে হয়। ওদের বাবাকে 'বাবু' ডাকত সবাই। মঞ্জু ডাকত 'বাবু স্যর'। 'বাবু স্যর' ছেলেদের 'বড় খোকা', 'ছোট খোকা' বলেই বলত। পরে খোকাবাবু বাদ গিয়েছে। বড় খোকাবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি। ফোনটা পেয়েই বড় স্যর খোকাবাবুর মতোই বলে ফেলল, বড় বিপদে পড়ে গিয়েছি। ছোট ভাইটা মামলা করে দিয়েছে। ডায়েরি করেছে। মায়ের কাছে চলে গেলাম...মঞ্জু বলল, আরও বিপদ স্যর...ভীষণ বিপদ...।

বড় স্যর সেই রাত্রেই ফিরেছিলেন। পরদিন গেঁদু এবং লোটনের নামে ডায়েরি করা হয় থানায়। এর দু'দিন পরই খবর কাগজে বের হয় ভ্রমণ সংস্থার প্রতারণা।

অনিকেত এসব কিছুই জানে না। একটা মেসেজ পায়—'পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। বাঁচা।'

অনিকেত বুঝতে পারে না ওকে কেন পুলিশে ধরবে? অনিকেত তখন কলকাতা ছিল না। চাইবাসায়। ও ফোন করে। মঞ্জু বলে, ডাবুদা ভীষণ বিপদ...।

আর কিছু শুনতে পায় না। শুধু একটা পুরুষ কণ্ঠস্বরে শোনে—মোবাইলে কথা বলা যাবে না থানায়। ওটা আমাকে দিন, দিন এক্ষুনি...।

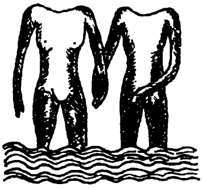

অনিকেত স্বপ্ন দেখছিল 'ছেলেধরা'-'ছেলেধরা' বলে ওর পিছনে অনেক লোক ছুটছে। তারপর ওকে ধরে বেদম মারছে। ও যে 'ছেলেধরা' নয়, সেটা বোঝাতে পারছে না কিছুতেই। ওর পেটে লাথি মারল কেউ। খুব ব্যথা পেল। ব্যথায় ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নেও ব্যথা লাগে? ঘুম ভেঙে যেতে নিশ্চিন্ত হল। যাক, কেউ মারছে না। আবার ঘুমোতে চেষ্টা করল। সেই একই স্বপ্ন আবার। ইট দিয়ে মেরে ঠোঁট থেতলে দিয়েছে, দাঁত ভেঙে দিয়েছে। ও বলার চেষ্টা করছে, 'বিশ্বাস করুন, আমি সরকারি কর্মচারী। আমি কেন ছেলেধরা হতে যাব?' কিন্তু কথা বলতে পারছে না। দাঁত নেই, ঠোঁট নেই... একই স্বপ্ন সারারাত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। রোদ্দুর উঠে গেলে, রাস্তায় সাইকেলের কিড়িং শুরু হলে, স্বপ্নরা চলে গেল, তারপরও বেশ কিছুক্ষণ মটকা মেরে পড়ে থাকল অনিকেত। বিছানা ছাড়ল বেশ বেলাতে। জাহানাবাদিদি ছিলেন। উনি নেনুয়া-র খোসা ছাড়াচ্ছিলেন। 'নেনুয়া' মানে ধুঁদুল।

জাহানাবাদিদি বললেন, গুড মর্নিং, জয় শ্রীরামজি কি। আজ থোড়া লেট রাইজিং হো গিয়া আপকা।

অনিকেত বলল, বহুত বুঢ়া ড্রিম দেখা ম্যায়নে।

স্বপ্নের কথা ও বলল কিছুটা। জাহানাবাদি বললেন, মার খাওয়ার স্বপ্ন দেখছ কেন? মার দেওয়ার স্বপ্ন দ্যাখো। সকাল-সকাল হনুমান মন্দিরে ভোগ চড়িয়ে এসো—আর রাত্রে শোওয়ার সময় হনুমান চালিশা পড়ে নাও, তা হলে আর এরকম পড়ে-পড়ে মার খেতে হবে না।

এই ধরনের স্বপ্ন খুব একটা দ্যাখে না অনিকেত। স্বপ্নে ভগ্নপ্রাসাদ, প্রাসাদের অলিগলির মধ্যে পথ হারানোর স্বপ্ন দ্যাখে মাঝে-মাঝে। এসব স্বপ্নের ভিতরে নাকি 'গূঢ় মানে' লুকিয়ে থাকে। মনোবিদরা এসব স্বপ্ন বিশ্লেষণ করতে পারেন। পঞ্জিকাতে স্বপ্নতত্ত্ব থাকে। শুক্লা প্রতিপদে স্বপ্ন সুখের কারণ; দ্বিতীয়ার স্বপ্নে হয় আত্মীয় মরণ—এরকম সব থাকে। আবার প্রহর অনুযায়ীও স্বপ্নফল হয়। দ্বিতীয় প্রহরে স্বপ্ন নিষ্ফলা রয়, চতুর্থ প্রহরে স্বপ্ন ফলবতী হয়। তা ছাড়া স্বপ্নের বিষয় অনুযায়ী ফল লাভের কথাও থাকে। স্বপ্নে শৃগাল দেখিলে বন্ধুলাভ, সর্প দেখিলে রাজনুগ্রহ...। ফ্রয়েডের চিন্তায় 'সাপ' যৌন আকাঙ্ক্ষা। বিশেষত মেয়েদের। আর পুরুষের ক্ষেত্রে আপেল, কমলালেবু ইত্যাদি অবদমিত ইচ্ছার প্রতীক হিসেবে আসে। এগুলো 'স্তন'-এর প্রতীক। জারোয়ারা আপেল দ্যাখেনি, ওরা তবে ডাব দেখবে নিশ্চয়। সাহারা-র যাযাবররা তো খেজুর ছাড়া কিছুই দ্যাখেনি, ওরা কী দেখবে? তবে ছেলেধরা-র স্বপ্ন নিয়ে খনা বা ফ্রয়েড কেউ কিছু বলেনি। তবে স্বপ্নটা তো ছেলেধরা-র নয়, মার খাওয়ার। অনেকে মিলে ওকে মারছে। মানে, স্বপ্নে মার খাচ্ছে। তবে কি ওর 'সুপার ইগো' বা 'বিবেক' বলে যে-বস্তু আছে, সেটাই ওকে মার খাওয়াচ্ছে? বলছে তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত? ওই 'সুপার ইগো'-

টাই ছেলেধরা বানিয়ে মার খাওয়াচ্ছে? কেন মার খাওয়াচ্ছে? কী দোষ?

সকালবেলা চায়ে চুমুক দিতে-দিতে দোষ স্বীকার করে অনিকেত। সামনে বসে আছে 'ফাদার'। 'ফাদার' মানে জাহানাবাদি। জাহানাবাদি তখন হনুমান-মাহাত্ম্য থেকে মেথি-র জলে নেমে এসেছেন। বলছেন, মেথিকা পানি মে পেট ঠান্ডা রহতা হ্যায় আউর পেট গরম হোনে সে ভি খতরনাক খোয়াব দেখাই দেতা হ্যায়। পেট গরম হোনে সে কভি-কভি অ্যাইসা বুঢ়া খোয়াব দেখাই জাতা হ্যায়—জো কাপড়া খারাপ কর দেতা হ্যায়।

এই 'ফাদার'-কে ত্যাগ করে অনিকেত ছাদে গেল। নব বসন্তের কচিপাতা ভরা নিম গাছ। নিম গাছই এখন 'ফাদার'।

অনিকেত বলল, হে বৃক্ষ, আমি পাপ করেছি। এক মহিলা, সে আমার বাল্যসহচরী, কৈশোরে আমি অকস্মাৎ তার ওপরে দুষ্কর্ম করার চেষ্টা করেছিলাম। আমার এক নিকটাত্মীয়ও তার পূর্বে রোগ আরোগ্যের অছিলায় তার ওপর দুষ্কর্ম করে। ইত্যাদি কারণ হেতু একটি ট্রমা হয়, এবং পরবর্তী কালে যৌনশীতল হয়ে পড়ে। সেই মেয়েটি, মানে মহিলাটি, বিপদগ্রস্ত হয়ে আমাকে ফোন করে। বিনা দোষে ওকে পুলিশ ধরেছিল। জেল হাজতে ছিল কয়েক দিন। আমি যাইনি। ঝামেলায় জড়াইনি। এছাড়া একটি ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছিলাম বাড়িতে। ওকে হঠালাম। ও সমকামী এ জন্যই হঠালাম। অথচ মুখে আমি...

নিমগাছ ডাল নাড়াল দু'বার।

—বুঝেছি বৎস, বুঝেছি। তুমি প্রহার পাইয়াছ, যদিও-বা স্বপনে। বুঝিলাম তোমার অনুশোচনা হইয়াছে। ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করিলেন।

ঈশ্বর না-হয় ক্ষমা করলেন। মঞ্জু কি করল? আবার একটা অন্যায় হয়ে গেল না মঞ্জুর ওপর? পরিও ফোন করেছিল। বলেছিল, খুব ঝামেলায় পড়েছি কাকু—কী করব বুঝতে পারছি না, মা'কে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ।

অনিকেত জিগ্যেস করেছিল, শুধু কি তোমার মা, না কি মালিকদেরও ধরেছে?

ও বলেছিল, হ্যাঁ, ওদের বাড়ি থেকেও দু'জনকে ধরেছে। খবর কাগজে আমার মা-র নামও উঠে গিয়েছে। কাগজে ভ্রমণ সংস্থার প্রতারণা—এইসব লিখেছে। আপনি প্লিজ আসুন। আমি কী করব বুঝে উঠতে পারছি না!

অনিকেতও কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। ও তখন কী করে যায়? সামনে ZPCC নামে একটা মহা ঝামেলা ঝুলছে। ZPCC হল 'জোনাল প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেশন কমিটি'। সদ্যগঠিত ঝাড়খণ্ডে যেসব রেডিও স্টেশন আছে, তাদের কর্তাব্যক্তিরা এক জায়গায় বসে একটা মিটিং করেন। ঝাড়খণ্ডের মধ্যে পড়েছে রাঁচি, জামশেদপুর, হাজারিবাগ এবং চাইবাসা স্টেশন। মিটিং তো ইটিং ছাড়া হয় না। এসব ইটিং-এর খরচা সরকারি ভাবে বেশি দেখানো যায় না। চা-বিস্কুটের বরাদ্দ করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে তো অতিথেয়তা হয় না। বাইরে থেকে যাঁরা আসছেন, তাঁরা তো গেস্ট। অতিথি। ওঁরা ট্যুরের জন্য টিএ, ডিএ ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। কিন্তু ওঁদের তো বলা যায় না—আপনারা আপনাদের ডিএ-র টাকায় খাওয়াদাওয়া করে নিন...। অনিকেত যখন অন্যত্র মিটিংয়ে যায়, সেখানেও আতিথেয়তা পায়। মিটিং শুরু হতে-হতে বেলা হয়। কারণ দূর থেকে সবাই আসেন। শেষ হতে-হতে সন্ধে। তখন ফিরে যাওয়া যায় না। সন্ধের পর জঙ্গল পথ বিপজ্জনক। নকশাল। সতরাং রাতে থাকার ব্যবস্থা,

খাওয়াদাওয়া। খাওয়াদাওয়া বলতে পানাহারও হতে পারে। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট। এসব খরচ সরকারি তহবিল থেকে সরাসরি পাওয়া যায় না। ব্যবস্থা করতে হয়।

যে-যাঁর অর্জিত বুদ্ধিতে এই ব্যবস্থা করে নেন। যদি কোনও বড় ব্যবসায়ী থাকেন, তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে বেতারশিল্পী বানিয়ে সেই ব্যবসায়ীকে স্পনসর করে দেওয়া যায়; কোনও প্রতিষ্ঠানকে বেশ কিছুটা প্রচার দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে লাঞ্চ এবং ডিনারের ব্যবস্থা করানো যায়; কিংবা 'লন-এর ঘাস কাটা' 'জঙ্গল সাফাই' 'গাড়ি সারাই' ইত্যাদির ঝুটো বিল বানিয়ে কিছু টাকা এসব সৎ কাজের জন্য তোলা যায়। এসব বুদ্ধি বার করাই তো এফিশিয়েন্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এখানে তো মাত্র দশ-বারো হাজার টাকা তুললেই চলে যাচ্ছে। আরও কত বেশি 'এফিশিয়েন্ট'-দের লক্ষ-লক্ষ টাকা তুলতে হচ্ছে।

অনিকেত ব্যবসায়ীদের কাছে, বা মোটর গ্যারেজ মালিকদের কাছে যায়নি। ও একটু অন্যরকম করে ব্যাপারটা মেটাচ্ছে। কিছু দিন আগে ছৌ-নাচ নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করতে সরাইকেলা গিয়েছিল। সরাইকেলা-র রাজবাড়িতেও গিয়েছিল। বড় রাজপ্রাসাদটি এখন বহু শরিকে বিভক্ত। এক রাজপুত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, যার বয়েস পঁয়ষট্টি, ছৌ আকাদেমি-র সদস্য, বাড়িতে অসংখ্য ছৌ-মুখোশ জমিয়েছেন, সেই সঙ্গে উনি খাদ্যরসিক। তাঁর ঝুল ও ঝুলে-পড়া ঝাড়লণ্ঠনের তলায় রেক্সিন চটে-যাওয়া, সোফা-সিংহাসনে বসে, মুখে পানপরাগ রাখা উচ্চারণে রাজবাড়ির খাওয়াদাওয়া প্রসঙ্গে সরাইকেলার বিখ্যাত লাড্ডুর প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা করেছিলেন—কীভাবে ব্যসন দিয়ে ঝুরিভাজা বানিয়ে, সেটা চিনির গাঢ় রসে ফেলে, খোয়া ক্ষীর এবং এলাচ-চূর্ণ সহযোগে লাড্ডু বানাতে হয়। রাজপুত্র-কথিত লাড্ডুগঠন প্রণালীটা রেকর্ড করাই ছিল। ব্যবহার করা হয়নি। আবার চাইবাসা-র কেন্দ্রস্থলে কয়েকজন লোক বিকেলের দিকে চার চাকার ভ্যানে কচুরি, সিঙাড়া, জিলিপি, গজা, ভেজিটেব্‌ল, চপ ইত্যাদি বিক্রি করে। মাথায় এল, 'রাজা খায় প্রজা খায়' জাতীয় একটা প্রোগ্রাম বানালে কেমন হয়? যে ঠেলাওলাটি এসব বানায়, ওকে বলা হল সকালবেলা অফিসের ভিতরে গিয়ে পুরি, জিলিপি, গজা বানাতে হবে এবং এজন্য টাকা পাবে। একজন সহকারী নিয়ে এসেছিল। জিলিপি-গজা'র রেসিপি বলার জন্য নিয়ম অনুযায়ী ওরা দু'জন যা টাকা পেল, সেটা ওদের কচুরি কি সিঙাড়ার দামের চেয়ে বেশি। ওরাও খুশি। 'রাজা খায় প্রজা খায়' প্রোগ্রামটির পরিবর্তে সকালের জলখাবারটা হয়ে গেল। সার্কিট হাউসের ম্যানেজার নিজে রান্নাবান্না জানেন। দুই পাচক, এক সহকারী-সহ চারজনের প্যানেল ডিসকাশনে আধুনিক খাবারদাবার প্রস্তুত প্রণালী রেকর্ড করা হল—যথা বিভিন্ন স্যান্ডউইচ, কেক, ফ্রেঞ্চ ওমলেট ইত্যাদি। আদিবাসী অঞ্চলে চিজ স্যান্ডুউইচ আর কিমা-ভরা ফ্রেঞ্চ ওমলেট কে খাবে এসব চিন্তায় গুলি মেরে ওদের যে 'ফি' দেওয়া হল—'ডিসকাশন' বাবদ—সেটাকেই বলা হল—অফিসারগণ যে খাওয়াদাওয়া করেছেন, তার পেমেন্ট। ম্যানেজার কেটারিং-এর কাজটা সরকারিভাবে না-করে 'ব্যক্তিগত' ভাবে করে দিলেন। এরকম নানা বেআইনি কাজ করতে হয়েছে। 'বেআইনি' বলতে নেই, 'ট্যাক্টফুল' কাজ করার জন্য এখানে সময় দিতে হল। এটা নিয়েই মেতে রইল। তবে এটাও ঠিক, মাঝখানে দু-একদিনের জন্য চলেও যাওয়া যেত। অন্তত যে-দিন জামিনের কেসটা ছিল। যায়নি। যত ঝামেলায় জড়াবে ঝামেলা ততই জড়িয়ে ধরবে। জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই। অনেক হয়েছে। আর না। মঞ্জু যতই 'কাঁপন-টাপন' মেসেজ করুক না কেন, তেমন ইচ্ছে জাগে

না। তবে 'সম্পর্ক' শুধু ওই কর্মের জন্যই তো নয়, আরও তো কত অভিমুখ আছে, সহমর্মিতা বোধ, আরও কত কী আছে, নইলে তো কবেই বলে দিতে পারত, মঞ্জু, আমার অনেক কাজ আছে, আমাকে ডিস্টার্ব করিস না। অনিকেত ফোনে পরিমলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। ও বেচারা একা-একা থাকছে ভেবে জিগ্যেস করেছিল, কী খাচ্ছো, কোথায় খাচ্ছো, একা থাকতে অসুবিধে হচ্ছে কি না...। পরিমল জানিয়েছিল, অসুবিধে হচ্ছে না, চয়ন থাকছে তো...।

চয়ন মানে সেই ওর কবিবন্ধু? চান্স পেয়েই ঘরে 'পারিক' ঢুকিয়ে দিলে বাবা? বেশ বেশ। সর্বনাশ আর পৌষমাস। চয়নই উকিল ঠিক করে দিয়েছে। পরি জানিয়েছিল। আগে 'চয়নদা' বলত মনে হচ্ছে। আজকাল 'চয়ন' বলছে।

কিন্তু সেই উকিল তো তেমন কিছু করতে পারল না। সঙ্গে-সঙ্গে জামিন তো হল না। আইপিসি চারশো কুড়ি, চারশো ছয়, আর চৌত্রিশ ধারায় মামলাটা ছিল। প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ, প্রমাণ লোপ...। বেচারা মঞ্জু। ওদের লোক যদি ক্যাশ নিয়ে পালায় মঞ্জু কী করবে? ও তো বলেছিল, অমুক হোটেলে থাকবেন, অমুক সাইটে নিয়ে যাওয়া হবে। ওর বিরুদ্ধেই প্রতারণার মামলা। দুঃখী মেয়েটা। পড়াশোনায় তো খুব একটা খারাপ ছিল না। ফেলটেল তো করত না ক্লাসে। দেখতেও খারাপ তো নয়। বিয়েটাও ভাল হল না। না-পেল দাম্পত্যসুখ, না-পেল সন্তানসুখ। চাকরিটাতেও এই অবস্থা। ও কি জানত যে, ছেলেগুলো ক্যাশ নিয়ে পালাবে? ওকে অফিস থেকেই পুলিশ ধরে। প্রথমে থানা। থানায় থাকতে হয়েছে সারা রাত। পর দিন আদালতে ওঠানো হয়। জামিন হল না। আট দিন জেল হেফাজত। এর মধ্যে পুলিশ আবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনদিন চাইল। ইশ, কী ঝামেলায় পড়ল। কল্পনা মৈত্র তো জনসেবা করেন। উনি কিছু করতে পারেন না? উনি ভাববেন, এসব 'চিটিং কেস'-এ মাথা না-গলানোই ভাল।

এদিকে অনিকেতের অফিসেও 'মিটিং কাম ইটিং' শেষ। খুব সুচারু চিটিংও হয়ে গেল এখানে। কেউ জানতে পারল না। মিটিং প্রসিডিওর-এ সব কাজের কথা লেখা থাকে। ফ্রায়েড রাইস চিলি চিকেন হুইস্কি রাম সিঙাড়া-কচুরি এসব কথা থাকে না। যাই হোক, প্রসিডিওর-টাও লেখা শেষ। এবার কলকাতা না-যাওয়া মানে স্রেফ মঞ্জুর ওপর অন্যায় করা।

শিয়ালদা কোর্টে পরিমল। সঙ্গে এক যুবক। থুতনিতে অল্প দাড়ি। জিনস্-এর ওপর পাঞ্জাবি চাপানো। অনিকেতকে দেখে পরিমল খুশি হল। উঃ, বাঁচা গেল। আপনি এসেছেন, বাঁচলাম।

অনিকেতরা এখন কোর্টের বাইরে। উকিলের জন্য অপেক্ষা করছে। অন্য কোনও কাজে রয়েছে উকিল। একটা 'কপু' লেখা গাড়ি ঢুকে গেল। ওখানে থেকে বের হল চারজন। মঞ্জুকেও দেখল অনিকেত। বিরস, মলিন। সোজা ভিতরে কোথাও নিয়ে গেল। পরিমল বিহ্বল তাকাল। ছেলেটা পরি-র কাঁধে হাত দিয়ে সামান্য চাপল। বলতে চাইল, বি স্টেডি। আমি তো আছি। পরিমল চয়নকে নয়, অনিকেতকেই বলল, মা আজ জামিন পাবে তো কাকু?

অনিকেত মাথা চুলকোচ্ছিল। ছেলেটা বলল, ল'ইয়ার বলেছেন আজ হয়ে যাবে। ডোন্ট ওয়্যারি। 'ওই যে উকিল, ওই যে উকিল'। পরিমল আঙুল নির্দেশ করল। কালো কোট-পরা একজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল মাটির ভাঁড়ে। ওর দিকে ধেয়ে গেল পরিমল। পেছন-পেছন ওরা। পরিমল সোজাসুজি জিগ্যেস করল—আজ মা-কে ছেড়ে দেবে তো?

উকিল বলল—কাগজপত্র তো কিছু নেই। না আছে কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, না

আছে কোনও আইডেন্টিটি কার্ড, না আছে কোনও পে-স্লিপ। তোমার মা যে ওদের একটা 'পেটি' কর্মচারী সেটাই তো দেখাতে পারছি না। তবে আজকের জজ সাহেব আমার ইয়ার-দোস্ত। বুঝিয়ে বলব। জজ-রা তো বেশি কথা শুনতে চান না, কাগজ চাই, কাগজ। দেখি কী করতে পারি। আজ জামিন হয়ে যাবে আশা করি।

একটু দেখবেন স্যর। হাত কচলাচ্ছে পরিমল। উকিলবাবু একটু বক্রদৃষ্টিতে পরিমলের দিকে তাকাল। পরিমলের কথার ভঙ্গি এবং শরীরী ভাষায় ওর হয়তো ইরিটেশন হচ্ছে। ছেলেটাকে ডেকে নিল, একটু দূরে গিয়ে কী যেন বলল। পরিমল অনিকেতকে জানাল, উকিলের খরচটরচ সব এখন চয়নই দিচ্ছে। আপনাকে বলেছিলাম না, চয়নের কথা, আমার বন্ধু। খুব হেল্পফুল।

কীরকম খরচাপাতি হচ্ছে সে-বিষয়ে বিশদে গেল না অনিকেত। শুধু পিছনের হিপ পকেটের ওপরে হাতটা একবার চলে গেল, যেখানে পার্স আছে। এমন সময় পরিমল হঠাৎ অনিকেতের জামাটা খামচে ধরল। 'ওই যে, ওই যে, ওই লোকটা আমার বাবা।'

অনিকেত লোকটাকে দেখল। অনিকেত জানে, ওর নাম কার্তিক। ট্রাউজারের ওপর একটা ঝোলানো শার্ট। হাতা গোটানো। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এবার এদিকে আসছে। পরিমল বলল, এই রে...। লোকটা এল। পরিমলকে জিগ্যেস করল, তোমার মাকে ক'টার সময় তোলা হবে?

পরিমল ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, জানি না।

—উকিলকে জিগ্যেস করে জেনে নাওনি?

পরিমল আবার একইভাবে বলল, জানি না যান...।

লোকটা বলল, এমন করলে চলে? বিপদের দিনে সবাইকে নিয়েই তো চলতে হয়।

পরিমল ঠোঁটটা বেঁকালো। মেয়েরা 'খুব হয়েছে ঢং' কিংবা 'এঃ, আদেখলাপনা'—এসব বলার সময় যেমন ঠোঁট বেঁকায়, তেমন করেই।

পরিমল বলেই ফেলল—এতদিন কোথায় ছিলেন তবে? পরিমল অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

লোকটা চলে যায়। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা বিড়ি বার করে। তারপর বিড়িটা বুকপকেটে ঢুকিয়ে একটা সিগারেট কিনে ধোঁয়া ছাড়ে। তাকিয়ে থাকে মহাশূন্যে।

পরিমল বলল, মা বোধহয় তলে-তলে লোকটার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। অ্যারেস্ট হওয়ার পরদিনই বাড়ি চলে এসেছিল লোকটা। খাট-আলমারি এসব দেখছিল শকুনের মতো। জিগ্যেস করছিল, এবার কী করব। আমি বলে দিয়েছি—যা করার দেখা যাবে। লোকটাকে বসতেও বলিনি। চলে গিয়েছিল লোকটা। আবার এসেছে। অনিকেত বলল, তুমি ওঁর সন্তান কিনা, তোমার জন্য তো ওঁর একটু টেনশন হবেই।

—ওসব ফালতু কথা। এতদিন টেনশন হয়নি? মা'কে ছেড়ে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে থাকে...।

তা হলে পরিমল হয়তো জানে না যে, সেই গার্লফ্রেন্ড আর নেই। মঞ্জু সব কথা তা হলে পরিমলকে বলে না। মঞ্জু অনিকেতকে ফোন করে জানিয়েছিল কিছুদিন আগে। এসব গন্ডগোলের আগে। ফোন করে বলেছিল—আমায় একটা ফোন কর না প্লিজ। মোবাইলের খরচ বাঁচানোর জন্য ও এরকম করে থাকে। অনিকেত সঙ্গে-সঙ্গে করেনি। ইচ্ছে করেই।

ইতিমধ্যে আবার একটা মিস্‌ড কল পেল, তখন ফোন করেছিল।

—অ্যাই জানিস, আমার বরের সেই মহিলাটা মারা গিয়েছে।

—তো?

—সেটা জানালাম।

—এটা সুসংবাদ, না দুঃসংবাদ?

—মানে?

—বলছি এটা খারাপ খবর, না ভাল খবর?

—কোনও মরে যাওয়ার খবর কি ভাল খবর হয়?

—তা হলে খারাপ খবর। এই খারাপ খবরটা দেওয়ার জন্য এত হাঁকুপাঁকু করার কী হল?

—ভাল হোক-খারাপ হোক, এটা একটা খবর তো। খবরটা জানাতে ইচ্ছে করল, তাই জানালাম।

অনিকেত এ নিয়ে বেশি ঘাঁটাল না। শুধু 'ও আচ্ছা' বলে চুপ করে থাকল। মোবাইল ফোনে যে কোনও দাঁড়ি-কমা, পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। নৈঃশব্দ্যের দাম অনেক। 'ভাল থাকিস' বলে লাল সুইচ টিপে দেওয়া এবার। 'ভাল থাকিস' মানে হল, 'এবার ছাড়'—এটা এখন সবাই জানে। তক্ষুনি মঞ্জু বলল, লোকটা বড্ড একলা হয়ে গেল রে...। অনিকেত বলেছিল, তা হলে এবার তুই ওর সঙ্গে গিয়ে থাক...।

মঞ্জু বলেছিল, মাথাখারাপ? আর ওই ইস্কুলে যাই? বেশ আছি।

অনিকেত আবার বলল, ও আচ্ছা।

এবার 'ভাল থাকিস' বলে ছেড়ে দিল।

মনের কত রকম স্তর থাকে, কত খুপরি-ঘর...।

মঞ্জুর স্বামীর শয্যাসঙ্গিনীর মৃত্যুর খবরটায় একটু বিমর্ষ হয়েছিল। ওর তো মনখারাপের পয়েন্ট নেই, তবু কেন? ওর কি সেই মুহূর্তে 'পজেশন'-বোধ ঝিলিক মেরে উঠেছিল? মনে হয়েছিল, মঞ্জু-র ওপর ওর অধিকার কমে যাবে? ও জানে, যে কারণেই হোক, হয়তো কিছুটা অসহায়তা, কিছুটা সুবিধে পাওয়ার বাসনাজনিত কারণে মঞ্জু অনিকেতকে যথেষ্ট পাত্তা দেয়। ইচ্ছে করলে মঞ্জুকে নিয়ে অনেক কিছু করতে পারে। সেটা এবার চোট খাবে? মঞ্জু মোটেই সুন্দরী নয়, ইচ্ছে করলে অনেক ম্যানেজ করতে পারত, 'একস্ট্রা ম্যারিটাল' কোনও ব্যাপারই নয়—তবে সম্পর্কে জড়াতে ইচ্ছে হয় না, ঝামেলায় জড়াতে ইচ্ছে হয় না, তাই। কিন্তু ও 'না' চাইলেও ঝামেলাগুলো ঠিকই ওকে জড়াতে আসে, জড়িয়েও নেয়। 'ঝামেলা' রাশিতে জন্ম বোধহয়।

আচ্ছা, মঞ্জুই-বা এই খবরটা দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠল কেন? ফোন, মিস্‌ড কল...। ওকে জেলাস করার জন্য? দ্যাখ দ্যাখ, আমার বর এবার ফ্রি... আমার আরও 'অপশন' তৈরি হয়েছে এটা বোঝানোর জন্য? মন হল মোনালিসা-র হাসি। সাত রকম মানে করা যায়।

জামিন হয়ে গেল। অর্ডার হল, কিন্তু বাইরে আসতে পারল না মঞ্জু। অনেক কিছু সইসাবুদ করতে হয়, কেস তো চলবে। কেস চলাকালীন কোথাও যাওয়া যাবে না—এসব মুচলেকায় সই করতে হবে। আরও কিছু ফর্মালিটি আছে। উকিল সাহেব আছে। চয়ন বেশ করিৎকর্মা বলতে হবে।

পরি'কে বলল—চয়নটা তো বেশ কাজের ছেলে, ভেরি স্মার্ট গাই। পরি-র চোখে-মুখে-ঠোঁটে খুশির প্রকাশ ঘটল।

এবার মঞ্জু বাইরে এল উকিলের সঙ্গে। বাইরে এসে হাতজোড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা নমস্কার করল। তারপর হাওয়ায় দু'হাত ভাসিয়ে দিল। কার্তিক একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। অনিকেত দেখল, কার্তিকও ওর দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়েছে। যেন যিশু। না কি আলিঙ্গন মুদ্রা? চোখ রাখল। মঞ্জু অনিকেতের চোখে চোখ রাখল। বলল, তুই তবে এলি শেষ পর্যন্ত? অনিকেত বলল, না-এসে পারি?

অনাহূত কার্তিকও গুটি-গুটি কাছে চলে এল। মঞ্জুর তক্ষুনি চোখ ফেটে জল বেরুল। কোনও শব্দ ছিল না। কোনও ক্রন্দনধ্বনিও ছিল না। ক্রন্দনরত অবস্থাতেই পরি'কে জড়িয়ে ধরে। বলল, তুই তো পারলি বাবা, পারলি তো আমাকে ছাড়াতে।

পরি মা'কে ছাড়িয়ে নেয়। বলল, তুমি ভেবেছিল আমি অপদার্থ। তোমরা তো তাই ভাবো।

মঞ্জু কোনও কথা না-বলে ছেলের মাথায় হাত বোলাচ্ছিল।

পরি বলল, আমি না, আমি তো কিছু করিনি। চয়ন, চয়ন।

কার্তিক বলল, খুব চিন্তায় ছিলাম। বুঝলে...।

চয়ন বলল, চলুন সবাই চলুন। সবাই মিলে একটু মিষ্টিমুখ করি।

উকিলবাবু বললেন—আরে আমার সময় কোথায়। তোমরা যাও। বিলটা কী করব? বিলটা?

চয়ন বলল, পাঠিয়ে দেবেন...। কেস তো চলবে।

উকিল বলল, লম্বা লম্বা ডেট নেব...কেস দাঁড়াবে না। যে দু'টো ছোঁড়া টাকা নিয়ে ভেগেছে, ওদের অ্যারেস্ট করতে পারলে এই কেস লিক্যুইড হয়ে যাবে। যাক, থ্যাংস গড্স। বার করে আনতে পেরেছি, মালিকদের তো ছাড়েনি এবারেও।

একটু হেঁটে মিষ্টির দোকানে গেল সবাই।

মঞ্জু বলল, কী সুন্দর না?

—কী? অনিকেত বলল।

—এই পৃথিবীটা।

মঞ্জু বলল—দ্যাখ, দরবেশ যে এত সুন্দর হয় বুঝিনি কখনও। হলুদের মধ্যে কী সুন্দর লাল-লাল বুটি। যেন চুনি।

—দরবেশ খান তবে... চয়ন বলে।

—নাঃ, এত সুন্দর জিনিসটা চিবোতে ইচ্ছে করছে না।

—তা হলে রসগোল্লা?

—ওটাও তো সুন্দর।

তখন হেসে ওঠে সবাই।

কচুরি আর পান্তুয়া দাও। চয়ন বলে। পান্তুয়া অত সুন্দর নয়। আমার মতো একটু কালচে কিনা, রসগোল্লার মতো ফরসা নয়। এটা খাওয়া যাবে।

আবার হাসি।

কার্তিক একটা রুমাল বের করে পকেট থেকে। রুমালে জড়ানো কিছু টাকা। পঞ্চাশ,

একশো টাকার কিছু নোট। মলিন। গার্ডার দিয়ে বাঁধা।

চয়নকে বলে, এটা রাখো। পরে আবার...

অনিকেতও প্যান্টের পিছনের হিপ পকেটে হাত দেয়। পার্স বের করে।

মঞ্জুর চোখ টলটল করে ওঠে ফের। পৃথিবী কী সুন্দর!

আকাশে মেঘ। খুব সাধুভাষায় ওটা জলধর পটল। জানলা দিয়ে স্কাইলাইন-এ দেখা যাচ্ছে নাতিউচ্চ গিরিশ্রেণি। স্কাইলাইন-কে খুব সাধুভাষায় বলে 'দিকচক্রবাল'। ওইদিকে তাকিয়ে আছে মঞ্জু। এই দৃশ্য অনিকেতের কাছে খুব পুরনো। মঞ্জুর কাছে নতুন। মঞ্জু ওইদিকে তাকিয়ে আছে। সামনের একটা নিমগাছে একটা ঘুড়ি আটকে আছে। মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহে ওই বেচারা ঘুড়িটা কাঁপছে। মঞ্জু বলল, তুই কী সুন্দর জায়গায় থাকিস। এখানে থাকলে মন ভাল হয়ে যায়। বেলা এগারোটা বাজে। রবিবার। অফিস নেই। সকালে বেরিয়ে একটু পাঁঠার মাংস নিয়ে এসেছিল অনিকেত। বাড়িতে 'অতিথি' বলে কথা।

গতকাল সকালে মঞ্জু চলে এসেছে। হঠাৎ করে না-জানিয়ে নয়, জানিয়েই। তিন-চারদিন আগে বলেছিল মঞ্জু, ফোনে—তোর কাছে যাব। যদি যাই তাড়িয়ে দিবি?

অনিকেত কিছু বলছিল না।

মঞ্জু বলল, এসটিডি-র পয়সা উঠছে। বুঝেছি, তুই ভয় পাচ্ছিস। তবে এখন না-হলে আর কোনও দিনই হবে না। আমার বরের কাছে চলে যাব আমি।

এরপরও অনিকেত নিরুত্তর।

মঞ্জু বলেছিল, বুঝেছি বুঝেছি।

ফোন কেটে দিয়েছিল।

অনিকেত একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল হঠাৎ ওই ফোন পেয়ে। এর আগে কয়েকবার মঞ্জু বলেছিল, তোর ওখানে একবার যাব অ্যাঁ? অনিকেত ঘাড় নাড়িয়ে বলত—হ্যাঁ। কিন্তু সত্যি-সত্যি চলে আসবে এমনটা ভাবেনি।

মঞ্জু ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার পরই কোনও গ্রাম্যযাত্রার মোচওয়ালা নায়কের 'ধিক, তোরে ধিক' সংলাপটা বেরিয়ে এল অনিকেতের ভিতর থেকে—নারীবাঞ্ছা ফেরাস তুই, এত কাপুরুষ? ভয়? ভয়? হা-হা-হা-হা...।

ওর পৌরুষ চাগিয়ে উঠল।

কী আর ভয়? এখন কেউ থাকছে না এই কোয়ার্টারে। একতলার তেওয়ারি ছুটিতে। রাস্তায় বের হলে কৌতূহলী কেউ-কেউ জিগ্যেসও করে ফেলতে পারে। 'মিসেস' তো বলা যাবে না, শুক্লা তো একবার এসেছিল এখানে, ওকে অনেকে চেনে। 'রিলেটিভ' বলে দিলেই হল। একটু ফুসফুস গুজগুজ হবে? হোক গে। লোকে যা বলে বলুক, ওদের কথায় কী আসে যায়। ওই তো একটা মেয়ে আছে, রীতা ওরাওঁ। খ্রিস্টান। ওর স্বামী আছে, দুই মেয়ে আছে, ওরা রাঁচিতে

থাকে। এখানে বদলি হয়ে এসেছে। ওর তো একজন পুরুষ-বন্ধু প্রায়ই এসে এখানে থাকে। এ নিয়ে কথা হয়, কিন্তু সামনাসামনি কেউ কিছু বলে না তো ওকে। ওই মেয়েটা কত বোল্ড। কত সাহসী!

ধুশ শালা, যা হয় হবে—এই ভেবে মোবাইলটা মুঠোয় ধরেছিল অনিকেত।

—শোন মঞ্জু, তুই সত্যিই আসবি?

—না হলে ফোন করলাম কেন?

—কবে আসবি?

—শনিবার আসি? পরি ওর বন্ধুর সঙ্গে দিঘা যাবে শুক্রবার।

—চয়নের সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—ভোরবেলা ট্রেন। সকাল ছ'টা দশ।

বারোটা নাগাদ এখানে পৌঁছবে। স্টেশনে থাকব।

—সত্যি?

—হ্যাঁ রে বাবা, সত্যি!

মঞ্জু আবার বলল, তোর অসুবিধে থাকলে বলে দে, আসব না।

—না না, অসুবিধে কী?

—তা হলে ফাইনাল?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ফাইনাল।

অনিকেত আগেই ঠিক করেছিল এই সপ্তাহটা এখানেই থাকবে। অফিসে কাজ নেই এখন খুব একটা। দুলালী উপাখ্যান আরও একটু লিখবে। অনেক দিন লেখা হয়নি। ভেবেছিল—হাসি বলে যে-মেয়েটা, নাকি ছেলেটা, যার পেটের ভিতরে দু'টো অপরিণত অণ্ডকোষ রয়ে গিয়েছে, ওর সমস্যার কথা লিখবে। ইন্টারনেট-এ দেখেছে ওই অপরিণত কোষ অনেক সময় হঠাৎ বড় হতে পারে, এবং সেই গ্রোথ ম্যালিগ্ন্যান্ট হয়ে যায়, ডাক্তাররা বুঝতে পারে না কিছু। পরে, ছড়িয়ে গেলে বোঝা যায়। কিন্তু সেই উৎস, আদি বীজ, অজানাই থেকে যায়। এই ব্যাপারটা মাথায় রয়েছে। লগন-এর কথা জেনেছে, ওসবও লেখা হয়নি। বিহার-উত্তরপ্রদেশে গিয়ে হিজড়েরা রোজগার করে, নাচে, হোলি-র উৎসব। সারা-রা-রা...। হিজড়া নাচ, লওন্ডা নাচ। বাবুদের খাটাল ঘরে ওদের থাকার ব্যবস্থা, খাটাল ঘরেই ব্যাগ থেকে ছোট আয়নাটা বের করে ঠোঁট লাল করা, বুক উঁচু করা... শুনেছিল লগনের নাচে এক মাতাল বাবু বুক এবং কোমর দোলানিতে খুশি হয়ে এক হিজড়ের বুকে সেফটিপিন দিয়ে আটকে দিতে গিয়েছিল একটা একশো টাকার নোট। সেফ্‌টিপিনের খোঁচায় 'ইলু ইলু' ফেটে জল বেরিয়ে, ব্লাউজ ভিজে গেলে ওর পিছনে জুটেছিল লাথি, এসব কত কী লেখার ছিল। লিখবে ভেবেছিল 'ছুট' বাগানো এবং 'ছুট' জমানোর কায়দা। 'ছুট' হল বখশিস। এতে গুরুমা-র কোনও অধিকার নেই। আর লগনের রোজগারের অনেকটাই ওদের নিজেদের। কিন্তু দুলালীকে কি লগনে পাঠানো যেত? ওর তো বয়েস বেশি, দেখতেও তেমন নয়। ঝুমকো, ঝর্না, ওদের তো পাঠানো যেত...।

অনিকেত নিজে দুলালকে দেখেছে। বা দুলালীকে। এই আবার পরিমল-মন্টুকেও। ওই জন্যই তে লেখার ইচ্ছেটা। ও তো আর লেখক-টেখক নয়, ওর সেই সাধনা নেই। লেখকদের

নাকি রোজ সকালে উঠে লিখতে হয়! তারপর সেই লেখা ছাপবে কে? কে ওকে চেনে? এসব ভেবেই লেখাটা হয়ে ওঠে না। এগোয় না। কিন্তু মাঝে-মাঝে চাগাড় দেয়।

শুক্লা জানে এ সপ্তাহে কলকাতা যাচ্ছে না অনিকেত। পরের সপ্তাহে যাবে। শুক্লা বলেছিল, থাক, আসতে হবে না। যাওয়া-আসা কম ধকল নাকি? বয়সও তো হচ্ছে।

যতই আমার বাড়ছে বয়স ততই জ্বলছে দেহ
জ্বালা জুড়াই, জ্বালা জুড়াও কেহ—

মঞ্জু পরপর কয়েকটা 'এসএমএস' করেছিল, তসলিমা নাসরিনের কাঁপন সিরিজের না কি মঞ্জু নিজেই তসলিমার নামে চালাচ্ছে? স্টেশনে গিয়েছিল অনিকেত। ট্রেন রাইট টাইম।

কলকাত্তা সে গাড়ি আয়া, হাজার টাকা দাম
উ গাড়ি মে লিখা হ্যায়
মঞ্জু ম্যাডাম কী নাম

মঞ্জুকে দেখতে পেল। চাদরটা হাতে। চাদরের ভাঁজে-ভাঁজে বিষাদ গোঁজা। মঞ্জু অনিকেতকে দেখে হাত ওঠাল। ওর মুখে বিশুষ্ক তৃণের মতো হাসি।

মঞ্জু বলল, ঠিক চলে এলাম। তারপর বলল, ভেবেছিলাম ঠান্ডা থাকবে এখানে। বেশ গরম কিন্তু।

এপ্রিলে ঠান্ডা থাকে নাকি? —অনিকেত বলল।

মঞ্জু বলল, এপ্রিল নয়, চৈত্র মাস বলো, চৈত্র।

'চৈত্র' শব্দটা শুনেই অনিকেতের মনে এল 'সেদিন চৈত্র মাস তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।'

মঞ্জু বলল, ফাল্গুন-চৈত্র বসন্তকাল।

হ্যাঁ। এটা বসন্তই বটে। গাছে-গাছে এখনও কচি পাতা। শাল ফুল। কোন-কোন গ্রামে বাহা উৎসব চলছে। 'বাহা' মানে ফুল। শালফুলের গুচ্ছ মাথায় বেঁধে নাচ। জঙ্গলের যেটুকু অবশিষ্ট আছে এই শহরের আশেপাশে, ওখানে আশ্চর্য এক গন্ধ। বসন্তের। মঞ্জু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে কোনও পাহাড় দেখতে পেল না বলে জিগ্যেস করল, পাহাড় কই?

রিকশায় বসার সঙ্গে-সঙ্গেই কয়েকটা কোকিল ডেকে উঠল, আর একটা চলমান অটো রিকশা থেকে বেরিয়ে এল 'ম্যাজিক-ম্যাজিক-ম্যাজিক লোশন, দাদ-হাজা-আউর হরকিসিম কা খুজলি কা ইলাজ...'

মঞ্জু বলল, তোর বউ যদি জানতে পারে আমি এখানে এসেছি, কী হবে?

অনিকেত বলল, তোর বর যদি জানতে পারে, তা হলে কী হবে?

মঞ্জু বলল, এখনও তো পুরোপুরি বর হয়নি। মানে ওর কাছে এখনও তো যাইনি।

—তোর খোঁজ-টোজ তো রাখছে। সেদিন দেখলাম কোর্টেও এসেছিল...।

—হ্যাঁ। এখন খুব টান দেখাচ্ছে। একা থাকতে পারছে না কিনা...।

—তোর বাড়ি এলে দেখবে তুই নেই...।

—দেখুক গে। অত কৈফিয়ত দিতে যাব নাকি ওকে?

—ওসব কথা ছাড়। আমি এখন তোর কাছে, ব্যস।

কী সুন্দর রাস্তা। কত গাছ। ওই তো দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে... নীল... ওই পাহাড়ে যাব, অ্যাঁ? রিকশাটাকে আরও জোরে চালাতে বল না ডাবুদা... যেন রথ... অনিকেতের হাত চেপে ধরল মঞ্জু। মঞ্জু বলল, উঃ কী মজা! এবড়োখেবড়ো রাস্তায় ঝাঁকুনি খুব। যেন নিক্কোপার্কে রোলার কোস্টারে রাইড নিয়েছে ওরা। মঞ্জু দু'হাতে অনিকেতের একটা হাত চেপে ধরল।

অনিকেত দেখল, কোলে ফেলে রাখা মঞ্জুর চাদরটাও রৌদ্রে ঝিলমিল। দুই প্রায়-পঞ্চাশ এখন প্রায়-টিনএজার। মঞ্জুর কানের লতিতে হঠাৎ জিহ্বাগ্রের ছোঁয়া দিয়ে দেয়। দূরের পাহাড়ের দিকে চলে রথ। অ্যাডভেঞ্চার। অ্যাডভেঞ্চার। 'যাই যাই' বললেও সবটা যায় না। কিছু থাকেই। তার নাম জীবন।

—এবার বাঁদিকে-বাঁদিকে।

বাঁদিকে গেলে অফিস পাড়া। আর একটু সোজা গেলে গাছেদের পাড়া। বাঁদিকে ডিএম বাংলো—পুলিশ কর্তাদের বাংলো, জেলা জজের বাংলো, ফরেস্ট অফিস, হনুমান মন্দির, এই সব সভ্যতা। অনিকেত এবার একটু সরে বসল, সভ্য হয়ে বসল। পঞ্চাশ বছরে প্রৌঢ়দের মতো। ঘরের চাবি খোলার সময় মনে হল গুহায় ঢুকছে। আলিবাবার। চিচিং ফাঁক।

—ঝাড়ু-টাড়ু দিস না ঘরে? মঞ্জুর প্রথম কথা। ইশ, মশারিটার কী দশা? দেখি, রান্নাঘরটা...মঞ্জু ওর গৃহিণীপনা দেখাতে থাকল।

—আরে, আগে বোস। চা করে দি।

—তুই করে দিবি?

—হ্যাঁ। আমিই তো করে দেব। রান্না করেও খাওয়াব তোকে। আগে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নে। ওই যে বাথরুম। আর এইটা তোর ঘর।

—সে কী রে? এ ঘরে লিপস্টিক কেন? চুলে লাগানোর ক্লিপ? কী ব্যাপার? ঘরের দেওয়ালে গাঁথা তাকটাকে তাক করে মঞ্জু।

—ওটা মেরিলিন লাকড়া নামে এক ভদ্রমহিলার। এখানে এসে থাকেন মাঝে-মাঝে।

—মাইরি? তুমি তো বাবা ভালই ডুবে-ডুবে জল খাও। কত বয়স? কেমন দেখতে? এখানে কবে থেকে গার্লফ্রেন্ড জোটালি? এখানে থাকে? রাত্রেও? একসঙ্গে সব প্রশ্নগুলো করে ফেলে মঞ্জু। তারপর সারা ঘরে চোখ বুলোয়। আরও নারীচিহ্ন খুঁজতে থাকে। একটা রামের নিপ পায় অন্য তাকে।

ওই মহিলা মাল-ও খায় না কি? এবার সেই তাকেই একটা বিড়ির প্যাকেট। একটা বিড়ি পড়ে আছে। এগুলো আবার পুরুষচিহ্ন।

অবাক চোখে তাকায় মঞ্জু। কনফিউজ্‌ড।

এসব নিয়ে এখন ভাবতে হবে না। আমার গার্লফ্রেন্ডের কথা বলব। আগে ফ্রেশ হয়ে আয়।

—না, আগে বল।

তখন ভেঙে সব বলতে হয়। মেরেলিন লাকড়া আর জাহানাবাদির কথা—যারা মাঝে-মাঝে এসে এখানে থেকে কাজ করে। লাকড়া ম্যাডাম যে যৌবনহীনা বৃদ্ধা এবং পরম করুণাময় ঈশ্বর ওঁকে কৃপা করে রূপ-বঞ্চিত করেছেন, হাইপ্রেশারে ভোগেন বলে আয়ুর্বেদিক তেল ব্যবহার করেন, এবং সামগ্রিক সুস্বাস্থ্যের জন্য গোমূত্র পান করেন—সেটাও বলল অনিকেত। এবার কলঘরে গেল মঞ্জু।

কলঘর ছলভরা। সেই কলঘর। পুরনো স্মৃতি। একদা আচমকা কলঘরে ঢুকেছিল কিশোর অনিকেত। মঞ্জু তখন কিশোরী। স্মৃতি আঁচড়ায়। চায়ের জল বসায় অনিকেত।

সারা ঘরে শরীর-গন্ধ ছড়িয়ে মঞ্জু কলঘর থেকে ওর ঘরে যায়। শরীরের গন্ধ তো নয়, সাবানের। সাবান শরীরের স্পর্শ পেয়ে উতল হয়। দরজা বন্ধ হল। লাকড়া-ও দরজা বন্ধ করে, কিন্তু এই দরজা বন্ধ করার শব্দ আলাদা রকম। চায়ের গেলাসে চিনি গোলাচ্ছে অনিকেত। টুংটাং...টুংটাং...কী মেশাচ্ছে চায়ের জলে? শুধুই চিনি? না কি ভালবাসা?

দরজা খুলে দিল মঞ্জু।

অনিকেত বলল, আয়। আমার ঘরে আয়।

অনিকেতের বিছানায় বসল মঞ্জু। অনিকেত চেয়ারে। মঞ্জু কী স্নিগ্ধ। হাসছে মৃদু। জানালা খোলা। বাইরে, কিছুটা রৌদ্রের সঙ্গে চার-পাঁচটি ফড়িং মিশিয়ে, ঈশ্বর বলছেন : ওহে, আজ বসন্ত দেখহে। মঞ্জুকে দেখে মনে হচ্ছে এখন ওর হৃদয়ে কোনও ক্ষত নেই। ছোটখাটো দুঃখগুলোর লতায়-পাতায় কিছু ফুল। পুষ্পবতীও।

ছোট্ট ট্রে-টা থেকে চায়ের গেলাসটা তুলে নিয়ে, মঞ্জু, গ্লাসটা অনিকেতের হাতে ধরিয়ে দিল। চায়ের গেলাস নয়, আপেল, সেই স্বর্গের বাগানের 'পাপ'-আপেলটা বাড়িয়ে দিল প্রৌঢ়া ইভ। গ্রহণ করল আদম-অনিকেত।

তারপর মাছভাজার গন্ধ, প্রেশার কুকারের সিটি, জলের ছরছর, থালা-বাসনের ঠুংঠাং, ও মা? সজনে ফুলের বড়া? কত গুণের ছেলে রে তুই... উঃ কী ঝাল... বেশ একটা পিকনিক হল—এইসব।

দুপুরবেলাটায় ফিরে এল সেই এক্কাদোক্কা বেলা, ঘুড়িবেলা, গুলি বেলা...। কোনও অলৌকিক ম্যাজিকওলা আশ্চর্য ঝুলি থেকে বের করে এনেছে দু'টো কৈশোর। 'এই-এই ভাল হবে না বলছি...।' 'এই সুড়সুড়ি লাগে। বউকে বলে দেব সব...।' 'তোরও কত চুল পেকে গিয়েছে মঞ্জু...।' 'চুল পেকেছে কিন্তু আমি তো পাকিনি।' 'ভালই তো পেকেছিস...' 'না রে, পাকিনি। কেউ পাকিয়ে দেয়নি তো...। সেই বুড়োটা পাকাতে এসেছিল আমায়, সেই ছোটবেলায়...।' 'ওসব আজ থাক মঞ্জু। ওসব ভুলে যাসনি কেন?' 'ঠিক আছে, ভুলে গিয়েছি।' 'একটা পাহাড়ে নিয়ে যাবি?'

একটা দুপুরে একা পূর্ণজীবন অতিবাহিত হয়ে যায় যেন।

শাল-পিয়ালের গা বেয়ে বিকেল নেমে আসে। ওরা একটা রিকশা নিয়ে কিছু দূরে গিয়ে রিকশা ছেড়ে দেয়। একটা ছোট্ট টিলা। টিলার দিকে এগোতে-এগোতে অনিকেত ওর ভূগোল, জিওলজি, বটানি-র জ্ঞান বমি করতে থাকে। কাউকে পাওয়া গিয়েছে এতদিনে। এগুলো গ্রানাইট, এগুলো বেসল্ট। পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা এখানেই। এটা ছিল গন্ডোয়ানা ল্যান্ড। ওটা অর্জুন গাছ। অর্জুন গাছের ছাল হার্টের অসুখে খুব কাজে লাগে। শালপাতা মাটিতে পড়লে বর্ষার জলে মাটির সঙ্গে মিশে খুব ভাল গন্ধ হয়। ওটা কেন্দু গাছ। ওটার ফল খেলে নাকি সেক্স বাড়ে।

—খেয়েছিস তুই?

—আমি খেয়ে কী করব? আমার তো খালি হিসি করতে কাজে লাগে। ব্যবহার না করে-করে খারাপ হয়ে গিয়েছে।

—বাজে কথা বলিস না...। দুপুরে তো বুঝেছিলাম একটু...।

দুপুরবেলায় খুনসুটি করতে-করতে অনিকেত বলেছিল, এই রে, এবার নির্ঘাত আমি মরে যাব।

মঞ্জু বলেছিল, কেন—অলুক্ষুণে কথা, এখনও তো কিছুই হল না। মরে যাব বলে তো সেই চরম সময়ে। 'ক্লাইম্যাক্স' না কী যেন বলে, তখন।

অনিকেত বলেছিল, কেন মরে যাব বলছি। মা ছোটবেলায় বলেছিল মেয়েদের সঙ্গে বেশি মিশবি না। ওদের গায়ের সঙ্গে গা লাগাবি না, ওদের ঢাকা জায়গাগুলো ছুঁবি না। ছুঁলেই পাথর হয়ে যাবি। পাথর হয়ে গেলে কি বাঁচে?

মঞ্জু বলেছিল, সে কী—পাথর হবি কেন!

অনিকেত বলেছিল, এই তো এই জায়গাটা শক্ত হতে শুরু করেছে। ক্রমশ সারা শরীরটাই শক্ত হয়ে পাথর হয়ে যাবে। দ্যাখ না... মঞ্জু হাত দিয়ে দেখেছিল কতটা পাথর...। বলেছিল, এখন পাথর হতে হবে না।

ছড়ানো পাথরের পাশ দিয়ে ওরা টিলার ওপর উঠল। সূর্যটা লাল। পাহাড়ের গায়ে বেশ কিছু সালংকরা পলাশ গাছ নটীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। শিমুল-ও রাঙা, এসব জায়গায় সূর্যের লাল আলো। টিলার চূড়া পর্যন্ত যাওয়া হল না। একটা বড় পাথরের ওপরে বসে সূর্যের ডুবে যাওয়া দেখল। পাখিরা ঘরে ফিরছে। ওদের কণ্ঠে ঘরে ফেরার উল্লাস। রাখাল ছেলেটাও কতগুলো গরু নিয়ে ঘরে ফিরছে। ছেলেটা মুখ ঘুরিয়ে ওদের দেখল। কয়েকটা গরুও। গুরুদের কাছে এটা আশ্চর্য দৃশ্য। কৃষ্ণচূড়া-পলাশ-শিমুল এসব ওদের কাছে তেমন কোনও দৃশ্য নয়। সারা আকাশ লাল করে সূর্যদেবের আকাশতলে মিলিয়ে যাওয়াও কোনও দৃশ্য নয়। বরং এরকম বাবু-বিবি'র এভাবে বসে থাকাটাই একটা দৃশ্য। মাথায় জ্বালানির কাঠকুঠো বয়ে নিয়ে যাওয়া দুই রমণীও ওদের দেখল। অনিকেত এসব প্রায়ই দ্যাখে। সূর্যাস্তও দ্যাখে। কিন্তু এভাবে সুন্দর দ্যাখেনি কত দিন। এতটা মুগ্ধতা কত দিন গায়ে লাগেনি ওর। সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে। মানুষ দেখেও দ্যাখে না। মাঝে-মাঝে, দ্যাখে। কোন অসময়ে।

সূর্য ডুবে গেলে, গরুরাও ধুলো উড়িয়ে ঘরপানে চলে গেলে, অদ্ভুত গোধূলি আবছায়ার মধ্যে মঞ্জু বলল, তোর কোলে একটু মাথা রাখি ডাবুদা? অনিকেত কিছু না-বলে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। মঞ্জু অনিকেতের কোলে মাথা রাখে। অনিকেত মঞ্জুর মাথায় শুশ্রূষা বুলিয়ে দেয়। চতুর্দিকে ছড়ানো পাথর। সেই সৃষ্টির আদিম পাথর—মেসোজয়িক যুগের। চারিপাশে কোনও জনপ্রাণী নেই আর। পাখিরাও নেই।

মঞ্জু বলল, অহল্যা-ও পাথর ছিল। না রে?

—হুঁ।

—আমিও পাথরই ছিলাম। কে আমায় জাগাল বল তো?

অনিকেত কিছু বলে না।

মঞ্জু দু'হাতে অনিকেতকে জড়িয়ে ধরে। চুম্বনের জন্য মুখটা ওপরে ওঠায়। অনিকেত মুখটা ডুবিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর দ্যাখে আকাশে শুকতারা। অন্ধকার নেমে আসে ধীরে-ধীরে। একদিকে দূর শহরের সভ্য আলোরেখা দেখা যায়। দিগন্তের অন্য দিকে চাঁদ। কস্তুরী আভার চাঁদ। এখান থেকে যাব না, যাব না আর। মঞ্জু বলে।

অনিকেতেরও ওরকমই মনে হয়।

মঞ্জুর বিশুষ্ক বাহুর ওপরে মায়াবি চন্দ্রালোকের সম্পাত। কেশবন্ধন, মানে প্লাস্টিক ক্লিপ, পাঁচ টাকাও না, খুলে গিয়েছে, অসংলগ্ন কেশদাম অস্থির, কণ্ঠাস্থি চঞ্চল, পরিত্যক্ত গ্রাম্যপথের মতো হাতের নীল শিরা-উপশিরায় মেলার মাঠের লোক চলেছে। অনিকেতও অন্ধকারকে জড়িয়ে নেয়। অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর, অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চায়। হে সময়গ্রন্থি, হে নিশিথ কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া, আমাকে জাগিও না। কোনও দিন জাগিব না আর। জাগিবার গাঢ় বেদনার অবিরাম অবিরাম ভার...।

শেয়াল ডাকে।

এবার উঠতে হয়। মঞ্জুর ঠিক খেয়াল থাকে।

এই চাঁদ-পাথর-জোনাকির মধ্যেও প্লাস্টিকের ক্লিপ-টার কথা ভোলে না। খুঁজতে থাকে। খুঁজে পায়।

কোনও মাদক ছাড়াই নেশা হয়েছে যেন। পা টলছিল। শরীর টলছিল। অনেকটা হেঁটে এসে একটা রিকশা পাওয়া গেল। রিকশায় উঠল। মঞ্জু অনিকেতের কানে-কানে বলল, এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হত তুমি বলো তো?

অনিকেত মনে-মনে বলল, সুচিত্রা সেন জানতে পারলে একটা কষে থাপ্পড় মারবে। কিন্তু আসলে বলল, খুব খারাপ হত। তার মানে, ওরা আবার স্বাভাবিক, ঠিকঠাক। কারণ শহরে এসে গিয়েছে। চাঁদ নয়, মাথার ওপরে হ্যালোজেন আলো।

রাত্রে ওই কোয়ার্টারে ওরা দু'জন। তেমন কিছু নয়, খিচুড়ি-ডিমভাজা। একটু মহুয়াও। মঞ্জুকে মহুয়া 'টেস্ট' করাতে চাইল। মঞ্জু গন্ধ শুঁকে নাক কোঁচকাল। অনিকেত বলল, দ্যাখ না কেমন বাসমতি চালের গন্ধ। একটু মহুয়া হাতের আঙুলে নিয়ে মঞ্জুর হাতে বুলিয়ে দিয়ে বলল, শুঁকে দ্যাখ না। মঞ্জু বলল, সত্যিই তো পায়েসের গন্ধ। অনিকেত বলল, তবে? ঠিকমতো মার্কেটিং করতে পারলে শ্যাম্পেন-ট্যাম্পেন'কে হারিয়ে দিতে পারত এই মহুয়া। রতনলাল ব্রহ্মচারী নামে একজন সায়েন্টিস্ট আছেন, বাঘের ফেরোমন নিয়ে কাজ করেছেন। উনি দেখিয়েছেন, যে রাসায়নিক যৌগটার জন্য বাসমতি চালের সুগন্ধ, সেই যৌগটাই বাঘের ফেরোমন-এ থাকে। তবে বাসমতি চাল ফুটন্ত গরম জলে সেই গন্ধটা ছাড়ে, কিন্তু বাঘের ফেরোমন-এ নর্মাল টেম্পারেচারেই সেই গন্ধটা থাকে। মহুয়াতেও সেটা আছে। মহুয়া খাওয়া মানে বাঘের ফেরোমন খাওয়া।

মঞ্জু জিগ্যেস করল, ফেরোমন কী?

অনিকেত বলল, ফেরোমন হল যৌনতার গন্ধ। তা হলে অনেক কথা বলতে হয়। অল্প একটু মহুয়া খেয়ে নে তবে, পাতলা করে বানিয়ে দিচ্ছি।

তারপর কথা। ক'য়ে কথা, খ'য়ে খুনসুটি, গ'য়ে গল্প। গল্প করতে-করতে গল্প।

অনিকেত বলল, গল্পের সঙ্গে মেয়েদের একটা সম্পর্ক আছে। ৮, ১৮, ২৮, ৩৮ আর ৪৮ বছরের মহিলাদের সঙ্গে গল্পের সম্পর্কটা পাল্টে-পাল্টে যায়। বুঝলি? ৮ বছর বয়সি মেয়েদের বিছানায় নিয়ে গিয়ে গল্প শোনাতে হয়। তারপর ঘুম পাড়াতে হয়। ১৮ হলে গল্পের আছিলায় বিছানায় নিতে হয়। ২৮ হলে বেডরুমে নেওয়ার জন্য আর গল্প শোনাতে হবে না। ৩৮ হলে মেয়েটাই গল্প শোনাতে-শোনাতে বেডরুমে নিয়ে যাবে। আর ৪৮-শে...

—কী, ৪৮-এ? মঞ্জু চোখ ঘুরিয়ে জিগ্যেস করে।

'অরিজিনাল জোক'-টাতে ছিল—আপনি ওকে গল্প শোনাবেন ঠিকই, তবে সেটা বেডরুমের বাইরে, এবং বেডরুম থেকে দূরে রাখার জন্য।

—৪৮-এ কী বললি না?

অনিকেত বলে, ৪৮-এ গল্প-টল্প নয়। কম কথা।

মঞ্জু বলে, হ্যাঁ। কথা কম। শুধু ঘুম। ঘুমের চেষ্টা।

অনিকেত বলে—না, কাজের চেষ্টা।

গল্প পেটে পুরেই ওরা বেডরুমে যায়। জানলা খোলা। তারাভরা আকাশ। গল্পভর্তি ঘর।

মঞ্জু বলল, ফেরোমন বল, ফেররওমন।

মঞ্জুর কি একটু গলা জড়িয়েছে, মহুয়ায়?

হাফপ্যান্ট পরা অনিকেত গেঞ্জিটা খুলে ফেলে মঞ্জুর গলা জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চেপে ধরে বলল, গন্ধ নে, ফুসফুস ভরা গন্ধ। ফেরোমন। মঞ্জু তাই করতে লাগল। নির্গত শ্বাসের উষ্ণতা এবং আর্দ্রতায় শিহরিত হচ্ছিল। পুরুষ-বুকের ছোট্ট অ্যারিওলা থেকে আশ্চর্য শিরশির প্রবাহিত হল সারা শরীরে। পিতৃদুগ্ধ বলে কিছু নেই। পুংশরীর শিশুখাদ্য দুগ্ধ উৎপাদন করে না, অথচ নিপ্‌ল আছে। কে জানে কেন? যাকগে মরুকগে। এবার ক্রম উন্মোচন। এত দিনের অবদমিত লিবিডো-র বাচ্চা সংশোধনাগারের গারদ ভেঙে বেরিয়ে এল। কে বলল প্রায়-মেনোপজ? কে বলল ড্রাই? ঘুঙুর বাজল, ঘুঙুর। ঘ-এ ঘুঙুর, ঙ-য় উম্‌ম্‌ উঙঙা...তারপর চ, ছ, জ... জ-এ জাদু, ঝ-এ ঝুমঝুমি। ত-এ তরঙ্গ... ন-য়ে নিধুবন...আর ভ-এ তো ভয়। এসব শেষ হয়ে গেলে ভয় হয়। কিন্তু ভয়কে জয়-করা একটা ভালবাসা দু'জনের ওপর হালকা নকশি কাঁথার মতো রয়ে যায়। ভালবাসা মানে ঘুম, শরীর-বিস্মৃত। পাশাপাশি ঘুমোনোর মতো বিসর্গ-চিহ্ন। নিঃশেষ ও নির্বিকার।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে ঘুম-জড়ানো গলায় মঞ্জু বলেছিল, আমার পরিকে তুই একটু দেখিস, কেমন! আমার বরটা ওকে দেখবে না। তারপর কিছুক্ষণ নৈঃশব্দ্যের পর অনিকেতের গায়ে হাত দিয়ে বলেছিল, এখনও শেষ হয়ে যাইনি, বল, আমার বরটা তা হলে...।

মঞ্জু কি নিজেকে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার জন্য এসেছিল তা হলে?

এখানে বেলা এগারোটা বেজে গিয়েছে।

চায়ের গেলাসগুলো পড়ে আছে। সিগারেটের টুকরো।

এখনও বাইরের কেউ এসে হানা দেয়নি।

পাগলির সঙ্গে গুহাজীবন, তারা-জীবন, চার অক্ষর জীবন কাটানো হয়ে গেল। মঞ্জু এবার গেল মাংসে নুন-হলুদ মাখাতে।

নুন-হলুদ মাংসের গায়ে লেপ্টে দিতে-দিতে মঞ্জু বলছিল—আমার বরটা ভেবেছে আমার টাকায় ও খাবে। ওর তো বিজনেসের অবস্থা ভাল না। কিন্তু আমার চাকরিটার শেষ পর্যন্ত কী হবে, আমি জানি না। মালিকরা জামিন পেয়ে গিয়েছে। গেঁদু আর লোটনের নামে ডায়েরিও করেছে থানায়। ওরা ধরা পড়েনি এখনও। 'ছোট স্যর' বলেছে, বিজনেস বন্ধ করবে না, বরং ভাল লোক নিয়ে ভাল করে চালাবে। থানা থেকে তো 'সিল' করে দিয়েছিল। কাগজপত্র

দেখেছে। থানাকে ভাল টাকা দিতে হয়েছে। যারা ট্যুরে গিয়েছিল, ওদের টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিয়েছে। লস হয়ে গিয়েছে। এখনও তো সব ওলটপালট। মাইনেপত্র গত মাসে দেয়নি। পাতলা করে ঝোল করি, এ্যাঁ? ছাদে দেখছিলাম নিমগাছে কচিপাতা। পেড়ে আনবি? না, আমিই আনব?

অনিকেত বলে, তোকে ছাদে উঠতে হবে না। তুই আছিস কেউ জানে না তেমন। ভাগ্যিস আমার কোয়ার্টারটা এক সাইডে। আর আমার বাড়িতে আড্ডা মারতে স্টাফ-রা আসে না। শত হোক, 'বস' বলে কথা। তুই এখানে ম্যাজিক। তুই টুপির মধ্যে ঢুকে থাকা লাল ফুল, নীল ফুল, জরির শেকল।

আজ চারটের সময় ফেরার ট্রেন। সাড়ে তিনটে নাগাদ স্টেশনে পৌঁছলে হবে। অনিকেত বলল, তুই আগে স্নান করে নে, পরে যাব। তোর স্নান হয়ে গেলে মাংসটা বসিয়ে দেব।

মঞ্জু স্নান ঘরে ঢুকলে অনিকেতও হঠাৎ বলল, 'হিস্ট্রি রিপিট্‌স'। মঞ্জু কথাটা ঠিক বুঝল না, তবে শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ ছবিতে গোপিনীরা যেভাবে থাকে, মঞ্জু তেমনই করল, যদিও যে কোনও গোপিনীর চেয়ে মঞ্জু ডবল-বয়সিনি। শাওয়ারের পাইপ যেন কদম্বের ডাল। ওখানে ঝুলছে প্রৌঢ়া গোপিনীর ম্যাক্সি। প্রৌঢ় কৃষ্ণ বলল, আয় সাবান মাখিয়ে দিই। গোপিনী বলল, উঃ... সেই দিনটা... কী বাজে কথা বলেছিলাম তোকে...। কেষ্টা বলল—কেস-টা কী? অ্যাঁ, ছিটকিনিটা ঠিকমতো দিসনি কেন? বলে সাবান মাখানোর চেষ্টা করতে থাকে, এবং বেরসিক সাবান হাত ফসকে যায়। এবং হাত-ফসকানো সাবান সাধারণত প্যানে পড়ে। তাই হল। সাবানলীলা অকালে শেষ হয়।

এবার মাংস-টা চাপিয়ে দেয় প্রেশার কুকারে। গত কয়েক ঘণ্টার পাপের জন্য বেশ খুশি লাগছে। জীবনে তবুও তো হল কিছু। চেষ্টা করা হয়নি তেমন আগে। তা হলে অনেক হত। না চাহিলে যারে পাওয়া যায়...। যা হোক, এতে ওর গোপন বায়োডাটায় কিছু তো লেখা যাবে। এটাই হল পৌরুষ। একদম কিছু এক্সট্রা-ম্যারিটাল হল না—তবে আর ব্যাটাছেলে কী? এটাই তো মনে গেঁথে আছে। গেঁথে থাকে। নিজ লিঙ্গটিকে উত্থিত দেখতে মহিলাদের চেয়ে পুরুষরাই ভালবাসে বেশি। এই উশকানি কর্মের জন্যই সারা পৃথিবীতে হাজার-হাজার কোটি টাকার তেল, মলম, লোশনের ব্যবসা। গন্ডার নিধন...। কে জানে ধাতব বন্দুকে বেশি খরচ করে পুরুষসমাজ, না কি প্রোটিন বন্দুকে? একটা সিগারেট ধরায় অনিকেত। বেশ মৌজ করে ধরায়। অস্ত্র ব্যবহারে খুশি ও।

ম্যাক্সিটা ধুয়ে দিয়েছে মঞ্জু। না-ধুলেও চলত। এত তাড়াতাড়ি শুকোবে না। ব্যালকনিতে মেলতে নিষেধ করল অনিকেত। মঞ্জু শাড়িটা কোনওমতে পেঁচিয়ে এসেছে বাথরুম থেকে। এটাও অন্য অনুপম। অনুপম মানে—'সৌন্দর্য' আর কী। ও তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করল। শব্দ করে ছিটকিনি দিল, যেন অনিকেত হুট করে ঢুকে যেতে পারে, সেই ভয়। ছেনালিও অনুপম লাগে। এই সব অনুপম ছেনালি, ব্যাপক ছলনা, হেব্বি ছেমো কত দিন, কত দিন, কত দিন পরে।

লিভিং স্পেসের দড়িতে মঞ্জুর ভেজা ম্যাক্সিটা মেলে দিল। ফ্যানটা চালিয়ে দিল। না-শুকোলে পলিথিনে ভরে ব্যাগে নিয়ে যাবে।

এ সময় করাঘাত। দরজায় করাঘাত। কলিং বেলটা খারাপ হয়ে আছে।

কে এখন আবার? ঘরের ভিতর থেকে অনিকেত কিছু বলার আগে ঘরের সামনে গিয়ে বলে, মঞ্জু, এখন বেরবি না। মঞ্জু কিন্তু অনিকেতের বেডরুমেই এখন। কারণ ওর ব্যাগটা পাশের ঘর থেকে গতকাল রাতেই এই ঘরে নিয়ে এসেছিল।

অনিকেত জিগ্যেস করল, কে?

হামি, মধুসূদন আইজ্ঞা।

মধু মাহাতো হল ওদের একজন গ্রুপ ডি স্টাফ। ভাল ছেলে। ওকে দিয়ে রুটি-টুটি আনায় মাঝে-মধ্যে।

—কী ব্যাপার মাহাতো? আমি একটু ব্যস্ত আছি।

—স্যর, খুলেন। গেস্ট আপনার গেস্ট।

—কোন গেস্ট?

—বউদি স্যর। আপনার মিসেস।

এবার? শুক্লা চলে এল? একা? না-জানিয়ে? কী বলবে? মঞ্জুর কথা একটু-একটু জানে শুক্লা। কিন্তু... যত দেরিতে খুলবে ততই খারাপ। দরজা খুলে দিল অনিকেত।

শুক্লা হাসছে।

কীরকম সারপ্রাইজ, অ্যাঁ? একা-একা চলে এলাম তো...। মন্টুটা নেই...। কাজ কী আমার...? বসন্তকাল বলে কথা... ট্রেনটা এক ঘণ্টা লেট করল...। ঘরে ঢুকেই গলা নামিয়ে বলল—তোমার কাছে ওই খ্রিস্টান ভদ্রমহিলা আছেন বুঝি এখন? কী লাকড়া যেন... ও আমরা 'অ্যাডজাস্ট' করে নেব। শুকোতে দেওয়া ম্যাক্সিটার দিকে শুক্লার চোখ।

তারপর আবার বলল, ও আমরা ম্যানেজ করে নেব। মাংসের গন্ধে তো ঘরটা ম'ম করছে। ভাল দিনেই এসে পড়েছি। না-হয় তোমাদের একটু কম হবে। কাল বেশি করে এনো। আবার গলা নামিয়ে, আঙুলটা বেচারা ম্যাক্সিটার দিকে তাক করে বলল, কোন ঘরে?

অনিকেতের মাথা ঝিমঝিম করে, গা ঝিমঝিম করে। মুখে কথা নেই।

শুক্লা হাতের ব্যাগটা নামায়। মধু মাহাতো চলে যায়। লিভিংরুমে ম্যাক্সির শরীর থেকে দু-একফোঁটা জল ঝরছে ঘরের মেঝেতে।

—কিছু কথা বলছ না কেন? খুশি হওনি তুমি?

অনিকেত তখনও কোনও কথা বলে না।

শুক্লা দ্যাখে একটা ঘর খোলা, একটা ঘর বন্ধ। খোলা ঘরটায় ঢোকে। দড়িতে ঝুলছে একটা ব্রা। তাকের ওপর একটা প্লাস্টিক ক্লিপ।

—কোনটা তোমার ঘর? কোনটা?

মাথা ঝাঁকিয়ে বিহ্বল শুক্লা প্রশ্ন করে।

অনিকেত পিত্তল পুত্তলি।

—কী, কথা বলছ না কেন?

অনিকেত মূঢ় ম্লান মূক।

পাশের ঘরের দরজাটায় ধাক্কা দেয় শুক্লা।

মৃদু।

দরজা খোলে না।

এবার জোরে ধাক্কা দেয়। হাত মুঠো করে কিল মারতে থাকে।

অনিকেত বলে, দরজাটা খোলো মঞ্জু, শুক্লা এসেছে। আমার শুক্লা।

দরজা খুলে যায়।

মাথা নিচু করে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে।

অনিকেত বলে, মঞ্জু এসেছিল। হঠাৎ।

তক্ষুনি প্রেশার কুকার ফোঁস করে উঠল। তীব্র।

শুক্লা অবাক হয়ে দেখছে চারদিক।

অনিকেতের ঘরে একটা মেয়েলি ব্যাগ। বিছানায় একটা ব্লাউজ। বাইরে জল-চোঁয়ানো ম্যাক্সি। মাংস গন্ধ।

শুক্লা আর দ্যাখে না। চোখ বোজে। বসে যায় ঘরের মেঝেতে।

সন্ধ্যামণি কনক তারা
সন্ধ্যামণি জলের ধারা
আমি সতী নিজ ব্রতী
সিঁথির সিঁদুর ভাগ্যবতী
আয়না আয়না আয়না
সতিন যেন হয় না।

হে অন্ধকার, হে ট্রেন, ট্রেনের হুইশল,
জমি উপড়ে দিয়ে চলে গেছে চাষি
এত মাছি কেন?
শুধু কুয়াশা। ভীষণ কুয়াশা...।

অনিকেত আর মঞ্জু মিলে শুক্লাকে শুইয়ে দেয়। মঞ্জু জলের ঝাপ্টা দিতে থাকে। অনিকেত দ্যাখে শুক্লার নাসাছিদ্র বেয়ে নেমে আসছে ক্ষীণ অথচ তিরতীক্ষ্ণ রক্তস্রোত।

বউদির কোনও খবর পাই না। প্রায়ই ফোন 'সুইচ্‌ড অফ' থাকে। গতকাল তোকে দু'বার ফোন করেছিলাম, দু'বারই ফোন কেটে দিয়েছিলি। নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধে ছিল, থাকতেই পারে। 'কল রেকর্ড' থেকে ওই 'কল'গুলো ডিলিট করে দিস। আর এই চিঠিটাও পড়া হয়ে গেলেই পুড়িয়ে ফেলবি। একদম ছাই করে দিবি। কিংবা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে পায়খানার প্যানে ফেলে জল ঢেলে দিবি। আমার কোনও চিহ্ন রাখবি না ডাবুদা। আমি কেন এই পৃথিবীতে এলাম? আমার কোনও দরকারই ছিল না এই পৃথিবীতে। সবাইকে কষ্ট দিয়ে গেলাম শুধু। এখন বউদি

কেমন আছে জানি না। জামশেদপুরের হাসপাতালে পৌঁছে তুই আমাকে চলে যেতে বলেছিলি। মানে, তাড়িয়েই দিয়েছিলি। আমি সন্ধ্যার ট্রেনে উঠে পৌঁছেছিলাম। অনেক 'লেট' ছিল ট্রেন। হাওড়া স্টেশনে বসেছিলাম সারা রাত। সে সব থাক। আমি অন্য একটা কথা বলার জন্য এই চিঠি লিখছি। বউদির ওই স্ট্রোকের জন্য আমিই দায়ী। আমার নিজের ওপর ঘৃণা হয়। আমার চাকরি নেই। আমার অফিসটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর এখন কোনও নতুন কাজ পাওয়ার আশা নেই। এই বয়সে কে আমাকে চাকরি দেবে? আমার এই চিঠি যখন পাবি, তখন আমি পৃথিবী ছেড়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছি। ব্যাঙ্কে আমার মোট দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা আছে। এটা আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। তিল-তিল করে আমি এই টাকা জমিয়েছি। এছাড়া আমার নয়-দশ ভরি সোনা আছে। মা-র কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম। চাকরি করে একটা দুল গড়িয়েছিলাম শুধু। এছাড়া আমার একটা লাইফ ইনসিওরেন্স আছে। এক লাখ টাকার। আমার ছেলেকে 'নমিনি' করা আছে। সুইসাইড করলে ইনসিওরেন্সের টাকা পাওয়া যায় না। কিন্তু দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে পাওয়া যায়। ডাবুদা আমার মরণটাকে আমি এমনভাবে সাজাব, যেন মনে হয় ওটা অ্যাক্সিডেন্ট-ই হয়েছে। আমার ছেলে, আমার বর, সবাই জানবে 'অ্যাক্সিডেন্ট'। গত কয়েক দিন ধরে ভেবে-ভেবে আমি একটা ছক তৈরি করেছি। পরি তোকে খুব শ্রদ্ধা করে। ভালবাসে। ও নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ওকে ফিরিয়ে দিস না। এই অভাগিনী তোর কাছে হাত জোড় করে এই ভিক্ষা চায়। আমাকে ঘৃণা কর, আমার মরণের পরও ঘৃণা করে যাস, কিন্তু পরি'কে ঘৃণা করিস না। পরি'কে নিয়ে তোর সঙ্গে আমার যতবার কথা হয়েছে, ততবারই তুই পরি-র ওপর সহানুভূতি দেখিয়েছিলি। আমি জানি, তুই ওকে ভালবাসিস। আমার টাকাটা যেন ও পায়, সেটা দেখিস। এই টাকাটা না পেলেও কোর্সটা করতে পারবেনা। হয়তো লেখালিখি করতে হবে, থানা-পুলিশ করতে হবে। আমি যেটা করতে চলেছি, সেটা আগেই করতে পারতাম, যেদিন হাওড়া স্টেশনে বসেছিলাম সারা রাত, সেদিন নিজের ওপর এত ঘেন্না হচ্ছিল যে, ভাবছিলাম, সেই রাত্রেই নিজেকে শেষ করে দিই। একটা করে ট্রেন ঢুকছিল, আর বলছিল, 'আয়, আয়, ঝাঁপিয়ে পড়।' কিন্তু নিজেকে চেক করেছিলাম। আগে কয়েকটা জরুরি কাজ শেষ করতে হবে। ফিক্সড ডিপোজিটগুলো ভাঙিয়ে সব সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা রেখেছি। ওই অ্যাকাউন্ট-টা আমার আর পরি, দু'জনের নামেই জয়েন্ট। ও ভাঙিয়ে নিতে পারবে। ক'টা দিন ভাল করে রান্না করলাম, পরি যা খেতে ভালবাসে। ওর পড়াশোনা শেষ করতে তিন বছর লাগবে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা—এসব জায়গার কতগুলো কলেজে চেষ্টা করছে। বলছে, তোমার টাকা খসাব মা, কিন্তু দেখো, সুদে-আসলে পুষিয়ে দেব। ও যদি বাইরে পড়ে, ওর খরচ আছে, তার ওপর কলকাতার বাড়ি ভাড়া, আমার নিজের খাইখরচ, কী করে সামলাব আমি? আর ওই কার্তিকবাবু, উনি ভেবেছিলেন আমার চাকরির টাকায় খাবেন, আর আমার রান্না করে দেওয়া হালকা ঝোল খাবেন। যখন দেখলেন আমার চাকরি নেই, তখন যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। যোগাযোগ করলেও বেকার অবস্থায় ওর সংসারে থাকতে পারতাম না। লাথি-ঝাঁটা খেতাম। তা ছাড়া নিজের ওপর ঘেন্না তো আছেই। তোর কাছেও মুখ দেখাতে পারছি না। আমি ভগবানের কাছে রোজ প্রার্থনা করি বউদি যেন তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠে। বউদিকে বলিস, তোর কোনও দোষ নেই, আমিই হঠাৎ করে জোর করে তোর কাছে গিয়েছিলাম। বউদিকে বলিস আমি সেই পাপেই মরেছি।

এক ফোঁটা জল পড়ল কাগজের ওপর, যেখানে 'মরেছি' শব্দটা ফুটে আছে। এই লেখাটা যদি ডটপেন না-হয়ে কালির হত, মরণ লেখাটা ঝাপসা হত একটু। জলের ফোঁটাটা শুষে নিচ্ছে কাগজ, কালো লেখাটা কালো-ই রয়ে গেল। কিন্তু পুরো পৃষ্ঠাটাই ঝাপসা দেখছে মঞ্জু। আঁচল দিয়ে একবার চোখ মোছে মঞ্জু। তুই রইলি জলে আমি রইলাম ডালে। তোর-আমার দেখা হবে মরণের কালে। চিঠিটার শেষ লাইনে 'আমার ভালবাসা নিস' লিখল। লিখে কেটে দিল। ভাল করে কেটে দিল—যেন কিছুতেই না পড়া যায়। তলায় লিখল 'ইতি, অভাগিনী মঞ্জু'। লিখে, কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। চিঠিটার তলায় আরও একটু শূন্যতা আছে। সাদা শূন্যতা। ওখানে লিখল 'পুনঃ : চিঠিটা পড়েই ছিঁড়ে ফেলবি কিন্তু। নামটাও। কোনও প্রমাণ রাখবি না।'

পরের লাইনে লিখল, 'পরি-কে দেখস, প্লিজ। ও যেন সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে। ও যেন সবাইকে দেখিয়ে দিতে পারে মেয়েলি-ছেলে হয়েও বড় হওয়া যায়। আমি ওপর থেকে দেখব, আর শান্তি পাব।'

আরও একটু জায়গা ছিল। ওখানে লিখল, 'আমায় ক্ষমা করিস।'

কাগজটা ভাঁজ করে একবার কপালে ঠেকাল। যে কোনও শুভ কাজে হাতটা কপালে ঠেকায় মঞ্জু। খামে ভরল। ঠিকানা লিখল। ওর ব্যাগে ভরল। স্ট্যাম্প লাগিয়ে এমনি ফেলে দিলে যদি না যায়? কুরিয়ার? ওদেরও বিশ্বাস নেই। স্পিড পোস্ট-ই ভাল।

এবার মোবাইলটা নিল। অনিকেতকে যে-সমস্ত মেসেজ করেছে, ওগুলো 'ডিলিট' করতে লাগল। স্ক্রিনে যখন জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে—'ডিলিট মেসেজ?' ও তখন পোকা মারার মতো টিপে দিতে থাকে : ইয়েস...ইয়েস...ইয়েস...। একটা মেসেজ ছিল 'প্লিজ হেল্প মি।' সেটার ওপর যখন জিজ্ঞাসা-চিহ্নটা এল, ওটা ডিলিট করল না। ওর মোবাইলে এই আর্তিটা শেষ পর্যন্ত লেগে থাকুক। অনিকেতের করা যে-ক'টা মেসেজ ছিল, মেসেজ বক্স থেকে ওগুলোও ডিলিট করে দিল। অনিকেতের সঙ্গে গত কয়েক বছরের সম্পর্কের প্রমাণ জেগে রইল শুধু প্লিজ হেল্প মি-র মধ্যে। ওটা যদি উড়িয়েও দিত, তা হলেও কি সব প্রমাণ লুপ্ত হতে পারত?

জায়গাটা দেখে এসেছে আগেই। পার্ক সার্কাস আর বালিগঞ্জের মাঝামাঝি। রেললাইন-টা পার হলে শরৎ পণ্ডিত স্ট্রিট, একটু হেঁটে গেলেই মরকতকুঞ্জ। বড় স্যরের বাড়ি। ওখান দিয়ে অনেক ট্রেন। দু'চার মিনিট পরপরই ট্রেন।

আত্মহত্যা মহাপাপ, নরকে গমন...। এমনি-এমনি মরলে—যক্ষ্মায়, ক্যানসারে, কিডনির গণ্ডগোলে... তা হলে যেন কত স্বর্গবাস হত... কী এমন পুণ্য করেছে জীবনে? পাপই তো বেশি। পাপের ফল কি নরকে ভোগ করতে হয়? না কি পরের জন্মে? এ জন্মে যে সুখ পেল না, সে কি গত জন্মের কর্মফল? এ জন্মের কর্মফল কি আগামী জন্মে যাবে? আগামী জন্মে তবে কি আরও দুঃখ?

ঘরটার প্রদক্ষিণ করল দৃষ্টিতে। খেলা ফুরল। খেলা ভাঙার খেলা। জল তেষ্টা পাচ্ছে। এতক্ষণে। তেষ্টা এগোয়, জল এগোয় না।

ডাবুদাকে একটা ফোন করবে? শেষ ফোন? শেষবারের মতো গলাটা...।

ওর নামটা দেখেই আবার ফোনটা কেটে দেবে ডাবুদা। পরশুদিন দু'বার কেটে দিয়েছিল।

গাড়িতে উঠিয়ে প্রথমে চাইবাসার সরকারি হাসপাতালে গিয়েছিল। ওখানে ডাক্তাররা হাতে-হাঁটুতে ছোট হাতুড়ি দিয়ে ঠোকাঠুকি করেছিল। প্রেশার মেপেছিল, তারপর বলেছিল—প্রেশার এখনও অনেক বেশি। দু'টো ইনজেকশন দিয়েছিল, তারপর বলেছিল এক্ষুনি জামশেদপুরে নিয়ে যান। ওরা একটা অ্যাম্বুলেন্সও দিয়েছিল। অ্যাম্বুলেন্সে অক্সিজেন সিলিন্ডারও ছিল। শুক্লা বউদির মাথার কাছে বসেছিল ডাবুদা আর মাহাতো বলে ছেলেটা। পায়ের কাছে মঞ্জু। মঞ্জু শুধু ঠাকুরের নাম করছিল। যে-আর্তনাদের মতো হুই-হুই আওয়াজটা অ্যাম্বুলেন্সের থেকে বের হচ্ছিল, আসলে ওটা মঞ্জুর বুক ফুঁড়েই বেরচ্ছিল। অ্যাম্বুলেন্সের কাচের দু'পাশের পাহাড়গুলো, গাছগুলো ক্রমাগত মঞ্জুকে দুয়ো দিচ্ছিল। মঞ্জু কিছুতেই অনিকেতের দিকে তাকাতে পারছিল না। মঞ্জু মাথা নিচু করে বসেছিল। মাহাতো বলছিল—হঠাৎ কী করে এমন হল স্যর? ম্যাডাম বহুত খোশ মে থি। রিকশা থেকে লেবে হামাকে পুছল সাহেব আছে কি নাই? হামি বললাম, একবার তো দেখেছিলাম। বাহার ট্যুরে যায় নাই। তারপর আপনার কোয়ার্টারে লিয়ে গেলাম...।

অনিকেত বলেছিল—প্রেশারের গণ্ডগোল বহু দিন থেকেই তো ছিল। কী জানি হঠাৎ কেন এমন হল। স্ট্রোক হলে এরকম হঠাৎই তো হয়। আমার শালি এসেছিল হঠাৎ। ম্যাডামের নিজের বোন নয়, কাজিন বোন। আমি ফোন করে ম্যাডামকে বললাম, চলে এসো।

—তা হলে কেন ম্যাডাম হামাকে পুছল সাহেব আছে কি নাই?

অনিকেত বলল—তা হলে হয়তো জানতে চেয়েছিল তখন ছিলাম, না কি বাজার-টাজারে গিয়েছিলাম।

মঞ্জু বুঝতে পারছিল না তখন ওর কী করা উচিত। অনিকেতের কথাতেই তো সায় দেওয়া উচিত ছিল। দু'বার ঘাড়ও নাড়িয়েছিল মঞ্জু, কিন্তু অনিকেত বা মধু মাহাতো কারও চোখের দিকেই তাকাতে পারেনি।

ট্যুর কোম্পানির চাকরিটার জন্যই হয়তো খারাপ অবস্থা সামাল দেওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনেক সময় মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে, সত্যি-মিথ্যে বানাতে হয়েছে। মঞ্জু তখন সত্যি বানানোর চেষ্টা করছিল। মিথ্যেকে সত্যি দিয়ে মুড়ে দেওয়ার, বা সত্যিকে মিথ্যে দিয়ে...।

মঞ্জু দু'একবার শুক্লার গা ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল—দিদি, ও ফুলদি, শুনতে পাচ্ছো? একবার আড়চোখে তাকিয়েছিল অনিকেতের দিকে। অনিকেতের কপাল কুঁচকানো।

হাসপাতালে তাড়াতাড়ি ভর্তি করে নিয়েছিল ওরা। মাহাতো অনিকেতের সঙ্গে-সঙ্গে ছিল। মঞ্জু বসেছিল নীচে। হাসপাতালের ঠিক বাইরে একটা হনুমান মন্দির আর একটা শিবমন্দির ছিল। ওখানে মাথা ঠুকেছিল। ও একটা কালীমন্দিরের অভাব বোধ করছিল। ধোঁয়া-মাখা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, হে মা কালী আমাকে বাঁচাও। আসলে শুক্লার 'বাঁচা' মানে মঞ্জুরও বাঁচা।

কিছুক্ষণ পরে অনিকেতকে নামতে দেখে ছুটে গিয়েছিল মঞ্জু। 'বেঁচে আছে, এখনও বেঁচে আছে' বলে বোধহয় কোনও ওষুধ আনতে ছুটেছিল। তারপর দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল মঞ্জু। মাহাতোও নেমেছিল। মঞ্জুর দিকে তাকিয়েও চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে অনিকেত আবার ঢুকেছিল হাসপাতালে। বলেছিল, এমআরআই হবে।

মঞ্জুর মনে হচ্ছিল ও কীরকম অনাবশ্যক এই সময়ে। ও কোনও কাজেই লাগছে না। ওর

এখানে থাকা না-থাকার কোনও মানে নেই। আরেকবার দেখা হল। সঙ্গে মাহাতো। মঞ্জু শুধু বলল, তোমরা কিছু খেয়ে নাও। সারা দিন কিছু...। ডাবুদা বলেছিল—এসব নিয়ে ভাবতে হবে না।

একা বসেছিল নীচে। যারা বসেছিল, তারা অনেকে চলে গেল, নতুন কেউ এল। ওরাও চলে গেল। সন্ধে হল। ওদের খবর পাচ্ছিল না। মঞ্জু সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওদের খুঁজছিল। দোতলায় দেখল একটা চেয়ারে বসে আছে ডাবুদা। চোখ বোজা। মঞ্জু সামনে দাঁড়ানো। চোখ খুলছে না ডাবুদা। জিগ্যেস করল, এখন কেমন আছে বউদি? অনিকেত চোখ খুলল। বলল, মাথায় রক্ত জমে আছে। এখন কিছু বলা যাচ্ছে না। তুই চলে যা। ঢিল ছোড়ার মতোই কথাগুলো ছুড়ে দিয়েছিল ডাবুদা।

অটো করে জামশেদপুর স্টেশন। একটা ট্রেন পেল সাড়ে সাতটায়। হাওড়া স্টেশনে যখন ঢুকল রাত বারোটা বেজে গিয়েছে। স্টেশনে সারা রাত।

পর দিন সকালে ফোন করেছিল। ডাবুদা বলেছিল, ডান দিক পড়ে গিয়েছে। এখনও জ্ঞান আসেনি।

বেশি ফোন করতে ভয় পাচ্ছিল। এদিকে ফোন না-করলে খবরটাও পাওয়া যাবে না। অনিকেত ফোন ধরত না বেশির ভাগ সময়। জেনেছিল জ্ঞান ফিরেছে। সাত দিন নাকি দশ দিন হাসপাতালে ছিল। শুধু জেনেছিল এখন বাড়িতে।

মঞ্জু বলেছিল, আর ফোন করব না কখনও।

অনিকেত বলেছিল, আচ্ছা ঠিক আছে।

আলনায় ছেড়ে রাখা পরি-র জামাকাপড়। সবগুলো একসঙ্গে করে নিয়ে দু'হাতে মুখে চেপে ধরে। জোরে শ্বাস নেয়। পরির গায়ের গন্ধ। কী সুখ! কী সুখ! ওইসব জামাকাপড় অনেকক্ষণ গায়ে মাখে মঞ্জু। বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর উপুড় হয়ে থাকে। তারপর আবার ভাঁজ করে করে গুছিয়ে রাখে। ট্রাউজার, কুর্তা, ফতুয়া, গেঞ্জি, ব্রা, শর্ট...। ফতুয়াগুলো এমন করে বানিয়েছে, যেন মেয়েদের টপ। ছবি এঁকে ডিজাইন করে দেয় ও। ছবি আঁকার খাতাটা কি আছে? পাওয়া যাবে? ওর ছোটবেলার ছবি আঁকার খাতাটা? ময়ূর আঁকত, সাপুড়ে এঁকেছিল একটা, কী সুন্দর একটা আঁকা ছিল, খাতার এক কোণে কয়েকটা ফোঁটা। এটা কী সোনা? ও বলেছিল এটা তুমি। আমি কেমন করে হব? ও বলেছিল, কেন, এটা তো তোমার শাড়ির আঁচল? এই যে বুটি বুটি, এই শাড়িটাই তো। আর তুমি তো রান্নাঘরে। তোমার শাড়িটা শুধু দেখা যাচ্ছে। সেই আঁকার খাতাটা খুঁজতে গিয়ে অ্যালবামটা পেয়ে গেল। কার্তিকের সঙ্গে ওর ছবি স্টুডিওতে গিয়ে তোলা। সিংহাসনের মতো দু'টো চেয়ারে ওরা দু'জন পাশাপাশি বসে আছে। কার্তিকের একটা হাত মঞ্জুর কাঁধে। মঞ্জুর সিঁথিতে অনেকটা সিঁদুর। জমিদার বাড়ির মতো থাম, জাফরি-কাটা জানলা। ওগুলো স্টুডিওর ছবি। স্টুডিওর লোকটা জিগ্যেস করেছিল, 'পিছনে কী রাখবেন? তাজমহল না ফুলের বাগান, না কি জমিদার বাড়ি?' এই তো সেদিন। এই তো ছোট সোনাটা। নেংটু। ওর পুরুষ-চিহ্নটা দেখল ভাল করে। ছোট্ট পরিকে চুমু খেল একবার। মঞ্জুর মায়ের ছবি। রান্নাঘরের গন্ধ, কলঘরের শ্যাওলার গন্ধ। শাড়িতে হলুদের গন্ধ। মা, আমাকে তুমি আনলে যদি, ফিরিয়ে নাও। মা! বার্লির গেলাস, জ্বরের আবছা গন্ধ, তোমার

ঠান্ডা-ঠান্ডা হাত আমার কপালে ছুঁইয়ে দাও। মা, তোমার ঘোমটা সামান্য টানা, ঠোঁটের কোনায় একটু পানের রস, সাদা-কালো ছবিতে বোঝা না-গেলেও, আছে। মা গো, শীতসন্ধ্যার বৃষ্টির মতো মন কাঁদে। পাতা উল্টে যায়, অ্যালবামের পাতা, পুরনো দিন, পুরীতে তোলা তিনজন। কার্তিকের কাঁধে পরি। সমুদ্রের ধারের ফোটোগ্রাফার তুলে দিয়েছিল। পিছনে সমুদ্র। স্থির সমুদ্রকেও এক ফোঁটা নুন জল দিল মঞ্জু। অ্যালবাম-টা গুছিয়ে রেখে দিল। আর কী-কী কাজ? ভাবতেই কাকের ঝাঁকের মতো কাজগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রবল কা-কা-কা...। হুশ করে তাড়াল মঞ্জু। এখন চাই নীরব শান্তি। মাথা ঠান্ডা রেখে এগোতে হবে। হে ভগবান, যেন সব ঠিকঠাক হয়।

এগারোটা নাগাদ খেয়েদেয়ে পরি বেরিয়ে গিয়েছে। কোথায় যায়, মঞ্জু জিগ্যেস করে না। কখন আসবে সেটা জিগ্যেস করে কখনও-কখনও। আজ জিগ্যেস করেছিল। পরি বলেছিল, সন্ধের পর। মঞ্জু বলেছিল, আমি যদি তখন বাড়িতে না-থাকি, তুই খেয়ে নিস বাবা। ঘুগনি করে রাখব, খেয়ে নিস। কাবলি ছোলার ঘুগনি খেতে খুব ভালবাসে পরি। প্রেশার-কুকারে ভেজানো কাবলি ছোলা বসিয়ে দিল। আলমারি খুলে গয়নার পুঁটুলিটা বের করল মঞ্জু। নিজের কানের থেকে রিং দু'টো বের করে পুঁটুলিতে রাখল। পুঁটুলিটা শক্ত করে গিঁট দিল। ওর না-দেখা আগামী দিনগুলোকে বাঁধল মঞ্জু। যেন সোনার দিন হয়, সোনালি দিন হয় ছেলেটার। ব্যাঙ্কে যা আছে, ছেলের সঙ্গেই আছে। কাগজপত্রগুলো সব একটা খামে ভরা আছে। খামের ওপর মঞ্জু লিখল : ব্যাঙ্ক। সোনা-টোনাগুলো নিয়ে ওই চয়ন বলে ছেলেটা পালাবে না তো? ওকে খুব বিশ্বাস করে ছেলেটা। খুব আসা-যাওয়া করে। ছেলেটাকে তো দেখে ভালই মনে হয়। বাইরে থেকে দেখে কাউকে কি কিছু বোঝা যায়?

এই কথাটাই তো বলেছিল মাহাতো বলে ছেলেটা। নাক দিয়ে গড়ানো রক্ত দেখে ছুটে বাইরে গিয়েছিল ডাবুদা ড্রাইভারকে ডাকতে। শুক্লা বউদির তখন জ্ঞান নেই। মাথায় জলের ঝাপটা দিচ্ছিল মঞ্জু। তখন ভয়ও হচ্ছিল। যদি জ্ঞান ফিরে তাকায়, মঞ্জুকে দেখে, যদি বলে তুমি কেন এখানে? কী বলত তখন মঞ্জু? গাড়ির ড্রাইভার সেদিন ছিল না। রবিবারের ছুটিতে কোথাও গিয়েছিল। মাহাতো ছেলেটি অন্য একটা গাড়ি নিয়ে এসেছিল তাড়াতাড়ি। লোকজন জড়ো হয়েছিল। স্ট্রেচার-ও জোগাড় হয়েছিল একটা। ধরাধরি করে গাড়িতে কোনওরকমে শোয়ানো হয়েছিল শুক্লা বউদিকে। সে-সময় ছেলেটা বলেছিল ওই কথাটা।

ঘুগনির মধ্যে কয়েকটা কিশমিশ মিশিয়ে দিল মঞ্জু।
পেঁয়াজের কুচি দিল করি পরিপাটি।
তারপরে যত্ন করি ঢাকা দিল বাটি।।
তাহার উপরে লেবু এক খণ্ড রাখি।
আঁচলে মুছিল বামা জলপূর্ণ আঁখি।।

এবার দরজা বন্ধ করে মরতে যাবে। একটুও বুক কাঁপছে না তো? গলাও শুকিয়ে আসছে না। তবু একটা ছোট জলের বোতলে জল ভেরে নেয়। মোবাইলে কথা বলতে-বলতে রেললাইন পার হবে মঞ্জু। কথা বলবে, বড় স্যারের সঙ্গে। বলবে স্যার, আমার জন্য একটা কিছু করুন স্যার, আমাকে বাঁচান স্যার... সেই সময় ট্রেনটা এসে ধাক্কা দিয়ে ওর সব সমস্যার সমাধান

করে দেবে। কাগজে বেরবে : মোবাইলের বলি এক গৃহবধূ। অ্যাক্সিডেন্ট। সুইসাইড নয়। মোবাইলের কল রেজিস্টারে প্রমাণ থাকবে ও বাঁচতে চেয়েছিল।

হেন কালে অকস্মাৎ হল দৈববাণী।

মোবাইল তোমার হাতে না রবে তখনি।।

কে যেন বলল—মোবাইল তো ছিটকে যাবে। থাকবে না তোমার হাতে। কেউ যদি ওটা নিয়ে পালায়? তোমার বাঁচার প্রমাণ তো চুরি হয়ে যাবে বাছা...।

মঞ্জু তখন অন্য একটা বুদ্ধি করল। কী করে এসব বুদ্ধি আসে এ সময়ে?

মঞ্জু আবার কাগজ-কলম বের করল।

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমাদের অফিসটা বন্ধ করে দিলেন। আপনি দয়াপরবশ হয়ে দুই মাসের বেতন দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এতে ক'দিন চলবে? আমাকে অন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিন। আপনার তো কত চেনা-জানা আছে। আমি এখন কোথায় কাজ পাইব? আপনার পায়ে পড়ি, আমার জন্য যে কোনওরকম কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিন। দরকার হলে আপনার বাড়ির রান্নার কাজ করতেও রাজি আছি। আমার অবস্থা আপনি সবই জানেন। এত দিন আপনার দয়ায় ডাল-ভাত জুটিয়াছিল। এবার আমি কী করব? আমাকে বাঁচান স্যার।

এইটুকু লিখে কিছুক্ষণ কলম কামড়ে রইল মঞ্জু। তারপর আবার লিখল—এই আবেদন পোস্ট না-করিয়া আমি নিজ হাতে আপনাকে দিলাম। পোস্ট করিলে দেরি হইবে। মার্জনা করিবেন। ইতি।

কলমটা কপালে ছুঁইয়ে নিজের নামটা লিখল : মঞ্জু।

চিঠিটা ভাঁজ করে ব্যাগে রাখল। ও যে চাকরির জন্য দেখা করতে যাচ্ছে, এটা তার প্রমাণ।

চিঠিটা ব্যাগে থাকবে। আর হাতে থাকবে মোবাইল। মোবাইলেই স্যারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাবে।

ঘরে তালা দেওয়ার আগে শেষবারের মতো আর একবার দেখে নিল ঘরটাকে। পরির টেবিল।

তালাটা চাবি দেওয়ার আগে, চাবিটা কপালে ছোঁয়াল মঞ্জু। এই তালা যেন আর না-খুলতে হয় আমার। গ্রীষ্মের আকাশে তাকাল। কপালে ছোঁয়াল হাত। ঈশ্বরের কাছে মৃত্যুই চাইছে ও, কিন্তু ও বলল, 'হে মা কালী। আমাকে বাঁচাও।' জামশেদপুরের আকাশেও বলেছিল 'আমাকে বাঁচাও'। মানে, শুক্লাকে। ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু চায় না কেউ। মঞ্জুও চাইল না। ও জানে, 'বাঁচাও' মানে 'নির্বিঘ্নে মরণ দাও।'

পোস্ট অফিসে গেল ও। অনিকেতকে লেখা চিঠি। জিগ্যেস করল ঠিক যাবে তো? পোস্ট অফিসের লোক বলল, যাবে তো মানে? মঞ্জু বলল, খুব জরুরি চিঠি। দরকারি। খুব দরকারি। রেজিস্ট্রি করে দেব? না কি স্পিড পোস্ট?

যা খুশি। স্পিড পোস্ট তাড়াতাড়ি যাবে। তা হলে তাই করে দিন।

ব্যাগের গহ্বর থেকে যত্নে রাখা চিঠিটা বের করল মঞ্জু। কপালে ঠেকিয়ে কাচের ফাঁকের মধ্যে সমর্পণ করল চিঠিটা। একটা ছোট্ট চিরকুট পেল। প্রমাণ। বাইরে বেরিয়ে ওই প্রমাণটাকে

পাকিয়ে রাস্তার ঝাঁঝরি খুঁজতে লাগল মঞ্জু। হাঁটতে গেলে মনে হচ্ছিল ওর পায়ে শেকল পরানো আছে। শেকল ছেঁচড়ে হাঁটতে-হাঁটতে ঝাঁঝরি খুঁজতে লাগল মঞ্জু। ওকে এখনও অনেক দূর যেতে হবে, অনেক দূর। একটা ঝাঁঝরি এবং একটা ট্যাক্সি একসঙ্গেই পেয়ে গেল। মঞ্জুকে দেখে একটা ট্যাক্সি থামল। কেন থামল? মঞ্জুকে দেখে কখনও কোনও ট্যাক্সি থামে না। ট্যাক্সিওলারা বুঝে যায় এ মেয়ে ট্যাক্সির নয়। কিন্তু আজ ট্যাক্সিটা মঞ্জুর সামনে এসে প্রায় থেমে গেল। ড্রাইভার জিগ্যেস করল, যাবেন? মঞ্জু বলল, বালিগঞ্জ স্টেশন।

খুব বিলাসিতা করা গেল। ব্যাগ থেকে একটা পঞ্চাশ টাকা বের করে দিল। ব্যাগে আরও তিরিশ-চল্লিশ টাকা আছে। সবই তো ভাবতে হয়। ঝাঁপ দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে যদি কেউ হাত ধরে টেনে নেয়? রোজ কত কী যে ঘটে যাহা তাহা—এমন কেন সত্যি হয় না আহা... দেয়াল ল্যাম্পপোস্ট চাঁদসী চিকিৎসালয় বলরাম মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে এ লাইনগুলো উচ্চারিত হতেই ‘চোপ এক থাপ্পড় মারব’ বলে ‘ঠিক যেন এক গল্প হত তবে’-র গল্পটিকে থামিয়ে দেয়। কবজি উল্টে ঘড়ি দেখে। ঘড়িতে চারটে বেজে দশ। ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের করে। একটা মেসেজ লেখে, Ami Ektu Apnar Kachhe Jachhi Sir, Khub Darkar Amake Banchan. বড় স্যারের নম্বরে পাঠিয়ে দেয়। সব কিছু রেডি। সুইসাইড নয়। বাঁচার জন্য যাচ্ছে মঞ্জু। ভ্যানে করে ঝিঙে-ট্যাঁড়সের ঝুড়ি যাচ্ছে বাজারের দিকে। দক্ষিণের কাজের মাসি-পিসিরাও বেরিয়ে পড়েছে। ফুচকাওয়ালাটিও চলেছে এবং আইসক্রিম। চারিদিকে জীবনের আয়োজন।

এই মাত্র হুশ করে ট্রেন ছুটে গেল দক্ষিণের দিকে। লাইনের ওধারে শরৎ পণ্ডিত রোড।

রেললাইনের ধারে এসে থামে মঞ্জু। ব্যাগটা আঁকড়ে রাখে।

নয়া গাঙের পাড়ে রে ফুটিল চম্পার ফুল
কে তুমি দাঁড়াইয়া কন্যা উড়ে মাথার চুল
বাতাসে কাঁপিছে কন্যার মলিন বসনখানি
দূরের পানে চাহে কন্যা নাও-এর শব্দ শুনি
গাঙের পাড়ে বিরল বৃক্ষ চিরল চিরল পাতা
বৃক্ষ কহে কহ কন্যা তোমার মনের কথা
বৃক্ষের পক্ষী ডাক্যা কয় কন্যা থাক আশার আশে
আইজ বা গেল মন্দেরে মন্দে কাইল বা সুদিন আসে

বৃক্ষ কথা পক্ষী কথা শুনিল না নারী
অদূর দরিয়ার দিকে দিল সে যে পাড়ি।

বৃক্ষ থেকে, পক্ষী থেকে, ল্যাম্প পোস্ট, রেললাইনের পাথর, পোস্টার, আকাশ-বাতাস-চরাচরের ভিতর থেকে তীব্র আর্তনাদের মতো, চিৎকারের মতো, অট্টহাসির মতো ট্রেনের হুইশল...।

শ্মশানেই একজন ঠাকুরমশাই ধরেছিল ওরা। চয়ন, কার্তিক, পরি'র প্রতিবেশীরা ছিল শ্মশানে। মঞ্জুর মৃতদেহ পেয়েছিল তিন দিন পর। পোস্টমর্টেম-এর পর। পুলিশের ব্যাপারটা কার্তিকবাবুই দেখেছে।

মর্গে মৃতদেহকে বলে 'লাশ'। বারবার 'লাশ' শব্দটা উচ্চারিত হয়েছিল তখন। মুখাগ্নির আগে 'প্রেত'। বারবার 'প্রেত'।

সপ্ত ছিদ্রে সাত খণ্ড সোনা লাগে। ঠাকুরমশাই বললেন।

—সোনা?

পরি-র মনে হয়েছিল, মায়ের কানে তো সব সময় পরার মতো দুল থাকত। কিন্তু মুখটা মোড়ানো। দেহটাই তো টুকরো-টুকরো হয়ে আছে। মর্গে একবার কাপড়টা উঠিয়ে মুখটা দেখিয়েছিল এক ঝলক। ডোম বলেছিল, এসব মরা দেখতে নেই। নাক আর ঠোঁটটা দেখিয়েছিল ডোম। বলেছিল, মাথার কাপড় ওঠাব না। খুলি উড়ে গিয়েছে।

কার্তিক বলল, সোনা পাব কোথায়?

ঠাকুরমশাই বললেন, অভাবে কাংস্য। ডালার মধ্যে কাংস্য নেই।

শ্মশানেই সব পাওয়া যায়। 'দাহকর্মের ডালা' বললেই সব দিয়ে দেয়। তিল, আতপ চাল, ঘি, মালসা—সবই থাকে। ঠাকুরমশাই বললেন, কাংস্য আলাদা কিনতে হয়।

কার্তিক বলল, ঠিক আছে, মূল্য ধরে দিচ্ছি। দশটা টাকা দেব'খনে।

ঠাকুরমশাই বলল, অপঘাতে মৃত্যু কিনা, যতটা পারা যায় শাস্ত্র মেনে কাজ করা উচিত। নইলে মুক্তি পাবেন না যে। নাও, মন্ত্র পড়ো—এহি প্রেত গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ...। জলের ছিটা দাও। এবার ঘি মাখানোর কথা। কিন্তু শরীর কি আছে? ঢাকা চাদরের ওপর ঘি ছড়াও। এই নাও পাটকাঠি। আগুন জ্বালাও। মুখ তো দেখা যাচ্ছে না, ঢাকনা খোলার দরকার নাই। এই যে, এইটা যদি মাথা হয় এখানেই মুখ। এইখানে জ্বলন্ত অগ্নি স্পর্শ করো। বলো, সর্বে হুতাশন গৃহীত্বা এনং দহন্তু। দহেয়ং সর্বগাত্রানি দিব্যান লোকান স গচ্ছতু...।

হাঁ-মুখ খুলে গেল। ভিতরে গনগনে হুতাশন। দিব্যলোক। কাপড়ে প্যাঁচানো লাশ। পরি এতক্ষণে কেঁদে উঠল, মা গো...। কার্তিক ওর কাঁধে হাত দিতেই এক ঝটকায় কাঁধটা সরিয়ে দিল।

ঠাকুরমশাই জিগ্যেস করলেন, অশ্বলায়ন গোত্র তো মন্ত্রে বললাম। কী জাত?

কার্তিক বলল, আমরা ছুতোর। পাল লিখি।

—ক'দিনে কাজ করা হয়?

কার্তিক বলল, বাবার বেলায় তো তেরো দিনে করেছিলাম।

—এটা অপঘাত কিনা, সাতদিনে হবে। 'সুইসাইড কেস' হলে অশৌচ, শ্রাদ্ধ কিচ্ছু হয় না। আমি সুইসাইড কেস-এ 'কাজ' করি না। যে-ব্রাহ্মণ 'সুইসাইড কেস' করে, তারও প্রায়শ্চিত্তির করতে হয়। 'অ্যাক্সিডেন্ট কেস' বলে আমি করছি। আর ভাল কথা। মৃতের কোনও মেয়ে নেই তো? বিবাহিতা মেয়ে হলে কালই অন্নজল করতে হবে।

'বিবাহিতা' শব্দটা শুনতে বোধহয় পরিমল ভুল করেছিল।

পরি চয়নকে বলল, আমি তা হলে কালই করে ফেলি?

চয়ন বলল, তোর বাবা কি রাজি হবেন?

পরি একটু জোর দিয়েই বলল, শুনব না, শুনব না, ওর কথা।

চয়নও বোধহয় পুরোহিতের সব কথা খেয়াল করেনি।

পরি পুরোহিতকে বলল, অন্নজল করতে কী লাগে?

—চাল, ফলমূল, হরীতকী, গীতা আর দক্ষিণা পিত্তল বা কাংস্য পাত্রে দান করতে হয়, আর মৃতাকে জলদান করতে হয়।

পরি বলল, কালই তবে করব। ঘাটে এসে করতে হবে?

কার্তিক বলল, কাল কেন? কী সব বলছিস?

পুরোহিত বলল, বিবাহিতা কন্যার ক্ষেত্রে চতুর্থ দিনে।

—অবিবাহিতা হলে?

—সাত দিনেই হবে।

—ওঃ।

রণে ভঙ্গ দেয় পরি।

কিছুক্ষণ পর একটা মালসায় ধোঁয়া-ওঠা একটা ছাই-ঢাকা কালচে মাংস দিয়ে ডোম বলল, তোমার মায়ের নাভি।

গন্ধ পাচ্ছে পরি।

মায়ের গন্ধ কত দূর থেকে পেত। ঘরে এলেই বুঝতে পারত। এখনও চাদরে, শাড়িতে মায়ের গন্ধ লেগে রয়েছে। আর এটাও মায়ের পোড়া গন্ধ।

প্লেটে করে ধোঁয়া-ওঠা চাউমিন নিয়ে আসত মা। এখন মালসায় ধোঁয়া-ওঠা-মা'কেই নিয়ে যাচ্ছে পরি। গঙ্গায় নাভি ভাসিয়ে স্নান করতে হবে। প্রতিবেশীরা দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ির ওপর। কার্তিকবাবুর হাতে একটা নতুন কোরা কাপড়, কাঁধে গামছা। প্রতিবেশীদের কে যেন একটা চাবিও জোগাড় করে সুতোয় বেঁধে দিয়েছে। কার্তিকের হাতে ঝুলছে সেই চাবি। পরির পরনে একটা ফুলপ্যান্ট এবং হাওয়াই শার্ট। ওকে এবার এসব খুলতে হবে। নাভি বিসর্জন দিয়ে গামছা পরে অবগাহন করতে হবে। তারপর ধরাচুড়ো পরতে হবে।

পরি হাতছানি দিয়ে চয়নকে কাছে ডাকল। চয়নের কাঁধ ধরে ওর কানে-কানে বলল, আমি কী করে সবার সামনে খালি গা হব?

চয়ন বলল, ওদের বল্লে দে মাথায় জল ছিটিয়ে বাড়ি গিয়ে ধরাচুড়ো পরবি।

পরি বলল, ওসবই বা কী করে পরে থাকব? গায়ে কী দেব?

চয়ন দাড়িটা চুলকে বলল, ওসব বাড়ি গিয়ে দেখা যাবে। এখন বলে দে যে, তুই স্নান করবি না। শরীর খারাপ করবে।

পরি যদি বলে, আমি এখন জামা খুলে খালি গায়ে স্নান করতে পারব না, সবাই হাসাহাসি করবে। যদি খালি গায়ে স্নান করে, তা হলেও সবাই হাসাহাসি করবে। অনেকের কাছে সারা জীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে।

পরি-র তেরো-চোদ্দো বছর বয়সের সময় ওর বুকটা ফুলে গিয়েছিল, একটু বড় হয়ে গিয়েছিল। পরে জেনেছিল, বয়ঃসন্ধির এই ব্যাপারটাকে বলে 'গাইনিকোম্যাস্টিয়া'। বয়ঃসন্ধিতে শরীরে অনেক তোলপাড় হয়। নতুন-নতুন কেমিস্ট্রি সব। ওই সময় কিছুটা ইস্ট্রোজেন-ও তৈরি হয়ে যেতে পারে। তার প্রভাবেই 'গাইনিকোম্যাস্টিয়া' হয়। আবার কমেও যায়। পরি-র কমেনি। তাতে খুশিই হয়েছিল পরি। গত কয়েক বছর ট্যাবলেট খাচ্ছে ও। ওর বুকটা অন্য ছেলেদের মতো নয়, একটু বড়ই। আয়নায় দেখে বেশ লাগে। ওর বাড়ির প্রায় সবাই জানে এটা। প্রায় বস্তির মতো জায়গায় থাকে। ছেলেরা বাইরে স্নান করে, মেয়েদের জন্য ঘেরা স্নানঘর আছে। পরি তো ওই ঘরে স্নান করতে পারে না, বাইরেই করতে হয়, গায়ে গামছা ঢাকা দিয়ে ঘরে আসে।

আজ গঙ্গায় মা-র দেহাবশেষ ভাসাতে গিয়ে ঘাটের সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে মনে হল, কতগুলো মানুষ গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে আছে জলের ভিতরে একটা ইরোটিক শো-র প্রতীক্ষায়। পরি সিঁড়ি বেয়ে সোজা ওপরে চলে আসে।

কি রে, ডুব দিলি না? নারায়ণী মাসি বলে ওঠে।

পরি মুখ ফিরিয়ে সমুদ্রের-দিকে-ভেসে-যাওয়া ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, না। ডুব দেব না।

গলাটা যতটা সম্ভব কঠিন করার চেষ্টা করে পরি।

সে কী? ডুব দিতে হয়। তোর বাবা কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা পরে আগুন ছুঁয়ে, লোহা ছুঁয়ে, দাঁতে নিমপাতা কেটে বাড়ি ঢুকবি। সব ব্যবস্থা করে রেখিছি যে...!

পরি যতটা সম্ভব পুরুষ হতে চেষ্টা করে। দু'হাত আড়াআড়ি রাখে, স্বামী বিবেকানন্দ-র ছবিতে যেমন। বলে, কে বলেছে ওসব ব্যবস্থা করতে? আমি ওসব মানি না। নারায়ণী মাসি বলে, এ কী অলুক্ষুণে কথা বলে, অ্যাঁ? তোর মা তোকে কত ভালবাসত, তোর মায়ের ওপর কর্তব্য নেই? মায়ের গতি করবিনে? তুই ছাড়া তোর মায়ের কে ছিল বল? একমাত্তর ছা। অ্যাক্সিডেনে মরেছে। অপঘাত মরণ। শাস্তরের যা নিয়ম আছে তা করতে হবে নে?

এমন সময় অনিকেত এসে পড়ে। পরি ফোনে জানিয়েছিল। অনিকেত দোটানায় ছিল। ভেবেছিল আসবে না। শেষ পর্যন্ত এসেই পড়ল। এবং এসে এসব শুনছিল, এবং ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

অনিকেত বলল, কেন ওকে জোর করছেন সবাই? যদি নিমতলা শ্মশানে না-এনে কেওড়াতলায় নেওয়া হত, ওই নোংরা জলে ডুব দেওয়ার জন্য বলতেন?

ওই ভদ্রমহিলা অনিকেতের দিকে কপাল কুঁচকে তাকাল। তারপর বলল, আপনি ক্যা? চিনছি না তো? ওর কে হন? তারপর আবার এমন তাকাল যেন অনিকেতকে ক্যাবলা করে দেবে। বলল, অ! চিনিচি। একদিন দুকুরবেলায় দেখেছিলুম তো মঞ্জুর ঘরে। রান্নাঘরের গ্যাস জ্বালিয়ে এমন মশগুল ছিল যে, আমি গ্যাস নিবে না-দিলে অ্যাক্সিডেন হয়ে যেত। আমি যাকে একবার দেখি, ভুলি নে...।

সবাই এবার গঙ্গার ধারের সিঁড়ির গ্যালারি থেকে অনিকেতকে দেখতে থাকল।

অনিকেত এবার সাহস অবলম্বন করল। বলল, হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছিলেন। একটা কাজে এসেছিলাম একবার।

—একবার এসেই এত?

চোখ নাড়িয়ে বলল ওই মহিলা।

পরি ততক্ষণে মাথায় জল ছিটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। ওর পাশে চয়ন। পরি ওর বাবার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। অনিকেতের কাছে এল। বলল, শেষ পর্যন্ত এলেন তা হলে কাকু...।

অনিকেত পরিমলের মাথায় হাত দিল। কার্তিক অনিকেতকে চেনে। মঞ্জুর জামিনের দিন আলাপ হয়েছিল। কার্তিক ওর এক হাতে একটা সাদা থান, অন্য হাতে একটা পলিথিন ব্যাগ ধরে ফ্যালফ্যাল দাঁড়িয়ে আছে।

পরি অনিকেতকে জিগ্যেস করল, এবার আমি কী করব কাকু?

বাড়িতে কেউ আছে? অনিকেত জিগ্যেস করল।

—বড় মাসি এসেছিল, এখনও আছে।

—ক'দিন থাকবেন উনি?

—আর দু-চারদিন হয়তো। একটা শ্রাদ্ধ তো করতে হবে...। না হলে টেকা যাবে না।

অনিকেত মৃদু মাথা নাড়াল শুধু। কার্তিক এসে অনিকেতের হাতে থান কাপড়টা ধরিয়ে দিল। আর প্লাস্টিকের ব্যাগ। বলল, এখানে আসন আছে, লোহা আছে। আমার কর্তব্য আমি করলাম। শ্রাদ্ধের দিনেও আমি আসব, খরচাপাতি যা লাগে দেব, শ্রাদ্ধ এই ঘাটেই হবে, ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে। বামুনভোজন-টা এই 'বাবা তারকনাথ হিন্দু হোটেল'-এ করিয়ে দেব। পাঁচজন বামুন দরকার। ঠাকুরমশাই একজন, আর আপনিও থাকুন না, আপনি তো বামুন। অনিকেতকে বলল কার্তিক।

অনিকেত হ্যাঁ, না কিছুই বলল না।

—আর বাকি তিনজন আমি জোগাড় করে নেব।

এবার দু-তিনটে সিঁড়ি ওপরে উঠে হাতজোড় করে বলে, শ্মশানবন্ধুদের বলছি, আগামী তরশু দিন, শনিবার, আপনারা সবাই এই ঘাটে দুপুরবেলা আসবেন। আমার স্ত্রী মঞ্জু-র আত্মার শান্তির জন্য ঘাটকাজ করব, আপনারা সবাই দুপুরে ভোজন করবেন।

কার্তিক এবার একটা হাত দিয়ে অন্য হাতটা ঘষে নিল। যেন হাতের ধুলো ঝেড়ে নিল।

প্রৌঢ়া মহিলাটি, যে মঞ্জুদের পাশের ঘরে থাকে, তাকেই যেন 'আপন লোক' মনে হল কার্তিকের।

বলল—আমার সঙ্গে কোনও কানেকশন রাখত না ওর মা, তবুও কর্তব্য করলাম। আর ওই ছেলেটার কথা কী বলব? আজব একখান চিজ, আপনারা সবই জানেন। ওর কাছ থেকে আমি কিছু আশা করি না। মঞ্জু'কে যখন পুলিশে ধরে নিয়েছিল, ছুটে গিয়েছি। মরার পরও ছুটে এয়েচি। ওপরওলার কাছে আমি কিলিয়ার। কেমন কিনা?

নারায়ণী নামের ওই মহিলাটি বলল, আপনি আপনার ডিউটি করেচেন। কিন্তু ছেলে যদি ছেলের ডিউটি না-করে, আপনি কী করবেন আর আমিই বা কী করব। পাশের ঘরে থাকত

মেয়েটা, ওর মনের কথা বলত। ছেলেটা বিচিত্তির হয়েছে। ছোটবেলাতেই যখন রং-ঢং করত—থাবড়া মারা উচিত ছিল, খালি থাবড়া। মায়ের মন, পারেনি। আপনি ঘরে থাগলে হয়তো অমন হত না। যাক, যা অদেষ্ট, যার কপালে যা নেকা।

কার্তিক ঘাড় নাড়ছিল, মাঝে-মাঝে জিভ দিয়ে ঠোঁটের কোনার ছোট্ট ঘা-টা স্পর্শ করছিল।

ওরা উঠে এল। শ্মশানঘাটের কাছে সাধারণত ট্যাক্সি থাকে। পরি-র হাতে একটা পাঁচশো টাকার নোট গুঁজে দেয় অনিকেত। সবার জায়গা হল না। চয়ন আর পরি উঠল। নারায়ণী আর একজন মহিলা। কার্তিক কী করবে বুঝতে পারছিল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু বিড়বিড় করল। তারপর সামনের সিটে উঠে বসল।

অনিকেত সেদিন হাসপাতালেই প্রতিজ্ঞা করেছিল, অনেক হয়েছে আর নয়। এই মঞ্জু, এবং ওর গুষ্টির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবে না। ও বলেছিল, শুক্লাকে বাঁচিয়ে দাও। কাকে বলেছিল? ভগবানকে? বহু দিন ভগবানের কাছে কিছু চায়নি ও। কিছু জানতেও চায়নি ঈশ্বরের কাছে। বরং জানতে চেয়েছে ইন্টারনেট-এর কাছে। কিছু প্রার্থনাও করেনি কত দিন। বিস্ময়ের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে, সেটাকে 'ঈশ্বর' বলে ডাকাডাকি করাটা বন্ধ করেছে বহু দিন। কিন্তু যখন ডাক্তার বলল, সেরিব্রাল স্ট্রোক, কিচ্ছু বলা যাচ্ছে না, তক্ষুনি অদৃশ্য-ঈশ্বর মাথার ওপরের ফ্যানটায় দুলে উঠলেন। হাসপাতালের সবুজ পর্দায় নড়ে উঠলেন, নার্সদের হিলতোলা জুতোর ঠকঠক শব্দে প্রকট হলেন। অক্সিজেন সিলিন্ডার, স্যালাইন বোতলের তরল পদার্থ, সব কিছুর দিকে তাকিয়ে অনিকেতের ভিতর থেকে একটা প্রার্থনা উঠে এল : ওকে বাঁচাও। নীচে নেমে ইলেকট্রিক ও টেলিফোন তার এবং হোর্ডিং-এ আড়াল করা ঘোলা ধূলিধূসর আকাশটার দিকেও তাকিয়েছিল অনিকেত।

নীচে নেমে যতবার মঞ্জুকে দেখেছে, ততবার মনে হয়েছে ডাইনি। মনে হয়েছে, ওর জীবনের এই বিচ্ছিরি অঘটনের জন্য দায়ী ওই মহিলা।

মঞ্জুকে চোখের সামনে থেকে বিদায় করেছিল অনিকেত।

মঞ্জু যখন আর নয়নসম্মুখে ছিল না, তখন হৃদয়ের মাঝখানে ছিল অ-বিশ্বাস-করা, অ-জানা ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরই অনিকেতের সারা গায়ে থুথু ছেটাচ্ছিল। বলছিল, পাষণ্ড, তুমি সাধুপুরুষ? মঞ্জু ডাইনি? তুমি জিতেন্দ্রিয়? বানচোদ কোথাকার।

অনিকেত বলেছিল, হ্যাঁ ঈশ্বর, আমি তাই। আপনি যা বলবেন। সকলই আপনার ইচ্ছা স্যর। ওকে বাঁচিয়ে দিন।

ডাক্তারবাবু স্ক্যান এবং এমআরআই রিপোর্ট দেখে বলেছিল, মাথার বাঁ দিকে রক্ত জমে রয়েছে। বেশ কিছু ব্রেন সেল কাজ করছে না। ডান দিকে রিফ্লেক্স নেই।

মানে ডানদিক 'পড়ে গেল'? তার মানে যদি শুক্লা বেঁচেও যায়, তা হলে ও ঠিকমতো হাঁটতে পারবে না, খাওয়াদাওয়া করতে পারবে না। শুয়ে থাকবে শুক্লা?

ঈশ্বর কোথায় বাস করেন কে জানে? কিন্তু শয়তান মানব শরীরেই থাকে। ঠিক শরীরে নয়, মনে। মনের গভীরে ওর বাস। শয়তানটা অনিকেতকে বলে, তুই শালা বুদ্ধু। ভগবানের কাছে কী সব ফালতু প্রেয়ার করছিস! বরং আমায় বল, আমি মেরে দি'। মধ্যবিত্তগুলোর এই হল ফ্যাচাং—ভগবানের কাছে কখনও কারও মৃত্যুকামনা করে না। করতে নেই। যে তোর

শত্তুর, সব সময় তোর ক্ষতি করে যাচ্ছে, ভগবানের কাছে তখনও তোরা বলবি না, ওকে সাঁটিয়ে দাও ভগবান। যে-শালা একগাদা টাকা ধার নিয়ে বসে আছে, ওর পাওনাদার খিস্তি মেরে যাচ্ছে, সে-ও বলে না—ভগবান, পাওনাদারকে মেরে ফেলে আমাকে উদ্ধার করো। বল দেখি, পক্ষাঘাতে পড়ে থাকবে তোর বউ—সারা জীবন তোকে সেবা করে যেতে হবে, ঘরবন্দি হয়ে থাকবি, কোথাও যেতে পারবি না—সেটা ভাল, না কি...। অনিকেত কাকে নালিশ করবে আর? নিজেকেই করে, না কি ভগবানকে? দ্যাখো না... আমাকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে...

অনিকেতের এক বন্ধুর কথা মনে পড়েছিল। বন্ধুটির ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার, খুব ভাল বৈবাহিক সম্বন্ধ এসেছিল। ধনী পরিবারের মেয়ে। দেবে-থোবে ভাল। কিন্তু ওপরের দাদার বিয়ে না-হলে ছোট ভাইয়ের বিয়েটা হয় কী করে? পশ্চিমবঙ্গের বনেদি সুবর্ণবণিক সমাজ। তাড়াহুড়ো করে ফরসা দেখে একটি পাত্রী ঠিক করা হয়েছিল বন্ধুটির জন্য। বিয়ের পর বোঝা গেল মেয়েটির গভীর মানসিক গন্ডগোল আছে। স্কিৎজোফ্রেনিক। কিছু দিন পর বন্ধুটির মনে হল, ওর স্ত্রী'র স্তনে টিউমার হয়েছে। এবং ক্যানসার সম্ভাবনায় মনে হর্ষ উপস্থিত হচ্ছিল। এবং হর্ষ উপস্থিত হলেই অপরাধবোধে ভুগত। বন্ধুটি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে বুঝেছিল, ওটা টিউমার নয়, তারপরও মনে হত টিউমার হয়েছে। ওর ঘুম হত না। ওর মন দু'টো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারত না। চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকত। অনিকেতকে বলেছিল, আমি কতবার গরম খুন্তি দিয়ে নিজের হাতে ছ্যাঁকা দিয়ে বলেছি : আর কখনও টিউমার ভাববি? তবু টিউমার ভাবতাম।

ওর স্ত্রী পরে মারা যায়। ইলেকট্রিক হিটার গোবর জলের ত্যানায় মুছে 'শুদ্ধ' করতে গিয়ে ইলেকট্রিক শক-এ। ও মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পায়নি বহু দিন। এখনও তিন পেগ খেলেই বলে 'আমার বউ অ্যাক্সিডেন্টে মরেছে বলে আমি খুশি হয়েছি। মার আমাকে।'

জামশেদপুরে বেশ কয়েকটা দিন থাকতে হয়েছিল অনিকেতকে। মাহাতো বলে ছেলেটাও দু'দিন ছিল অনিকেতের সঙ্গে। ওকে একটার-পর-একটা মিথ্যা বলতে হয়েছে। বলতে হয়েছে —শুক্লা খুব হাই প্রেশারের রোগী। যে আগের দিন এসেছিল, ও হল শুক্লার মামাতো বোন। দুই বোনে খুব ভাব। শুক্লা জানত, মঞ্জু আসবে। মাহাতো প্রথম-প্রথম দু-একটা পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, যেমন—ম্যাডাম কেন তবে অন্য ম্যাডামকে দেখে অবাক হলেন? আসলে মাহাতো শুক্লার সঙ্গেই এসেছিল। ও তো সবই দেখেছে। স্যরের 'ইন্টু-পিন্টু কেস' আঁচ করতে পেরে এ নিয়ে পরে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। তবে সারাক্ষণ বলে গিয়েছে, ঘাবড়াইয়ে মাত স্যর, কুছ নেহি হোগা।

জ্ঞান ফেরার পর, শুক্লা অবাক চোখে তাকিয়েছিল অনিকেতের দিকে। অনিকেত নিজের চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। আর শুক্লা প্রথম কথা যেটা বলেছিল—তোমার কিছু হয়নি তো? কী বোকার মতো মাথা নাড়িয়েছিল অনিকেত, হাবার মতো।

তার কিছুক্ষণ পর শুক্লা বলেছিল, আমি হাসপাতালে। একটা প্রশ্নচিহ্নও ছিল যেন। যেন 'কেন হাসপাতালে?' প্রশ্নটা ভাঁজ করে রাখা ছিল।

অনিকেত তখন স্যালাইন স্ট্যান্ডের মতোই স্থির দাঁড়িয়েছিল।

এবার শুক্লা একটা ছোট্ট শব্দ উচ্চারণ করল—'বুঝেছি'।

কামানের গোলার মতো যেন একটা ছোট্ট নিরীহ শব্দ।

এরপর আর কিছু বলার ছিল না অনিকেতের।

এসব নিয়ে কোনও কথাই বলেনি শুক্লা। বাড়ি ফেরার পর, একদিনই শুধু কী একটা টিভি সিরিয়ালে পরকীয়া দেখতে-দেখতে বলেছিল—ওই মেয়েটা তো মঞ্জুই ছিল, না কি...

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওই তো ছিল। ও টাকা নিতে এসেছিল। ওর খুব টাকার দরকার ছিল। ছেলেটাকে ভর্তি করাবে, এদিকে চাকরি নেই... শুক্লা বাঁ হাতটা সামনে এগিয়ে হাতের পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে দিয়েছিল। মানে : থাক, থাক, ঠিক আছে।

ও ওর বাম হাতটাই ব্যবহার করতে পেরেছিল ওই শরীরী-নির্দেশের জন্য। ডান হাতটা পারেনি। কারণ ডান হাতটা কাজ করছিল না।

এসব খবর তো চাপা থাকে না, টেস্টি-টেস্টি খবর। কলকাতা অফিসের সহকর্মীরাও জেনে গেল। কেউ-কেউ ফোনে জিগ্যেস করতে লাগল, আপনার স্ত্রী না কি হঠাৎ আপনার কাছে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কী হয়েছিল?

একটি 'সর্বজনীন বক্তব্য' বা 'প্রেস রিলিজ' তৈরিই করে রেখেছিল, সেটা হল—ওটাই, মাহাতোকে যা বলেছিল। কিন্তু 'শালি' শব্দটাই তো কালি লেপে দেয়। 'শালি' খুব প্রভাবশালী শব্দ। মাহাতোকে 'বোন এসেছিল' বললেই হত। হ্যাজব্যান্ডের বোন তো ননদ। ননদ-বউদিতে তো ভাব থাকতেই পারে। 'শালি' শব্দটা উহ্য রেখেই অফিসের লোকজন শুক্লার কথা জিগ্যেস করছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যে বেশ ছড়িয়েছে, সেটা দু-একটা ফোন থেকেই বোঝা গেল। শোভন পাঠক ফোন করে কোনও ভনিতা না-করেই জিগ্যেস করল, কী রাজা শালিবাহন? রানিমাতা এখন ঠিকঠাক আছে তো?

শুক্লাকে ফিরিয়ে নেওয়ার সময় বিকাশকে খবর দিয়েছিল। গাড়ি নয়, ট্রেনেই একটা স্লিপার নিয়েছিল। শুইয়ে হাওড়া, তারপর হুইল চেয়ারে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। বিকাশ না-এলে খুবই অসুবিধে হত। বিকাশের কাছে গোপন করল না অনিকেত। একজন তো চাই, যাকে সব বলতে হয়। নইলে তো গাছের কোটরে মুখ নিয়ে বলতে হয়। বিকাশ বলল, তোর কোনও দোষ নেই ডাবু। যা করেছিস বেশ করেছিস। কিন্তু যেটা হয়েছে, সেটা অ্যাক্সিডেন্ট। তোর কিছু করার ছিল না। শক পেয়েছে শুক্লা বউদি। কেন? শক পাওয়ার কী হল? তুমি তোমার সব কিছু বিসর্জন দিয়ে বসে আছ, এদিকে একটা ব্যাটাছেলে কি আঙুল চুষবে? আমার বউ ভেগেছে বলে কি আমিও বিধবার মতো একাদশী করছি ভেবেছিস? এই কথাটা বলেই কিন্তু বিকাশ হঠাৎ থম মেরে যায়। বলে, বউ থাকবে কেন? খুনির কাছে কেন থাকবে? ও বলে, এই শোন, আমি একটা গেঁড়ে। আমার কোনও মতামত নেই।

বিকাশ অনেক রোগা হয়ে গিয়েছিল, মদ খাওয়া আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। দিনের বেলাতেও খেয়েছে।

কলকাতা এনে আবার নার্সিং হোম। এখনও ছুটিতে আছে। সেই যে এসেছে, আর ওখানে ফিরে যায়নি অনিকেত। হাসপাতালের অনেক কাগজপত্র জমে গিয়েছে। সেই সব কাগজপত্র গেঁথে ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্নাকাটি করে দরখাস্ত করেছে দিল্লিতে। 'থ্রম্বোসিস' গ্রাউন্ডে ট্রান্সফারটা

হয়েই যাবে। দিল্লির নেতাদেরও ফোন করেছে। নেতারাও 'আহা থ্রম্বোসিস ইশ থ্রম্বোসিস' করেছে। আর ঘাপটি মেরে বসে থাকা শয়তানটা বলেছে, জয়, থ্রম্বোসিসের জয়।

মাসখানেক হয়ে গেল বাড়িতেই রয়েছে অনিকেত। কলকাতার অফিসেও খুব একটা যায়নি। বাড়িতে রান্নার লোক জোগাড় করে দিয়েছে কল্পনা মৈত্র। ছাদের ইস্কুলটা বন্ধ করেনি। শুক্লার প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা খোঁজখবর নেয়। প্রথমে দু'বেলাই লোক ছিল শুক্লার দেখাশোনা করার জন্য, এখন একবেলা আছে। ফিজিওথেরাপি চলছে।

এর আগে মঞ্জুর ফোন এসেছিল কয়েকবার। একবার শুধু 'ভাল আছে' বলেই কেটে দিয়েছে অনিকেত। শেষ কয়েকবার ফোনই ধরেনি। ও মনে-মনে স্থির করে নিয়েছিল, আর কোনও ঝামেলায় জড়াবে না। মঞ্জুর সঙ্গে জড়ানোর কোনও যুক্তিই ছিল না। যদি কোনও সুন্দরী, প্রখর-যৌবনার সঙ্গে জড়াত, জড়িয়ে যেত, তারও কোনও একটা মানে হত। এই জড়ানোর কোনও মানেই ছিল না। ও ঠিক করেছিল, অ্যালুফ থাকবে ও, অ্যালুফ।

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অ্যালুফ থাকা যায়? রাত্রি ন'টা নাগাদ ফোন পেয়েছিল অনিকেত। পরি-র গলা। মা আর নেই কাকু...।

—ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট। পুলিশ বলছে 'সুইসাইড'। কিন্তু মা আমাকে ফোন করে বলেছিল, মালিকের বাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু পুলিশ নাকি লোকজনদের জিগ্যেস করে জেনেছে—মা লাইনের ধারে দাঁড়িয়েছিল, তারপর একটা ট্রেন এলে...।

অনিকেত থানায় যায়নি। ওই রাত্রে শুক্লাকে ফেলে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। যত ভাবে, ঝুট-ঝামেলায় জড়াবে না, তত ঝুট-ঝামেলাগুলো মাছির মতো ওর কাছে ধেয়ে আসে।

সুইসাইড? আত্মহনন? কেন? ওর মধ্যেও কি পাপবোধ কাজ করছিল? অপরাধ বোধ? তা হলে তো পুলিশ কেস। তদন্ত। মোবাইল তো রয়েছে। মোবাইলে কি ওর নাম নেই? ওকে পাঠানো মেসেজ? যদি 'টাওয়ার লোকেশন' চেক করে, পুলিশ জানতে পারবে ওর কাছে গিয়েছিল।

এ তো মহা মুশকিল! সব প্রমাণ রয়ে যায়। প্রমাণ মুছে দেওয়া যায় না। তোমার মহাবিশ্বে প্রভু হারায় না তো কভু।

এবার পুলিশ যদি ডেকে পাঠায়? ডেকে পাঠালে বলবে, হ্যাঁ চিনি। যদি বলে আপনার কাছে গিয়েছিল? বলবে, হ্যাঁ গিয়েছিল। বেশ করেছিল। আপনার কী?

অনিকেত যায়নি। পরদিন ও একবারের জন্যও ফোন করেনি পরিকে। তার পরদিন মঞ্জুর চিঠিটা পায়।

সেই কাতর চিঠিটা। চিঠিটা একবার, দু'বার, তিনবার পড়ে। পড়তে-পড়তে প্রতিবারই বুক ভারি হয়। চোখে জল ছলছল করে। তারপর চিঠিটা ভাঁজ করে জামার বুকপকেটে ভরে। বুকের ভিতরে তুমুল রেলগাড়ি ছুটে যায়। সারা শরীর ঝিনঝিন করে। ছাদে যায় অনিকেত। খামসমেত চিঠিটার শরীরে আগুন ধরায়। জ্বলছে। মঞ্জু জ্বলছে।

চিতা বহ্নিমান।

নারায়ণী মাসি পরি'কে বলল—শোন বাবা, তুই আমার ছেলের মতো। ছোটবেলা থেকে তোকে দেকচি। একটা কথা বলি, তোর মা সহ্য করেচে, আমরা কিন্তু সহ্য করব না। এখানে ওসব চলবে না। পরি-র এখন সাহস বেড়েছে। বলেছে, আমার ঘরের ভিতরে যা করব—সেটা আমার ঘরেই করব। রান্নাবান্না, পড়াশোনা, আর যা-যা করছি আমার ঘরে। প্রতি মাসে ভাড়া দি'।

নারায়ণী মাসি বলল, ও বাব্বা, মাগীপনা করলে কী হবে, চোপা তো ভালই হয়েছে!

পরি বলল, মাগীরা মুখ করে না বুঝি? এ বাড়িতে তো তোমরা ডেলি ঝগড়া করছ। নারায়ণী বলল, দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতর কী হয় সবই বুঝি। নিতাইরা বলছিল, ওই দাড়িওলা ছেলেটাকে প্যাঁদাবে। কী দরকার অশান্তি করে? তাই ভাল কথা কইছিলুম।

পরি বলল, প্যাঁদাক না দেখি, নিতাইদাদের বলে দিও...!

এ বাড়িতে চার ঘর ভাড়াটে। মাঝখানে উঠোন। পরি-র বয়সের একজনই আছে নূপুর। ছোটবেলায় নূপুরের সঙ্গে পুতুল খেলেছে, রান্নাবাটিও।

নূপুর লেখাপড়ায় ভাল ছিল না, পরির ভাল রেজাল্ট। এ নিয়ে একটু দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। তখন প্রায়ই আড়ি করত নূপুর। বলত, মেয়েদের মতো এক্কাদোক্কা খেলতে আসিস, লজ্জা করে না? বলত, এ মা, মেয়েদের মতো গামছা গায়ে দিয়ে চান করিস, লজ্জা করে না...। এখন কিন্তু নূপুরের সঙ্গে কথা হয়। নূপুর কিছুটা হয়তো বোঝে পরি'কে। মনের কথাও বলে। নূপুর একটা বিউটি পার্লার-এ কাজ করে। চার মাস কাজ শিখে কাজটা পেয়েছে। নূপুর বলেছে, পার্লারের মালিক বলেছে 'মেসেজ' শিখে নিতে। কোথায় শেখানো হয় বলে দিয়েছে। 'মেসেজ' শিখলে অনেক পয়সা। পরি বলেছিল, 'মেসেজ' নয়, 'ম্যাসাজ' বলিস। কিন্তু ম্যাসাজ-এ কী করে পয়সা হয় জানিস তো...।

নূপুর বলেছিল, জানি। এখন আমার আর কিছুতেই কোনও আপত্তি নেই।

নিতাইদা তো বছর খানেক আগে 'বেশ বাগিয়েছিস তো' বলে পরি-র বুকে হাত দিয়েছিল হঠাৎ। পরি কাউকে বলেনি। ওর মা'কেও নয়, বললে ওর মা বলত : তোরই তো দোষ, বেশ করেছে। নূপুরকেই বলেছিল পরি। নূপুর বলেছিল আমাকেও রে...। যা কিছু একটু ফোলা দেখলেই ওদের হাত নিশপিশ করে।

নিতাইদা পাশের বাড়িতে থাকে। পরি নারায়ণীকে বলল, নিতাইদাকে বলে দিও যেন পরের ধানে মই না-দেয়। পরি কখনও ধানে মই দেয়া দেখেনি। ধানে মই দিলে কী হয়, সেটাও জানে না। কিন্তু ওই কথাটার মানে জানে। এইসব প্রবাদ-টবাদ ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই বেশি ব্যবহার করে। পরিও।

নারায়ণী মাসি চোখটা বড়-বড় করে একবার পরি-র দিকে তাকাল, তারপর চলে গেল।

আইএফটি-তে ভর্তি হয়ে পরি-র মনে অনেক আত্মবিশ্বাস এসেছে। ওখানে পরি'কে সবাই ভালবাসে বেশ। পরিরও খুব ভাল লাগে।

'আইএফটি' মানে 'ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেক্নোলজি'। তিন বছরের কোর্স। দু'লক্ষ দশ হাজার টাকা কোর্স-ফি। বছরে সত্তর হাজার করে দিতে হয়। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে টাকাটা ম্যানেজ হয়ে যাবে। এই 'কোর্স'-টা শেষ হলে চাকরি পাবেই। নিজেও বুটিক খুলতে পারে, কনসালটেন্সি করতে পারে। মা দেখল না...। মা-এর মৃত্যুটাই এখানে ভর্তি করাতে পারল। ইনসিওরেন্সের টাকাটা না-পেলে কি সম্ভব হত এই কোর্সটা করা?

পুলিশকে নাকি একজন উইটনেস দিয়েছিল যে, মা নাকি লাইনের ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। অসাবধানে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হত, তবে দাঁড়াবে কেন? 'সুইসাইড' হলেই সামনে দাঁড়ায়, কনসেনট্রেট করে...।

অনিকেত আঙ্কেল, মানে অনিকেত কাকুর জন্যই পুলিশ রিপোর্টটা ঠিকঠাক গিয়েছে, নইলে ইনসিওরেন্স থেকে টাকাটা পাওয়া যেত না। পুলিশ কি সহজে ছাড়ে? যদিও ওর মোবাইল ফোনটা কাছাকাছিই পাওয়া গিয়েছিল, ওখানে মেসেজও ছিল, ব্যাগটাও শরীর থেকে ছিটকে যায়নি যদিও মাথার খুলিটা ছিটকে গিয়েছিল, কোমর থেকে খুলে গিয়েছিল পা, ব্যাগে চিঠিও পাওয়া গিয়েছিল, তবুও পুলিশকে তো সন্তুষ্ট করতে হয়েছে। হয়তো প্রেসের লোক বলে কিছুটা সুবিধে পেয়েছে, কিন্তু ছুটোছুটি তো করতে হয়েছে। প্রথমে থানা পুলিশে পার ইনস্যুরেন্স অফিসে।

চেক-টা পাওয়ার পর অনিকেত আঙ্কেল বলেছিল, আমার কাজ শেষ, এবার আর আমাকে কোনও কিছুতে ইনভল্ভড কোরো না, যেমন করে পারো কোর্স-টা শেষ করো।

মায়ের সঙ্গে অনিকেত কাকুর কিছু একটা ছিল। নিশ্চয়ই ছিল। মা খুব অন্যমনস্ক থাকত, কথা বলত না বেশি। দিঘা থেকে ফিরে এসেই দেখেছিল, মা কীরকম যেন হয়ে গিয়েছে। ঠিকঠাক খাচ্ছিল না। পরিকে হঠাৎ করে যেন বেশি আদর করছিল। গায়ে হাত বুলিয়ে দিত, একদম বকত না। চাউতে চিকেন-সেদ্ধ মিশিয়ে দিত, আর বেশ কয়েকবার বলেছে অনিকেত কাকুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবি। মা মাঝে-মাঝেই বাইরে গিয়ে ফোন করত, আর ব্যাজার মুখে ফিরে আসত। একদিন বিছানায় মোবাইলটা ছুড়েই ফেলে দিয়েছিল, রাগ হলে 'দুচ্ছাই' বলে যেমন করে ছুড়ে দেয়। একদিন চুপিচুপি মোবাইলের 'কল লিস্ট'-টা ঘেঁটেছিল পরি। ডায়াল্ড নম্বরে বারবার ভেসে উঠেছিল ডাবুদা। 'ডাবুদা' মানে তো অনিকেত আঙ্কেল। ডাবুদা ফোন ধরেনি। কখনও 'কল ডিউরেশন' দশ সেকেন্ড, বারো সেকেন্ড। 'আমি এখন ব্যস্ত' কিংবা 'আমাকে বিরক্ত কোরো না' বলতে যতটা সময় লাগে আর কী...। মা কি অনিকেত আঙ্কেলের কাছে টাকা চাইত? চাকরি চাইত?

অনার্স নিয়ে পাস করার পর মা তো বলেইছিল, এবার চাকরি দ্যাখ। স্কুলে অনেক লোকজন নিচ্ছে। পরি বলেছিল, ওসব জায়গায় টিকতে পারব না মা, সবাই প্যাঁক দিয়ে অস্থির করবে। বেশ কয়েকটা দৃষ্টান্ত জানা ছিল পরি-র। একজন তো সরকারি চাকরি পেয়েছিল পরীক্ষা দিয়ে। ইন্টারভিউয়ের সময়েই বুঝে গিয়েছিল ওর চাকরিটা হবে না। এবং হয়নি। 'এফিমিনেট' বলেই হয়নি। একটু 'মেয়েলি' বলেই হয়নি। শেষ পর্যন্ত একটা এনজিও-তে কাজ পেয়েছে, দুর্বার মহিলা সমন্বয়ে। ওখানে ও হ্যাপি। মেয়েরা ওকে মনের কথা বলে। ও না-হয় তাও একটা

জায়গায় কিছু করছে, কিন্তু পার্থ? ওকে তো সুইসাইড করতে হল। ও চাকরি করত একটা ছোটখাটো বেসরকারি অফিসে। একটু 'ব্যাকিং' ছিল, দু-একজনকে খুশি করে দেওয়ার ব্যাপারও ছিল। কিন্তু পারল না। চাকরিটা করতে পারল না শুধু নয়, বাঁচতেই পারল না। গলায় দড়ি দিয়েছিল ওই অফিসেই, কাগজে উঠেছিল। কাগজে যেটা ওঠেনি—সেটা হল সর্বক্ষণ বহুজনের কাছে ওকে শুনতে হত : চুষে দিবি? চুষে দিবি?

পরি দেখেছিল—ওর মতো যারা, তারা অনেকেই মেক আপ ম্যান হয়, কেউ নাচ শেখায়। আগে ওরা নাটকের নারী-চরিত্রে অভিনয় করত। চপল ভাদুড়ী তো এখনও বেঁচে আছেন, অভিনয়ও করছেন। যাত্রায় আগে মেয়েরা অভিনয় করত না। ওরাই করত—'আলকাপ' দলে 'ছোকরা' বলে যাদের। একটু মেয়েলি, যারা নাচতে পারে, গাইতেও, ওরাই নারী-চরিত্রে অভিনয় করত। 'আলকাপ'-এর অনেক মদ্দা ব্যাটাছেলে ওদের প্রেমেও পড়ত। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে এসব লেখা আছে। কিন্তু আজকাল তো মেয়েরাই যাত্রা-থিয়েটারে অভিনয় করে। আলকাপ-টালকাপ প্রায় নেই। থাকলেও পরি-র পক্ষে সম্ভব নয়। কিছু এনজিও-তে কাজ করা যায়, কিন্তু ফ্যাশন কোর্স-এর বুদ্ধিটা দিয়েছিল চয়নদা-ই। বলেছিল, এই প্রফেশনে এখন অনেক ছেলেমেয়ে এবং ট্রান্সজেন্ডার-রা আসছে। ওখানে কেউ এসব 'বদার' করে না তুমি কীভাবে কথা বলছ, কেমন করে হাঁটছ, তোমার সেক্সুয়াল চয়েস কী—তা নিয়ে। চয়নদা বেশ কয়েকজন বড়-বড় ফ্যাশন ডিজাইনার-এর নাম বলেছিল, যাঁরা ট্রান্সজেন্ডার। যাঁরা অনেক টাকার মালিক। জ্যাক নোরা নামে একজনের কথা বলেছিল, যিনি নাকি বয়ফ্রেন্ড ফ্যাশন নামে একটা পেটেন্ট নিয়ে কোটি-কোটি ডলার কামাচ্ছেন। নামটা অদ্ভুত। 'জ্যাক' আবার নোরা। 'নোরা' তো মেয়েদের নাম, আর 'জ্যাক' ছেলেদের নামই হয়। আনন্দসুন্দরী আমাদের এখানে কেন নাম হয় না? আনন্দসুন্দর হয়। আনন্দ কি সুন্দরী হতে পারে না? আনন্দ পুংলিঙ্গ কেন? তবে হ্যাঁ, কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য নামে একটা নেম প্লেট আছে বটে। এটা কি কৃষ্ণ আর কালীর সম্মীলিত রূপ? না কি কালীর বিশেষণ হিসেবে 'কৃষ্ণ' শব্দটা এসেছে। কালো কালী। যাক গে। জ্যাক নোরা 'বয়ফ্রেন্ড ফ্যাশন'-টা বানিয়েছিলেন। এটা মেয়েরাই পরে, কিন্তু আসলে ছেলেদেরই পোশাক। ছেলেদের জিন্স, পাজামা, টি-শার্ট সামান্য পাল্টে দেওয়া যাতে—কন্টুর-টা বোঝা যায়। দেখে মনে হবে যেন বয়ফ্রেন্ডের কাছ থেকে ধার করে আনা হয়েছে। বয়ফ্রেন্ড ফ্যাশনের পোশাকগুলোর সাইজ একটু বড়ই হয়। একটু যেন ঢিলে-ঢিলে, আসলে কিন্তু সূক্ষ্মভাবে ফেমিনিন টাচ থাকে। জিন্স-টা যেন কোমর থেকে পড়ে যাচ্ছে, নাভির তলায় নেমে গিয়েছে। অথচ পাছাটা-উরুটা বোঝা যাচ্ছে বেশ। শার্টেও ওরকম সূক্ষ্ম চাতুরি। এখন ব্যাপারটা বোঝে পরি। কিন্তু বয়ফ্রেন্ড ফ্যাশন, থ্রিপটিং, 'অঁত কেওয়র'—এসব কথা চয়নের কাছ থেকেই তো জেনেছিল পরি। পরি বলেছিল, ওর মা-কে, এসব নিয়েই পড়াশোনা করবে। মঞ্জু খরচাপাতির কথা জিগ্যেস করেছিল, পরি তখন বলতে পারেনি, লজ্জায়।

পরি জানে, ওর মা নিশ্চয়ই বুঝেছিল এটা করতে অনেক খরচ। এজন্যই কি অনিকেত কাকুর কাছে টাকা চেয়েছিল মা? মোবাইলটা পুলিশ ফেরত দেওয়ার পর মেসেজগুলো দেখেছিল পরি। অনিকেত কাকুকে করা 'প্লিজ হেল্প মি' জমাট-বাঁধা রক্তের মতো স্ক্রিনে ফুটে উঠেছিল। বোতাম টিপে নয়, হাতের আঙুল দিয়ে লেখাটা মোছার চেষ্টা করেছিল পরি, পরি-

র মনে হয়েছিল, আঙুল—ওর আঙুলটা ভিজে গিয়েছে। অনিকেত কাকু শ্মশানে এসেছিল যদিও, তেমন কোনও কথা বলেনি। দু'টো-একটা ব্যাপারে কেমন যেন প্রশ্নচিহ্ন লেগে আছে। গয়নার পুঁটুলি তে মা-র দুলটাও কেন রাখা ছিল—যে-দুলটা সব সময় মায়ের কানে থাকত, সেটা কেন খুলে রেখে গেল? ব্যাঙ্কের কাগজপত্র সব একটা খামে সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছিল? কেন বেশি-বেশি করে আদর করত মা, আগে তো কখনও করেনি, কেন সেই কাবলি ছোলার ঘুগনি? সন্ধের সময় যখন লেবু চিপে পেঁয়াজ-কুঁচি মিশিয়ে ঘুগনি খাচ্ছিল—তখন মা টুকরো-টুকরো হয়ে আছে রেললাইনে।

থানা থেকে পরদিন ডেকেছিল। জিগ্যেস করেছিল আর কে আছে বাড়িতে? বাবা কেন একসঙ্গে থাকে না? ঝগড়া হত কি না? শেষবার কবে ঝগড়া হয়েছে?

পুলিশ বলেছিল, তোমার হাবভাব, চাল-চলনটা তো ভাল নয়, এ নিয়ে তোমার মায়ের দুঃখ ছিল না?

পরি বলেছিল—না।

পুলিশ বলেছিল, যদি বলি এই দুঃখেই তোমার মা আত্মঘাতী হয়েছে?

পরি বলেছিল, দুঃখ কেন হবে, আমি তো ভাল রেজাল্ট করি। মা বলত, কবে চাকরি-বাকরি করবি—সুখের দিন দেখব...

—বিয়ে দিয়ে নাতির মুখ দেখব বলত না? চোখ দিয়ে যেন শরীরটা চাটছিল থানার লোক। একটা ঢিলে শার্ট পরেছিল পরি। ওদের কি এক্স রে চোখ? খুব বিচ্ছিরিভাবে তাকাচ্ছিল। একটা আঁচল বা ওড়নার অভাব বোধ করছিল পরি।

কী করা হয়?

স্টুডেন্ট।

আর কী করা হয়?

ক-এর দীর্ঘ ই-কারটা লম্বা করে টেনে দিয়েছিল।

—আর কী করব?

—'ধুরানি' মানে জানো?

এবার হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ শব্দ, সেটা ব্র্যাকেটে, শোনা যাচ্ছে না।

একটু কড়া চোখে তাকাল পরি, ও যতটা পারে আর কী।

—হ্যাঁ, জানি।

এ নিয়ে আর ঘাঁটেনি ওরা।

—তোমার মা যে ট্রাভেল কোম্পানিতে কাজ করত, ওটার নামে তো বদনাম আছে, চিটিং কেস। তোমার মায়ের নামেও কেস আছে। ঝুলছে ওটা। ওটাও তো মেটেনি। ওসব নিয়েও নিজের ওপর ধিক্কার ছিল... পরি কথাটা শেষ হওয়ার আগেই বলল—মায়ের কী দোষ? মা তো একজন সামান্য কর্মচারী...

—ওই জন্যই তো তোমার মায়ের দুঃখ। যাগ গে। টাকাপয়সা কি নিজের নামেই ছিল ব্যাঙ্কে, না কি তোমার সঙ্গে জয়েন্ট...।

—জয়েন্ট।

—যাক। বাঁচা গিয়েছে।

'বাঁচা গিয়েছে' শব্দটা ঠাস করে লাগল পরি-র গালে। পরি কপাল কুঁচকে তাকাল।

—ইনসিওরেন্স-এর পলিসি-টলিসি ছিল?

—ছিল তো একটা।

—এই সেরেচে। তবে তো ক্যাঁচাল কেস। পলিসিওলা-রা চাইবে যেন সুইসাইড দেখানো যায়। এখানে পুলিশের রিপোর্টটাই কিন্তু মেন। গুছিয়েগাছিয়ে লিখতে হবে আমাদের। বড় কেউ আছে? গার্জিয়ান? যে এসব ডিল করবে? তুমি তো...।

আবার পরি-র গায়ে দৃষ্টি ঘুরল।

বড় কে আছে ওর? কে ওর গার্জিয়ান? একবার ভগবানের কথা মনে হল। যাকে জানা যায় না, দেখা যায় না। ঘরের দরজার ওপর মা কালীর ছবি আছে। মা বেরনোর আগে রোজ হাতজোড় করত। ওই চিরকালীন জিভ বের করা উলঙ্গিনী মহিলা, হাতে কাটা মাথা। উনিই গার্জিয়ান? এরকম একজন গার্জিয়ান সত্যি-সত্যি হলে মন্দ হত না। দেখলেই এদের তড়পানি থামিয়ে দিত। হে মা কালী? যেন ঠিকঠাক হয়। কে ওর গার্জিয়ান? বাবা? বাবা না ল্যাবা? চয়ন? চয়ন কি গার্জিয়ান? বললে কি আসত? অনিকেত কাকু কি গার্জিয়ান? মা মরেছে, ব্যস। হাত ধুয়ে নিয়েছে।

সেবার রবীন্দ্রসদনের ঘটনাটা মনে পড়েছিল। পুলিশে ধরেছিল যখন, অনিকেত কাকুই তো এসে ব্যাপারটা ম্যানেজ করেছিল। বলেওছিল—আমি তোমার পাশে আছি। বলেছিল তো। কিন্তু সেই অনিকেত কাকুই তো বারবার মায়ের ফোন কেটে দিয়েছে। 'প্লিজ হেল্প মি' অক্ষরগুলো মায়ের মোবাইলের মধ্যে মন্দিরে লাগানো পাথরের মতো রয়ে গিয়েছে।

—আমরা পুলিশের লোক। জানি কী করে কেস সাজাতে হয়। তোমার মা যে ওই অ্যাক্সিডেন্ট-টা সাজায়নি, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। কেস-টা খুব প্ল্যান করে সাজিয়ে যে সুইসাইড করেনি—কে বলতে পারে? একটা সাক্ষী আছে—বলছে, লাইনের ধারে ঘোরাফেরা করছিল। দাঁড়িয়েছিল লাইনের ধারে। ওসব লিখে দিলেই ইনসিওরেন্স-এর টাকাটা ভোগে চলে যাবে।

হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়েছিল পরি। ওর ওই মাতৃশোকের মধ্যেই পুরোহিতের দেওয়া তিল-হরীতকী-বস্ত্র-শয্যা-ছত্র-পঞ্চগব্য-কুশ...লেখা কাগজের উল্টো দিকে হিসেব করে ফেলেছিল দু'লাখ ত্রিশ প্লাস এক লাখ প্লাস বোনাস, প্লাস দশ ভরি সোনা এক লাখ আশি হাজার...। ওর কোর্স-ফি ছাড়াও শরীরে সার্জারি করে নারীশরীর বানানোর জন্যও কিছুটা সংস্থান হ'য়ে আছে ইনসিওরেন্সের টাকাটা না-পাওয়া গেলে তো সব হিসেব ছারখার হয়ে যাবে।

সিনেমায় নায়িকার যখন হাত বাঁধা, তলায় আগুন জ্বলছে, ভিলেন বন্দুক তাক করে আছে, গুলিটা ছুড়তে যাবে, তক্ষুনি কাচের দরজা চুরমার করে বচ্চন-শাহ্রুখ-প্রসেনজিৎ-চিরঞ্জিৎ'রা ঢুকে পড়ে, ঠিক তেমন করেই সেদিন থানায় ঢোকে অনিকেত। পরি'কে দেখতে পেয়ে অনিকেত বলে, তুমিও আছ?

পরি অবাক হয়।

অনিকেত বলে এমনিই এসেছিলাম। থানায় একটু দরকার আছে। পুলিশের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বলে—এই কেসটা যিনি দেখছেন, তার সঙ্গে একটু কথা আছে।

—সেই কথাই তো হচ্ছে। আপনি কে?

—আমি ওদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড।

বসতে বললে অনিকেত বসেছিল।

অনিকেত ওর মোবাইলটা বের করে। পুলিশের অফিসারের দিকে বাড়িয়ে দেয়। বলে এই 'মেসেজ'-টা পড়ুন।

—প্লিজ হেল্প মি।—তো?

অনিকেত বলে—এই যে ছেলেটা, পরিমল, ভাল স্টুডেন্ট, হায়ার এডুকেশন নিতে চায়। ওদের বাবা থেকেও নেই, ওর মা সামান্য চাকরি করত, সেটাও চলে গেল। আমার কাছে সাহায্য চেয়েছিল। আমার স্ত্রী পক্ষাঘাতে পঙ্গু।

—তো?

এই ইনফর্মেশনগুলো দিলাম, যদি আপনাদের কাজে লাগে। খুবই ডিস্টার্ব মাইন্ডে ছিল। একটা চাকরির জন্য মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। আমিও চেষ্টা করছিলাম ওর একটা কাজের জন্য। কিন্তু এর মধ্যেই অ্যাক্সিডেন্ট-টা হয়ে গেল।

—অ্যাক্সিডেন্ট তো? সুইসাইড-ও তো হতে পারে।

অনিকেত বলল, হতেই পারে না। পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনও ইচ্ছাই ছিল না ওর। একমাসের মধ্যেই ওর একটা চাকরি হয়ে যেত...

পুলিশ হাসলেন। অনিকেতের কথা থেমে গেল। পুলিশ বললেন, আরে সব খেলা মশাই, খেলা। এই দুনিয়াটাই খেলা। শেক্সপিয়র বলেছিল না—এই দুনিয়াটা খেলার মাঠ...। সবাই খেলতে এসেছি। ভগবান নিজেই খেলছেন। একটা গান আছে না, আমার মেয়ে গায়, খেলিছো এ বিশ্ব লয়ে... আর কেসগুলোও হল অক্ষরের খেলা। দু-চারটে অক্ষর বসিয়ে দিলেই অ্যাক্সিডেন্টটার পাশে কোয়েশ্চেন মার্ক বসে যাবে। ভদ্রমহিলার একটা লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি আছে না?

অনিকেত বলল, ওসব খারাপ অক্ষর বসাবেন কেন। এজন্যই তো আমি এসেছি।

পরিমলকে অনিকেত বলেছিল, একটু বাইরে যাও। আমার সঙ্গে ওঁদের কথা আছে।

পরিমল বাইরের বেঞ্চিতে বসেছিল। একজন পাহারাদার পুলিশ 'শুকতারা' খুলে হাঁদাভোঁদা পড়ছিল। থানার সামনে উঠোন, ওখানে একটা মাঝারি বটগাছ, গাছতলায় শিব, ফুল, গাছের গায়েও ঢিল বাঁধা দড়ি, একটা ছাগল ঢুকে পড়ে শিবের মাথার ফুলগুলোয় মুখ দিল। গার্ড হাঁদাভোঁদা ফেলে ছাগলকে ডান্ডা প্রহার করল। ছাগল কি জানে, এটা থানা? ছাগলের বদলে যদি ষাঁড় আসত? ষাঁড় কি মার খেত? ষাঁড়কে কিচ্ছু বলত না। শিবের বাহন শিবের জিনিস খেয়েছে, বেশ করেছে।

কিছুক্ষণ পর অনিকেত ঘর থেকে বের হয়ে এল। পরি'কে বলল, চলি। আর কিছু নয়। পরি বলল, আমি এবার কী করব? অনিকেত বলেছিল, যা খুশি করো।

পুলিশ রিপোর্টটা ঠিকঠাকই ছিল। ঠিকঠাক করতে গিয়ে কী-কী তুকতাক করতে হয়েছিল পরি তার ডিটেল জানে না। ইনসিওরেন্সের টাকাটা একমাসের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। অনিকেত সার্টিফিকেটের জেরক্স-টা চেয়েছিল, বলেছিল, বাড়িতে আসতে হবে না, ক্যুরিয়ারে পাঠিয়ে দিতে। দিয়েছিল। চেক-টা হাতে পেয়ে অনিকেতকে ফোন করে পরি বলেছিল, কী করে যে ধন্যবাদ দেব... অনিকেত কাকু বলেছিল—'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ব্যস।' এরপর

অনিকেত কাকু আর ফোন-টোন করেনি। ওই যে, একটা শব্দ বলেছিল—'ব্যস'-এর মানে কি বোঝেনি পরি? 'ব্যস' মানে দিস ইজ দ্য এন্ড। 'ব্যস' মানে এনাফ ইজ এনাফ। ভর্তি হওয়ার পর একটা মেসেজ করেছিল—আজ অ্যাডমিশন নিলাম। আধঘণ্টা পর মেসেজের উত্তর এসেছিল—অল বেস্ট উইসেস। গো অ্যাহেড।

এরপর ফুল স্টপ। একটা কৃষ্ণগহ্বর যেন। ওটার মধ্যে ঢোকানো আছে 'ব্যস'। পরি জানে।

তিন মাস হয়ে গেল, ক্লাস চলছে। স্টাইলিং অ্যান্ড ইমেজ ডিজাইন, ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন ফোটোগ্রাফি, ফ্যাশন কমিউনিকেশন—এসব পড়ছে, জানছে।

সোনালি ম্যাডাম ফ্যাশন কমিউনিকেশন-এর ক্লাস নেন। প্রথম দিন বোর্ডে লিখলেন HAUTE COUTURE. কেন কে জানে, পরিকেই জিগ্যেস করলেন, বলো কী লিখলাম? পরি বলল হাউটে কুটার। ছোট্ট একটা হালকা হাসির শব্দ শুনেছিল পরি। ম্যাডাম বলেছিলেন—যারা এটা আগেই জেনে বসে আছো, তারা ভেবো না সব কিছু জেনে গিয়েছ। যারা জানে না, ওদের সম্মান করতে শেখো। সবাই জানবে। শিখবে। শেখার চেষ্টাটাই হল আসল কথা। ম্যাডাম ইংরেজিতেই বলেছিলেন। ম্যাডাম বললেন, দিস ইজ আ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড। উচ্চারণ হল 'অঁথ কইওর'। ইংলিশ মিনিং—হাই কস্টিউম, কিন্তু সেই 'হার্ড মিনিং'-টা এখন আর নেই। এখন 'অঁথ কইওর' বলতে বোঝায় কারও উপযোগী করে তৈরি করা, মানে কারও জন্য 'স্পেশাল' কিছু। এরপর লিখলেন pret-a-porter.

অন্য একজনকে জিগ্যেস করলেন ম্যাডাম। সে একটা মেয়ে। মাথার চুল হর্সটেল করা। কানে ঝুলন্ত দুল। ভ্রু-র ওপর পিয়ার্সিং করা। ও বলল প্রেতা পর্তে। র-ফলা একটু অন্যরকম করে উচ্চারণ করল। র-সাউন্ড-টার মধ্যে বেশ কায়দা ছিল। ম্যাডাম জিগ্যেস করেছিলেন, ডু ইউ নো ফ্রেঞ্চ?

ও কাঁধটা একটু শ্রাগ মতো করে বলেছিল, আঁ পে। হাতের আঙুলের মুদ্রায় বোঝা গেল অল্প-অল্প। পরি সত্যিই তখন একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। কোথায় এসে পড়ল রে বাবা! হংস মধ্যে বক নয়। ময়ূর মধ্যে কাক।

ম্যাডাম বললেন, ইয়েস, 'প্রেতা পর্তে' ইজ ভেরি কমনলি ইউজ্‌ড। মানেটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এর মোদ্দা কথাটা হল—যেটা সবার জন্য। স্পেশাল কিছু নয়। তেমন আলাদা করে বানানো নয়। মানে গড়পড়তা। ও বুঝল—ওই কাঁধ শ্রাগ করা মেয়েটা হল 'অঁথ কইওর', আর পরি হল, 'প্রেতা পর্তে'।

মায়ের ছবিটাকে 'অঁথ কইওর' করে বানিয়েছিল পরি। শ্রাদ্ধের দিনে অন্য কোনও ছবি পায়নি। বিয়ের পর তোলা, পিছনে জমিদার বাড়ির বাবা-মা'র ভিতর থেকে শুধু মা-কে কেটে নিয়ে ছবিটা বানিয়েছিল। আর কোনও ছবি ছিল না তখন। সেটাই বড় করে বাঁধিয়েছিল। কার্তিক বাবু চেয়েছিল ছবিটা, পরি দেয়নি। শ্রাদ্ধের কাজটা ওই ছবিতে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওই 'মা' পরি-র অচেনা ছিল। মায়ের কাঁধে কার্তিকবাবুর হাত, মায়ের মুখে লজ্জা-লজ্জা হাসি, চোখটা সামান্য নত। মুখের মধ্যে বেশ একটা সুখচ্ছায়া। এই মা অচেনা। বরং 'চেনা মা' ছিল ভোটার কার্ডে। সেই বিচ্ছিরি ছবিটাকে বড় করিয়েছে। ফোটোশপ-এ নিজেই একটু-আধটু টাচ দিয়েছে। এই মুখে একটা দুঃখমেঘ রয়ে গিয়েছে। এটাই চেনা মা। এটাই ওর 'অঁথ কইওর'।

এই ছবিটায় মাঝেমধ্যে মালা দেয়। আজ দিয়েছে।

এখন ওর ঘর থেকে ক্যাপসিকাম, চিকেন, অজিনামটো, ব্রকোলি আর সয়া সস-এর সম্মিলিত গন্ধ বেরচ্ছে। রজনীগন্ধা আর ধূপ গন্ধ মিলে গিয়েছে এইসঙ্গে। বাইরে নারায়ণী মাসির গলা শোনে, মা-কে মেরে মায়ের টাকায় ফুটুনি। ছোঃ।

আজ স্পেশাল নুডুল্‌স বানাচ্ছে পরি। চয়ন আসবে। চয়নের জন্য একটা লম্বাটে ফতুয়া-র ডিজাইন স্কেচ করে রেখেছে। গলাটা একটু নামানো। বুকের রোমরাজির অল্প আভাস বোঝা যাবে তাতে। ট্রাউজারের সঙ্গে দিব্যি পরা যাবে, পায়জামার সঙ্গেও। পকেটে কনট্রাস্ট কালার। একটা লম্বা স্ট্রিপ জুড়ে দেবে ডান পাশে। দারুণ লাগবে ওকে।

এটা চয়নের স্পেশাল। 'অঁথ কইওর'।

চয়ন এল।

ঘরে ঢুকতেই পরি চয়নকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমো খেল। চয়নও।

মা দেখছে।

মা, আমার সুখ দ্যাখো। তুমি তো চেয়েছিলে যেন সুখী হই।

ওই অটোওলাগুলো, লরিওলাগুলো, ওরা স্বব—যারা লেখে সুখ স্বপনে, শান্তি শ্মশানে।

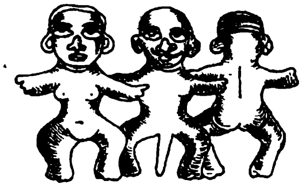

চয়ন বলেছে, আমাকে একটু দাঁড়াতে দে, আর একটু মাল কামাতে দে, একটা ফ্ল্যাট কিনে নেব।

—তখন এরা দেখবে আর জ্বলবে, লুচির মতো ফুলবে।

পরি হাততালি দিয়ে বলল।

'এরা' মানে ওর প্রতিবেশীরা।

—ব্যাঙ্কের পরীক্ষাটা দিলাম। যদি লেগে যায়, ব্যস। কোনও চিন্তা নেই, তোকে খুব ভাল করে রাখব।

পরি বলল, এটা ঠিক বললে না চয়নদা, রাখারাখি আবার কী? তুমি আমায় রাখবে? 'রাখা'-টা তোমারই রাইট না কি? তোমাদের? আমি তোমায় রাখতে পারি না? পুরুষতন্ত্রের বাইরে বেরতে পারলে না চয়নদা।

চয়ন বলল, তুইও বেশি মাদিবাদী হয়ে হয়ে উঠেছিস দেখছি।

—আবার মাদি? শিট। বলেছি না—'মাদি' বলবে না!

—কেন? 'মাদি' বললে ব্যাকরণের ভুল হয় না কি? মাদি ছাগল, মাদি খরগোশ, মাদি হাঁস বললে দোষ হয় না...।

—আমরা তো জন্তু-জানোয়ার নই, মানুষ।

—আচ্ছা ঠিক আছে, মানুষ। মানুষ তো কী হয়েছে? আমাকে 'মদ্দা' বল না, আমি রাগ

করব? পুরুষতন্ত্রকে 'মদ্দাতন্ত্র' অনায়াসেই বলতে পারিস, পুরুষতন্ত্রের তাতে কিচ্ছু যায়-আসে না। খবরের কাগজে 'ফিমেল এলিফ্যান্ট' বোঝাতে লিখছে 'স্ত্রী-হাতি', কিন্তু 'পুরুষ-হাতি' বোঝাতে 'মদ্দা'-র কোনও বিকল্প নেই। দ্যাখ না, 'মদ্দা' শব্দটাই কেমন পুরুষালি। একটা 'দ'-এর ঘাড়ে আর একটা 'দ' চেপে বসে আছে কেমন। অক্ষরবিন্যাসটাই পুরুষালি।

—এই 'চেপে' রাখতে পারাটা নিয়ে তোমাদের খুব গর্ব, তাই না চয়নদা?

—হ্যাঁ, তার কারণ তোরা 'চেপে' থাকতে চাস। ওটাই প্লেজার তোদের। আমাকে চয়নদা ডাকিস কেন? কতবার বলেছি চয়ন ডাকবি। চানু-ও ডাকতে পারিস। সব সময় জানাতে হবে আমি বয়সে ছোট। লুলুপুলু ভাব।

পরি এবার চয়নের হাতে ছোট্ট একটা চিমটি কেটে দেয়। যদি সুযোগ থাকত, চয়নের দাড়িময় গালে পুচ করে একটা চুমু খেয়ে ফেলত। ওরা বসেছিল সল্টলেকের সিটি সেন্টারে। কিছু দিন হল চালু হয়েছে। কত সব রেস্তোরাঁ। কতরকম দোকান। কাফে। ওসব জায়গায় ঢোকার পয়সা নেই ওদের, বাইরে বসেই আড্ডা দিচ্ছে ওরা। অনেক ছেলেমেয়ে এই চত্বরে বসে গল্প করে। পরি-র কলেজটাও কাছেই। কলেজের পর চয়ন মাঝে-মাঝে চলে আসে। সত্যি বলতে কী, পরি-ই চয়নকে আসতে বলে। ওখানে ভাঁড়ে চা নেই আশেপাশে। সস্তা বলতে টি-জংশন। চায়ের কাপ দশ টাকা। ক্যাফে কফি ডে-তে দাম আরও বেশি। তবু এখানেই আসতে বলে, কারণ, ওদের কলেজের অনেকে এখানে আসে। আড্ডা মারে। দেখুক ওর একটা স্টেডি লাভার আছে।

পরি বলল, মল্লিকা সেনগুপ্তের 'তুমিই বলো মার্কস' পড়লাম। মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে?—দারুণ, না?

—এতদিন পরে পড়লি? দারুণ লাগল? কেন? মেয়েরা বুঝি বিপ্লবের সেবাদাসী হতে পারে না? কেন পারে না? বিপ্লবের সেবাদাস ছেলেরাই কেন হবে শুধু? পুরুষ, নারী, না-পুরুষ, না-নারী সবাই বিপ্লবের সেবা করবে।...শোন, ভাল কথা। একটা বিপ্লব হতে যাচ্ছে। জানিস আইপিসি ৩৭৭ ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে একটা মামলা করেছে। নাজ ফাউন্ডেশন। দিল্লি হাই কোর্ট মামলাটা নেয়নি, নাজ ফাউন্ডেশন সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে। জানিস বিক্রম শেঠ 'থ্রি সেভেনটি সেভেন'-এর এগেনস্টে দারুণ আর্টিকেল লিখেছেন একটা। মুম্বইতে গে'রা মিছিল করেছে।

—এখন আর 'গে'-টে নিয়ে অত ইন্টারেস্ট নেই আমার। আমি 'গে' নই। আমি মেয়ে। আমি নারীবাদী। নারীবাদী কাজকর্ম নিয়েই আমি বেশি উৎসাহ ফিল করছি। পবন রঞ্জন বাসবদের সঙ্গে আমার আর তেমন লিঙ্ক নেই। রতনের সঙ্গে একটু আছে। একটা কবিতা লিখেছি চয়নদা, আচ্ছা আচ্ছা, চয়ন, শুনবে?

> অর্ধেক আকাশ বলো?—সে আকাশ মেঘে ঢাকা আছে
> মেঘের বিদ্যুৎভাণ্ড জেগেছে, এবার জেগেছে
> বজ্রপাত হবে।
> তোমাদের ব্যর্থ বীর্যপাত ধুয়ে যাবে বাজ-ভাঙা জলে
> বলছে আদম পুত্র, তুমি এবার ভোলাবে কী ছলে?

চয়ন বলল, জোর করে নারীবাদী হতে হবে না। তোর জামার ভিতরে ম্যানা'টাকে ওষুধ

খেয়ে একটু ফোলাতে পেরেছিস বলে নিজেকে একেবারে মেয়েছেলে ভেবে ফেলে মেয়েছেলে নিয়েই কবিতা লিখবি শুধু? তোর সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটার কথা ভাব, যে-কবিতাটা শুনে তোর সঙ্গে যেচে আলাপ করেছিলাম—ওটা তো কোনও নারীবাদী কবিতা ছিল না। লাইন দু'টো আজও মনে আছে :

কাগজের নৌকো আমি, নেমেছি জলে ভেঙেছি বাঁধ।
যদিও বামন, চুম্বন করি চাঁদ।

বাঁধভাঙা জলে কাগজের নৌকোটার ছবি ভেসে উঠেছিল। ভাল কবিতা। নিজেকে মেয়ে বলে জাহির করার জন্য জোর করে ওসব লিখতে হবে না।

—জোর করে লিখছি কে বলল? নিজের ভিতর থেকেই তো আসছে।

—যদি সত্যি-সত্যি ভিতর থেকে আসে তো ভাল কথা। কিন্তু আমরা তো পুরুষবাদী কবিতা লিখি না। একসময় 'ওয়ার পোয়েট্রি' লেখা হত। ওগুলো 'মেল পোয়েম্‌স'। পুরুষবাদী কবিতা যদি বলি—মেয়েদের রূপ নিয়ে। যৌবন নিয়ে। নারীশরীরের যন্ত্রপাতি নিয়ে। নারীবাদী কবিরা বাঁবি নিয়ে লেখেন না কেন? তুইও তো লিখতে পারিস।

—'বাঁবি' মানে?

—আরে ছেলেদের যন্ত্রপাতির কথা বলছি। আরও দু'টো অক্ষর—মানে দুটো সাউন্ড অল্টারনেটিভ্‌লি ঢুকবে।

ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল পরি-র। বুঝে—'কী অসভ্য' বলে আড়চোখে চয়নের দিকে তাকাল।

এই চাউনিটা চয়নের ভালই লাগল। আশ্বস্ত হল, আইএফটি-র হাই-ফাই ব্যাপার পরিকে এখনও বেশি পাল্টাতে পারেনি।

সন্ধে নেমেছে বেশ কিছুক্ষণ হল। ওরা ওঠে। পরি এখন বাইশ তেইশ। চয়নের ত্রিশ-বত্রিশ। এমএ পাশ করেছে বাংলায়। এমএ সেকেন্ড ক্লাস। তাও পঞ্চাশ পার্সেন্টের কম। অনার্সেও ওরকমই ছিল। কলেজে চাকরি জোটার কোনও আশাই নেই। বিএড দিয়েছে। স্কুলের চাকরির জন্য এসএসসি চালু হয়েছে। দু'বার বসেছে চয়ন, হয়নি। চয়ন বলে, পার্টির লোক ছাড়া চাকরি হওয়া মুশকিল। পার্টির কিছু লোকজনের সঙ্গে আলাপ আছে, ওরা নিচু লেভেলে। প্রকৃতপক্ষে ওরাও চেষ্টা করে যাচ্ছে নিজেদের জন্য। চয়ন বলে আমি হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু তোর ওই কবিতাটা আমাকে আবার এন্‌থু দিল। একটা কাগজের নৌকো বাঁধ-ভাঙা জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, বামন চাঁদের গায়ে চুমু খাবে খাবে, কচুরিপানা-ভরা পচাপুকুর নীল-নীল ফুল ফুটিয়ে জলপরিদের, ফুলপরিদের ডাকে। আবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে চয়ন। ব্যাঙ্কের পরীক্ষা দিতে পারছে না, অঙ্কে কাঁচা, কিছুতেই মাথায় ঢোকে না। আরও দু-একটা পরীক্ষা দিয়েছে। একটা চাকরি জোগাড় করতেই হবে। নইলে নোটবই লিখবে। মলাটে লেখা থাকবে কোনও বড় অধ্যাপকের নাম। এখনও টিউশনি করে।

চয়ন মল্লিক জমিদারের বাচ্চা। স্কুলে ওর নাম ছিল চয়নেন্দ্রনাথ। ওর এক দাদার নাম নয়নেন্দ্রনাথ। ছোট ভাইয়ের নাম জয়েনেন্দ্রনাথ। কোনও মানেই হয় না। ওর বাপ এসব নাম লিখে দিয়েছিল ইস্কুলে। ও নিজেকে চয়ন মল্লিক বলেই পরিচয় দেয়। ওর দাদা নয়ন, ভাই

জয়। চয়নের বাবা হারীন্দ্র পারিবারিক বিগ্রহের গয়না বেচে দিয়েছিল, জ্ঞাতিরাই পুলিশে ধরিয়ে দেয়। পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, এবং জেলেই হার্ট অ্যাটাক। চয়নের পিতামহের ঔরসে কিছু দুলে-বাগদি রমণীর গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে তখন হইচই হয়নি। দুলে-বাগদি'রা যেমন পুকুরপাড়েই থাকত, তেমনই থাকত, তবে কোলে-কাঁখে কয়েকটা তীক্ষ্ণনাসা গৌরবর্ণ সন্তান। কিন্তু ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ওই নিয়ে হট্টোগোল হয়, এবং দেশের বাড়ি ছোট জাগুলিয়ার বেশ কিছু জমি ওদের নামে লিখে দিতে হয়। তখন অনেক দুলে-বাগদি-বাউড়িই জমি বাগিয়ে নিয়েছিল। চয়নের বাপ-কাকা-জ্যাঠারা বাধ্য হয়েছিল লিখে দিতে। চয়নের প্রপিতামহ-ই জমিদারিটা বাগিয়েছিলেন। সাহেবদের নেটিভ মেয়ে সাপ্লাই করতেন। এরকম এক পরিবারের ছেলে চয়ন। বিধ্বস্ত জমিদার বাড়িটা রয়েছে শশীভূষণ দে স্ট্রিটে। ঝুল বারান্দা ভেঙে পড়েছে। গাছ গজিয়েছে বেশ কয়েকটা। বাড়িতে কাঁকড়াবিছে আছে, কার্নিশে ভেলভেটের মতো সবুজ শেওলা। একটা মাথা-ভাঙা পরির গলার সঙ্গে সিংহর ল্যাজের দড়ি বাঁধা আছে, ওখানে লুঙ্গি-সায়া-ম্যাক্সি শুকোয়। ওই বাড়িটায় এখন এগারো-বারোটা ভাগ। যেসব শরিক বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনে অন্যত্র সরে গিয়েছে, তারাও অংশ ছাড়েনি। চয়নের মা মারা গিয়েছিলেন ছোটবেলায়। শুনেছে স্টোভ বার্স্ট করে। মামারবাড়িতে বড় হয়েছে। কিন্তু মামারবাড়িতেই শুনেছে, ওর মা'কে পুড়িয়ে দিয়েছে ওর বাবা। চয়নের বাবা আবার বিয়ে করেছিল। চয়নের একটা সৎ ভাই, আর একটা সৎ বোন আছে। মামার বাড়িতেও বেশি দিন থাকতে পারেনি। দাদু, মানে মায়ের বাবার মৃত্যুর পর, মামাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল, চয়ন কার কাছে থাকবে, এ নিয়েও ঝগড়া। চয়ন আবার ফিরে এল ওর বাড়িতে। তখন ওর বয়স বারো-তেরো। চয়ন ওর নতুন মায়ের সঙ্গে কথা বলত না। মা বলে ডাকতেই ইচ্ছে করত না। কিন্তু কী ডাকবে? মাসি? কাকিমা? বাবার হুকুমে 'মা' ডাকতে হত। ব্লেড দিয়ে কত দিন ওর মায়ের সায়া কেটে দিয়েছে। বডিজ-এর ফিতে কেটে দিয়েছে। ওর মা শরিক বউদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। বাবার নতুন বউয়ের এক ছেলে, এক মেয়ে। দু'চক্ষে দেখতে পারত না চয়ন। বাবা ওদের নিয়ে ঠাকুর দেখতে যেত, চয়ন যেত না। ওর বাবার একটা ব্যবসা আছে। একটা ছোট্ট কারখানা, প্লাস্টিকের চিরুনি, চামচ, এইসব হয়। কী একটা আইসক্রিম কোম্পানির জন্য চামচ বানায়, আইসক্রিম কাপের সঙ্গে যে-চামচ দেয়। এরকম একটা বাড়ির ছেলে চয়নেন্দ্র। কী করে যে কবিতা-ভূত চাপল, এটা বড় রহস্যের। পড়ত জুবিলি ইস্কুলে। বাড়িতে বইপত্র কোথায়? কী একটা খুঁজতে গিয়ে তাকের পিছনে পেয়েছিল কয়েকটা 'যৌবন সুধা' আর 'পুষ্পধনু' পত্রিকার কয়েকটা সংখ্যা ব্যস। ব্যাকরণ বইটাই দায়ী। ওখানে ভাবসম্প্রসারণ করার জন্য কবিতার লাইন দেওয়া ছিল। 'কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে'—নিজের মতো করে লিখেছিল চয়ন, বাংলার স্যর রাজেনবাবু খুব প্রশংসা করলেন, গায়ে হাত বুলোলেন। এখনও ভাল কিছু লিখে ফেললে রাজেনবাবুর হাত চয়নের পিঠে লাগে।

পাড়ার লোকজন চয়নকে ভালবাসে। পাড়ার লোকদের মতে, এই ছেলেটা কোনও মেয়েকে দেখে হিড়িক দেয়নি, কোনও ছোঁকছোঁকানি নেই। খুব ভাল ছেলে।

পরি চয়নের কাঁধ খামচে তর্জনী উঁচিয়ে চাঁদ দেখাল। উজ্জ্বল-উচ্ছল নিওন-হ্যালোজেন-সিএফএল ছাড়িয়ে সল্টলেকের আকাশে চাঁদ। পরি বলল, চলো হাঁটি।

চয়ন বলল, এই যে আলো, তোর মুখে পড়েছে, এর মধ্যে কিন্তু চাঁদের আলোও মিশে আছে।

পরি বলল, এই চাঁদ তোমার-আমার। হিহি।

হিহি-টা হল নিজের ন্যাকমিটা বুঝিয়ে দেওয়া। চয়ন পরি-র দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

পরি বলল, চয়ন, তুমি অরূপদা হবে না তো?

চয়ন পরি'র হাত চেপে ধরল। বলল, সেসব কোনও চান্স নেই। আমার বাবা আমাকে জোর করে বিয়ে দিতে যাবে না।

—আর গার্লফ্রেন্ডগুলো?

—ধুর। কোথায় গার্লফ্রেন্ড দেখছিস? যাদের সঙ্গে কথা-টথা বলি—ওদের প্রতি কোনও অ্যাট্রাকশন আছে নাকি আমার, ধুর, ওইসব পিত্তলপুত্তলি। ওদের আছেটা কী? বলো না...।

—তাই?

—তাই তো।

—আচ্ছা চয়নদা, ওকে, ওকে চয়ন, একটা কথা জিগ্যেস করছি। সত্যি কথা বলবে তো?

—কেন বলব না? অবিশ্বাস করছিস?

—না, আসলে এই প্রশ্নটা তো কখনও করিনি তোমায়, খুব পার্সোনাল প্রশ্ন কিনা, বলছি, তুমি কখনও কোনও মেয়েকে 'করেছ'?

চয়ন কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল—একটা এক্সপেরিয়েন্স হয়েছিল আমার, খুব বাজে। খুব খারাপ লেগেছিল। ওদিকে আমার ইন্টারেস্ট নেই। তা ছাড়া দ্যাখ—শুধু তো 'সেক্সুয়াল অর্গান' দিয়েই রিলেশন তৈরি হয় না। তোকে আমি অ্যাডমায়ার করি, ভালবাসি। অনেক কারণ আছে। চল, এবার বাসেটাসে উঠি।

একটা বাসে উঠল ওরা। চয়ন উল্টোডাঙা নেমে গেল। ওর টিউশনি আছে, আটটা থেকে। বাসে পরি একা।

রবীন্দ্রনাথের ওই গানটায় 'চয়ন' শব্দটা আছে—

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন আকাশে

আকাশ কুসুম করেছি চয়ন হতাশে...।

চয়ন কি আকাশকুসুম?

বাসের জানালা দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছিল।

আকাশকুসুম।

ও চাঁদ চুমু খাবো—যদিও বামন।

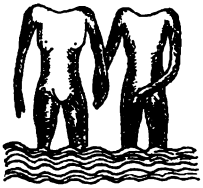

মন্টুর বেশ কিছু দিন ধরে কাশি হয়েছে। প্রথম-প্রথম নুনজলে কুলকুচি করেছে, তুলসী পাতা চিবিয়েছে, কমেনি, তারপর ডাক্তারও দেখিয়েছে। কমেনি। মন্টুর এখানে ভাল লাগে না। একদম ভাল লাগে না। দমবন্ধ অবস্থা। ওর সেই খাজাইতলা-ই ভাল ছিল। নাবাল জায়গা দিয়ে হাঁটলে কচুরিপানাগুলোর ফটাস-ফটাস কী সুন্দর, কী সুন্দর বাঁশপাতা, ঝরাপাতা, ছাগল ডাকছে, পুকুরের জলে ঝাঁপাচ্ছে বাচ্চারা, মুখে খড় নিয়ে উড়ছে শালিক, পায়ে আলতা দিচ্ছে কোনও ঠাকমা, একটা বাচ্চা চাল ছড়াচ্ছে, আর ইহি-ইহি হাসছে...। খাজাইতলায় ওর জ্যাঠা-খুড়োরা আছে। ওর-ও তো অংশ আছে। ছেড়ে দেবে?

জেঠিমা বলেছিল, ভিটেটা তুই ছাড়বি কেন? জেঠিমা মানে গাঁয়ের জেঠিমা নয়, শুক্লা জেঠিমা।

বলেছিল, একটা ব্যবস্থা করে দেবে। ও বাড়ির তো পাট চুকল, কিন্তু ওসব কিচ্ছু হল না। এই কাকুর কাছে ও-কথা একবার তুলেছিল। এই কাকু বলেছে 'গুলি মার'।

এই কাকুটা ছিটেল। কখনও-কখনও প্যাকেট করে ভাল-ভাল খাবার নিয়ে আসে। নরম-নরম, কালো-কালো মুরগির মাংস। চিলি চিকেন। কখনও বিরিয়ানি। দু'জনে মিলেই খাওয়া হয়। কাকুটা হুইস্কি দিয়ে খায়। মন্টুকেও দু-একবার গেলাসে ঢেলে দিয়েছিল। একচুমুক-দু'চুমুকে কিছু বোঝা যায় না। তারপরই কেমন যেন লাগে। মনের মধ্যে বোশেখ মাসের কালো মেঘ জড়ো হয়, কাঁদতে ইচ্ছে করে। এই জীবনটা নিয়ে কী যে করি, কী যে করি মনে হয়।

এই কাকুটাকে যত ভাল ভেবেছিল, তত ভাল নয়। ওর ছবি তুলে থানায় দিয়ে এসেছে। ওর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে এসেছে। ওকে বিশ্বাস করে না। আলমারির চাবি সব সময় আগলে-আগলে রাখে। যখন পায়খানা যায়, চানে যায়, ওটা সঙ্গে নিয়ে যায়। আগের জেঠুটা এরকম করত না। দরজার একটা চাবি ওর কাছেই থাকে। কিন্তু সেই চাবি দিয়ে কাকুর ঘরে যাওয়া যায় না। ওই ঘরের চাবি কাকুই সঙ্গে নিয়ে যায় সব সময়। কী করবে ও কাকুর ঘরে গিয়ে? নরম বিছানা? না কি ভাবছে চুরি করে বোতল খাবে?

বোতল খেতে যাবে কেন? কোন দুঃখে? বোতল খেলে দুঃখই পায় শুধু। খায় না। কাকু দিলেও খেতে চায় না, তাই আজকাল আর দেয় না। বোতল খেলে মনে হয়—হিজড়ে হয়ে যাবে। ওদের দলে চলে যাবে। ওদের সঙ্গে নাচবে, গাইবে, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করবে, মস্তি জীবন। এই জীবনে কী আছে?

এর চেয়ে ও-বাড়ি ভাল ছিল। অনেক ভাল ছিল। ওই অনিকেত কাকু বলেছিল গ্র্যাজুয়েট পাস হলে বিউটিশিয়ান কোর্সে ভর্তি করিয়ে দেবে। তা হলে ভাল-ভাল পার্লারে চাকরি পাওয়া যেত।

কিন্তু ওরা রাখল না। কেন রাখবে? বাট্‌লিবাজি ধরা পড়ে গেল যে। বাট্‌লিবাজিতেই যত

দোষ। যদি চিপ্‌টিবাজি ধরা পড়ত, তবে এত দোষ হত না।

কতবার ভেবেছিল আর করবে না। কিন্তু ঠিক নুনে নুন হয়ে যায়। কোত্থেকে জুটে যায়, কয়েকবার ধরা পড়ে গেল। কাকিমা রাখবে কেন?

এই লোকটা তো চাকর বানিয়ে রেখেছে। চাকর প্লাস রাঁধুনি। চাকর প্লাস রাঁধুনি প্লাস ম্যাসিওর না কী বলে...গা-হাত-পা টেপার লোক। প্লাস...। কী পড়াশোনা করছে, স্কুলে যাচ্ছে কি না—ওসব কিচ্ছু খবর রাখে না।

এরই মধ্যে মাধ্যমিক পাস করেছে মন্টু। বছর নষ্ট হয়েছে যদিও, এখন ইলেভেন। আর্টস পড়ে। আগে শুক্লা কাকিমা খোঁজখবর করত, বই কেনার টাকা দিত। দেখা করতে যেত কিনা মন্টু, গেলে খুশি হত। এখন আর টাচ নেই। অসুখ করেছে। একদিন দেখতে যেতে হবে। একাই যাবে। এখন ক'দিন খুব শরীর খারাপ যাচ্ছে। খুব কাশি। ভাল হলে যাবে। বারো ক্লাস পাস করে তারপর কী করবে মন্টু? বিএ পড়বে? পড়াবে? তারপর? কোথাও কি পিওনের চাকরি হবে? ছোট-মোটো কোনও চাকরি? বিকাশকাকু কি কোনও কাজের ব্যবস্থা করে দেবে? কে জানে? চাকরি হলেও কি করতে পারবে ও? সবাই প্যাঁক দেবে না? নার্স হওয়া যায় না? মেয়েরাই কেন নার্স হয় শুধু? ছেলেরাও তো নার্স হতে পারে। সেবা করা। সেবা পরম ধর্ম। সেবা করতে তো ভালোই লাগে। খাইয়ে দাও, স্নান করিয়ে দাও, ঘুম পাড়িয়ে দাও...।

এখানে এই বিকাশকাকুর ঘরে সন্ধের সময় মাঝেমধ্যেই আসর বসে। ওর বন্ধুরা বলে, তোর মাইচা-টা কোথায়, ওকে একটু সোডা আনতে বল, বরফ আনতে বল।

বন্ধুরা ওকে নিয়ে ঠাট্টা করে, মশকরা করে। মাইচা-লন্ডা-হিজড়া কত কী বলে। একজন বলেছিল, একটু নেচে দেখা তো। সোহাগ চাঁদবদনী ধনি নাচো তো দেখি। একজন বলেছিল আইসক্রিম খাস? আইসক্রিম? সাদা মনে কাদা নেই। ও ঘাড় কাত করে বলেছি, হ্যাঁ...। তখন চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন—কাপের আইসক্রিম না কাঠির আইসক্রিম? কাঠির আইসক্রিম চুষতে বেশি ভাল লাগে, তাই না? এসবের মানে তো ও জানে।

তিন-চারবার রান্না করার মাসি পাল্টেছে এই কাকু। সবগুলোই পাল্টেছে তা নয়, দু'জন ইচ্ছে করে ছেড়ে গিয়েছে। বিকাশকাকু হাত ধরে টানাটানি করেছে। ভাল কথায় এটাকেই বলে শ্লীলতাহানি। এসব কথা তো কাগজে ওঠে না, থানাতেও ওরা বলে না। এসব ঘটনা রাস্তার কর্পোরেশনের কলে এমনি-এমনি জল পড়ে যাওয়ার মতো হতেই থাকে। আর মন্টুদের বেলায়? প্রশ্নই নেই। ওদের শ্লীলতাহানি বলে কিছু নেই। বিকাশকাকুর ওই ঠেকের এক বন্ধু একদিন দুপুরবেলায় এসে মন্টুর মুখে ঠেসে ধরল যন্তর। চোষ, চোষ না, টাকা দেব। ও করেনি। বলেছিল, কাকুকে বলে দেব। লোকটা বলেছিল, বলিস। আমি বলব, তুই আমাকে ডেকেছিলি। তুই তো বিকাশের আইসক্রিম'টা খাস। খাস না?

এসব কথা ও রাঁধুনিদের বলে। যারা ছেড়ে গিয়েছে, তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল শান্তি। ওকে মাসি বলত না। দিদি বলত। মন্টুর চেয়ে খুব বেশি বড় না। মন্টু ওকে মনের কথা বলত, শান্তিদিও। শান্তিদি বলত, এই বাড়ির কর্তার নজর খারাপ। আমি সব নজর চিনি। বলত, আমি যখন সকালে এসে রান্না করি, বাবু তোকে বাজারে পাঠায়, বাবু রান্নাঘরে আসে, গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, বলে কী রান্না করছ দেখছি, বলে, আমায় রান্নাটা শিখিয়ে দেবে? দেখি তো ভাজা

মাছটা উল্টোতে পারি কি না। কাঁধে হাত দিয়ে মাছ উল্টানোর তাল করে। ন্যাকা। ভাজা মাছ উল্টোতে জানে না।

ওর বাড়ির কথাও বলত, একটা ছেলে হয়েছে, এখন দু'বছর। বলেছে ভাল করে মানুষ করবে, আর বাচ্চা করবে না। মন্টুকে বলে, কন্ডোম ছাড়া এক্কেবারে করতে দিই না।

মন্টুর কাছে লজ্জা ছিল না শান্তিদি-র। দু'বছরের বাচ্চা এখনও মাই খায়। এখন দুধ নেই, তবু চুষবে। ছেলে তো, হিহি।

বিকাশ অফিসে বেরিয়ে যেত ন'টা-সোয়া ন'টা। মন্টু বেরত আরও পরে। রান্নার দিদি-মাসিরা দু'বেলার রান্না করত। ন'টার মধ্যে হত না। বিকাশ অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পরও, কিছুক্ষণ ওরা থাকত। তখনই গল্পগুজব হত।

শান্তিদি একদিন সকাল থেকেই বলছিল—সারা গা চুলকোচ্ছে রে মন্টু, পাঁচিলের ওপর শাড়ি-ব্লাউজ মেলে দি, ওখানে কী একটা গাছে শুঁয়োপোকা হয়। ব্লাউজে বোধহয় শুঁয়ো ছিল। বাবু থাকলে চুলকোতেও পারছি না।

বিকাশ চলে গেলেই বাথরুমে ঢুকেছিল শান্তি। সামনে গামছা চাপা দিয়ে উদলা গায়ে বেরিয়ে এসেছিল। বলছিল, পিঠটা পারছি না রে, খুন্তি দিয়ে ভাল করে ঘষে দিবি?

মন্টু বলেছিল, ওতে শুঁয়ো যায় না। চুন দিতে হয়। আমি জানি। চুন শুকিয়ে গেলে চেঁছে ফেলতে হয়, তা হলে শুঁয়ো বেরিয়ে যায়।

—চুন এখন কোথায় পাবি? শান্তি বলেছিল।

—ময়দা দিয়েও হয়। মন্টু ময়দার কাঁই করে পিঠে মাখিয়ে দিয়েছিল। কী সুন্দর পিঠ। মাঝখানে একটা দাগ। ব্রা-এর। যেন ওদের খাজাইতলার খালের ওপরের বাঁশের সাঁকো। ময়দা লেপে দিয়ে দুষ্টুমি করে একবার সামনে হাত দিয়েছিল মন্টু। শান্তি বলেছিল, অ্যাআই...। ওটা ধমক না। মন্টু জানে। মন্টু শান্তির ভরাট বুক ছোঁয়, বুক-মাখা হাতটা নিজের বুকে মেখে নিয়েছিল।

ফ্যানের হাওয়ায় শুকিয়ে গেলে ভেজা গামছা দিয়ে ময়দা মুছে দিয়েছিল মন্টু। শান্তি বলেছিল, তুই কত কী জানিস রে। এখন শান্তি।

একটা রোববার মন্টুকে কচুরি আনতে পাঠিয়েছিল বিকাশকাকু। তিনজনের জন্য দশটা। শান্তি চারটে, আমরা তিনটে করে। আর জিলিপি। বলেছিল, গরম ভাজিয়ে আনবি। ফিরে এসে দেখে খুব মুখ করছে শান্তিদি। বলছে—দরকার নেই কো এই দশদিনের মাইনে। এমন ছোটলোকের বাড়িতে আর আসব না। ইজ্জত নেই? গরিব বলে কি ইজ্জত নেই আমাদের? এই চললুম। হনহন করে বেরিয়ে গিয়েছিল শান্তিদি।

আর একজন ছিল বিলাসিনী। আর একটু বেশি বড়। মন্টু তখন নতুন এসেছে। প্রথম-প্রথম বিকাশকাকুকে মন্দ লাগত না। ওর জন্য মায়া হত। ছেলেটা মরে গিয়েছে, সেই দুঃখে বউটাও নেই। ভিতর থেকে একটা 'আহা রে আহা রে' ভাব আসত। অফিস থেকে মাঝে-মাঝে টাল হয়ে বাড়ি ফিরত। ফিরে এসে ঢকঢক জল খেত। শুয়ে পড়ত বিছানায়—জামাকাপড় না ছেড়েই। দু'আঙুল দিয়ে কপালের রগ টিপে ধরত।

মন্টু বলত, মাথা টিপে দেব কাকু?

—দিবি? তবে তো ভালই হয়।

মাথা টিপে দিত, চুল টেনে দিত। এরপর পাও টিপে দিত। তারপর হাত-পা-গা-পিঠ সব। লুঙ্গিটার গিঁট আলগা করে দিত...।

বিকাশ বলত, তুই খুব ভাল মন্টু। ডাবু আমাকে একটা ভাল ছেলে দিয়েছে। আমি ওর কাছে গ্রেটফুল। তোর কাছেও রে মন্টু, তোকে না-পেলে আমি মরে যেতাম। ঘরেই আসতাম না রোজ। রাস্তাঘাটে পড়ে থাকতাম। তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস।

এরপর বিলাসিনীকে দিয়েও গা-হাত-পা টেপাত। দরজা বন্ধ করে দিত। খুব হিংসে হত মন্টুর। বন্ধ দরজার গায়ে কান লাগিয়েছে মন্টু। 'আর একটু আর একটু' শুনেছে। '...ইস নোংরা জায়গা' শুনেছে, 'অনেক হয়েছে আর না' শুনেছে বিলাসিনীর গলায়। 'তুমি একটু সাবান-টাবান মাখো না কেন'—শুনেছে বিকাশকাকুর গলায়। এরকম আরও। বিলাসিনীর নিজের জন্য করা চায়ে জল ঢেলে দিয়েছে মন্টু, ও দুপুরে খেত। ওর বাড়া ভাতে ছাই দিতে ইচ্ছে করত, ছাই কোথায় পাবে, নুন দিয়েছে ডালে। খাবার সময় বলেছে, এত নুন তো দিইনি ডালে, উনি তো খেয়ে গেলেন। কে দিল? ক্যা?—

মন্টু চুপ করে থেকেছে।

বিলাসিনীকে তাড়াতে হল, ও কেবল মাইনে বাড়ানোর কথা বলত বলে। বিলাসিনী বলত, এই টাকায় সব কিছু হয়? বিকাশ বলত কেন? কত তো বাড়িয়েছি। মাঝে-মাঝেই তো এক্সট্রা টাকা ধরে দি।

'এস্পেশাল' কাজের জন্য ওই টাকায় হয়? এক্সট্রা কাজ করলে মাসে এক হাজার বাড়াও, নয়তো প্রতিবার তিনশো করে দাও, নইলে আমি আর পারব না। বিলাসিনী 'তুমি' করে বলত, যেন বয়ফ্রেন্ড। মাইনে বাড়াল বিকাশ।

মন্টু বলেছে, কেন, ওর এত মাইনে বাড়াচ্ছেন কেন? বড্ড খাঁই ওর।

একবছরের মধ্যে যখন তৃতীয়বার মাইনে বাড়াতে বলল, বিকাশ রাজি হল না।

মন্টুর খুব শান্তি হয়েছিল।

যখন একজন চলে যায় আবার কেউ আসে, মাঝের গ্যাপগুলোয় রান্নাবান্নার কাজটা মন্টুই করে। মন্টু নিজেকে মনে করে বাড়ির গিন্নি। দুপুরে একা শোয়, পাজামা পরেই, মনে হয় যেন কাজকর্ম সেরে ম্যাক্সিটা গায়ে দিয়ে একটু শুল, সন্ধের আগেই আবার উনুন ধরাতে হবে। একা থাকলে কখনও যেন চাবির ঝুনঝুন বাজে, যে-চাবি আঁচলে থাকে। খবর কাগজওলাকে বকতে খুব ভাল লাগে—যেদিন দেরি করে কাগজ দেয়।

এখন কোনও রান্নার লোক নেই। গত পনেরো দিন হল। কিন্তু এখন সেই মজাটা পাচ্ছে না মন্টু। কারণ ওর শরীরটা ভাল লাগছে না। জ্বর-জ্বর লাগছে। কাশিটা কমছে না। কাশির সঙ্গে মনে হল যেন রক্ত।

কাশির সঙ্গে রক্তর কথা বলল ওর বিকাশকাকুকে। বিকাশ শুনেই বলল, সে কী? কাশির সঙ্গে রক্ত? গাঁড় মারিয়েছে। তোকে আর রান্না করতে হবে না। দেশে চলে যা।

—দেশ? ওরা তো থাকতে দেবে না।

—কবে থেকে রক্ত যাচ্ছে?

—আজ সকালে দেখলাম।

—কাশছিস কত দিন?

—এক-দেড় মাস হয়ে গেল।

মহা ঝামেলা বাঁধাতে পারিস। কাল যাব ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তারবাবু বেশ কিছু টেস্ট লিখে দিলেন। রক্ত পরীক্ষা, এক্স রে, হাতের চামড়ার তলায় কী একটা ইনজেকশন দিয়ে দু'দিন পর আসতে বললেন। এই টেস্ট-টার নাম বেশ মজার। ওর নামে টেস্ট। মন্টু টেস্ট। কে জানে কেন?

পরে জানতে পারল—মন্টু নয়, মান্টু টেস্ট ওটা।

ডাক্তারবাবু বললেন—যা ভয় পেয়েছিলেন সেটা নয়। টিবি নয়। থ্রোট ইনফেকশন। ইএসআর-টা একটু বেশি আছে বটে, সব ইনফেকশনেই থাকে। কমে যাবে। অ্যান্টি-বায়োটিক দিয়ে দিচ্ছি।

দশ-বারো দিন পরেও কমল না। ডাক্তারবাবু ওষধু পাল্টে দিলেন, গার্গল করার জন্য একটা ওষুধ দিলেন। ক'দিন কম, কিন্তু আবার শুরু হল।

কাশি, কেমন যেন লালা বেরিয়ে আসে গলা থেকে। একটু লালচে। যেন রক্ত।

কাকুকে আর জ্বালাতন করতে ইচ্ছে করল না। একদিন হাসপাতালে গেল। টিকিট করে বসে রইল। ডাক্তার দেখল দু'ঘণ্টা পর। হাঁ করতে বলল। টর্চ দিয়ে দেখে বলল, টনসিল পেকেছে। ওষুধ লিখে দিল।

মন্টু দেখল, অ্যামক্সিসিলিন লিখেছেন ডাক্তারবাবু।

মন্টু বলল, এই ওষুধ তো খেয়েছি।

ডাক্তারবাবু বললেন আরও খেতে হবে।

বিকাশ তো মহা মুশকিলে পড়ল। ছোঁড়ার কাশিটা কমছে না। ক'দিন কমে তো আবার হয়।

বিকাশ অনিকেতকে ফোন করল। বলল, তোর তো অনেক চেনাজানা ডাক্তার আছে, একটা ভাল ডাক্তার দেখিয়ে দে।

মন্টুর ধারাবাহিক কাশির কথাটা জানাল বিকাশ।

অনিকেত বলল—এসব ঝুটঝামেলা আর নেব না আমি। আমি আছি নিজের প্রবলেমে। ফিজিওথেরাপিতে শুক্লা তেমন কিছু ইমপ্রুভ করছে না। কথা একদম জড়ানো। কী বলে বোঝা যায় না। কানেও শুনতে পায় না ভাল। অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসি আমি। আমি আর কোনও ঝামেলায় নেই।

বিকাশ বলল, ঝামেলায় তো তুমিই আমাকে ফাঁসিয়েছ গুরু। জাস্ট একটা ডাক্তার দেখিয়ে দাও। ভাল ডাক্তার। ওকে বাঁচাতে হবে তো?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, একজন ইএনটি দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে।

পেশেন্টকে নিয়ে আসতে বলেন ডাক্তার ইন্দ্রনীল সেন। অনিকেত বিকাশকে দিনক্ষণ জানায়। মন্টুকে সঙ্গে করেই নিয়ে যায় বিকাশ। মন্টু অনেক দিন পর জেঠুকে দেখল। জিগ্যেস করল কেমন আছে-টাছে। অনিকেত তেমন কিছু জিগ্যেস করল না। কী হয়েছে তাও না। নাম ডাকলে চেম্বারে ঢুকল ওরা তিনজন। ডাক্তার গলাটা দেখলেন। ওদের মাথায় কোহিনুরের মতো একটা আয়না থাকে। গোল আয়না। ওই আয়নার আলো গলায় পড়ে। হাতে টর্চও থাকে। কাগজপত্র দেখলেন ডাক্তারবাবু। বললেন, বাব্বা। সবরকম অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া

হয়ে গিয়েছে দেখছি। অ্যামক্সিসিলিন, অ্যারিথ্রোমাইসিন, এমনকী ডক্সিসিলিন-ও ঠুসে দিয়েছে। আর চেস্ট ক্লিয়ার। স্ট্রেঞ্জ!

আবার ভাল করে দেখলেন।

বললেন, আপনারা বেরিয়ে যান, ওর সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা আছে।

মিনিট তিনেক পরে বেল বাজল। ওরা ফিরে এল। বলল, আর একটা টেস্ট করাব।

অনিকেত নিজের একটু বিদ্যে জাহির করার জন্য বলল, ব্রঙ্কোস্কপি?

ডাক্তারবাবু বললেন, না, একটা সোয়াব টেস্ট করাব। আমিই গলা থেকে নিয়ে নিচ্ছি, আমিই ল্যাবে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের কোনও টেনশন নেই।

দু'দিন পর ড. সেন অনিকেতকে ফোন করে জানাল সোয়াব টেস্টের রেজাল্ট পেয়েছি। নিসেরিয়া গনোরি পাওয়া গিয়েছে, গনোরি। গনোরি বুঝলেন তো?

—গনোরিয়া?

—হ্যাঁ।

—গলায়?

—হ্যাঁ, গলায়। ওরো-জেনিটাল কনট্যাক্ট। চিন্তার কিছু নেই, পেনিসিলিন দিলেই কমে যাবে।

—মানে?

—মানে ওর গলায় গনোরিয়া। কোন জননাঙ্গ থেকে ইনফেকটেড, মানে সংক্রামিত হয়েছে। ওর সঙ্গে কথা বলে জেনেছি ওর সাক করার হ্যাবিট আছে। মেল জেনিটালিয়া। বিকাশ যেন শক্ পায়। চুপ করে থাকে। ডাক্তারবাবু টেলিফোনের ওধার থেকে বলতে থাকেন—ও যার পেনিস সাক করে, তার গনোরিয়া আছে। অনিকেত আঁতকে ওঠে।

ভয় পায়। ওর তবে গনোরিয়া আছে? মন্টু কি ডাক্তারবাবুকে বিকাশের নাম বলে দিয়ে দিয়েছে নাকি! ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন—

যিনি তার জেনিটেলিয়ায় গনোরিয়া পুষছেন, তিনি কিন্তু কোনও মহিলার কাছ থেকেই পেয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই একাধিক নারীসঙ্গ করেন।

অনিকেত লক্ষ করে—ডাক্তারবাবু হঠাৎ 'তিনি-তিনি' করেছেন।

অনিকেতের যেমন আশ্চর্য লাগে। একটু মাথা ঘুরছে যেন। গলায় গনোরিয়া? এটা বিকাশ অর্জন করেছে বাইরের কোনও মেয়েছেলের কাছ থাকে এবং সেটা এখন মন্টুর গলায়?

অনিকেত জিগ্যেস করে, সেই পুরুষটিরও তো তবে গনোরিয়া হয়েছে, তার অসুবিধা হচ্ছে না কিছু?

ডাক্তার সেন বলেন—হয়তো হচ্ছে না তেমন, লেটেন্ট আছে, কিংবা একটু-আধটু হচ্ছে, উনি ইগ্‌নোর করছেন। দুনিয়া বড় বিচিত্র। ছেলেটির সঙ্গে আমার একটু পার্সোনাল কথা হয়েছিল, আপনাদের সরিয়ে দিয়ে ওকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করেছিলাম। ওই ভদ্রলোকটি কে? যে আপনার সঙ্গে এসেছিল? দুর্বল স্বরে অনিকেত বলল, আমার রিলেটিভ, রিলেটিভ, বন্ধুর মতো...।

ফোনের ডায়াল টিপে কড়া স্বরে অনিকেত বিকাশকে বলল, ছিঃ, তুই মন্টুকে দিয়ে চোষাস? অ্যাঁ? রাসকেল!

বেড়াল যেমন পাঁচিলের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়, সেই কায়দায় একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার নাম 'ক্যাটওয়াক'। এভাবে হাঁটলে পোশাকের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

স্ক্রিনে কতগুলো ক্যাটওয়াকিং দেখানো হচ্ছিল। ক্যাটওয়াকিং-এর জন্য বিশেষ জুতো আছে। ব্ল্যাক বেলি, রেড বেলি, পিপ টো ইত্যাদি জুতোগুলোকে দেখানো হচ্ছিল স্ক্রিনে। অডিও-ভিজ্যুয়াল ক্লাস। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ-এর সাত তলার ওপরের এই ঘরে কখনও রিও ডি জেনিরো, কখনও মিলান, কখনও কোলন, কখনও প্যারিস। বিবি রাসেলের একটা শো দেখল ওরা, প্যারিসের বুকে দাঁড়িয়ে গামছার ফ্যাশন। পায়জামা আর কুর্তার ওপর কাঁধে একটা গামছা। এই গামছার দাম কত? মেয়েদের পরনে নানা রঙের গামছা জোড়া দিয়ে, মানে, অ্যাসেম্বল করে বানানো ঘাগরা, একটা চোলি, আর গামছার ওড়না। আমাদের রিকশাওলারা, কুলি-কামিনরা তো কাঁধে গামছাই রাখে, কই, ফ্যাশন তো হয় না! শশী কাপুর কিংবা দেবানন্দ কাঁধে গামছা রাখলে ফ্যাশন হয়। মা-রা স্নান করে বুকের ওপর গামছা ফেলে দিলে সেটা ফ্যাশন নয়। বিপাশা বসু কিংবা সুস্মিতা সেন বুকে গামছা দিলে ফ্যাশন। এখন বিবি রাসেল-এর মডেল'রা গামছার পোশাকে ক্যাটওয়াক করছে। ওসব দেখতে-দেখতে পরি একটা কাগজে সত্তর হাজার কে আড়াইশো দিয়ে ভাগ করে। বছরে আড়াই শো দিনের মতো ক্লাস, সত্তর হাজারটা বছরে দিতে হয়। দু'শো আশি টাকা প্রতিদিন। দু'শো আশিকে ছয় দিয়ে ভাগ করে। ছ'ঘণ্টা যদি ক্লাস হয়, তবে ঘণ্টায় সাড়ে ছেচল্লিশ টাকা। এক ঘণ্টার ক্লাস মানে তিন কিলো চাল। এই যে চল্লিশ সেকেন্ড হেঁটে গেল র‍্যাম্পে, এটা দেখল, মানে, একজনের একবেলার আহার। 'আহার' শব্দটাই মনে এল, কারণ শব্দটার মধ্যে 'আহা' রয়ে গিয়েছে। জাহিরুল হাসান ক্লাস নিচ্ছেন। ট্রেন্ড সেটিং আর ফ্যাশন বোঝাচ্ছেন। ইট্‌স আ বিগ জব। দিস ইজ এক্সক্লুসিভ। এটা হল ফ্যাশন সিগনেচার। দেখলেই বোঝা যায় এসব বিবি রাসেলের ডিজাইন। দেখলে বোঝা যায় রিতু কুমারের ডিজাইন, দেখলেই বোঝা যায় ক্যামেলিয়া জোন্‌স-এর ডিজাইন। ওঁর ডিজাইন হল নেচারস্যাভি। লিফ, ফ্লাওয়ার বার্ক্‌স এসব দিয়ে কস্টিউম ডিজাইন হয়। পাওয়ার পয়েন্টে দেখাচ্ছেন জাহিরুল হাসান। একটি মডেলের বুকে দু'টো ফুল, উরুসন্ধিতে একটা পাতা।

জাহিরুল স্যর বলছেন—ফুল তো সত্যিকারের ফুল হতে পারে না, শুকিয়ে যাবে। ফেব্রিক চুজ করতে হবে। ব্রেস্ট কভারিং ফ্লাওয়ারগুলো সফ্‌ট কট্‌ন দিয়ে করা হয়েছে। কট্‌ন ফেব্রিক্‌স কেটে-কেটে, ভাঁজ করে, সেলাই করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। 'পেয়ার অফ ফ্লাওয়ার' এমন করে সেট করা হয়েছে যেন ক্লিভেজ-টা বোঝা যায়। বুকে আটকে রাখার জন্য কোনও ইলাস্টিক ইউজ করা হয়নি। সিসিল ফাইবার দিয়ে বাঁধা হয়েছে। কিন্তু পাতাটা কট্‌ন নয়। কট্‌ন হলে অসুবিধে হত। কী অসুবিধে হতে পারত?

প্রশ্নগুলো ইংরেজিতেই হচ্ছিল। পরি বুঝতে পারছিল ঠিকই। এই প্রশ্নটার উত্তর গেস

করেছে ও, পরি হাতটা উঠিয়ে দেয়।

—নাইস। হোয়াট ইজ দ্য পুফিং?

'পুফিং' মানে জানে। রিজেক্ট করা বলে। কেন কট্‌ন নয়? বলতে গিয়ে মনে হল, ও ঠিক করে ইংরেজিতে বলতে পারবে না।

পরি হাতটা নামিয়ে নেয়। বলে, নো-নো।

—হোয়াই নো নো? হোয়াট ইজ ইয়োর প্রবলেম।

পরি বলে, আই অ্যাম নট ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ।

—সো হোয়াট? স্পিক ভুল ইংলিশ।

পরি বলে—স্যর, দিস ইজ বন্য-বন্য অরণ্য ভাল থিম। দিস মডেল ইজ চাইল্ড অফ নেচার। সো শি ইজ নট অ্যালাউড টু উইয়ার প্যান্টি। উইদাউট প্যান্টি দ্যাট কট্‌ন মে ক্রিয়েট আ মার্ক। ভ্যাজাইনা-র সরু প্যাসেজে কট্‌ন-টা সেঁটে গিয়ে একটা লম্বা স্কার মার্ক আই মিন একটা দাগ তৈরি করবে। দ্যাট মে লুক্‌স অসভ্য। কয়েকজন হাল্কা করে হেসে উঠল।

কিন্তু জাহিরুল হাসান বললেন, শিক। শিক। ভেরি রাইট। ফ্যান্টাস্টিক। ফ্যাশন ভোকাবুলারি-তে 'শিক' হল ভাল লাগার অ্যাডজেকটিভ। পাতাটাও সিসিল ফাইবার দিয়ে বাঁধা আছে এবং পাতাটা ঘুরিয়ে পিছনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং সিসিল ফাইবারে ট্যাগ করা হয়েছে। ট্রুলি স্পিকিং, বাট্‌ক ক্যাভিটি-টা পাতা দিয়ে ঢাকা হয়েছে, র‍্যাদার ঢাকার চেষ্টা হয়েছে। কট্‌ন হলে একটা স্কার মার্ক তৈরি হত...। পরি ভাবে, একলাইনের কথাটা কতটা ঘুরিয়ে বলতে হয়। আসল কথাটা হল, ফাঁকে ঢুকে যেত। সেটা ও বুঝেছিল, কিন্তু ওটার ইংরেজি করতে পারেনি।

...ফর দ্যাট রিজন, শি ইউজ্‌ড সফ্‌ট কোয়ালিটি পিভিসি। মিন্‌স—পলি ভিনাইল ক্লোরাইড। এর কোয়ালিটি কট্‌নের মতো নয়। এনি ওয়ে...। ইউ আর ভেরি ট্যালেন্টেড পরি, ইউ সেড রাই্‌ লি। এই প্রশংসা পরি-র খুব ভাল লাগল।

পরি এভাবেই এগোয়। ওদের ক্যাড শেখানো হচ্ছে। কম্পিউটার এইডেড ডিজাইনিং। আগে হাতে স্কেচ করতে হত। এখন কম্পিউটারই করে দেয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভার্চুয়াল মডেলটিকে দেখা যায়। কালার কম্বিনেশন কী হবে, সেটাও করে নেওয়া যায়। এছাড়াও 'ফ্যাশন ফোটোগ্রাফি' বলে একটা ব্যাপার আছে। ফোটোশপ-এর কিছু কাজ জানাটাও জরুরি। এজন্য নিজের একটা ক্যামেরা দরকার। পরি-র দু'টো জিনিস কিনতে হবে। একটা ক্যামেরা এবং একটি কম্পিউটার। টাকা চাই।

মায়ের সোনার গয়নার পুঁটুলিতে এখনও হাত দেয়নি। ওটা রাখা আছে। ভবিষ্যতে ফ্যাশন শো করাতে হলে টাকা দরকার হবে। মডেলরা অনেক টাকা নেয়। ভেনু ভাড়া করতে হবে। বামন হয়ে কেন যে চাঁদ ধরতে গিয়েছিল...

এই ক্লাসে বত্রিশজন আছে। কুড়িজনই মেয়ে। পিয়ার্সিং করা, ফ্রেঞ্চ জানা মেয়েটার নাম শিকস্তি সিন্‌হা। মেয়েটার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে পরি-র। ওকে সবাই 'শিক' বলে ডাকে। ছেলে মেয়েরা যেটাকে 'ব্যাপক' বলে, ফ্যাশন জগতে সেটা 'শিক'। 'গ্র্যান্ড', 'গ্রেট', 'অসাম', 'ফ্যান্টাস্টিক'—এসব বোঝাতে 'শিক' শব্দটা চালু। এর আসল মানে 'স্টাইলিশ'। যদিও 'ব্যাপক'-এর মতো শব্দটার মানে বহুধাবিস্তৃত। পরি ওকে জিগ্যেস করেছিল, শিকস্তি মানে কী

গো? ও বলেছিল, কোনও নদীর চর জেগে উঠে যে-জমিটা তৈরি হয় তাকে বলে শিকস্তি। আমার বাপি তো ডিএম ছিলেন...। পরি জিগ্যেস করেছিল, আর যে-জমিটা নদী খেয়ে নেয়, তাকে কী বলে? বাবাকে ফোন করে জেনে নাও তো...।

শিক্‌ বলেছিল, জানি। ওটা পয়োস্তি। বাপির সঙ্গে আমার প্রচুর গল্প হয়। পরি বলেছিল আমি পয়োস্তি। ডুবন্ত স্থলভাগ। শিক বলেছিল শিট্। কে বলল পয়োস্তি? ইউ আর এমার্জিং ম্যা... বোধহয় বলতে যাচ্ছিল ইউ আর এমার্জিং ম্যান... ছেলেদের যেমন বলে ও। 'ম্যান' শব্দটা স্পষ্ট করে বলতে পারল না। বোধহয় কোনও রিফ্লেক্স কাজ করছিল। শিক বলল, আই অ্যাডমায়ার ইউ। আই ক্যান গেস ইওর ইক্‌নমিক কন্ডিশন। স্টিল ইউ আর ফাইটিং।

ও জানে পরির মা নেই, বাবাও ঠিকঠাক নেই। ও জানে, এতটা খরচ সাধ্য কোর্সে পড়া খোঁড়া লোকের কাঞ্চনজঙ্ঘা ওঠার মতোই কঠিন ব্যাপার। মেয়েটা ওকে মাঝেমধ্যে খাওয়াতে নিয়ে যায়। বার্গার-স্যান্ডউইচ এসব খাওয়ায়। ফর আ চেঞ্জ মুড়িও।

পরি ওকে কিছুটা ওর বেঁচে থাকার গল্প বলেছে। শিক বলেছে, চলো তোমার বাড়ি, দেখব তুমি কীরকম করে বেঁচে আছো। আসলে, শিকস্তির সঙ্গে কখনও গরিব ছেলেমেয়ের বন্ধুত্ব হয়নি। গরিব দেখেছে রাস্তায় হেঁটে যেতে-যেতে ফুটপাথে, কিংবা গাড়ির কাচের ভিতর দিয়ে। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে জিপ-এ করে ঘুরেছে বাঁকুড়ার গ্রামে—যখন ভ্যাকেশন-এ এসেছে। ধানের মরাইয়ের পাশে খাটিয়ায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করেছে, একটা কাঁসার থালা থেকে তিন-চার ভাইবোনের সমবেত পান্তাভাত খাওয়া দেখে ওদের পাশে বসে যেতে ইচ্ছে করেছে। ধান খেতের আল ধরে হাঁটতে ইচ্ছে করেছে, রাস্তার ধারের ছাতুর হোটেলে রিকশাওলাদের ছাতুর তাল, কাঁচা পেঁয়াজ আর চাটনি দিয়ে খাওয়া দেখে একদিন বসে গিয়েছিল। ছাতুওয়ালাটা যে কতবার থালাটা ধুয়েছিল...। বস্তির ভিতরে কখনও ঢোকেনি শিকস্তি। পরি'কে বলল, একদিন নিয়ে যাবে তোমাদের ঘরে?

একদিন নিয়ে গিয়েছিল। দেখুক, সবাই দেখুক—ওর বন্ধু কারা। শুধু ব্যাটাছেলে নয়, মেয়েরাও আসে ওর বাড়িতে। ওর ঘরে গিয়ে ছবি তুলেছিল, ওদের উঠানের ছবি, টিনের ঘের দেওয়া আব্রু বাঁচানোর আদি-বাথরুমের ছবি। ওকে বসিয়ে রাস্তার দোকান থেকে পেঁয়াজি এনে মুড়ি-পেঁয়াজি খেয়েছিল—লঙ্কা কামড়ে, আর ঝালে হু-হা করছিল, ওর মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। শিকস্তি স্কুলিং করেছিল কার্শিয়ং-এ। গ্র্যাজুয়েশন গোয়েঙ্কা—কমার্স। এনআইএফটি-তে অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়েছিল, হয়নি। ওখানে পরিও পরীক্ষা দিয়েছিল। পরিরও হয়নি। পরি বলেছিল, তুমি তো দিল্লি-বাঙ্গালোর-পুনে'তে আরও ভাল জায়গায় এই কোর্সটা করতে পারতে। ও বলেছিল, বাবার বেশি টাকা খরচ করতে চাইনি, তা ছাড়া আমার দাদা আছে একটা, সেন্ট জেভিয়ার্স-এ পড়ত। বাবার গাড়িটা নিয়ে র‍্যাশ ড্রাইভ করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট, স্পাইন ভেঙে ফেলেছে। এখন হুইল চেয়ারে। ট্রিটমেন্ট করানোর জন্য সিঙ্গাপুর নিয়ে গিয়েছিল বাপি। ভাল হয়নি। গাদাখানেক খরচ হয়ে গিয়েছে। ওই জন্য বাবার টাকা খসাইনি। তা ছাড়া আমরা সল্টলেকেই থাকি কিনা, কাছাকাছি হয়। কোথায় পড়ছি, সেটা খুব একটা ম্যাটার করে না। নিজের ইনোভেটিভ আইডিয়া-টাই আসল। তা ছাড়া আর একটা কারণ আছে। ভেরি কন্‌ফিডেনশিয়াল। বলব?

—তোমার ইচ্ছে।

—তার আগে তুমি বলো পরি, শরীর নিয়ে তোমার কোনও ট্যাবু আছে? আই গেস ইউ আর এ গে। বট্‌ম গে। অ্যাম আই রাইট?

মাথা নাড়ে পরি।

—'গে না, আমি মেয়ে—উইথ বাঁবি।'

—বাঁবি মানে?

অক্ষর দু'টোর ফাঁকে 'ড়া' আর 'চি' আছে।

দু-সেকেন্ড পর মর্মার্থ বুঝল শিকস্তি। বলল, দারুণ অ্যাব্রিভিয়েশন। তুমি বলছ তুমি মেয়ে। নিজেকে তাই ভাবছ। আমরা তোমাকে গে' ভাবছি। নাথিং রং ইন ইট। চোখটা 'প্যান' করে চারদিক দ্যাখে বলে—নিজের মতো করে বাঁচা কোনও অন্যায় নয়—আন্‌লেস তুমি অন্যের ক্ষতি করছ।

আলনার দিকে চোখ রেখে শিকস্তি বলে, তোমার নিশ্চয়ই বয়ফ্রেন্ড আছে।

মায়ের আলনা। আগে মায়ের শাড়ি-ব্লাউজ থাকত পরির জামা-প্যান্টের সঙ্গে মাখামাখি করে। এখন মায়ের একখানা শাড়ি শুধু রেখে দিয়েছে, নইলে খারাপ লাগে। মায়ের শাড়িগুলো রয়ে গিয়েছে আলমারিটায়, ওগুলো পরির উত্তরাধিকার। ও পরবে একদিন। তবে শিকস্তি এখন বয়ফ্রেন্ডের প্রসঙ্গটা তুলল আলনায় ঝুলন্ত একটা পাঞ্জাবি দেখেই। ওটা চয়নের পাঞ্জাবি। অ্যাপ্লিক করে দেবে বলে রেখেছিল। ও বুঝে ফেলেছে এটা ছেলেদের পাঞ্জাবি—ওর নয়।

বয়ফ্রেন্ড প্রসঙ্গে পরি সম্মতির ঘাড় নাড়ল।

শিকস্তি জিজ্ঞাসা করল, স্টেডি?

আবার সম্মতির ঘাড় নাড়ল পরি।

ইজ হি আ হেলপিং গাই?

আবার একইরকম মাথা নাড়ল পরি। তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে পরি বলল, 'হেল্প' মানে—মেন্টাল সাপোর্ট দেয় ও। পাশে আছে। কিন্তু ও চাকরি-টাকরি পায়নি। টিউশনি করে। নিজের খরচটা চালিয়ে নিতে পারে।

শিকস্তি বলল, পরি, জানি তোমার টাকা দরকার। যেখানে ভর্তি হয়েছে এটা কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট। এখানে কোনও মার্সি নেই। 'সেমিস্টার ফি' না-দিতে পারলে ওরা তাড়িয়ে দেবে। ফ্যাকাল্টি'রা যতই ভালবাসুক, ফেভার করুক, সিমপ্যাথি দেখাক ম্যানেজমেন্ট ছাড়বে না। এছাড়া রেকারিং খরচ আছে। আমি আমার খরচের অনেকটাই নিজে আর্ন করি। ল্যাপটপটাও নিজের টাকায় কিনেছি। আমি এস্‌কর্ট সার্ভিস করি। যদি চাও তুমিও করতে পারো।

—এস্‌কর্ট? মানে কি গাইডের কাজ? পারব?

—এসকর্ট সার্ভিস জানো না?

—এসকর্ট মানে তো সঙ্গে থাকা। এসকর্ট ভ্যান বলে না? ট্রেনে ব্লাইন্ড-রা একজন এসকর্ট নিতে পারে...

এটাও সঙ্গে থাকা। কিন্তু মোর ক্লোজলি। ফাকিং সার্ভিসকে ভাল করে বলি এসকর্ট সার্ভিস। জাস্ট শুই। দু'হাজার, তিন হাজার...। ইজি মানি। দু-একজন ক্লায়েন্ট আছে দে গিভ মি ফাইভ থাউজ্যান্ড ইভেন। একটা এজেন্সি-র থ্রু-তে কাজগুলো ইনিসিয়ালি পাই, পরে ডিরেক্ট হয়ে যায়। এজেন্সি থেকে বলেছে ওদের কিছু বাট্‌ক ডিমান্ডিং ক্লায়েন্ট আছে। তুমি যদি চাও

যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি। কোনও ঝামেলা নেই, ফোন পাবে, টাইম দেবে, তুমি কন্ডিশন দেবে, তোমার কন্ডিশনে কাজ হবে। আমি তো আমার কন্ডিশনেই কাজ করি। জানো তো, জিগালোদের খুব ডিম্যান্ড। মেয়ে-ক্লায়েন্টরা ওদের ডাকে। বাংলা বাজারে জিগালো সাপ্লাই খুব কম। আমার চেনা একটা জিগালো আছে, ব্যাপক আর্নিং। ইউ কান্ট বিলিভ দেয়ার ফি। মাঝবয়সি মহিলারা ডেকে নিয়ে যায়। যত বেশি বয়স, তত বেশি টাকা ডিম্যান্ড করে। আগেকার দিনে নাকি মহিলারা ওদের সইকে বলত, আমার একটা নাং আছে, কিংবা একটা ময়না পুষেছি। জিগালো-রা হল মডার্ন ময়না। ওদের কিন্তু খুব মেন্‌টেন করতে হয়। রোজ সকালে আমন্ড আর কাজু বাটার শরবত খায়, শিলাজিৎ-টিলাজিৎ কী সব খায়। মাঝেমধ্যে টেস্টাস্টোরেন ইনজেকশন নেয়। ছেলেদের পক্ষে প্রতিদিন এই কম্মো করা কি সহজ নাকি? আমাদের আর কী, ঠ্যাং ফাঁক করে দিলেই হল। তোকে তো জিগালোগিরি করতে হবে না, তোর 'বাঁবি' নিয়ে উপুড় হবি, টাকা আসবে। ...'তুই' বলে ফেললাম। আমাকেও 'তুই' বলিস।

পরি'কে শিকস্তি যা বলছে—পরি জানে সেটা ধুরানিগিরি। ও যখন 'কোতি'দের আড্ডায় যেত—তখন বেশ কিছু ধুরানি-র সঙ্গেও আড্ডা মেরেছে। অনেকে স্বীকার করে না যে ধুরানিগিরি করে, অনেকে স্বীকার করত। রতন নামে যার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল ওর, যে-রতন বাড়িতে সফ্‌ট টয় বানাত, অলোক নামে যে-লোকটা নিজে অনেক খরচাপাতি করে 'ব্রেস্ট' বানিয়ে রতনকে অপমান করেছিল রতনের বুকে ন্যাকড়া গোঁজা ছিল বলে, যে-রতন রবীন্দ্রসদনে বসে পরির কাছে কেঁদেছিল, পুলিশ ধরে নিয়েছিল, অনিকেত আঙ্কেল সাম হাউ বাঁচিয়েছিল, সেই রতন ধুরানিগিরি করত—পয়সা রোজগার করে ঠিকঠাক বুক বানাবে বলে। সেই সময় ওর মা ছিল। ধুরপিট্টি করে পয়সা রোজগারের কথা মনেই আসেনি কখনও। কষ্ট করে—যেভাবে হোক মা ওর খরচ চালিয়েছে। বকাঝকা, রাগ-অভিমান সবই ছিল যেন ভালবাসার শরবতের গেলাসে লেবুর রস বিট নুন পুদিনা বাটা। তা ছাড়া অরূপদাও ছিল। সে ছিল মাস্টার লোক। কিডু-ফিডু কিনে দিয়ে পরি-র বহির্দ্বারটিকে 'প্রবেশ দ্বার' বানিয়ে ফেলতে পেরেছিল। সে যা হোক, কোতি-ধুরানি'র জগৎটাকে জেনেছিল পরি। লহরী-ধুরানিদের কথা জেনেছিল, যারা খুচখাচ কাজকম্মো করে, ব্যবসা হোক, ছোটখাটো চাকরি হোক, সাধারণ ছোটখাটো খদ্দের। কেউ-কেউ সোনাগাছি এলাকার মাসিদের সঙ্গে ফিট করে ও-অঞ্চলে সন্ধের দিকটা থাকে। বাট্টুখোরদের সার্ভিস দেয়। এসকর্ট সার্ভিস। কথাটা নতুন শিখেছে। ছোটখাটো রোডসাইড হোটেলেও লহরী-ধুরানি'রা যায়। কেউ-কেউ ভাড়া নিয়ে ট্যুর যায়। দিঘা-বকখালি। যেন দুই বন্ধু বেড়াতে গিয়েছে।

আর এক ধরনের ধুরানি আছে, যাদের নাম 'পৌনে আটটা'। বহু দিন ধরেই এই নামটা চলছে। যারা বাট্টুখোর, পকেটের জোর কম—ওরা বলে আজ একটা 'পৌনে আটটা' তুলব। কলকাতার কিছু হোটেল-বয়, মুটে-মজুর, মোদোমাতাল, বাসের খালাসি—এই সব স্বল্প আয়ের সমকামী মহলে 'পৌনে আট" খুব প্রচলিত শব্দ—যে-শব্দটার বিশেষ এক ধুরানিদের বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

সন্ধের পর কলকাতা ময়দান এলাকায় ঘুরঘুর করে বহু ছুটকো যৌনকর্মী। ওরা মেয়েই। কিছু পুরুষও ঘোরাফেরা করে। এরা আকুয়া নয়। মানে, স্ত্রী-বেশধারী পুরুষ নয়। একেবারেই পুরুষ। কারও হয়তো চলন-বলন সামান্য মেয়েলি। এই পুরুষগুলো নিজেরা খদ্দের নয়। বরং

এদের কাছেই খদ্দের আসে। এরাই হল 'পৌনে আটটা'-র ধুরানি। বোধহয় সন্ধের কিছুক্ষণ পরে দেখা পাওয়া যায় বলে এদের এরকম নাম হয়েছে। এদের চেহারার তেমন কোনও মাধুর্য নেই। এরা 'নাগিন' টাইপ নয়। নাগিন হলে 'পৌনে আটটা' হতে হত না। লহরী হয়ে যেত। গরিব ঘরের ধুরানিরা প্রথম দিকে সঙ্গীদের সঙ্গে 'পৌনে আটটা' হয়েই ধুরানি-জীবন শুরু করে। ওদের পকেটে ভাল লুব্রিকেটিং জেলি-ও থাকে না। স্রেফ ভেসলিন-এই কাজ সারতে হয়। শুধু ময়দান নয়, বাবুঘাট, শিয়ালদা ফ্লাইওভারের নীচে, পার্ক সার্কাস ময়দান এলাকা, হাওড়া ময়দান এলাকায় পৌনে আটটাদের ঠেক। জহুরিরা ঠিকই জহর চিনে নেয়। কোড আছে। কোনও খদ্দের বাদাম খেতে-খেতে যদি কাউকে বলে 'নুন' আছে, সে যদি ধুরানি হয় বলবে 'আছে'। ক'টা বাজে প্রশ্নের উত্তরে কেউ যদি বলে 'ঘড়ি স্লো'—বুঝে নিতে হবে সে ধুরানি। তারপর বাকি কথা। 'আইসক্রিম' মানে শুধু সাকিং। জেলুসিল মানে হাতে নেড়ে মোক্ষণ করা। জেলুসিল হল একটা অ্যাসিডিটি-র ওষুধ। খাবার আগে ওটাকে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়। ওষুধের গায়ে লেখা থাকে 'শেক দ্য বট্‌ল বিফোর ইউজ'। আর পুরো পেনিট্রেটিভ সেক্স-এর কতগুলো সাংকেতিক শব্দ আছে—ট্রামে চড়ব, বাসে চড়ব, জুতো পরব এসব। মোজা আছে তো? মানে, কন্ডোম আছে কি না জানতে চাওয়া হচ্ছে।

বাস-লরি'র খালাসিদের জীবনের স্বপ্ন থাকে ড্রাইভার হওয়ার, সিমেন্ট-বালি সাপ্লায়াররা প্রোমোটার হতে চায়, তেমনই 'পৌনে আটটা'-রাও লহরী হতে চায়। লহরীদের অন্ধকারে ঘুরঘুর করতে হয় না। নিজের একটা ঠেক থাকে। গণিকাপল্লি-ও হতে পারে সেই ঠেক। তারপর লহরীদের ওপরের স্তর হচ্ছে খানদান ধুরানি। গরিব ঘরের ছেলেদের খানদানি ধুরানি হয়ে ওঠা বেশ মুশকিল। ওরা ইংরেজি জানে, দামি পারফিউম মাখে, চলন-বলন আলাদা। এরা 'হাই প্রোফাইল'। শিকস্তি পরি'কে যেটা বলছে, সেটা খানদান ধুরানিগিরি।

শিকস্তি-র ওপর রাগ হল না পরি'র। রাগ হবে কেন? ও তো ভালর জন্যই বলেছিল, পরির ভাল চেয়ে। আর পরি নিজেও জানে, ওর পায়ুটি শুধু মাত্র বাহ্যে নির্গমনের কাজে লাগেনি। অরূপদা তো রীতিমতো প্যাসেজ বড় করার জন্য এবোনাইট 'কিডু' প্রেজেন্ট করত, নিজ হাতে পরিয়েও দিত। অরূপদার কল্যাণেই ও নিজের পেছনটা প্রফেশনাল করতে পেরেছে। কিন্তু ও কখনও ধুরানি হয়নি—মানে 'বাট্টু' বেচে টাকা কামায়নি।

পরি এতক্ষণ চুপ করেছিল বলে শিকস্তি বলল, সরি পরি। হার্ট করলাম বোধহয়। আমি জাস্ট একটা শর্ট কাট ওয়ে বলতে চেয়েছিলাম টু আর্ন মানি। ডোন্ট থিংক আই অ্যাম এ পিম্‌প অর সাম বডি অফ দ্যাট এজেন্সি।

পরি শিকস্তি'র হাত চেপে ধরল।

বলল, ছিঃ, এমন করে ভাবছিস কেন ভাই? আমি কি তাই বলেছি, না কি তাই ভাবছি? তুই আমার ভালর জন্যই বলেছিলি। আমি কী বলেছি যে, করব না। ভাবছি একবার ওকে জিগ্যেস করব কি না।

—কাকে? বয়ফ্রেন্ড'কে? ও কি 'হ্যাঁ' বলবে ভেবেছিস নাকি? আরে ওরা খুব 'পজেসিভ' হয়। এভরিবডি। অল বয়ফ্রেন্ড্‌স।

পরি জিগ্যেস করে, তোর কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই?

—কেন থাকবে না, আছে। নাম্বার অফ।

—সেরকম বয়ফ্রেন্ডের কথা বলছি না, লাভার। একদম নিজের মতো...।

—নো। ডোন্ট হ্যাভ। তোর যে-আছে, সে কি লাভার? চোখ নিচু করে মাথা নাড়ে পরি। যেন একটু লজ্জা।

—তুই খুব সরল পরি। ভাবছিস লাভার। কিন্তু দেখবি, ওর আরও গার্লফ্রেন্ড আছে। বাঁবিওলা নয়, বায়োলজিক্যাল গার্ল। এরা সব বাইসেক্সুয়াল হয়। আমি যতটুকু জানি বললাম। পুরোটা বিশ্বাস করিস না ভাই ওদের।

ওরা এখন এমনভাবে কথা বলছে যেন দুই সই। যেন গত শতাব্দীর দুই অন্তঃপুরবাসিনী কস্টিউম পাল্টে এখানে। যেন ওদের হাতে গঙ্গাজল। যেন ওদের হাতে গাঁদাফুল। পান-খাওয়া ঠোঁটে চুপি-চুপি বলা হয়ে গিয়েছে রজনীবিলাস। গলার আঁচল সরিয়ে একজন দেখিয়ে দিল নখ বিলেখন, তক্ষুনি আঁচল ঢাকা দিল। এবার চুপ। কি লো, কথা কইছিস না যে বড়?

একটু পরেই একজন অন্যজনের কাঁধে হাত দেবে, হাত জড়িয়ে ধরবে। বলবে মিছে কয়েছিলেম গো গঙ্গাজল, ওটা ভালবাসার নখের দাগ নয়, অত্যেচারের। বলেছিলাম কেন আনবাড়ি যাও, তাই। তারপর এক গঙ্গাজলের চোখের জল আঁচলে মুছিয়ে দিচ্ছে অন্য গঙ্গাজল সই।

শিকস্তি বলল, অনেক কষ্ট পেয়েছি রে পরি। বলব পরে। বহু যুগের ওপার হতে একটা হাত এসে শিক-এর নেলপলিশ করা আঙুলের ওপর শুশ্রূষা বোলায়। পরি ওর হাত ধরে।

তুই বিয়ে করবি না শিক? পরি বলে।

—বিয়ে? আই ডোন্ট নো। আগে তো ক্যারিয়ার করি। আই মাস্ট আর্ন এ লট। অনেক রোজগার করব, তারপর ছেলেগুলোকে নাচাব। ছেলেদের কস্টিউম ডিজাইন করব আমি। ছেলে-মডেলগুলোকে র‍্যাম্পে হাঁটাব। ওদের জাঙ্গিয়ার সামনে মড়ার খুলি ছাপ্পা দিয়ে দেব। ওদের আন্ডারগার্মেন্ট ডিজাইন করব—খালি গায়ে জাঙ্গিয়া পরে ছেলেরা র‍্যাম্প-এ হাঁটছে, জাস্ট ইম্যাজিন দা সিন, ছেলেরা খালি গায়ে, কারও সিক্স প্যাক, কারও ফোর প্যাক, পরনে শুধু জাঙ্গিয়া, কারও জাঙ্গিয়ার ওপরে মড়ার খুলি, কারও জাঙ্গিয়ার প্লিটটার ওপর ব্লাডশেড, কারও গায়ে লিখে দেব 'আইপিসি ৪৯৮ কোথাও লেখা থাকবে 'পেন ইজ মাইটার দ্যান সোর্ড' নয়—'পেনিস মাইটার দ্যান শোর্ড'। কেমন হবে বল তো?

—তুই বুঝি নারীবাদী?

—নারীবাদী? ফেমিনিস্ট? আই ডোন্ট নো।

—ছেলেদের ঘেন্না করিস?

—বললাম না, আমার খুব বাজে অভিজ্ঞতা আছে। আমাকে ডিচ করেছে, রেপ করেছে, আমার রিভেঞ্জ নিতে ইচ্ছে করে। তুই বুঝি ছেলেদের খুব ভালবাসিস? অ্যাডমায়ার করিস?

—আমাকেও ডিচ করেছে। অরূপদা। আমাকে পড়াত। ছেলেরা ওরকমই। তবু কী করব? ছেলেদেরই তো বেশি ভাল লাগে। ওদের শরীর...

—তুই অবশ্য খুব একটা ভুল বলিসনি পরি। আমি হেট-ও করি, আবার অ্যাট্রাক্টেড-ও হই। 'লাভ অ্যান্ড হেট' সম্পর্ক। তবে আমি যখন ওদের সঙ্গে সেক্স-এ যাই, আমি অ্যাক্‌টিভ রোল প্লে করি। অ্যান্ড আই গো আপ টু এন্ড। মনে হয়, আমিই রেপ করছি। কেউ-কেউ আগেই দ্য এন্ড করে দেয়, আমি তখন ওদের টিজ করি। খুব ভাল লাগে টিজ করতে।

—সপ্তাহে ক'দিন তুমি তোমার ওই এসকর্ট সার্ভিস করো?

—আমার টার্গেট মাসে টেন থাউজ্যান্ড। তিন দিনেও হয়ে যায়, কখনও চার দিন।

—আমার কি এত রোজগার হবে? তুমি হ'চ্ছো হাই প্রোফাইল...আমি তো ভাল দেখতে না...

—আবার তুমি-তুমি? বি ফ্র্যাংক। তুই।

পরি বলে ঠিক আছে, হয়ে যাবে।

শিকস্তি বলে—কনফেডেনশিয়াল কিন্তু। তোকেই বললাম সব। যদি চাস তো বলবি, আমি কনট্যাক্ট করিয়ে দেব। আর যদি তোর প্রেজেন্ট বয়ফ্রেন্ড ল্যাপটপ-ক্যামেরা কিনে দেয়, তা হলে তো মিটেই গেল।

পরি ওই কথা শুনে একটু হাসল শুধু। চা আর ডিমের ওমলেট ভেজে দিল পরি। ঘরের দরজা খোলা। নারায়ণী মাসি ছাড়াও দু-একজন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। দেখুক। এই হাই স্টেটাসের মেয়েটাকে দেখুক। পরি নিজের জন্যও ওমলেট করেছিল। শিক বলল, খুব ভাল হয়েছে। একটু চিজ স্প্রেড দিলে আরও ভাল হত। চিজ ওমলেট।

পরি আজকাল জানে চিজ, মেয়োনিজ, অয়েস্টার সস এসব হল হাই প্রোফাইল মশলা। মাশরুম, বেবি কর্ন, ব্রোকোলি...।

পরিও একদিন মুড়ি-বাতাসা, কুমড়ো থেকে চিজ মাশরুমে যাবে। কোর্সটা শেষ হোক...।

শিকস্তি বলল, জাস্ট সি পরি, আমরা কী। আমি তোকে কতবার বললাম, কিপ দিস ডায়লগ সিক্রেট। কেন বললাম? আমি অনেক পুরুষের সঙ্গে শুই-টুই এটা জানাতে চাই না। কিন্তু ছেলেদের কাছে এটা প্রাইড। বুক ফুলিয়ে বলে যে, এত ক'টা মেয়ের সঙ্গে শুয়েছি। আমার একটা বয়ফ্রেন্ড কী বলেছিল জানিস? ফিমেল কান্ট মিন্স তালা, জেন্টস কক্ ইজ চাবি।

কোনও তালা যদি তিন-চারটে চাবি দিয়ে খুলে যায়, তা হলে সেই তালাটাকে কী বলা হয়?

—খারাপ তালা।

—আর যদি একটা চাবি দিয়েই চার-পাঁচটা তালাকে খোলা যায়—তখন সেটা 'মাস্টার কি'। তাই না?

—শিট্। 'মাস্টার কি' দু'টো তালা পরপর খুলতে পারে না—তাই নিয়ে গর্ব।

—আমাদের তালাই ভাল, তাই না পরি?

মেয়েটা কী সুন্দর সখী! পরি ওর হাতটাকে মুঠোর মধ্যে নেয় ফের। খুব ভাল লাগল শিকস্তি'র সঙ্গে কথা বলে। ওকে এগিয়ে দিল। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে ওইসব মাছি-ভনভন ছোলা সেদ্ধর পশরা, সাইনবোর্ডের দোকান, যেখানে সবেমাত্র লেখা হয়েছে, টাটকা। 'ফেসিয়াল' ও 'মেসেজ' করা হয়—সেটা দেখল। রঙের ওপর একটা মাছি আটকে গিয়েছে।

চয়নকে কী বলবে? পরি ভাবছে। চয়নদার একটা পারমিশন নেওয়া উচিত নয় কি?

নিজেই ভাবল ফের—কেন জিগ্যেস করবে? চয়ন তো ওকে মাদিবাদি বলে। নিজেও ভাবে অনেক সময়। ওর পারমিশন নিতে যাবে কেন? ওর শরীর, এই শরীরকে কীভাবে ব্যবহার করবে সেটা ওর ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করছে।

রতনের কথা মনে পড়ল আবার। বহু দিন ওর কোনও খবর জানে না পরি। কী সুন্দর সফ্‌ট টয় বানাত রতন। ধুরানি হল। কেউ বলেছে, ও কলকাতায় নেই। মুম্বই চলে গিয়েছে। ওখানে নাকি রোজগার বেশি। কেউ বলেছে, ও গাজা-চরস পাচার চক্রে ফেঁসে গিয়ে জেলখানায় পচছে।

শিকস্তি যেটা বলেছিল, হাই প্রোফাইল এসকর্ট সার্ভিস। মেল। এসব জেনেছে আগেও। যখন পারি 'এলজিবিটি' গ্রুপের মিটিংয়ে গিয়েছে, 'প্রবর্তক'-এর ছেলেদের সঙ্গে আলাপ-টালাপ ছিল, ওদের কাছে বিদেশি পত্রিকা দেখেছিল। মিটিংয়ের পরে তো গুলতানি। নানারকম দেখনদারি। কে কত ভাল পারফিউম কিনেছে, কে ভাল পারিক জুটিয়েছে, কে কোথায় ঘুরে এসেছে এসব জাঁক। ওখানেই কার কাছে বিদেশি পত্রিকা দেখেছিল গে' পত্রিকা। যত দূর মনে হয় পত্রিকার নাম 'NEXT'।

পাতায়-পাতায় পুরুষমানুষের ছবি। কেউ রোমশ, কেউ রোমহীন, কেউ জিন্‌স-এর জিপ খুলে রেখেছে, কেউ জাঙ্গিয়া পরে আছে, ফুলে আছে, জানাচ্ছে নাইন ইঞ্চ কক, কেউ জানাচ্ছে স্মুদ, সফ্‌ট, হেয়ার-ফ্রি স্কিন। কোনও 'গে' লাইভ নেটওয়ার্কে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে—অ্যাব্‌সোলিউটলি বেস্ট ওয়ে টু মিট ম্যান। বিজ্ঞাপনে জানাচ্ছে—কিউট ব্লন্ড বটম বয়, ৫-৮ লুকিং টু স্প্রেড লেগ্‌স। কেউ জানাচ্ছে, আমেরিকান-আফ্রিকান বয়, ২৭, ইজি গোয়িং স্মুদ অ্যাস, সিক্‌স ম্যাচো গাই। কেউ জানাচ্ছে, মি, ককেশিয়ান মেল, হোয়াইট, ক্লিন শেভেন, নাইস ডিক, লুকিং ফর ব্ল্যাক মেল টু সাক মি অ্যান্ড পসিব্‌লি গেট ফাক্‌ড। এরকম কত। টপ-বট্‌ম সবরকম 'গে' এবং 'বাইসেক্সুয়াল'-রা তাদের আবদার, অভিলাষ এবং নিজস্ব সম্পত্তির কথা বলেছে, কেউ ছবি-সুদ্ধু।

কলকাতার কাগজেও তো বিজ্ঞাপন থাকে—'পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে বোল্ড রিলেশন করুন।' 'মেসাজ ক্লিনিক ফর ফল রিলাক্সেশন।' 'হাই প্রোফাইল পুরুষ-মহিলাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব'—এই সব। এখনও ছদ্মবেশে থাকে। ওসব দেশের মতো খোলাখুলি থাকে না হয়তো। এসব জায়গায় নানারকম প্রতারণাও হয় নিশ্চয়ই, নইলে কেন কোনও-কোনও বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে—'প্রতারণা নয়, গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠান, আগে পছন্দ, পরে ফি।'

চয়নকে বলেই ফেলল পরি। বলল—একটা ভাল কানেকশন পেয়েছি। রেগুলার ভাল রোজগার হবে। আমাকে উপুড় হতে হবে। যাব? মেল এসকর্ট সার্ভিস। এসকর্ট বোঝো?

—এসকর্ট বুঝি না, উপুড় হওয়াটা বুঝলাম।

—হ্যাঁ। ঠিকই বুঝেছ।

চয়ন বোধহয় একটু অবাকই হল।

বলল, যাঃ।

—হ্যাঁ গো, সত্যি। কম্পিউটার-ক্যামেরা নিয়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা লাগবে। মায়ের গয়না থেকে কিছুটা বেচে দিচ্ছি। কিন্তু আমার তো একটা ইনকাম দরকার। টিউশনি করে যা হয়, তাতে হবে না।

চয়ন বলল, গরিবের ঘোড়া রোগ যখন হয়েই গিয়েছে, তখন আমি কী বলব বল। আমি তো বলতে পারছি না তোকে কিনে দিতে পারব। আমি তো বলতে পারছি না তোকে মাস

গেলে দু'হাজার করে দেব। যদি ইচ্ছে হয় তো কর। সাবধানে।

—তুমি কিছু মনে করবে না তো? পরির গলা ধরে যায়।

চয়ন বলে, ধুর বোকা। আমি কেন বাধা দেব। আমি বাধা দেওয়ার কে? আমি যেটা করতে পারি, আরও ভাল করে চাকরির চেষ্টা করতে পারি। সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করব। পুলিশেও। পিওনের চাকরিও ছাড়ব না।

ফোন নম্বর দিয়েছিল শিকস্তি। ওরা সদর স্ট্রিটের একটা গেস্ট হাউসের ঠিকানা এবং রুম নম্বর বলে দিল। সময়ও। কথা ছিল দু-হাজার পাবে, কাজ হয়ে গেলে কাউন্টারে ৫০০ টাকা দিয়ে যেতে হবে।

ছেলেটা কি নেপালি? নাগা-মিজো-মণিপুরিও হতে পারে। ওর হাতে উল্কি আঁকা ছিল, কাঁকড়াবিছের। জাঙ্গিয়ার রং ছিল লাল।

পশুর মতো। কুকুরের মতো। ভীষণ লেগেছিল পরি-র। পরি কাতর শব্দ করেছিল। ছেলেটা সেই শব্দ উপভোগ করছিল। পরি'র কাতর শব্দের সময় ও বলছিল, ক্যারি অন, ক্যারি অন। শাউট, শাউট লাউড্‌লি। ছেলেটা যখন জাঙ্গিয়াটা পরল, পরি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ওখানে মৃতের খুলি আঁকা রয়েছে।

দেড় হাজার টাকা পকেটে পুরে ঘরে ফিরল রাত ন'টা নাগাদ।

চয়নদা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

পরি'কে দেখল।

পরি কিছু বলল না। মাথা নিচু করে ঘরে ফিরছে, পিছনে চয়ন।

ঘরে ফিরেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল পরি। বালিশে মুখ।

চয়ন বলল, খুব কষ্ট হয়েছে, না রে পরি?

পরি কাঁদছে।

চয়ন বলল, সবাই কি ঠিকঠাক বোঝে?

চয়ন পরি'র মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

তারপর পরি'র প্যান্টের বেল্ট খুলল। টেনে নামাল প্যান্টটা।

ভেজা রুমালটা দিয়ে মুছিয়ে দিল। বলল, যা-তা ব্যাপার।

খুব যত্ন করে বোরোলিন ঘষে দিচ্ছিল। আস্তে করে।

চয়ন বলল, আর যাস না।

পরি হঠাৎ উঠে বসল।

বলল, না গিয়ে কী করব! যাব। বেশ করব যাব। দেবে তুমি টাকা? দেবে?

দু'হাতে মুখ ঢাকল পরি।

পোড়ামুখী।

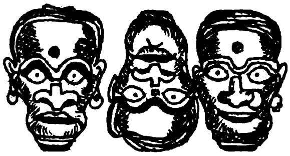

আগের টিভিটা রঙিন হলেও রিমোট ছিল না। টিভির বোতাম টিপে চ্যানেল পাল্টাতে হত। শুক্লার অসুস্থতার পর রিমোট কিনল অনিকেত—যাতে বিছানায় বা চেয়ারে বসেই শুক্লা চ্যানেল পাল্টাতে পারে।

শুক্লার ডান দিকটা ভাল কাজ করছিল না। ডান হাতের জন্য ব্যায়াম শিখিয়ে দিয়েছে ডাক্তার। জল-ভরা বেলুন নিয়ে এসেছে অনিকেত, যার গোপন নাম ইলু-ইলু, যেটা অনেকের কাছে নকল স্তন, সেটা শুক্লার হাতের মুঠোয়। আঙুলে চাপ দিচ্ছে, দেওয়ার চেষ্টা করছে শুক্লা। 'ইলু' এখন ব্যবহৃত হচ্ছে পক্ষাঘাতের চিকিৎসায়। ডান হাতে এখনও গেলাস ধরতে পারে না। একটা চুপ করে বসে থাকা বেড়ালের গায়ে হাত বুলোতে ইচ্ছে করে, পারে না। জানালার গ্রিল ফুঁড়ে আসা চাঁদের আলোয় হাত বুলোতে না-পারলেও হাতটা পেতে দেয়। সারা হাতে চাঁদ লাগে। ইচ্ছে করে সেই চাঁদ অনিকেতের গায়েও মাখিয়ে দিতে। হাতটা ওঠাতে পারে না যে। অনিকেত হাবলুর মতো, কাবলু ছেলের মতো শুক্লার মাথার সামনে চুপচাপ বসে থাকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছেও করে, কিন্তু অনিকেতেরও পক্ষাঘাত। শরীরে নয়, মনে।

বাড়িতে আসার পর, একটু নিজ-হাতে সেবা করার চেষ্টা করছিল, শুক্লা বাঁ হাতটা ভোটের হাত চিহ্নের মতো সামনে ধরেছিল। খুব মৃদু অথচ তেজি দু'টো শব্দ 'ঠিক আছে'—যেন মেলার বেলুন ফাটানোর অব্যর্থ দু'টো গুলি। অনিকেত একদিন বলেছিল—হাতটা ঠিক হয়ে গেলে প্রথমেই তোমার যেটা করা উচিত, তা হল আমাকে একটা চড় মারা। চড়ের বিশেষণ হিসেবে 'ঠাটিয়ে' শব্দ মনে এলেও বলতে পারেনি। কারণ শব্দটার মধ্যে একটু 'ইয়ে' আছে। শুক্লা সামান্য হেসেছিল। স্ট্রোকের পর থেকে হাসতে গেলে শুক্লার মুখটা সামান্য বেঁকে যায়। হাসিগুলো বিদ্রুপের মতো লাগে। আলাদা করে বোঝা যায় না—কোন হাসিটা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের, কোনটা সুখের। দু'টো ঠোঁট সামান্য ফাঁক করে, মুখের কয়েকটি পেশির সংকোচন-প্রসারণে যে-অভিব্যক্তি, তাকেই তো 'হাসি' বলা হয়। হাসি বড় রহস্যময়। মানুষ সুখে হাসে, দুঃখেও, বিদ্রুপে, ঘৃণায়, এমনকী খুন করার পরও। হা-হা-হা অট্টহাস্য কি কেবল যাত্রার? কেবল বেদের মেয়ে জোসনার? জীবনে নেই? 'আমি তোকে বধিব এখুনি'—হা-হা-হা'র মধ্যে যে ধমক ও ধিক্কার, সেটা শুক্লার মৃদু হাসির মধ্যেই নিঃশব্দ হয়ে আছে। এসব ছোট-ছোট হাসি মানে অনেকগুলো 'ফাইল' একটা ফোল্ডারে 'জিপ' করে দেওয়া।

এই যে এখন শুক্লা একটা জল-ভরা বেলুন মুঠোর মধ্যে নিয়ে হাতের ব্যায়াম করছে, আর অনিকেত হাবার মতো বসে দেখছে—শুক্লার মুখে একটা হাসির রেখা। এই হাসির অন্তর্গত রহস্যের কোনও মানে বুঝতে পারছে না, পরবর্তী ব্যায়ামটা হল একটা ইঞ্চি পাঁচেক লম্বা ছিপি-আঁটা জলভরা শিশি, যেটা ঝাঁকাবে। ধীরে-ধীরে ঝাঁকানোর চেষ্টা করবে। যেটা অন্য কেউ করলে অনিকেতের মুখে একটা আদিরসাত্মক হাসি ফুটে উঠত, কিন্তু এখনও ও হাসবে না। বরং তীব্র কনসার্ন নিয়ে দেখবে সাকসেসফুলি ঝাঁকাতে পারছে কি না।

অনিকেত আজকাল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে। আগে দু'বেলাই আয়া ছিল, এখন শুধু দিনের বেলায় আছে। লাঠি ভর করে শুক্লা সামান্য হাটতে পারে। ডান পা-টা চলে না। রান্না করা খাবার গরম করে শুক্লার সামনে দিয়ে দেয় অনিকেত, বাঁ হাতটা সাবান দিয়ে ধুইয়ে দেয়, শুক্লা বাঁ হাতে খায়। কল্পনা মৈত্রর ইস্কুলটা বন্ধ হয়নি। ছাদেই হয়। শুক্লা ওটা বন্ধ করতে চায়নি। তা ছাড়া বাড়ির ভিতরে, বাড়িটার নিস্তব্ধতা ভাঙার কিছু উপাদান থাকা জরুরি ছিল। শুক্লার কানে নামতা পড়ার সুর গানের মতোই লাগবে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার দাপাদাপি, ঝগড়া-বকাঝকা—এসবের মধ্যেই তো প্রাণ, সেই প্রাণের ছোঁয়াটা তো এসে লাগে।

শুক্লা গতবছরে একবারের জন্যও মঞ্জুর কথা ওঠায়নি। কোনও কিছুই জিগ্যেস করেনি। এই জিগ্যেসহীনতা একটা দমবন্ধ অবস্থায় রেখে দিয়েছে অনিকেতকে। জিজ্ঞাসা-চিহ্নর বদলে একটা ফুলস্টপ দিয়ে রেখেছে শুক্লা। এই ফুলস্টপ-টা যেন একটা পাথর। এই ফুলস্টপ-টা এমন এক কৃষ্ণগহ্বর, যা থেকে বিস্ফোরণ হতে পারে, বিগ ব্যাং...। গাদা-গাদা জিজ্ঞাসাচিহ্ন ছুটে বেড়াবে। ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার কিছু দিন পর শুক্লার কাছে একটা স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিল। ভেবেছিল বলবে, ওটা ছিল একটা উদাসীন সঙ্গম, প্রেমহীন। যৌনতার টানও এমন কিছু ছিল না, তবু ঘটে গিয়েছিল। কী করে বলবে তার একটা স্ক্রিপ্টও তৈরি করে রেখেছিল। খুব একটা সিরিয়াস স্ক্রিপ্ট নয়, একটু হালকা ভঙ্গিতে, যার শুরুটা এরকম—একটা ব্যাপার তোমার জানা দরকার শুক্লা, মঞ্জুর সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে কোনও প্রেম নেই। জানোই তো, ও ছিল ছোটবেলার খেলার সঙ্গী। বড়বেলায় দেখা হল, পাকেচক্রে এই বড়বেলায় একটু খেলা হয়ে গেল। বড়দের খেলা। প্ল্যান ছিল না। আসলে ও অনেকবার বলেছে, তোর কাছে বেড়াতে যাব, আমি অ্যাভয়েড করে গিয়েছি, হঠাৎ হাজির হয়ে গেল... কোনও প্রেম নয়, ভালবাসা নয়...।

একদিন স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী শুরু করেছিল অনিকেত। বাক্যটার শেষাংশে 'প্রেম নেই' এর পরিবর্তে 'ইয়ে নেই' বলেছিল, দ্বিতীয় বাক্যটা শুরু করতেই শুক্লার বাঁ হাতটা সাপের মতো এগিয়ে এসে প্রায় ফণা তুলল। ওর বাঁ হাতের সচল পাঁচ আঙুল। শুধু বলল, জানতে চাই না। প্রথম বাক্যটা আবার রিপিট করেছিল অনিকেত, 'জানাটা দরকার শুক্লা...।' শুক্লা তখন মাথা ঝাঁকিয়ে তীব্র স্বরে বলেছিল, একদম কোনও কথা বলবে না এ নিয়ে। একটা কথাও নয়।

সত্যিই এ নিয়ে কোনও অনুযোগ, কোনও তির্যক উক্তি করেনি শুক্লা। যেন মঞ্জু বলে কারও কোনও অস্তিত্বই কোনও দিন পৃথিবীতে ছিল না। মঞ্জু সম্পর্কে নির্মোহতা দেখালেও অনিকেত জানে—শুক্লার মনে মঞ্জু এখনও জীবিত। মঞ্জুর মৃত্যুর কথা শুক্লাকে বলেনি অনিকেত। মঞ্জু মারা যায় শুক্লার সেরেব্রাল স্ট্রোক হওয়ার সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই। শুক্লা তখনও বেশ অসুস্থ। ওর মধ্যে ওসব বলার কথা ওঠেই না। কিন্তু পরেও বলা হয়ে ওঠেনি, কারণ, মঞ্জু-প্রসঙ্গ উত্থাপনই করতে দেয়নি শুক্লা। অফিসের কাজে কখনও দেরি-টেরি হয়ে যায়। শুক্লা কি ভাবে, ও মঞ্জুর সঙ্গে ঘুরছে? আড্ডা ছাড়া মানুষ বাঁচে না কি? আড্ডাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। বাড়িতে মাঝেমধ্যে কেউ-কেউ আসে। এসব আড্ডায় শুক্লা থাকে না কখনও। থাকলে—'মঞ্জু মরে গিয়েছে' এই সুসংবাদটা কায়দা করে দিয়ে দেওয়া যেত। এখন, একটা মৃত্যুর দু'বছর পর—'এই জানো তো, মঞ্জু মরে গিয়েছে' বলা যায় না। একটা মৃত্যুকে কীভাবে উপহার দেবে ভেবে

উঠতে পারেনি অনিকেত এত দিনেও।

টেলিভিশনে ট্রেন দুর্ঘটনার ছবি দেখতে-দেখতে একদিন ভাবছিল বলে দেয়—ইশ, কত শিশু-মা হারা হল, বাপ-হারা হল। মঞ্জুর ছেলেটাও মা-হারা হয়েছে, জানো? বলা হয়নি। কারণ তক্ষুনি অনিকেতের মনে হয়েছিল শুক্লা জিগ্যেস করবে, কে মঞ্জু? কী বলবে তখন অনিকেত।

চেচেনিয়া'তে সুইসাইড বোম বিস্ফোরণ চলছিল, ইরাকে বম্বিং চলছিল। মানুষ মরছিল। তার মধ্যেও মঞ্জুকে গুঁজে দিতে পারত। উদাই আর কোয়াসি হোসেন, সাদ্দামের দুই ছেলেকে মেরে ফেলল আমেরিকা, প্রেসিডেন্ট বুশ হাসিমুখে মৃত্যু ঘোষণা করছেন। শুক্লার সামনে ওরকম হাসি মুখে অন্য এক নারীর মৃত্যু ঘোষণা করার সুযোগ পাচ্ছে না অনিকেত।

কল্পনা মৈত্র যদি বলে দিতেন, ব্যাপারটা অন্য দিকে গড়াত। কল্পনা মৈত্র মনে হয় জানেন ঘটনাটা। নইলে বলেছিলেন কেন—এবার একটু সামলে চলুন। অনিকেত 'কী সামলাবো, কাকে সামলাবো, কেন সামলাবো' এসব নিয়ে কিছু উচ্চবাচ্য করেনি। কল্পনা ম্যাডাম মাঝে-মাঝে দুপুরবেলাটা শুক্লার সঙ্গে গল্প করেন, কখনও সন্ধের সময়ও। অনিকেতের সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হয়। দেখা হলে—কেমন আছেন? ভাল আছেন? ঠিক আছে। যখন বলেন 'সব ঠিকঠাক চলছে তো?'—তখনই মনে হয় কথাটা ঠিকঠাক হল না। অনিকেত একবার বলেছিল, কিছুই তো ঠিকঠাক চলছে না। 'ঠিকঠাক চলা'-টা কি এত সোজা? কল্পনা ম্যাডাম বলেছিলেন, ঠিকঠাক চালাতে গেলে স্টিয়ারিংটা ঠিকঠাক ধরতে জানতে হয়। হয়তো এটা নির্বিষ কথা, একটি নিতান্ত সরল বাক্য। কিন্তু অনিকেতের কাছে ওটা ব্যঞ্জনাময়। এসব মহিলার অনেক যোগাযোগ। অনিকেতের কর্মস্থলের কারও সঙ্গে কি পরিচয় নেই? থাকতেই পারে। ওর অফিসে তো ঘটনা চাপতে পারেনি, বরং পল্লবিত হয়েছে। কেউ-কেউ আড়ালে নিশ্চয়ই বলেছে, এই ভদ্রলোকটির কাজকর্মে ওর স্ত্রী-র স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে।

টিভি চলছে, শুক্লার বোতল ঝাঁকানোর ব্যায়ামটা শেষ। ওর হাতে রিমোট। এবারে ও বোতাম টিপে চ্যানেল পাল্টাবে। এতক্ষণ ধরে 'ম্যায় হুঁ না' সিনেমা হচ্ছিল। শাহরুখ খান।

অনিকেত বলল, জল খাবে?

—উঁহু।

—অনেকক্ষণ জলটল খাওনি। একটু খাও।

—আচ্ছা।

—আজ বেশ গরম।

—হুঁ।

—একটা এসি হলে হত...

—কোনও দরকার নেই।

ব্যস। কথা ফুরিয়ে যায়।

কত দিন শুক্লা বলেছে—কেন সন্ধেবেলায় এখানে ভূতের মতো বসে থাকো, যাও না, অন্য কাজ থাকলে করো না।

কী অন্য কাজ করবে? কাজের লোকেরাই তো করে যায়। তবু মাঝে-মধ্যে গ্রিল মোছে অনিকেত, ফ্রিজ মোছে, এমনকী ঠাকুরের আসনও পরিষ্কার করতে যায়, শুক্লা বাঁ হাত নাড়িয়ে

নিষেধ করে, তোমায় কে বলেছে? ছোঁবে না। আমি মাধবীকে দিয়ে করিয়ে নি'। মাধবী হল আয়াটির নাম।

কী কাজ করবে অনিকেত? ইচ্ছে করলে যেটা লিখছিল, সেটা শেষ করতে পারে। কিন্তু ওসব নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে ইচ্ছে করে না। যত নষ্টের মূল হল ওরা। ওইসব গে-বাইসেক্সুয়াল-ট্রান্সজেন্ডার। ওদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়েই তো মঞ্জুর খোঁজ। ওই মঞ্জুর ছেলে পরিমলকে নিয়ে ওর ভাবনা-চিন্তা শেয়ার করা। কী গাড্ডায় পড়েছিল অনিকেত। এখন অন্য গাড্ডায়। একটা কুয়োর ভিতরে বসে আছে।

যেসব চরিত্র নির্মাণ করেছিল অনিকেত, ওরা অনেকেই ওর হাত ধরে টানাটানি করে, অনিকেত ওদের খিস্তি করে তাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু রাত্তিরে এলে কী করতে পারে? রাত্তিরেই তো ওরা আসে। কারণ রাত্তিরেই তো বিশাল একটা ফাঁকা মাঠ। শুক্লা আর অনিকেত একটা খাটে শোয়, ছয় ফুট বাই সাড়ে ছ'ফুট। ওদের দু'জনের মাঝখানে তিন ফুট ব্যবধান থাকে। আসলে ওটা তিন যোজন। ওদের মাঝখানে একটা বিশাল পতিত জমি পড়ে থাকে। ওখানেই আসে চাক্তারা আসে, ঝুমকো। ময়না'রা নাচে। বহু যুগের ওপর থেকে ঢোলের শব্দ ভেসে আসে। মড়াকান্নার মত গান ভেসে আসে। মাঝে মধ্যে অনিকেত যেন শুনতে পায়—

রেলের গাড়ি চলে গেল নাগর আমার এল না আজ আসি কাল আসি বলে, কেন সে গো আসে না। ঝুমকো কি বিহারের কোন রাজপুত বাড়ির উঠানে? একটা বছর চল্লিশের তাগড়া মরদ গোঁফে চুমড়ি কাটছে। বলছে দুসরা গান গাও, হিলকে হিলকে গাও। চোলিকা পিছে মালুম হায়?—

নতুন কেউ এল নাকি দলে? ওরা সবাই কেমন আছে এখন?

এই তো সেদিন হাসি বলল—তুমি তো জানো আমার আসল পরিচয়, আমার অন্তর, আমার যন্তর। আমার গতরের ঠিকুজিকুষ্ঠি। আমার পেটে বড় ব্যথা। ডাক্তার কিছু করতে পাচ্চে না, খালি ফোটোক তোলাচ্ছে। জেরবার হয়ে গেলাম গো, ছ্যাদা দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, নাচতে পারি না, হেঁপে যাই।

হাসিকে অনিকেত তৈরি করেছিল xx 'মেল' হিসেবে। ওর অপরিণত অণ্ডকোষ দু'টি জন্মাবধি পেটের ভিতরে ছিল। গোনাডোট্রফিন হরমোনের অসামঞ্জস্যের কারণে দু'টো অণ্ডকোষ, তৈরি হয়েছিল, অথচ 'ওভারি' হয়নি। অনিকেত বইপত্রে জেনেছিল—পেটের ভিতরে লুকিয়ে-থাকা অণ্ডকোষ থেকে ক্যানসার হতে পারে একটা সময়। কারও ক্ষেত্রে এরকমটা হয়ে থাকে। হাসির বেচারা অণ্ডকোষ দু'টো গোপনে কোনওক্রমে দীনহীন হয়ে থাকা অক্ষম মাংসদানা দু'টো অকস্মাৎ স্ফীত হতে লাগল। ম্যালিগ্‌ন্যান্ট গ্রোথ। ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওরা বুঝতে পারছে না। একদিন মূত্রছিদ্র দিয়ে রক্তপাত হল। আর ঢোল-কাঁসর বেজে উঠল মহল্লায়। জয় মা বহুচেরা। অ্যাদ্দিনে হাসির মাসিক হয়েছে। ওলো হাসি, আজ তোর খিলুয়া টাঁকবার দিন। নাচ মেয়ে নাচ, তালি মেরে নাচ...।

তিন-চারদিনে মাসিক শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। হাসির চলতেই থাকে। পেটেও ব্যথা। প্রথম-প্রথম মাসিক হলে এরকমই হয়, ওরা শুনেছে। ওদের কারও কোনও দিন ঋতুস্রাব হয়নি,

শুধু স্বপ্ন দেখেছে। হাসির এই রক্তপাত যেন কাঙ্ক্ষিত, যেন স্বপ্নপূরণ। তাই উৎসব। তাই ঢোল বাজে। ঢোলের চাটি অনিকেতের বুকে এসে বাজে। অনিকেত হাসির করুন মুখচ্ছবি দেখে। বলে ভীষণ ব্যথা, পেচ্ছাবও আটকে যায়।

গুরুমা বলেছে—কিছু হয়নি মেয়ে। মা বহুচেরা তোকে পরীক্ষে করচে। রোজ মায়ের পুজো কর, ঢোল পুজো কর, ঠিক হয়ে যাবি।

হাসি'কে লাল চেলি পরানো হয়, খবর পেয়ে হাসি-র পুরনো প্রেমিক আসে এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে, হাসি যন্ত্রণায় মরে।

হাসি গুরুমা'কে বলে—তোমরা যা ভাবছ তা বোধহয় নয়, আমার অন্য কিছু হয়েছে।

গুরুমা চাত্তারাও জানে—ওদের যা কিছু গান সবই ভেল। 'আমায় মেয়্যা করে দাও'—এই প্রার্থনা কখনও কোনও দেব, কোনও দেবী পূরণ করে না, তবু প্রার্থনা করে যেতে হয়। তেল-সিঁদুর, প্রদীপে, খিস্তিতে, মন্ত্রে, হাতের তালিতে যেসব নিয়ম কানুন, তা মেনে চলতে হয়। বিশ্বাস করতে হয়—লিঙ্গ-কর্তনের পর যে বদরক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে গেল, তা হল পুরুষ-রক্ত, এবার ভিতরে নারী-রক্ত তৈরি হবে।

হাসি-র এই শরীর খারাপের মধ্যেও গুরুমা রসিকতা করে—ডাগ্‌তার দেখাবি বলছিস, কোন ডাগ্‌তার দেখাবি লো? মেয়েছেলের ব্যারামের জন্য কোন ডাক্তার যেন দেখায়?

ময়ূরী বলল—গাইনি, গাইনি।

—কত জানিস লো তুই, কত বিদ্যে! কী করে এত রাখিস?

ময়ূরী বলে—ওই তো, গ'য়ের অসুখের ডাক্তার হল গাইনি। এইভাবে মনে রাখি।

ডাক্তার দেখানো হয়। ডাক্তার কী করে জানবে ওর গোপন কথা। ও যে গুপ্ত অণ্ডকোষ ধারণ করে বসে আছে, কী করে জানবে পানাগড়ের সামান্য ডাক্তার। ও বড়জোর আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করাতে পারে। স্ফীত এবং নডিউলার দু'টো মাংসপিণ্ড আন্দাজ করতে পারে এবং স্বাভাবিক ভাবেই এটাকে টিউমার ভাবে।

বাইরে থেকে পেটের তলার দিকটার স্ফীতি দৃশ্যমান হয়। মহল্লার সব রসিকতা করে—তোর পেট হয়েছে হাসি!

এই অবস্থাতেও হাসি মৃদু হাসে।

টিউমার মানে অপারেশন। হিজড়েদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হ্যাপা অনেক। নিতেই চায় না। তারপর কোন ওয়ার্ডে ভর্তি নেবে? 'মেল' না 'ফিমেল'? ওরা 'ফিমেল ওয়ার্ড'-এই ভর্তি হতে চায়। অনেক সময় হয়েও যায়। কিন্তু ডাক্তার-নার্সরা পরীক্ষা করার সময় আবিষ্কার করে ফেলে শাড়ি বা ম্যাক্সির তলায় পুরুষ-লিঙ্গর অস্তিত্ব। ঝামেলা হয়। ঝামেলার ভয়ে অনেক সময় বেডেই দেওয়া হয় না, বারান্দার মেঝেতে ফেলে রাখা হয় এদের।

হাসি হাসপাতালে ভর্তি হয়নি। হোমিওপ্যাথি করেছিল। ওর ক্যানসার ছড়িয়ে গিয়েছিল অন্যান্য অংশে। এরপর যা হওয়ার, মরে গিয়েছিল।

এরপর কান্নাকাটি। সে-ক্রন্দন হৃদয়ের গভীর থেকে যতটা, তার চেয়ে বেশি হল নিয়ম-পালন। রিচুয়াল। কাঁদতে হয় বলে। দুঃখ তো আছেই, এত দিন ধরে সংঘ-জীবন, একসঙ্গে নাচা-গাওয়া-ঝগড়া-গালাগালি রঙ্গরসিকতা হয়েছে। এবার সে আর নেই। সুতরাং ওদেরই তো কাঁদতে হবে। তাই এই কাঁদা পর্ব।

মধ্যরাত্রে বিছানায় অনিকেত এবং শুক্লার মধ্যবর্তী শূন্য মাঠে একটা গ্রাম্যপথ তৈরি হয়ে যায়। শবদেহ ঘিরে চরিত্ররা নিঃশব্দে শ্মশানযাত্রা করে।

কত কিছুই তো লেখা হয়নি। লেখা হয়নি দুলালী আর যাদবের বৃত্তান্ত। লেখা হয়নি মাদক-চালান চক্রে দুলালীর জড়িয়ে পড়ার কথা। দুলালী অর্জিত টাকা জমাচ্ছে গোপনে, ওই টাকা একদিন ওর মা-কে দেবে। ঘরে একটা ছেলে আছে, হয়তো ওর ঔরসজাত নয়, তবু তো ওকে কোলে নিয়েছে, গায়ে মেখেছে শিশুর ওম, শরীরে মেখেছে শিশু-গন্ধ। বাবা ডাক শুনেছে, কাঁধে চেপে ঘুরেছে গাছের ছায়ায়, চাঁদকে বলেছে টিপ দিয়ে যা, হাত ঘুরিয়ে নাড়ু দেওয়ার কথা বলেছে, পাখিকে দেখিয়ে বলেছে আয় রে পাখি ল্যাজ ঝোলা, কোকিলের গলার স্বর নকল করে শিশুকে শুনিয়েছে কু-উ-উ। ওর জন্যও কিছু টাকা নিয়ে যাবে। এবং দুলালীর মৃত্যু-পরিণতি লিখবে।

দুলালী বলে, কি গো—আমার মরণ কাহিনি লিখবে না?

টাকা-চাওয়া হিজড়েদের যেভাবে ভদ্রলোকেরা আঙুলের ইশারায় হঠিয়ে দেয়, সেভাবেই হঠিয়ে দিয়েছে অনিকেত। এদের কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবে না ও।

সোমনাথ এখন মানবী। সার্জারি করেছে। পুরুষসঙ্গী জুটিয়ে কেমন আছে, কেমন চলছে ওর ঘর-সংসার—জানতে ইচ্ছে হলেও ঠোঙা ফাটানোর মতো সেইসব ইচ্ছেকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। ইচ্ছেগুলো শালা টিকটিকির ল্যাজ। কেটে ফেলে দিলেও আবার তৈরি হয়।

অফিসে ভেঙ্কটরমন নামে একজন নতুন ইঞ্জিনিয়র এসেছে। উনি তামিল। ওর কাছে শুনল আরাবানের উপখ্যাস! আরাবান নামে কোনও চরিত্র মহাভারতে আছে বলে জানত না অনিকেত। অর্জুনের এক স্ত্রী ছিল উলুপী, উলুপীর গর্ভে অর্জুনপুত্রর নাম আরাবান। আসলে ইরাবান। ইরাবান বসু রায় নামে একজন প্রবন্ধ লিখতেন। ইরাবান-ই তামিল উচ্চারণে আরাবান। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয় নিশ্চিন্ত করার জন্য পাণ্ডবরা এক জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিল। জ্যোতিষী বলেছিল, যুদ্ধের আগে একজন প্রকৃত-পুরুষকে বলি দিতে হবে। 'আ পারফেক্ট মেল হ্যাজ টু বি স্যাকরিফাইস্‌ড'—ভেঙ্কটরামন বলেছিল। 'পারফেক্ট মেল' মানে? জিজ্ঞাসা করেছিল ভেঙ্কটরমন। অনিকেত বলেছিল, আমি জানি না। তুমি জানো?

ভেঙ্কটরমন বলল, আমিও জানি না, কিন্তু ওরা বোধহয় জানত। অনেক দেখে-শুনে অর্জুনপুত্র আরাবান'কে প্রকৃতপুরুষ ঠিক করে ওকে 'বলি' দেওয়ার জন্য ধরে আনা হল। আরাবান বলল, ঠিক আছে, পাণ্ডবদের জন্য জীবন দিতে রাজি আছি, কিন্তু মৃত্যুর আগে বিয়ে করব।

কোনও মেয়েই আরাবানকে বিয়ে করতে রাজি হল না। কেন হবে, সবাই তো জানে, দু'দিন পরই বিধবা হতে হবে। শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ নারীর বেশে আরাবানের বউ হলেন। আরাবানের মৃত্যুর পর সেই নারী মঙ্গলসূত্র খুলে ফেলল, সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্হিত হল ওর স্তন, ওর নারীত্ব। দক্ষিণ ভারতে অনেক মহিলাই নাকি আরাবানের পুজো করে। পারফেক্ট পুরুষ। এবং পরের দিন এক দিনের বৈধব্যপালন করে।

অনিকেত পরে জেনেছিল—দক্ষিণের হিজড়েরাও আরাবানের পুজো করে। কুডাগামের মন্দিরে জড়ো হয় ওরা, মন্দিরে বড় গোঁফওলা এক পুরুষমূর্তি। হিজড়েরা সঙ্গে নিয়ে আসে

একজন করে পুরুষসঙ্গী। আরাবানের সঙ্গে বিয়ে হয়, পুরোহিতরা মন্ত্র পড়ে মঙ্গলসূত্র পরিয়ে দেয় হিজড়েদের গলায়। নাগারা বাজে, খোল-মৃদঙ্গ।

আরাবানের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর হিজড়েরা পুরুষসঙ্গীকে আরাবান ভেবে নিয়ে ওর সঙ্গেই সহবাস করে।

পরদিন আরাবানের মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়। গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। আরাবানকে একটা রথে বসানো হয়। সেই রথ এক জায়গায় এসে থামে। সেটা 'বলি স্থান'। মূর্তির মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হয় ওর ধড় থেকে।

সেই সময় তুমুল ক্রন্দন করে সমবেত হিজড়ে সকল। কাঁদন পরব। এখানে-ওখানে জ্বলতে থাকে কর্পূরের মতো আগুন। হিজড়েরা মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে ফেলে। চিৎকার করে কাঁদে। সিঁদুর মুছে ফেলে। আর সেই পুরুষ-সঙ্গীটি? আরাবানের মৃত্যু মানে তো ওরও মৃত্যু। একরাত্রের জন্যই আরাবান।

ওই পুরুষসঙ্গীগুলোকে চুপচাপ বাড়ি চলে যেতে হয়। ওদের আর কোনও ভূমিকা নেই।

লেখা হয়নি। এসব কিন্তু লেখা হয়নি।

শুক্লা টিভির চ্যানেল পাল্টাচ্ছে।

এই বছর 'ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ রাইস'। বিশ্ব 'চাল বৎসর'। বক্তৃতা। চালের উপকারিতা। এটা ডিডি বাংলা। ইজরায়েলি রকেট গাজা-তে হানা দিচ্ছে। এটা বিবিসি। অন্য কোথাও দেখাচ্ছে কী একটা রান্না। টেবিলের ওপর আস্ত একটা মোচা। সানফ্রান্সিসকো'তে সমলিঙ্গের বিবাহ অনুমোদিত হল। এ নিয়ে টক-শো। পাল্টাও পাল্টাও। চেচেন প্রেসিডেন্ট ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে মারা গেলেন—উনি যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শহিদ স্মরণ করছিলেন। সার্বিয়াতে হাজার-হাজার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, একটা ট্রেন উড়িয়ে দিয়েছে বিস্ফোরণে। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করা হচ্ছে এক মহিলার দেহ। এক বালক ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল এই নারীশরীরে, যার মুখ ছাই-মাখা, অঙ্গার-মাখা, রক্ত-মাখা। বীভৎস। ক্রন্দন। মৃত্যু। বীভৎস মৃত্যুর পটভূমিতেই কথাটা বলার জন্য শ্বাসগ্রহণ করেছিল অনিকেত, এবং বলেও ফেলল— জানো শুক্লা, মঞ্জু মরে গিয়েছে, ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে। তার আগেই রিমোটের বোতাম টিপে দিয়েছিল শুক্লা। টিভিতে তখন পেলব-মসৃণ-সুন্দর মুখ। মাস্ক মাখা হবে। চন্দন-গোলাপ-হলুদ...।

—মারা গিয়েছে?

শুক্লা ভীষণ আশ্চর্য হয়।

—কী করে? কবে?

—এ তো, তোমার স্ট্রোক হওয়ার পরে-পরেই।

—কী করে?

—ট্রেনের ধাক্কায়। অ্যাক্সিডেন্ট।

শুক্লা তীব্র চোখে তাকায়। অ্যাক্সিডেন্ট, না সুইসাইড?

না, না, অ্যাক্সিডেন্ট। অ্যাক্সিডেন্ট।

চন্দন বাটা গুলবেন গোলাপ জলে। দু'ফোঁটা লেবুর রস মধু, আর মুলতানি মাটি...।

বিকাশ ওর ঘরের ভিতর থেকে হাঁকল—দু'টো ওমলেট কর। ডাব্‌ল ডিমের। তারপরই শুধরে নিয়ে বলল—একটা সিঙ্গল ডিমের। আমার আবার বেশি ডিম-টিম খাওয়া ভাল না।

আজ শনিবার। দুপুর থেকে মেয়েছেলেটা আছে। গত দু-তিন মাস ধরে প্রায়ই আসছে ওই মুখপুড়ি। কাকু ওকে 'পারো' ডাকে। দেবদাস সিনেমার 'পারো'। কাকু বলে, পারো, তুমি কত কী পারো, কতরকম করে পারো... গা জ্বলে যায়।

একসঙ্গে তিনটে ডিম ভাঙল না মন্টু। প্রথমে একটা ডিম ভেঙে একটা ওমলেট ভাজল, তারপর দু'টো ডিম ভেঙে বেশি করে নুন দিয়ে ভাজল। নুনে মুখ পুড়ে যাক। ঘরে বিষ থাকলে, নুন কেন বিষ মিশিয়ে দিত। একদিন ওর জুতোর ভিতরে চেবানো সজনের ডাঁটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল মন্টু। জুতোয় পা ঢুকিয়েই ঢং করে চেঁচিয়ে উঠে কাকুর কাঁধটা খামচে ধরেছিল। পরে দেখা গেল জুতোর ভিতর থেকে চেবানো ডাঁটা বেরিয়েছে।

পারো নিশ্চিন্ত হল। ও বলল, আমি ভাবছিলাম সাপ-টাপের বাচ্চা। পায়ে ঠান্ডা লাগছিল কিনা।

বিকাশ বলেছিল, দুপুরে চেবানো সজনেডাঁটা জুতোর ভিতরে গেল কী করে? ওই মেয়েটা বলেছিল, কাক-টাক—বেড়াল-টেড়াল...।

বিকাশ বলেছিল, বেড়াল তো পুষি না। আর কাক ডাঁটা নিয়ে জুতোয় ঢোকাবে কেন?

মেয়েটা বলেছিল, কে জানে কেন? সাপ-টাপ যে নয়, তাতেই নিশ্চিন্দি। জুতোটা ঝেড়ে পরে নিল।

মেয়েটা নিশ্চয়ই গ্রামের মেয়ে। নইলে জুতোয় সাপের বাচ্চা ঢুকে থাকতে পারে এমন ভাবনা আসতই না। জুতোটাও ছিট-ছিট ভেলভেটের। চামড়ার না। বেশি দামি না। এরা হল কাগজের মেয়ে। মানে, খবর কাগজের। খবর কাগজে 'বান্ধবী চাই বিজ্ঞাপন' দিয়েছিল ওই কাকু। ও ঠিক জানে। ফোনে যখন কথা কইত, সেসব কথাবার্তাতেই ব্যাপারটা বুঝেছে মন্টু। নানা ধরনের নানা রকমের মেয়েছেলে ঘরে ঢুকিয়েছে কাকু। কিছু দিন হল এই মেয়েছেলেটা বেশি-বেশি আসছে। খুব পিরিত হয়েছে। কাঁঠালের আঠা লাগলে পরে ছাড়ে না। তেল দিয়ে ছাড়াতে হয়। বিছানায় বিছুটি পাতা রেখে দিলে দু'জনেরই পিরিত গাধার গর্তে ঢুকে যেত।

ডিমের ওমলেটের প্লেট দু'টো রেখে এল। মামলেট'কে 'ওমলেট' বলা শিখেছে ও-বাড়ির জেঠিমা'র কাছে।

এবার চা বসাবে।

মন্টু শুনতে পাচ্ছে ও ঘরের 'ডাইলগ'।

—ইশ, নুন কটা, ভীষণ নুন।

—কই, আমারটা তো ঠিক আছে!

—জানি তোমারটা ঠিক আছে, কিন্তু ডিমে খুব নুন।

—কই দেখি, দাও একটু।

নিশ্চয়ই এবার একটু ছিঁড়ে খাইয়ে দিয়েছে।

—হ্যাঁ, তাই তো। কিন্তু আমার ওমলেট'টায় কিন্তু ঠিক ছিল। তোমারটায় বেশি হল কী করে?

—মন্টু... অ্যাই মন্টু...। এত নুন হল কী করে?

মন্টু ও-ঘরে গেল। মাথা চুলকে বলল, দিদিমণি তো একটু বেশি নুন খান, তাই ওঁরটা আলাদা করে বানিয়েছি।

—একটু বেশি? মুখে দেওয়া যাচ্ছে না। গাদাখানেক নুন ঢেলেছিস। মারব ঠেসে একটা থাবড়া।

পারো-দিদিমণি বলল—ঠিক আছে—ঠিক আছে। বোধহয় দু'বার দিয়ে দিয়েছে। নুন একটু বেশি খাই সত্যি কথা। একটু বেশি করে দু'বার দিয়ে দিয়েছে হয়তো।

বিকাশকাকু পারো-দিদিমণিকে বলল, ওটা খেতে হবে না তোমার। অ্যাই মন্টু, আবার তৈরি কর। ভাল করে কর।

মন্টু আবার মাথা চুলকোয়। ফ্রিজে আর ডিম নেই।

—ডিম নেই? তবে নিয়ে আয় গে যা।

—না, না, দোকানে যেতে হবে না। চা হলেই হবে।

—শুধু চা খাবে কেন?

—চায়ের সঙ্গে কিছু লাগে না আমার।

—চায়ের সঙ্গে লাগে না? মালের সঙ্গে লাগে, তাই না?

মেয়েরটা ঢঙির মতো মুখ নাড়ায়।

—দ্যাখ তো সেউই ভাজা আছে কি না...।

সেউই ছিল বয়ামে। এনে দেয়। কাজুও কেনে বিকাশ। কাজু মন্টুর জিম্মায় রাখে না। মন্টু লোভ সামলাতে পারে না, টুকটাক খেয়ে নেয়। কাজু ঘরেই রাখে। বোধহয় নেই। তা হলে নিজেই বের করে দিত। থাকবে কী করে? দুপুরে তো একপ্রস্থ বিয়ার খাওয়া হয়েছে। দরজা বন্ধ করে। ওই তো, তিনটে বোতল কেতরে পড়ে আছে। দু'প্যাকেট বিরিয়ানিও আনিয়েছিল। ওই তো, ঘরের কোনায় প্যাকেট দু'টো পড়ে আছে।

এই মেয়েটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না মন্টু। মন্টুকে অর্ডার করে। অর্ডার করো, কিন্তু এমন টোন দিচ্ছো যেন তুমি এ বাড়ির কাকিমা। মন্টুর সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিল কাকু, তখনই হেসেছিল। একে পেলেন কোথায়? ওকে দিয়ে আপনার সব কাজ হয়ে যায়, তাই না? হি হি হি। তখন, ও কাকুকে 'আপনি' করে বলত। এখন তো আদেখলাপনা করে 'তুমি'-'তুমি' করে। বলেছিল, তোর নাম মন্টু না মিন্টু?

—কেন? মিন্টু হলে কী হত?

—মিন্টুর সঙ্গে ইন্টুপিন্টু খুব ভাল মিলত। গাইতে পারিস?

কোনও জবাব দেয়নি মন্টু। দেবে কেন?

—নাচতে পারিস?

তুই নাচ। পুটকিতে রস হয়েছে খুব। মনে-মনে বলেছিল মন্টু।

'পারো' বলে ডাকে বলে তুই কি ঐশ্বর্য রাই নাকি? না কি শতাব্দী, না রূপা গাঙ্গুলি? তোর নাম নিশ্চয়ই পারুল। পারুল গাঁয়ের মেয়েদের নাম হয়। আমাদের গাঁয়েও পারুল ছিল। ও ছিল হাবি। কথা কইতে পারত না।

একদিন মেয়েটাকে বিকাশের জামায় বোতাম লাগাতে দেখেছে মন্টু। কেন, ও তো বাইরের লোক? লাগালাগির কাজে এসেছিস, কাজ করে চলে যা। দরদ দেখাচ্ছিস কেন? বোতাম তো আমিই সেলাই করে দি'। কাকুর মাথাও টিপে দেয় নিজের কোলের ওপর মাথাটা তুলে। বহুত পয়সা খিঁচে নেয়। এমনিতে কত রেট কে জানে, যাওয়ার সময় ব্লাউজের ফাঁকে টাকা গুঁজে দেয়। ভাঁজ করা থাকে তো, তাই বোঝা যায় না কত। একদম ভেড়ুয়া বানিয়ে রেখেছে কাকুকে। ফার্স্ট দিন থেকেই এই হারামজাদিকে ভাল লাগেনি মন্টুর। ওপর-পড়া। মন্টুর সামনেই কাকুর থুতনি নাড়িয়ে দিয়েছিল মেয়েটা। ওরা যখন ঘরে ঢুকে থাকে, ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ থাকে। এসি চলে। এসি-টা গররগরর শব্দ করে, আসলে গোঁঙায়। কেঁদে মরে। এ বাড়ির মরা ছেলেটার জন্য। বেসিনের জলের কল ছ্যারছ্যার করে ছিছি দেয়।

বন্ধ দরজার গায়ে কান লাগিয়ে অসভ্য-কথা শুনেছে, অনেক অসভ্য-কথা, আর গা জ্বলে গিয়েছে মন্টুর।

মন্টু চা করল। এই মাগিটা দুধ চা খায়, কাকু লিকার।

লিকারে একটু দুধ মিশিয়ে চিনি দিয়ে 'থুক' করে চায়ের কাপে একটু থুথু ফেলে দিল মন্টু। চামচ দিয়ে নেড়ে দিল। মেয়েছেলেটাকে দিয়ে এল। নিন, দুধ চা। রান্নাঘরে এসে চামচটা ভাল করে ধুয়ে নিল। এবার কাকুর চায়ে অল্প চিনি।

ঘরে গিয়ে মন্টু দেখল, কাকু ওই চা-টা খাচ্ছে। ওই থুতুমারা চা।

মন্টু বলল, সে কী, আপনার তো লিকার।

বিকাশ বলল, আমার দুধ-চা খেতে ইচ্ছে করল যে, কত লিকার খাব।

পারো বলল, একযাত্রায় পৃথক ফল কেন?

কী থেকে কী হয়ে গেল। ঠিক হয়নি, পাপ হল। মন্টুর খুব মন খারাপ।

মন্টুও খায়। সব সময় নিজের ইচ্ছেয় খায় তা নয়, কাকুও মুখে পুরে দেয়। অসুখও করেছিল গলায়। কোত্থেকে অসুখ নিয়ে এসেছিল, ফোনে গল্প করতে-করতে কাকে যেন বলেছিল, পেন ড্রাইভ-এ তো ভাইরাস আসবেই। মন্টুকেও একবার বলেছে মাল খেয়ে এই একই কথা। এটা কম্পিউটারের কথা, কিন্তু এর মানে মন্টুও বোঝে।

অনিকেত জেঠু তখন বড় ডাক্তার দেখিয়ে দিয়েছিল। ইনজেকশন নিতে হয়েছিল। কাকুকেও ইনজেকশন নিতে হয়েছিল। তারপর অনেক দিন ওসব বন্ধ ছিল। তারপর আবার। অবশ্য মোজা পরিয়ে। ওই রবারের গায়ে আবার আইসক্রিমের গন্ধ।

তখন বিকাশকাকু মন্টুর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কাকু ওকে ভালবাসে। কাকু তত্ত্বতালাশ নেয়—খেয়েছিস তো? বাজার থেকে মাছ কাটিয়ে আনলে পিস ছোট-বড় করে না। সব এক সাইজের পিস কাটিয়ে আনে। একদম অনিকেত জেঠুর বাড়ির মতো।

মিত্তিরবাবুর ড্রাইভারের নাম লাল্টু। লাল্টুর সঙ্গে কথাবার্তা হয় মন্টুর। লাল্টু শুধু গাড়ি

চালায় না, মিত্তিরবাবুর আরও অনেক কাজ করে, বাজারও করে। ওদের বাড়িতেই থাকে। এখনও বে-থা করেনি কিনা। ও বলেছে, মাছের পিসগুলো মাঝখান দিয়ে কাটা হয় ওর জন্য আর রান্না মাসির জন্য। রান্নার মাসিই মাছের টুকরোগুলো হাফ করে নিজের হাতে। করতে হয়।

মন্টু তো সেম-সেম মাছ পায়। সেম-সেম চালের ভাত। লুচি হলে সেম-সেম লুচি।

কিন্তু সেই বিকাশকাকুকে থুতু খাওয়াল মন্টু?

ইচ্ছে করে তো নয়...।

তা ছাড়া চুমু তো থুতু-মাখানোই হয়। কাকু কোনও দিন চুমু খায়নি মন্টুকে। এখন থুতু খাচ্ছেনা তাহলে, চুমু খাচ্ছে। চুমু!

পরির ঘরে নূপুর এসেছিল ল্যাপটপ-টা দেখতে। পরি শুধু আঙুলের ছোঁয়ায় একটা মডেলের পোশাকের রং পাল্টে দিচ্ছিল। পরি বলছিল, এই দ্যাখ, আর একটু ঝুলিয়ে দিচ্ছি টপ-টা। হাঁটুর একটু ওপরে। একটা বর্ডার লাইন বসিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়, যাকে বলে পাড়। কী পাড় দেব নূপুর?

নূপুর বলে, বেগুনি।

বেগুনি করে দেয় পরি।

নূপুর বলে কমলা।

কমলা রঙেরই পাড় হয়ে যায়।

নূপুর বলে আমাকে তোর ওই যন্তরটার মধ্যে ঢুকিয়ে নে। তারপর খুব সুন্দরী বানিয়ে, সাজিয়ে আমায় বের করে দে। দে না রে-এ-এ...

—সুন্দরী হলে কী করবি তুই?

—তা হলে 'মেসাজ' করা ছেড়ে দিতাম।

নূপুর এখন 'ম্যাসেজ' নয়, 'মেসাজ'-ই বলছে।

—কেন মেসাজ ছেড়ে দিতি নূপুর?

—ধুর, আর ভাল লাগে নাকি? ভাল না-লাগলেও অন্যের গা চটকানো। এক ঘণ্টা চটকে যা পাই—তার হাফ কেটে কোম্পানি আমায় দেয়।

—কোম্পানি?

—ওই আর কী।

নূপুর হিহি হাসে। নূপুর মতোই বাজে, পরির গায়ে ঢলে পড়ে।

—পার্লার-টার্লার না-বলে 'কোম্পানি' বলতে ভাল লাগে। রিকশাওলারা যেমন নিজেদের 'পাইলট' বলে। হিহি।

পরিও হাসে।

বলে, যা বলেছিস মাইরি, দালাল যেমন এজেন্ট।

নূপুর বলল, সুজি যেমন মোহনভোগ।

পরি হাত নেড়ে বলল—না রে, সুজি ভেজে ঘি-কিশমিশ বাদাম-চিনি মিশিয়ে, তার সঙ্গে ভালবাসা আর বউ-বউ ভাব মিশিয়ে মিঠিন-মিঠিন শব্দ করা খুন্তি নাড়িয়ে যেটা তৈরি হয়, সেটা হল 'মোহনভোগ'। আজ জলে সেদ্ধ করে ভক করে একমুঠো চিনি ফেলে ঝক ক্করে ক'টা কিশমিশ ছড়িয়ে ঠ্যাঙোর-ঠ্যাঙোর খুন্তি ঘষে যেটা তৈরি হল—সেটার নাম কী জানিস? 'হালুয়া'।

আবার দুই সখি হেসে গড়ায়।

পরি বলে—সুন্দরী হয়ে না-হয় মেসাজের কাজ ছেড়ে দিলি, তারপর কী কাজ করবি?

—কেন, মডেলের কাজ...?

—ওটাও কি ভাল লাগত, রংচং মেখে, আজব-আজব পোশাক পরে র‍্যাম্পে হেঁটে বেড়ানো? বুকের খাঁজে দাদের মলমের কৌটো রেখে ছবি তোলা, শর্ট প্যান্টের সঙ্গে হাওয়াই চটি পরে নাচা, ভাল লাগবে তোর?

—হ্যাঁ, ভাল লাগবে। পয়সা তো বেশি।

—বেশি পয়সা তো পার্লারেও আছে। এক্সট্রা-অ্যাসাইনমেন্ট নিলেই তো পয়সা।

—পা ফাঁক করার কথা বলছিস তো পরি? তাতেই-বা কী পয়সা। আমাদের ওখানেও জাতবিচার আছে। ছেলেরা যতই বলুক না কেন, খেঁদি পেঁচি নুরজাহান অন্ধকারে সব সমান—সমান নয়। এই আমি, যদি গলিতে দাঁড়াতাম, একরকম পয়সা, বিউটি কেয়ার প্রফেশনে থাকলে আরও একটু বেশি, দু'টো সিরিয়ালে নায়িকার বান্ধবীর অভিনয় করতে পারলে আর একটু বেশি। মডেল খুব উঁচু জাত। আমার কি আর মডেল হওয়া হবে? ফিগার করতে হবে। অ্যাই পরি, তুই তো মডেল নিয়ে কারবার করিস। আমার ফিগারটা কেমন রে? সত্যি কথা বল।

—কেন, ভালই তো বেশ। পরি বলে। আমার চেয়ে অনেক ভাল।

—কোমরটা ঠিক আছে?

ম্যাক্সিটা উঠিয়ে সামনে দাঁড়ায় নূপুর। নাভিতে সামান্য স্পর্শ দিয়ে পরি বলে, ভালই তো। কোনও চর্বি নেই।

—চর্বি হবে কোত্থেকে রে পরি? কী খাই? যা রোজগার করি, সংসারে গাদাই। বাপের ওষুধের পেছনে গুচ্ছের টাকা। মাসে এক হাজার করে স্যাকরার দোকানে জমা হয়। বিয়ের গয়না। গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল।

একটা 'লাভার' পাওয়া সত্যি-সত্যি মুশকিল। বয়ফ্রেন্ড জোটে, 'লাভার' হয় না। মা ঘটক লাগিয়েছে। আমরা যদি বস্তিতে না-থেকে ভদ্রবাড়িতে থাকতাম, তা হলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন হত 'পাত্রী স্লিম, সুন্দরী, বিউটিশিয়ান'। ঘটক ব্যাটা 'বিউটিশিয়ান' মানে বোঝে? অচেনা ব্যাটাছেলের সঙ্গে পয়সার জন্য তো কত কিছুই করেছি, করি, কিন্তু বিয়ে করা যায়, বল? তোর কী ভাগ্যি রে পরি, তুই একটা 'লাভার' পেয়েছিস।

পরি বলে, কে জানে কতটা লাভার, ওদের চেনা খুব মুশকিল। ইস্কুলে সংস্কৃত থেকে বাংলা ট্রানস্লেশন ছিল না—কী যেন... স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যা—একদম বাজে

কথা। এখন তো গদগদ ভাব দেখাচ্ছে, চাকরি পেলেই অন্য রূপ ধারণ করবে। কিচ্ছু বলা যায় না। বিয়ের পিঁড়িতে বসে যাবে, বেশ টুকটুকে বউ, ঠিক জায়গায় ঠিক ছ্যাঁদা, বলবে বাড়ি থেকে দিয়ে দিল, কী করব।

পরি এরপর এক কাণ্ড করে। আলমারির ভিতরে রাখা গয়নার পুঁটুলিটা থেকে একটা হার পরে, দুল। বলে, আমাকে কেমন লাগছে রে নূপুর ?

চয়ন মাথা চাপড়ে বলল, চাকরিটা হল না মাইরি।

পরি বলল, আরে, এত মুষড়ে পড়ার কী হল। চাকরি কি এত সহজ নাকি?

চয়নের চোখটা লাল। পরি দেখল। শরীর খারাপ? জিগ্যেস করল পরি।

চয়ন ঘাড় নাড়ল। বলল, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণা, আর আত্মধিক্কারে।

—আত্মধিক্কারে মাথা ধরে না, তা হলে তো আমার সব সময় মাথা ধরেই থাকত। আজ তো খুব রোদ্দুর, এজন্য। বাইরে ঘুরেছ খুব, তাই না।

—হুঁ।

বাড়িতে থাকলে কোলে মাথা রেখে টিপে দিতাম। চলো কফি খাই।

ক্লাসের পর দেখা করতে এসেছে চয়ন। কলেজের সামনে থাকে না। ফোনে জায়গা ঠিক করে নেয়। কোনও দিন সাউথ সিটি মল, কোনও দিন সেন্ট্রাল পার্ক, কয়েকবার শিয়ালদার প্রাচী সিনেমা হল-এর সামনের ফুট ব্রিজের ওপর। রাস্তার এপার থেকে ওপারে যাওয়ার জন্য বানানো হয়েছিল, কিন্তু কেউ ব্যবহার করে না। ওরা রেলিং-এ হেলান দিয়ে গল্প করত, নীচে বয়ে যেত কলকাতা। একবার পুলিশ ধরেছিল, মুচিপাড়া থানায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সেই পুলিশটা সম্ভবত বিহারের। ও আইপিসি ৩৭৭ ধারা জানে না, ও জানে 'লন্ডা' আইন। কেন থানায় যাব—জিগ্যেস করাতে চয়নকে বলেছিল—ওপেন মে লন্ডাবাজি করতে হ্যায় তুম, এগেনস্ট লন্ডা-ল। উয় পুরো লেড়কি হোতে তো কুছ নেহি বলতে। শেষ পর্যন্ত কুড়ি টাকায় রফা হয়েছিল। সেই থেকে ওরা ওধারে যায় না। এখানে কেউ কিছু বলে না।

পরি 'ক্যাফে কফি ডে'-তে নিয়ে গেল। এই সব নতুন ডিজাইনের চা-কফির দোকান হয়েছে আজকাল। ভানুদার কেবিন কানুদার কেবিনগুলো ক্রমশ উঠে যাচ্ছে—যেখানে চা-টোস্ট খেতে-খেতে অনেকক্ষণ আড্ডা মারা যেত। কিন্তু এসব জায়গায় চা-কফির দাম অনেক বেশি। তবু সেফ।

গোল-গোল টেবিল। চারজন বসা যায়। কাচের দেওয়ালের বাইরে শব্দময় ছুটন্ত শহর। কাচের দেওয়ালে এধারে তরুণ-তরুণীদের নিজস্ব শব্দ।

পরি ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ-টা বার করে টেবিলে রাখল। অন করল। নীল রঙে ভেসে উঠল উইনডোজ।

পাসওয়ার্ড দিল পরি। ছ'টা তারা ফুটে উঠল।

—কী লিখলাম বলো তো চয়ন।

চয়ন বলল, তোর পাসওয়ার্ড আমি কী করে জানব?

—জানো, তুমি জানো।

চয়ন ঠোঁট কামড়ায়।

পরি তারাগুলো মুছে দেয়।

এবার চয়নের দিকে ল্যাপটপ-টা ঘুরিয়ে দিয়ে বলে, তোমার নামটা টাইপ করো... সি এইচ... চয়ন টাইপ করে। ও সামান্য কিছু কম্পিউটার জানে। 'এন্টার' মারে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে সুরমূর্চ্ছনা, এবং জানালা খুলে যায়।

—আমার নামে পাসওয়ার্ড করেছিস তুই? যদি সব খুলে দেখে নি?

—খুলো...তুমিই তো খুলবে...। মুখ টিপে হাসে পরি।

চয়ন দু-একটা ফাইল খোলে। ডাউনলোড করা কী সব। ক্রুজো, ফাইবার, সালা...

—সালা কি রে?

—ওটা একটা ফ্রেঞ্চ অ্যাবরিভিয়েশন। এস এ এল এ। সিগনেচার কস্টিউম বোঝায়। মানে হচ্ছে, যে-পোশাক কারও ক্যারেক্টার বা প্রফেশন'কে রিপ্রেজেন্ট করে। একজন বুরোক্র্যাট বা একজন পেইন্টার'কে কস্টিউম দেখেই বোঝা যায়। উকিলদের আলাদা পোশাক। যারা ম্যাচো গে, টপ—ওরাও অনেকে চায় ওদের সিগনেচার কস্টিউম। কিন্তু চয়ন, তুমি হলে ছুপা। তোমায় দেখে কেউ বলবে না তুমি 'গে', তুমি 'টপ'। দিব্বি পাঁচ পাবলিকের মতো দেখতে, মাথায় টোপর পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসার মতো লুক, শাশুড়িকে দেখে লজ্জায় হাবা। কে বলবে, তুমি উল্টে খেতে জানো? তোমার উচিত সোল্ডার মাস্‌ল-এ ট্যাটু করা, সফ্ট ফাইবারের গেঞ্জি, এমন ট্রাউজার, যাতে ওই জায়গাটা বেশ ফোলা-ফোলা দেখায়...।

চয়ন বলে—ওরকম পার্টি পেয়েছিস না কি রে পরি, কাঁধে উল্কি, ফোলা-ফোলা বাইসেপ?

—হ্যাঁ, পেয়েছি তো।

—খুব শক্তি ফলায়... না? খুব চেপে ধরে?

পরি কিছু বলে না।

—খুব লাগে? মানে খুব হাঁসফাঁস লাগে, তাই না?

পরি ব্রীড়াবনত মুখ মৃদু নাড়ে দু'বার।

—এবার ছেড়ে দে পরি। কম্পিউটার তো হয়ে গিয়েছে। ক্যামেরাও। আর কী দরকার, এসব করে?

—ক্যামেরা কই হল? মায়ের সোনা আমি নষ্ট করব না। ওগুলো আমার জন্য রেখে গিয়েছে মা। ওগুলো আমি পরব।

চয়ন বলল, ঠিক আছে, ক্যামেরা কত দাম? আট-দশ হাজারে হয়ে যাবে না? আমি কিনে দিচ্ছি, ইনস্টলমেন্টে কিনে দেব, মাসে দু'শো করে দিলেই হয়ে যাবে। আমি পারব। তুই অন্য ছেলেদের কাছে যাস না।

—হিংসে হচ্ছে, তাই না চয়নদা?

—তা তো একটু হচ্ছেই। কিন্তু খারাপও লাগছে। এভাবে...

—এভাবে কী? শুয়ে টাকা কামাচ্ছি বলে? এটাও স্ট্রাগ্‌ল। যদি প্রফেশনে নাম করি, লোককে গর্ব করে বলব আমি এভাবে লড়াই করেছি। ছেড়ে দাও চয়নদা। তোমাকে ক্যামেরা কিনে দিতে হবে না। ওটা আমিই বুঝে নেব।

—কন্ডোম নিস তো?

—হ্যাঁ। ওসব সেফ্‌টি আমি নি। তোমার কোনও রিস্ক নেই।

—আমার রিস্কের কথা হচ্ছে না, আগে তো তোর নিজের রিস্ক।

পরি বলল, ধরো আমার এইড্‌স হয়ে গেল, তখন তুমি ফুটে যাবে, তাই না?

—কেন ওসব নাম মুখে আনছিস ওসব হবে কেন? সেফ থাকবি...।

—এড়িয়ে গেলে। জানি তুমি ফুটে যাবে। তোমার ফুটতে হবে না। আমিই তোমাকে নিষেধ করব তখন।

—বাজে কথা রাখ তো। ব্যাপারটা লাইট কর।

—না, ঠিক আছে। যদি রাধার এইড্‌স হত, রাধা কী করত? কৃষ্ণকে ঘেঁষতে দিত? ওর তো নিজ অঙ্গ প্রীতি ইচ্ছে ছিল না, কেবল কৃষ্ণ অঙ্গ প্রীতি ইচ্ছে। রাধা তখন অন্যভাবে কৃষ্ণকে তুষ্ট করত।

চয়ন বলল, থাম তো।

ব্ল্যাক কফি এসে গিয়েছিল, আর ছোট কেক।

চয়ন বলল, তোর এখন খুব পার্সোনালিটি হয়েছে পরি। ভালই লাগছে। নিজের সিদ্ধান্তে স্টিক করছিস। কর। তোর কোনও ক্লায়েন্টের সঙ্গে আবার স্পেশাল বন্ধুত্ব করে বসিস না যেন। তা হলে দুঃখ পাব।

—জেলাস হবে?

—হ্যাঁ।

পরি বেশ খুশি হল যেন। ওর মুখে হঠাৎ এক ঝলক আলো যেন। জেলাস হওয়া তো ভালবাসার একটা সিম্পটম।

পরি বলল, নো স্পেশাল রিলেশন। নো কোয়েশ্চেন অফ।

—ঠিক তো?

মাথা দু'বার নাড়ায় পরি। দু'পাশে। মানে একদম ঠিক।

চয়ন বলে, তা হলে একটা গল্প শোন, চারজন 'গে' একটা বার-এ গিয়েছে। একটাই বসার টুল। ওরা করল কি টুলটাকে উল্টে দিল। তারপর চারটে পায়ার উপর চারজন বাট্টু ঠেকিয়ে বসে গেল। মাল খাওয়া হওয়ার পর আবার টুল উল্টে, টুলটা যেমন ছিল রেখে চলে গেল।

জোক্‌-টা শুনে পরি-র পুরুষালি স্মার্টনেস ধ্বসে গেল। হাতটা বেঁকিয়ে, ভ্রুভঙ্গি করে চয়নের গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল—যাঃ।

পরি দু'টো ছোট চুমুক দিল। বলল, এত কড়া কফি খেতে পারি না। তুমি তো আঁতেল, কড়া কফি খাও, তাই 'ব্ল্যাক' বলেছিলাম।

এবার কী একটা মনে করে পরি একা-একা হাসতে লাগল।

চয়ন বলল, এখনও হাসছিস যে, খুব মজা লেগেছে, না?

পরি বলল, না, অন্য একটা কথা মনে পড়ল। টনি। বলছিলাম না, কাঁধে ট্যাটু, বাইসেপ-এ ট্যাটু, ওর নাম নাকি টনি। মজার জোক বলে। বলছিল, হোয়াট ডাজ হ্যাভ আ গে-ম্যান অ্যান্ড অ্যান অ্যাম্বুলেন্স কমন? দে বোথ গেট লোডেড ফ্রম দি ব্যাক অ্যান্ড গো Whoo-Whoo...।

চয়ন গম্ভীর হয়ে গেল।

একটু পরে বলল, শোন পরি, যেভাবে পয়সা কামাচ্ছিস, ওটা ঠিক না। ওটা প্রস্টিটিউশন। তুই অন্য কিছুও তো করতে পারিস সাইডে।

কী করব বলো? কী পারি আমি? কুঁতিয়ে কাঁতিয়ে দু'টো কবিতা লিখলে পয়সা আসবে?

চয়ন বলল, না, ধর, বিউটিশিয়ান'স কোর্স করে নিলি এক মাসের। ওতেও তো পয়সা আছে, কিংবা ধর মেক-আপ ম্যানের কোর্স...।

পরি চয়নের দিকে সোজা তাকাল। ব্ল্যাক কফির সঙ্গে মানায়, এমন গলায় বলল, বুঝলাম।

শিকস্তি বলল, এই যে পরি, তোর বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে এত 'ডিপ' ছিলি, যে, আমাদের দেখতেই পেলি না? আমরা তো তোদের প্রায় পিছনেই ছিলাম। হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রবেলম?

—কেন? প্রবলেম কেন?

—আরে, তোর মুখের শেড পাল্টাচ্ছিল যে, অবজার্ভ করছিলাম।

—না, কিছু না।

—তুই ওকে নিশ্চয়ই সব বলেছিস...

—হুঁ।

—টেক ইট ইজি বলেনি ও?

—উঁহু...।

—বলে কখনও? নিজে চাকরি জোগাড় করেছে?

—না।

—তোর পয়সায় খাবে বসে-বসে। ইনডাল্‌জ করিস না পরি। বল না ওকে রোজগার করতে।

—টিউশনি করে তো। বলছিল ক্যামেরা কিনে দেবে ইনস্টলমেন্টে।

—ধুর, টিউশনি করে ক'পয়সা? ওকে 'জিগালো'-র কাজ করতে বল। পয়সা আছে। কানেকশন আমি দেব। আজকের কাগজেও তিনটে অ্যাড আছে: লোননি প্রেটি উওমেন সিক্‌স বয়ফ্রেন্ড...

এটা আশা করেনি পরি। জিগালো হবে চয়ন?

—কি রে পরি, ভাল লাগল না কথাটা?

—না রে, ও পারবে না। ও কি টনিদের মতো মাচো? ও রোজ-রোজ পারবে না।

—কে বলল, পারবে না? ইঁদুরের মতো চেহারার পুরুষমানুষকে দেখেছি একটার-পর-একটা শট দিয়ে যাচ্ছে।

—ওরা ওষুধ-টসুধ খায়, কিংবা হরমোন নেয়। আমি তো নিজেকে দিয়েই...।

কথা শেষ করে না পরি।

পরি বলতে চেয়েছিল নিজের অভিজ্ঞতায় ও বুঝেছে। আসলে পরি তো বায়োলজিকালি 'বাঁবি'-সম্পন্ন পুরুষ। ও যখন নিজস্ব পায়ু দান করে, লিঙ্গ ঘর্ষণে অস্ত্রের পর্দার বাইরে অবস্থানরত প্রস্টেট গ্ল্যান্ডটায় সুখানুভূতি পায়, কিন্তু চরম পর্যায়ে যা ক্ষরিত হয়, তা বীর্যক্ষরণ-ই, তাতে শুক্রকীট সংখ্যা কম থাকতে পারে, কিন্তু তা প্রস্টেট এবং শুক্রথলি থেকে আসা তরল। যা নিষ্ক্রমণের পর যৌন-ইচ্ছা থাকে না। একটু যেন কাহিলও লাগে। জিগালোদের তো এ কম্মোটি বারবার করতে হবে। চয়নদার শরীর খারাপ হবে না?

শিকস্তি আবার বলে—কী, নিজেকে দিয়ে কী?

পরি বলে, না রে। চয়ন ওসব পারবে না।

—তার মানে তোর সায় নেই। অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে মিশতে দিতে চাস না ওকে। জেলাস হয়ে যাবি। তার মানে তুই খুব পজেসিভ। দিস ইজ লাভ।

শুক্লা অনিকেতকে বলল, কেমন ঘরকুনো হয়ে গিয়েছ তুমি।

অনিকেত বলল, এই বেশ ভাল আছি।

শুক্লা বলল, বিকাশ ঠাকুরপো কেমন আছে?

অনিকেত বলল, অনেক দিন খবর জানি না।

—আর মন্টু?

অনিকেত বলেনি মন্টুর গলায় গনোকক্কাস সংক্রমণের কথা। ডাক্তার দেখানোর কিছু দিন পর ফোন করে জেনেছিল মন্টু এখন ঠিকঠাক। সে বহু দিন হয়ে গেল।

শুক্লা বলল, মন্টুকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। পড়াশোনাটা চলছে তো? ওকে একদিন বাড়িতে নিয়ে এসো না গো...।

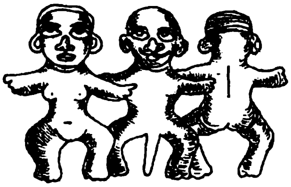

আজ ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৪। আজ অনিকেত বাহান্ন বছর পূর্ণ করে তিপ্পান্ন-য় পা দিল। শুক্লা বলেছিল, একটুর জন্য তুমি যিশু হলে না। মাত্র দু'দিন আগে জন্মালেই তোমার জন্মদিনে পৃথিবী জুড়ে উৎসব হত। বছর চারেক আগে বলেছিল—তুমি তো প্রায়-যিশু। সব পাপীর পাপ তুমি ধারণ করছ।

ছোটমামা নাকি বলেছিল, এ ছেলের নাম যিশুই রেখে দাও। ঠাকমা নাকি বলেছিলেন, এরকম অলক্ষুণে নাম কেউ রাখে? একশো বছর পরমায়ুওলা কারও নামে নাম রাখো। ভীষ্ম, ব্যাসদেব এসব।

তারপর কী করে ওর নাম অনিকেত হল ও জানে না। ছোটবেলায় কেক কাটার ব্যাপার ছিল না। পায়েস করতেন মা। বড়বেলাতেও কেক কাটার প্রচলন হয়নি। যদি ওদের সন্তান থাকত, তা হলে হয়তো কেক-টেক কাটার ব্যাপার থাকত। অনিকেত একবার মন্টুকে জন্মদিন জিগ্যেস করেছিল। মন্টু বলেছিল, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। কিন্তু ইস্কুলে আছে কত যেন জানুয়ারি। একবার শুক্লা বিশ্বকর্মা পুজোর দিন কেক আনিয়েছিল, মনে পড়ে। বাঙালিরা রথের দিনে পাঁপড় ভাজা খায়, লক্ষ্মী পুজোয় খিচুড়ি, পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে—হিন্দু বাঙালিদের কথাই হচ্ছে—আর ক্রিসমাসে কেক। কিন্তু ইদের দিনে সেমুই বা বিরিয়ানি'টা ঢুকল না। যা হোক 'কেক' এখন বাঙালি জীবনে জড়িয়ে গিয়েছে। বাঙালি এখন 'বেক' করে। 'বেকিং মেশিন' আছে অনেক বাড়িতে। এ বাড়িতেও আছে। শুক্লা ২৫ ডিসেম্বর কেক বানাত। সেই

কেক কেটে খাওয়া হত ২৭ ডিসেম্বর। এ বছর ওটা বের করা হল না। কেক কিনেই এনেছিল অনিকেত। আজ কেক কাটার কথা। শুক্লার সামনে প্লেটে রেখেছে। শুক্লা বলল, কাটো। এমনি কেক। সাধারণ। অনিকেতের হাতে ছুরি। 'হ্যাপি বার্থ ডে' বলারও কেউ নেই। হাততালি দেওয়ারও কেউ নেই। শুক্লা এখনও দু'হাত এক করতে পারে না। অনিকেত কেকটার ওপর ছুরি বসাল। এবং অদ্ভুত একটা আর্তনাদের শব্দ কানে এল। ছুরিটার দিকে তাকাল।

কেকটা দু'ভাগ হয়ে পড়ে রইল, কিন্তু কেউ মুখে দিল না। কান্নার শব্দ এখনও আসছে। কান্নার শব্দ পাশের ঘরের টিভি থেকেই আসছিল।

আসলে গতকাল মাঝরাতে ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে সুমাত্রার কাছে সাগর গভীরে। তীব্র সমুদ্রস্রোত এবং জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড সিংহলের উপকূলের বিরাট এলাকা। আন্দামানের কী হয়েছে কিছু বলা যাচ্ছে না। তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, ওড়িশার ওপরও আছড়ে পড়েছে জলস্রোত। দিঘাতেও জল উঠেছিল। সুনামি। গোল টেবিলে রাখা নিরীহ কেকটার উপর সুনামির হাওয়া।

শুক্লা বলল, বাঁ হাত দিয়ে আমি তোমায় খাওয়াব না। তুমি নিজেই মুখে দাও।

অনিকেত কেক-এর একটা টুকরো ভেঙে শুক্লার মুখে দিতে গেল। শুক্লা বলল, না, আগে তুমি। অনিকেত নিজের মুখেই দিল। শুক্লার এক হাত নড়ছে। অন্য হাত কাঁপছে। করতালি দিচ্ছে শুক্লা, শব্দ হচ্ছে জলস্রোতের। শুক্লা বলল, হ্যাপি বার্থ ডে। কখনও বলেনি আগে। বলল, অনেক, অনেকদিন বাঁচো। সুন্দর করে বাঁচো, রঙিন হয়ে বাঁচো। তারপর অনিকেতও এক টুকরো শুক্লার মুখে দেয়। শুক্লর গালে ছোট্ট করে চুমু খায়। সমুদ্র আছড়ে পড়ছে তখন। আজ দুপুরের পর থেকেই টিভিতে দেখাচ্ছিল। দুপুরে খোলা হয়নি টিভি। অনিকেত অফিস থেকে একটু আগে আগেই ফিরেছে। অফিসেই খবর পেয়েছিল, সুনামি নামে কিছু একটা হয়েছে।

ঘরে গিয়ে দেখল ঝড়ের তাণ্ডব। দেখছিল, জলের তোড়ে খেলনার মতো ভেসে যাচ্ছে গাড়িগুলো। মানুষ ছুটছে, পিছনে জল, নিষ্ঠুর জল। তোলপাড় জল। জল খেয়ে নিচ্ছে পলায়নপর মানুষগুলোকে। ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড শ্রীলঙ্কা ভারত সব একাকার। বেঁচে যাওয়া মানুষগুলো কাঁদছে স্বজনহারাদের জন্য। জল কি তোমার কোনও ব্যথা বোঝে?

পৃথিবীর তলায় লুকনো দু'টো প্লেট একটার গায়ে অন্যটা উঠে গিয়েছে। গোপন সংঘর্ষে তৈরি হয়েছে বিরাট ব্যাপক শক্তি, তাতে কেঁপে উঠেছে মেদিনী। ফুলে উঠেছে জল। সেই তীব্র জল আছড়ে পড়েছে দেশে-দেশে। শুক্লা আর অনিকেত নির্বাক তাকিয়ে থাকে। মানুষের কান্না এবং আর্তনাদের দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকে। কান্না আছড়ে পড়ছে জন্মদিনের কেক-এ।

এ সময় ফোন বেজে ওঠে। অনিকেত দেখে অচেনা নম্বর। ফোন ধরে। অচেনা গলা। বিকাশ চ্যাটার্জি নামে কাউকে চেনেন?

—হ্যাঁ। কেন? কী হয়েছে? অনিকেত ভয় পায়। বিকাশ আবার কোনও নতুন ঝামেলা পাকিয়েছে হয়তো।

ফোনের ওপার থেকে শোনা যায় : আমি শ্যামপুকুর থানার এএসআই বলছি। বিকাশবাবু খুন হয়েছেন।

সাড়ে নয় রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প হয়েছে। ভূমিকম্পের উৎস ভূস্তরের ষোলো হাজার ফিট তলায় অনুমান করা হচ্ছে।

—খুন?

দমকা হাওয়ার মতো অনিকেত চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে শুক্লাও চিৎকার করল, কে খুন? কে?

ওপাশ থেকে পুলিশ-কণ্ঠ—আমরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখি ডেড বডি। স্টিফ। হয়তো গতরাত্রেই খুন হয়ে গিয়েছে। ঘরের আলমারি তছনছ। মোবাইল ফোন নেই। ড্রয়ারে কিছু ভিজিটিং কার্ড পাওয়া গিয়েছিল। সেই কার্ডে আপনার নম্বর ছিল। বিকাশবাবুর সঙ্গে আপনার রিলেশন কী?

অনিকেত বলল, আমার মামাতো ভাই হয়। শুক্লা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। হাওয়ায় আঁচল। বলল, বিকাশ? বিকাশ ঠাকুরপো? আর মন্টু?

পুলিশ কণ্ঠ—দু'টো ডেড বডি ছিল। বিকাশ এবং অন্য একটি ছেলের। আঠারো-উনিশ বছর বয়েস। আপনি প্লিজ এক্ষুনি চলে আসুন।

—আর কারও কার্ড পাওয়া যায়নি? শুধু আমার?

—ছিল খাবারের হোম ডেলিভারির কার্ড ছিল, ইনকাম ট্যাক্স কনসালট্যান্টের কার্ড ছিল, দিঘার হোটেলের আরও সব ছিল। কেন আপনার আসতে আপত্তি আছে? আপনার রিলেটিভ বলছেন...।

শুক্লা আবার বলে, কী গো, মন্টু?

অনিকেত মৌন।

—মন্টু খুনটা করেনি তো? অ্যাঁ? লোভে পড়ে?

—মন্টুও মরে আছে।

অনিকেত কেঁদে ফেলে, কিন্তু কান্নার তেমন শব্দ হয় না। বিশ্বজোড়া হাজার-হাজার মানুষ নিঃশব্দেই কাঁদে।

এইবার শুক্লা কেঁদে ওঠে প্রকৃত কান্নার শব্দে। বাঁ হাত দিয়ে মাথা চাপড়াচ্ছে। ডান হাতের ভিতর দিয়েও নিশ্চয়ই প্রবহমান সুনামি-তরঙ্গ। টেলিভিশন থেকে বেরিয়ে আসা কান্নাসমষ্টিতে শুক্লার কান্না মিশে যায়। স্পর্ধিত জলের মাঝখানে একটা মসজিদের চূড়া দেখা যাচ্ছে খালি, ওখানে বসে কিছু মানুষ দোয়া চাইছে, চোখে জল। এই সামান্য জল কত দুর্বল।

শুক্লা মাথায় চাপড় মেরে বলে, কেন পাঠালাম, কেন পাঠালাম ছেলেটাকে? এখানে থাকলে তো ওকে মরতে হত না। শুক্লা উপুড় হয় বিছানায়। ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। অনিকেত টিভি বন্ধ করে দেয়। এখন শুধু শুক্লা থাক এই আহত নির্জনে। জলের তরল আলোয় থাক। অনিকেত হ্যাঙ্গারে ঝোলা জামা গায়ে গলায়। পড়ে আছে জন্মদিনের কেক। অনিকেত বলল, তবে যাই।

বাড়ির কিনারা থেকে কেঁপে ওঠে হাওয়া। দোলে স্মৃতি, দোলে দেশ, দোলে ঠান্ডা ধুনুচির অন্ধকার।

বিছানার ভিতর থেকে দলা পাকানো শব্দ ছুটে আসে, যাই না, আসি বলো।

অনিকেত বলে, হ্যাঁ, আসছি।

বিকাশদের ফ্ল্যাটের সামনে পাঁচ-সাতজন লোক। কাজের লোকদের দেখলেই বোঝা যায়

ওরা কাজের লোক। জড়ো হওয়া মানুষদের মধ্যে কাজের লোকই বেশি। ভদ্রলোকরা এখন সোফায় বসে আয়েস করছে কেউ, কেউ-বা সুনামির ধ্বংসলীলা দেখতে-দেখতে সন্তানদের প্রকৃতির লীলাখেলা বোঝাচ্ছে। ভিতরে পুলিশ, একজন ভদ্রলোক, একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা, আর দু'টি মৃতদেহ। বাইরের কাউকে পুলিশ ঢুকতে দিচ্ছে না।

—আপনি অনিকেতবাবু?

—হুঁ।

সোফায় বসা ভদ্রলোকটি বলেন, আপনি এসে গিয়েছেন? এবার সামলান আপনি। আমি এই রেসিডেন্সের সেক্রেটারি। আমাকেই সব করতে হল। বিকাশবাবু আপনার কাজিন ব্রাদার টাইপের কিছু, তাই তো? বিকাশবাবুর চালচলন একদম ভাল লাগছিল না। ওর ছেলেটার 'মিস হ্যাপ' হওয়ার পর থেকেই উনি একদম বিগড়ে গেলেন। মায়া হয় লোকটার জন্য। তারপর কোত্থেকে একটা ছেলে জুটিয়েছিল, একটু ইয়ে ধরনের, ভিতরে-ভিতরে হিজড়ে কি না কে জানে? কেন যে ওকে রেখেছিল বুঝলাম না। কোমর দুলিয়ে হাঁটত, একদিন তো আমি ওকে একটা থাবড়াই মেরে দিয়েছিলাম, ন্যাকামি করছিল বলে। ওর কানেকশনেই কেউ এসেছিল কি না কে জানে, তারপর সাবাড় করে দিয়ে গিয়েছে। কোনও প্রুফ রাখতে চায়নি হয়তো...। জ্যান্ত মানুষদের কথাগুলো হচ্ছিল বাইরের ঘরে। ঘরের ভিতরে মৃত মানুষেরা। অনিকেত ওই ঘরে উঁকি দিল। দু'টি দেহই চাদরে ঢাকা। বিছানার চাদর দিয়েই ঢেকে রেখেছে। একটা দেহ খাটের উপর, অন্য দেহটা মেঝের উপর। মেঝেতে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

পুলিশ অফিসার অনিকেতকে বলল, বসুন।

অনিকেত ডিসেম্বরের শীতেও ফ্যানটা চালিয়ে দিল।

—কী হয়েছিল? অনিকেত প্রশ্নটা হাওয়ায় ভাসাল।

—বলো, কী হয়েছিল? ফ্ল্যাট সেক্রেটারি মেঝেতে বসে থাকা মধ্যবয়স্কাকে হুকুম ছুড়ে দিল।

ও বলল—সকালে এসেছিলাম, যেমন আসি।

—ক'টায়? পুলিশ জিগ্যেস করল।

—সাড়ে সাতটায়।

—তারপর?

মন্টু নামে একটা ছেলে আছে, সে রোজদিন দোর খুলে দেয়। আজ অনেকক্ষণ কলিং টিপলাম। ভিতরে টিরিং শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু কেউ দোর খুলল না। ভাবলাম, কোথাও গিয়েছে হয়তো। ওরা বাইরে গেলে লোহার ওই কোলাপ গেটে বাইরে দিয়ে তালা ঝোলানো থাকে, ভিতরে থাকলে ভিতরের আংটায় তালা ঝোলে। বাইরেই তালা ঝোলানো ছিল। 'ওরা নেই' ভেবে চলে যাই, সন্ধের সময় আবার আসি। আজও এসেছি। ভিতরে কী হয়েছে কিছু জানি। মা কালীর দিব্বি কিছু জানি না। আমাকে এবার ছেড়ে দিন, বাড়ি যাব।

অনিকেত জিগ্যেস করল, কী করে বোঝা গেল এরকম হয়ে গিয়েছে...।

সেক্রেটারি বলল, মেনটেনেন্স করাচ্ছিলাম। বাইরেটা রং হচ্ছিল। আমি রিটায়ার্ড লোক কিনা, তাই জোর-জোর করে আমাকেই সেক্রেটারি বানিয়ে দিয়েছে। সব হ্যাপা আমাকেই সামলাতে হয়। বাঁশের ভারা বাঁধা আছে, রং মিস্ত্রিরা জানালার আউট সাইড রং করবে বলে

জানালাটা খুলেছে, খুলেই চিল্লামিল্লি শুরু করে দিল। তখন বিকেল চারটে-টারটে হবে। ঘরে একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম। আমায় এসে বলল, বাবু, লাশ।

—ও!

—আমি কি আর বাঁশের ভারা বেয়ে উঠতে পারি? কেয়ারটেকারটা দেশে গিয়েছে। ওই মিস্ত্রিরাই বর্ণনা দিল। বীভৎস। দুপুরবেলা কাকে আর পাব? পুলিশে খবর দিলাম। পুলিশ এসে তালা ভাঙল, দরজাও। যারা খুন করতে এসেছিল, ওরা চাবি নিয়ে দরজা লক করে বাইরে তালা মেরে গিয়েছে।

পুলিশ জিগ্যেস করল, কেয়ারটেকার কি কোনও সিকিউরিটি এজেন্সি থেকে নেওয়া?

সেক্রেটারি বলল, এজেন্সি থেকেই নেওয়া ছিল। কিন্তু লোকটা বলল, ওরা টুয়েন্টি পার্সেন্ট কেটে নেয়, ডাইরেক্ট করে দিতে। অনেক দিন ধরে কাছ করছে, লোকটা ভাল, আমরা ভাবলাম ওর পকেট যদি দু'টো পয়সা বেশি আসে, আসুক, তাই ডাইরেক্ট করে নিলাম। এখন ওর সঙ্গে সিকিউরিটি এজেন্সি-র কোনও সম্পর্ক নেই।

পুলিশ বলল, এগুলোই তো মুশকিল করেন। কাকে ধরব এখন? যে ছেলেটা এখানে থাকত, ওর কি ছবি দেওয়া আছে থানায়?

কেউ কিছু বলতে পারল না।

—কেয়ারটেকার কোথায়?

—ওর মা মারা গিয়েছে। দেশে গিয়েছে। তিন দিন হল।

—ও কি এখানে চব্বিশ ঘণ্টাই থাকে?

—হ্যাঁ স্যর। নীচে একটা ওর ঘর আছে। রান্নাবান্না করে খায়। সারা দিন বাইরেই বসে থাকে।

—ঠিক ও যখন দেশে গেল, তারপরই ঘটনাটা ঘটল? পুলিশ অফিসারের কপালে রেখাচিত্র। ওর দেশের বাড়ির ঠিকানাটা বলুন। সেক্রেটারি মাথা চুলকোচ্ছেন। জানেন না? আপনারা এতটাই ক্যালাস? ও আর আসবে না। ওই লোকটাই কাজটা করিয়েছে। ওর নাম কী? বয়স কত?

—হারাধন ঢালি। বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন হবে। বর্ধমান জেলার কুড়মুন নামে একটা গাঁ আছে, ওখানেই থাকে। কুড়মুনের গাজনের কথা বলত। গাজনের সময় দু-তিনদিনের জন্য দেশেও যেত। কিন্তু ওকে মিছে সন্দেহ করছেন স্যর। ও খুব নিরীহ লোক।

সন্দেহের বাইরে কেউ নয়। আপনিও নন, আর ওর যে ভাইটা এসেছে সে-ও নয়।

—যে থাকত, ওর হোয়ারঅ্যাবাউট জানা আছে?

অনিকেত বলল, আমি জানি। আমিই ওকে দিয়েছিলাম। ছেলেটার বাপ-মা কেউ ছিল না। ওর কাছেই রেখেছিলাম। ছেলেটা ভালই। ওর নাম মন্টু। ঠিকানা জানি। আমার ঠিকানাই ওর ঠিকানা। 'ছেলে ছেলে' তো বলছেন সবাই। আমিও বলছি। কিন্তু দেখবেন? —ওর পরনে কী ছিল?

চাদরের তলা থেকে সরায় পুলিশ অফিসার। ও একটা শাড়ি পরে আছে।

পুলিশ অফিসার বলল, শাড়িটাও উল্টে আমি দেখে নিয়েছি ভিতরে ব্যাটাছেলেদের যা থাকে, ওরও তাই আছে। মাথায় একটা পরচুলা পরানো আছে। মুখের কাপড় সরাব? সহ্য

করতে পারবেন? অনিকেত ঘাড়টা সামান্য কাত করে নীরব সম্মতি জানায়।

দেখল একটা কালো কঠিন মুখ। চেনা যায় না। মাথায় কাঁধ ছাড়ানো হাল ফ্যাশনের চুল। সামান্য খয়েরি। শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে যেমন দেখায়, কিন্তু রক্তমাখা। জমাট রক্তে চুলগুলোও দলা পাকিয়ে গেছে। হাঁ করা মুখের ভিতরে একটা পলিথিন ব্যাগ ঠাসা। জিহ্বার মতো ব্যাগের লাল হ্যান্ডেল বেরিয়ে এসেছে। হ্যান্ডেলের গায়ে লেখা ক্রিসমাস হ্যাম্পার।

—এই আমাদের মন্টু।

ওর মুখগহ্বরে একটা শূন্য শপিং ব্যাগ। ব্যস।

—আমার ভাইটাকে একবার দেখাবেন?

কনস্টেবলটি বলে, ওর পরনে কিছু ছিল না। লুঙ্গিটা দূরে, ওইখানে। ওইখানেই আছে। আমরা কিছু সরাই নাই। বরং মুখ দেখেন। ওরও রক্তাক্ত মুখ। মাথার খুলি ফেটে গিয়েছে। বিকাশের মুখের ভিতরে কিছু গোঁজা নেই।

অনিকেত বলল, ছেলেটা যেন চিৎকার না-করতে পারে, তাই ওর মুখের ভিতরে প্লাস্টিক গোঁজা হয়েছিল। তার মানে খুনের সঙ্গে ওর কোনও যোগাযোগ নেই। ও চিৎকার করেছিল।

ওসব আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আমরা আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব। জবাব দিন। বাকিরা একটু চলে যান প্লিজ।

কাজের মেয়েটা ভাবল নিষ্কৃতি পেল। ও পুলিশের পায়ে হাত দিয়ে একটা পেন্নাম করে উঠে দাঁড়াল। পুলিশ অফিসার বলল, যাচ্ছিস কোথায়? বাইরে দাঁড়া, কথা আছে।

আজ সকালের খবর কাগজে 'আজ আপনার দিনটি'-তে ছিল অপ্রত্যাশিত খবরে জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে। খবর তো হল। এবার জীবনের মোড় ঘোরা। হাজতে পুরে দিলেই মোড় ঘুরে যাবে। পরের লাইনে ছিল দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকে মুক্তি। তা হলে জ্যোতিষ-বচন ঠিক। বিকাশ তো সমস্যাই হয়ে উঠেছিল। তা হলে মন্টু? মন্টু, মন্টুরা তো সমস্যাই। তবে এটাই বুঝি মুক্তি? এভাবেই?

পুলিশ অফিসারের মুখোমুখি অনিকেত। তিনি কলম বার করেছেন, নোটবুকও।

—জানতে পারলাম বিকাশবাবুর জীবনে ডিসিপ্লিন বলে কিছু ছিল না। রাইট? ঘরের কোনায় কয়েকটা মদের ফাঁকা বোতলের দিকে ওর চোখ।

—হুঁ। ওর ছেলেটার মৃত্যুর পর।

—মেয়েছেলের দোষও ছিল। তাই না?

—হুঁ।

—ওসব মেয়েছেলের আপনি কাউকে চিনতেন?

—না।

—ওর প্রাইভেট লাইফ সম্পর্কে কিছু জানতেন?

—না।

—তবে যে মেয়েছেলের দোষের বেলায় 'হুঁ' মারলেন...

অনিকেত চুপ করে থাকে। তা হলে তো কত কিছু বলতে হয়। মন্টুর গলার গনোকক্কাস ইনফেকশন... এসব বলতে ইচ্ছে করছে না এখন।

অনিকেত বলল—মনে হয়েছিল ও ওসব করে।

—কী করে মনে হল? কেন মনে হয়?

—এমনিই মনে হয়েছিল। আন্দাজ করেছিলাম।

—ওর স্ত্রী তো ওর সঙ্গে থাকে না। অফিসিয়াল ডিভোর্স হয়েছে?

—না।

—ওর পিএফ তো স্ত্রী পাবে। অন্যান্য টাকাপয়সাও। ওর স্ত্রী খুনটা করিয়ে দিতে পারে?

—ওর স্ত্রী? না, না, পারমিতা এরকম করতে পারে না।

—করতে পারে না? পুলিশের চাকরিতে কত কী দেখলাম! 'হয় না' বলে কিছু হয় না। ওর স্ত্রী'র ফোন নম্বর আছে?

মোবাইলটা বার করল অনিকেত। বলল, আছে।

পুলিশ অফিসার বলল, ৯৮৩১৪ দিয়ে?

—হ্যাঁ।

—ওটা নয়। পালটে ফেলেছে। পাশের ফ্ল্যাটের মহিলার কাছ থেকে জোগাড় করেছিলাম। ওই নম্বরে ফোন করে পেলাম না। নতুন নম্বরটা জোগাড় করুন। ওর শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

—নাকতলার দিকে।

—ঠিকানা?

—ঠিক জানি না।

—জোগাড় করুন। খবর দিন। অফিসিয়ালি তো উনি এখনও ওঁর স্বামী। আর এই মার্ডার কেস-এ ওর স্ত্রী'র সঙ্গে কথা বলা খুব দরকার। এই লোকটার ছেলেটার ডেথ-ও খুব মিস্টিরিয়াস, যা শুনলাম আপনাদের সেক্রেটারির মুখে। মিস্টিরিয়াস। মানে উল্টোপাল্টা মেয়েছেলেকেও এই ফ্ল্যাটে ঢুকতে আপনাদের ফ্ল্যাটের কেউ-কেউ দেখেছে। আপনাদের সেক্রেটারি বিকাশবাবুকে নাকি সাবধানও করেছিলেন। অনিকেত চুপ করে থাকে।

—কাউকে সন্দেহ হয়?

অনিকেত চুপ করে থাকে।

—অন্য ছেলেটার নাম মন্টু?

—হুঁ।

—পুরো নাম?

—মন্টু মৃধা।

—বাবার নাম?

দু'বার ঢোক গিলে অনিকেত বলল, দুলাল মৃধা। বাইরে কেমন যেন শোঁ-শোঁ শব্দ। সুনামির ঝড় এখানেও এল?

—আপনার বাড়িতে ছেলেটা আগে কাজ করত?

—হুঁ।

—ছেলেটাকে তাড়ালেন কেন?

—তাড়াইনি। বিকাশের স্ত্রী চলে গেল বলে ও কেমন যেন হয়ে গেল, তাই ওকে যেন একটু দেখভাল করে...

—ছেলেটাকেই তো দিয়েছিলেন, তাই তো?

—হুঁ।

—ছেলেটা শাড়ি পরে কেন? ঠোঁটে লিপস্টিক? বিকাশবাবুর পেনিসেও লালচে দাগ লক্ষ করেছি। লিপস্টিকেরই হবে। দেখবেন?

—না-আ-আ। কাতর, বড় আর্ত স্বরে বলে অনিকেত।

—বলুন, তবে বলুন এটা কী করে হয়?

—আমি জানি না, জানি না... কেঁদে ফেলে অনিকেত। সুনামি আসছে।

—কিচ্ছু গোপন করবেন না। কিছু চেপে গেলে আমরা ঠিকই ধরে ফেলব। আচ্ছা, বিকাশবাবু মরে গেলে কার-কার লাভ?

—মাথা চুলকে অনিকেত বলল, ওর স্ত্রী'র?

—ঠিক। আর মন্টু মরে গেলে?

অনিকেত বলল, কারও না।

পুলিশ অফিসার বললেন, সমাজের। বলেই হাসলেন। রসিকতা কিনা...।

অনিকেত বলল, এই ভাবে ভাবছেন কেন? সিম্প্‌ল চুরির কেস হতে পারে তো...।

—কীভাবে ভাবব, সেটা আমরা ভাবব। আপনাকে যা জিগ্যেস করব, তার উত্তর দেবেন।

একটু থেমে পুলিশ অফিসার বলল—যা প্রশ্ন করব, তার বাইরেও যদি কিছু ইনফর্মেশন দেন, সেটাও 'ওয়েলকাম' করব। বুঝলেন তো?

মাথা নাড়ে অনিকেত।

—ঘরে কি টাকাপয়সা থাকত খুব বেশি?

—জানি না। খুব বেশি কি রাখবে? মনে হয় না।

—ওর স্ত্রী'র গয়নাগাটিও নিশ্চয়ই ছিল...

—না, বিকাশ বলেছিল গয়নাগাটি নিয়ে গিয়েছে সব।

—তবে কী নিতে চোর আসবে, এবং দু-দু'টো খুন করবে? একটা মোবাইল ফোন আর কয়েকশো টাকা?

অনিকেত মাথা চুলকে বলে, ওর পার্সটা কি পাওয়া গিয়েছে?

—না, ড্রয়ারে নেই, টেবিলেও নেই। থরো সার্চ করা হয়নি। একজন সাক্ষী দরকার। ওর স্ত্রী'কে খবর দিন।

অনিকেত বলল, ওর পার্সে তো 'এটিএম' কার্ড থাকে...।

—কিন্তু পাসওয়ার্ড? পুলিশ অফিসার বলে।

—হ্যাঁ, ওটা যদি জেনে গিয়ে থাকে কেউ, চেনাজানা কেউ...

কিছুক্ষণ নীরব থাকে পুলিশ।

এবার বলে, লোকজন ডাকুন। লাশ দু'টো নিয়ে এখন আমাদের অনেক কাজ। থানা, হসপিটাল, মর্গ...। ঘরটা 'সিল' করে দিচ্ছি। খারাপ গন্ধ বেরতে শুরু করেছে। নেহাত শীতকাল, নইলে এতক্ষণে টেকা যেত না। টেবিলের ওপর একটা ডিওডোরেন্ট ছিল। জ্যান্ত বিকাশের। পুলিশের কনস্টেব্‌ল ওটা মরা বিকাশের ওপর স্প্রে করতে থাকল। তারপর মন্টুর গায়ে। ওখানে কম। মরার পরেও জাতিভেদ, স্ট্যাটাস ভেদ থেকে যায়।

বাড়ি ফিরতে রাত হল খুব। বাড়িতেও সুনামি হয়ে গিয়েছে মনে হয়। একটা বালিশের

ভিতরের তুলো দেখা যাচ্ছে। মাথার ঘিলুর মতো।

এক হাতে কি বালিশ ছেঁড়া যায়?

দাঁতও ব্যবহার করেছিল শুক্লা?

শুক্লা উদ্ভ্রান্ত। বিধ্বস্ত করেছে নিজেকে।

মাঝখানে ফোন করেছিল। শুধু জিজ্ঞাসা ছিল—সত্যিই মরে গিয়েছে ওরা?

শুক্লার সঙ্গে কথা হল না তেমন। অনিকেত শুধু বলল, এখন মর্গে।

শুক্লা খুব আস্তে স্বগতোক্তি করল যেন স্বর্গে যায়, স্বর্গে।

অনিকেত শুয়ে-শুয়ে ভাবে—মন্টু শাড়ি পরল কেন?

ঠিক আছে শাড়ি পরার ইচ্ছে না-হয় হল, হতেই পারে, ঠোঁটে লিপস্টিক না-হয় দিলই, কিন্তু পুলিশ যেটা বলছিল—বিকাশের লিঙ্গগাত্রে লিপস্টিক-চিহ্ন...।

যারা 'নাগিন'-ছেলেদের মেয়ের পোশাক পরিয়ে এসব করে, তাদের দলে তুইও? ঘেটুপুত্র কমলাকে তুই এত কিছুর পরও ব্যবহার করিস বিকাশ?

কমলাকে নিয়ে সিলেট জেলায় লোককথা প্রচলিত আছে। কমলার কথা মনে পড়ে, দেড়শো বছর আগেকার কোনও কমলা।

পূর্ববঙ্গে বর্ষার তিন মাস অনেক জায়গা জলবন্দি থাকে। পয়সাওলা মানুষরা এই সময় বাড়িতে 'ঘেটুর দল' রাখে। ঘেটুর দলে বাজনাদার থাকে, গায়ক থাকে, আর থাকে নাচিয়ে। কোনও সুদর্শন বালকই মেয়ের পোশাক পরে নাচে। কৃষ্ণলীলার মধ্যেই অশ্লীলতা ঢোকে। শ্রীরাধিকার স্নান, প্রসাধন, অঙ্গরাগ থেকে অভিসার, কুঞ্জবনে কৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেলা সবই থাকে। বুকে নারকোল মালা বেঁধে ঘেটু-বালকরা বক্ষ দোলায়, পিডোফেলিক ধনাঢ্যরা ওদের ব্যবহার করে, ওই বালকরা যখন চিৎকার করে, বাজনদাররা তখন বন্ধ ঘরের বাইরে বসে বাজনা বাজায়। অনেক বাজনদারই ওদের সুদর্শন বালক পুত্রকে ঘেটু দলের 'নাচনি' করে। ওদের একটা 'ঘেটুনাম' হয়, সেটা মেয়েদের নামে। যেমন সাজ্জাদ নামে এক বালকের ঘেটুনাম হল কমলা।

ঘেটুদলে হিন্দু-মুসলমান সবাই থাকত। মুসলমান গায়করাও কৃষ্ণলীলা গাইত। তিন মাস পর এই ঘেটুদল কিছু টাকাপয়সা পেত।

যখন কোনও জমিদার বা ব্যবসায়ী ঘরে ঘেটু ঢোকাত, বাড়ির বউ খুব ব্যাজার হত। ঘেটু ছেলেদের মনে করত, সতিন। অথচ জমিদার বউরাই ঘেটু ছেলেদের সাজিয়ে দিত, গায়ে সুগন্ধি দিত, তারপর হাত ধুয়ে নিত, কারণ এরা অপবিত্র।

...দুই পায়ে আলতা দেয়, গাত্রে দেয় ননী
মাথার উপরে দেয় নকল বিনুনি
কাজল রেখায় করে বিলাল আঁখি,
মুখে থুক দিয়া বলে যা রে আবাগি...।

চন্দন-মাখা মুখের ওপর গিন্নিমা-র থুথু হাতের চেটোয় মুছে ঘেটু-বালকরা যেত কর্তার ঘরে।

কমলা উপাখ্যানের শেষে ছিল—জমিদার গিন্নি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিল কমলাকে।

আর জমিদারের লোক সেই দেহ ফেলে দিয়েছিল হাওরের জলে।

ওগো ও কমলা তুমি পেট ভইরা খাও
ওগো ও কমলা তুমি পায়স বাটি নাও
ওগো ও কমলা খাও দধি চিনি পাতা
পাটিসাপটা পিঠা খাও শুন মোর কথা।
তারপরে পানি খায় কাঁসার ঘটিতে
অঙ্গ হেলিয়া পড়ে না পারে উঠিতে

কমলার লাশ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু একটা হাওরের নাম এখনও কমলা হাওর। হাওর মানে তো সাগর।

আর ওই যে-গানটা, 'ভাল কইর‍্যা বাজাও দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে', ওটা ওই কমলাই কিনা...।

কমলারা মরে না। ওদের পুনর্জন্ম হয়। ধনীর ঘরেও হতে পারে, গরিবের ঘরেও।

মন্টু শাড়ি পরেছিল। লিপস্টিক মেখেছিল মরার আগে। ও জানত না ও মরবে, মরতে হবে। কে কতটা 'গে', কতটা 'ট্রান্সভার্স', কতটা 'ট্রান্সজেন্ডার', কতটা 'বিপরীত সজ্জাকামী', কতটা 'লিঙ্গ-রূপান্তরকামী'—এর কোনও মাপকাঠি নেই। ও শাড়ি পরেছিল। এবং সেদিন কেউ এসেছিল।

—সে কি ওর সতীন?

কয়েক দিন পর জানা গেল—বিকাশের পাকস্থলীতে অ্যালকোহল পাওয়া গিয়েছে এবং ফেনোবার্বিটল। মন্টুর পাকস্থলীতে অ্যালকোহল ছিল না, ফেনোবার্বিটল-ও ছিল না। এবং মৃত্যুর কারণ হাতুড়ি জাতীয় শক্ত কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত।

ফেনোবার্বিটল হল বেশ কড়া ধরনের ঘুমের ওষুধ। তার মানে, প্রথমে বিকাশকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল। হয়তো মদের সঙ্গে, নয়তো চায়ের সঙ্গে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ার পর ওকে হাতুড়ি মারা হয় মাথায়। যারা এসেছিল, ওরা হয়তো চেনা মানুষ। মন্টু প্রথমে হয়তো কিছু বোঝেনি। পরে আঁচ করতে পেরেছিল কিছু।

ও যেন চিৎকার না-করতে পারে, যেন কোনও কথা না বলতে পারে ওই জন্য ওর মুখে ঠেসে ঢোকানো হয়েছিল পলিথিন ব্যাগ। আরও জানা গেল, যেদিন খুন হল ওরা, ২৬ ডিসেম্বর, সেদিনই রাত সাড়ে দশটায় বিকাশের এটিএম কার্ড ব্যবহার করে চব্বিশ হাজার এবং পরদিন ভোরবেলা আরও চব্বিশ হাজার টাকা তোলা হয়েছে। ওর পঁচিশ হাজার 'লিমিট' ছিল। ২৮ ডিসেম্বর রাত সাড়ে বারোটায় আরও উনিশ হাজার টাকা তোলা হয়েছিল। সেভিংস-এ আর মাত্র এক হাজার টাকা পড়ে ছিল। অফিসের লোকজন জানতে পারে ২৮ তারিখ সকালে।

বোঝাই গেল এটিএম কার্ডটার জন্যই এই মৃত্যু।

পাসওয়ার্ড-টা হয়তো কীভাবে জেনে ফেলেছিল।

ছায়াছবির মতো দৃশ্যগুলো দেখতে পায় অনিকেত। মন্টু শাড়ি পরেছে, সেজেছে, বিকাশ ডেকেছে ওকে। তারপর ওইসব করেছে।

কোনও মহুয়া, রীতা, মিতা বা পারুল এসেছে সন্ধেবেলা। ভালবাসায় ভুলিয়েছে। ঘুম

পাড়িয়েছে। যে এসেছিল, মন্টু তাকে চেনে। একটু পরই এসেছে আরও দু'জন। যাদের সঙ্গে ছিল হাতুড়ি বা ওরকম কিছু।

পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি। বিকাশের মোবাইল পায়নি, তবে ওর মোবাইল কোম্পানির সার্ভারে বেশ কিছু ফোন নম্বর পেয়েছিল, তার মধ্যে পারুল নামে কেউ একজন ছিল। ওকেই বেশি ফোন করত বিকাশ। টাওয়ার লোকেশনে দেখা যাচ্ছে ২৬ ডিসেম্বর সন্ধেবেলা ওই মোবাইল 'ব্যারাকপুর' দেখাচ্ছে।

তার মানে ও তখন ব্যারাকপুরে ছিল।

কিন্তু তার মানে তো এটাও হল, ও আগে-ভাগেই মোবাইলটা ব্যারাকপুরে চালান করে দিয়েছিল।

কেন পুলিশ এত কিছু করতে যাবে? ওরা তো বিখ্যাত কেউ নয়। ওদের হয়ে পুলিশের কাছে দরবার করার কেউ নেই। কত কমলা ভেসে যায়, নিরুদ্দেশ হয়ে যায় যুগ-যুগ ধরে।

গানে থেকে যায় কখনও, লোককথায় থাকে।

বিকাশের ফ্ল্যাটটার নতুন চাবি হয়। সেই চাবি থাকে বিকাশের স্ত্রী পারমিতার কাছে। রক্তটক্ত ধোয়ানো হয়ে গিয়েছে আগেই। বোতল-টোতল কবেই পরিষ্কার। এখন হোয়াইট ওয়াশ হচ্ছে।

শুক্লা একদিন উদাস গলায় বলল—আমাদের তবে কে রইল?

একটু থেমে বলল, মন্টুর জন্য কী আমি দায়ী?

অনিকেত বলে, তুমি কেন দায়ী হবে? নিয়তি। নিয়তি।

শুক্লা বলে, 'নিয়তি' শব্দটা তো তোমার মুখের নয়, ওটা আমাকে খুশি করার জন্য বলা। আমি জানি। তখন অনিকেত চুপ।

শুক্লা আবার শ্বাস নেয়। গভীর।

বলে—মঞ্জুর ছেলেটা কেমন আছে—জানো?

কতদিন—কত দিন পর মঞ্জু-নাম উচ্চারিত হল।

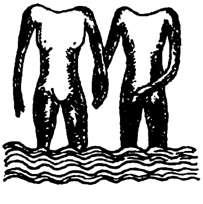

আরও দু'-আড়াই বছর কেটে গেল। কত জল বয়ে গেল গঙ্গায়, টিভিতে কত সিরিয়াল শুরু হল, কত সিরিয়াল শেষ হল। আরও কত কন্যা-ভ্রূণ ধ্বংস হল। আরও কত জঞ্জাল পড়ল ধাপার মাঠে। বিজেপি-র বাজপেয়ী'কে বিদায় নিতে হয়েছিল, মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী হয়ে এসেছিলেন ২০০৪-এর সুনামির আগেই। ২০০৫ সালে লালুপ্রসাদ হেরে গেলেন বিহারে। বিহারে একটা প্রবাদ ছিল : যবতক রহেগা সামোসে মে আলু, তবতক রহেগা বিহার মে লালু। সেই লালুপ্রসাদ যাদবও হেরে গেলেন। নীতীশকুমার বিহারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী। সপ্তম বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এল। ইরানে প্রকাশ্য ফাঁসিতে ঝুলল আটজন পুরুষ সমকামী। আর পরি

বস্তির ঘর ছেড়ে ফ্ল্যাট ভাড়া নিল ট্যাংরা অঞ্চলের মুসলমান-প্রধান এলাকায় সাড়ে তিন হাজার টাকায়। ওয়ান রুম ফ্ল্যাট। নামাজের আজান শোনে। ব্যালকনি থেকে একটা কোনওরকমে টিকে থাকা আমগাছ দেখা যায়। বসন্তে আম বকুলের গন্ধ পায়, পাখিও দেখে। পরি চাকরি করে যে কোম্পানিতে, তার নাম 'পিকক্'স টেল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড'। ময়ূরের পালক। 'পিকক' নামেই কোম্পানিটা বিখ্যাত। ওরা টালিগঞ্জের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত। সিনেমার জন্য কস্টিউম বানায়। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলোর সঙ্গেও কাজ করে। কিছু দিন আগে এক হোটেল-মালিকের ছেলের বিয়ে হল। পাল্কিতে বর-বউ কিছুটা ঘুরবে। পাল্কি-বাহকদের কস্টিউম করল, গিন্নি-বান্নি-দাস-দাসি সবার। গিন্নিদের ঘটি-হাতা ব্লাউজ। আর দাসিরা ব্লাউজহীনা। গিন্নিদের কস্টিউম ডিজাইন করা তেমন কঠিন কাজ ছিল না, কঠিন ছিল দাসিদের কস্টিউম করা। উজ্জ্বল রঙের ফেব্রিক, চমকদার ঝুটো গয়না...। এরপর পরি একটা দুর্গাপুজোর কস্টিউম করেছে। ওতেই খুব নাম হয়ে গিয়েছে ওর। ওই পুজোর থিম ছিল একশো বছর আগেকার কোনও গ্রামের দুর্গাপুজো। ঢেঁকিতে ধান কুটছে কয়েকজন গ্রাম্য নারী। ওদের গায়েও ব্লাউজ নেই, শাড়ির পাড়ে মাছের সারি, কিংবা প্রাচীন কলকা। মাত করে দিল এক নামি চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর জন্য একটা শাড়ির ডিজাইন করে। কোনও এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করা মেয়েদের সংবর্ধনা দিল। পুরস্কার তুলে দেওয়ার কথা সেই বিখ্যাত অভিনেত্রীর। পিককস টেইল-এ যোগাযোগ করা হয় সেই অভিনেত্রীর তরফ থেকে। ওই অনুষ্ঠানে পরার জন্য একটা মানানসই শাড়ি চাই। একটা সাদা খোলের শাড়িতে বেশ মোটা পাড়, এবং পাড়ে লেখা 'বেঁচে থাকো বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে।' শান্তিপুরের তাঁতিরা নাকি এক সময়ে মেয়েদের শাড়ির পাড়ে এটা বুনতেন। সুতো দিয়ে বুনতে অনেক সময় লাগত, এমন একটা ব্লক করিয়ে নিয়েছিল, যেন দূর থেকে মনে হবে সুতোয় বোনা। সেই ব্লক দিয়ে প্রিন্ট করিয়ে নিয়েছিল শাড়ির দু'দিকের পাড়ে। তিন ইঞ্চি চওড়া ব্লক। দূর থেকেও বেশ বোঝা যায় লেখাটা। টিভিতে দেখানো হল ওই শাড়ি-পরা মহিলা গায়ে বিদ্যাসাগর জড়িয়ে পুরস্কার দিচ্ছেন, হয়তো একটু পরেই ওই শাড়ি ছেড়ে শর্ট প্যান্ট আর গেঞ্জি পরেই 'ধুৎ, কাছে এসো খোকাবাবু' টাইপের গানের সঙ্গে নাচবেন, তা নাচুন গে, কিন্তু ওই যে ইমেজ বিল্ডিং, ওটা তো শাড়িটার জন্যই হল। থিমেটিক কস্টিউম-ডিজাইনার হিসেবে পরির নাম ফাটল খুব দ্রুত।

প্রফেশনে ওর নামডাক হয়েছে পরি হিসেবেই। পরিমল নামটা ব্যবহার করে না আর। পদবিও ব্যবহার করে না। এই দুচ্ছাই পরিও আজকাল দিবাস্বপ্ন দেখে নিজস্ব কোম্পানির। একটা খুব ভাল বাংলা নাম ভেবেছে—পরি-কল্পনা। কিন্তু অল্প কিছু বাঙালি ছাড়া এই নামের মানে কেউ বুঝবে না। বিখ্যাত-বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনিং কোম্পানির নাম হয় হামেল, ব্রাউন বাফেলো, লিজ্ ডেভালেপমেন্ট—এসব। গ্যাপ-ও খুব নামী সংস্থা। 'কালেকশন ডিজাইনার' নামটা কেমন হয়?—চয়নকে জিগ্যেস করেছিল পরি। চয়ন বলেছে ভালই তো। আসলে চয়ন বুঝতে পারল না ওর নামেই কোম্পানিটার নাম ভাবা হয়েছে। 'চয়ন' মানে তো সংগ্রহ। সংগ্রহর ইংরেজি 'কালেকশন'। ল্যাপটপের পাসওয়ার্ড এখনও চয়নের নামে।

প্রথম-প্রথম চয়ন বলত, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল। কবে কোথায় কোম্পানি হবে, আগেই নাম নিয়ে চিন্তা। পরি বলেছে নামটাই তো আগে। এই যে রবীন্দ্রনাথ, নামটা তো সবার আগে

দেওয়া হয়েছিল, তারপর তো রবীন্দ্রনাথ। চয়ন বলেছে, ধুৎ, সব কিছুতে বাড়াবাড়ি। একটু বেশি-বেশি স্বপ্ন দেখিস তুই, তোর স্বপ্নদোষ আছে। স্বপ্ন তো দেখেই পরি। স্বপ্নটা দেখেছে বলেই তো দু-চার গাছা পদ্য লিখেছে। স্বপ্নটা দেখেছে বলেই তো কোর্সটা শেষ করেছে, নিজের পশ্চাদ্দেশ ওর স্বপ্নবিপণির একটা 'আইটেম' মাত্রই ছিল। পরি নিজের কোম্পানির স্বপ্ন দেখে। চয়ন ঠিকঠাক চাকরি পেল না তো কী হল? কাঁচকলা হল। ব্যবসা সামলাবে। অ্যাকাউন্টস'টা ও পারবে না। এটা পরি নিজেও পারবে না। অ্যাকাউন্টেন্ট রাখতে হবে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট?—একটু পরে। প্রথমে না। ট্যাক্স-এর কাজটা ভাল করে জানে এমন কাউকে রাখবে। ট্যাক্স ফাঁকি দিতে হবে না? ট্যাক্স ফাঁকি দেবে? কিছুটা ফাঁকি না-দিলে কি কোম্পানির মান থাকে? আচ্ছা বাবা আচ্ছা, ট্যাক্স ফাঁকি দেবে না। হিসেব করতে হলেও তো লোক চাই। তারপর ল-ইয়ার। পিআরও। পুরোদস্তুর অফিস। কত দারুণ-দারুণ ছেলে পরি-র সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য হা-পিত্যেশ করে আছে। ও একটা খুব সুন্দর—শাহরুখ টাইপ ছেলেকে সেক্রেটারি রেখেছে। চয়নের কী হিংসে, ইস, ওর মুখটা কীরকম বোকা-হাবা হয়ে আছে। ছি ছি ছি। সেই বোকা কুমোরের স্বপ্ন দেখার গল্পটা মনে পড়ে পরির। দশটা হাড়ি বেঁচে যা লাভ হল, সেটা বেঁচে দোকান, দোকান থেকে প্রচুর লাভ, তখন আর একটা বিয়ে, আর প্রথম বউটার পেছনে এক লাথি। লাথিটা মেরেছিল কুমোর, একটার উপর অন্য হাঁড়ি রাখা হাঁড়ির সারিতে। হাঁড়িগুলো ভেঙে গিয়েছিল।

না, পরি ওরকম না। ও চয়নকে ফোটাবে না। কিন্তু চয়নের চিন্তিত মুখ দেখতে চায়। জেলাস মুখ দেখতে চায়।

রেকারিং ডিপোজিট করেছে পরি, রেকারিং ডিপোজিট। প্রতি মাসে দু-হাজার টাকা করে রাখছে। দু'বছর রাখলে একসঙ্গে পঞ্চান্ন হাজার টাকা পাবে। মায়ের গয়নাগুলো সব ঠিকঠাক রয়ে গিয়েছে। একটাও বিক্রি করেনি। সেগুলোও কাজে লাগাবে। তারপর? তারপর উল্টে দেখ, পাল্টে গেছি। গয়না তো নিজের অঙ্গ সাজানোর জন্যই। গয়না বিক্রি করে নিজের অঙ্গই তো সাজাবে পরি। আস্তে-আস্তে সর্বাঙ্গে ফুটে উঠবে কমনীয় কান্তি। সর্বাঙ্গে বসন্ত বসাবে। আহা কী অনিন্দ্য-ভ্রান্তি। ভ্রান্তিবিলাস। বামন হয়ে সত্যিই-সত্যিই চাঁদকে চুমু খাবে। অপারেশন করাবে পরি। রি-অ্যাসাইমেন্ট সার্জারি। ট্যাবলেট খাওয়া ফাঁপা বক্ষ নয়, চক্ষে তাক লাগা খাপে-খাপ মাপা বক্ষ। এই হাইটে ঠিক যতটা মানায়। জল না-পাওয়া কলা গাছের কাঁঠালি কলার ছা-টাকে পেটের তলা থেকে খসিয়ে দিয়ে ওখানে বসিয়ে দেবে সাদা অপরাজিতার ফুল। এত দিন ওদের দিকে শুধু তাকিয়ে দেখেছে, যারা মুম্বই থেকে সার্জারি করিয়ে গায়ে বসন্ত বসিয়েছে। এখন তো কলকাতাতেও হচ্ছে। খুব ইচ্ছে হয় রাতারাতি অপারেশন-টপারেশন করে চয়নকে বলবে : উল্টে দেখ পাল্টে গেছি। কিন্তু এসব অপারেশন তো রূপকথা-পুরাণের আশ্চর্য পুষ্করিণী-স্নান নয় যে, একটা ডুব দিয়ে উঠলেই সব পাল্টে গেল, এটা একটা লং প্রসেস।

চয়ন একটা স্কুলে কাজ পেয়েছে। পুরোপুরি চাকরি নয়, আংশিক। ওদের বলে 'প্যারা-টিচার'। তাই বলে ইস্কুলে কম সময় থাকতে হয়, এমন নয়। অন্য টিচাররা যেমন থাকে, তেমনই থাকতে হয়, কিন্তু চয়নের তুলনায় ওরা পাঁচগুণ মাইনে পায়। আবার যখন এসএসসি পরীক্ষা হবে, তখন এই অভিজ্ঞতার জন্য পয়েন্ট পাবে। একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বাংলা টিচারের জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিল, কিন্তু ওদের ইংরিজিটা কেমন যেন। প্রশ্নগুলোই ঠিকমতো

বুঝতে পারছিল না। 'ওন্না' 'গোন্না' করে কী সব বলছিল যে ওরা...।

পরি এখন কী সুন্দর ইংরিজি শিখেছে। যখন ফোনে কথা বলে, অবাক হয়ে শোনে চয়ন। পরিও 'ওন্না' 'গোন্না' বলে। পরি একদিন বোঝাচ্ছিল—'ওন্না' নয়, 'ওয়ানা' হল ওয়ান্টু টু। ছোট করে 'গোন্না' মানে 'গোইং টু'। এরকম আরও কত। 'ডোন্ট ওয়ারি' বলতে গিয়ে বলে 'চিল', 'চিল'। এখনকার ছেলেপুলেরা খুব 'ব্যাপক' আর 'বীভৎস' বলে। চয়নও বলে। পরি কখনও বলে 'কুল', কখনও বলে 'হট'। দারুণ পাল্টে গিয়েছেও। ব্যাপক পাল্টে গিয়েছে। নিজে তেমন কিছু করে উঠতে পারল না বলে নিজের উপর মাঝে-মাঝে ঘেন্না হয়। পরিকে একথা বলেছে চয়ন। বলেছে, আমায় একটু ঠিকঠাক ইংরেজি শিখিয়ে দে পরি...। পরি বলেছে ওগুলো ঠিকঠাক ইংরেজি নাকি, ওগুলো স্ল্যাং। কথায়-কথায় 'শিট', 'বল্‌স', আঁস এসব না-বললে স্মার্ট হওয়া যায় না। কথায়-কথায় আমি কিন্তু এখনও ফাকিং-টাকিং বলতে পারি না—বলে চয়নের কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়েছিল পরি, একদম মেয়েদেরই মতো।

পরি চেষ্টা করে নিজের গলাটা সরু করেছে। কিছুটা, কিন্তু বিপাশার মতো পারেনি। বিপাশা তো আগে ছেলেই ছিল, অল্পস্বল্প আলাপ ছিল আগে। অনেক দিন যোগাযোগ নেই। একটা টিভি প্রোগ্রামে ওকে দেখেছিল। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের একটা আলোচনায় কৃষ্ণা বসু, শাশ্বতী ঘোষদের মতো নারীবাদীদের সঙ্গে। ও কী বলছিল, তার চেয়ে বেশি মন দিয়ে শুনছিল ওর কণ্ঠস্বর। ও কি গলার ভোকাল কর্ডেও সার্জারি করিয়েছে? ওর ফোন নম্বর চেষ্টা করলে জোগাড় করা কোনও সমস্যা হত না, কিন্তু তার আগেই একজন খুব সিনিয়ার ইএনটি সার্জেনের কাছে গেল। বলল, আমায় দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি একজন ট্রান্সজেন্ডার। আমি অপারেশন করে সব ঠিকঠাক করব। তার আগে আমার ভয়েস-টা ঠিক করে দিতে পারবেন? ডাক্তারবাবু বললেন—ভোকাল কর্ডে অপারেশন করে হয়তো করা যায়, কিন্তু আমি পারব না। কারণ এই ধরনের অপারেশন তো কখনও করিনি আমি। আমি কেন, কলকাতার কেউ বোধহয় করেনি। খুব রিস্কি অপারেশন কিন্তু। মেয়েদের গলায় শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি পুরুষদের তুলনায় বেশি থাকে। বাচ্চা বয়সে ছেলেমেয়েদের গলার ফ্রিকোয়েন্সি একই থাকে। বয়ঃসন্ধিতে চেঞ্জ হয়। হরমোনের খেলা। কর্ডের টিস্যুগুলো তখন পাল্টে যায়। তোমার গলাটা চেঞ্জ করতে হলে কর্ডে ছুরি চালিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কী দরকার বাবা এসব ঝামেলা করে? যেমন আছো থাকো না। কী করো? কেন বাপের পয়সা নষ্ট করতে যাচ্ছো? পরি বলে, বাপের পয়সা নয়, নিজের পয়সা। বলার সময় গলাটা গম্ভীর করে ফেলল। যেমন আরও একটু ছেলে-ছেলে। কিন্তু মেয়েরা যখন গলা গম্ভীর করে কথা বলে, তখন তো ছেলে-ছেলে লাগে না, মা তো কত বকুনি দিত, মনে হত না কোনও ছেলে বকুনি দিচ্ছে। শিকস্তি যখন 'ওফ্, ফাক আউট', 'ফাক দেম আউট' বলে ছেলেদের কায়দায় খিস্তি দিত, তখনও মনে হত না কোন ছেলে খিস্তি দিচ্ছে। নাঃ, মেয়ে হতেই হবে। শুধু মনের ভিতরে একটা নারী-আত্মা পুষে রাখলে চলবে না। পুরো মেয়ে হতে হবে। প্রতি অঙ্গে। আই ওয়ানা। ডাক্তারবাবু বললেন, কেন মেয়েদের মতো হতে চাইছ বলো তো?

পরি বলে, মেয়েদের মতো নয়, মেয়েই হতে চাইছি। পরি জিনস আর শর্টশার্ট পরে এসেছিল। একটু টাইট-ফিটিং, ছোট হাতা। ডাক্তারবাবু কেন ওর বুকের দিকে তাকাচ্ছে না? সস্তার ট্যাবলেট খাওয়া বুক বলেই না? সিলিকোন বুক হলে ঠিক লক্ষ করত। ডাক্তারবাবু

বললেন, জানি তো মেয়েই হতে চাইছ। কী দরকার বাপু? পয়সাকড়ি তো রোজগার করো বলছ, কী করো? পার্সোনাল কথা বলছি বলে কিছু মনে কোরো না যেন।

আমি একজন ফ্যাশন ডিজাইনার। বুক ফুলিয়েই বলল পরি।

ডাক্তারবাবু বললেন, ভেরি গুড, ভেরি গুড। তুমি তো জামা-কাপড়ে ডিজাইন করো। ভাল কথা। নিজের বডিতে ডিজাইন করতে যাচ্ছো কেন? এটা এখন একটা ফ্যাশন হয়েছে। বছর দুই আগে তোমার মতো আর একজন এসেছিল আমার কাছে, অলোকা হালদার। একটা অ্যাড এজেন্সিতে বড় চাকরি করে। বম্বেটম্বে থেকে অপারেশন করিয়েছিল। সিরিজ অফ অপারেশন। আগে নাকি অলোক হালদার ছিল। যখন এল, বুঝতে পারিনি ও ছেলে না মেয়ে। যখন কথা বলল, তখন বুঝলাম। ও বলল আমার খোলস আমি ছেড়ে ফেলেছি। আমার শরীরে একটা পুরুষের খোলস ছিল। ফেলে দিয়েছি ওটা। আমি এখন ভিতরে-বাইরে নারী, শুধু গলার স্বরটা সরু করে দিন। আমি বলেছিলাম গলার স্বর নিয়ে কেন এত মাথা ঘামাচ্ছেন ভাই, অনেক পুরুষের গলার স্বর তো সরু হয়, আমাদের স্কুলের সংস্কৃত স্যারের গলার স্বর খুব সরু ছিল। আবার অনেক মহিলার গলা তো মোটা হয়। বোঝালাম অনেক। বুঝল না। বলতে লাগল— আপনি তো নানারকম সেমিনার টেমিনারে যান, বাইরে কোথায় এসব হয় আমায় খোঁজ দিন। আমি বললুম আমেরিকায় হয়, ওখানে তো অনেক খরচ। দেখছি সিঙ্গাপুর বা ব্যাঙ্ককে হয় কি না। ওই ভদ্রলোক সেদিনের মতো চলে গেলেন। কিন্তু ওঁর মাথা থেকে ভূতটা নামল না। আমাকে ক্রমাগত ফোন করতে লাগলেন। খোঁজ খবর নিয়ে জানলুম ব্যাঙ্ককে এ ধরনের অপারেশন হয়। ওখানে এলাকাজার নামে একটা নাচগানের দল আছে, ওই দলের সবাই ছেলে থেকে মেয়ে হয়েছে। ওরা সব ওই হাসপাতালে গলা অপারেশন করিয়েছিল। আরও অনেকে ওখানে ভয়েস চেঞ্জ করায়। কি যেন নাম হাসপাতালটার ভুলে গিয়েছি। একজন অস্ট্রেলিয়ান ডাক্তার অপারেশন করেন। কী যেন নাম...কী যেন নাম...।

দরজা খুলে উঁকি দিল একজন। স্যর...।

ডাক্তারবাবু বললেন, সরি সরি। পরিকে বললেন, অনেক কথা আছে, চেম্বারে বলা যায় না। চেম্বার তো গল্প করার জায়গা নয়, রোববার সন্ধের পর ক্যালকাটা ক্লাবে বসি, এসো, সব বলব।

পরি তো অলোকা হালদারকে চেনে। সেই ছাত্র বয়সে যখন রবীন্দ্রসদনের ঠেকে আড্ডা হত। যে মুম্বই থেকে অপারেশন করিয়ে এসে বলেছিল, দেখলে হবে? খরচা আছে। যে রতনের বুক লক্ষ করে বলেছিল ওখানে ন্যাকড়া পোরা। রতন পরির কাছে নন্দন চত্বরে কেঁদেছিল। সেই অলোকা হালদার? হবে হয়তো।

ক্যালকাটা ক্লাবে আর যাওয়া হয়নি। ভুলেই গিয়েছিল। আজ দেখা হয়ে গেল অলোকাদির সঙ্গে। আজ রোববার। ফায়ার ছবিটার একটা বিশেষ শো ছিল নন্দনে। চয়ন আর পরি দেখতে এসেছিল। চেনা কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল। এরা সব এলজিবিটি অ্যাকটিভিস্ট।

'সাফো'র কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল। ফায়ার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল বলে মেয়েটা লেসবিয়ান সম্পর্কে জড়িয়ে গেল। বেসিক জায়গাটাতেই ভুল। অতৃপ্ত হেট্রো সেক্সুয়ালিটি মোটেই হোমো সেক্সুয়ালিটির কারণ হতে পারে না, এ নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। পরি দেখল সেই দঙ্গলে অলোকাদি দাঁড়িয়ে আছে। ও কোনও কথা বলছে না, শুধু শুনছে। অলোকা যখন অলোক ছিল তখন থেকেই চিনত। খুব হাত চোখ নাড়িয়ে কথা বলত,

আর একটু বেশিই কথা বলত কথার মধ্যে, ভাল লাগলে ঠিকরি দিত। ঠিকরিও হাত তালি, তবে একটা হাতের সঙ্গে অন্য হাত নব্বই ডিগ্রির মতো কোণ করে আঘাত করে। আর, একটু অন্য ধরনের শব্দ হয়। অলোকদাই সবার আগে অলোকাদি হয়েছিল। ওর বাবা বোধহয় উকিল টুকিল কিছু। দাদা থেকে দিদি হওয়ার পর হইচই গিরি আরও বেড়ে গেল। ভাল বাংলায় এটাকে বলে প্রগলভতা। সেই অলোকাদি কোনও কথাই বলছে না। মৃদু মৃদু হাসছে, কিংবা কপাল কুঁচকোচ্ছে। যারা যারা আগে পরিকে চিনত তাদের কেউ কেউ ওকে দেখে খুশি হয়েছে, বলেছে কেউ আবার না চেনার ভান করেছে। হিংসে হলে যা হয় আর কি, কিন্তু অলোকাদি দেখেও কথা বলছে না। চোখাচোখি হল, তবুও না। ওরা ওই জটলা থেকে বেরিয়ে এল। সন্ধে সাড়ে সাতটার মতো, একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে বলে রাস্তার ওপর জলের পর্দা। গাছের পাতা থেকে দু'ফোঁটা এক ফোঁটা জল পড়ছে, বেশ লাগছিল। পরি দেখল নন্দন চত্বরে গাছতলায় বেশ ভিড়। সব জোড়ায় জোড়ায়। পরির মনে এল 'একটু জায়গা দাও মাগো মন্দিরে বসি...।' কিন্তু গাইল না, মনটা একটু অফ হয়ে আছে। ওই অলোকাদির জন্যই হয়তো। এক জায়গায় এক জোড়া উঠে গেল। পরি বলল, চলো বসি। চয়ন বলল, না বসব না, এখন মাস্টারি করি তো, যদি কেউ দেখে ফেলে...।

তো কী হয়েছে? মাস্টারমশাই হলে বুঝি কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা যায় না...।

চয়ন বলল, মেয়ের সঙ্গে তবু যায়। কিন্তু তোকে দেখতে তো এখনও ঠিক—ও বুঝেছি। হিজড়ে হিজড়ে লাগে। তাই তো?

উঠে দাঁড়ায় পরি। বলে, বুঝেছি। তারপর স্বগতোক্তির মতো বলে, ওই জন্যই তো আমি অপারেশনটা করার কথা ভাবছি চয়ন। চিকেন পক্স-এর খোসার মতো, ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও দেওয়ালের 'ভোট দিন' পোস্টারের মতো আমার গায়ে লেগে থাকা ছেলেত্বটা ছিঁড়ে দেব, শিওর।

চয়ন চুপ করে থাকে। ও জানে এইসব অপারেশন প্রচুর খরচার ব্যাপার। এবং এ ব্যাপারে চয়নের অনেকটা দায়িত্ব আছে। অথচ ও পারছে না, তাই এই প্রসঙ্গে ক্যাবলা হয়ে থাকা ছাড়া ওর কোনও ভূমিকা থাকে না।

ঠিক আছে—তবে বাড়ি যাই...। পরি ওঠে। চয়ন বলে একটু ওদিকের রাস্তায় হাঁটলে ভাল লাগত...ওয়েদারটা বেশ, চয়ন রেস কোর্সের দিকটার দিকে আঙুল নির্দেশ করে।

পরি বলে, না, তুমি শিক্ষকমহাশয়। কেউ দেখে ফেলবে। কোথাও যাব না। আই ডোন্ট ওয়ানা গো। বাসে উঠব।

তখনই ক্যালকাটা ক্লাব চোখে পড়তে, ডাক্তার বাবুর কথা মনে পড়ল। মনে হল, একবার ঘুরে এলে হয়। সেদিন ডাক্তারবাবুকে মজার লোক মনে হয়েছিল।

চয়নকে বলল, চলো ক্যালকাটা ক্লাবে যাই।

চয়ন বলল, ওখানে কী?

পরি বলল, চলো না, ওখানে তোমার ছাত্রদের যাওয়ার কোনও চান্স নেই। হাত ধরেই পরি টেন নেয় চয়নকে। ডাক্তারবাবু সবই জানে।

বিরাট গাড়ি বারান্দা। বড় নাম। ঢুকতেই সাদা ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটির লোক বলল, কোথায় যাচ্ছেন?

পরি বলল, ডাক্তার এ কে সেন। আসতে বলেছেন।

সিকিউরিটি পরিকে বলল, আপনি যেতে পারেন। উনি অ্যালাওড নন। চটি চলে না।

চয়নের পায়ে চটি ছিল। পরির পায়ে নাইক সু।

চয়ন বলল, তুই যা। চয়ন ছিটকে বেরিয়ে গেল। চটাস চটাস চটির আওয়াজটা যেন একটু বেশি।

যাকগে। চয়নের পিছন পিছন ছুটল না পরি। পরি ভিতরে ঢুকল। কাজের সুবাদে বড় হোটেলে ঢুকেছে পরি, টলি ক্লাবেও একবার। এখানে প্রথম। বাঁ দিকে কাচের দরজা, ওখানে বড় বড় সোফায় বসে আছে অনেকে। দরজাটা খুলল না ও। সামনে বারান্দা। বারান্দার পরে লন। বারান্দায় একটা গোল টেবিলে ডাক্তারবাবুকে দেখতে পেল পরি। টেবিলে আরও দু'জন। টেবিলে কাচের গ্লাসে সোনালি হুইস্কি।

পরি হাত জোড় করে। চিনতে পারছেন স্যর? আসতে বলেছিলেন, আমার নাম পরি। আপনার কাছে গিয়েছিলাম, আমার গলার ভয়েসটা...।

ও, ইয়েস, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বোসো। অন্য দু'জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। একজন টেলিভিশনের হ্যালো ডাক্তারবাবুর অ্যাংকার, অন্যজন এটি বিখ্যাত হোটেলের শেফ্। আর পরির পরিচয় দিল আমার ইয়ং-ভেরি ইয়ং ফ্যাশন ডিজাইনার ট্রান্সজেন্ডার ফ্রেন্ড।

'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দটা যেভাবে উচ্চারিত হল, তার মধ্যে কোনও সস-মেয়োনিজের প্রলেপ ছিল না।

টেবিলে ফিশ ফিঙ্গার, বাটিতে লাল সস্ এবং মেয়োনিজ। ডাক্তারবাবু বললেন, খাও। আস্তে করে বললেন, একটু হুইস্কি? ঘাড় নাড়ল পরি, নিষেধের। ডাক্তারবাবু বললেন, ওকে, ওকে। এধার ওধার থেকে শব্দ ছুটে আসছে—ব্লেন্ডারস প্রাইড—আইস কিউব—সেনসেক্স—জিনসেঙ—ভ্যান হুসেন—ইনসুলিন...। জুতোর শব্দ, হা-হা হাসি, গন্ধ আসছে পারফিউমের, ঝলসানো মাংসের, অ্যালকোহলের। টুকরো-টুকরো জৌলুস ঝলসানো মাংসের মতো এখানে-ওখানে ছিটানো। পরি বলল, ওই অলোকা সরকারের কথা বলবেন বলেছিলেন...।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস, অ্যাট দ্য সেম টাইম, ইট ওয়াজ ভেরি স্যাড। বলতে চেয়েছিলাম তোমায় এটা বলতে যে, বেশি ক্রেজি হয়ো না। ওই অলোক, অর অলোকা—হোয়াট এভার, ওর জীবনের কথা বলেছিল। আমি ভাবছিলাম তোমায় বলি, বলতে শুরুও করে দিয়েছিলাম, তখন আমার সেক্রেটারি কাম কেয়ারটেকার কাম দারোয়ান ঘরে ঢুকল। আমি খুব গপ্পোর লোক। ওকে বলা আছে এদিক-ওদিক বুঝলে ঘরে টোকা মেরো। তাই সেদিন বলা হয়নি। তা, ছেলেটা, সরি, মেয়েটা, হোয়াটএভার, বলেছিল সার্জারি করার আগে ওর যে সব প্রেমিক ছিল, ওরা বেশিদিন টিকত না ওর যে সব প্রেমিক জুটত, ওরা মোস্টলি বাইসেক্সুয়াল। কিছুদিন ওর সঙ্গে মেশামেশি করে তারপর আর সম্পর্ক রাখত না। মেশামিশি মানে কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ তো? পরি ঘাড় নাড়ে।

ডাক্তারবাবু হুইস্কির গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বললেন, গুড। ইউ আর কোয়াইট অ্যাডাল্ট। ভোট দিয়েছিলে? পরি বলে, দু'হাজার ছ'য়ে দিয়েছিলাম। ওরা তো আমার সেক্স মেল লিখেছিল। কিছুতেই ফিমেল লিখল না। দু'হাজার ন'য়ে চেষ্টা করব যেন অন্তত পক্ষে আদার লেখানো যায়। এবার ফর্মে মেল, ফিমেল-এর সঙ্গে 'আদার' ছিল।

অলোক ফিমেল হিসেবেই ভোট দিতে পেরেছিল। ডাক্তারবাবু বললেন। দ্যাট ওয়াজ এ লং প্রসেস। প্রথমে তো অপারেশন। ব্রেস্ট বানাবে, ভ্যাজাইনা বানাবে। ভ্যাজাইনা থাকলেই স্ত্রী লিঙ্গ হয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার। আরে বাবা, ওই ভ্যাজাইনার গোড়ায় ইউটেরাস আছে কি না, ওভারি আছে কি না—ওসব কোনও ব্যাপার নয়। ভ্যাজাইনা বানিয়ে ডাক্তার যদি সার্টিফিকেট দেয়, ব্যস হয়ে গেল। তারপর এ্যাফিডেভিট করে নাকি ও সেক্স চেঞ্জ করেছিল।

শেফ বোধহয় স্পাইস-এর গন্ধ পেয়েছে। বলল, সরি টু ইনটারাপ্ট। ওটা কি ওরিজিনাল ভ্যাজাইনার মতো হয়?

ডাক্তারবাবু বললেন, আমি কি দেখেছি নাকি, নাকি দেখেই বুঝতাম।

টিভি অ্যাংকার ছোট করে পরিষ্কার করে বলল, মা-ঠাকমাদের হাত চিপে বার করা আমের রস আর ম্যাঙ্গো ফ্রুটির ড্রিঙ্কস কি এক হয় কখনও? আমার আঙুলের আংটিতে আসল হিরে। জাতই আলাদা। আমেরিকান ডায়মন্ড চকচক করে হয়তো বেশি, কিন্তু...

ডাক্তারবাবু ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এনি ওয়ে...। কী যেন বলছিলাম...।

শেফ বলল, ভ্যাজাইনা...ভ্যাজাইনা...

ডাক্তারবাবু বললেন, তার আগে কী যেন বলছিলাম? বয়ফ্রেন্ডস। ইয়েস। অলোকার বয়ফ্রেন্ডরা কিছুদিন পর কেউ বিয়ে করে নিত, কেউ বা অন্য মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হত। ও তখন ভ্যাজাইনা বানানোর জন্য মরিয়া হয়ে গেল। এর আগেই বোম্বে থেকে ব্রেস্ট বানিয়ে এসেছিল। কিছুদিন পরই ক্যাস্ট্রেশন করিয়ে প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে ভ্যাজাইনা বানিয়ে নিল। এরপর ওর একটা প্রেমিক জুটল। পুলিশে চাকরি করে। কনস্টেবলের একটু উপরেই। এএসআই হতে পারে। ওই পুলিশটা নাকি ওকে সামনেও ইউজ করত, পেছনেও। কিন্তু সামনে খুব ভাল করে পারত না। অলোকা বলেছিল—ওর ভ্যাজাইনাল ক্যাভিটিটা চার ইঞ্চির মতো ছিল। স্ট্রেচ্‌ড হলে সাড়ে চার, হয়তো ম্যাক্সিমাম পাঁচ ইঞ্চি পর্যন্ত হত। পুলিশের ওতে হত না। হিজ থিং ওয়াজ লংগার। এজন্য দেখো, ওই পুলিশটার জন্য ও আবার অপারেশনে গেল। কারণ, যে ক্যাভিটিটা করা হয়েছিল, ওটা তো একটা ব্লাইন্ড চ্যানেল। একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। ন্যাচারাল ভ্যাজাইনা তো ব্লাইন্ড নয়। সার্ভিক্স, মানে জরায়ু মুখ পর্যন্ত এমনিই একটা স্পেস আছে, তারপর চাপ পড়লে আরও সরে যায়। কিন্তু আর্টিফিসিয়াল ভ্যাজাইনাল চ্যানেল তো...এরকম...।

যেন খাঁড়ি। কোনও উৎস নেই নদীর মতো...। হাত মোছার টিস্যু পেপারে ছবি আঁকলেন ডাক্তার।

বোঝো, আবার সার্জারি। তিন সপ্তাহ পর ফিরে এসেছিল ও।

ক'ইঞ্চি করল? শেফের জিজ্ঞাসা। জানি না ঠিক। খুব বেশি তো করা যায় না। ব্লাডার-প্রস্টেট বাঁচিয়ে করতে হবে।

—আচ্ছা, কথাটা উঠল যখন জিজ্ঞাসাই করে ফেলি, এই যে আর্টিফিসিয়াল ইয়েটা হয়, ওটায় ইয়ে হয়?

—মিনস? মানে?

—ভেজে?

হেসে উঠলেন ডাক্তার। ওটা তো আমারও প্রশ্ন ছিল। ঠিক এই প্রশ্নটাই জিজ্ঞাসা

করেছিলাম ওকে ফর মাই অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট।

ও খুব ফিলোজফিকাল উত্তর দিয়েছিল। বলেছিল, চোখের জলের মতো ভেজে। আনন্দাশ্রুর মতো ভেজে। তারপর বলেছিল, স্যর, এমনকী অন্তর আছে নারী-নরে? অন্তরে রয় যদি ধন...। হয়তো কিছুটা ফ্লুয়িড ক্ষরিত হয় প্রস্টেট থেকে। যে টিস্যুগুলো দিয়ে ভ্যাজাইনাল চ্যানেল করা হয়েছে ওরা তো ফ্লুয়িড তৈরি করতে পারে না...।

যাক গে, যেটা বলছিলাম। এত কাণ্ড করে অপারেশন করাল, কিন্তু ওর বয়ফ্রেন্ডের বায়না মেটে না। বলছে লাভ মেকিং-এর সময় ওর গলা থেকে ছেলেদের মতো শব্দ বেরয় বলে ওর নাকি লুজ হয়ে যায়। বোঝো।

এতক্ষণ পর পরি কোনও কথা বলল। ও জিজ্ঞাসা করল—শুধু ওই একটা কারণে ও ভয়েসটা চেঞ্জ করতে চাইছিল? নিজের কারণে নয়? নিজের কাছে ওর নিজের গলাটা ভাল লাগছিল?

ডাক্তাবাবু বললেন, দ্যাট্স এ গুড পয়েন্ট। ওর নিজেরও নিশ্চয়ই ভাল লাগছিল না, ও তো ওর ইন্ট্রোডিউসিং সেনটেনসেই বলেছিল আমার শরীরে একটা পুরুষের খোলস ছিল, ফেলে দিয়েছি ওটা। শুধু গলার স্বরটা ঠিক করে দিন।

যেটা বলার জন্য এত কথা। ব্যাঙ্ককের ক্লিনিকটার ঠিকানা আমিই দিয়েছিলাম ওকে। ও ব্যাঙ্কক গিয়েছিল। অপারেশন হয়েছিল। তারপর থেকে ও মাম।

মাম মানে? পরি প্রায় আঁতকে উঠে বলল।

কী আবার? কথা বলতে পারে না।

ফিরতে একটু রাত হল পরির। দোকান থেকে রুটি কিনে নিয়েছে। অন্যদিন ফ্ল্যাটের চাবি রাখা রিংটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে ওপরে ওঠে। আজ রিংটা আঙুলে নিল না। ওর মাথায় কেবল অলোকাদি ঘুরছে। অলোকাদির গলা থেকে এখন যে শব্দ বের হয়, সেটা কি কেবল গোঙানি?

রুটি ক'টা খবর কাগজে মোড়ানো। কাগজের ওপর দেখল মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গয়না পরা ছবি। একটা পুরনো আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৬ জুলাই ২০০৫। মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্টারভিউ। হেডিং—স্বামী আমার প্রতারক।

খাওয়া পরে হবে। আগে 'ইন্টারভিউ'-টা পড়ে নেওয়া যাক। মানবীদি'র সঙ্গে যোগাযোগ নেই পরি-র। একদিন টেলিভিশনেও দেখেছিল একটা 'ইন্টারভিউ'-তে। বলছিল এফিডেভিট করে কীভাবে সোমনাথ থেকে 'মানবী' হয়েছে। ওর পিএইচডি-র রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে 'মানবী' নামে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বাংলা সাহিত্যে 'তৃতীয় সত্তা'-চিহ্ন বিষয়ে ওই গবেষণা। ইন্টারভিউ'তে মানবীদি ওর স্যরের কথা বলেছিলেন—একটাই শর্ত, যখন আমার কাছে আসবি, কানে দুল পরে আসবি না।

সেই ইন্টারভিউয়ের কয়েকটা কথা একটু-একটু মনে পড়ছিল। দৈত্যদের কবল থেকে অমৃত উদ্ধার করতে স্বয়ং বিষ্ণুকে মোহিনী বেশ ধারণ করতে হয়েছিল। এত রম্ভা-উর্বশী-মেনকা থাকতে খোদ 'দেব-ডিরেক্টর'কে কেন মোহিনী বেশ ধারণ করতে হয়েছিল—প্রশ্ন তুলেছিলেন মানবী।

বিষ্ণুর মোহিনী-রূপ ধারণ নিয়ে যে নৃত্যধারা গড়ে উঠেছে, তার নাম 'মোহিনী আট্যম'। মোহিনী আট্যমের সমস্ত পুরুষ শিল্পীদের নারী-সজ্জায় নাচতে হয়। ওড়িশি নৃত্যগুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের কেশবিরল মাথাটা বাদ দিয়ে দেহবিভঙ্গে অবাক হয়ে দেখতে হয় কী ম্যাজিকে একজন বৃদ্ধ লাস্যময়ী তরুণীর দেহপট গড়ে তোলেন। মানবী বলেছিলেন—সভ্যতা যত এগোবে নারী-পুরুষ সংজ্ঞার বৈষম্য ঘুচে গিয়ে, লিঙ্গ-বৈষম্য ক্রমশ লীন হয়ে গেলে 'সমকামী' শব্দটার কোনও মানে থাকবে? এরকম কথা যে বলেছেন, তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কেন এমন সস্তা হেডিং? একটু খারাপ লাগে পরি'র। রুটিটা আলাদা রেখে ভাঁজ করা কাগজটা টানটান করে। খবর কাগজের একটা পৃষ্ঠার অর্ধেক ছিঁড়ে রুটিগুলো 'প্যাক' করা হয়েছিল। ইন্টারভিউয়ের কিছুটা হয়তো বাকি অর্ধেক রয়ে গিয়েছে। খাওয়া পরে হবে। আগে পড়ে নেওয়া যাক। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ জুলাই, ২০০৫।

'পত্রিকা : শুনলাম সেক্স চেঞ্জ করে বিয়ে করেছিলেন?

মানবী : হ্যাঁ। কিন্তু জানেন... সে বড়ই বেদনার। কী সাঙ্ঘাতিক মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যে চলেছি গত দেড়টা বছর... বিশ্বাসঘাতকটা আমার শরীর-মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে... আমায় ভাসিয়ে চলে গেল!

পত্রিকা : বিয়ের কতদিনের মধ্যে?

মানবী : মাস দু'য়েকের।

পত্রিকা : কিন্তু উনি তো জানতেন আপনি পুরুষ থেকে নারী হয়েছেন?

মানবী : খুব ভালভাবেই। ইনফ্যাক্ট, আমি যখন সেক্স চেঞ্জের দিকে এগোচ্ছি, তখন থেকেই ও আমার সঙ্গে। মানসিকভাবে ভীষণ সাহায্য করেছে।

পত্রিকা : তা হলে?

মানবী : সে অনেক কথা। বলতে গেলে...

পত্রিকা : বলুন না...

মানবী : আমি ঝাড়গ্রামে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকি। ওই বাড়িতে ওয়াটার ফিল্টারের একটা অফিস আছে। হঠাৎই শুনি ওই অফিস ঘরটা বড় হবে। সেই জন্য আমায় অন্য ঘরে চলে যেতে হবে। আমি কলেজে পড়াই। একা মানুষ। তবু বলামাত্র উঠে যাই সামনের ঘরে। এ দিকে আমার পুরনো ঘরে যে ভদ্রলোক এলেন, তিনি ওই অফিসের মালিকের সম্বন্ধী। নাম অভিজিৎ পাহাড়ি। এই অভিজিৎকে আমি বিয়ে করি।

পত্রিকা : বেশ তো, তারপর?

মানবী : আমার হাজব্যান্ডের ভগ্নিপতি প্রথমে আমাকে একদিন ডেকেছিল ওর ঘরে। ডাকটা অত্যন্ত কুরুচিকর। এখন বুঝতে পারছি, স্বয়ং মালিক আমায় ভোগ করতে চেয়ে পারল না বলে অভিজিৎকে মগজ ধোলাই করে আমাকে জব্দ করার প্ল্যান করল।

পত্রিকা : বুঝলাম না!

মানবী : আরে বাবা, ছোট থেকেই যেহেতু প্রতি মুহূর্তে উত্যক্ত হয়েছি, 'পীড়িত' হয়েছি পুরুষের দ্বারা, আমি বুঝি ওই দৃষ্টির মানে... একটি মেয়েও বোঝে। তবে বুঝিনি তার দাম এভাবে দিতে হবে!

পত্রিকা : কিন্তু এ তো ভগ্নিপতির কথা। স্বামীর কথা কিছু বলুন।

মানবী : ওর কথা বলতে গেলে ওর ভগ্নিপতির কথা বলতেই হয়। কারণ, উনিই যত নষ্টের মূল... যাই হোক, স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় ওই বাড়িতেই। প্রথমে আমরা পরস্পরকে দেখতাম, আমার অবাক লাগত, ভদ্রলোক ভগ্নিপতির আন্ডারে কাজ করে, দেড় হাজার টাকা মাইনে পায়... বাসন মাজে, ঘর ঝাড় দেয়—তো একদিন বলল, আপনাকে ডেমনস্ট্রেশন দেব, আমাদের ওয়াটার ফিল্টারের ব্যাপারে। ঠিক আছে... আসবেন সন্ধেবেলা। কিন্তু সেদিন এল না। সামনাসামনি ঘর। জিজ্ঞেস করলাম। বলল, শরীর খারাপ, কালকে ঠিক যাব। তবে সত্যি বলছি, প্রথম থেকেই অভিজিৎকে আমার ভাল লাগত, বেশ ভদ্র। ওর ভগ্নিপতির মতো ওর চোখে কোনও শিকারি দৃষ্টি দেখিনি। ওর চোখে দেখেছিলাম সুস্থতা... মানে যথার্থ এক পুরুষকে। কিন্তু ওমা! যেদিন ও বলল 'কালকে' যাব, সেদিনই রাত্রিবেলা, ওদের অফিসের চারজন হঠাৎ এসে আমায় বলে, আপনি আমাদের সহকর্মী অভিজিতের সঙ্গে প্রেম করছেন। আপনি তো আমাদের প্রডাক্ট নেন না। তা হলে ডেমনস্ট্রেশন নিচ্ছেন কেন? ভাবুন!

পত্রিকা : কেন এরকম বলল?

মানবী : কি জানি, হয়তো আমাদের দু'জনের এই ভাল লাগার ব্যাপারটা ওরা বুঝতে পারছিল।

পত্রিকা : তারপর?

মানবী : আমি খুব প্রতিবাদ করলাম। বললাম, কী ব্যাপার অভিজিৎ, এরা কী বলছে? ওমা, দেখি অভিজিৎ একেবারে সেদ্ধ ঢেঁড়স! ঘাড় গুঁজে, লজ্জা পেয়ে... পরদিন এসে আমাকে বলে কিনা, জোনাল অফিসে রটে গিয়েছে আপনার সঙ্গে আমার প্রেম। তাই ওরা আর আমাকে রাখবে না। আমিও ভাবছি চাকরিটা ছেড়ে দেব... বলেই ও ওর জীবনী বলতে শুরু করে। ওর কেউ নেই, সৎ মা, বাবা অল্পবয়সি এক মেয়েকে বিয়ে করেছে... বুঝলাম অভিজিৎ আমার কাছে সারেন্ডার করতে চাইছে। তা না হলে, সে আমাকে কেন দুঃখের কথা বলবে? তখন বললাম, আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু হলেন... এরপর আমাদের সেই সম্পর্ক এমন তৈরি হল যে, ও না খেলে আমি খেতে পারি না। ও দিনের পর দিন না খেয়ে থাকত। ওকে আমিই খাওয়াতাম।

পত্রিকা : কিন্তু এই প্রেম চলাকালীন আপনার এই রূপান্তর নিয়ে ও কিছু বলত না?

মানবী : বলত। বলত, আপনি তো আর্টিফিশিয়াল নারী... কেন এটা হলেন? ওকে বোঝাতাম, সভ্যতাটাও তো আর্টিফিশিয়াল। না হলে তো গুহা ছিল প্রাকৃতিক, কী দরকার ছিল এত বড় বড় ম্যানসন তৈরি করার? আপনাদের ওয়াটার ফিল্টারও তো কৃত্রিম। প্রাকৃতিক জল খেলেই তো ভাল হত, তাই না? এ রকম নানা বিষয়ে তর্ক হত। ওর মস্তিষ্কে ঢোকাতে হত পৃথিবীর যে সুচারু, শিল্পিত জীবন, সেই জীবনটা আসলে কী।

পত্রিকা : আপনাদের এই কোর্টশিপটা কতদিন চলে?

মানবী : বেশি দিন না। ক'দিনের মধ্যেই আমরা বিয়ে করি।

পত্রিকা : কে কাকে প্রথম প্রেম নিবেদন করেছিলেন?

মানবী : ও-ই প্রথম করে। আমি বলি, আমার বিয়ে করার খুব ইচ্ছে। জীবনের সব কিছুই যখন হল, তখন বিয়েটা করতে অসুবিধে কোথায়? ভীষণভাবে একটা সংসার চাই।

পত্রিকা : শুনেই অভিজিৎ রাজি হয়ে গিয়েছিল?

মানবী : না। বলত তুমিও বিয়ে করবে না। আমিও করব না। আমরা একসঙ্গে থাকব। সেই রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে গোরা, বিনয়কে যেমন বলেছিল। কিন্তু আমি কোনও দিন ভণ্ডামি চাইনি। চেয়েছিলাম বিয়ে। কারণ, বিছানায় দু'টো শরীরকে আমি ভীষণভাবে রেসপেক্ট করি।

পত্রিকা : আপনাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল?

মানবী : ওমা, নিশ্চয়ই, আমাদের মধ্যে যখন শ্রদ্ধা আছে, প্রেম আছে, তখন যৌনতা থাকবে না? তা ছাড়া আমার যখন বুব্‌স, ভ্যাজাইনা, ম্যামরি গ্ল্যান্ডস তৈরি হল, সেইগুলো তো তৈরি হল ভোগ করার জন্যই। আমি তো 'পথ' তৈরিই করলাম সেখান দিয়ে 'হাঁটা'-র জন্য। আমার দেহ চাইছিলই সেই 'জানলা-দরজা'গুলো খোলার জন্য। শরীরের মধ্যে একটা ছটফটানি ছিল, না হলে উন্মুক্ত হতে পারছিলাম না।

পত্রিকা : আপনাদের বিয়েটা কবে হল?

মানবী : আসছি, আসছি। পর পর বলছি। যখন ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিই...ও লিভ টুগেদারের প্রপোজাল দেয়...আমি বলি, দ্যাখো ভাই, লিভ টুগেদারের লোক অনেক পাব...আমি ভাল চাকরি করি, আর তোমার অবস্থা ভাল নয়...মানে খোঁড়ার সঙ্গে কানার বন্ধুত্ব। সে ক্ষেত্রে দু'জন সমব্যথী মানুষের বিয়ে করাটাই তো মঙ্গল। লিভ-টুগেদার করতে যাব কোন দুঃখে! পৃথিবীতে কি ছেলের অভাব?

পত্রিকা : তারপর?

মানবী : অভিজিৎ বলল, আমাকে কিছুদিন সময় দাও। তোমাকে জানাব। দিন-পনেরো পর বলল, আমি তোমাকে বিয়ে করব, মন ঠিক করে নিয়েছি। তারপরে আমরা একটা ঘরে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করি। পরে রেজিস্ট্রি করব বলে দিন ঠিক করি।

পত্রিকা : তারিখটা কত ছিল?

মানবী : ২৩ অগাস্ট ২০০৩।

পত্রিকা : তারপর?

মানবী : রেজিস্ট্রি করার যেই কথা হল, তার দু'তিনদিন বাদে দেখলাম ওর ভগ্নিপতি এল। আমাকে, অভিজিৎ হঠাৎই বলল, 'আমাকে যেতে হবে'। আমি বললাম, আমাদের যে রেজিস্ট্রি হওয়ার কথা? তখন ও একটি চিঠি লিখে যায়। লেখে, দিন পনেরো বাদে এসে আমরা রেজিস্ট্রি করব। কিন্তু তারপর আর ফোন করল না, কিচ্ছু না। এদিকে ভগ্নিপতি বাড়িওয়ালাকে উদ্দেশ করে একটা চিঠি লেখে, যার বিধেয় আমি। লিখেছে আমি নাকি বাড়িতে অসামাজিক কাজ করি। মানে পুরো গোলমাল পাকিয়ে দিল বাড়িওয়ালা আর ওর ভগ্নিপতি। এর পর বাড়িওয়ালা শুধু ওই চিঠিটা আমাকে ধরিয়েই দিল না, ওখান থেকে উচ্ছেদ করার জন্য শুরু করল অত্যাচার।

পত্রিকা : যদি রেজিস্ট্রি করতেন, তা হলে অসুবিধে হত না?

মানবী : কোনও অসুবিধেই হত না। আমি তো এখন গোটা এক নারীই। অসুবিধে ওর হত। আমাকে খোরপোষ দিতে হত।

পত্রিকা : আইনত এই নারী হওয়ার জন্য কী করতে হয়েছে?

মানবী : ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হয়েছে। সেখানে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে হয়েছে, যে ডাক্তাররা আমাকে মেয়ে তৈরি করেছেন, এরপর ওরা আমাকে ছাড়পত্র দিয়েছে। এবং সেটা কাগজে আমাকে ডিক্লারেশন দিতে হয়েছে।

পত্রিকা : পুরনো কথায় ফিরে আসি, আচ্ছা, এরপর অভিজিতের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগই হল না?

মানবী : হয়েছে। পরে আসছি। তবে এখন মনে হয়, ও প্রথম থেকেই ছক করেছিল। কেননা ওকে কেন্দ্র করে পুলিশ, বাড়িওয়ালার হুমকি, জল বন্ধ কী না সহ্য করেছি? বাড়িওয়ালা তার লোকজন দিয়ে আমাকে মারধর পর্যন্ত করল। সেই 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'-তে তনুজাকে যেমন অসামাজিক মেয়ে হিসেবে অত্যাচার করা, তেমন। আমি ওখান থেকে পালিয়ে যাই। তবে প্রমাণ করতে চেয়েছি, আমি নারী, আমাকে মেরে কোথাও সরানো যাবে না। তখনই আমি উওমেনস কমিশন-এ আসি।

পত্রিকা : মহিলা কমিশনেও গিয়েছেন?

মানবী : হ্যাঁ। 'উওমেনস কমিশন' আমায় নারী বলার পরে পরেই চিত্রটা বদলে যায়। আমার হাজব্যান্ড অভিজিৎ আমাকে ফোন করে। বলে, তুমি আমাকে একটা ফোন করলে না কেন? ও আবার ফিরে আসে আমার কাছে। এমনকী গত বছর রাসপূর্ণিমার দিন আমরা মেদিনীপুরের লজে থাকি। তখনই বুঝি ও আসলে চিটার। আমার থেকে আসলে জিনিস চায়। এটা দাও, ওটা দাও।

পত্রিকা : চিটার!

মানবী : এখন মনে হয়। কেন না ও সারাক্ষণ বলতে চাইত...

পত্রিকা : কী কী দিয়েছেন ওকে?

মানবী : অনেক কিছু। সে বলে আমি ছোট হতে চাই না। আসলে ওটা ছিল ওর ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং... যাই হোক, 'মহিলা কমিশন' জাঁহাতক আমাকে সমর্থন করল, তখনই এস পি-টেসপি ওকে ঘিরে ধরল। এদিকে এই 'ইস্যু' নিয়ে বাড়িওয়ালা যখন আমার ওপর অত্যাচার শুরু করল, আমি ঝাড়গ্রাম পুলিশ স্টেশনে গিয়ে দু'দিন অনশন করেছিলাম। ওমা, দেখি পুলিশ তখন গ্রেফতার করল বাড়িওয়ালার শালার ছেলেকে। বাড়িওয়ালাকে নয়। আমি অবাক হয়ে যাই, এই সমাজে মেয়েরা কী করবে?

পত্রিকা : আচ্ছা... তা মহিলা কমিশন কী করল?

মানবী : কী করল? স্বামীকে আজ একবছর ধরে ডেকে পাঠাচ্ছে, কিস্যু করতে পারছে না। তাদের সেভাবে কোনও ক্ষমতা নেই। মহিলা কমিশন কিছু ডি এম, কিছু এস পি, কিছু পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল। ডি এম, এস পি কী করছে? আমাকেই গিয়ে গিয়ে জুতোর সুখতলা খসাতে হচ্ছে। মহিলা কমিশনের মহিলারা প্রচুর হেল্প করছেন ঠিকই, কিন্তু কোনও ফ্রুটফুল জায়গায় পৌঁছতে পারছেন না।

পত্রিকা : আচ্ছা, আইনের একটা ৪৯৮এ ধারা আছে না...

মানবী : এই ধারার সাহায্য আমি পাব কেবল শ্বশুরবাড়ির ক্ষেত্রে। বাড়িওয়ালার ক্ষেত্রে এই আইনি সাহায্য আমি পাব না।

পত্রিকা : তা আইনের পথে আপনি আপনার অধিকার ফিরে চাইছেন না কেন?

মানবী : ঠিকই। আইনের পথে এখনও নামিনি। কিন্তু যেদিন মহিলা কমিশন বলবে, সেদিনই আইনের পথ ধরব।

পত্রিকা : আপনার সঙ্গে কি ওঁর সম্পর্ক একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে?

মানবী : কী বলব, ক'দিন আগেও এসেছিল। আমরা লজে থাকলাম। কিন্তু যেই বলছি, রেজিস্ট্রি না-করলে একটা পয়সাও আর দেব না, তখই বিগড়োচ্ছে। ফোঁস ফোঁস করছে। বলছে, 'তুমি আমাকে একেবারে ফোন করবে না।' আসলে ও বুঝে নিয়েছে ওকে আমি ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি। সত্যিই খুব ভালবেসেছি। আমার ছাত্রীরা দেখেছে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি— দু'মাস পুরো কেঁদে কাটয়েছি। তখন থেকেই আমার সাইকিক ট্রিটমেন্ট শুরু হয়েছে। কারণ ওকে ছেড়ে থাকার কথা আমি ভাবতেই পারছি না।

পত্রিকা : আপনি শাঁখা-সিঁদুর পরেন নিয়মিত?

মানবী : 'উওমেনস্‌ কমিশন' বলেছে আপনি সিঁদুর শাঁখা ছাড়বেন না। কিন্তু অভিজিৎ কী বলে জানেন? বলে, 'তুমি কি শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে বিয়েটা প্রমাণ করতে চাও?' আমি বলেছি, না, সম্পর্কটাকে প্রমাণ করতে চাই। আমার মনে হয় বিয়ে আর সম্পর্ক দু'টো আলাদা। মানে, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক, সেটা সিঁদুর পরলে খুব কনস্ট্যান্ট। কিন্তু সিঁদুরে মেঘ দেখতে তুমি ডরাও, অথচ আমি সিঁদুর না-পরলে খুব ফ্রিলান্স একটা ব্যাপার থাকে... মজা... আসলে পুরুষ সব সময়ই মুক্ত বিহঙ্গ। সেই জন্য এত কিছুর পরেও বলতে পারে, 'আমি বিয়ে করিনি'। আহা। তুমি যদি বিয়ে না-ই করো, তুমি তো রেজিস্ট্রির প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছ।

পত্রিকা : তার মানে! বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিয়ে করেনি? আপনাকে ঠকিয়েছে?'

বাকিটা নেই। আরও কিছু বলেছিল হয়তো...। যখন অভিজিৎ নামটা পড়ছিল পরি, তখন অরূপদার মুখটা ভেসে উঠেছিল একবার। চয়নের মুখটাও ভেসে উঠল, তক্ষুনি ভাসা-মুখটাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল পরি। না, চয়ন 'বিট্রে' করবে না।

কোনও গ্যারান্টি আছে? কোনও ব্যাটাছেলেকেই বিশ্বাস করিস না পরি...। ঝাড়গ্রাম থেকে যেন বলে উঠল মানবীদি। পরি বলল অনেকদিন তো হল...। দেখছি তো চয়ন খুব কেয়ারিং।

—তোর থেকে টাকাপয়সা চায়?

—না-না, তেমন ধান্ধা নেই।

—ওর চিপ্‌টি-ভুখ আছে?

—কে জানে? সেটা তো বুঝতে পারি না। কোনও মেয়ের সঙ্গে ও খুব 'ইনটিমেট'—এমন তো জানি না। ও আমাকে বেশ কয়েকবারই বলেছে 'চিপটি'-তে ও খুব একটা মজা পায় না।

—একটা কথা বলি পরি, পুরুষগুলোকে বিশ্বাস নেই। পুরুষ জাতি ভ্রমর জাতি। এক ফুলে বেশিক্ষণ বসে না। তুই শিওর কোনও মেয়ের সঙ্গে ওর ইন্টু-পিন্টু নেই?

—কে জানে দিদি, আমায় তো কিছু বলেনি।

—একটা কথা জিগ্যেস করি। যখন 'কড়ি সাতরা'-য় থাকিস, তখন বেশি আদর পাস, না কি...'নিহারন' ড্রেসে...

—'কড়ি সাতরা' মানে ছেলেদের পোশাক বোঝাতে চাইছ তো?

—জানিস না? কাঁচা গেড়ে।

—ভাল বলেছ। টেস্ট করে দেখেছি। মেয়েদের পোশাক পরলেই যে ও বেশি এক্সাইটেড হয়—এমন নয়। আবার কড়ি ড্রেসে যখন থাকি, তখন যে অচ্ছেদ্দা-তাচ্ছিল্য করে এমনও নয়।

—শোন পরি। এখন না-হয় ফ্যাশন ডিজাইনার হয়েছিস। কলেজে তো বাংলা পড়েছিলি। 'চিত্রাঙ্গদা' পড়েছিলি তো, যদিও তোর সিলেবাসে ঢোকানো ছিল না।

—পড়ব না আবার?

—চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে দেখে প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু অর্জুন পাত্তা দেয়নি। কারণ চিত্রাঙ্গদার বাবা ওকে ছেলের মতো মানুষ করেছিল। চিত্রাঙ্গদা দেখতেও ততটা মেয়ে ছিল না। এজন্য ওকে 'মদন থেরাপি' করতে হল। 'মদন থেরাপি' মানে বুঝলি তো? মদনের কাছ থেকে রূপ-যৌবন ভিক্ষে করল। তারপর অর্জুন ওকে বলল 'আই লাভ ইউ।' মদন থেরাপি না-করে দ্যাখ তো ও কীরকম বিহেভ করে। পুরো ছেলেদের পোশাকে থাক। কখনও কাজল পরবি না। ওর সামনে বিড়ি খা। দ্যাখ না, টেস্ট কর না...

—'মদন থেরাপি' তো তুমিও করিয়েছিলে দিদি, এখন তো মদনদেবের ধ্যান করে ওঁকে আনা যায় না, প্লাস্টিক সার্জেনের কাছে যেতে হয়। তুমি কেন তবে সার্জনদের কাছ থেকে রূপ যৌবন ভিক্ষে করলে? ভয়ে?

—বড্ড কঠিন-কঠিন প্রশ্ন করতে শিখেছিস তুই। ভয়, মানে পাছে পুরুষমানুষ ভেগে যায় সেই ভয়? সত্যিকথা তী জানিস ভাই পরি, মনের ভিতরের একটা মন আছে, তার ভিতরে আর একটা মন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাটা মনে পড়ছে রে...।

কালোগাড়ির ভিতরে আবার কালো গাড়ি
তার ভিতরে আবার কালো গাড়ি। সারবন্দী
জানালা দরজা, গোরস্থান ওলোট পালট কঙ্কাল
কঙ্কালের ভিতরে সাদা খুন। খুনের ভিতরে জীবন,
জীবনের ভিতরে মৃত্যু—সুতরাং
মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু।
আর কিছু নয়।

মানুষের মনের গহন কন্দরে কালো ঘরের ভিতরে আরও কালো ঘর—তার ভিতরে আরও। রূপকথার গল্পে দ্যাখ না সমুদ্রের তলায় একটা বড় গুহা, গুহার ভিতরে আরেকটা গুহা, তার ভিতরে একটা বাক্সো, বাক্সোর ভিতরে আরও একটা বাক্সো, তার ভিতরে ভ্রমরাটা। একদম ভিতরের কৌটোটায় যেটা আছে, সেটা হয়তো ভয়। কিন্তু ওটা স্বীকার করি না পরি। আমি বলি, আমি আমার শরীরের জঙ্গল ছাঁটার জন্য প্লাস্টিক সার্জেনের কাছে গিয়েছি—যেসব জঞ্জাল বিধাতার ভুলে আমার শরীরে রয়ে গিয়েছে। তুই বল না, একটা জ্যান্ত শামুকের খোলের ভিতরে কী থাকে? একটা শরীর থাকে তো? সেই শরীরটাকে কি একটা সেন্টের শিশির ভিতরে পোরা যায়? শামুকের শরীর শামুকের খোলের ভিতরেই ভাল থাকে। আমি নিজেকে

মনে-প্রাণে একজন নারী মনে করি। কেন, আমার সত্তাটাকে একটা পুরুষ-খোলের ভিতরে রেখে দেব? পৃথিবীর প্রত্যেকটা বস্তুর জন্য উপযোগী 'কনটেনার' থাকে। টুথ পেস্ট-এর টিউব আর মরিচগুঁড়োর কৌটো আলাদা। জলের বোতলে মাখন থাকে না। একটা পুরুষ-শরীরে কেন আমার নারীত্বকে পুষব? নারীশরীর চেয়েছিলাম। আমি তাই আগাছা সাফ করে ফুলগাছ লাগিয়েছি।

—নারীশরীর মানেই বুঝি ফুল? পুরুষশরীর সুন্দর নয়? আমার বান্ধবী শিকস্তি মুম্বইতে থাকে, ডেভিডের ছবি দেখিয়েছিল। মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ভাস্কর্য ডেভিড। কী ইনোসেন্ট দৃষ্টি। ঠোঁটে কী আশ্চর্য সৌন্দর্য। ডেভিড একটা ন্যাংটো পুরুষ। ন্যাংটো নয় দিদি, নগ্ন বলতে হয়। পুজো করতে ইচ্ছে করছিল, চুমু খেতেও। শিকস্তির যা ইচ্ছে করছিল, আমারও তাই। শিকস্তি বলেছিল অরিজিনাল ভাস্কর্যটা ঘেরা, কিন্তু ওটার 'কপি' রয়েছে সারা পৃথিবীতে। পদতলে চুম্বনচিহ্ন...

—আমাদের কেষ্টঠাকুরই বা কম যায় কীসে রে? সিক্স প্যাক নেই বলে? তা খামোকা ডেভিডের কথাই বা উঠল কেন? তুই ডেভিড, অ্যাডাম, টম ক্রুজ, শাহরুখ যাকে খুশি চুমু খা গে যা। পারলে আমিও খাই। কিন্তু ওই শরীর আমি নিতে যাব কেন? ওটা কি আমি? আমি কি ওই শরীরে ঢুকব?

—না-না, ওসব ঠিক আছে। মেয়েদের শরীরটাকেই ফুলগাছ বলছিলে কিনা, তাই...।

—ওলো, বুঝেছি বুঝেছি। তোর পারিক-ও ফুলগাছ। ক্যাকটাস নয়। হল? তবে শোন, তোর দিদি হিসেবে, তোর চেয়ে বেশি পৃথিবীকে জানার অভিজ্ঞতায়, তোর ওয়েলউইশার হিসেবে একটা কথা বলে দি, তোর পারিক'টাকে বেশি বাড়তে দিস না। ভালবাসবি ঠিকই, ভালবাসা, ভালবাসতে পারার প্রবৃত্তি ছাড়া মেয়েদের আছেটা কী, কিন্তু এমন ভালবাসা দেখাবি না যেন তুমি ছাড়া আমার জীবন পচা আলু। যেমন আধাবেকার আছে, ওকে তেমনই থাকতে দে। ভাল রোজগারপাতি করতে থাকলেই কাঁধে ডানা গজাবে। একটু পয়সা এলেই রক্ত চলাচল বেড়ে যায় ব্যাটাছেলেদের। তখন লিক্ম কড়কায় বেশি। বুঝলি রে ঢেমনি?

—তুমি এরকম করে বলছ কেন? তুমি না অধ্যাপিকা?

—তবে কি বলব ভর্ত্তৃখাদিকা? তৎসম শব্দপ্রয়োগে? জীবনে যা ঘা খেয়েছি, সব তৎসম 'ক্যান্টাভারাস' হয়ে গিয়েছে।

—তুমি খুব ভাল মানবীদি। জানি আমাকে খুব ভালবাস।

ভালবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাব
ভালবাসা পেলে আমি কেন আর পায়সান্ন খাবো?
ভালবাসা পেলে জানি সব হবে। ও আমাকে
ভালবাসে। ঠিক জানি। ভালবাসা পেলে আমিও
ফুল ফোটাব আমার শরীরে।

মানবীর সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথন এতক্ষণ হল। খাদ্য-মোড়ানো কাগজটা পড়ে আছে। রাত হল বেশ। পাশের ফ্ল্যাটের টয়লেটে ফ্ল্যাশ টানার শব্দ হল। সোয়া বারোটা নাগাদ এই জলশব্দ হয়। এটা প্রেম শব্দ। পোস্ট-লাভ সাউন্ড এফেক্ট। ও ফ্ল্যাটে নবদম্পতি।

মানবীদির সঙ্গে কাল্পনিক কথাবার্তা বেশ লাগল। এবার ওর সঙ্গে সত্যি-সত্যি কথা বলতে

ইচ্ছে করল। ফোন নম্বরটা নেই। অনেক দিন যোগাযোগ নেই। সত্যি-সত্যি ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আজ থাক। ফোন নম্বর জোগাড় করা তেমন কোনও কঠিন কাজ নয়।

পরি নিজের শরীরে সার্জারি করার আগে একবার অন্তত মানবীদির সঙ্গে কথা বলে নেবে।

অলকাদির সঙ্গেও বলা যেত। কিন্তু ও যে আর কথা বলতে পারে না...!

অপারেশন করে সেক্স 'চেঞ্জ' করার কথা আগে ভেবেছে অনেক বার, কিন্তু মানবীর ইন্টারভিউ-টা পড়ার পর আরও পেয়ে বসল। ইন্টারভিউয়ের সঙ্গে যে-ছবিটা ছেপেছে, ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পরি। বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু। ওই টুকরো কাগজটা ভাঁজ করে একটা ফাইলে রাখে, যেখানে ওর দরকারি কাগজপত্র আছে—মার্কশিট, সার্টিফিকেট, এবার আস্তে-আস্তে ওই ফাইলে জমা হবে আরও কাগজপত্র। ফাইলের নাম 'পরিবর্তন'। ব্যাংকশাল কোর্টের এফিডেবিট বলে 'আমি শ্রী পরিমল পাল শ্রীমতী পরি পাল নামে পরিচিত হইলাম...।' এই ফাইলে থাকবে ডাক্তারের সার্টিফিকেট—যিনি ডিক্লারেশন দেবেন, 'আমি ওর ভ্যাজাইনা বানিয়ে দিয়ে ওকে নারীচিহ্ন-সম্পন্না করেছি।' ইলেকশন কমিশনে করা দরখাস্ত থাকবে। 'আমি এফিডেবিট এবং সার্জারি-সূত্রে নারী হইয়াছি। সুতরাং আমার ভোটার কার্ডে স্ত্রী এবং F লেখা হউক।' আরও কত রকম দরকারি কাগজে ভরে উঠবে ফাইল।

শুয়ে পড়ে পরি। এই ফ্ল্যাটে রাতে চয়নের সঙ্গে শুয়েছে বেশ কয়েক দিন। এখানে ও-বাড়ির মতো নারায়ণী মাসি সন্তুদা-মাস্তনদারা নেই। কেউ কারও ব্যাপারে উৎসাহী নয়। কিন্তু ও-বাড়িতে একটা জীবন বোঝা যেত। সকাল থেকেই কলতলার বালতির শব্দ, জলের ছ্যারছ্যার, কুকুরের ঝগড়া, জঞ্জালের ওপর কাকেদের আনন্দস্বর, অদ্ভুত সুন্দর মর্নিং টিউন। একটু পরই হাওয়া নিয়ে আসছে লঙ্কা পোড়ার ঝাঁঝ, কিংবা রসুনের গন্ধ। তারে ঝুলছে লুঙ্গি, গেঞ্জি, সায়া। জাঙ্গিয়াও ঝোলে, কিন্তু ব্রেসিয়ার গোপনে থাকে। পরিও গোপনে রাখত। কখনও ঝগড়া, কখনও গড়ানো জলের মতো ও-ঘরের এফএম, এ-ঘরের কাশির শব্দ ও-ঘর থেকে শোনা যেত, আহা রে, এখানে ওসব কিছু নেই। সব প্রাণহীন। কাঠ-কাঠ।

পরির ঘুম আসে না। মন ভাল নেই। মানবীদির জন্য কষ্ট হয়। অলোকাদির জন্য কষ্ট হয়। নৃসিংহ মণ্ডল কেমন আছে এখন—সেই আইআইটি-র ছাত্রটা? সেক্স চেঞ্জ করে কেমন আছে ও এখন? তিস্তা মিত্র ভাল আছে তো? টিভিতে দেখেছিল একবার। খুব সুন্দরী লাগছিল ওকে। গলার স্বরটাও পাল্টে ফেলেছে। অপারেশন না অভ্যেস? বিপাশা কেমন আছ গো তুমি? তুমিও তো স্বর পাল্টেছ। শরীর পাল্টেছ। তোমাদের জীবনে কি ফুল ফুটেছে? আমি পরি। পরি পাল। আমিও ফুল ফোটাব। ফুল নিজের জন্য ফোটে না। তবে কার জন্য? ভোমরাদের জন্য? ওইসব অভিজিৎ পাহাড়িদের জন্য? সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আর ঋতুদা? তুমি কেমন আছো গো ঋতুদা? তোমায় যে কী চোখে দেখি তুমি জানো না। দূরের নক্ষত্রের যত তুমি। ছুঁতে পারি না, আলো দেখি। তুমি তো কিছু বলো না, মানবীদি যেমন সব বলে দেয়। কিন্তু তুমি আমাদের মনে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছ—তুমি জানো না। ভালো আছো তো? আমাদের জন্যই ভালো থেকো...ঘুম আসছে না। আয় ঘুম, আয়। মা, ও মা, আমায় ঘুম পাড়িয়ে দাও। জল হয়ে, ছায়া হয়ে আমার পাশে এসো। কী ভাল তুমি মা, এসে গিয়েছ? আমি ঘুমোব। একবারও বলব না মা

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে। বরং বলছি তুমি আমাকে আর একবার জন্ম দেবে না মা? আমি নতুন করে তোমার ভিতরে জন্ম নেওয়ার জন্য মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করতে পারি। আমি আজ মৃত্যুর ভিতর থেকে তোমার রক্তের মধ্যে প্রস্ফুটিত হওয়ার জন্য জন্মকে আলিঙ্গন করছি।

আমি পরি। আমার কাঁধে ডানা গজাল। রাখাল পরির পাল লয়ে যায় মাঠে। কালের রাখাল? কেমন ঝাপসা যেন। কুয়াশা-মোড়া। অস্পষ্ট। সদ্য ডিম ফুটে বেরনো পাখি-ছানার মতো ডানা ঝাপটাচ্ছি আমি, ডানা ঝাপ্টানোর শব্দে মা-মা ধ্বনি। টলতে টলতে কালের রাখালের পিছনে পিছনে আমরা যাচ্ছি টালমাটাল পায়ে। মানবীদি, অলোকাদি, তিস্তা, বিপাশা, আমি। কোথায় যাচ্চি? কত বড় বিক্ষত প্রান্তর আমাদের সামনে। চুনাপাথরের খাদ। সেই কুয়াশা-মোড়া ঝাপসা রাখাল কাথায় যাচ্ছে? আমরা ওর পিছন পিছন...।

ফ্ল্যাটবাড়িতে সকাল হয় মোবাইল অ্যালার্মে। ছ'টায় অ্যালার্ম বাজলে ছ'টাতেই সকাল, সাতটায় বাজলে সাতটায়। আটটায় বাজলে আটটায়। সাতটায় বেজেছে আজ। চা খাবে প্রথমে। তারপর একটু কাগজ পড়া, ব্রেকফাস্ট এবং অফিস। দরজার গোড়ায় খবরের কাগজটা পড়ে আছে।

কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বোমা ফেটেছে, সিপিএম বলছে আমেরিকার সঙ্গে নিউক্লিয়ার চুক্তিতে কিছুতেই সায় দেবে না, দরকার হলে সমর্থন উঠিয়ে নেবে। ঝাড়খন্ডে ল্যান্ড মাইন ফেটে একটা পুলিশের জিপ : এরই ফাঁকে একটা খবর ৩৭৭ ধারার বিরুদ্ধে নাজ ফাউন্ডেশনের পিটিশন দিল্লি হাই কোর্ট গ্রহণ করল।

সেই ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩৭৭ ধারা। যার ভয় দেখিয়ে রতনের সঙ্গে গল্প করার সময়, সুখ-দুঃখের কথা বলার সময় পুলিশ ধরেছিল। যে ধারা পশুমেহনের সমান অপরাধে অপরাধ করে সমকামীদের। যদি পরস্পরের সম্মতিতেও দু'টি পুরুষ শরীরে যায়। আইনের চোখে সেটা দণ্ডনীয়। মুম্বইয়ের নাজ ফাউন্ডেশন ২০০১ সালে একটা জনস্বার্থ মামলা করেছিল দিল্লি হাইকোর্টে। ২০০৩ সালে এই মামলাটা ফিরিয়ে দেয়। সলিসিটার জেনারেল পিপি মালহোত্রা বলেছিলেন হোমোসেক্সুয়ালিটি হল সোশ্যাল ভাইস। সামাজিক পাপ। কিন্তু ২০০৬ সালে ঔপন্যাসিক বিক্রম শেঠ একটা বড় লেখা লিখলেন। বললেন, মানুষের পছন্দ-অপছন্দ মানুষের। যৌনসঙ্গী নির্বাচনেও স্বাধীনতা থাকা উচিত। দিল্লিতে তখন ইউপিএ সরকার। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবুমনি রামদস। উনি বিক্রম শেঠকে সমর্থন করলেন। ভারত সরকার স্বাস্থ্য দপ্তর ৩৭৭-এর সংশোধনী আনতে সায় দিলেও বিরোধিতা করল স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

এর মধ্যে নাজ ফাউন্ডেশন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করল। ২০০৩ সালে ফিরিয়ে দেওয়া পিটিশনটা যেন আবার গ্রহণ করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি হাইকোর্টকে বলেছিল আবেদনটা পুনর্বিবেচনা করার জন্য গ্রহণ করতে।

আজকের খবর হল সেটা। শুনানি শুরু হবে আবার। নিশ্চয়ই LGBT-রা আনন্দ করছে। দিল্লি-মুম্বইতে বাজি ফাটবে।

খবরটা ভালই লাগল। চায়ের সঙ্গে ভালই গেল। কিন্তু পরি ভাবল—সমকামীরা একসঙ্গে নিশ্চিন্তে শোবে, এটা আর অপরাধ বলে গণ্য হবে না, তাতে ওর কী? ও তো মেয়েই।

মহা মুশকিল। মেয়ে বললেই মেয়ে? একটা জনন অঙ্গ ঝুলছে না? মেয়েদের ওই অঙ্গ কি

ঝোলানো থাকে? ওই জন্যই তো কেটে ফেলা। ওই জন্যই তো অপারেশন। রিঅ্যাসাইমেন্ট সার্জারি।

যখন বাংলা অ্যাকাডেমি রবীন্দ্রসদনে আড্ডা মারত, তখন অন্য একটা জীবন ছিল। কেমন একটা খেলা ছিল। রতন-টতনরা গোপনে টুক করে লেডিস টয়লেটে বাথরুম করে এসে ভাবত কিছু একটা জয় করে এসেছে। পরিও কি যায়নি?

শেয়ালদা স্টেশনে লেডিস বাথরুমে গিয়েছে—মহিলারাই হাই হাই করে উঠেছে। হিজড়েদের কিন্তু কিছু বলে না। ওরা শাড়ি পরে কিনা। সালোয়ার কামিজ পরা অবস্থায় দু'একবার ট্রাই করেছে, কিছু অসুবিধে হয়নি। পরির অফিসে এ নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। যে কোনও টয়লেটেই যেতে পারে। ছোট অফিস, ছোট দু'টো টয়লেট। টয়লেট তো বলে না, ওয়াশরুম। মেয়েদেরটাতেই যায়। দরকার হলে ছেলেদের ওখানেও যেতে পারে। বসেই করতে হবে এমন নয়। রাস্তাঘাটে হিসি পেয়ে গেলে তো পেইড পাবলিক ইউরিনালে দাঁড়িয়েই কাজটা সেরে ফেলে। ওসব কেটে ফেললে আর দাঁড়িয়ে হবে না। না হোক গে।

ভাল প্লাস্টিক সার্জেন খুঁজতে হবে। চেনাজানা কেউ নেই। ভেবেছিল যারা করেছে ওদের কাউকেই জিজ্ঞাসা করে ডাক্তারের খোঁজ নেবে। গত কালকের ইন্টারভিউটা পড়ে মানবীদিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে হল।

এখন ওর নতুন মোবাইল। কত দামি। আগের সিম কার্ডের সব নম্বরগুলো সব কপি হয়েছে তো? মোবাইলে সার্চে দেখল মানবীদির নাম ফুটে উঠেছে। এখন করা যায়? আজ ভাল দিন। দিল্লি হাইকোর্টে মামলার শুনানি হবে। সব গে গুলো নিশ্চয়ই এমএমএস করে তুলকালাম করছে। একটা ফোন মানবীদিকে করাই যায়।

—গুড মর্নিং মানবীদি। আমি পরি। চিনতে পারছ?

—পরি? কবিতা লিখতিস?

—হ্যাঁ।

—লিখিস এখন? শুনেছি ফ্যাশন ডিজাইনার হয়েছিস?

—কতটা ডিজাইনার হয়েছি জানি না। ওই লাইনে কাজ করি।

—খুব ভাল করেছিস। আমাদের কাজে অনেক হ্যাপা পোহাতে হত। ডিগ্রিধারী হলেই যে শিক্ষিত হয় না, সেটা প্রতিটি পদক্ষেপে বুঝতে পারি। অস্পৃশ্যতা শুধু হাতের কারণে হয় না, শরীরের কারণেও...যাকগে। বল কেমন আছিস?

—কাল তোমার একটা ইন্টারভিউ পড়লাম। যদিও পুরনো, তিন বছর আগেকার। তবে কালই হঠাৎ করে পেলাম। তুমি যে সবার নাম-ধাম করে দিলে ঝামেলা হয়নি?

—হয়েছে তো। মানহানির মামলা করে দিয়েছিল আমার বিরুদ্ধে।

—তারপর?

—চলছে।

—মহিলা কমিশনে গিয়েছিলে?

—গিয়েছিলাম তো।

—তোমায় মহিলা বলে স্বীকার করে তো?

—করবে না মানে?

—কলেজে?

—একটু ঝামেলা তো আছেই। সোমনাথ নামে এমএ, মানবী নামে পিএইচডি করছি। আগের নামের আগে ছিল শ্রী, পরে শ্রীমতী। যতসব গণ্ডগোল পাকিয়ে রেখেছি। লেগে আছি। ঠিক করে নেব।

—বলছি কি, দিল্লি হাইকোর্ট তো আবার নাজের মামলাটা নিচ্ছে।

—তাই নাকি? কাগজ পড়িনি এখনও।

—কোথায়?

—বাড়িতে। বাবার শরীর খারাপ। বাবাকে দেখছি। বাবা বলছেন ভাগ্যিস তুই মেয়ে হয়েছিস, ছেলে থাকলে তো বউ নিয়ে চলে যেতিস। কে দেখত আমায়?

—তোমার মেয়ে হওয়া বাবা মেনে নিয়েছেন?

—খুব ভালভাবে। আমার আগে দিদিরা ছিল। আমার জন্মের পর নুঙ্কু দেখে বাড়িতে খুব শাঁখ বেজেছিল। তারপর আমার মেয়েলিপনায় মা-বাবা সবারই মন খারাপ ছিল। আজ বাবা বলছে ভাগ্যিস তুই মেয়ে হয়েছিস।

পরি এবার অনেকটা শ্বাস নিয়ে বলল, দিদি, আমিও অপারেশন করাব। একটু ব্যবস্থা করে দেবে? তোমার ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলো না একবার...।

মানবী বলল—তা তো নিতেই পারি। প্রথমে একতলাটা করবি, নাকি দোতলা?

কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল শব্দের ব্যঞ্জনা বোধগম্য হতে। পরি বলল প্রথমে দোতলাটাই করি না হয়...।

মানবীর কাছ থেকে ফোন নম্বর পেয়ে সার্জেনের কাছে গেল পরি। পরির পেশার কথা শুনে বললেন, দিব্যি তো আছেন। কেন আবার এসব ঝামেলায় যাচ্ছেন?

পরি বলেছিল, আমি আমাকে আমার স্বমূর্তিতে দেখতে চাই। আমি তো মেয়ে, কেন পুরুষশরীর বহন-করে বেড়াব? আমি অন্তরে নারী, বাইরেও নারী হতে চাই স্যর, পূর্ণ নারী...

পরির কথা থামিয়ে ডাক্তার খান্না বললেন, একটা খোপের মধ্যে থাকতেই হবে? হয় পুরুষ, নয় নারী? কী দরকার? প্রফেশনে খুব কি অসুবিধে হচ্ছে?

পরি বলল, না, তেমন কিছু নয়।

—তা হলে? আপনি হুট করে কোনও 'ডিসিশন' নেবেন না।

—ভাবুন।

—অনেক ভেবেছি আমি।

ডাক্তারবাবু বললেন, আপনি নিজে ভাবলে হবে না। ভাল সাইকোলজিস্টের কাছে যান, 'সিটিং' নিন। আপনার মনটা ওরা ঠিকঠাক স্ক্যান করতে পারবেন। স্ক্যানিং মেশিনে শরীরের

ভিতরের অর্গ্যানগুলো দেখা যায়। মন বোঝা যায় না। মনের ভিতরে অনেক বুদবুদ থাকে, ওরা ওসব বুঝতে পারেন কিছুটা। শুধু 'স্টেটাস' বাড়ানোর জন্য সার্জারির মধ্যে যাবেন না।

স্টেটাসের সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক? পরি কপাল কোঁচকায়।

—আছে, আছে। অনেকে গাড়ি কিনে ফ্যালে পাশের বাড়ির গাড়ি আছে বলে। তার নিজের হয়তো তেমন 'ইউটিলিটি' নেই। আপনি যে-অপারেশন চাইছেন, সে-অপারেশন আমি বেশ কিছু করেছি। অপারেশনের পর অনেককেই দেখেছি খুব ডিপ্রেস্ড হয়ে গিয়েছেন। খুব 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিস' হয়। এখন যে ক্রাইসিস আছে তার চেয়ে অনেক বেশি। গাছ-পাকা ফল আর কার্বাইডে পাকানো ফলে তফাত আছে না? কার্বাইডে পাকানো আমকে আম পাব্লিক কি ভাল চোখে নেয়? যদিও নিজের বাগান ছাড়া গাছ-পাকা ফল পাওয়াই যায় না। এমনি মেয়ে আর সার্জিক্যাল মেয়ের তফাত আছে না? নারীসমাজের মধ্যেও ওরা 'এলিয়েন', পুরুষসমাজও ওদের নেয় না। 'টোটাল সোসাইটি'-ও হ্যাটা করে। শুধু এদেশেই যে এমন হয় তা-ই নয়, বিদেশেও। পোস্ট রি-অ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির সুইসাইডাল স্ট্যাটিস্টিক্স জানো? আমেরিকাতেই টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট। অপারেশনটা করলে ট্রান্সসেক্সুয়াল-ট্রান্সজেন্ডার সমাজে হয়তো নিজের কদর বাড়ানো যায়। থাকগে, অনেক 'পেশেন্ট' বসে আছে বাইরে। আমার সাজেশন হল—কোনও সাইকোলজিস্টের সঙ্গে কনসাল্ট করুন, তারপর একটা সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন। তা ছাড়া, আমার হাতে এখন অনেক কাজ, আমি তো শুধু এসবই করি না, আরও নানা ধরনের কাজ করি। আপনার কাজটা করব কি না জানি না। আমিও ভেবে-টেবেই করব। যদি করি, অপেক্ষা করতে হবে।

'নমস্কার' জানিয়ে চেম্বার ছাড়ে পরি। বড় ডাক্তার, প্রায়ই বিদেশে যান। কেতাই আলাদা। এটুকু সময় দিয়েছেন—তাই ঢের। ব্যাগ থেকে পার্স-টা বের করেছিল পরি, ডাক্তারবাবু বললেন—না, থাক।

এসব সার্জনদের জন্য মনে-মনে বহু দিন ধরে শ্রদ্ধা-ভক্তি পুষে রেখেছে পরি, সেই কবে থেকে। এঁরা ম্যাজিশিয়ানদের চেয়েও বড় 'ম্যাজিশিয়ান'। ঈশ্বরের কাছাকাছি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি করতে পারেন এঁরা। ঈশ্বর যেমন সৃষ্টি করেন, পালন করেন, বিনাশ করেন, এঁরাও তো তাই। পরি-র ক্ষেত্রে সিরিজ-টা না-হয় একটু পাল্টে যাচ্ছে। আগে বিনাশ, তারপর সৃষ্টি, তারপর পালন। নিনা নামে একজন মডেল আছে, ও বলেছিল, ওর নাকটা তৈরি করা। অসাধারণ নাক। বাঁশির সঙ্গে কেন উপমা দিয়েছে সংস্কৃত শাস্ত্রে কে জানে? নাকের সঙ্গে ঝাঁশির কিছুই মেলে না। কমলালেবুর কোয়ার সঙ্গে ঠোঁটের উপমা দেওয়া যায়, চেরা পটলের সঙ্গে চোখ তবুও চলে যায়, মুক্তোর সঙ্গে দাঁত ঠিক আছে। কিন্তু বাঁশির সঙ্গে নাক একেবারে যায় না। নিনার নাকি আগে থ্যাবড়া নাক ছিল। মডেলদের মধ্যে কয়েকজনের ব্রেস্ট অগ্‌মেন্টেড। ওরা তো আর বলে না, ও জানে। এই সার্জেনরা হল সুশ্রুতদের বংশধর। এঁরা সব গণেশের কাঁধে হাতির-মাথা-বসানো লোক। চেম্বার থেকে বেরনোর সময় টেবিলে হাত ঠেকিয়ে টক করে কপালে ঠেকাল পরি। বাইরে বেরিয়ে দেখল কত মানুষ বসে আছে। কারও ঠোঁট মাঝখান দিয়ে চেরা, কারও মুখ-গলা-হাতের চামড়া কুঁচকে রয়েছে—পুড়ে গিয়েছে হয়তো। সুগন্ধ ছড়ানো এক প্রৌঢ়াকেও দেখল। মুখটা যেন চেনা। টিভির কোনও সিরিয়ালে দেখেছে হয়তো। শাড়ির আঁচলে গলাটা ঢাকা। হয়তো গলার কুঁচকে যাওয়া চামড়াকে টানটান ত্বক বানাবে। চামড়া আর

ত্বকের পার্থক্য কী? কার যেন একটা পদ্যে ছিল : 'যুবতী পোশাক আঁট, যখনই তা ঢিলা সংজ্ঞা পাল্টে তিনি হলেন মহিলা।' ওটারই অনুকরণে বলা যায় 'চামড়া মলিন বড়, যখন চকচক, চামড়া পাল্টে গিয়ে হয়ে যায় ত্বক।' পরি ভাবে, ওর মায়ের চামড়া কোনও দিনই ত্বক হয়ে ওঠেনি। রোদ্দুরে বেরনোর সময় কতবার বলেছে, 'সানস্ক্রিন' মেখে বের হও মা, এনেও দিয়েছিল, মা মাখত না, খরচা হয়ে গেলে আবার আনতে হবে... অনেক তো দাম...পরি মাখুক। পরির চামড়া এখন 'ত্বক'। ও জানে। পরি শশার রস মাখে, গোলাপ জল মাখে, মুলতানি মাটি আর মধু-মেশানো পেস্ট দিয়ে স্কিনের ড্রাই সেল 'স্ক্র্যাব' করে। সেই প্রৌঢ়ার পাশে কে বসে আছে? তৃপ্তি না? সেই কলেজের তৃপ্তি। হ্যাঁ, তৃপ্তিই তো। অ্যাথলেট। একটু মোটা হয়েছে। মুখটাও যেন একটু চৌকো মতো লাগছে। ঠোঁটের ওপর একটা হালকা গোঁফের রেখাও।

তৃপ্তির কাছে গিয়ে দাঁড়াল পরি। কি রে? চিনতে পারছিস না?

তৃপ্তি বলল, আমি তো তোকে চিনতে পেরেছি। কিছু বলছিলাম না, দেখছিলাম, তুই আমাকে চিনতে পারিস কি না।

—কত দিন পর দেখা, তাই না? আমাকে চিনতে পেরেছিলি?

তোকে চিনতে পারব না? তোকে ভোলা যায়? তৃপ্তি বলে।

পরি হাতছানি দিয়ে তৃপ্তিকে অন্য দিকে ডেকে নেয়। এই হাতছানির মধ্যেই নিহিত ছিল 'প্রাইভেট কথা আছে'—যে-কথা সখীর সঙ্গে হয়।

তৃপ্তি উঠে আসে।

ওই ভদ্রমহিলা তোর সঙ্গে এসেছে? পরি জিগ্যেস করে।

ভদ্রমহিলা কি রে? মালবিকা রায়। 'তবুও সিঁদুরের' বড় পিসি। আমার সঙ্গে আসেনি, পাশে বসেছে।

—তুই খেলাধুলো ছেড়ে এখন এসব সিরিয়াল দেখিস না কি?

—আর বলিস না।

—তোকে যদিও অনেক দিন পরই দেখলাম এখানে, কিন্তু তোর ছবি দেখেছি কাগজে। ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স না কীসে যেন দু'-তিনটে গোল্ড পেয়েছিলি...।

—না, একটা গোল্ড, দু'টো সিলভার। তারপর তো রেল-এ চাকরি পেয়ে গেলাম।

—রেলে চাকরি করিস? কী মজা। খুব ঘুরিস?

তৃপ্তি বলল, এখানে ফিসফিস করে কথা বলতে ভাল লাগছে না। বাইরে চল। আমার দেরি আছে। আমি এগারো নম্বর। সবে তিন চলছে, বাইরে বেরিয়ে তৃপ্তি পরি'র হাত চেপে ধরে।

এই তৃপ্তির সঙ্গে কলেজে খুব ভাব হয়েছিল ক'দিন। দু'জনে দু'জনের প্রাইভেট কথা বলেছিল। পরি ছিল ঠিকঠাক-ছেলে-না, তৃপ্তি ছিল ঠিকঠাক-মেয়ে-না। পরি আর তৃপ্তি দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ছিল আলিঙ্গনে। তৃপ্তি বলেছিল, পরি+তৃপ্তি কী হয়? তৃপ্তি নিজেই উত্তর দিয়েছিল—'পরিতৃপ্তি'। তৃপ্তির বাড়িতেও গিয়েছিল পরি। ওর বাবা সংস্কৃত পড়ান। ওর বাবা বলেছিল—কি করে, এই সত্ত্বঃগুণসম্পন্ন পরিবারে রজঃ এবং তমোঃ গুণসম্পন্না কন্যা জন্মাল কে জানে? নারীসুলভ কোমলবৃত্তির বড়ই অভাব। তৃপ্তি পরি'কে দেখিয়ে ওর বাবাকে বলেছিল, এই পুত্রটিরও পুরুষসুলভ কঠিন বৃত্তির বড়ই অভাব। তৃপ্তির মা বলেছিল, তা হোক গে যা...। সোনার আংটি আবার ব্যাঁকা হয় না কি? তৃপ্তি পরে বলেছিল, সোনার আংটিটার

মানে আসলে কী বল তো? ল্যাওড়া। ওটা তো আবার একটু বেঁকাই হয়, তাই না? তুই তো অনেক দেখেছিস। পরি 'যাঃ অসভ্য' বলে তৃপ্তিকে ধাক্কা দিয়েছিল...।

তৃপ্তি এই প্লাস্টিক সার্জেনের কাছে এসেছে কেন? পেটের ভিতরে ইউটেরাস বসাতে? তৃপ্তি তো বলেছিল, ওর ইউটেরাস নেই, ওর মেন্স-ও হয় না। ও বলেছিল, ওর ছোট্ট একটা ভ্যাজাইনা আছে। প্যাসেজ-টা খুব 'ন্যারো'। ও কি প্যাসেজ বড় করাতে এল?

পরি জিগ্যেস করল, তোর এখন মেন্স-টেন্স হয়?

তৃপ্তি বলল, ধুর, ওসবের বালাই নেই। ভাগ্যিস ওসব হয়নি, ইচ্ছেমতো প্র্যাকটিস করতে পেরেছি। দেখি তো অন্য মেয়েদের, মাসে ক'টা দিন কেলিয়ে থাকে। কারও কোমর ব্যথা, কারও তলপেট টনটন করে, আমার ওসব বালাই নেই, বেঁচে গেছি।

—এখনও খেলিস?

—হ্যাঁ, খেলব না কেন? রেলের হয়ে খেলি তো। রেল-কে দু'বার মেডেল এনে দিয়েছি। গতবার কিছু পাইনি। আমাকে কোচ করে দেবে।

অ্যাথলেটিক্সের কোন-কোন ইভেন্টে ও এক্সপার্ট—তার ডিটেল জানে না পরি। এমনি দৌড়, মানে রেস ছাড়াও হার্ডল রেস না কি যেন বলে, সেটাও দৌড়য় তৃপ্তি। হার্ড্ল রেস বোধ হয় লাফিয়ে-লাফিয়ে দৌড়। বোধহয় লোহার বলটল ছোড়ে। কলেজে তো ব্যাডমিন্টন-ও খেলত ছেলেদের সঙ্গে।

কোথায় তোর অফিস রে? পরি জানতে চায়।

—ওই তো, স্ট্র্যান্ড রোডের লাল বাড়িটায়। কাজ তেমন কিছু নেই।

পরি ওর পড়াশোনা আর কাজের কথা বলল।

দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল, বরং বলা ভাল দৃষ্টিবর্ষণ করল, যে-দৃষ্টি ভালবাসায় ভেজা, যে-ভালবাসা শুভেচ্ছা জড়ানো। তৃপ্তি পরি'র দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলেছিল। হ্যাট্স অফ গুরু। পরিও তৃপ্তিকে ওই কথাটাই বলতে চেয়েছিল। আসলে দু'জনই দু'জনের সাফল্যে খুশি হয়েছিল। দু'জন লিঙ্গ-পরিচয়ের সংকটে থাকা মানুষ। শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতে পারাটা শেয়ার করল ওরা।

পরি দেখল, যেন কম্পিউটার স্ক্রিনে ভেসে উঠছে সাকসেসফুল। সাফসেসফুল। ওই 'ওয়ার্ড'-টার ফন্টগুলো বড় হচ্ছে। ওর যেন মনে হল আকাশ থেকে কুচো-কাগজ পড়ছে, রঙিন। ওই কাগজে লেখা 'কনগ্র্যাচুলেশন'। আগে এরকম অনুভূতি হয়নি। এই মেয়েটার সামনে এসে এরকম মনে হল ওর। ওরা দু'জন দু'জনের ফোন নম্বর নিল।

তৃপ্তি জিগ্যেস করল, তোর সেই চয়ন কি এখনও আছে?

পরি যেন একটু ব্রীড়াভঙ্গি করল। ঈষৎ ভ্রুকুটি-তে বলল, কোথায় যাবে?

—গুড। ভেরি গুড।

—আর তোর কী ব্যাপার?

—পরে বলব। দেখা হবে তো এবার থেকে। অনেক কথা আছে।

তৃপ্তি কেন এই সার্জেনের কাছে এসেছে নিজে থেকে বলেনি কিছু। পরি-ও জিগ্যেস করেনি কিছু। এ ব্যাপারে পরিকেও জিগ্যেস করেনি কিছু তৃপ্তি। তৃপ্তি কেন এল এখানে? ওর সেদিনের কথা মনে পড়ে। তৃপ্তি বলেছিল, 'আঙুল দিয়ে দেখবি, প্যাসেজ-টা কি খুব ছোট?' ও কি

'প্যাসেজ' বাড়াবে? ইউটেরাস তো লাগানো যায় না। কোথাও-কোথাও নাকি চেষ্টা হয়েছিল—অন্যের জরায়ু প্রতিস্থাপনের। ফেল করেছে। যদি সম্ভব হত পরি-ই হয়তো বসানোর কথা ভাবত। পরির জানতে ইচ্ছে করছিল তৃপ্তিও কি অপারেশনের জন্য এখানে এসেছে। তার আগে নিজের কথাটা বলা উচিত। পরি বলল—আমি এখানে এসেছিলাম এসআরএস-এর ব্যাপারে জানতে।

—'এসারেস'? ওটা কি আবার? বাংলায় বল।

পরি বলল, 'সেক্স রি-অ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি'। বলেই মনে হল ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছিলেন—এটা যেন সোশ্যাল আপলিফ্‌টমেন্ট। স্টেটাস বাড়ানো। 'এসআরএস' করাচ্ছি বলাটা যেন 'হাইল্যান্ড পার্কে ফ্ল্যাট বুক করেছি' বলার মতো।

—বললাম, না বাংলায় বলতে, এত ইংরেজি ছাড়ছিস কেন?

—ওই তো মেয়ে হওয়ার অপারেশন। বুব্‌স বানাবো, পুসি বানাবো...।

—আবার ইংলিশ। কাঁচা বাংলায় বল না—ম দিয়ে, গ দিয়ে...।

—তুই বল।

তৃপ্তি কাঁচা বাংলায় স্ল্যাং বলে, উইথ অঙ্গভঙ্গি। পরি মজা পায়।

—আর তুই কি বাড়াতে এসেছিস? ফুটো?

—না আমি বানাতে এসেছি।

—কী?

—দু'অক্ষরের নাম তার রান্নাবাড়ায় থাকে, এমনিতে শান্তশিষ্ট, মাঝে-মধ্যে রাগে। বুঝলি কিছু?

পরি মাথা চুলকোয়। বলে, ও, বুঝেছি।

তৃপ্তি বলে হ্যাঁ রে...। অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে। অপেক্ষা করবি একটু। তৃপ্তি ঘরে গিয়ে জেনে আসে এখন ছয় নম্বর চলছে।

পরি ঘড়ি দেখে। বেলা পৌনে বারোটা। অফিস যেতে হবে। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

পরি বলে আজ আর নয়। আমার ফ্ল্যাটে আয়। ফ্ল্যাট নিয়েছি।

সত্যি? তৃপ্তি খুশি হয়। বলে, একদিন সারাদিন। কেমন?

অফিসে ঢুকল পরি। ট্যাক্সি নিয়েছিল। ট্যাক্সি থেকে নেমে দরজা বন্ধ করার সময় যে-শব্দটা হয়, সেই শব্দটা উপভোগ করে পরি। সেই শব্দ ও গায়ে মাখে। এই শব্দটা ওর মায়ের গায়ে মাখাতে পারেনি। এরকম আরও কত শব্দ, যা ছিল দূরের, যেমন ডিওডরেন্ট স্প্রে করার লম্বা শব্দ, যা বিজ্ঞাপনে থাকে। আগেও এই শব্দ পেয়েছে, বড় কৃপণ ছিল সেই শব্দ, মুহূর্তের মাত্র, একবার টিপেই হাত উঠিয়ে নিত, যেন বহু দিন যায়, যেন না শেষ হয় সহজে, এখন শুধু সুগন্ধ নয়, শব্দ-ও গায়ে মাখে। কফি মেশিনের শব্দ, প্লেটের ওপর কাঁটা-চামচের শব্দ—এই সব। এসি মেশিনের শব্দও একদিন ঘরে ঢুকে যাবে, যা রূপকথার অশ্বক্ষুরধ্বনি।

নিনা বলল, মেলানকলিক কেন? চাপে আছো পরি?

পরি বলল, কী করে বুঝলে?

নিনা বলল, মুখেই রিফ্লেকশন হয়। তোমার স্কিন হল গ্লসি। এখন দেখছি 'ম্যাট ফিনিশ'।

—তোমার বাবা একদম ঠিক নাম রেখেছিল।

নিনার পুরো নাম নিপুণা সেন। এই নামেই চেক কাটা হয়। কিন্তু ও নিনা নামেই পরিচিত। এই ধরনের প্রফেশনে নিপুণার চেয়ে 'নিনা' নাম ভাল খায়।

—তুমি সত্যিই নিপুণা। পরি বলে। কাজে তো নিপুণা দেখতেই পাচ্ছি। আর কীসে-কীসে নিপুণা গো?

—কীসে-কীসে নিপুণা শুনবে? 'ভেজ' না 'নন ভেজ'?

—'নন ভেজ'।

— x নাকি xx?

—xx।

—বেশ আগে তুমি একটা মিনিমাম xx দাও। বহু দিন ধরে ঘোরাচ্ছ।

পরি হঠাৎ বলে, একটু পিছন ফেরো তো নিনা। নিনা পেছন ফেরে।

—চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। পরি বলে।

পরি আগেই দেখেছিল নিনা-র ব্লাউজের দড়িটা খুলে যাওয়ার মতো হয়েছে। স্লিভলেস ব্লাউজ, পিছনে অনেকটা কাটা, পুরো পিঠই দেখা যায়। ব্লাউজে বোতাম নেই। একটা বাহারি দড়ি দিয়ে বাঁধা। ওটা প্রায় খুলে যাচ্ছিল। পরি দড়িটা ঠিক করে বেঁধে দিল। পরি এরকম করে। যেসব মেয়ে কলিগ আছে, ওরা পরি'কে ওদেরই একজন ভাবে। পরি কারও টিপ-টা ঠিক করে দেয়, কারও চুল। নিনা বলল, থ্যাংক ইউ। তো—জোক?

পরি বলে— ওই তো, জোক হয়ে গেল, দড়ি বেঁধে দিলাম, আমার কাজ আছে না?

একটা সিনেমার কাজ। হরলাল চক্রবর্তীর ছবি। একটা মেয়ে মাওবাদীদের আস্তানা থেকে পালিয়েছে। জঙ্গলে একা। একটা পুকুর দেখতে পেয়ে শাড়িটা খুলে জলে নেমেছে। কাছেই একটা গ্রাম মতন আছে। খুব গরিব গ্রাম, মেয়েদের শাড়ির অভাব। ওর শাড়ি-ব্লাউজ ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে যায় অন্য একটি মেয়ে। এবার পুকুর থেকে স্নান সেরে মেয়েটি দেখবে ওর পোশাক নেই। মেয়েটি তখন জঙ্গলের গাছ-পাতা-লতা দিয়ে নিজের আব্রু রক্ষা করবে। সেই আব্রু রক্ষার কস্টিউম-টা ডিজাইন করতে হবে। এটা যদি বলিউড মেন স্ট্রিম হত, নানা বাহারি পাতা দিয়ে একটা সাইকাডেলিক কস্টিউম হত। এটা বাংলা সামাজিক ছবি। হরলাল চক্রবর্তী আজকাল ফিল্মের দায়বদ্ধতা নিয়ে বলেন-টলেন। ওঁর জন্য সেমি-রিয়েল বা সিওডো-রিয়েল কস্টিউম, বানাতে হবে। কুড়িয়ে পাওয়া ছেঁড়া চট, আর জঙ্গলের লতাপাতার পোশাক। পরি চট দিয়ে একটা ডিজাইন করছে। নায়িকা নতুন, পরি দেখেছে। পা, থাই সব ভাল। অনেকটা 'ওপেন' রাখতে হবে। পিছনে, বাটকের দিকটায় কিছুটা ছেঁড়া থাকবে। এবং কস্টিউম'টা এমন করে বানাতে হবে যেন মেয়েটা কোনওরকমে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। আসলে কিন্তু মোটামুটি শক্তপোক্ত হবে। স্টিচ থাকবে, ক্লিপ-ও থাকবে গোপনে, কারণ মেয়েটাকে লাফাতে হবে। এটাই একটা 'জোক'। নিনা-রা এতে খুশি হবে না। মাঝে-মাঝে ওদের ফুচকা চাপে, মাঝে-মাঝে পিৎজা, আবার মাঝে- মাঝে জোক্‌স।

পরি জোক্‌স জানে, শুনেছে অনেক, চয়নের কাছ থেকেই বেশি, সব মনে থাকে না। বড্ড কাঁচা। সেদিন বলছিল, একজন 'গে' বাস কন্ডাক্টার 'সেক্স' এনজয় করছিল। আর চ্যাঁচাচ্ছিল— চলো অন্দর চলো, অউর অন্দর আগে বহুত ইসপেস হ্যায়, জলদি করো, যো দো বাহার লটক

রহে হ্যায়, উন্‌হে ভি অন্দর করো...। বলতে পারে, কিন্তু বলবে না। নিজেদের নিয়ে ইয়ার্কি-ফাজলামো নিজেদের মধ্যেই করা যায়। পরি চুপ করেই ছিল। আস্তে করে টেবিলের দিকে যাওয়ার তাল করছিল। নিনা বলল, কী হল? জোক?

পরি বলল, তুমি আগে বলো।

নিনা, মোটর সাইকেলে উত্তমকুমারের পিছনে বসা সুচিত্রা সেনের নকলে বলল, না-না তুমিই বলো।

পরি আবার বলে, না, তুমি বলো, তুমি।

নিনা বলে, আমি কতটা বেড-নিপুণা জিগ্যেস করছিলে না? নিপুণতা দেখাব কী? টাইম দেয় নাকি হ্যাজব্যান্ড? আলাপ, তারপর বিস্তার, তারপর তো ঝালা। ঝালা পর্যন্ত না-গেলে এক্সপারটাইজ দেখাব কী করে? অনেক সময় তো আলাপেই ফিনিশ। ও বলছিল, বোন গ্রাফটিং করাবে নাকি সেই বর্ধমানের এক জোতদারের মতো।

তখন একটা গল্প বলেছিল টি.কে।

—একজন লোক এল চেম্বারে। বয়স পঁয়ষট্টি মতন হয়েছে। বলছে এমন একটা ব্যবস্থা করুন যেন সব সময় খাড়া থাকে। টি.কে জিগ্যেস করেছিল, সব সময়? কেন? লোকটা বলল, দেখতে ভাল লাগে। টি.কে জিগ্যেস করল, স্ত্রী-র বয়স কত? লোকটা বলেছিল, স্ত্রী গত হয়েছে। টি.কে বলল, রক্ষিতা আছে? গার্লফ্রেন্ড? লোকটা বলল, তাও নেই। টি.কে বলল, তা হলে খাড়া রেখে কী করবেন? ক্যালেন্ডার ঝোলাবেন? লোকটা সরল মনে বলেছিল, না, ক্যালেন্ডার কেন ঝোলাতে যাব, দেখতে ভাল লাগে। টি.কে জিগ্যেস করেছিল, কে দেখবে? ও বলেছিল, কেন আমি?

টি.কে তো কিছুতেই অপারেশনটা করাতে চাইছে না, বলছে এই বয়স কেন করাতে যাচ্ছেন, কত হ্যাপা? লোকটার সেই এক কথা এটা দেখতে ভাল লাগে না।

টি.কে বলল—ভিতরে একটা হাড় ঢুকিয়ে তার ওপর মাংস চাপা দিতে হবে।

লোকটা বলল, তাই দিন।

টি.কে বলল. অনেক খরচ।

লোকটা বলল, হোক খরচ।

টি.কে বলল, পাঁজড়া থেকে একটা হাড় কেটে নেব কিন্তু।

লোকটা বলল তাই নিন।

টি.কে অবিশ্যি বোন গ্রাফটিং করেনি, কিছু একটা পলিমার জাতীয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল পেনিসে।

পরি বলল, টি.কে কে গো?

নিনা বলল, তীর্থঙ্কর। আমার হাজব্যান্ড।

—উনি প্লাস্টিক সার্জেন?

—হ্যাঁ, তো...।

পরি বলল, আমি জানতাম তোমার হাজব্যান্ড একজন ডাক্তার, কিন্তু প্লাস্টিক সার্জেন জানতাম না।

—ও জানতে না? আমরা থ্যাবড়া নাকটার জন্যই তো ওর সঙ্গে প্রেম হল। আমার নাকটা তীর্থঙ্করই অপারেশন করেছিল।

—খুব বড় ডাক্তার? পরি জানতে চায়। ডাক্তার খান্নাকে অনেক দূরের মনে হয়েছিল। বেশি নামী, কিংবা বেশি বড় মাপের বলেই হয়তো। এমন কোনও ডাক্তার হলে ভাল হয় যে ওকে বুঝবে।

নিনা বলে—খুব বড় ডাক্তার কি না জানি না, তবে আমার চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড়। বারো বছরের বড়। প্লাস্টিক সার্জারিতেই এম.এস করেছে, তারপর আমেরিকাতেও কী সব ডিগ্রি নিয়েছে। ওখানেও চাকরি করেছে আট বছর। তারপর ঘরের ছেলে ঘরে এসে মায়ের কোল জুড়ে বসেছে।

পরি বলে, তোমার বরের সঙ্গে আমায় একটু আলাপ করিয়ে দেবে ভাই?

নিনা এখানকার এমপ্লয়ি নয়। মডেল। মাঝেমধ্যেই আসতে হয় ওকে। ড্রেস পরিয়ে ভিস্যুয়াল নেওয়া হয়। কাজের মধ্যেই টুকটাক গল্প হয়। ইয়ার্কি-ফাজলামোও। কিন্তু ওর ব্যক্তিগত জীবন জানে না পরি।

পরি যখন ওর বরের সঙ্গে আলাপ করার কথা বলল, তখন নিনা বলতেই পারত—আমার বর কিন্তু হোমে-টোমো নয়...। কিন্তু বলল না। ভাল বলতে হবে।

নিনা বলল—সে ঠিক আছে। এসো কোনও রোববার...।

টেবিলে যায় পরি। ওকে জঙ্গুলে পোশাক বানাতে হবে। ওর চোখের সামনে 'ইভ'-এর ছবি এলো। টারজানের কে একজন যেন গার্লফ্রেন্ড জুটেছিল, পাতার পোশাক। ওসব মন থেকে তাড়াল। ওকে নিজের মতো কাজ করতে হবে। অরিজিনাল কাজ। পুরনো কিছুতে প্রভাবিত হলে চলবে না। ছেঁড়া বস্তার পোশাক। জুট ফেব্রিক। ওর সঙ্গে থাকবে কয়েকটা পাতা। কচুপাতা? জঙ্গলমহলে কি কচুপাতা পাওয়া যায়? কচুগাছ তো একটু স্যাঁতসেঁতে এলাকায় হয়। শালপাতা-ই তো ভাল। একটা স্কেচ করতে শুরু করল পরি।

ওর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সিদ্ধেশ গর্গ। 'বিজি উইথ ইওর নিউ অ্যাসাইনমেন্ট?' সিদ্ধেশ জিগ্যেস করে। পরির কাঁধে হাত রাখে সিদ্ধেশ।

ইয়েস স্যর। পরি হাসে।

—কাজ করুন। কাম করুন। ইউ আর ডুইং ওয়েল।

পরি একটু বিগলিত হাসি হাসে।

এরকম বিগলিত, সুললিত, মালায়িত হাসি বসকে দিতে শিখে গিয়েছে পরি। 'মালায়িত' মানে মালাই-সমৃদ্ধ হাসি। যা কিছুটা তৈলাক্ত। যাতে ৩০% কৃতজ্ঞতাও মেশানো আছে।

এই বসের কৃপাতেই মাইনে বেড়েছে পরি'র।

—এটার পর অউর একটা ভাল অ্যাসাইনমেন্ট দিব। রোবটকে জামাকাপড় পিন্ধাতে হবে। একটা রোবট ভাবল ও কেন আনড্রেস্‌ড থাকবে? মুম্বই থেকে একটা কাজ এসেছে। পারবে না?

ইয়েস স্যর...পরি বলল।

—আই অ্যাম শিওর, ইট উইল বি ডান। পরি ওর কাঁধে গর্গের আঙুলের খেলা টের পায়। ও কাঁধটা নির্বিকার রাখে। ওই আঙুলের কলমের খোঁচাতেই তো ওর মাইনে বেড়েছে। আর

মাইনে বেড়েছে বলেই ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়েও ওর বাবাকে টাকা দিতে পারছে।

পরির বাবা গয়নাগুলো চেয়েছিল। বলেছিল, খাটতে পারছি না। ওগুলো আমায় দিয়ে দে বাপ। পরি দেয়নি। বলেছিল, ওসব নেই। খরচা হয়ে গিয়েছে।

—সব খরচা করে ফেললি? তো মায়ের স্মৃতি কিচ্ছু রাখলি না?

পরি কড়া গলায় বলেছিল, যেটা পড়লাম, তাতে কত খরচা জানো? তুমি দিয়েছ কোনও টাকা? আর তুমি এখন মায়ের স্মৃতির কথা বলছ, মা'কে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে কেন তখন?

কার্তিকের পিছন দিয়ে ঢোকানো গরান কাঠটাও বোধহয় অক্ষত ছিল না তখন। একেবারে কেতরে পড়েছিল। কার্তিক পাল কীরকম কাঁচুমাচু হয়ে বলেছিল—ভুল করেছিলাম, অন্যায় করেছিলাম বাপ...।

তখন এন্টালির কাছে ওই পানবাজার বস্তিতেই থাকত পরি। ওই বাড়িতেই এসেছিল ওর বাবা। ওর বাপ বলেছিল আলমারিটা খুলবি একটু? পরি বলল, না। ওর বাবা মাথা চুলকে জিজ্ঞাসা করেছিল, মাইনেপত্র কেমন পাচ্ছিস বাপ?

—যা পাই চলে যাচ্ছে।

—তবে আমাকে একটু দ্যাখ না...। আমি তোর ফাদার...।

পরি মনে-মনে বলে, তুমি কি আমার নিজের ইচ্ছেয় ফাদার হয়েছ? এজন্য কি আমি দায়ী?

পরি চুপ করে ছিল।

কার্তিক বলেছিল, কিছু বলছিস না যে বড়?

—কী বলব আমি?

—কিছু বল বাপ, নইলে গেট আউট বলে দে। বল, গেট আউট বল, আমি চলে যাই...

পরি তবু চুপ।

—আমার শরীর খুব খারাপ পরিমল, খুব খারাপ। খেটে খেতে পারি না। কারখানা বিক্রির টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে। ভিক্ষে করে খেতে হবে। তোর কাছে ভিক্ষে চাইছি।

—আমাকে পরিমল বলবে না। পরি বলবে, পরি।

—হ্যাঁ, বাবা তুই 'পরি'। পরির মতোই তো অসাধ্যসাধন করেছিস। তোর মা তোকে নিয়ে কত চিন্তা করত। তুই দাঁড়িয়েছিস। আমার কত শান্তি।

তখন ওর বাবার চোখে জল দেখতে পেয়েছিল পরি। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। এটা নাটক নয়, সিনক্রিয়েশন নয়। আনন্দাশ্রুই। নীরস করে বলতে গেলে এটা 'জিন'-গৌরব। কিন্তু অনাদিকাল থেকেই অশ্রুজলের একটা অনন্য আকুতি আছে। পরি বলেছিল, ঠিক আছে, যা পারব দেব।

মাথা নিচু করে চলে গেল লোকটা সেদিন। পরের মাস থেকে দেড় হাজার করে দিচ্ছিল, গত মাসে আসেনি। বাড়ি গিয়ে দেখেছিল শুয়ে আছে। দেখল ফ্যাকাশে মুখ, বলল দুর্বল। ডাক্তার দেখাল পরি। রক্তপরীক্ষায় দেখা গেল হিমোগ্লোবিন ছয়। বারো থাকা উচিত। ওষুধপত্র কিনতে হল। অ্যানিমিয়া। পরের মাস থেকে দু'হাজার টাকা দিতে হচ্ছিল। কার্তিকের খুব ইচ্ছে ছিল ছেলের কাছেই থাকে।

স্কেচ-টা অটো ক্যাডে দিয়ে টিল্ট করাচ্ছিল পরি। হট ফাইবারের ওপর কি একটু ওয়াক্স ঘষে দেবে? এটা তো মৃণাল সেন বা আদুর গোপালকৃষ্ণনের ছবি না, হরলালবাবুর। ছেঁড়া চটও

চাই। গ্লেয়ার-ও চাই। একটু 'ওয়াক্স এফেক্ট' করে দিয়ে দেখল কেমন লাগে। কম্পিউটার তলা থেকে একটা লুকনো হাত উঠে যায়, আর হাতের থেকে জ্যোতি বের হয়। যেন আশীর্বাদ। কেউ ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে। কম্পিউটারটায় প্রথম থেকেই ছিল। ওটা 'ডিলিট' করেনি। থাক ওটা। ওটা মা।

কাজের ফাঁকে-ফাঁকে কার্তিকবাবুর কথাও মাঝেমধ্যে মনে হয় ওর, ইনসিডেন্টলি যিনি ওর বাবা। হিমোগ্লোবিন বাড়ছে না। শুক্লা জেঠিমার কথাও তো মনে পড়ে, কেন সেরে উঠছে না? অনেক দিন হয়ে গেল ওদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। যেতে হবে একদিন। গিয়ে কি এসব ইচ্ছেগুলোর কথা জানাবে? ইচ্ছের কুঁড়িগুলো ফুল হয়ে ফুটবে তো? ফুটবে। আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে। সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে। বড় ফাঁকা লাগে, বড় একা লাগে। মা নেই বলে সবকিছু শূন্য হয়ে গেছে মনে হয়। কাজের মধ্যে ডুবে থাকা যতক্ষণ, ততক্ষণই যেন কিছুটা মুক্তি।

চোখ কম্পিউটারে, হাতে মাউস। চটের পোশাক পরা নায়িকা কম্পিউটার স্ক্রিনে ঘুরছে। পরি ওর দিকে চেয়ে থাকে। পরি নিজের একটা ছবি বের করে নেয়। নিজের মুণ্ডটা কোট বের করে। চটের পোশাক পরা নায়িকার গলাটা কেটে দেয়। ওখানে নিজের মুখটা বসায়। দু'কাঁধে দু'টো ডানা লাগিয়ে দেয়। স্তন দু'টো বাড়িয়ে দেয়। পরি এবার সত্যিকারের 'পরি' হয়ে গিয়েছে। পরি উড়ছে। তেরো নদী পেরিয়ে উড়ছে। উড়তে-উড়তে ফলের বাগান। কোঁচড়ভরা ফল— আঙুর, আপেল, ডালিম। কার্তিকবাবু, অ্যাক্সিডেন্টলি আমার বাবা, এসব ফল সম্ভার তোমার। হিমোগ্লোবিন বাড়াও তুমি। আর ম্যাডাম, অনিকেত বাবুর স্ত্রী, আপনাকেও গন্ধমাদন পর্বত থেকে এনে দিলাম আশ্চর্য শেকড়। এই শেকড় অনিকেত বাবুকে খাইয়ে দিও না আবার, তোমার সুশীলার দশা হবে। এটা তোমার, তুমি খেও। আবার ঘর থেকে বেরবে। জানলা ছেড়ে আলনা ছেড়ে উনুন ছেড়ে বাইরে।

ওমা! ডানা খসে গেল কেন? কোথায় 'ক্লিক' করে ফেললাম ভুল করে। আমি পড়ে যাচ্ছি। অনেক উপর থেকে পড়ে যাচ্ছি। আমাকে বাঁচাও প্লিজ...

কম্পিউটারটা 'শাট ডাউন' করে দেয়। স্ক্রিন অন্ধকার।

নিনা আর সরিতা কাছে এসে বলে, কী হল তোমার পরি? আর ইউ নট ওয়েল?

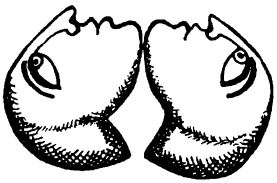

বছরখানেক আগে হঠাৎ একদিন ফোনটা পেয়ে একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল পরি। প্রথম কথাটা ছিল 'তুমি কেমন আছো পরি?' গলাটা চিনতে পারেনি। মোবাইলেও নাম ওঠেনি। নতুন মোবাইল না? চওড়া স্ক্রিন, ক্যামেরাও আছে।

কে বলছেন? জিজ্ঞাস করল পরি।

—সে কী? আমাকে চিনতে পারছ না?

এবার বুঝল। অনিকেত কাকু। কিন্তু এত নরম কোমল করে বললে চিনবে কী করে? উনি তো আগে এত নরম করে কথা বলতেন না, এখন গলাটা যেন সাটিন-ফেব্রিক্।

শেষ দেখা হয়েছিল ওর মায়ের দাহ দিনে। কী হল হঠাৎ?

পরি বলে হ্যাঁ, বলুন?

ওধার থেকে শুনতে পেল—যেটা পড়ছিলে, সেটা চলছে তো?

পরি বলেছিল 'ইয়েস'। আর পড়া শেষ করে চাকরিও করছি।

ইয়েস্ শব্দটার মধ্যে পরি নিজের অজান্তেই মিশিয়ে দিয়েছিল কিছুটা অহং, তুবড়িতে বারুদ ঠাসার মত। যার ভিতরে গোপনে থাকে ফুলকি। এই গোপন ফুলকি পরি টের পেয়েছে ঋতুপর্ণ ঘোষের 'মেয়েলি' কথার মধ্যেও, মাঝে মাঝে। ওই 'ইয়েস' শব্দটার মধ্যে ভরাছিল আরও কিছু মনের কথা— হ্যাঁ অনিকেত বাবু, আপনাদের সাহায্য-টাহায্য ছাড়াই আমি পারি। সেই কবে একবার বলেছিলেন কোনও দরকার হলে বোলো, আমি আছি। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর আমাদের কোনও খোঁজখবর নেননি। মায়ের সঙ্গে আপনার তো কিছু একটা ছিল, অথচ মায়ের মৃত্যুর পর আপনি হাত ধুয়ে নিয়েছেন।

'ইয়েস'-এর জবাবে পরি মহাসিন্ধুর ওপার থেকে শুনল, ভেরি গুড ভেরি গুড।

সামান্য নীরবতার পর পরি শুনল—একদিন সময় করে এসো না আমাদের বাড়ি, শুক্লা তোমার কথা বলছিল। তোমাকে দেখিনি বহুদিন। তোমার কাকিমা তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায়।

পরির মনে হয়েছিল—কেন? আবার ওই ভদ্রমহিলা কেন? মায়ের কথা কিছু জানতে চাইবেন নাকি, আঁকশি বাড়িয়ে টেনে আনতে চাইবেন নাকি কোনও কুলুঙ্গিতে রাখা কোনও গোপন বাকেসা?

ওই ভদ্রমহিলাকে কখনও দেখেনি পরি, কাকিমা জেঠিমা বলে ডাকেনি কোনও দিন। উনি অনিকেতবাবুর স্ত্রী। অনিকেতবাবুকে তো কাকুই ডাকত, পরে জেঠু। মা ডাকত ডাবুদা। মায়ের দাদা তো মামাই হয়।

পরি বলছিল, যেতে বলছেন কেন? দরকার কিছু?

উত্তর পেল কোনও দরকার নেই পরি, তোমার কোনও দরকার নেই। বলতে পারো আমাদেরই দরকার। যদি আসতে পারো, ভালো হয়। এবার গলাটা আর নরম। সাটিনও নয়, মখমল। ঠিকানা নিয়েছিল পরি। গিয়েছিল।

অনিকেত কাকুর, সরি, জেঠুর চুল পেকে গিয়েছে অনেকটাই, মুখের গ্লসিভাব নেই, ফেডেড।

অনিকেত কাকু বললেন—ভালো আছিস তো পরি, কোথায় চাকরি করছিস রে?—এতদিন খোঁজ নেয়া হয়নি, তোর কাকিমাকে নিয়ে খুব ঝামেলায় আছি কিনা? ও এখন কিছুটা ঠিক হয়েছে। চল। ওর কাছে নিয়ে যাই। ও গত ক'দিন ধরে তোর কথা খুব বলছে।

একটা চেয়ারে বসে ছিলেন ওই শুক্লা ম্যাডাম। অনিকেত বলল এই যে পরি। উনি মুখের ইশারায় ডাকলেন। ওটাই হাতছানি। হাতছানিটা মুখের ভিতরে ফেব্রিক করা ছিল। ওঁর পিছনের জানালায় একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতাগুলি ইলিক ঝিলিক করছিল।

এই বুঝি পরি? বাঃ।

পরি সেদিন একটা ছাপ ছাপ শার্ট আর জিন্স পরেই গিয়েছিল। কানের দুলটা খুলেই গিয়েছিল। ভদ্রমহিলা হাসি হাসি মুখ করে অনেক্ষণ দেখলেন। তারপর বললেন, মাকে স্বপ্ন দ্যাখো?

পরি দু'বার মাথা নাড়ায়।

তোমার মা কিন্তু তোমায় আশীর্বাদ করে চলেছেন—উনি যেখানেই থাকুন না কেন। শুনলাম ফ্যাশান ডিজাইনার হয়েছ। চাকরিও করছ। কোথায় তোমার চাকরি।

পরি কোম্পানির নাম বলে।

বেশ। খুব খুশি হয়েছি। তোমার মা যদি দেখে যেতেন। কী খুশি হতেন-বলো?

কী খাবে বলো।

পরি বলে খাওয়া-টাওয়ার ঝামেলা করতে হবে না কিছু।

—কী খেতে ভালোবাসো। চাইনিজ?

—সে তো ভালোইবাসি। কিন্তু ওসব থাক না।

—না, থাকবে কেন, এখানে দোকান হয়েছে তো। কাছাকাছি।

অনিকেতকে বলল—নিয়ে এসো না ওর জন্য...। পরির মনে হয়েছিল অনিকেতকে সরিয়ে দিয়ে এবার একা পেয়ে ওর মায়ের সঙ্গে অনিকেত কাকুর সম্পর্ক-টম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা করবে।

কিন্তু ওসব প্রসঙ্গ এলো না। কী ধরনের কাজ করতে হয়। কাজ করতে ভালো লাগে কি না এসব জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বলল, মন্টু নামে একটা ছেলে ছিল আমার কাছে কিছুদিন। বুঝলে, ও আমাকে জেঠিমা ডাকত। তুমিও আমাকে জেঠিমা ডেকো, কেমন?

মন্টু কোথায় এখন!

উনি কিছু বললেন না। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। গাছেরপাতা গুলো কাঁপল।

মন্টুর ব্যাপারটা পরির জানার কথা নয়। পরি মন্টুর প্রসঙ্গে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করল না। শুক্লাও অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল, নিজে নিজে রান্না করে খাও?

পরি মাথা নাড়ায়। সম্মতির।

কী রান্না করো?

পরী এই প্রশ্নটার শেষে উহ্য থাকা 'বাছা' শব্দটাও শুনতে পেল যেন। কী রান্না কর বাছা!

পরী বলল—ডাল সেদ্ধ, ভাত, ম্যাগি, ডিমের ওমলেট...।

রান্না করতে ঝামেলা মনে হয় না?

—ভালোই তো লাগে।

—শোনো, একটু ঘি বা মাখন রেখো, চালে ডালে বসিয়ে খিচুড়ি করে নিও, একটু ঘি ফেলে দিও, ব্যাস, সহজে হয়ে যাবে।

একটা বাকসো করে চাউমিন এনেছিল অনিকেত, প্লেটে ঢেলে দিল। পরি খাচ্ছিল, শুক্লা হাসি মুখ করে দেখছিল।

সিনেমা টিনেমা দেখো?

পরি বলল সময় কোথায় এত! মাঝে মধ্যে দেখি।

শুক্লা বলল আমি খুব দেখি। আর কীই বা করব। চোখের বালি দেখেছ, ঋতুপর্ণর?

পরি বলল, দেখেছি তো।

প্রসেনজিৎ একদম অন্যরকম, তাইনা?

পরি বলল, হ্যাঁ।

শুক্লা বলল—ঋতুপর্ণ খুব বড় ডিরেক্টার।

সেই উনিশে এপ্রিল থেকে দেখছি। ওকে অনেকে ইয়ে করে, কিন্তু...

—কিন্তু কী?

কিন্তু কী আবার। বাইরে দিয়ে কিছু হয় না, ভিতরটাই তো আসল।

পরির ভিতরটা রিনরিন করে উঠেছিল।

এই শুক্লা কাকিমা, বা জেঠিমা, হোয়াট এভার, মহিলাটিকে ভালো লেগে গেল।

পরি বলেছিল—আপনাকে জেঠিমা ডাকতে বললেন, কিন্তু অনিকেত কাকুকে তো কাকু ডাকি।

অনিকেত বলে—ওসব গ্রামাটিকাল মিস্টেক কোনও ব্যাপার নয়।

শুক্লা বলে ওকেও জেঠু ডেকো, তাহলেই তো হয়।

সেদিন পরি যেন ওর সারা গায়ে ভালোবাসার পাউডার মাখা হয়ে ওর বাড়ি ফেরে।

মন্টু আর বিকাশদের সেই বিচ্ছিরি ঘটনাটা ঘটে যাবার পর টিভিতে জোড়া খুনের গল্প দেখায়। কোনও কোনও চ্যানেল নাট্যরূপান্তরও করে। বিকাশকে দুশ্চরিত্র উওম্যানাইজার হিসেবে দেখানো হয়, দেখানো হয় একটি মহিলা দু-একটা সঙ্গী নিয়ে এসে বিকাশকে খুন করে ওর এটি এম কার্ড হাতিয়ে নিয়ে চলে যায়। মন্টু মহিলাটিকে চিনে ফেলেছিল বলে ওকেও মাথায় হাতুড়ি মারা হয়। পারমিতাকেও দেখানো হয়েছিল, পারমিতার বেশ সাজগোজ, মুখে কোন দুঃখের ছাপ নেই। চুলে লক। ও বলছে এ ব্যাপারে ও কিছু জানে না। বিকাশের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না। আর মন্টুকেও চেনে না, দেখেনি কোনও দিন।

অথচ বিকাশের অফিসের পাওনাগণ্ডা সবই—ও নিয়েছে। কে জানে পারমিতা অবার বিয়ে করবে কি না, শুক্লার শরীর খারাপের খবর কি ও জানেনা? কই, কখনো ফোনটোনও করেনি তো...।

টিভির ‘পুলিশ ফাইল’ শেষ হয়ে গেল, আর মন্টুও হারিয়ে গেল।

শুক্লা একদিন বলেছিল মন্টুটার একটা ছবিও নেই কোথাও। একটা অস্তিত্ব বিলীন। কোনও চিহ্ন নেই।

শুক্লা বলত, অন্যায় করেছিলাম। খুব খারাপ। এরপরই পরির কথা বলতে শুরু করে শুক্লা। পরি সম্পর্কে কিছু কথা অনিকেতের কাছেই শুনেছিল শুক্লা।

কিছুদিন আগে ঋতুপর্ণ ঘোষের একটা ইন্টারভিউ দেখছিল শুক্লা। দেখতে দেখতে বলল ওর কিরকম ঝাঁকড়া চুল ছিল। কত চুল কম এখন। মুখটাও কেমন যেন লাগছে।

এরপরই বলে পরিকে বাড়িতে আসতে বলো না গো একদিন....

মঞ্জুর মৃত্যুর কারণ হিসেবে অনিকেত শুক্লাকে যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছিল, সেটা হল—ছেলের ব্যাপারে মঞ্জুর খুব মন খারাপ থাকত। অন্যমনস্ক থাকত, এরকম অন্যমনস্ক অবস্থাতেই লাইন পার হতে গিয়ে মঞ্জুর দুর্ঘটনা। শুক্লা বলেছিল—ইশ্! মেনে নিলেই তো হত...। কাকে কী

বলছি, আমিও কি মেনে নিতে পেরেছিলাম...।

পরি এরপর ও বাড়িতে এসেছে মাঝে মাঝে। পুজোর আগে জিজ্ঞাসা করেছিল পরি, তুমি কী নেবে বলো, যদি চুড়িদার চাও বলতে পারো। পরি বলেছিল, তাহলে চুড়িদাই দিন...। জেঠিমা বলেছিল, খুব ভাল হত যদি তোমার সঙ্গে নিয়ে পছন্দ করে কিনে দিতে পারতাম।

পরি ও-বাড়ি যায় মাঝেমধ্যে। ওর মন্দ লাগে না।

পরির কে-ই বা আছে নিজের বলতে? দু'-তিনরকম রান্নাও শিখিয়েছেন। রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলছেন, এবার চিংড়িটা ভেজে নাও, বেশি ভেজো না, চিংড়ি মাছ বেশি ভাজলে শক্ত হয়ে যায়, সামান্য লালচে হয়েছে, এবার তুলে রাখো, লাউতে কী ফোড়ন দেবে? জিরেও দিতে পারো, রাঁধুনিও দিতে পারো। ওই যে রাধুনি। হ্যাঁ একদম জোয়ানের মতো দেখতে। একটু মুখে দিয়ে দাঁতে কেটে দ্যাখো, জোয়ান নয়। এবারে লাউটা ছেড়ে দাও। লাউ-চিংড়িতে হলুদ দেবে না কিন্তু...। যেন নিজের মেয়েকে রান্না শেখাচ্ছে...। আবার বলছে... ছেলেদের কিন্তু রান্না শিখে রাখা উচিত। কাজ চালানোর মতো। কাজ চালানোর মতো বলছি কেন, ভাল করেই শিখে রাখা উচিত। ঘরের রান্নাটা মেয়েরাই করবে কেন বলো, ছেলেদেরও তো করা উচিত তাই না?

পরির যেন মনে হচ্ছিল, ওই ভদ্রমহিলা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না পরির সঙ্গে ছেলেদের মতো ব্যবহার করবেন, না কি মেয়েদের মতো। আসলে 'সেক্স আইডেন্টিটি' গুলিয়ে যাচ্ছিল, আর পরি সেটা উপভোগ করছিল। কখনও-কখনও পরি যেন পাশের বাড়ির মেয়েটা হয়ে যাচ্ছিল, যে দুপুরবেলা উল বুনতে-বুনতে কিংবা সিরিয়াল দেখতে-দেখতে গল্প করতে এসেছে। গত এক বছর ধরে প্রতিমাসে একবার করে ওদের বাড়ি যাওয়া হয়ে যাচ্ছিল পরির। চয়নের কথাও বলেছে একটু একটু। কিন্তু চয়নকে নিয়ে বেশি উৎসাহ দেখায়নি শুক্লা। শুধু একদিন বলেছিল—ওকে নিয়ে আসতে পারিস তো একদিন। চয়নকে বলেছিল পরি, চয়ন উৎসহ দেখায়নি। বলেছিল এরকম বহুত কাকিমা জেঠিমা দেখা আছে। ধান্দাটা কী ওনার?

পরি বলেছিল ধান্দা থাকতেই হবে? অন্যভাবে কিছু ভাবতে পারো না তোমরা? চয়ন বলে ওই ভদ্রমহিলা কি তোর মায়ের রিপ্লেসমেন্ট?

পরি বলে তা কেন হবে? কিন্তু কি জানি কেন ওর কাছে গেলে রোদ্দুরের মাঠে তমাল ছায়ার মত লাগে।

চয়ন বলে আরিব্বাস? তমাল ছায়া? তমাল গাছ দেখেছিস কখনো?

পরি মাথা নাড়ায়। বলে দেখিনি বলেই তো...চয়ন বলে অনেক দিন কবিতা লিখিসনি পরি। লেখ এবার।

শুক্লা জেঠিমা এখনও হাত দুটো উপরে ওঠাতে পারে না। বই পড়তে পারে না বইয়ের র‍্যাক থেকে। লাস্ট যেবার গেল, পরিকে বলেছিল, বিভূতিভূষণের গল্প সংগ্রহটা পেড়ে দিবি পরি? 'মৌরীফুল' আর 'পুঁইমাচা'-টা পড়ব। বলেছিল, চোখেও ছানি হয়ে গিয়েছে রে, পড়ে দিবি একটু মৌরফুল-টা?

পরি পড়তে শুরু করেছিল—'অন্ধকার তখনও ঠিক হয় নাই, বাঁশবাগানে জোনাকির দল সাজ জ্বালিবার উপক্রম করিতেছিল। তালপুকুরের পাড়ে গাছের মাথায় বাদুড়ের দল কালো হইয়া ঝুলিতেছে—মাঠের ধারের বাঁশবাগানের পিছনটা সূর্যাস্তের শেষ আলোয় উজ্জ্বল।

চারিদিক বেশ কবিত্বপূর্ণ হইয়া আসিতেছে।'

শুক্লা জেঠিমা হাতের ইশারায় থামতে বলেছিল। তারপর চোখ বুজে বলল, দাঁড়া, দৃশ্যটা একটু দেখে নি, কেমন...।

কয়েক সেকেন্ড চোখ বুজে দৃশ্য দেখছিল শুক্লা জেঠিমা। কত দিন এসব দৃশ্য দেখেনি। চোখ বুজে দেখছে। পরিও চোখ বুজে ছিল। কিন্তু কোনও দৃশ্য দেখতে পেল না তেমন। 'বাদুড়ের দল কালো হইয়া ঝুলিতেছে'—এই দৃশ্যটা কল্পনাই করতে পারল না পরি। পরি কখনও বাদুড় দ্যাখেনি। আর জোনাকি?

শুক্লা জেঠিমা চোখ বুজে হামিং করছিল। সুরটা টের পেয়েছিল পরি। ও জোনাকি, কী সুখে ওই ডানা দু'টি মেলেছ...। তারপর জেঠিমা গাইলেন না, স্বগতোক্তির মতোই বলেছিলেন,

তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে আপন আলো জ্বেলেছো
তোমার যা আছে তা তোমার আছে
তুমি নও গো ঋণী কারও কাছে
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে, তারই আদেশ পেলেছ।

পরি কখনো জোনাকি দেখেনি। জোনাকির কথা শুনেছে।

'মৌরিফুল' গল্পে সন্ধ্যা নামার দৃশ্যের সময় জেঠিমা চোখটা বন্ধ করেছিলেন, দশ-বারো সেকেন্ড পরে খুললেন। এই সামান্য মুহূর্ত সময়ে কোথায়, কত দূরে মানস-ভ্রমণ করলেন কে জানে?

এবার বললেন—নাও, পড়ো।

পরি পড়তে থাকে। মুখুজ্জে মশাইয়ের ছেলে কিশোরীলাল, কিশোরীলালের বালিকাবধূ সুশীলারা আসে। কিশোরীলালের কাছে বালিকা সুশীলা গল্প শুনতে চায়, কিশোরী গল্প বলে। খেজুর বনের জলের ফোয়ারা হইতে মণিমুক্তা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে... পথহীন দুরন্ত মরুপ্রান্তর মৃত্যু যেখানে শিকার সন্ধানে ওৎ পাতিয়া আছে, সমুদ্রের ঝড়.... দৈত্যসঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়া নির্ভীক যাত্রা... এসব শুনিতে শুনিতে সুশীলার গা শিহরিয়া উঠিত। ঘুম ভাঙিলে ঘরের মধ্যে অর্ধরাত্রির অন্ধকার বিকটাকার জীনদেহের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া ভয়ে সে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিত। ...সে নিজের স্বামীকে যাত্রা দলের রাজার পোশাক পরাইয়া দূরদেশে বিপদের মুখে পাঠাইত...এই সুশীলা ক্রমশ বড় হচ্ছিল গল্পটার মধ্যে। ওর স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল। কোথায় গেল সেই গল্প বলা।

নৌকা করে সুশীলা যাচ্ছিল আত্মীয় বাড়ি। নৌকোয় এক সঙ্গিনী জুটল। কলকাতার মেয়ে। ওর সঙ্গে মৌরীফুল পাতালো।

'সঙ্গিনীর মুখে স্বামীর আদরের গল্প শুনিয়া সুশীলার মনের মধ্যে একটা গোপন ব্যথা জাগিয়া উঠিল। সেটা সে অনবরত চাপিবার চেষ্টা করে, তবু কি জানি কেন সেটা ফাঁক পাইলেই মাথা তোলে। প্রথম বিবাহের পর তাহার স্বামীও তো তাহাকে কত আদর করিত, রাত্রে ঘুমাইতে না দিয়া নানা গল্পে ভুলাইয়া জাগাইয়া রাখিত, সুশীল পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত সাধ্যসাধনা করিয়া পান মুখে তুলিয়া দিত—সেই স্বামী তাহার কেন এমন হইল। তাহার বুকটার মধ্যে কেমন হুহু করিয়া উঠিল...'

পরি, শুক্লা জেঠিমার দিকে তাকায়। দামোদরের চরের একটা দৃশ্য বয়ে যায় ওর মনে ধু-ধু

বালিচর, দূরে শীর্ণ, রুগ্‌ণ নদীটা। বালি মেশানো হওয়া। হু-হু করছে।

শুক্লা জেঠিমার মনের ভিতরেও কি হু-হু শব্দটা কোনও দ্যোতনা দিল? নইলে আবার কেন হাতের পাঁচ আঙুল জোড়া করে পরিকে দেখাল? পরি থামল। গল্পটা শেষ অবধিই পড়েছিল। এক তান্ত্রিকের উপদেশে, সেই তান্ত্রিকপ্রদত্ত শিকড়বাটা ডালের বাটিতে মেশাচ্ছিল স্বামীকে খাওয়াবে বলে, কেউ দেখে ফেলল। সবাই ভাবল সুশীলা স্বামীকে বিষ খাওয়াচ্ছে...। একটু স্বামীর সোহাগ চেয়েছিল সুশীলা। কে না চায়? এমন কিছু বয়স হয়নি শুক্লা জেঠিমার। হয়তো মায়েরই বয়সি। অথচ কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। সর্বদা হু-হু করে মন... বিশ্ব যেন মরুর মতন। বাংলা অনার্সের ক্লাসে পড়েছিল পরি। বিহারীলাল চক্রবর্তীর লেখা। শুক্লা জেঠিমার কি ওরকম হয়?

কিন্তু হু-হু শব্দটা পরির শরীরেও খেলা করতে লাগল। 'হু-হু' শব্দটার 'হ' ধ্বনির মধ্যে যেন হায়-হায় গুপ্ত আছে। আমিও তো সোহাগিই হতে চাই চয়ন, সেই সুশীলার মতো, সেই চারুলতার মতন, কাদম্বিনীর মতন, রোহিণীর মতন...। চয়ন...চয়ন...।

সকালবেলা ব্রেকফাস্টের পর ইস্ট্রোজেন ট্যাবলেটের স্ট্রিপ থেকে একটা বড়ি আর কাচের গেলাসে টলটলে জল দিয়ে বলবে, খেয়ে নাও। আমার ব্রা-টা হুকে লাগিয়ে দেবে অফিস যাওয়ার আগে। জাঙ্গিয়াটাও এগিয়ে দেবে। লজ্জা কী এখনও তো জাঙ্গিয়াই, প্যান্টি-র দিন আসবে। বলবে সান-স্ক্রিনটা লাগাতে ভুলে যাওনি তো। ছাতাটাও ব্যাগে পুরে দিয়ে চুমো খাবে একটা। চয়ন তোমার সঙ্গে হরমোন-জীবন কাটাব...হরমোন কাটাব জীবন। চয়ন তোমার সঙ্গে কেচ্ছার জীবন কাটাব...চয়নের সঙ্গে নয়ন, শয়ন এসব শব্দ আসছে। কবিতায় যেমন হয়। কবিতা তুই ফোট, ঝলসানো রুটির মতো দরকারি গদ্যরা জীবনে এসে জোট।

কে জানে হু-হু শব্দটার মধ্যে কী দ্যোতনা ছিল, পরি পড়া থামিয়ে শুক্লার দিকে তাকায়। শুক্লাও পরির দিকে। দামোদরের চর থেকে ধুলো হাওয়ায় হু-হু। পরি বলে একটা কথা বলব জেঠিমা?

কী কথা রে?

আমি না, সেক্‌স চেঞ্জ করব। মেয়ে হব।

গতকাল খবরটা ছোট করে বেরিয়েছিল, মনে হয়েছিল হয়তো অন্য কোনও তৃপ্তি সামন্ত। আজ ছবি ছেপেছে কাগজে। সেই তৃপ্তিই তো! ধর্ষণের অভিযোগে ৩৭৬ ধারায় গ্রেপ্তার। একটা পুলিশ ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বাঁ হাতে মুখটা ঢাকার চেষ্টা করছে তৃপ্তি তবুও বোঝা যাচ্ছে এই মেয়েটাই সেই তৃপ্তি। ভিতরের খবরে বলে দেওয়া হচ্ছে তৃপ্তি সামন্ত, জাতীয় পুরস্কার বিজয়িনী অ্যাথলেট, সেই সুবাদে রেল-এ চাকরি করত। সুমিতা হালদার নামে একজন মহিলা থানায় অভিযোগ করে যে, তৃপ্তি সামন্ত চাকরির লোভ দেখিয়ে সুমিতাকে একাধিকবার ধর্ষণ

করেছে। ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং শরীরের কয়েকটি জায়গায় নখের দাগ-সহ অত্যাচারের 'চিহ্ন' পাওয়া গিয়েছে।

চয়নকে চমকপ্রদ খবরটা ফোনে জানাতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু এখন ও হয়তো টিউশনি-মগ্ন।

অফিসে তিন-চারটে কাগজ রাখা হয়। কোনও কাগজে হেডিং 'উওম্যান অ্যাকিউস্‌ড ফর রেপ'। কোন কাগজে হেডিং 'প্রশ্নের মুখে ৩৭৬ ধারা', কোনও কাগজের হেডিং 'এবার নারীই ধর্ষক'। একটা কাগজ তৃপ্তির গলায় মেডেল ঝোলানো ছবি জোগাড় করেছে।

অফিসেও এ নিয়ে কথা চলছে। বাপি বসু ফোটোগ্রাফার। ও বলল, মেয়েরাও ধর্ষণ করতে পারে। কোনও এক লেডিজ হোস্টেলে নাকি এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রি লাইন সারাতে এসে রেপ্‌ড হয়েছিল। একদম গ্যাং রেপ্‌ড। অন্য একজন বলল, ওঃ, বাপি, হাউ লং ইউ উইল বি আ ন্যাকা চৈতন্য? এখানে একটা উওম্যান আর একটা উওম্যানকে 'রেপ' করেছে। বাপি তখন মাথা চুলকে বলল, একটা মেয়ে আর একটা মেয়েকে রেপ করতেই পারে, যদি লেসবিয়ান হয়।

ওরা দু'-তিনজন তখন পরি'র দিকে তাকিয়ে আছে ওর কোনও কমেন্টের জন্য। এই মেয়ে-সাজা ছেলে এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু জানে। কিন্তু পরি কিছু বলছিল না। ওদের বস সিদ্ধেশ গর্গ একবার ওর কিউবিক্‌ল থেকে বাইরে এল। এসে বলল, 'নো পেনিট্রেশন—নো রেপ। দিস ইজ আইপিসি থ্রি সেভেনটি সিক্স—অ্যাজ আই নো। দ্যাট গার্ল, সুমিতা, ক্লেইম্‌স তৃপ্তি ডাজ হ্যাভ দ্যাট ইন্সট্রুমেন্ট টু পোক্ ইন।' ওদের আলোচনার মধ্যে গর্গ সাহেব এইটুকু 'পোক্ ইন' করে আবার নিজের চেয়ারে 'পোক আউট' হয়ে গেলেন। এই ধরনের আড্ডায় বেশি ইনভল্‌ভড হওয়া 'বস'-এর ডিগনিটি-বিরোধী। কিন্তু একেবারে না-এসেও পারা যায় না। পরি ওদের জানাতে চাইছে না যে তৃপ্তিকে ও চেনে।

মাসখানেক আগে ডাক্তার খান্নার চেম্বারে তৃপ্তির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন বলেছিল যে ওর একটা পুংলিঙ্গ হলে ভাল হয়। কলেজে ওর ছেলেমি দেখেছে, ছেলেমি মানে খেলাধুলো, ডানপিটেগিরি, আবার ও জানত যে, তৃপ্তি একটা মেয়ে, কিন্তু অসম্পূর্ণ মেয়ে। ওর ঋতুচক্র নেই, পাড়ার লোক ওকে 'নিমাই' বলত, ও জানে, কলেজের কেউ-কেউ 'ম্যানচেস্টার'-ও বলেছে। যে-মেয়ের 'চেস্ট ম্যান-এর ন্যায়'—মধ্যপদলোপী তৎপুরুষ? ছোটবেলা থেকে ফ্রক পরেছে, ওর মা ওকে নাচের ইস্কুলেও ভর্তি করে দিয়েছিল ছোটবেলায়। যখন ওর মা-মাসিরা 'হাত ঘুরালে নাড়ু দেব—নইলে নাড়ু কোথায় পাব' বলত, ও নাকি খুব সুন্দর করে হাত ঘুরাতে পারত, তাই ছোটবেলা থেকেই নাচের ইস্কুল। এসব তৃপ্তি বলেছিল পরির ফ্ল্যাটে এসে।

ডাক্তার খান্নার চেম্বারে দেখা হওয়ার পর ফোন নম্বর আদানপ্রদান হয়েছিল। তারপর তৃপ্তি একদিন গিয়েছিল পরির ফ্ল্যাটে কোনও এক রবিবার। খুব ভাল করে পাঁঠার মাংস রান্না করবে বলে দই, হলুদ, রসুন, আদা দিয়ে মাংস মেখে রেখেছিল পরি। ফ্ল্যাটে ঢুকেই তৃপ্তি পরিকে আলিঙ্গন করেছিল। পরির মনে হয়েছিল এই আলিঙ্গন কি হোমো সেক্সুয়াল আলিঙ্গন? না কি হেট্রো সেক্সুয়াল?

বার্থ সার্টিফিকেট অনুযায়ী তৃপ্তি মেয়ে, পরি ছেলে, সুতরাং এটা হেট্রো সেক্সুয়াল। আবার পরি ওর সার্টিফিকেট মানে না। ও ওরিয়েন্টেশন-এ মেয়ে। নিজেকে মেয়ে ভাবে। সুতরাং

তৃপ্তির সঙ্গে ওই আলিঙ্গন 'সাফো আলিঙ্গন'। লেসবিয়ান। আবার পরি লিঙ্গগত-চিহ্নে পুরুষ, আর তৃপ্তি নিজেকে 'পুরুষ' ভাবছে। ওর পুংলিঙ্গটি নেই, বানাতে চায়। তৃপ্তিও মনে-মনে পুরুষ। সুতরাং পরির সঙ্গে তৃপ্তির এই আলিঙ্গন 'সাদোমিক'। 'হোমো সেক্সুয়াল'। আবার তৃপ্তি যদি মানসিকভাবে পুরুষই হয়, পরি মানসিকভাবে নারী। সুতরাং এটা হেট্রো সেক্সুয়াল অ্যাক্ট। এ তো কালিদাসের হেঁয়ালিরে ভাই। পরি আপন মনেই হেসে ওঠে।

তৃপ্তি বলে, কী হল? হাসলি কেন?

পরি জানে, এই হাসির কারণ ও তৃপ্তিকে বোঝাতে পারবে না। মনে-মনে বলল, হাসছি কেন কেউ জানে না, আর মুখে বলল, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই। চকিতে দু'টো লাইনও মনে এল—রবীন্দ্রনাথের।

ডানা-মেলে দেওয়া মুক্তি প্রিয়ের কূজনে দু'জনে তৃপ্ত
আমরা চকিত অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত।

এটাও বলল, না। মাংস ম্যারিনেট হচ্ছে।

তৃপ্তি বলেছিল, খুব ঝামেলা। যা চাইছি হবে না।

—কী হবে না?

—ওটা, যা চেয়েছিলাম, রান্নাবাড়ার মধ্যে যেটা আছে। ডাক্তারবাবু বললেন, একটা 'ভ্যাজইনা' বানানো বরং সহজ, কিন্তু 'পেনিস' বানানো কঠিন। ডাক্তারবাবু ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিলেন।

—কী বোঝালেন?

—দে, একটা কাগজ দে, বোঝাচ্ছি।

তৃপ্তি কাগজ নিল। বলল, প্রথম সমস্যা হিসি নিয়ে। হিসির যে পাইপটা, ইউরেথ্রা না কী যেন বেশ বলে, সেটা তো আমার এখানেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর তো বাড়াতে হবে। মেয়েদের হিসির পয়েন্ট আর বিশুর পয়েন্ট তো আলাদা। ছেলেদের একটাই। আলাদা মাংস-টাংস দিয়ে যদি পেনিস বানায়, সেটা কোথায় বসাবে?

কোনও-কোনও মেয়ে হিসু-র পয়েন্ট বসায়। একটা পাইপ ঢোকানো থাকে মাংস ভেদ করে। দেখতে ভাল লাগে না, কেউ কেউ উপরের দিকে বসায়, কিন্তু ওটা ফর শো। ওখান দিয়ে হিসুটা বেরয় না। হিসু—হিসুর জায়গা দিয়েই বেরয়।

—'বিশুর পয়েন্ট' 'বিশুর পয়েন্ট' বলছিস কেন? ঠিক করে বল না ভাই, হেঁয়ালির কী দরকার আমার কাছে অন্তত? পরি বলেছিল।

তৃপ্তি বলেছিল, হেঁয়ালির কী আছে? 'বিশুর পয়েন্ট' মানে বিশুদারা যে-পয়েন্ট খোঁজে।

পরি বলে, আগে তো খুব কাঁচা খিস্তিটিস্তি দিতিস, এখন আর অত দিস না বুঝি?

তৃপ্তি বলে, কী বলব বল? কাঁচা বাংলায় যা বলে সেটা আমি জানি, তুইও জানিস, কিন্তু আমার কী সেটা আছে? খুঁতো তো। তাই...।

যাগ গে... আর কী বলেছিল ডাক্তার? পরি জিগ্যেস করেছিল।

তৃপ্তি বলেছিল, উনি বললেন, পেনিস'টা খুব ডেলিকেট জিনিস। ওখানে প্রচুর রক্তনালি আছে। সেক্স-এর ইচ্ছে হলে মাথা থেকে সিগনাল যায়, তখন পেনিসে প্রচুর ব্লাড সাপ্লাই হয়, ওখানে স্পঞ্জের মতো কী সব আছে, রক্তে ভরে যায়, কোথায় যেন একটা লক্ মতো আছে

রক্ত আটকে থাকে, ফেরত যায় না। তখন ওটা হার্ড হয়ে যায়, তারপর কাজ হয়ে গেলে রক্ত আবার ভেন-এর ফেরত যায়। তখন 'লুজ' হয়ে যায়। এত ডেলিকেট জিনিসটা আর্টিফিশিয়ালি বানানো যায় না। কোথায় পাবে এরকম স্পঞ্জি ইয়ে? ডাক্তাবাবু বলছিলেন, যাঁরা 'টপ' লেসবিয়ান, মানে পুরুষ টাইপের মেয়ে, ওরা বিশুর জায়গায় একটা মাংস টাইপের কিছু দিয়ে রাখে, ভিতরে পকেটের মতো করে দেয়, যখন কাজ-কারবার করবে, তখন পকেটের ভিতরে পলিমারের স্টিক ঢুকিয়ে দেয়, ওটা সাপোর্টের মতো আর কী, নেতিয়ে-পড়া তুলসী গাছকে বাঁশের চটা দিয়ে যেমন বেঁধে খাড়া রাখত মা। তারপর কাজ হয়ে গেলে স্টিকটা খুলে নিলেই হল। তখন ওই মাংসটা নেতিয়ে পড়বে আবার। ওদের কিন্তু হিসুর জায়গাটা আলাদাই থাকে। আর ওই পেনিস-টা হচ্ছে জাস্ট একটা গয়না। অত ঝামেলা না-করে টপ লেসবিয়ানদের অনেকে 'ডিল্‌ডো' ইউজ করে—কোমরে বেল্টের মতো বেঁধে। তারপর ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করেছিলেন, আপনি কি লেসবিয়ান না ট্রান্সজেন্ডার?

তুই কী বললি? পরি জিগ্যেস করেছিল।

তৃপ্তি বলেছিল, আমি বললাম, ডাক্তারবাবু, আমি ঠিক জানি না, তবে আমার একটা খুব সুন্দর পেনিস পেতে ইচ্ছে করে।

ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করেছিলেন, ওটা পেলে কী করবেন?

আমি বললাম, ওটা দিয়ে সবাই যা করে...।

এতক্ষণ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা হল, কিন্তু তখনও আমার সব কিছু দেখেননি। এবার শুয়ে পড়তে বললেন। জিন্‌স-প্যান্টি খুললাম। উনি গ্লাভস পরে নিলেন হাতে। জায়গাটা টিপে দেখছিলেন। ওপরের দিকে হাত দিলেন। চটি বইতে পড়েছি—জায়গাটাকে 'ছোট নাক' বলে। মেয়েদের ওই জায়গাটা নাকি খুব সেনসেটিভ হয়।

পরি বলল, হ্যাঁ। ক্লিট। ক্লিটোরিস। শুনেছি।

হ্যাঁ, তৃপ্তি বলছিল, ওখানে হাত দিলেন, নাড়িয়ে দেখছিলেন। আমার শিরশির করছিল গা-টা। তারপর গ্লাভ্‌স-পরা আঙুলে কী একটা জেলির মতন মাখিয়ে বিশুর জায়গাটায় ঢুকিয়ে দিল। আমার একটু ব্যথা লাগছিল। ডাক্তারবাবুর কপালটা দেখলাম কুঁচকে যাচ্ছে। তারপর একটা যন্তরের মতো কী যেন, একদিকে লেন্‌স আছে, সেটা ঢুকিয়ে দিয়ে লেন্‌সে চোখ দিয়ে কী সব দেখলেন। তারপর নিজেই বললেন, মেন্‌স হয় না নিশ্চয়ই। আমি বললাম না। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, আগে কাউকে দেখাননি?

আমি বললাম, না।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ভ্যাজাইনাল ক্যাভিটি'-টা ব্লাইন্ড।

ব্লাইন্ড? আমি একটু যেন আঁতকে উঠেছিলাম। উনি বলেছিলেন ক্লোজড। বন্ধ। ইউরিন পাস হয় নিশ্চয়ই এখান দিয়ে... উপরের ছোট্ট মাংস পুঁটুলিটার ওপর একটা স্টিলের রড ছোঁয়ালেন। তক্ষুনি মনে হয়েছিল ওটা যদি জাদুদণ্ড হত, আর ওই জাদুদণ্ডের স্পর্শে ওটা বড় হয়ে যেত... আমি বললাম, হ্যাঁ। ওখান দিয়েই...। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, আপনার আগে কখনও মনে হয়নি আপনি ঠিকঠাক 'মেয়ে' নন...। আমি বলেছিলাম, মনে হয়েছে, যখন মেন্‌স হচ্ছিল না, মা-বাবাকে কিছু বলেনি লজ্জায়, মা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন...। একটা মেয়ে ডাক্তারের কাছেও। উনি বলেছিলেন, প্যাসেজ-টা সরু। বিয়ে হলে

ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন সব পোশাক পরে নিন। তারপর হাত ধুয়ে লিখে দিলেন : এমআরআই, আলট্রাসোনোগ্রাফি।

ওসব করিয়েছিস? পরি জিগ্যেস করেছিল।

তৃপ্তি বলল, না রে। এরপরই তো পাতিয়ালা যেতে হল। ওখানে একটা ইন্টার রেল অ্যাথলেটিক্স ছিল।

এবার তবে করিয়ে নে... পরি বলেছিল।

—হ্যাঁ, করাব। টাইম পাচ্ছি না। আবার জব্বলপুর যেতে হবে। তা ছাড়া একগাদা টাকাপয়সা খরচা করে ওসব করিয়েই-বা কী হবে বল? ডাক্তারবাবু তো বলেই দিলেন তোরা যে ধনে ধনী সে ধন আমার হবে না। এত বড় প্লাস্টিক সার্জেন, তিনিও পারেন না।

মাংস ম্যারিনেট হচ্ছিল। এবার প্রেসার কুকারে বসাল পরি।

তৃপ্তি বলল, ছোটবেলাটাই ভাল যায় রে পরি, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হল বাল্যকাল, তাই না?

পরি মাথা নাড়ায়।

তৃপ্তি বলে, এখন আমার ঘরে কত মেডেল, কাপ, শিল্ড, সার্টিফিকেট। মনে হয় ওই সব ফালতু। জঞ্জাল। রাগ হয়। অবশ্য স্পোর্টস-ই তো আমাকে ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু জানিস মাইরি, ভিতরটা হু-হু করে...।

সেই হু-হু...। শুকনো নদীখাত, রৌদ্রদগ্ধ জনহীন বালুচর। নির্জন হাওয়া।

দু'জনেই চুপ করে থাকে, শুধু প্রেশার কুকারে শোঁ-শোঁ। তৃপ্তি বলে, মেরা কুছ নেহি হ্যায়। কুছ ভি...। আবার নৈঃশব্দ।

তৃপ্তি বলে, ওই যে ছেলেটা, তোর বন্ধু, তোকে ভালবাসে, না?

পরি ছোট করে সম্মতির মাথা নাড়ে।

ইউ আর লাকি। আমার কেউ নেই রে...। এবার একটু গলা চড়িয়ে তৃপ্তি বলে—আরে বাবা, আমি ঠিকঠাক মেয়ে না-ও হতে পারি, আমার ঠিকঠাক 'ফুটো' না-থাকতে পারে—আমি মানুষ তো, মানুষ তো রে বাবা। সারা জীবন ধরে আমি কি সিট-আপ-বেন্ডিং-মৎস্যাসন-কূর্মাসন করে যাব নাকি? আর কত দিন ছুটতে ভাল লাগে?

গলার 'পিচ' বাড়ালে ওর স্বর বেশ খরখরে হয়ে যায়। এমনিতেই ওর স্বর একটু মোটা। কলেজে কিন্তু ওর গলা আর একটু সরু ছিল।

ও ইচ্ছে করে মোটা করার চেষ্টা করছে কি না ওই বলতে পারবে। পরি যেমন যতটা পারে গলাটা সরু করার চেষ্টা করে।

তৃপ্তি বলে, প্যায়ার-মুহব্বত বলে যা কিছু আছে, সিনেমায় দেখেছি। লাইফ-এ দেখিনি। রাজেশ মাথুর নামে একটা কোচ ছিল, ও শুধু এক্সারসাইজ দেখিয়ে দিত, আমার ইভেন্ট থাকলে পুজো দিত, সেই পুজোর ফুল আমার মাথার চুলের ফাঁকে গুঁজে দিত, ব্যস ওইটুকুই ওর বডি টাচ। তবু ভালবাসাটা বুঝতাম, বুকের মধ্যে যেন শিল-পড়া বৃষ্টি হত। এখন মাইরি হু-হু। একটা ফাঁকা রেসিং ট্রাক, চুনের দাগও উঠে গেছে, ওখানে একটা ক্রাচ নিয়ে হাঁটছি আমি। ঘুরপাক খাচ্ছি। কেউ নেই...। আই নিড সামথিং, আই নিড লাভ। বাংলায় যাকে বলে ভালবাসা...। আই নিড সেক্স টু-উ-উ...।

প্রেশার কুকার ফোঁশ করে উঠল।

পরির কলেজ জীবনের একটা দিনের কথা মনে পড়েছিল, তৃপ্তি ওর জিন্‌স-এর জিপার খুলে দিয়ে বলেছিল, একটু প্যাসেজ-টা দ্যাখ না রে... তোর সঙ্গে কম্পেয়ার করে...। পরি শুধু ওপর দিয়ে একবার হাত দিয়েছিল শুধু, সহানুভূতির। পরীক্ষায় ফেল করে এলে, ভাল মা যেভাবে মাথায় হাত রাখে...।

পরি বলল, তুই তা হলে এত 'কক্‌' 'কক্‌' করছিস কেন? তোর ওই 'ন্যারো' প্যাসেজটাকে ঠিক করিয়ে নে... মেয়েই হয়ে যা।

তৃপ্তি বলল, ছোটবেলায় ভাবতাম... কয়েক বছর আগেও ভাবতাম...। এখন আমি বুঝতে পারছি আমি মেয়ে না। আমি কী আমি জানি না। দেখবি। দ্যাখ না, শেয়ার কর না একটু...।

পোশাক খুলে ফেলে তৃপ্তি। উন্মুক্ত হয়।

পরি ওর যৌনাঙ্গ দেখতে পায়। দেখে যোনি-ই মনে হয়। রোমাবৃত কিন্তু ওপরের অংশ, যেখানে ক্লিটোরিস থাকে, বইতে তো এরকমই ছবি দেখেছে, সেটা যেন একটু বড়। চিড়িয়াখানায় দেখা শিশু-বানরের শিশ্নর মতো যেন।

তৃপ্তি বলে, এই আমার বিশুর জায়গা, যেটা নাকি ব্লাইন্ড, আর এই আমার হিসুর জায়গা। এখানে কোনও ভিক্টরি স্ট্যান্ড নেই। এটা আমার 'স্পট অফ ডিফিট'। এখানে আমি হেরো। আমার কোনও বিচি-টিচিও নেই। অথচ আমার মনে হয় আমি ছেলে। মেয়েদের দিকে আকর্ষণ। আমি যে কী করি...

হঠাৎই তৃপ্তি ওর দুই হাত বরণ ডালার মতো করে, পরির লিঙ্গস্থলের কাছে নিয়ে যায়, স্পর্শ করে, বলে, ইয়ে চিজ তু মুঝে দে' দে ঠাকুর...। প্রেশার কুকার আর্তনাদ করে চলেছে।

তৃপ্তি সামন্তকে নিয়ে আলোচনা তখন চলছে। কেউ বলছে, এটা 'ব্ল্যাকমেল কেস', থানায় নিশ্চয়ই টাকাপয়সার লেনদেন হয়েছে, নইলে একটা মেয়েকে কিছুতেই অন্য কোনও মেয়েকে 'রেপ' করার জন্য চার্জ করা যায় না। কেউ বলল, দ্যাখ গে, ও হয়তো আসলে ছেলেই, কমপিটিশনে জেতার জন্য জেন্ডার ভাঁড়িয়েছে। এগুলো জেন্ডার চিটিং। অন্য একজন বলল, তা কখনও হয় না কি আবার? ও কি পাড়ার স্পোর্টস-এর প্রাইজ উইনার না কি? কত বড়-বড় অ্যাথলেটিক মিট-এ প্রাইজ জিতেছে। ওরা কি টেস্ট করেনি? অন্য একজন বলল, দ্যাখগে ও হয়তো হিজড়ে...। পরি শুধু শুনছিল, ও কোনও মন্তব্য করছিল না। হিজড়ে প্রসঙ্গ আসতেই একজন পরিকে জিগ্যেস করল, অ্যাই হিজড়েদের ওই জায়গাটা কেমন দেখতে হয় রে? পরিকেই জিগ্যেস করল, যেন ও এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। পরির রাগ হল। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, জানি না। এরপর হাসির শব্দ। সমবেত।

তখন নন্দীগ্রামে সিঙ্গুর নিয়ে কলকাতা গরম। জঙ্গলমহলে রোজ মানুষ খুন হচ্ছে, কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে সিঙ্গুরে টাটা কোম্পানির গাড়ি কারখানার বিরুদ্ধে বিদ্বজ্জন সমাবেশ হচ্ছে। তে-ফসলি জমিতে কৃষক উচ্ছেদ করে শিল্প : ছি-ছি চলছে। এরই মধ্যেও বিদ্বজ্জনরা ফিসফিসোচ্ছে—তৃপ্তি সামন্তর ওই জায়গাটা কেমন?

পুলিশ কাস্টোডি'তে কোনও বিজ্ঞানমনস্ক পুলিশ মোবাইলে খচ করে ওর যৌনাঙ্গের ছবি তুলে অন্য কাউকে বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য পাঠিয়ে দেয়, তারপর ছবি ফরওয়ার্ডিং চলতে

থাকে জি.পি সিরিজে, মা-মাটি-মানুষের কাছে ছবি পৌঁছে যায়। সেই তমসাবৃত স্থানে ফ্ল্যাশ ঝলকেছিল ঠিকই, কিন্তু ফ্ল্যাশ সেই রহস্য-তমসা ভেদ করতে পারেনি। সেই স্যুররিয়ালিস্ট ছবিটা যে-মোবাইলগুলোতে এল না, সেই মোবাইলগুলো হীনম্মন্যতায় ভুগতে লাগল। কিছু মোবাইল 'যে-ধনে হইয়া ধনী মণিরে মানে না মনি' টাইপের অহংকারী হয়ে উঠল। টেলিভিশনে ব্রেকিং নিউজ হল 'ডাক্তারি পরীক্ষায় তৃপ্তি পুরুষ'। এবার তৃপ্তি কি সত্যিই পুরুষ? এ নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। একজন নারীবাদী কবি বললেন, 'ছিদ্রসন্ধানী পুরুষতন্ত্র কেবল ছিদ্র খুঁজে যায়। ছিদ্র নিয়ে নারীত্ব বোঝা যায় না কখনও। নারীত্ব থাকে অন্তরে।' টেলিভিশনের আলোচনায় সিরিয়াল-অভিনেতা, গায়ক, কবি-সাহিত্যিকদের দেখা যায় অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, এমনকী আমেরিকার সঙ্গে নিউক্লিয়ার ডিল করা উচিত কি না এসব নিয়েও মতামত দিচ্ছেন। লিঙ্গ-নির্ধারণ সম্পর্কিত এক আলোচনায় হাতে গিটার নিয়ে একজন গায়ক গাইলেন—'কী বা অন্তর আছে নারী-নরে অন্তরে থাকে যদি ধন'।

তৃপ্তির সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল পরি, কিন্তু ফোন সুইচ্‌ড অফ। তৃপ্তির কাছে আগেই শুনেছিল, ও এখন একাই থাকে। ওর বাবা গত হয়েছেন, মা দেশে চলে গিয়েছেন, ওখানে কাকারা থাকেন। তৃপ্তি টাকা পাঠায় মা-কে। প্রথমে রেলের কোয়ার্টারে ছিল, ওখানে থাকা লস। এখন হাউস রেন্ট অ্যালউয়েন্স থার্টি পার্সেন্ট। কোয়ার্টারে থাকলে ওই টাকাটা পাওয়া যায় না, তাই একটা 'ওয়ান রুম' ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকে বাঁশদ্রোণীর দিকে।

মিডিয়া মারফত জানা গেল সুমিতা হালদার একজন বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলা। দু'বছর ধরে তৃপ্তির সঙ্গে থাকে। একটা টিভি চ্যানেল সুমিতা হালদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দেখিয়ে দিল।

প্রশ্ন : আপনি তৃপ্তি সামন্তর বিরুদ্ধে থানায় নালিশ করতে গেলেন কেন?

উত্তর : ও আমার সঙ্গে দিনের-পর-দিন খারাপ কাজ করত।

প্রশ্ন : আপনি বাধা দিতেন না?

সুমিতা : ওর সঙ্গে গায়ের জোরে পারব কেন?

প্রশ্ন : ও জোর করত?

সুমিতা : হুঁ। কখনও জোর করত, কখনও বলত আমরা তো বিয়ে করব...।

প্রশ্ন : দু'জন মহিলার মধ্যে তো বিয়ে এখনও আমাদের আইনে চলে না... তা হলে?

সুমিতা : ও তো ছেলেই! আমি দু'বছর ধরে জানি ও ছেলে। তবে অরজিনাল না, একটু কম-ছেলে। ও বলত, অপারেশন করে 'পুরো' ছেলে হয়ে যাব।

প্রশ্ন : কী করে বলছেন তৃপ্তি সামন্ত একজন ছেলে? মহিলা অ্যাথলেট হিসেবে কত প্রাইজ পেয়েছে...

সুমিতা : সে আমি জানি না কী করে পেয়েছে, তবে ও ছেলে। ছেলেরা যা-যা করে ও তাই করত।

প্রশ্ন : আপনার সঙ্গে কী করে আলাপ?

সুমিতা : আমি রান্না করতাম, তাপ্পর একদিন বলল, আমরা বেশ একসঙ্গে থাকব, আমি বর, তুমি বউ, সংসার করব।

প্রশ্ন : তারপর?

সুমিতা : তাপ্পর আবার কী? এখন অন্য গান গাইছে...

যখন ওইসব কথাবার্তা চলছিল, টেলিভিশন পর্দার ওপর কতগুলো অক্ষর নড়ে বেড়াচ্ছিল—exclusive...exclusive।

হাটেবাজারে, শ্মশানঘাটে, ছাত্রাবাসে খেলার মাঠে আলোচনার বিষয় হয়ে গেল তৃপ্তি সামন্ত ছেলে, না মেয়ে। এর যে কোনও একটা হতেই হবে, না হলে হিজড়ে। কত প্রশ্ন : বাংলার বায়ুমণ্ডলে ফ্যাৎফ্যাৎ সাঁইসাঁই উড়ে বেড়াতে লাগল—যেমন হিজড়েরাও কি স্পোর্টস-এ অংশ গ্রহণ করতে পারে? যদি পারে, তবে পুরুষ বিভাগে, না কি নারী বিভাগে? হিজড়েদের জন্য আলাদা স্পোর্ট্স কেন হয় না, যেমন অন্ধদের জন্য, খোঁড়া, সরি, প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা স্পোর্টস...। আচ্ছা, স্পোর্টস অথরিটি'ই বা কেমন? ওরা ন্যাজ উল্টে দ্যাখে না বকনা কি এঁড়ে? আচ্ছা, ওর মেডেলগুলো কি কেড়ে নেবে?

খবর কাগজের সাংবাদিক তৃপ্তির মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করল হাওড়া জেলার কোনও গ্রামে। তৃপ্তির মা বলেছিলেন, ওর জন্ম থেকেই তো জানি ও মেয়ে। ফ্রক পরাতুম, কপালে টিপ পরাতুম, মেয়েদের ইস্কুলে পড়েছে, নাচের ইস্কুলে দিয়েছিলুম। দিদিমণিদের জিগ্যেস করুন গে, সবাই জানে ও মেয়ে। ছেলে হলে তো ভালই হত। আমার তো ছেলের শখই ছিল। কিন্তু মেয়েই তো হল। কিন্তু মেয়ে হয়েও তো দশের এক হল। কত মেডেল আনল, আমাদের মুখ উজ্জ্বল করল। ওর বাবা বলত মেয়ে হয়েছে বলে কোনও দুঃখ নেইকো। আমার মনে হচ্ছে এর পেছনে কোনও চক্রান্ত আছে, ওই রাঁধুনে মেয়েটা ওকে ফাঁসিয়েছে। আমিই বলেছিলাম, হাত পুড়িয়ে খাচ্ছিস মা, একটা রান্নার লোক দ্যাখ। আবার বাড়িওলাও নাকি অনেকটা ভাড়া বাড়াতে বলেছিল...। কাগজে লেখালিখি হচ্ছে লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য পুলিশ কেন সরকারি হাসপাতালে না পাঠিয়ে নার্সিং হোমে পাঠাল। নার্সিং হোমের ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে তৃপ্তি পুরুষ।

কোর্ট থেকে বলা হয়েছে ওর জিনেটিক টেস্ট করতে হবে। কিন্তু জামিন দিচ্ছে না। তৃপ্তি হাজতে। যেহেতু সরকারি চাকরি, পুলিশ কাস্টোডিতে থাকলে সাসপেন্ড হতে হয়। যদি প্রমাণিত হয় ও পুরুষ নয় তা হলেই চাকরিটা আবার ফিরে পাবে।

অন্যান্য অফিসের মতো পরির অফিসেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই আলোচনা চায়ের সঙ্গে চানাচুরের মতো চলছে। একটা জব্বর ইস্যু পাওয়া গিয়েছে বটে। আজ নিনা এসেছে। নিনা বলল, আই নো দ্য মিস্ট্রি। সবাই জানে নিনার হ্যাজব্যান্ড ডাক্তার, তাই অনেকেই নিনার মেডিকাল টিপস চায় যেমন জাপানি তেল কি মেড ইন জাপান, এখানে বটলিং হয়? হুইস্কি কি হার্ট ভাল রাখে? তা হলে রাম কী দোষ করল? সর্ষের তেল না সানফ্লাওয়ার? নিনাও টিপ্স দেয়। নিনা বলছে, জানো? তৃপ্তি কিন্তু ছেলেই। মাইক্রো পেনিস, হি হি।

টিকে ওর মোবাইলে একটা ছবি পেয়েছিল, ওই মেয়েটার, সরি, ছেলেটার। ওর কোনও বন্ধু ফরওয়ার্ড করেছিল। কম্পিউটার ছবি ট্রান্সফার করে, বড় করে দেখছিল।

নিনা বলছিল এ ভেরি স্মল পেনিস, কভার্ড বাই পিউবিক হেয়ার। বল্সও নেই। টি.কে বলছিল বল্স হয়তো পেটের ভিতরে রয়ে গিয়েছে। টি.কে বলছিল ছোটবেলায় ওই তৃপ্তির পেনিসটা হয়তো হাইডেড ছিল, বোঝাই যেত না, সামান্য এক্সপোস্ড হয়েছিল। তা ছাড়া ও তো স্পোর্টস ম্যান, ডোপ টোপ করে কি না কে জানে, হয়তো ডেপিংএর হরমোন এফেক্টএ

ওর মলেস্ট করার ইচ্ছে হয়েছিল... ইয়ে মানে ইন্টারকোর্স সম্ভব নয়, হি হি,... টি.কে বলেছে...।

প্রীতি নামে একটা মেয়ে আছে একটু কমই কথা বলে, ও বলল আমার কম্পিউটারে দেখে যাও, স্পটেড ফিমেল হায়নাদের জেনিটাল কেমন, 'জেন্ডার আইডেনটি' সার্চ দিয়েছিলাম, উইকিপিডিয়া দেখছিলাম, এখানেই আটকে গেলাম। জাস্ট সি, শি ইজ ফিমেল, বাট জেনিটাল লুক্স লাইক মেল। বলছে ওদের ক্লিটোরিস এতটাই এনলার্জড থাকে, যে মানুষ কনফিউস্ড হয়ে যায়।

নিনা বলল মানুষ কনফিউস্ড হয়, কিন্তু হায় না হয়না। ঠিক হ্যায় না? হি হি।

প্রীতি বলছে তোমরা যেটা স্মল পেনিস ভাবছ, সেটা তো এনলার্জড ক্লিট ও হতে পারে...

বাপি বোস বলল—আরে নিনা'স হ্যাবি ইজ এ ডকটর আফটার অল...। ক্লিট আর পেনিসের তফাত বুঝবে না ও? তুমি কটা ক্লিট দেখেছ?

নিনা বলে, বাপি যেন অনেক দেখেছে...

হ্যাঁ, দেখেছি তো... এ নাম্বার অফ...

এ সময় সিদ্ধেশ গর্গ চলে আসে।

গর্গ বলে জেন্ডার বহুত খতরনাক চিজ হ্যায়। বহুত উল্টাপাল্টা আছে। একটা কহবত, মতলব, কাহানি আছে কি, একটা ট্রাইবাল ভিলেজে একজনের বাড়িতে একজন বড় মেহমান এসে গিয়েছে। বলছে লাঞ্চ করবে। লেকিন ঘরে কিছু নাই। খালি চাওল আছে। ও কি করল, ফান্দ, মিন্স্ ট্র্যাপ নিয়ে বেরিয়ে গেল আর চিড়িয়া ধরে আনল। যে বড় মেহমান ছিল, সে হল কোনও ট্রাইবাল হেড। আগে মন্ত্র টন্ত্র পড়ে তারপর খায়। লোকটা চিড়িয়াটা এনে দিল। মেহমান বলল—এটা আওরত নয় তো? আমি স্ত্রী হত্যা করি না। আমি মুরগা খাই, মুরগি খাই না। খাসি খাই, ছাগল খাই না। কনফার্ম হোয়েদার দিস বার্ড ইজ মেল অর ফিমেল।

পাখিটা একটা রেয়ারটাইপের কিছু ছিল, মে বি আনকমন বার্ড, হোস্ট, গেস্ট কেউ বুঝতে পারল না কি ওটা মেল আছে না ফিমেল আছে। লোকটা বার্ডটা নিয়ে ওর নেক্সট নেবারের কাছে গেল, ও কিছু বলতে পারল না, আবার অন্য একজনের কাছে গেল, সে ভি কিছু বলতে পারল না। তখন একজন বলল মাস্টারজির কাছে যাও, মাস্টারজি বহুত লার্নেড ম্যান, ও ঠিক বাতাতে পারবে। তো আলটিমেটলি মাস্টারজি কো পাস গিয়া। মাস্টারজি চিড়িয়াকো কুছ একজামিন ভি নেহি কিয়া, বোলা—আরে ইয়েতো বহুত সিম্পল ম্যাটার হ্যায়। উসকো কুছ দানা দে দো, খানেকো। আগর খায়েগা তো জরুর পুংলিঙ্গ হোগা, অর উয়ো খায়েগী তো স্ত্রী লিঙ্গ, ব্যাস, হো গিয়া...।

চোদ্দোদিন পর জামিন পেয়েছিল তৃপ্তি। খবর কাগজ পড়ে জেনেছিল যে তৃপ্তি জামিন পেয়েছে, ওর টিস্যু কোথায় যেন পাঠানো হয়েছে জিনেটিক পরীক্ষার জন্য। পরি ফোন করেছিল। তৃপ্তিই ধরল এবার। তৃপ্তি তখন ওর দেশের বাড়িতে ছিল, মায়ের কাছে। তৃপ্তি বলল—বাড়িতে ঘর বন্ধ করে আছি। পাড়ার লোক আমাকে ভাবছে একটা আজব টাইপের কোন জন্তু। দেশের বাড়ির ক্লাব থেকে আমাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল ওরা ভাবছে আমার দু'পায়ের ফাঁকে কী আছে? ছোটকাকা বলছিল ছোটবেলায় তো তুই বসে পেচ্ছাপ করতিস, এখনও কি ওই ভাবে, নাকি দাঁড়িয়ে?—তৃপ্তি বলছিল খবর কাগজ আর টেলিভিশনে নানা

রকম কথাবার্তা হয়েছে তো আমাকে নিয়ে, অনেকের ধারণা লেজ গজানোর মতো আমার একটা নতুন ধন গজিয়েছে। —বলল, কলকাতায় ফিরতে হবে। চাকরিটা বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। তোর বাড়িতে থাকতে দিবি? তুই তো একা থাকিস।

পরি বলল—কেন, তোর বাড়ি কি হল?

বলছে আমার মতো উল্টোপাল্টা কেসকে বাড়িতে রাখবে না।

পরি বলল, ও। চুপ করে রইল।.

পরি ওকে কি করে বলে চলে আসতে এখানে? ওর বাবাকে ঘরে আনতে হবে যে...।

কার্তিক পাল, মানে পরির বাবা খবর দিয়েছিল—খুব শরীর খারাপ একদিন আয়, দেখে যা। পরি গিয়েছিল।

ওর বাবা খালি গায়ে ছিল। ওর বাবাকে দেখে অবাক। একটা বুক ফুলে উঠেছে। কী অশ্চর্য! ওর বাবারও? একটা বুক যেন প্রায় স্তন। অন্যটাও ফুলেছে, অতোটা না। বুক আর গলার মাঝে কতগুলো গুটলি। গলাতেও গুটলি বেরিয়েছে। চামড়ার ভিতরে যেন চড়াই পাখির ডিম। শরীরটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

পরি জিজ্ঞাসা করেছিল এসব কবে থেকে বেরল?

ওর বাবা বলল, হল তো তিন হপ্তার ওপর।

ব্যথা করে?

ওর বাবা মাথা নাড়াল।

পরি ওর বাবার ফুলে ওঠা স্তনে হাত দিল। একটু চাপ দিল। ব্যথা লাগে?

—না।

ডাক্তার দেখিয়েছ?

দেখিয়েছিলাম তো, শর্মা ডাক্তারকে। বলল বড় ডাক্তার দেখাতে। এখন হোমিওপ্যাথি খাই। একজন বলল আব, আঁচল, টিউমার, এসব হোমিওপ্যাথিতে ভাল কাজ হয়।

ওই ডাক্তার কী বলল?

বলেছিল তো ভাল হয়ে যাবে, টাইম লাগবে।

ভাল হচ্ছে?

মাথা নাড়িয়েছিল কার্তিক।

তবে বড় ডাক্তার দেখালে না কেন?

অনেক টাকা লাগে...

টাকা পাঠাই তো...

ওতে কি হয়...

তবে কি আরও টাকা পাঠাতে বলছ?

না রে... আমার ছেলে হলেও তুই, মেয়ে হলেও তুই। আমার চিকিচ্ছেটা করিয়ে দে...।

এরপর একজন বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল পরি।

সেই ডাক্তারের খোঁজ নিনাই দিয়েছিল। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন মনে হচ্ছে লিম্ফোমা। হজকিন—নাকি নন হজকিন পরে বুঝতে পরব। অনেকগুলো টেস্ট করতে হবে।

রক্তপরীক্ষা করাতে দিয়েছে পরি। রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। মনে হচ্ছে লোকটাকে ওর বাড়িতেই নিয়ে আসতে হবে। এই অবস্থায় তৃপ্তিকে ও কী করে বলবে চলে আয়?

তৃপ্তি আবার বলল তোর বাড়িতে থাকতে পারি ক'দিন? যতদিন না...

পরি বলল তোর বাড়িটা ছাড়তে যাবি কেন? ইঃ, আল্লাদ? বাড়িওলা বললেই ছাড়তে হবে নাকি? ভাড়া কিছুটা না হয় বাড়িয়ে দে...। তৃপ্তি বলল—অন্য ভাড়াটেরাও চাইছে না, আমি থাকি, ওরা নাকি হিজড়ে টিজড়েদের কিংবা লেসবিয়ান-টেসবিয়ানদের সঙ্গে থাকতে চাইছে না। পাবলিক এখনও কনফিউজ্‌ড আমি লেসবিয়ান না হিজড়ে? অ্যাথলেট পরিচয়টা কোনও কিছু নয়।

পরি বলে তোর স্পোর্টস লাইনের কারোর কাছ যদি...

তৃপ্তি বলে আরে ধুর, আমার এই কিচাইনে ওরা তো খুশি।

কতরকমের যে সত্যি কথা হয়, পরি ভাবে। 'সত্য যে কঠিন বড় কঠিনেরে ভালবাসিলাম'। রবীন্দ্রনাথ লিখেই খালাস।

তৃপ্তি বলল—তোর বাবা কি এসে গিয়েছেন?

পরি বলল—না রে, শিগগিরই নিয়ে আসতে হবে। একদম দুর্বল হয়ে গিয়েছে, জ্বর হচ্ছে মাঝেমধ্যে... গায়ে কেমন গুটলি...।

তৃপ্তি বলল, তবে কাল যাই? সারাদিন কাজ করে রাতে তোর কাছে থাকব, পরদিন আবার কিছু কাজ সেরে বাড়ি ফিরব।

চয়নকে জানাল। চয়ন বলল সাবধানে থাকিস। তোকে আবার সুমিতা না করে দেয়। চয়ন ইয়ারকির ছলেই বলল। মানে, তৃপ্তিকে নিয়ে ঠাট্টা-চর্চিত, ইয়ারকি চর্চিত সমাজের চয়নও একজন।

সব কিছু চয়নকে বলতে হয়, নইলে আবার রাগ করে। বড্ড পজেসিভ। ওর বাবার কথা। বাবাকে নিয়ে আসা নিয়ে ওর ভাবনার কথা বলেছে। ও গাঁইগুই করছে। কিন্তু সব সময় কেন ওর কথা শুনবে? চয়নের চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করে পরি। টাকাকেও তো ধন বলে। ওই সব পরিবারে কী হয়? যেখানে বর-বউ এর সংসার? বরের চেয়ে সিঁদুর পরা বউ-এর রোজগার বেশি, সেসব সংসারেও বউরাই সকালের চা শাঁখা পরা হাতে স্বামীকে এগিয়ে দেয়, স্বামীর গেঞ্জি জাঙ্গিয়া কেচে দেয়, যদিও স্বামীরা কখনও বউদের অন্তর্বাস কাচে না, হাতই দেয় না, দরকার হলে সন্ধের পর স্বামীকে শশা কেটে দেয়। আলুভেজে দেয়, সঙ্গে স্বগতোক্তি—কেন যে এসব ছাইপাঁশ খায়...। সে সব বউরাও কি মাকে গরদ দেবে না তসর দেবে এ নিয়ে পরামর্শ করে? নিজের বাবাকে মাসে মাসে চ্যবনপ্রাশ কিনে দিতে হলেও কি বরের সঙ্গে পরামর্শ করে? বিধবা মাকে যদি ঘরে নিয়ে আসতে চায়? বর আপত্তি করলেও বেশি মাইনে পাওয়া শাঁখা পরা বউরা কী করে? বরের চেয়ে নিজের মতটাই খাটায়। রোজগার বেশি। ও ধনের চেয়ে এ ধনের জোরটাই বেশি। বেশি নয়? কারুক গাঁইগুঁই। কার্তিকবাবুকে নিয়েই আসবে। কার্তিকবাবু কেন? বাবাই তো। পিতা। পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ না কি যেন...শিট্। বেচারা বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। মা থাকলে তো মা কবেই নিয়ে আসত।

তৃপ্তি এসেছিল রাত ন'টা নাগাদ। ও চাদর দিয়ে মুখের অনেকটাই ঢেকে এসেছিল। এখনও এমন কিছু শীত পড়েনি। যতটা আড়ালে থাকা যায়। ও জানে, খবর কাগজ আর টিভির মহিমায় ওকে এখন বহু লোক চিনে গিয়েছে। খেলায় জিতেছে, মেডেল পেয়েছে তখন, কটা লোক চিনেছে? এখন চেনে। যারা মোবাইলে ছবি পেয়েছে ওরা ওই ছবিটা জুড়ে দেয়, যারা পায়নি, ওরা কল্পনা করে কিছু একটা বসিয়ে নেয় পদসন্ধিস্থলে।

তৃপ্তি যা যা বলল তার সারমর্ম হল—চাকরি থেকে সাসপেন্ড হয়ে আছে বলে মাইনে খুব কম পাচ্ছে। যতদিন মামলা না মিটবে, ততদিন এরকমই পাবে। যদি মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়, তবে বকেয়া টাকা ফেরত পাবে, আর দোষী প্রমাণিত হলে তো সব গেল।

ওর উকিল বলেছে দোষী প্রমাণিত হওয়ার কোনও চান্স নেই, মামলা টিকবে না, ডাক্তারি সার্টিফিকেটে বলা আছে লিঙ্গগত ভাবে পুরুষ হলেও ও প্রায় লিঙ্গহীন।

একটা খুব ছোট্ট নুনু থাকলেও সেটা রেপোপযোকী নয়। তাছাড়া সাক্ষীও নেই। শুধু ওই সুমিতা হালদারের মুখের কথায় কেস টিকবে না। এখন শুধু টাকার খেলা। খরচাপাতি করতে পারলে মামলাটা তাড়াতাড়ি শেষ হতে পারে।

আসলে, ওই সুমিতা হালদার অনেক টাকা-পয়সা চেয়েছিল। গয়নাগাটিও। ওর একটা বিয়ে হয়েছিল, ওর স্বামী ওকে ছেড়ে দিয়েছে। ওর পুরনো স্বামীর একাট বন্ধু আছে, ওর সঙ্গে সুমিতার সম্পর্ক আছে। সেই লোকটার বুদ্ধিতেই সুমিতা থানায় এফআইআর-টা করেছে। এখন সুমিতাকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে কেসটা উঠিয়ে নেওয়াও সম্ভব নয়, ৩৭৬ ধারাটা এমনই যে এফআইআর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। কোর্টে হিয়ারিং হবে, ম্যাজিস্ট্রেট যা রায় দেবে, তাই হবে। কোর্টে তো লম্বা লম্বা ডেট পড়ে, উকিল বলেছে পেস্কার ম্যানেজ করে, আরও কি সব ম্যানেজ করে যদি ডেটগুলো একটু তাড়াতাড়ি নেওয়া যায়...। আর ওই মাসিটাকে, মানে সুমিতাকে ম্যানেজ করে, মানে টাকা-পয়সা দিয়ে যদি দুর্বল আর কনফিউজিং সাক্ষ্য দেওয়ানো যায়...

কনফিউজিং সাক্ষ্য মানে সুমিতা বলবে—'ও আমার সঙ্গে শোয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করত, গায়ে হাত দিত, খারাপ জায়গায় হাত দিত... ঘেঁষাঘেঁষি করত, আমি ভাবতাম এটাকেও রেপ বলে।'

পরি বলেছিল—তৃপ্তি, তুই তাই করতিস না কি? তৃপ্তি বলেছিল—হ্যাঁরে, করতাম তো, প্রচণ্ড ইচ্ছে হয় কোনও মেয়েকে আদর করতে। তোকে চুপি চুপি বলছি পরি, যখন তোকে মেয়ে মেয়ে মনে হয়, তোকেও। কোচিং ক্যাম্পেও তো করেছি মাঝে মাঝে দু'-একজনকে। সুমিতা কিন্তু দেখতে একদম ভাল নয়, শরীর টরীরও ভাল নয়, তবুও ওকে। কী করব। ও তো রাজিই ছিল। আমার কেবল মনে হত ছেলেদের মতো যদি আমার একটা যন্তর থাকত...। সুমিতার গায়ের ওপর যখন শুতাম, আমার কল্পনায় ওখানে একটা পেনিস বানিয়ে নিতাম।

পরি জিজ্ঞাসা করেছিল তৃপ্তি, তুই যে ওসব করতিস, তোর কি কোনও তৃপ্তি হত? যাকে বলে ক্লাইম্যাক্স...

—হ্যাঁ, কিছু একটা হত। একটা ফ্লুইডও একসময় বেরত বাচ্চা টিকটিকির ল্যাজের মতো ওখানটা থেকে, তুই তো দেখেছিস... জায়গাটা...। আমি তো চেয়েছিলাম ঠিকঠাক একটা লিঙ্গ। ওই জন্যই তো ডাক্তারের কাছে...। আমি ডাক্তারের কথা মতো এম.আর.আই, —ওই সব

করিয়েছিলাম। ওসব দেখে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন আমার পেটের ভিতরে নাকি লুকনো অণ্ডকোষ আছে। প্রস্টেটও নাকি আছে।

ডাক্তারবাবু জানতেন আমি খেলাধুলো করি। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন ডোপিং করি কি না...। ডোপিং কি না জানি না, একটা ওষুধ তো খেতাম...। আমার কোচ খেতে বলেছিলেন। একটা ইনজেকশনও নিতাম মাঝেমাঝে। আমার কোচ একটা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন ওই ইনজেকশনটা নিলে শরীরটা ম্যাসকুলার হবে। মাস্‌ল তো দরকার স্পোর্টস-এ। তখন জানতাম না কি ইনজেকশন নিচ্ছি, অনেক পরে জেনেছি যে টেস্টাস্টেরন নিচ্ছি। ডাক্তারবাবুকে বলেছিলাম সেটা। উনি বলেছিলেন ওই হরমোনই তোমাকে আবার জাগিয়ে দিয়েছে ভাই।

ও বলছিল—দ্যাখ পরি, যখন জন্মেছিলাম, আমার তো নুনু ছিল না, চেরা ছিল, কে জানত ওটা ব্লাইন্ড, কে জানত ওটা ফলস কে জানত ওটা ধোকা? সবাই জানত আমি মেয়ে। আমিও। দিব্যি ছিলাম। খেলতাম টেলতাম, মেয়েদের কিংবা ছেলেদের—কারও দিকেই খুব একটা যৌন আকর্ষণ ছিল না, যৌবন জ্বালা ছিল না। কিন্তু পেটের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা বিচি দু'টোর কথা তো জানতাম না। বাইরের হরমোনে জেগে উঠেছে ও দুটো, বিষ ছড়িয়েছে আমার রক্তে। আমার মধ্যে জেগে উঠল ছেলেত্ব। আমি কী করব বল পরি, আমি তো মেয়েই ছিলাম। তাই তো জানতাম। খুঁতো মেয়ে, মাসিক না হওয়া মেয়ে। জানতাম বিয়ে হবে না, বর জুটবে না, কত মেয়েরই বিয়ে হয় না, আমার ফুল পিসিরই তো বিয়ে হয়নি, না হতেই পারে। ফুল পিসি তো হেড মিসট্রেস। খারাপ আছে? যখন কলেজে, আমার বুকটাও হয়েছিল। ম্যাসকুলার নয়, ফেমিনিন। পেয়ারার মতো। ডাক্তারকে বলেছিলাম সেটা। ডাক্তার বলেছিল, আগে বাইরে থেকে হরমোন নিতাম না তো, আর আমার ওই যত নষ্টের মূল অণ্ডকোষ ঘুমন্ত ছিল, অকেজো ছিল, টেস্টাস্টেরন তৈরি করতে পারত না, তাই বুকটা ফুলেছিল। এখন অনেকটাই ফ্ল্যাট আবার। আমার জিন রেজাল্ট এসে গিয়েছে। আমি নাকি শালা ছেলে, প্রতি কোষে ছেলে, অথচ আমার লিঙ্গ নেই। লিঙ্গহীন পুরুষ, অসমর্থ, অথচ রেপ কেসের আসামী। কেসে হাজিরা দিতে হবে, প্রণাম করতে হবে আমার নেই, আমি পারি না...। পারি না প্রমাণ করতে আমি কোর্টে সবার মধ্যে ল্যাংটো হয়ে বলতে পারি দ্যাখো নেই, নেই, নেই, কিন্তু তাতেও নাকি নিস্তার নেই, উকিল বলেছে, আমি ৪৬xy, আমি প্রতিটি কোষে পুরুষ, রেপ না পারি, শ্লীলতাহরণ তো পারি, মলেস্ট করতে পারি, ৩৭৬ না হোক, ৩৫৪ ধারা তো আছে...। আমি কেন ছেলে হলাম? আমার ঘুমন্ত বিচি কেন জেগে উঠল পেটের ভিতরে? কেন আমি হরমোন নিতে গেলাম? কেঁদে ফেলল তৃপ্তি...। দু'হাতে মুখ ঢেকে বলল, সবই অদৃষ্ট রে পরি...। অদৃষ্ট...ওর পুরনো মেয়ে সত্তা জাগে। পরির মনের মধ্যে আকাশ থেকে ছত্রিসেনাদের মতো প্যারাসুটে করে নামে লাইনটা—'অদৃষ্ট রে হাস্য মুখে করব মোরা পরিহাস...।' কিন্তু ও খারাপ কথা বলে ফেলে। এরকম কথা পরি বলে না। ও বলেছিল, অদৃষ্টের গাঁড় মারি শালা...। পরির মধ্যে পুরনো ছেলেমি। অথচ পরিও মুখ ঢাকল, চোখ ঢাকল...অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত।

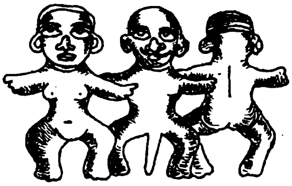

আজ রোববার। জানুয়ারি ১৬, ২০০৯। এখন সকাল সাড়ে ন'টা। সকাল থেকে অনিকেত কয়েকটা কথা শুক্লার উদ্দেশে বলেছে : ১) বাঃ! ডান হাতেই তো বেশ দাঁত মাজতে পারছ। ২) বাজার যাচ্ছি। ৩) পরিটা অনেকদিন আসছে না। ৪) আজ লুচি-টুচি নয়। রুটি। এর উত্তরে, শুক্লা প্রথম কথাটার পর নীরব ছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কথার পরও। চার নম্বর বাক্যটির পর—'আলুচচ্চড়ি না খেজুর গুড়? খেজুর গুড় বোধহয় নেই, দেখে নিও।' আজ যে লুচি করতে হবে না, সেটা কাজের মেয়ে কমলাকে বললেই হত, কিন্তু গৃহকর্ত্রীকেই তো বলা উচিত। আসলে অনিকেতের আজ সকালেই কম্বলের ভিতরেই ইচ্ছেটা জেগেছিল খেজুর গুড় দিয়ে রুটি খাওয়ার। শুক্লা ঠিক ধরে ফেলেছে। কী করে যে বোঝে...!

বাজারে বেশিই সময় নেয় অনিকেত, বিশেষত শীতকালে। বাজার মানে প্রকৃতি-ভ্রমণ। লতাপাতা-শস্য-সবজি, ফল-তরকারির সান্নিধ্য-সুখ। পেঁয়াজকলির সবুজ শরীরে মাথায় সাদা মুকুট, ফুলকপি শ্বেতশুভ্র, টমেটোর আশ্চর্য একটা রং, বেগুনেরও। তাজা বেগুনের গায়ে একটা 'লাসচার' থাকে, যেন আলো পিছলে পড়ে, ওটা হল জীবনের ঔজ্জ্বল্য। বাসি বেগুনের ওই ঔজ্জ্বল্য থাকে না, বাসি বেগুনিরও থাকে না। বাসি মানুষেরও নয়। শুক্লা বলে 'পাপী মানুষ' দেখলেই বোঝা যায়। কাকে উদ্দেশ করে বলে কে জানে?

সাড়ে ন'টা নাগাদ ফিরে কাগজ পড়তে থাকে অনিকেত। শুক্লা সেই নীল মলাটের ডায়েরিটা বার করেছে। ওর বিয়ের যৌতুক, মহাপুরুষের বাণী-ভর্তি ডায়েরি। অনিকেত স্বগতোক্তি করল—শুক্লাকে শোনানোর জন্যই—তপন সিংহ চলে গেলেন...।

শুক্লা মাথা তুলল।

বলল, তাই, ইস্‌স, একটু তো ভুগছিলেন, তাই না?

অনিকেত মাথা নাড়ায়।

ও বোঝে, তপন সিংহকে নিয়ে এখন শুক্লার সঙ্গে দু'চার কথা হতে পারে। এমনিতে তো কথার দুর্ভিক্ষই বলা যায়।

ইস, চলে গেলেন... শুক্লা বলে। সেই কবে বাবার সঙ্গে 'কাবুলিওয়ালা' দেখতে গিয়েছিলাম...। তারপর কতবার দেখেছি...। 'গল্প হলেও সত্যি' আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।

শুক্লা জিগ্যেস করেনি—'তোমার?' তা হলে তো বেশি ইন্টিমেসি দেখানো হয়ে যায়। অনিকেত নিজেই বলল, আমার 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

শুক্লা বলল, 'ক্ষুধিত পাষাণ' একটা স্বপ্ন, 'গল্প হলেও সত্যি'-ও একটা স্বপ্ন। রবি ঘোষ একটা স্বপ্ন। তাই না?

এই 'তাই না?' শব্দটা আশাতীত অনিকেতের কাছে। 'শেয়ার' করতে বলছে শুক্লা। কমই হয়।

অনিকেত বলল, হ্যাঁ। দু'টোই স্বপ্ন। 'গল্প হলেও সত্যি' সিনেমাটার নাম হওয়া উচিত ছিল 'এমন কেন সত্যি হয় না আহা'। রবি ঘোষ। আহা!

শুক্লা বলল, মন্টুকে আবার মনে পড়ছে। খুব ছেলেটা বড্ড কেয়ারিং ছিল...

ওর পড়ার জন্য তো কত কী করলাম, কিন্তু ও তো লেখাপড়ায় সিরিয়াস ছিল না, মঞ্জুর ছেলেটা কত সিরিয়াস কত উন্নতি করেছে...। মন্টুটাকে ঠিকমতো 'মোটিভেট' করতে পারিনি... যাক গে... ওসব ভেবে আর কী করব। শুক্লা ডায়েরি এবং অনিকেত খবর কাগজ পড়তে থাকে। খুন, অগ্নিসংযোগ, কৃষকের অধিকার... কৃষক মেরে শিল্প নয়... টাটা-রা সিঙ্গুর ছেড়ে চলে গিয়েছে। ওদের কাঠামো পড়ে আছে, সেই কাঠামো পাহারা দিচ্ছে পুলিশ...। কাগজ পড়তেও ভাল লাগে না। শুক্লা নীল ডায়েরিটা পড়ছে। শুক্লার কথা এখন অনেক পরিষ্কার, আর ততটা জড়ানো নেই। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন কথা বলতে, কথা বলা প্র্যাকটিস করতে। কিন্তু কথা কই? কথাগুলোও তো পরিত্যক্ত কাঠামোর মতোই। কথা হয় না। অনিকেত বলে যা পড়ছ জোরে পড়ো, আমিও শুনি না-হয়...। শুক্লা বলে, তুমি এসব শুনবে না কি? অনিকেত কাগজ চার ভাঁজ করে বালিশ চাপা দিয়ে বলে, পড়ো শুনি।

শুক্লা একবার তির্যক তাকায়। একে 'অপাঙ্গে' তাকানো বলে। এরকম ভ্রুভঙ্গি হারানো-পুরনো। অনিকেতের ভাল লাগে।

শুক্লা পড়ে—সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বেসন্তু নিরাময়াঃ সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ দুঃখ ভাগ ভবৎ। শুক্লার বাবা এর বাংলা অনুবাদও করে রেখেছেন—

সকলেই যেন সুখী হয় ভবে
    হোক নিরাময় বিশ্বজন
সবাই দেখুক সুখদৃশ্য
    দুঃখ বেদনা হোক বারণ।

অনিকেত মনে-মনে বলে সবাই দেখুক সুখদৃশ্য? দেখলে হবে, খরচা আছে।

শুক্লা পড়ে—নাভিনন্দেত মরণং না ভিনন্দেত জীবিতম...

না করিও মরণকে অভিনন্দন
না করিও জীবনকে অভিনন্দন
কালের আদেশ লাগি প্রতীক্ষা করিও
প্রভুর আদেশ লাগি ভৃত্য যেমন
এরূপ ভাবিলে পাবে শান্তিপূর্ণ মন...।

অনিকেত মনে-মনে বলে, সুখ স্বপনে, শান্তি শ্মশানে।

শুক্লা কয়েকটা ওসব শ্লোক পড়ার পর অনিকেতকে বলে, ভাল লাগছে না তো?—এবার 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়ি। আসলে ওই ডায়েরি থেকেই পড়ছিল। ওর বাবা 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' থেকে কিছু-কিছু লিখে দিয়েছিলেন।

পাপ আর পারা হজম হয় না। কেউ লুকিয়ে পারা খেলে গা ফুঁড়ে বেরবে। পাপ করলেও ফল ভোগ করতে হয়। এরপরের চার লাইন শুক্লার বাবার স্বরচিত, ছন্দোবদ্ধ মন্তব্য।

পাপ প্রশমিত হয় আত্মগ্লানি হলে
কিছু পাপ করে মাপ তীব্র অনুতাপ

লবণ যেমন গলে পরিষ্কার জলে

সুকর্ম্ম সেরূপে হরে মানুষের পাপ।

এটুকু পড়ে চুপ করে রইল শুক্লা। বইটা বন্ধ করল। চোখ বুজল। কপালে বাম হাত স্পর্শ করে বলল, পাপ করেছি। পাপের জন্যই আমার এই অসুখ। যে-হাত দিয়ে মন্টুকে একদিন চড় মারতে গিয়েছিলাম, সে-হাতখানাই তো পড়েছে। মন্টুকে না তাড়ালে ও মরত না। বিকাশ ওর নিজের পাপের শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু মন্টুকে তো আমরাই...আমরা কেন, আমি, আমি তো... তুমি তো আমার মুখের ওপর কথা বলো, আমি যা বলি তা কি সব শুনতে? তুমি কেন বললে না—না, বিকাশের কাছে ওকে পাঠিও না, বিকাশ বয়ে গিয়েছে...।

অনিকেত তখনও বলে না যে, ও নিজেও বাড়িতে মন্টুকে রাখতে চাইছিল না। একটা অশিক্ষিত পরিবারের পড়াশোনায় তেমন ভাল নয় আনস্মার্ট ছেলের দায়িত্ব নিতে চায়নি। তেমন হলে মাঝেমধ্যে টাকাপয়সা সাহায্য করা যেত, বছরে দু'বার জামাপ্যান্ট দেওয়া যেত, বাড়িতে এনে বাৎসল্য করার পক্ষে ছিল না মোটেই। বিকাশ যখন চালচুলোহীন, নিঃসঙ্গ, তখন বিকাশের কাছে মন্টুকে পাঠানোর প্রস্তাবটা তো অনিকেতেরই ছিল। অনিকেত বলতেই পারত—তুমি কেন বললে না—তুমি কেন ভাবছ তুমিই মন্টুকে তাড়িয়েছ। আমিই তো...। বলল না।

'কিছু পাপ করে মাপ তীব্র অনুতাপ'। অনুতাপ করুক। পাপ প্রশমিত হয় আত্মগ্লানি হলে। হোক আত্মগ্লানি। অনিকেতের কিছুই তো নেই। ও নিরালম্ব নিরাশ্রয়। ওর কোনও সমর্পণ নেই। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে—একটা সমর্পণ থাকত। সমর্পণ তো একটা আশ্রয়। মঞ্জুর কাছে কি একটু আশ্রয় চেয়েছিল অনিকেত?

শুক্লা আবার বলল, মন্টুটা কী সুন্দর করে ডাকত। বাজার, হাট, মুদি দোকান... দু'টো পয়সা কখনও এধার-ওধার করেনি। ওর পারসোনাল অভ্যেস নিয়ে এতটা মাথা না-ঘামালেই হত। আমাদের কারও ক্ষতি তো করছিল না, ও তো কোনও কাউকে ফুঁসলে আনত না, ও তো রেপ করত না, যা করত—নিজেরা। কাগজে তো পড়ছি এ ধরনের রিলেশন'কে স্বীকার করে নিচ্ছে কত দেশে। সমলিঙ্গের মধ্যে বিয়েও স্বীকৃতি দিয়েছে নরওয়ে, সুইডেন, আরও কী সব দেশ।

অনিকেত বলে—যাক, পুরনো কথা নিয়ে ভাবতে হবে না।

শুক্লা বলে, তা হলে নতুন কথা নিয়ে ভাবি?

অনিকেত বলল, ভাবো...

শুক্লা বলে, মঞ্জুর ছেলেটাকে হেল্প কোরো, অ্যাঁ?

পরির ওপর একটা সফ্‌ট কর্নার তৈরি হয়েছে, অনিকেত জানে। কয়েকবার এখানে এসেছে। শুক্লা ওর সঙ্গে গল্প করে। পরি এখন রোজগারপাতি ভালই করছে। তবে সার্জারি করে মেয়ে হতে গেলে যা-খরচ, সেটা কি পরির পক্ষে মেটানো সম্ভব? না কি আবার টাকা চেয়ে বসবে?

মঞ্জু যে-চিঠিটা লিখেছিল অনিকেতকে, সেই গোপন চিঠিটা ছাই হয়ে পঞ্চভূতে, মঞ্জুর দেহটারই মতন। মঞ্জু নেই, ওর স্মৃতি আছে। মরুপথে নদীধারা হারিয়ে গেলেও সে-নদী আসলে হারায় না। মঞ্জুর সুইসাইড নোট, যেটা শুধুমাত্র অনিকেতের কাছেই ছিল, পরে যেটা ছাই, যা পরিও জানে না, সেই চিঠিটা অনিকেতের সত্তায় পাথরের মতো। স্মৃতিভার।

'স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ভার মুক্ত সে এখানে নাই'। কিন্তু সেই স্মৃতিভার শরীরের বিনাইন টিউমারের মতোই, পিঠের কুঁজের মতোই, বয়ে বেড়াচ্ছে অনিকেত। এ নিয়ে তেমন কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। স্বপ্নেও বেশি আসেনি মঞ্জু, বরং বেশি এসেছে চাত্তারা, ফুলি, হাসি, ঝুমকো, ময়না...। যাদের শরীর দিয়েছিল অনিকেত, যাদের মুখে কথা দিয়েছিল।

মঞ্জুর মৃত্যুর পর অনিকেত ভেবেছিল—যে-জীবন দোয়েলের, ফড়িং-এর তার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে। ও আর ইন্দ্রজিৎ নয়, অমল-বিমল-কমল। এবার খুব সাধারণ। বাকি পাঁচ পাবলিকের মতোই জীবন কাটাবে। কোনও ঝুটঝামেলায় থাকবে না আর। অফিসেও কেমন মিইয়ে-যাওয়া-মুড়ি হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া চাইবাসার ঘটনাটা রটেও গিয়েছিল তো...। বাইরের মেয়েছেলেকে অনিকেতবাবু ঘরে লটকে রেখেছিল দেখে ওর স্ত্রী পটকে গিয়েছে...। কত দিন ওর কাজের বাইরে অন্য কিছু নিয়ে কোনওরকম নাক গলায়নি। এমনকী, কন্যাভ্রূণ ধ্বংস নিয়ে ফিচার করার জন্য ডিরেক্টরের অনুরোধটাও এড়িয়ে গিয়েছে—এরকম বিষয় পেলে লুফে নিত একসময়। একদিন রাস্তায় আইভি-র সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল প্রায়, সেটাও এড়িয়ে গিয়েছে। ওইসব পবন, সঞ্জয়, মানবী, রঞ্জন কারও সঙ্গেই কোনও যোগাযোগ রাখেনি। মাঝেমধ্যে নিজেকে 'নিজলিঙ্গাপ্পা' মনে হত। ব্যাসবাক্য হল : নিজেই নিজের লিঙ্গ নিজের পায়ুতে প্রবেশ করিয়েছে। নিজেকে মনে হত হরিপদ কেরানিও নয়, হরিপদ কেরানিরাও ময়দানে বাঁদর খেলা দেখে, চুপি-চুপি জাপানি তেল-টেল কেনে। অনিকেত নিজেকে ভাবত—

টিপিকাল কেরানি
ঝামেলায় যাবনি
বসকে রাখব দূরে
বাজার করব ঘুরে
টিফিন চচ্চড়ি-রুটি
বউয়ের কথায় উঠি।

কিন্তু কবি গাহিয়াছেন 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'। এঁদো ডোবাও ভরাট হয়ে 'সুখ নিকেতন' বাড়ি ওঠে, গ্যাঁজলা স্বপনেরও মুখের ক্ষুরের ক্ষতচিহ্ন মসৃণ হয়ে যায়। কত তদন্ত কমিশন, কত সিবিআই কেস মিশে যায় হাওয়ায়। এক বছরের মধ্যে অনিকেতের মঞ্জু-কেস অফিসের লোক ভুলে যায়, কিন্তু অনিকেত পিঠের কুঁজের মতো, ক্রনিক অম্বলের মতো বয়ে বেড়ায়। কারণ হয়তো সেই গোপন চিঠিটি গিলে ফেলা, যা হজম হয়নি। মঞ্জু মরেছিল পরির কেরিয়ারের জন্যই তো, পরির কেরিয়ার তৈরি হয়েছে। এজন্য একটা প্রশান্তিও কাজ করে। মানুষ তো। সব মানুষেরই কিছু-কিছু সদ্‌গুণ থাকে। টুকটাক থিয়েটার নাটক দেখতে যায় আবার, মহিলা কলিগদের সঙ্গে আড্ডাও টুকটাক চলে, এক বিয়ার বিলাসিনীকে সঙ্গে নিয়ে দু'এক দিন বিয়ার সেবন, একটু-আধটু গা ঘষাঘষি, হাত ধরাধরি করে ট্রাফিকসংকুল রাস্তা পার হওয়ার পরও হাত না-ছাড়া...। কবে আপনাদের কামনা নিবৃত্তি হয় বলুন তো...বিয়ার বিলাসিনীর উত্তরে বলা—এভাবে দেশলাই মারবেন না প্লিজ, ইন বিল্ট দমকল নেই কোনও... এই সব এসে যায়। যাকে বলে ছন্দে ফেরা। সেটা মোটামুটি হয়ে যায় অনিকেতের জীবনে, তবে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার চেষ্টাটা থাকে, তবে আগেকার মতো অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়তা একদম নেই তার। নিজের খোঁড়া ডোবা হয়ে যাওয়া জমিতে এভাবেই সুখ নিকেতন টাইপের বাড়ি

ওঠানোর চেষ্টা হয়—ফের অনিকেতের জীবনে।

একদিন মিনিবাসটা ধরবে বলে দৌড়চ্ছিল অনিকেত, পিছন থেকে কলার ধরেছে কেউ, নিজেকে সামলে, পিছন ফিরে দেখল আইভি।

—আইভি, তুমি?

আইভি বলল, ন্যাকাপনা রাখো তো, সেদিন তো খুব অ্যাভয়েড করলে, দেখেও দেখলে না। ফোন-টোনও করো না শালা...খুব সতী হয়েছ, না?

অনিকেতের সঙ্গে হাত মেলাল আইভি। যাকে বলে হ্যান্ডশেক। অনিকেত অনুভব করল ওর হাতের চামড়া, নরমই আছে আগেকার মতো। কিন্তু ওর হাতে একটা ট্যাটু, কাঁকড়াবিছের ছবি। আইভি হাতটা ধরে ঝাঁকানো, কাঁকড়াবিছেটাও ঝেঁকে উঠল। আইভি বলল, বলো বস কেমন আছ?

অনিকেত বলে, ভালই তো।

আইভি বলে, চলো বস, কোথাও বসি। চা খাবে, না কি রাম!

অনিকেত বলে, চা-কফি-টফি...।

আইভি বলে, এত ম্যাদা মেরে গিয়েছ কেন?

অনিকেত বলে, কেন? চা খাব বললাম বলে বলছ?

আইভি বলে, তোমার বডি ল্যাঙ্গোয়েজ-টাই তো বলছে ম্যাদা মেরে গিয়েছ। জাস্টলাইক বাসি নিমকি।

আইভি একটা জিন্‌স পরেছে, একটা কলার ছাড়া হাফ শার্ট। পকেটে কুমিরের মুখ।

অনিকেত বলে, কেমন আছ আইভি?

আইভি বলে, বিন্দাস। এরপর বলল, ফোন-টোন করোনি কেন?

অনিকেত বলে ফোন-টা হারিয়ে গিয়েছিল...

—দেখি, মোবাইলটা দেখি, তোমার আগের ফোনটা আমার পুরো মনে আছে। রিকশাওয়ালাদের যেমন ফোন হয়, তোমার ফোন-টা সেরকম ছিল।

অনিকেত ফোনটা পাল্টেছিল, 'নতুন মডেল চাই' বলে না, আগের ফোনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে। নতুন ফোন-টা পকেট থেকে বের করে দেখল।

—মিস্‌ড কল দিচ্ছি, সেভ করো।

'মিস্‌ড কল' দিল আইভি, দেখার কিছু ছিল না, ওর নামটাই তো ফুটে উঠেছিল। অনিকেত 'সেভ' করার অভিনয় করল। এ তো খুব ছোট মাপের অভিনয়। আরও কত নিত্য অভিনয় লীলা চালাতে হয় জীবনযাপনে। এসপ্ল্যানেডের অঞ্চলে চায়ের দোকান আর কোথায়, যেখানে আড্ডা মারা যায়।

আইভি বলল, বার-এ চলো, বার-এ...। বলেই চোখ মটকে একটা লাইন গেয়ে দিল—বারে বারে কে যেন ডাকে আমারে...মানবেন্দ্রর গান...। কিন্তু অনিকেত বারে-টারে যেতে চাইছে না, গেলে দেরি হয়ে যাবে, তারপর মুখের গন্ধ দূরীকরণের জন্য কসরত করতে হবে, ঘুরতে হবে এখানে-ওখানে। অনিকেত বলল, না আইভি, তোমার বউদির শরীরটা ঠিক নেই...তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

অনিকেত জানে না, আইভি মঞ্জু-বৃত্তান্ত জানে কি না। জানালে আকাশবাণীরই কেউ

জানাবে। অনিকেত জিগ্যেস করল, আমাদের অফিসের কারও সঙ্গে যোগাযোগ হয়?

আইভি বলল—টুকটাক খবর পেয়ে যাই গুরু, একটা ম্যান্‌লি কাজ করছ শুনলাম, বাইরে ট্রান্সফার নিয়ে—

—কার কাছে শুনলে—

—সোর্স ডিসক্লোজ্‌ড করতে নেই গুরু...। বলো, একটু ডিটেল-এ বলো...।

অনিকেত মাথা চুলকে বলে, আজ বললাম না, তাড়া আছে। তুমি কি আগের অর্গানাইজেশনেই আছ?

আইভি বলল, না, দু'বছর হল ছেড়ে দিয়েছি। এখন দুর্গাপুরের একটা এডুকেশন কমপ্লেক্সের আমি চিফ সিকিউরিটি অফিসার। একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, একটা ম্যানেজমেন্ট কলেজ, একটা ল' কলেজ—সব একটা ক্যাম্পাসের মধ্যে। পুরো এরিয়াটা আমি দেখি। আমার আন্ডারে ছ-ছ'টা সিকিউরিটি অফিসার, তিরিশটা সিকিউরিটি গার্ড। ওরা সব শিফ্‌টে কাজ করে। ওদের সকালে ওয়ার্ম আপ করাই, প্যারেড করাই, আমার হাতে ব্যাটন থাকে, ব্যাটন।

অনিকেতের মনে হল, যেন আইভির ঠোঁটের ওপরে হাবিলদারি মোচ তৈরি হচ্ছে। দু'পাশে শুঁড় উঠবে, যাতে 'তা' দেওয়া যাবে।

ওরা স্যালুট দেয়।—আইভি বলে।

—সাব-অর্ডিনেট-রা কী বলে, ম্যাম, না স্যর?

খিলখিল হাসে আইভি। হ্যাঁ, খিলখিলই হাসিরও জেন্ডারভেদ আছে। মেয়েদের হাসি খিলখিল, ছেলেদের হাসি হো-হো। ও বলে, ভুল করে কখনও-কখনও 'স্যর' বলে দেয়।

অনিকেত বলে, না কি ভুল করে 'ম্যাম' বলে?

এবার হো-হো হাসে আইভি।

অনিকেতের কাঁধে হাত দিয়ে বলে—তুমিই আমাকে কিছুটা বোঝো মাইরি।

এসপ্লানেড মেট্রোর সামনে দাঁড়িয়েই ভাঁড়ে চা নেয়।

দুর্গাপুরে তোমার নিজের কোয়ার্টার আছে?—অনিকেত জিগ্যেস করে।

—ইয়েস। থ্রি রুম, টু টয়লেট্‌স, টু ব্যালকনি। চলে এসো, মুরোদ আছে?

—একাই থাকো?

—একটা কনস্টেব্‌ল থাকে। আই মিন কনস্টেব্‌লিনী। মেয়ে কনস্টেব্‌ল। কিন্তু বলীনি টাইপের নয়। দারুণ ফিগার মেয়েটার। খুব সুইট দেখতে। ও-ই কিন্তু রান্নাবান্না করে। আমার কোয়ার্টারেই থাকে। কনস্টেব্‌ল মানে 'সিকিউরিটি গার্ড' আর কী।

অনিকেত বলে, এই সেরেছে। তৃপ্তি সামন্ত-সুস্মিতা হালদার কেস হয়ে যাবে না তো?

আইভি ভ্রু নাচাল। বলল, রিলেশনটা অনেকটা ঠিকই গেস করেছ অনিকেতদা, আফ্‌টার অল ইন্টেলিজেন্ট গাই। খবরের কাগজ আর টিভি মাইরি, ঘরের মধ্যে শুধু নয়, আন্ডারগারমেন্টের ভিতরেও ঢুকে যাচ্ছে। তবে শোনো আমাদের 'তৃপ্তি কেস' নয়। আমি শালা মেয়ে, মেন্‌স হয়, বন্ধ করতে পারিনি। তৃপ্তির মতো ছেলে নই, মে বি হি ইজ আ মেল উইদাউট পেনিস অর উইথ আ মাইক্রোপেনিস। বাট, জেনেটিক্যালি হি ইজ আ মেল। আর ওই মেয়েটা তো ব্ল্যাকমেল করেছিল। আমার তো সে সব চান্স নেই। এই মেয়েটারও স্বামী ছিল, অত্যাচার করত। ওর স্বামী হল কার্পেন্টার, বউ সিকিউরিটি-র লোক, অথচ মেয়েটা

ইনসিকিওর্ড ছিল। মেয়েটার হাতে ডান্ডা ছিল, কিন্তু ছুতোরটার দু'পায়ের ফাঁকে ডান্ডা ছিল, ভাবো অনিকেতদা, কোন ডান্ডার জোর বেশি। মেয়েটাকে ওর বর নাকি মারত। মেয়েটা বলেছে, ও আগে জানত না 'আদর' কাকে বলে...। যাকগে দেরি করাব না, বউদির কাছে লক্ষ্মীছেলের মতো চলে যাও।

যত উল্টোপাল্টা, প্রথাছাড়া ব্যাপার-স্যাপারগুলো অনিকেতের সামনেই এসে পড়ে। ও কী কপালে কে জানে? ও এর মধ্যে ঢুকবে না। ও ব্যাপারটা সাম-আপ করে নিল। ও বুঝল—এটা লেসবিয়ান কেস। আইভি পুরুষ নয়, মেয়েই, তবে একটা ছেলেত্ব আছে। একটা পেনিস-বাসনাও আছে। তবে ও ট্রান্সজেন্ডার হয়তো নয়, ক্রশড্রেসার বা ট্রান্সভেসটাইট। বিপরীত সাজসজ্জাকামী। এবং 'টপ' লেসবিয়ান বা অ্যাকটিভ লেসবিয়ান। লেসবিয়ান রিলেশনের সময় ও অ্যাক্‌টিভ পার্ট নিতে পছন্দ করে। আর ওর ওই সিকিউরিটি গার্ড-টি শুধু স্বামীর অত্যাচারেই স্বামী ছেড়ে আইভির সঙ্গে শোয়—তা নয়। ওই মেয়েটিও লেসবিয়ান। 'ফায়ার' বলে যে-সিনেমাটা এসেছিল, ওখানে দেখানো হয়েছিল একটা মেয়ের স্বামী ওকে পাত্তা দিত না, দুর্ব্যবহার করত বলে ওর ননদের সঙ্গে শরীর সম্পর্কে গেল—ওটা কিন্তু ঠিক নয়, ওদের মধ্যে সুপ্ত লেসবিয়ানিজম না-থাকলে ওরা শরীর 'শেয়ার' করত না। কেইনস-এর স্কেলে ওরা কেউ এক-দুই ইউনিটে ছিল না। ৪/৫-এ ছিল। আর তৃপ্তি সামন্ত আর সুমিতা হালদারের সম্পর্ক লেসবিয়ান কেস নয়, হেট্রো-সেক্সুয়াল কেস। তৃপ্তি তো ছেলেই। কম-কম ছেলে। ফিটনেস বাড়ানোর জন্য যে-হরমোন নিত, সেটাই ওর ছেলেত্বকে জাগিয়েছিল। একটি মেয়েকে কাছে পাওয়ার চেষ্টা করেছে। তারপর ওই মেয়েটা সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করেছে। যা কিছু উল্টোপাল্টা কেস, ওর জীবনেই এসে জুটছে।

'উল্টোপাল্টা' কেস মানে কী? আনকমন? না কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ? টর্নেডো তো উল্টোপাল্টা কেস, কিন্তু টর্নেডো কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ? অল্প এলাকার ওপর দিয়ে বহে যায়, তছনছ করে, কিন্তু প্রকৃতিরই তো অঙ্গ এটা, বাইরে তো নয়...। আমরা বেশির ভাগই তো ডানহাতি। বাঁহাতি, মানে ন্যাটা যারা, ওরা কম, প্রকৃতিবিরুদ্ধ তো নয়। সেই কবে পবন ধল, গে অ্যাকটিভিস্ট, বলেছিল গোলাপ ফুলকে সবাই ভাবে 'পিঙ্ক'-ই হবে। 'ইয়ালো রোজ' কি হতে পারে না? হলদে গোলাপ? এটাও তো প্রকৃতিতেই আছে।

কিছু দিন আগে একটা আর্টিকেল পড়ছিল অনিকেত, হোমোসেক্সুয়ালিটি-র একটা ব্যাখ্যা, যা ডারউইনের তত্ত্বকে সমর্থন করে। পাঁচ-সাত বছর আগে হলে ওসব লেখা কেটে রাখত বা জেরক্স করে রাখত। লেখাটার সার পদার্থ হল : পতঙ্গ জগতে স্টেরাইল ওয়ার্কার থাকে। যেমন শ্রমিক পিঁপড়ে, শ্রমিক মৌমাছি। এরা বন্ধ্যা সৈনিক। এরা সন্তান জন্ম দেয় না, কিন্তু সমাজের কাজে লাগে। ওর শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করে, খাবার জোগাড় করে, পাহারা দেয়। আদিম সমাজে এইসব মেয়েলি পুরুষেরা বংশবৃদ্ধির কাজে লাগায়নি নিজেদের, বরং সেবা-র কাজে লাগিয়ে বংশরক্ষা করতে সাহায্য করেছে। যখন আদি সমাজের পুরুষেরা শিকারে বা খাদ্য সংগ্রহে যেত, তখন এই 'গে'-চাচারাই শিশু এবং মহিলাদের দেখভালের দায়িত্ব নিত। এদেরই পরবর্তী ধাপ হল খোজা প্রহরী। ঠাকুমাদের কাছে কুমড়ো-কাটা ভাসুর ঠাকুরদের গল্প শুনেছে অনিকেত। একান্নবর্তী পরিবারে এমন দু'-একজন থাকত, যারা বিয়েটিয়ে করত না। মেয়েলি চালচলন, অথচ ব্যাটাছেলে বলে বউমাদের সঙ্গে গল্পগাছাও করতে পারত না, বউরা ওদের

কাছেই আসত চালকুমড়োটা দু'-আধখানা করার জন্য। মেয়েদের চালকুমড়ো কাটতে নেই কিনা। ওই লেখাটারই শেষকালে ছিল ইতালির একটা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যেসব পরিবারে সমকামী পুরুষ আছে সেসব পরিবারের মেয়েদের ফার্টিলিটি বিষমকামী পরিবারের চেয়ে বেশি। মানে দাঁড়াচ্ছে, যে-জিন মেয়েদের ফার্টিলিটি বাড়ায়, সেই জিনই ছেলেদের মধ্যে সমকামী প্রভাব ছড়ায়। ডিন হ্যামারও বলেছিলেন, 'The same gene that causes men to like men also causes women to like men.' যে 'দুষ্টু' জিনটা ছেলেদের বলে ছেলেদের কাছে যাও, সেই জিনটাই মেয়েদেরও বলে ছেলেদের কাছে যাও।

সবই জানে, মোটামুটি বুঝেও গিয়েছে, তবুও যেন মনে হয় এসব কেস না-হলেই ভাল হত। হয়। জোড়া কলা, সাদা কাক, শীতের শিলাবৃষ্টির মতো এসব ঘটনা ওর জীবনে এসে পড়ে। আজ আবার পরি আসার কথা আছে। আসুক, এলে ঝামেলা ঠিকই। কিন্তু ধূসর ক্যানভাসে কিছুটা আঁচড় পড়ে।

বিকেলে পরি এল। আসার কথাই ছিল। জিন্‌সের ওপর একটা মেরুন পাঞ্জাবি, কিন্তু পাঞ্জাবির গলাটা বড়, একটু নামানো, বুকপকেট নেই, তার ওপর একটা জয়পুরী কাজের জ্যাকেট, গোল-গোল কাচ বসানো। দু'কানের লতিতে মুক্তো। বেশ লাগছে। শুক্লাকে, অনিকেতকে নিচু হয়ে প্রণাম করল। অনিকেত দেখল ওর পিঠে ব্রা-স্ট্র্যাপের উদ্ভাস। চোখ ফিরিয়ে নিল। মঞ্জুর অন্তিম কাজের দিনটা মনে পড়ল। কিছুতেই খালি গা হবে না। পরে গামছা জড়িয়ে...। জল-ভরা বেলুন বা স্পঞ্জ ভরা ব্রা হলে ঠিক আছে। ইস্ট্রোজেন নেয়-টেয় না তো?

আপনাকে অনেক ভাল দেখছি কাকিমা... পরি বলে।

তোমাকে তো ভাল দেখাচ্ছে—শুক্লা বলে।

স-ও-ও-ত্তি? পরি উচ্ছ্বসিত।

তোমার জামার ডিজাইনটি বুঝি তোমার?—শুক্লা জানতে চায়।

—হ্যাঁ, আমিই করেছি। ভাল হয়েছে?

—খুব মানিয়েছে।

—পরি মাথা নিচু করে কমপ্লিমেন্ট-টা গ্রহণ করল, 'থ্যাঙ্কস' শব্দটা উচ্চারণ করল না।

বাবা কেমন আছেন এখন?—অনিকেত জিগ্যেস করে।

—লিম্ফোমা-ই। নন-হজকিন বলছে। নন-হজকিনের নাকি অনেক রকম টাইপ আছে। কোনও-কোনও টাইপ নাকি পাঁচ-সাত বছর বেঁচে যায়। এটা খুব ভাল টাইপের নয়। জ্বর হচ্ছে মাঝে-মাঝে। কেমোথেরাপি করাতে হবে।

অনিকেত বলতে যাচ্ছিল, সে তো অনেক খরচার ব্যাপার। জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল, ওর মায়ের গয়নাগাটির কিছু অবশিষ্ট আছে কি না, চেপে গেল।

শুক্লাই কথাটা পাড়ল। টাকাপয়সার সমস্যা হলে বোলো...যতটা পারি...।

পরি এবার 'থ্যাঙ্কস' শব্দটা বলল। তারপর বলল, ওসব হয়ে যাবে।

তা হলে তো ভালই। শুক্লা বলল। খুব ভাল চাকরি করছ। মা দেখলে কত খুশি হত...। এবার বিয়েটিয়ে করো...মিষ্টি করে হাসল শুক্লা।

—আমিও তাই ভাবছি...।

পরির এ ধরনের উত্তরটা বোধহয় আশা করেনি শুক্লা। ওর মুখের হাসির ম্যাগ্‌নিচিউড কমে গেল।

বলল, মেয়ে ঠিক করছ? বলেই শুক্লার মনে হল, কথাটা ঠিক হয়নি, যেন আগের কথাটা কেটে দিয়ে বলল, পার্টনার, পার্টনার ঠিক করেছ? সে কি চয়ন? উম্‌?

পরি কুড়ি পার্সেন্ট আনন্দ, তিরিশ পার্সেন্ট লজ্জা, আর পঞ্চাশ পার্সেন্ট রহস্য মেশানো, চোখে-ভ্রুতে মুখের পেশিগুলোয়, টিস্যুগুলোয়, মাথাটা ওপর-নীচ নাড়াল দু'বার।

শুক্লা অভিব্যক্তি গোপন করতে শিখে গিয়েছে? না কি গোপন নয়, পরিবর্তন? শুক্লার কপাল কুঁচকে গেল না, কপালে ভাঁজ পড়ল না। হাল্কা হাসিটা ঠোঁটে-মুখে ছিল, ফেড-আউট হতে কয়েক সেকেন্ড লাগল।

—ভালই তো, ভালই তো, শিক্ষিত ছেলে...। শুক্লা দাঁতে ঠোঁটটা কামড়াল।

এবার বলল, আমাদের দেশে কি এরকম রেজিস্ট্রি হয়? ছেলে-ছেলেতে?

অনিকেতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা আলতো করে রাখল।

পরি বলল, এজন্যই তো মেয়ে হতে হবে আগে। সার্জারি করতে হবে। বাবার কেমো-টা হয়ে যাক, দেখি কেমন থাকে, তারপর...।

—খুব তো কাটাছেঁড়া...খুব কষ্ট হবে তো....

শুক্লাকে সত্যিই উদ্বিগ্ন দেখাল।

—না-না। অজ্ঞান করে তো...। অনেকেই তো করেছে। শুক্লা কিছু বলে না। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলে—সবার ভাল হলেই ভাল বাবা...। যেন সকালের ডায়েরির লাইনটাই বলল, 'সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ'।

—কেমোটা কোথায় করাব? ঠাকুরপুকুর ভাল?

পরি জিগ্যেস করেছিল।

—তোমার ডাক্তার কী বলছে?

নিনার স্বামীর পরিচিত ডাক্তারকে দেখাচ্ছিল পরি। দু'-তিনটে নার্সিং হোমের সঙ্গে যুক্ত।

পরি বলল, ডাক্তার তো নার্সিং হোমের কথা বলছে...অনেক খরচ।

অনিকেত বলল, চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে কার্ড করিয়ে নাও। ঠাকুরপুকুরও ভালই।

—চেনা আছে?

অনিকেত বলল, দেখছি।

পরিকে একটু এগিয়ে দিতে গিয়ে অনিকেত বলল, সত্যি-সত্যিই তুমি 'এসআরএস' করতে চাও?

পরী বলে, হ্যাঁ।

—মনস্থির করেছ?

পরি বলে, ডিসাইডেড।

যাকগে মরুক গে, বলে, ওর পাঁঠা ও ল্যাজে কাটবে না গলায় বলে ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে পারছে না অনিকেত। মঞ্জু যে-চিঠিটা লিখেছিল, যে-চিঠি পঞ্চভূতে, কিন্তু সেই চিঠির আত্মাটা যেন ঘুরে ঘুরে আসে—'ছেলেটাকে দেখিস।'

সন্ধের পর কম্পিউটারে বসল অনিকেত। গুগ্‌লে টাইপ করল 'সেক্স রি-অ্যাসাইনমেন্ট

সার্জারি'। অনেক রকম সাইট এল। কেউ-কেউ এরকম সার্জারি করে থাকে, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, লস অ্যাঞ্জেলেস, প্যারিস এসব জায়গার হাসপাতাল এবং বিশেষজ্ঞদের নাম ধাম চলে এল। ব্রেস্ট ইমপ্লান্ট ক্লিনিকের বিজ্ঞাপন ভেসে এল ম্যাসাচুসেট্স থেকে মুকুন্দপুরে। 'We rearrange alphabets, Lemon to Melon.' লেটারগুলো একটু এধার-ওধার করে দিলেই লেবুকে তরমুজ করা যায়। ভেসে এল কোনও ভ্যাজিনোপ্লাস্টি-র স্পেশাল ক্লিনিক সফ্ট অ্যান্ড স্লিপারি, যারা কৃত্রিম যোনিপথে কোল্‌ন টিস্যুর গ্রাফ্‌টিং-এ পারদর্শী। যারা যোনিপথ মসৃণ করবে। কোলন তো নাড়িভুঁড়ির একটা অংশ, যেখানে মল জমা থাকে। কোলন টিস্যুও কাজে লাগে? জানত না অনিকেত। ওয়েবসাইটগুলো ঘাঁটতে-ঘাঁটতে দেখল, এশিয়ার মধ্যে তাইল্যান্ডের পর সবচেয়ে বেশি 'এসআরএস' হয় ইরানে। এ কী কথা? ওখানে দুই পুরুষের শরীর মিলন, বা সাদোমি তো মারাত্মক অপরাধ। জানা গেল আয়াতুল্লা খোমেইনি ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, 'সাদোমি' অপরাধ, কিন্তু কোনও পুরুষ যদি নারীতে পরিণত হয় তা হলে সেটা আর 'সাদোমি' হয় না। এজন্য ইরানের বিভিন্ন ক্লিনিকে এই সার্জারি হয়।

পুরুষ নারী হতে পারে এরকম গল্প ভারতের পুরাণ-কথায় যেমন আছে, সেমিটিক পুরাণে, বা লোককথায় আছে। নারদ-ও তো বিষ্ণুর মায়ায় এক সরোবরে অবগাহন করে স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তালধ্বজ রাজার স্ত্রী হয়েছিলেন। তালধ্বজ রাজাকে সন্তান দিতে পারেননি। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে, ভীষ্ম রাজা ভঙ্গাসনের কথা বলেছিলেন, যে-পুরুষ হয়ে জন্মেছিলেন শতপুত্রের জনক ছিলেন, একটা সরোবরে স্নান করে নারীতে পরিণত হলেন, ঘরে ফিরলেন না আর, এক ঋষির স্ত্রী হলেন, এবং অনুভব করলেন, মিলনকালে নারীর স্পর্শসুখ অধিক হয়। রামায়ণে রাজা 'ইল'-এর কথা আছে, ইল রাজা মৃগয়া করতে তখন গভীর জঙ্গলে। সেই জঙ্গল গভীরে হর-গৌরী কামরত। মহাদেব স্ত্রীরূপ ধারণ করে গৌরীর সঙ্গে লীলা করছেন। মানে, মহাদেবেরও একটু লেসবি-লীলা করতে শখ হয়েছিল আর কী। মহাদেব যখন স্ত্রীরূপ ধারণ করেছিলেন, তখন মহাদেবের ইচ্ছায় বনের সমস্ত পশুপাখির জেন্ডার পাল্টে গিয়েছিল। সবাই ফিমেল। রাজা ইল-ও নারী হয়ে গেল। তারপর মহাদেবের সাধনা করে পুরুষত্ব ফিরে পেতে চাইল, কিন্তু মহাদেব খেয়ালি লোক, বললেন, ঠিক আছে, একমাস পুরুষ এবং একমাস নারী। সেটাই মেনে নিতে হল রাজ ইল'কে। আশ্চর্য বটে।

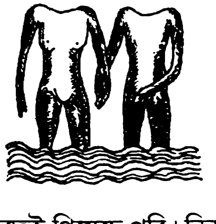

ডা. তীর্থঙ্কর বসুর চেম্বারে নয়, বাড়িতেই গিয়েছে পরি। নিনা বলল, তোমাদের ডিপ-পার্সোনাল কথাবার্তার মধ্যে আমি নেই। এটাও এক রবিবারের বসন্ত-সকাল। স্প্রিং। নিনা একবার এসে জিগ্যেস করল—চা, না কফি? পরি বলল, চা। সজনেফুলের বড়া খাবে? পরি দু'দিকে মাথা নাড়াল আহ্লাদে। স্প্রিং ফ্রাই করতে পারবে? স্প্রিং ফ্রাই? কোকিলের মৃদুস্বর শোনা গেল দশ

তলার ওপরে। মানে? নিনা ঘাড় কাত করে জিগ্যেস করে।

—মানে, 'চিকেন স্প্রিং ফ্রাই' আনালে না কাল? দ্যাখো না সজনেফুলেরও যদি স্প্রিং ফ্রাই হয়...।

আহা, একে বলে সংসার-সুখ!

—দেখুন, 'এসআরএস' করতে গেলে ধাপে-ধাপে করতে হয়। ভ্যাজাইনোপ্লাস্টি, দরকার হলে অ্যাব্ডোমেনোপ্লাস্টি, ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট, কেউ আবার 'জ' মানে চোয়ালও ঠিকঠাক করে নেয়।

আগে 'ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট'-টা বলি। এটা খালি ট্রান্সজেন্ডার'রাই করে তা নয়, CIS জেন্ডাররাও করে। ও, 'CIS জেন্ডার' মানে হল 'বায়োলজিক্যাল সেক্স' আর 'মেন্টাল ওরিয়েন্টেশন' যাদের এক, মানে, সে নিজেকে যে-সেক্স মনে করে, তার সঙ্গে যদি নিজের সেক্স অর্গ্যান ম্যাচ করে যায়। যেমন আমি, যেমন নিনা। CIS জেন্ডাররাও কসমেটিক সার্জারির পার্ট হিসেবে 'ব্রেস্ট অগমেন্টেশন' করে। কেউ বড় করে, কেউ ছোট করে, ব্যাপারটা বুঝে নিন, তারপর ফাইনাল ডিসিশন। ওকে?

বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নাড়ায় পরি। এরপর বলে, আপনি কেন, তুমি বলবেন, হ্যাঁ?

একটা প্যাডের কাগজে ছবি আঁকে তীর্থঙ্কর। একটা স্তন। তারপর নিজেই বলল, দু'টো না-হলে ভাল দেখায় না, না? স্তনে ছোট গোল বৃত্তে অ্যারিওলা দিল, বিসর্গ চিহ্নকে দু'ভাগ করে দু'টো নিপ্‌ল বসাল। স্তনবৃন্ত।

তীর্থঙ্কর বলল, হাওয়ায় বেলুন বাড়ে। তাই তো?

পরি ঘাড় নাড়ায়। ও জানে, জলেও বাড়ে। জলের বেলুন একটু অন্যরকম। মোটা। 'ইলু' বলে। ব্যবহার করেছে কত...!

তীর্থঙ্করের ডটপেনের সুচিমুখ স্তনের উপরে।

—এটাকে বাড়াতে হলে ভিতরে, মানে চামড়ার ভিতরে, কিছু ভেজাল দিতে হবে, এমন ভেজাল, যার কনট্যাক্টে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না। ঠিক চামড়ার তলায় একটু ফ্যাটের আস্তরণ থাকে মেয়েদের। ছেলেদের তেমন থাকে না। বুকের চামড়া এবং ফ্যাটের তলায় সেই 'ভাল' ভেজালটা ঢোকাতে হবে। ওই ভেজাল-টাকে বলে 'ইমপ্ল্যান্ট্স'।

কাগজের ওপর তীর্থঙ্কর লিখল 'ইম্প্ল্যান্ট্স'।

—মোটামুটি তিনরকম ইমপ্ল্যান্ট হয়। স্যালাইন, সিলিকোন, আর কম্পোজিট। 'কম্পোজিট' মানে মেশানো। সয়া তেল-ও ব্যবহার হত। ১৯৮৫ সালের আগে 'ব্রেস্ট ইম্প্ল্যান্ট' করতে 'অ্যাডিপোজ টিস্যু', মানে, চর্বি ব্যবহার করা হত। তারও অনেক আগে, বুকের চামড়া কেটে হাতির দাঁতের তৈরি বাটি ঢুকিয়ে দেওয়া হত। এরপর 'প্যারাফিন' ইনজেকশন করেও ব্রেস্ট অগ্মেন্ট করার চেষ্টা হয়েছিল, খুব খারাপ রেজাল্ট। আমি কিন্তু 'স্যালাইন ওয়াটার' কিংবা সিলিকোন জেল 'ইউজ' করি। সিলিকন নয় কিন্তু। সিলিকন তো একটা মেটাল, আর সিলিকা, মানে 'সিলিকন ডাই-অক্সাইড' হল বালি। 'সিলিকোন' হল 'ডাইমিথাইল সিলোক্সেন'-এর পলিমার। নরম, ইনার্ট। রক্ত বা হিউম্যান টিস্যুর কোনও ক্ষতি করে না। আর এমনি জল না-দিয়ে নুন জল কেন? যেন রক্তের সঙ্গে ম্যাচ করে। রক্তও নোনতা কিনা। নুন জলে খরচ কম, সিলিকোনে খরচ বেশি। সিলিকোন-ই ভাল, ন্যাচারাল ব্রেস্টের মতোই 'লুক'।

ফিলিং? পরি জিগ্যেস করে।

—'ফিলিং' একইরকম। স্কিনের তলায় তো ইম্‌প্ল্যান্ট যাচ্ছে। স্কিনেই তো নার্ভ নেটওয়ার্ক থাকে, তাই 'ফিলিং' নিয়ে প্রবলেম নেই।

তীর্থঙ্কর বলল, ইম্‌প্ল্যান্ট তো দেব, কিন্তু কীভাবে? ইনজেকশন করে? না। একটা কন্টেনার-এর মধ্যে 'ইম্‌প্ল্যান্ট' ইনপুট করা হয়। প্রথমে আমরা প্রতিটি ব্রেস্টের তলায় 'কন্টেনার' ঢুকিয়ে দিই। এই 'কন্টেনার'-কে বলা হয় 'এলাস্টোমার'। আমরা বলি, 'স্যাক'। এই 'স্যাক'গুলোও ভাল পলিমার। ভিস্‌কো ইলাস্‌টিক। এখন তো আরও ভাল 'স্যাক' বেরিয়ে গিয়েছে—লং চেন প্রোটিন। ১৯৬০ থেকে আজ পর্যন্ত এই 'স্যাক'-এর পাঁচটা জেনারেশন হয়ে গেল। সেই 'রবার স্যাক' থেকে শুরু।

ভাজা হয়ে গিয়েছে বউদি...একটা গলা শোনা গেল।

তার মানে নিনা নয়, কাজের মেয়েটা বড়া ভেজেছে। কিন্তু সুন্দর প্লেটে সুন্দর ট্রে করে নিয়ে এল নিনা। নিতান্ত দেশি সজনেফুলে বিঁধে আছে বিদেশি ফর্ক।

ওকে কাউন্সিলিং করছ, না জ্ঞান দিচ্ছ? নিনা বলে। জ্ঞান দেওয়ার চান্স পেলেই হল...।

ফর্কে কেটে বড়া মুখে দিল পরি। 'বিউটিফুল' বলতে গেল, ঠিক মানাচ্ছে না, বলল, অ'সাম, অ'সাম। আর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী জোড়া লাগিয়ে দু'বার ঝাঁকাল। এবার চা।

তীর্থঙ্কর বলল, ডাক্তার 'স্যাক'-টা প্লেস করার আগে বড়-বড় ফিল্মস্টারদের, মডেলদের জিগ্যেস করে নেয়—টাবা, না টুবা? আমাদের টাবা-টুবায় দরকার নেই, তাই না?

নিনার দিকে তাকিয়ে একটু ফিচেল হাসল তীর্থঙ্কর।

পরি কিছু না-বুঝে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। নিনা বোধহয় কিছু বুঝেছে। ও নিশ্চয়ই সুডৌল বুক বানিয়েছে টাবা-টুবা করে।

পরি'র তাকানো দেখেই তীর্থঙ্কর বলল, সব ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। TABA হচ্ছে 'ট্রান্স-অ্যাক্সিলারি ব্রেস্ট অগ্‌মেন্টেশন'। বগলের তলায় কাটা হয়, ওখান দিয়েই সুড়ঙ্গ করে বুকের চর্বি-চামড়ার তলায় 'স্যাক'-টা ঢোকানো হয়। তা হলে, কাটা দাগটা একদম বোঝা যায় না। আর TUBA হল 'ট্রান্স অ্যাম্‌বিলিক্যাল ব্রেস্ট অগ্‌মেন্টেশন'। মানে, বেলি বট্‌ন-এর গর্ত দিয়ে যন্তর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। 'বেলি বট্‌ন' মানে নাভি। অ্যাম্‌বিলিক পয়েন্ট। এখানেই জন্মের সময় নাড়িটা কাটা হয়। নাভির ইনোসেন্ট গর্তটা ব্যবহার করা হয়। কারও কিচ্ছুটি বোঝার উপায় নেই। আমি এটা করি না। 'টাবা' করেছি, 'টুবা' করিনি কখনও। IMF-ই ভাল, সহজ, তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। IMF হল ইন্ট্রা-ম্যামারি ফোল্ড। বুকের তলায়। মানে, স্তনের তলায় কেটে ভিতরে বুকপকেট বানাতে হয়, সেই পকেটে ইম্‌প্ল্যান্ট ভরে দেওয়া। 'বুকপকেট' বানানোটাই আসল বাহাদুরি, আর কত ছোট করে কাটা যায়, যেন স্কার, মানে, কাটা দাগটা একদম বোঝা না যায়। স্তনের তলায় দিকে যে-ভাঁজটা, ওখানে কাটলে দাগটা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, স্তনটা একটু ঝুলে থাকে তো? ওপরের দিকে ঠেলে তুললে তবে স্কার-টা বোঝা যেতে পারে। ওটাও চায় না অনেকে, তাই 'টাবা'। আর কেউ-কেউ NAC এরিয়াতেও ইনসারশন দেয়। NAC মানে 'নিপ্‌ল অ্যারিওলা কমপ্লেক্স', ছোট করে 'ন্যাক'। ছবিটা দেখায় তীর্থঙ্কর। স্তনবৃন্তকে কেন্দ্র করে একটা বৃত্ত। ও বলে, এই অ্যারিওলা স্কিন কালারের তুলনায় অনেক 'ডার্ক' হয়। ফরসাদের গোলাপি, শ্যামলাদের কালো। একটু শ্যামলা মেয়েদের 'ন্যাক'

এরিয়াতে 'স্কার' থাকলে তেমন কিছু বোঝা যায় না। তবে 'মিল্ক ডাক্ট' একটু ড্যামেজ হতে পারে। ছেলেদের তো আর 'মিল্ক ডাক্ট' রাখার ব্যাপার নেই। তা হলে কিন্তু একটা প্রশ্ন হতেই পারে, ছেলেদের কেন ছোট হলেও নিপ্ল আছে, অ্যারিওলা আছে?

পরি মনে-মনে বলে, ভাগ্যিস আছে...!

তীর্থঙ্কর বেশ ফ্রেশ মেজাজে আছে। ইতিমধ্যে দু'টো ফোন এসেছিল, কেটে দিয়েছে। এবার 'অফ' করে দিল।

তীর্থঙ্কর বলল, একটা গল্প বলি। একটা গাড়ির শো-রুমে গাড়ি বিক্রি হচ্ছে। আধুনিক গাড়ি। সব কিছু অটোমেটিক। সুইচ টিপলেই স্টার্ট হয়। গিয়ার-টিয়ার সব অটোমেটিক। গাড়ির সঙ্গে ফ্রি'তে কিছু অ্যাক্সেসারিজ দিয়েছে : বাল্ব, টায়ার, রেন্চ... সঙ্গে একদা 'দ'-এর মতো লোহা। ওটা স্টার্টার। ছোটবেলায় দেখেছি—লরি-টরি স্টার্ট না-হলে সামনে ওই 'দ'-এর একটা মাথা গাড়ির ইঞ্জিনে ঢুকিয়ে, অন্য মাথাটা ধরে ঘোরাতে। দু'-তিনবার ঘোরালেই গাড়ি স্টার্ট দিত। ওই প্রিমিটিভ স্টার্টার'টা দেখে এক খদ্দের বলল, এ গাড়ি আমি নেব না, মাঝপথে গাড়ি বন্ধ হয়ে গেলে 'দ' ঢুকিয়ে আমি গাড়ি স্টার্ট দিতে পারব না।

সেল্সম্যান বলল, সেই প্রশ্নই উঠছে না। এ গাড়ির স্টার্ট তো সুইচে হয়।

—তবে দ-টা দিচ্ছেন কেন? নিশ্চয়ই দরকার হয়। রাস্তায় নেমে 'দ' মারতে পারব না।

সেল্সম্যান বোঝানোর চেষ্টা করে, 'দ' মারার কোনও প্রশ্নই নেই। খুব ভাল গাড়ি এটা, আসলে এটা 'ট্রাডিশন'। একশো বছরের পুরনো কোম্পানি। প্রথম থেকেই গাড়ির সঙ্গে 'দ' দেওয়া হত। সেই ট্রাডিশন'টা রয়ে গিয়েছে। এটা একটা এথ্নিক ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছু নয়।

খদ্দেরটা বলছে, ওসব শুনব না। 'দ' যখন গাড়ির সঙ্গে দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই এটার ব্যবহার হবে।

সেল্সম্যান তখন বলল, স্যর, কিছু মনে করবেন না। আপনার বুকের দু'পাশে দু'টো নিপ্ল আছে। ছোট হলেও আছে। কোনও দিন কোনও কাজে লাগবে? আপনি কি আপনার বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবেন কোনও দিন? তা হলে কেন আছে? এথ্নিক বিউটি।

তারপর খদ্দের কন্ভিন্সড হল।

তীর্থঙ্কর এবার বলল, ভগবান বলো, প্রকৃতি বলো, ওরা জানে, ছেলেদেরও এটা দরকার হয়ে যেতে পারে, যেমন তোমার দরকার হচ্ছে পরি। ওই ছোট্ট অ্যারিওলা আর নিপ্ল আছে বলেই তো বাড়ানো যাচ্ছে। প্রকৃতি জানে, কখনও নিশ্চয় কোনও ছেলে মেয়ে হতে চাইবে। যার জন্য ছেলেদের বুকেই সেনসেশন দিয়েছে। তাই না?

পরি ঘাড় নেড়ে সমর্থন করে। চয়নের কথাও মনে পড়ে।

তীর্থঙ্কর বলে, পরি, তোমার ব্রেস্ট শেপ-টা দেখে নেব। না, এখন নয়, পরে। বুকটা ফুলে উঠে যখন একটু ঝুলে যাবে, স্কার মার্কটা একদম ঢেকে দেবে।

কেন? ঝুলে যাবে কেন? পরির কথাটা পছন্দ হয় না।

—ও গড! একটু ঝুলবে না? গ্র্যাভিটেশন নেই? একটুও না-ঝুললে তো নিউটন ফেল। তাই না?

ঘাড় নাড়ায় পরি। ওর মনে 'পীনোন্নতা পয়োধরা' শব্দটার একটা 'ইমেজ' ছিল। দেবীমূর্তিদের পয়োধর সমুন্নতই দেখেছে যে...।

তীর্থঙ্কর বলে, 'ইনসিশন' দিয়ে 'এলাস্টোমার' বা 'স্যাক'-টা ইনসার্ট করে সিলিকোন জেল ইনজেকশন করে দিতে একটা ব্রেস্টের জন্য দেড় ঘণ্টা সময় 'এনাফ'। আর ব্রেস্টটা কত বড় হবে, সেটা ৩২, ৩৪, ৩৬ সাইজ হিসেবে করা হয় না, মানে ইঞ্চিতে নয়, সিসি-তে। 350 cc, 450 cc, 600 cc এরকম। একটা মানানসই ভল্যুমের জেল দেওয়া হয়। তারপর 'ন্যাক এরিয়া ম্যানেজমেন্ট'। মেয়েদের নিয়ে সমস্যা নেই, ওদের অ্যারিওলা, নিপ্ল সব থাকে। অ্যারিওলা-র মধ্যে ছোট-ছোট ফুসকুড়ির মতো যেটা থাকে, তার নাম 'মন্টগোমরি বাড্স'। ছেলেদের জন্যই বুদ্ধি খরচা করতে হয়। আগেকার দিনে অ্যারিওলা-টা বড় করার জন্য ব্রাউন কালারের 'ট্যাটু' করে দেওয়া হত। চামড়া পুড়িয়ে যে-ট্যাটু, সেটা থেকে যায়। এখন তো কস্মেটিক ট্যাটু'তে চামড়া পোড়ানো হয় না। তবে এমন সব রং আছে, দু'বছর থেকে যায়। ছেলেদের 'ন্যাক' এরিয়াটা ছোট হয়। কিন্তু একটু বাম্প করিয়ে দেওয়া যায়। মানুষের কনুইয়ের চামড়াটা অনেকটা অ্যারিওলা-র মতোই দেখতে। বিদেশে অনেকে কনুইয়ের চামড়াটা গ্রাফ্ট করে। সমস্যাটা নিপ্ল নিয়ে। নিপ্লের তলায় অন্য টিস্যু ভরে দেওয়া যায়, ফোর টু সিক্স মিলিমিটার উঁচু করা যায়, কিন্তু নর্মাল নিপ্ল সাইজ এইট্টু টু টেন মিলিমিটার। তবে স্টিফ্ করানো মুশকিল। উত্তেজনায় নিপ্ল স্টিফ হয়ে যায় না? ইরেক্টাইল টিস্যু আমরা পাব কোথায়? বিদেশে পেনিস গ্লান্স নিয়ে চেষ্টা হয়েছে, সাকসেস্ফুল-ও হয়েছে। 'পেনিস গ্লান্স' হল 'টিপ অফ দি পেনিস'। লাল মতো জায়গাটা। যারা পেনেক্টমি করে, মানে পেনিস 'রিমুভ' করে, ওদের গ্লান ইউজ করা যায় নিপ্ল বানাতে। কী দরকার বাবা? বাইরে বেরনোর সময় বাংলা নিপ্ল বসিয়ে দাও ভাল রবারের, রিমুভ করা যায়, চেঞ্জ করা যায়, নাকের নথের মতো। ব্যস।

সব নিয়ে মাত্র দু'ঘণ্টায় হয়ে যাবে? পরি জিগ্যেস করে।

—আবার কী? সিম্পল তো। কমপ্লেক্স করলে কমপ্লেক্স।

—কেমন খরচ?

—ভাল পলিমারের এলাস্টোমারে সিলিকোন জেল দিয়ে 'আইএমএফ' করলে পঁচাত্তর হাজারেই করে দেব। সকালে ভর্তি হবে, বিকেলে বাড়ি যাবে। ব্যস।

—ব্যস?

এই তো ব্যাপার। পরি ভাবে। অথচ যারা ব্রেস্ট করিয়েছে, ওরা কত না ফাট মারে। ব্রেস্ট তো নয়, বুব্স বলতে হয়, বুব্স। পরি বলে দোতলাটা বুঝলাম। একতলা?

তীর্থঙ্কর বলে, আর একদিন।

—থিওরিটিক্যাল ক্লাসটা আজই হয়ে যাক না।

—একতলাটাও করবে না কি?

—ভাবছি তো।

—তোমার বাবার টাক ছিল?

—টাকের সঙ্গে কী সম্পর্ক?

—সম্পর্কটা হল, বাবার টাক থাকলে ছেলেরও টাক পড়তে পারে। টাকটা সাধারণত ছেলেদেরই হয়। এত কষ্ট করে সব কিছু করা হল, তারপর টাক পড়তে শুরু করল। তারপর উইগ পরো...।

—আমার বাবার টাক ছিল না। এখন চুল নেই। সে অন্য কথা। 'উইগ' পরলে ক্ষতি কী?

সাজার জিনিস তো। আই ল্যাশ লাগানো যায়, স্পঞ্জি প্যাড লাগানো যায়, উইগ কী দোষ করল...।

—তবে তো ঠিকই আছে। মনের সায় হলেই হল। 'উইগ' পরলে অনেকের মাথা গরম হয়ে যায়।

—আমার কিন্তু দেখলেই...

শেষ বাক্যটা জোরে।

বাইরে থেকে নিনার গলা—কোনও ছেলেকে চুল ডাই করতে দেখলেও আবার আমার মাথা গরম হয়ে যায়।

এই তো সংসার। পরির মনে হয়। সংসার সুখের হয় দু'জনের গুণে। কী মিষ্টি খিটিমিটি।

—এই অপারেশনটাকে 'ভ্যাজিনোপ্লাস্টি' বলে। একটা ভ্যাজাইনা বানানো হয়, ল্যামিনা মিজোরা, ল্যামিনা মিনোরা, একটা ক্লিট-ও বানাতে হয়, ভ্যাজাইনা দেখেছ তো?

একটু লাজুক সম্মতি পরির।

—ভাল করে দেখেছ, দরজা-টরজা খুলে?

—মানে?

—তা হলে ভাল করে দ্যাখোনি। অন্দরমহলে যাওয়ার একটা দরজা থাকে জানো তো, ল্যামিনা মিনোরা।

—জানি।

—গুড। ওসব বানাতে হয়, তারপর একটা প্যাসেজ...। এছাড়া প্রস্টেটটাকেও 'রিমুভ' করে দিতে হয়, 'স্ক্রটাম'টাও...।

দুলালের ও লিঙ্গচ্ছেদ হয়েছিল, ক্যাস্ট্রেশনের বর্ননাও দিয়েছিল—যখন দুলালকে নিয়ে অনিকেত কিছু লেখার চেষ্টা করেছিল। সেটা ছিল ছিবড়ানো। আর পরি যেটা করতে চায় সেটা হ'ল পেনেকটমি। পেনেকটমি মানে রিমুভাল অফ পেনিস। লিঙ্গচ্ছেদন। তারপর অরচিডেকটমি। মানে রিমুভাল অফ স্ক্রটাম, —অণ্ডকোষ ছেদন। তারপর তো ভ্যাজিনোপ্লাস্টি—যোনি গঠন। এস.আর.এস. করতে গেলে পরিকে এইসব করতে হবে।

শুক্লা বেশ কয়েবার জিজ্ঞাসা করেছে এইসব অপারেশনে কোন রিস্ক নেই তো? অনিকেত বলেছে—রিস্ক তো অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশনেও আছে, কিন্তু করাচ্ছে তো...

কী যে ভূত চাপল ওর... শুক্লা বলেছিল।

ভূত? তাইতো। অনিকেতের মনে হয়। 'তবু সে দেখিল কোন ভূত? কেন ঘুম ভেঙ্গে গেল তাঁর?'

তারপরের লাইনটা মনে পড়তেই অনিকেত ভয় পেল।

'লাশ কাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার..'।

না-না। কতই তো হচ্ছে আজকাল। বিজ্ঞান কত এগিয়ে গেছে।

উইকিপিডিয়া খুলল কম্পিউটারে। ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নিতে হয়।

পড়তে-পড়তে যেন কানে একবার বেজে উঠল মহিষাসুরমর্দিনী-র ওই জায়গাটা। দেবতাদের সম্মিলিত গুণ থেকে তৈরি হলেন তিলোত্তমা। বৃষ্টি দেবতা বরুণ দিলেন পেলবতা,

অগ্নি দিলেন তেজ, ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু, ইন্দ্র দিলেন আয়ুধ...। পেনাইল ফ্ল্যাপ থেকে ল্যামিনা মিজোরা, স্ক্রটাম স্কিন থেকে ল্যামিনা মিনোরা, বাক্কাল টিস্যু গ্রাফ্‌ট হবে ভ্যাজাইনাল অরিফিস এ...।

অনিকেত দেখল ইউ টিউবে একটা ভিডিও আছে, যেখানে ভ্যাজিনোপ্লাস্টি-র নির্বাচিত অংশ দেখানো আছে। সঙ্গে একটু কমেন্ট্রি। বলছে, এটা সেকেন্ড ফেজ অফ অপারেশন, প্রথম ফেজ-এ প্রস্টেট-টা সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অপারেশন টেবিল। একটি নিরীহ জননাঙ্গ। ফুটপাথের অনাথের মতো পাশ ফিরে শুয়ে আছে। এক জোড়া অণ্ডকোষ। একটা হাত, হাতে সূচিমুখ যন্ত্র। লিঙ্গটাকে একটা গ্লাভ্‌স পরা হাত পেটের সঙ্গে লাগিয়ে চেপে ধরল। একটা সাঁড়াশির মতো যন্ত্র টেনে ধরল অণ্ডকোষের চামড়া। একটা তীক্ষ্ণ ছুরির ডগা কেটে দিল সেই চামড়া। ভেতরে শ্বেতশুভ্র কোষ, এখানেই তৈরি হয় জন্মবীজ। চামড়ার ওপরে চাপ দিল গ্লাভ্‌স পরা হাত, কাটা জায়গাটা দিয়ে বেরিয়ে এল রক্তমাখা সাদা কোষ, পিছনে সুতোর মতো জট। বলছে, ওসব শুক্রনালি। শুক্র তৈরি হয়ে ওই নালিপথে শুক্রস্থলীতে যায়। একটা ছোট সাঁড়াশি টেনে বের করল ওই নালিগুচ্ছ। কোনও কাজে লাগবে না আর। একটা কাঁচি কেটে দিল ওই নল। ট্রে-র ওপরে পড়ে রইল শুক্রনালি বিজড়িত শুক্রকোষখানি। ভিতরে কিছু সেলাই হল। রক্ত-ফেনা মাখা, পাশাপাশি অণ্ডকোষ দু'টি এখন কোষমুক্ত। অণ্ডস্থলী এখন শূন্য। কমেন্ট্রি বলছে, এই স্কিন খুব ইলাসটিক। টেনে অনেকটা বাড়ানো যায়। এই স্কিন লেবিয়াপ্লাস্টি'তে কাজে লাগবে। ল্যামিনা মিনোরা এবং ভ্যাজাইনাল প্যাসেজ...। তৈরি করা যায় এই স্কিন দিয়ে...।

এবার পেনেক্‌টমি। একটা যন্ত্র লিঙ্গটি টেনে ধরল, একটা সূক্ষ্ম সূচের মতো যন্ত্র লিঙ্গত্বকটা কেটে ফেলল। উঃ! না, ও তো অজ্ঞান, বুঝতে পারছে না। ভিতরে নরম, কোমল রক্তরাঙা বেচারা মাংসখণ্ড। লিঙ্গত্বককে টানা হচ্ছে, কমেন্ট্রিতে নানারকম সার্জিকাল যন্ত্রের কথা বলছে, স্ক্যালপেল, ফরসেপ, স্প্যাচুলা, ক্ল্যাম্প্‌স...। লিঙ্গত্বককে কেটে উল্টে দেওয়া হল। একে বলে পেনাইল ইনভারশন। আর ওই চামড়াটা পেনাইল ফ্ল্যাপ। বলছে খুব কাজের জিনিস এটা, নার্ভ-জালিকা আছে এই চামড়ার ভিতরে। খুব সংবেদনশীল। তাই এই চামড়া দিয়েই তো তৈরি হবে যোনিখানি। একটা স্প্যাচুলা টেনে ধরল লিঙ্গশরীর। একটা কাঁচি ভিতরে ঢুকে গেল। একটা গ্লাভ্‌স পরা হাতের রক্তশোষার কাপড় শুষে নিচ্ছে চলকে ওঠা রক্ত। একটি স্প্যাচুলা টেনে আনল লিঙ্গশরীর, যা পেটের ভিতরেই থাকে বেশ কিছুটা, যা এখন সামান্য নলমাত্র, দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থানে এবার যোনিপথ তৈরি হবে। তার আগে মূত্রনালি বাঁচিয়ে সাবধানে প্রস্টেটটিকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল। কী দরকার প্রস্টেটে? ওটা তো পুরুষের একান্ত নিজস্ব। দু'টো সূক্ষ্মমুখ ছুরি কাটতে থাকে দুই উরু মধ্যবর্তী 'জিরো পয়েন্ট'। একটি যন্ত্র বের করে আনে শুক্রস্থলী। কী হবে ওসব আর?

এই জিরো পয়েন্টে তৈরি হবে একটি পথ, যাকে ওরা 'যোনিপথ' বলে ভাববে। এই পথটা তৈরি হবে ব্লাডার আর রেক্টামের মাঝখান দিয়ে। 'রেক্‌ট্রোপ্রস্টেটিক ফ্যাসিয়া' হল একটা পর্দা, যা প্রস্টেট আর ব্লাডারকে রেক্টাম থেকে আলাদা করে রেখেছে। প্রস্টেট নেই, ব্লাডার তো আছে। ওই পর্দাটা থাকবে।

মাংস কেটে পথ করছে। মাংসই তো, ওরা বলছে অনেক কিছু। মাংসর কত নাম, কত ভাগ...।

লিঙ্গ আবরণের যে-চামড়াটা রেখে দিয়েছিল শরীরে, যার নাম পেনাইল ফ্ল্যাপ, পেনাইল শ্যাফ্‌ট-ও বলছে কখনও, সেই চামড়াটা দু'পাশ থেকে টেনে 'গ্রাউন্ড জিরো' আবৃত করে দেওয়া হল। ক্ষত ঢেকে গিয়েছে চর্ম-আবরণে। সেলাই হল তলাটা। মাঝখানটায় ফাঁক আছে, ওখানে যোনিদ্বার হবে। সলিউশনে ডোবানো ঠান্ডায় রাখা গুটলি পাকানো নালি, যাকে 'লিঙ্গ' বলা হত, বলা হত রড, কক, বা ডিক, বাংলায় দার্ঢ্য দু'অক্ষর, তার শেষ প্রান্তে সামান্য লাল রঙের মাংস, টিপ্ অফ দ্য পেনিস, বা গ্লান্‌স ভাল বাংলায় যা শিশ্ন বা লিঙ্গমুণ্ড, তা দিয়ে ক্লিটোরিস হবে। কারণ এটা ইরেক্‌টাইল টিস্যু। রক্তজালিকা এবং নার্ভ সমৃদ্ধ। লিঙ্গ-আবরক যে-চামড়াটা, যা দু'পাশ থেকে টেনে সম্মুখ-যোনি করা হল, সেই চামড়ার কিছুটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। সেই চামড়ার পিছন দিকটা, যা পেনাইল ইনভারশন, যোনিপথ নির্মাণের কাজে লাগে। আর কোষহীন যে-অণ্ডস্থলীটি কুঁচকে পড়ে ছিল, এবার কাজে লাগবে। লিঙ্গ-আবরক চামড়া যদি কম পড়ে—পড়তেই পারে, অনেকের লিঙ্গই তো ছোট হয়, তখন অণ্ডস্থলীর চামড়া যোনিপথ নির্মাণের কাজে লাগে। আর, যোনিদ্বার, বিশেষত ল্যামিনা মিনোরা বানানো হয় এটা দিয়েই। এটা লেবিয়াপ্লাস্টি।

কিন্তু এই সব চামড়ার ক্ষরণ হয় না। পিছল নয়। এজন্য ওই চামড়ার ওপর অন্য টিস্যু জুড়লে ভাল হয়। যাকে বলে 'গ্রাফটিং'। মুখের ভিতরে গালের থেকে কিছুটা টিস্যু নেওয়া যেতে পারে, একে বলে 'বাক্কাল টিস্যু' বা 'ওরাল মিউকোসা। অনেক সার্জন কোলন থেকে টিস্যু সংগ্রহ করে লাইনিং করেন। এইসব টিস্যু নিঃসরণ করতে পারে পিচ্ছিলতা।

অনিকেত বাইশ মিনিটের ওই ভিডিওটির শেষে দেখল কী সুন্দর একটি যোনি তৈরি হয়ে গিয়েছে। ওরা ভাল্‌ভা বলছে, বলুক। অনিকেত দেখল কূর্মাকৃতি যোনি, শঙ্খিনী? পুরো অপারেশন করতে নাকি তিন ঘণ্টা পনেরো মিনিট লেগেছে। বাইরে ঝুলে আছে একটি ক্যাথিটারের নল।

বলছে, এরপরও আরও দু'-তিনবার আসতে হবে সার্জারি টেবিলে। বলছে, এই সব সার্জেন এক-একজন শিল্পী। প্রতিটি অপারেশন এঁদের কাছে সৃষ্টি। বলছে, ডেনমার্কের ক্রিস্টিন জরগেনশন শুরু করেছিলেন ১৯৫২ সালে, তারপর ইংল্যান্ডের রেনে রিচার্ডস, জার্মানির এলমার বেল্‌ট, আমেরিকার হপ্‌কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের চেষ্টায় এখন এই সার্জারির কত উন্নতি ঘটেছে। ভিডিওটা শেষ হওয়ার পর অনিকেতের মনে হচ্ছিল স্ক্রিনে রক্ত লেগে আছে। মনে হচ্ছিল মাছি আসবে। উঃ, এত কষ্ট। ছেলেটার শরীরে এত সব হবে? রিফ্রেশ বোতাম টেপে কম্পিউটারে। এতে কম্পিউটার নিজে রিফ্রেশ হয় হয়তো, ও তো হবে না। গুগ্‌লে গিয়ে ফুল সার্চ করে। রোজ। গোলাপ।'ইয়েলো রোজ' নামে একটা সাইট দেখে। ক্লিক করে দেয়। ফুটে ওঠে 'মাই মনোলগ'। পড়তে থাকে। 'অল রোজেস আর নট পিংক। আই অ্যাম ইয়েলো রোজ।' একজন রূপান্তরকামী বলছে নিজের কথা। তার মানে, সেই কবে পবনরা যেটা বলেছিল সেটা ওদের কথা নয়, শিক্ষিত রূপান্তরকামীদের মধ্যে এই লব্‌জটা চালু আছে।

অনিকেত পড়তে থাকে। ওই একই কথা, নিজেকে মেয়ে ভেবেছে ছোটবেলা থেকে, যদিও লিঙ্গচিহ্নে পুরুষ। পুরুষদের সঙ্গে যৌনমিলন করেছে, ছেলেটির বাড়ি মিশিগানে, ছেলেটি ব্ল্যাক। একটা সময় মনে হয়েছে পর্নস্টার হবে। টাকা কামাবে। ও অপারেশন করায়। অপারেশনের পর নানা অসুবিধার কথা খোলাখুলি বলেছে ওই পেজ-এ। ও যেটা লিখছে, তা হল অপারেশনের পর দেখলাম আমার একটা যোনি হয়েছে। যেটা আমার স্বপ্নে ছিল। যোনিদ্বার দিয়ে রক্ত পড়ত। প্রথমটায় খুশি হয়েছিলাম। আহা, একেই তো বলে মেনস্ট্রুয়েশন। কিন্তু রক্ত পড়া বন্ধ হল না, ভেতরে জ্বালা যন্ত্রণাও। ডাক্তারের কাছে যেতে হল। দেখা গেল, ইনফেকশন হয়েছে। পুরুষ থাকার সময় প্রস্রাবের বেগ নিয়ন্ত্রণ করা যেত। প্রস্টেট সেক্ষেত্রে সহায়ক ছিল। খুব অসুবিধা হচ্ছিল যোনিছিদ্রটি নিয়ে। ডাক্তার বলেছিল ডায়ালেটর ব্যবহার করতে নিয়মিত। ওটা এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। হিউম্যান বডি আর্টিফিশিয়াল ভ্যাজাইনা'কে সহজে মেনে নেয় না, শরীর মনে করে ওটা একটা ক্ষত। যে কোনও ক্ষত 'হিল' করতে চায় শরীর। এই ছিদ্রটাও বুজিয়ে ফেলতে চায়। রক্তপাত চলাকালীন আমি কয়েক দিন ডায়ালেটর ব্যবহার করিনি, ফলে ভ্যাজাইনাল অরিফিস-টা ব্লক হয়ে গিয়েছিল, তাই আমাকে আবার সার্জারি টেবিলে উঠতে হয়।

ও আরও কত অসুবিধার কথা লিখেছে, নিয়মিত ইস্ট্রোজেন নেওয়ার ফলে নানা শারীরিক অসুবিধে, মাথা ঘোরানো, এসব তো আছেই, আরও লিখছে—প্রকৃতিতে দেখি যারা পুরুষ হয়ে জন্মেও টেস্‌টিস বাদ দিয়েছে, ওদের মেটাবলিজম অন্যরকম হয়ে যায়। ভেড়া, শুয়োর, গরু—সবার ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে অণ্ডচ্ছেদনের পর ওরা গায়ে-গতরে বাড়ে। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ওজন বাড়ছিল, খাওয়াদাওয়া কমিয়েও লাভ হচ্ছিল না, তাই আমি অ্যাব্‌ডোমিনোটমি করিয়েছিলাম। স্টমাক ছোট করে দিয়েছিলাম যেন বেশি খেতে না-পারি। কারণ আমার ফিগার ঠিক রাখতে হবে। আমি স্টার। পর্নস্টার হলেও তো স্টার। আমার আর্টিফিসিয়াল স্তন, আর্টিফিসিয়াল ভ্যাজাইনা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, উনি দৃশ্যকামুক মানুষের সংখ্যা দুনিয়ায় ভালই রেখেছেন। আমার রোজগার ভালই ছিল, কারণ একই সঙ্গে কিংবা আলাদাভাবে আমি 'অ্যানাল পেনিট্রেশন' এবং 'ভ্যাজাইনাল পেনিট্রেশন' শুট করতে পারতাম।

শেষ প্যারাগ্রাফে লিখেছে, এখন আমার বয়স তেতাল্লিশ। এই বয়সে এসে মনে হচ্ছে আমি বৃথাই এত কষ্ট করেছি। আমি খুব একা। আমার কোনও প্রেমিক নেই। আমাদের কোনও স্থায়ী পুরুষসঙ্গী হয় না। আমার একজন বয়ফ্রেন্ড ছিল—যাকে আমি প্রেমিক মনে করতাম, সে আমার অনেক টাকাপয়সা নিয়ে টরেন্টো চলে গিয়েছে। এখন আমার তেমন টাকাপয়সা নেই। পা ফাঁক করতে, নিচু হতে, উপুড় হতে আর ভাল লাগে না। একটা নাচের স্কুল করেছিলাম, চলেনি, আমার গায়ে পচা আলুর গন্ধ লেগে আছে। যিশুর কাছে প্রার্থনা করেছি : শান্তি দাও। ফাদার বলেছে, রিপেন্ট করো। আর কত রিপেন্ট করব। আমার সমস্ত পাপড়িগুলো খসে পড়ার আগে কাঁপছে। কিছু করতে চায়, মানুষের কাজে লাগতে চায়। আমাকে মানুষ অবজ্ঞা করেছে একসময়। কিন্তু প্রতিশোধ নয়। সমস্ত মানবস্রোতের মধ্যে একজন হয়ে কিছু করতে চাই। আমাকে হেল্প করুন স্যর, হেল্প করুন ম্যাডাম...।

যাব্বাবা। রবীন্দ্রনাথ কি এঁর কথাও জানতেন নাকি, না কি রবীন্দ্রনাথই এঁর কথা বলেছেন—

নয়ন তোমার নত করো,
দলগুলি কাঁপে থরোথরো
চরণ পরশ দিয়ো দিয়ো, ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়—
ফুল বলে ধন্য আমি মাটির পরে।

এই লেখাটা কি পরিকে পড়ানো যায়? ওর মেল আইডি জানে না। জানতে হবে। এই পেজ-টা কপি করে রাখে অনিকেত। ওই ভিডিওটা দেখার পর অনিকেতের মনটা কেমন যেন দুর্বল হয়ে যায়। সবই তো বোঝে ও। এত দিন এসব নিয়ে নাড়াঘাঁটা করেও মনে হয়, পরি কেন এসব করতে চাইছে? ওর একটা পিতৃসত্তা জেগে ওঠে। বোধহয় বাৎসল্য। বাৎসল্যের মধ্যে অনেকটা স্নেহ মেশানো থাকে। 'স্নেহের স্বভাবই এই, অমঙ্গল আশঙ্কা করে।' বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন।

এত যে কাণ্ডকারখানা, রি-অ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি, গালের ভিতর থেকে, কোলন থেকে, লিঙ্গগাত্র থেকে টিস্যুসংগ্রহ, শরীর পাল্টানো, এটা একটা জেদের মতো হয়ে যাওয়ার পর জেদ শেষ। আন্তিনিওনি-র একটা ছবির কথা মনে পড়ে, সম্ভবত 'ব্লো-আপ'। একজন অতিজনপ্রিয় পপ গায়কের গিটারটি ভেঙে যায়। দর্শকদের মধ্যে ছুড়ে দেয় সেই গিটারটি। দর্শকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। একজন কেউ ওটা পায়, ওটা নিয়ে ছোটে, পিছনে ছুটছে আরও অনেক মানুষ। যার অধিকারে ছিল গিটারটি, তার মনে হয় পাওয়া তো হয়েই গিয়েছে, আর কী হবে? পিছনের জনতার দিকে ছুড়ে দেয়। ওখানেও আবার কাড়াকাড়ি শুরু হয়। একজন কেউ পায়, ছোটে, পিছনে জনতা...।

পরির এই ইচ্ছেটা কেন? পরিদের? 'মেয়েলি' হওয়া সমাজ ভালভাবে নেয় না, হ্যাটা করে, বিদ্রুপ করে। তার চেয়ে মেয়ে হয়ে যাওয়া ভাল, এই ভাবনায়?

না, শুধু যৌনতার জন্য নয়। পুরুষশরীর রেখেও তো নারীদের যৌনতা পাওয়া যায়। পেয়েছে তো। কতটুকু দিতে পারে কোলন লাইনিং? কতটুকু দিতে পারে সিরিঞ্জ-হরমোন? পিটুইটারি-র কালও একদিন শেষ হয়।

শরীর প্রবীণ হয়। বিবর্ণ প্রাসাদ তার ছায়া ফেলে জলে।

ও প্রাসাদে কারা থাকে? কেউ নেই—সোনালি আগুন চুপে জলের শরীরে নড়িতেছে—জ্বলিতেছে।

সে আগুন জ্বলে যায়—দহেনাকো কিছু।
নিমীল আগুনে ওই আমার হৃদয় মৃত এক সারসের মতো।'

শেষ অবধি বোধহয় বাৎসল্য-ই জয়ী হয়!

বাৎসল্য মানে 'এলআইসি'-র লোগো। দু'হাতে একটা প্রদীপকে আগলে রাখা। কোন অ্যাড্রিনালিন-অক্সিটোসিন-ইস্ট্রোজেন-প্রজেস্টেরনে এর ব্যাখ্যা নেই। এই যে বিশ্বসুন্দরী সুস্মিতা সেন, সন্তান ধারণ করেননি, দত্তক নিয়েছেন শিশু। এই যে মানবী ব্যানার্জি, এত কাণ্ড করল, এখন নাকি একটা কিশোর ছেলেকে পুষ্যি নিয়েছে, গরিবের ছেলে। দত্তক আইন

আমাদের যা আছে, এতে করে 'সিঙ্গল মাদার' দত্তক নিতে পারে না। ও হয়তো তাই কোনও শিশুসন্তান দত্তক নিতে পারেনি, কিন্তু পুষ্যি নিয়েছে।

এই বিশ্ব সংসার কিছু মায়া। কিছুটা মায়াবী।

এখন পরির জন্য অদ্ভুত একটা অনুভব হচ্ছে।

তীর্থঙ্কর'কে অপারেশন-এর বিষয়টা খুঁটিয়ে জিগ্যেস করেছিল পরি, বুকের 'সিলিকন প্রসথেসিস' সম্পর্কে বিস্তারিত বললেও ভ্যাজিনোপ্লাস্টি নিয়ে বিস্তারিত বলল না। তীর্থংকর শুধু বলেছিল—অত কিছু জানার দরকার নেই। যখন করে দেব, তখন বুঝবে—'উল্টে দেখি পাল্টে গেছি'। কোন জায়গা থেকে কী মাংস, কী চামড়া নেওয়া হবে—তা বিস্তারিত বলল না তীর্থঙ্কর। শুধু বলেছিল শরীরেই সব আছে, এধার-ওধার করে দেওয়া শুধু। একটা মজার কথা বলেছিল, বলল, ঠোঁট থেকে পায়ুদ্বার পর্যন্ত প্রায় একই জাতের টিস্যু আছে। পিঙ্ক। জিভ, গাল, খাদ্যনালি, কোলন, পায়ু, ভ্যাজাইনা—সব পিঙ্ক রঙের। ঠোঁটে লঙ্কা ঘষে দিলে জ্বালা করে, আবার লাস্ট এন্ড মলদ্বারেও লঙ্কা ঘষে দিলে জ্বালা করে। ওই টিস্যুই এধার-ওধার করা আর কী। তোমার কথা মতো 'দোতলা' হোক, পরে নয় 'একতলা' হবে। পরিও এমনটাই ভেবেছে।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেল। ২ জুন, ২০০৯ তারিখে দিল্লি হাই কোর্টের রায় বেরিয়ে গেল। কোর্ট বলল, সমকামিতা অপরাধ নয়। সেই কবে 'নাজ ফাউন্ডেশন' মামলা করেছিল। হাই কোর্ট খারিজ করে দেয়। সুপ্রিম কোর্ট বলে মামলাটা চালু করতে হবে। ২০০৮ সাল থেকে আবার শুনানি শুরু হয়। এবার মিটল। জাস্টিস অজিত প্রকাশ শা এবং জাস্টিস মুরলীধরন ১০৫ পাতার একটা রায় দিলেন। বললেন, ৩৭৭ ধারার একটা অংশ ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারার বিরুদ্ধে যায়, যেখানে ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের একইরকম সুযোগ পাওয়ার অধিকার আছে। যৌনসঙ্গীর ব্যক্তিগত পছন্দের ওপর রাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে না। সমকামীদের ক্ষেত্রে 'অ্যাবনর্মাল' শব্দটার পরিবর্তে 'ডিফারেন্ট' শব্দটা প্রযুক্ত হল। সম্মতি সাপেক্ষে যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার সমলিঙ্গের সঙ্গে শরীর-সম্পর্ক আইনের সম্মতি পেল। ৩৭৭ ধারা চালু রইল সম্মতিহীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং শিশুমেহনের ক্ষেত্রেও। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন গোলাম নবি আজাদ। কেন্দ্রে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার। ১২ জুন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বীরাপ্পা মইলি ৩৭৭ ধারা থেকে 'হোমো সেক্সুয়ালিটি' বাদ দিলেন। দেড়শো বছরের পুরনো আইন সংশোধিত হল। এরপর তো দেশ জুড়ে 'এলজিবিটি'-দের উৎসব চলতে লাগল। শুধু সমকামী কেন, উভকামী এবং রূপান্তরকামীরাও শামিল। ভুবনেশ্বরে Gay Pride Parade হল। দিল্লির রামলীলা ময়দানে পনেরো হাজার 'এলজিবিটি' নাচ-গান করল। বাঙ্গালোর, মুম্বই, সর্বত্র। কলকাতাও বাদ যাবে কেন?

পরির-ও আনন্দ হল প্রচুর। অফিসের সবাইকে ফিশ ফ্রাই খাওয়াল। ওর বস সিদ্ধেশ গর্গ ওকে 'কনগ্র্যাচুলেশন' জানালেন। পরি এই আন্দোলন থেকে নিজেকে বেশ বিচ্ছিন্ন-ই

রেখেছিল। অহংকার নয়, নিজের আপাতপ্রতিষ্ঠা পাওয়ার কারণেও নয়, ওদের চালচলন সব সময় পছন্দ হচ্ছিল না পরির। আর অতটা গোষ্ঠীবদ্ধতাও ভাল লাগছিল না পরির। পরিও মেসেজ পেতে থাকল। সব পুরনো বন্ধুর। কেউ মোবাইলের স্ক্রিন জুড়ে অসংখ্য 'ভি' পাঠাল, কেউ পাঠাল 'উই শ্যাল ওভারকাম', কেউ লিখল 'ওহ্ ফ্রিড্‌ম'। কেউ লিখল, 'এনজয়, এনজয়'। তৃপ্তি-ও একটা এসএমএস পাঠাল, আর কী বাধা, এবার বিয়ে কর, সুখী হ। এই এসএমএস-টির মধ্যে তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস মিশে আছে। এই আইন সংশোধনে ওর কী? ওর তো ৩৭৬ ধারার রেপ কেস। কেস টিকবে না, কিন্তু কেস চলছে। এখনও চাকরিতে জয়েন করতে পারেনি। কিন্তু তৃপ্তি হয়তো জানে না—৩৭৭ ধারার সংশোধন মানে সমলিঙ্গের বিয়ে স্বীকার করা নয়। পরি এবং চয়নের বিয়ে রেজিস্ট্রি হবে না। কিন্তু বিয়েটা করবে। মালাবদল করে, মাথায় মুকুট পরে।

'প্রান্তিক' বলে একটা পত্রিকা ৩৭৭ ধারা সংশোধন উপলক্ষে একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। ওখানে যাওয়ার জন্য একটা আমন্ত্রণ পেল পরি। পত্রিকাটা দেখেছে পরি। মলাটে লেখা 'প্রান্তিক মানুষদের নিজস্ব কাগজ'। আলোচনার বিষয় 'সংশোধন, কাটাকুটি, এবং এরপর'। 'সংশোধন বা কাটাকুটি' তো জয় গোস্বামীর একটা গল্পের নাম ছিল। এখানে 'কাটাকুটি' শব্দে অপারেশন ইঙ্গিত করা হচ্ছে না কি? কার্ডে লেখা ছিল অনেক কৃতী মানুষ আসবেন। 'ভারত সভা' হলে এই অনুষ্ঠান। সম্পাদক নিজে ফোন করে পরিকে বললেন, আসবেন কিন্তু। পরির কেমন বেশ শ্লাঘা বোধ হয়েছিল, গণ্যমান্যদের মধ্যে ও পড়ছে তা হলে। খবর কাগজে ওর নামটাম ছাপা হচ্ছে তো। লাইফ স্টাইলের পাতায়।

পরি নিজের জন্য একটা ইনোভেটিভ ড্রেস বানিয়েছে। একটা কুর্তা, কিন্তু টিপিক্যাল মেয়েদের মতো নয়, গোল গলা, বেশি নামানো নয়, লেগিংস, পায়ের দিকটা কাজ করা, একটা ওড়না। কানে দুলও পরল, গলায় হার পরল না।

পরি দেখল, 'ভারত সভা' হল-এর দরজার সামনে জটলা মতো। 'এলজিবিটি'-রা সব এসেছে। লেসবিয়ানদের দেখে বোঝা যায় না, পুরুষ সমকামীদেরও দেখে সব সময় আঁচ করা যায় না। বাইসেক্সুয়ালদেরও বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু রূপান্তরকামীদেরই দেখে বোঝা যায়। ওদের চলন-বলন, আর পোশাকের জন্য। কেউ-কেউ চড়া রঙে ঠোঁট রাঙিয়েছে, ব্রেস্ট অগ্‌মেন্ট করিয়েছে, কয়েকজন উর্ধ্বাঙ্গে এমন পোশাক চড়িয়েছে যেন ক্লিভেজ-টা বেশ ভাল করে দেখা যায়। সি-থ্রু শাড়ি পরেছে দু'-একজন। বিশেষত যারা ফর্সা, পেট প্রদর্শন করছে, একটা পানের দোকানে ক্লোরোমিন্ট কিনতে গিয়ে শুনল—একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মুখে জর্দা পান চর্বণরত অবস্থায় বলল, কালে কালে কোটো কি ডেকটে হল, ভারট সভা হলেও হিজড়েরা মিটিং করছে। লুঙ্গি-পরা পানওলা বলল, লেকিন লিখাই-পড়াই হিজড়া...।

মিটিংয়ের শুরুতে সম্পাদক বললেন, এই পত্রিকা প্রান্তিক মানুষদের কথা বলে। নির্যাতিতদের কথা বলে। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে যেমন বলে, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধেও বলে। আমাদের সমাজে এলজিবিটি-রা প্রান্তিক, এবং সংখ্যালঘু। নির্যাতিত ও উপেক্ষিত। যে কোনও প্রান্তিক মানুষের সংগ্রাম আমাদের সংগ্রাম। এই জয়ও আমাদের জয়। আদিবাসী, ওবিসি, এলজিবিটি সবার লড়াইকেই এক সূত্রে গাঁথতে হবে।

এই সংবিধান সংশোধনকে অভিনন্দন জানিয়ে ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে বিশিষ্টজনরা যা বলেছেন, সেটা পড়লেন একজন 'স্যাফো' অ্যাকটিভিস্ট। অরুন্ধতী রায়, অনিতা দেশাই, শশী থারুর, হর্ষ ভোগলে, গৌতম ঘোষ, ঋতুপর্ণ ঘোষরা কী বলছেন, এঁদের মন্তব্য পড়া হল। স্যাফো-র মীনাক্ষী সান্যাল বললেন, অনেকেই বলেন দেশের প্রধান সমস্যা হল অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। এর মধ্যে ৩৭৭ নিয়ে কেন হইচই? আসলে এই প্রান্তিক মানুষরা যখন সমাজবিচ্যুত হয়—এদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান কোনওটাই থাকে না। আমাদের দেশে এদের সংখ্যা এক কোটি...। খুব হাততালি পড়ল। অভ্যাগতদের মধ্যে কয়েকজন লেখক-কবিদেরও দেখা গেল। পরি পিছন দিকে বসেছিল। উদ্যোক্তাদের একজন ওকে সামনে ডেকে নিয়ে গেল। ওখানে বাসবদা, রঞ্জনদা ওদের দেখল। অনেক দিন পর। আলোচনা হল আধঘণ্টা ধরে, চারজন বক্তা ছিল। সব কেমন পুক-পুকিং মনে হল। কেউ বলল, 'এসসি', 'এসটি', 'ওবিসি'-দের মতো 'এলজিবিটি'দের জন্যও রিজার্ভেশন রাখতে হবে। কেউ বলল, বেসরকারি সেক্স চেঞ্জ সার্জারিতে এখন অনেক খরচ, তাই সরকারি হাসপাতালগুলিতেও সেক্স চেঞ্জ সার্জারির ব্যবস্থা রাখতে হবে। একজন এনজিও কর্তা বলল, অনেক কিয়স্ক তৈরি করতে হবে, যেখানে 'কয়েন' দিলেই কন্ডোম পাওয়া যায়। সবাই ওদের মতো করে ভাবে। এসব নিম্নবিত্ত মানুষগুলো যেন টেলারিং, কার্পেন্টারি বা হাতের কাজ শিখে নিজেদের ভাত-রুটির ব্যবস্থা করতে পারে, এ নিয়ে কেউ কিছু বলল না। এরপর একজন কিশোর, বোঝা যায় রূপান্তরকামী, কবিতা পড়তে লাগল হাত নাড়িয়ে। যতটা সম্ভব, গলাটা সরু করে: প্রথম কবিতাটা পড়ছি কবি জয় গোস্বামীর 'কুরূপ কাহিনী'।

তুমি কি নারীই? কিন্তু লাবণ্য স্বীকার করোনি তো?
গলার আওয়াজ শক্ত। প্যান্টের পকেটে একটা হাত
অন্য হাত উঁচু করে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে বাকিদের
তোমাকে কি করে কারও ভালো লেগে যায়?
এই ধরো আমার?
কাজের সূত্রেই গেছি তোমাদের বাড়ি
খেতে বসবার আগে হাতে-মুখে জল দিয়ে নিতে
ঢুকেছি স্নানঘরে—লম্বা বাথটব—বড় আয়নাটায়
আমার মুখের ছায়া পড়েছিল।
তোমার পোশাক-হারা শরীরের ছায়াটি যেখানে
রোজ দেখা দেয়, স্তনহীনা।
তোমার বৃন্তের মুখ কেউ কখনও দাঁতে চেপে ধরেছিল কিনা
তখনো জানি না।
তোমার পাঁজরসার বুকে মাথা রেখে শুলাম;
ক্যান ইউ ফিল মাই হার্ট বিট?
তখনো গলার স্বর অতই কর্কশ, কিন্তু শ্বাস শব্দ মিশে
কী যে একটা হয়ে আছে।
    তোমার শরীর পুড়ল আমার আঙুলে মাথা বিঁধে

সেদিনই বুঝলাম তুমি পুরোপুরি নারী।

তারপর হঠাৎ এই তিন বছর বাদে মুখোমুখি।
শাড়িতে অনেকটা লম্বা, কাঁধ ছাপানো চুল
শরীর সেরেছে বেশ। তন্বীসীমা পেরনো যুবতী
কোনোদিনই সাজগোজ ছিল না। আজ নাকে হীরে, কানে ঝুমকো দুল
আরে এই যে, ভাল আছেন! চিনতে পারছেন!
সে কি, চিনব না কেন?
একেবারে অন্য কেউ। আমি যাকে চিনতাম, সে নয়।
সঙ্গের যুবকটি এক পা দিয়ে বাইকে আঘাত করছে।
তোমাকেও ওইভাবে আঘাত করে না? করে তো? জানি
আঘাত পছন্দ করো তুমি
সে পছন্দ একদিন জেনেছিল এই অনধিকারীর মরুভূমি
যুবকটি হাই বলল। আমি নমস্কার।
রাজেন্দ্রনন্দিনী তুমি, তোমাকে মাত্রই দু-একবার
পেয়েছি—দৈবের বশে—কুরূপা আমার...।

হাততালির মধ্যেই অনিকেতের পাশে বসা বাসব, কাগজে চাকরি করে এখন—বলল—ওই বাইকে চড়া লোকটা কিন্তু কিছু দিন পরেই ফুটিয়ে দেবে ওকে। শিওর।

ছেলেটাকে দেখে পরির মনে হয়, ওর ফেলে আসা দিন। ও যেন সেই পুরনো পরি। 'রাজেন্দ্রনন্দিনী' হওয়ার স্বপ্ন দেখা পরি। ওই ছেলেটাও মায়ের বকা খায়, পাড়ার লোকের প্যাঁক...।

কয়েকজন কবি টবিও এসেছে। ৩৭৭ বিরোধী হওয়া মানে তো প্রগতিশীলতা। চৈতালী চট্টোপাধ্যায় 'কিন্নরী' নামে একটা কবিতা পড়ল—

না, কোন লক্ষ্মীশ্রীর কথা পড়তে আসিনি...
মা আমাকে সব সময় কুর্তি পরিয়ে রাখে...
আমার বিয়ের জন্য কোন ব্যাংক সেভিংস নেই...

এলজিবিটিরা কবিতা শুনছে না তেমন, নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। চপল ভাদুড়িও এসেছেন। একজন বয়স্ক কেউ পাকাচুল, বোধহয় সাংবাদিক, বল্লেন—বলে দিলাম, লিখে নিন, দিল্লি হাইকোর্টের রায় চ্যালেঞ্জ হবে সুপ্রিম কোর্টে। এটা মেনে নেবে নাকি মর্দ সোসাইটি। কাগজে দেখলাম এক গুরুদেব বলেছে দিল্লি হাইকোর্টের জজগুলো অধার্মিক।

একটু পর নিচে নেমে এল পরি। বাসবও। নিচে তিন-চারজন গুলতানি করছে। কাগজের বাঁশি বাজাচ্ছে একজন, যে-বাঁশি ফুঁ দিলে নলাকৃতি কাগজ ফুলে লম্বা হয়ে লাফিয়ে ওঠে। তালি দিচ্ছে। উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বাস।

বাসব বলল, তোমার তো নামটাম দেখেছি কাগজে। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগই রাখো না তো। 'এসআরএস'-এর কথা ভাবছ?

পরি বলে, ভাবছি।

—পার্টনার?

—আছে।

—ম্যারেড?

—না।

—আনম্যারেড? তুমি তো লাকি।

পরি কিছু বলে না।

বাসব বলে, ওদের বেশি মাথায় উঠিও না। 'তুমি ছাড়া চলবে না' এমন ভাব দেখিও না। চাকরি করে?

—হুঁ।

—ভাল চাকরি?

—না।

—সেই ভাল।

—তোমার অর্গানাইজেশনে ভাল পজিশনেই হয়তো আছ, পারো তো তোমার আন্ডারে কাজ করাও ওকে, যেন তোমার কন্ট্রোলে থাকে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা নিংড়েই তোমায় এই সাজেশন।

এখন বর্ষা চলছে। ৩৭৭-এর সেলিব্রেশনটা সবচেয়ে ভালভাবে করা যেত বিয়েটা করে নিতে পারলে। ওরা যে যাই বলুক না কেন, চয়ন ওর। ও বিট্রে করবে না। পড়ার খরচ মেটানোর জন্য পরি যখন ওইসব কুকর্ম করেছে, চয়ন কি মলম লাগিয়ে দেয়নি পায়ুপথে? মাথায় হাত বুলিয়েছে, বিপদে-আপদে পাশে থেকেছে, দু'-একটা মেয়ের সঙ্গে যা একটু হয়েছে ওর, পরিকে লুকোয়নি। ও চয়নকে বিশ্বাস করে। কত দিন এমন হয়েছে, চয়ন আর পরি দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

দু'জনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি, দোঁহে
মরুপথতাপ দু'জনে নিয়েছি, সহে
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা যেন না যাচি
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়—তুমি আছ আমি আছি।

এই লাইনগুলো রেডিওর প্রেমের নাটকে শুনেছে কত। ওগুলো হেট্রো-প্রেম। এখানে মনে এলেও বলা যায় না। বিয়ের প্রস্তাব চয়নকে তো দিয়েছে ও, চয়ন আপত্তি করেনি। তবে এখন তো খেলা-খেলা বিয়ে হবে। আইনি বিয়ে হওয়াতে গেলে ওকে মেয়ে হতে হবে। একতলা, দোতলা, সবরকম অপারেশন করিয়ে, ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে, কোর্টে কাগজ করিয়ে... সে অনেক ঝামেলা। তার আগে রেজিস্ট্রি না-হোক, এমনি-এমনি বিয়েটা সেরে ফেলতে পারলে বেশ হত। মানবীদের মতো শাখা-সিঁদুর শো করবে না। চুলের ফাঁকে একটু অল্প একটু সিঁদুর লাগিয়ে রাখবে। অনেক নারীবাদীরাও তো সিঁদুরের পরশ রাখে।

চয়ন বলেছিল, বিয়ে করলেও কাউকে বলতে পারবে না। বাড়িতে তো নয়ই, বন্ধুবান্ধবদের কাছেও বলতে পারবে না। স্কুলে জানতে পারলে হয়তো চাকরিটাই চলে যাবে। ও তো পার্মানেন্ট টিচার নয়, স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে চাকরিটা পায়নি। চাকরিটা পেয়েছে

ব্যাকিং-এ। প্যারাটিচার। সেক্রেটারির ভাগ্নেকে প্রায় বিনে পয়সায় পড়িয়ে, তেল মেরে, ছাত্রটির বাড়িতে বর্ষায় ইলিশ, শীতে পাটালি নিয়ে গিয়েছে চয়ন। ওরা যদি জানতে পারে এই টাইপের কাউকে বিয়ে করেছে ছোঁড়াটা, চাকরি চলে যাবে। ছাড়িয়ে দেবে ওরা। এই চাকরি ছাড়ানো কোনও ব্যাপার নয়, স্কুল কমিটির ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর ঝুলছে চাকরিটা। পরি একবার চয়নকে জিগ্যেস করেছিল, অন্য চাকরি পেলে করবে কি না। ও বলেছিল, বেশি মাইনে পেলে নিশ্চয়ই করব। এখানে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা পাই। অন্য চাকরি করতে-করতেও সরকারি চাকরি বা বেটার কোনও চাকরির চেষ্টা করা যায়। পরি ঠিক করল, ওর বস গর্গকে বলবে। সব খুলেই বলবে। গর্গ কিছুটা তো জানেই।

'বিয়ের ফুল' বলে কেন? প্রথমে কুঁড়ি হয়, তারপর ফোটে বলে। উন্মেষ? ফুল ঝরেও যায়। ঝরুকগে। বিয়ে মানে নারীত্বের স্বীকৃতি। পরি ওর বাবাকেও বলে দিয়েছে। পরির বাবা এখন পরির কাছেই থাকে। কেমোথেরাপি করার পর শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল, এখন হিমোগ্লোবিন বেড়ে নয় ছড়িয়েছে। খুব কাতর স্বরে ডাকে পরি, পরি...। খুব যখন জ্বর, প্রলাপ বকতো, মা গো মা এইসব কাতর ধ্বনি করত, পরি কপালে হাত বুলিয়ে দিত, জলপট্টিও। একদিন পরির হাত ধরে বলেছিল, মা গো মা...।

একদিন বলেছিল পরি, তুই ছেলে হলেও মেয়ের গুণ তোর। আমাকে যত্ন করিস। যদি ছেলে হতিস, বউ নিয়ে আমায় ছেড়ে চলে যেতিস। মেয়ের মত বলেই আমাকে দেখছিস রে...। মেয়েদেরই মায়া-মমতা বেশি হয়।

পরি ওর বাবাকে বলল, বিয়ে করব ভাবছি।

কার্ত্তিক ওর মুখের দিকে তাকায়। বিয়ে করবি? বউটা আমায় তাড়িয়ে দেবে না তো?

পরি বলে—বউ নয়, চয়ন, চয়ন।

চয়ন? ও বুঝেছি, তুই চয়নের বউ-এর মত হয়ে থাকবি...।

বউদের মত কেন? বউ হয়েই থাকব। আমি তো অপারেশন করাব, মেয়ে হয়ে যাব, একদম মেয়ে, চিনতেই পারবে না। তুমি আর একটু ভালো হয়ে গেলেই অপারেশন করিয়ে নেব।

চয়ন আমাকে তাড়িয়ে দেবে না তো?

ইশ্—বল্লেই হল? ঘাড় কাত করে বলেছিল পরি। কার্তিক পরির হাত চেপে ধরল। বলল পরি মা। পরি টিভি সিরিয়ালের আহ্লাদিনীর মত বলেছিল, তোমার কোনও আপত্তি নেই তো বাবা!

এই প্রথম পরি ওর ভিতর থেকে এরকম বাবা সম্বোধন করেছিল।

পরির বাবা বলেছিল—আমি কে আপত্তি করার? ভালোই তো। আমার অসুখ, আমার জ্বর আমার সব খাদগুলো পুরিয়ে দিয়েছে।

এই অসুখটাই হয়তো কার্তিককে পাল্টে দিয়েছে। মানুষের অসহায়তাও মানুষকে পাল্টায়। 'থাকিলে ডোবাখানা হবে কচুরিপানা'—স্বভাব তো কখনও যাবে না, কথাটা চিরসত্য নয়?

বিয়েটা করে ফেললে হয় এবার। কালীঘাটে করলে লোকজন সত্যিকারের প্যাঁক দেবে আওয়াজ করে। হয়তো পাণ্ডারাও রাজি হবে না। দরকার নেই কালীঘাট, দরকার নেই মন্দির-টন্দির। চন্দ্র-তারা, আর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব সাক্ষী রেখে একটা কোথাও করতে হবে। এলইডি লাইটের আলোকসজ্জা নয়, জোনাকি জ্বলবে। জোনাকি কোথায়? তারা-ই জ্বলুক আকাশে।

ফুল গাছগুলো দুলুক, গন্ধ ছড়াক বাতাসে, পাখিরা ডাকুক...। রাত্রে বিয়ে হলে প্যাঁচা ছাড়া কোন পাখিই-বা ডাকবে? কিন্তু রোমান্টিক ভাবনায় আহা কী রোমাঞ্চ!

না, বিয়েটার কথা সত্যি-সত্যি ভাবছে পরি। বাড়িতে বাংলা ক্যালেন্ডার নেই। একটা ছোট পঞ্জিকাই কিনে নিল। পরি যে খুব সংস্কারপরায়ণ তা নয়, তবে এই সব রোমান্টিক ব্যাপারে ট্রাডিশন-টা রাখতে চায়। এই তো শ্রাবণ মাসটা চলে যাবে। ভাদ্র মাসে কি বিয়ে হয়? সেই অঘ্রানের আগে নয়। সব যেন ঠিকঠাক থাকে। হে ভগবান, বাবাটাকে বাঁচিয়ে রেখো।

এখন শ্রাবণ চলছে। হাতে আর তিন মাস। এর মধ্যে শরীরটা পাল্টাতে হবে। নিজের জন্য একটা সুন্দর বিয়ের ড্রেস তৈরি করতে হবে। অবশ্য বিয়ের ড্রেস আর কী হবে, ও তো রাজকুমারীর ড্রেস চাইছে না, বেনারসী শাড়ি পরেই হবে, কিন্তু একটা মানানসই ব্লাউজ বানাতে হবে। ওরা শাড়ির সঙ্গে যে ব্লাউজ পিস'টা দেবে শুধু ওইটুকু দিয়ে 'প্রেতাপর্তে' নয়, স্পেশাল, 'অঁথ কইওর'। যা হবে নতুন পাওয়া পয়োধরের জন্য সেলিব্রেশন। আহা, পয়োধর। পীন পয়োধর। 'পীন' বিশেষণটা যেন শুধু পয়োধরের জন্যই। 'ব্রেস্ট অগ্‌মেন্টেশন' বা 'সিলিকন প্রসথেসিস' বলতে ভাল লাগে না। কী বলা যায়? স্তনের কী-কী প্রতিশব্দ হয়? কুচ। 'কুচযুগ শোভিত মুক্তা হারে'—সরস্বতী বন্দনায় আছে। আর কী হয়? 'মাই' খুব বাজে। পয়োধর-টা বেশ শুনতে ভাল, কিন্তু 'পয়োধর' মানে মেঘও হয়, নারকোলও হয়। মানে—যা জল ধারণ করে। দুধ ধারণ করে বলেই 'পয়োধর' নাম হয়েছে। এই নবস্তন দুগ্ধধারণে অক্ষম, দুগ্ধ সৃষ্টিতেও। তা হলে কুচ। 'কুচ কুম্ভ' শব্দটা বেশ লাগে শুনতে। 'কুম্ভ' মানে তো ঘট। তারচে' ব্রেস্ট অগ্‌মেন্টেশন ব্যাপারটাকে ঘটস্থাপন বললেই তো বেশ হয়। 'ঘটস্থাপন' শব্দটার মধ্যে কী সুন্দর একটা রিচ্যুয়াল রিচ্যুয়াল ভাব আছে, পুজো-পুজো ভাব। পঞ্জিকায় পূজা পদ্ধতিতে আছে যে কোনও পূজার প্রারম্ভে ঘটস্থাপন করতঃ, ঘটশুদ্ধি করিবে।

ঘটস্থাপন-টা করে নেবে পরি। শিগগিরিই। কত বড় ঘট বসাবে? ৩৬ মানাবে না। ও তো পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। কাঁধটাও চওড়া নয় খুব। ৩৪-ই ভাল। মানে বোধহয় ৩৮০ সিসি। মেয়ে হলে ওকে ভালই মানাবে, যেমন তিস্তা মিত্রকে মানিয়ে গিয়েছে। মানবীদির কাঁধটা চওড়া, হাইটও বড্ড বেশি। অলোকাদির মুখটা চৌকো ছিল। পরির মুখটা ওভাল, থুতনি গোল, ওকে মানাবে। ও পুরোটাই করবে। ক্রুজো। পুরো সেট। পিস মিল না-করে ক্রুজো করাই তো প্রেস্টিজের। সব্যসাচী মুখার্জি, রিতু কুমার'রা সিনেমা আর্টিস্টদের বিয়ে 'ক্রুজো' করে। পুরো সেট। বিয়ের তিন দিন আগে থেকে হনিমুন ড্রেস পর্যন্ত। পরি এখনও কোনও ক্রুজো অর্ডার পায়নি, শরীরটাকেই ক্রুজো করাবে।

জানালার ফাঁক দিয়ে মেঘ-মাখা আকাশ। জলভরা মেঘ। পয়োধর। অঞ্জন ঘন পুষ্পচ্ছায়ায় সম্বৃত অম্বর। আকাশের দিকে তাকিয়ে পরি বলে, বেশ করব ক্রুজো করব করবই তো।

চয়নও বলেছিল শরীরটাকে নিয়ে এত কাটাকুটি নাই-বা করলি, এমনিতেই তো ঠিক আছে। চয়ন-ই ওর ইস্ট্রোজেনের অভ্যাসটা বন্ধ করিয়েছে। বলেছিল, উল্টোপাল্টা খাস না, সাইড এফেক্ট আছে। ওই সব খেয়ে পরি ওর বুক কিছুটা তো বানিয়েছে, যদিও তেমন কিছু নয়, একটা সফেদা আধখানা করে যেন দু'দিকে সাঁটা। সেখানে এবার ঘট বসবে। ঘটস্থাপন। হেরো গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর হেরো গো নারী হৃদয়ের পবিত্র মন্দির। রবীন্দ্রনাথ কত বছর বয়সে লিখেছিলেন 'স্তন' কবিতাটা? বাইশ বছর বয়সে। এটা হয়ে গেলে এক দেড় মাস টাইম

নিয়ে বাকিটা। সেক্স চেঞ্জ যখন করবই, আধখামচা নয়। পরি ভাবে। হ্যাজার্ড? হোক গে হ্যাজার্ড। চয়ন যেন আনবাড়ি না যায়।

না, কোনও রিস্ক নয়, বাসবদার কথামতো চয়নকে তাঁবে রাখতে হবে।

গর্গ সাহেবকে একদিন বলেই ফেলল পরি—স্যর, আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে। আমার একজন বন্ধু আছে, স্মার্ট, কম্পিউটার জানে, ওয়ার্ড, ডিটিপি, একসেল... ওকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন স্যর...।

সিদ্ধেশ গর্গ মুচকি হাসলেন। বললেন, টেল মি মোর ফ্র্যাঙ্কলি।

—হি ইজ মাই ফ্রেন্ড...।

আর কীভাবে ফ্র্যাঙ্কলি বলবে? কিন্তু ভেবেছিল তো সব খুলেই বলবে...।

গর্গই খুললেন। ইওর বেড পার্টনার?

মাথা নাড়ায় পরি।

—পাওয়ার পয়েন্ট আতা হ্যায় উনকো? ফর প্রেজেন্টেশন?

—থোড়া বহুত। দ্যাট হি উইল ডু।

—নো প্রবলেম, দেখেঙ্গে। বাট নট হিয়ার। আই উইল ট্রাই টু পুট হিম ইন আ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি। 'মিরাক্‌ল এন্টারপ্রাইস'-টা খুব ভাল, ভাস্কর বোস আছে, আমার নিজের লোক, ওর অনেক উপকার করেছি আমি, অ্যান্ড, সো ফার অ্যাজ আই নো, কোম্পানি ইজ এক্সপ্যান্ডিং। কিন্তু কথাটা হল, তুমি এই কোম্পানিতে থাকছ তো, অফার পেয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে না তো? ডোন্ট গো—অ্যাজ লং আই অ্যাম হিয়ার। ইউ উইল গেট এ গুড ইনক্রিমেন্ট নেক্সট ইয়ার। ডোন্ট ডিসক্লোজ ইট টু এনিবডি।

ঠিক আছে, এখন চয়নকেও বলার দরকার নেই।

এবার কাজগুলো এক-এক করে সেরে ফেলতে হবে। নিনাকে জানাল। নিনা বলল—তুমি আমার কম্পিটিটর হতে চাইছ কেন বাবা? পরি বলল, ভয় নেই, মডেলিং করব না। কিন্তু মনে-মনে বলল, তুমি তোমার ক্লিভেজ-বিভা দেখাও নিনা, দেখে নিও আমিও পারি কি না।

তীর্থঙ্করের সঙ্গে দেখা করে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই একটা দিন ঠিক করে ফেলল পরি। ডাক্তার তীর্থঙ্কর বসু বলল, এর আগে কতগুলো পরীক্ষা করিয়ে নিতে। সুগার, এক্স-রে, হরমোন লেভেল ইত্যাদি। একটা ফর্মও দিয়েছিল। সেখানে লিখে দিতে হবে কত সিসি বাল্‌ব করবে, অ্যারিওলা, নিপ্‌ল সাইজ সব।

একটা দিন ঠিক করে নিল ভর্তি হওয়ার। লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া নয়, জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া করেই অপারেশনটা করবে ঠিক করল। ডাক্তারবাবুরও তাই মত।

অনিকেতকে একদিন ফোনে জানাল পরি। বলল, সার্জারিটা একটু করিয়ে নেব বিয়ের আগে। আপনাদের একটু জানিয়ে রাখলাম। ফোনের ওপ্রান্ত থেকে গুলতির মতো একটা শব্দ ছুটে এল যেন—'সে কী?'

পরি বলল, অবাক হচ্ছেন কেন? আমি তো বলেছিলাম...।

অনিকেত বলল, তুমি এসো একদিন, তাড়াতাড়ি একদিন এসো ভর্তি হওয়ার আগে।

কয়েকবার এসে আর তো আসছ না। ব্যস্ত খুব?

অপারেশনের ব্যাপারটা নিয়ে মনটা খিচখিচ করছে অনিকেতের। ইউটিউবে দেখা ভিডিওটার কথা বারবার মনে পড়ছে। অনিকেত সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না পরিকে ওই ভিডিওটা দেখে নিতে বলবে কি না। শুক্লাকে দেখায়নি। প্রশ্নই ওঠে না। যদিও শুক্লার জীবনে অনেক অপারেশন ঘটেছে। অপারেশন টেবিলে গেছে, অজ্ঞান হয়েছে, জ্ঞান ফিরেছে, ব্যস। কী হয়েছে ও জানে না। এই অপারেশনটা দেখলে ওর ট্রমা হয়ে যাবে। লিঙ্গচামড়া পুরোটা উল্টে নিয়ে লিঙ্গের নরম মাংস কেটে নেওয়া, অঙ্গকোষের সাদা বীজভাণ্ড খুবলে বের করা, মাংস কেটে যোনিপথ তৈরি করা লিঙ্গের আবরণের চামড়াটা টানটান করে সেলাইকরা—যা নাকি যোনি হবে...ভাবা যায় না। কী করে পরিকে দেখাবে? যদি দেখায়-তবে ও ট্রমাটাইজড্ হবে। হোক না, তাহলে যদি সিদ্ধান্ত পাল্টায়...।

নাকি হিতে বিপরীত হবে! হয়তো এমনভাবে গেড়ে বসেছে জেদ, সেই ভূত ও করবেই। জেদ বা প্রবল ইচ্ছে বনাম ভয়ের টানাপোড়েনে খারাপ কিছু করে ফেলাও অস্বাভাবিক নয়। অপারেশনটা কি খুব দরকার? মনে মনে মেয়ে হয়ে থাকলে তো বাইরের খোলস পাল্টে মেয়ে হতে হয় না। যদি আমাদের লোকজন, সমাজ পুরুষের জন্মগত মেয়েলিপনা মেনে নিত, তাহলে হয়তো জোর করে মেয়ে হতে হত না। পশ্চিমের দেশে, ইয়োরোপ আমেরিকাতে কত মানুষ মেয়েলি স্বভাবের হয়েও মূল স্রোতে থাকতে পারে। অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সবই তো হয়। ওরা তো ঠিক ঠাকই আছে।

তখনই মনে হয় অনিকেতের—পশ্চিমের দেশেও অনেকেই এইসব সার্জারি করে। আসলে অস্তিত্বের সংকট, নিজের পরিচয় এবং সামাজিক পরিচয়—এসব এত জটি লতা, একজন ট্রান্সজেন্ডারের আইডেনটিটির সংকট CIS জেন্ডারদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

এরই মধ্যে অফিস থেকে একটা কাজের ভার দেওয়া হয় ওকে। 'ঐতিহ্যের সন্ধানে' নামে একটা সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান চলছিল। বাংলার মন্দির, গড়-দুর্গ, কুটিরশিল্প, লোকনৃত্য, ধর্মভাবনা এসব নিয়ে আধ ঘণ্টার ফিচার। প্রথম দিকে তরজা গান নিয়ে একটা ফিচার অনিকেত করেছিল, ওটা ফাঁকিবাজি, বাইরে যেতে হয়নি, কিছু তরজা গান তো স্টকে ছিলই, দু'জন তরজা গায়ককে ডেকে এনে ইন্টারভিউ করে, মাঝে-মাঝে কিছু বকবক করে কেটে জুড়ে দিয়েছিল। এগুলো কোনও ব্যাপার নয়।

এটাও কি এক ধরনের প্লাস্টিক সার্জারি? হয়তো তাই, রক্তপাতহীন। অনেক দিন হয়ে গিয়েছে ওটা, আবার একটা করার জন্য তাড়া দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। ওর মাসে একটা করে তৈরি করার হুকুম ছিল, অথচ তিনমাস কেটে গিয়েছে। অন্যদের করা ফিচার রিপিট মেরে চলছে। খুব গেঁতো হয়ে গিয়েছে অনিকেত। অথচ চার-পাঁচ বছর আগেও এসব কাজ আগ বাড়িয়ে করত। মিটিংয়ে অনিকেতকে বলা হয়েছে তাড়াতাড়ি একটা ফিচার করুন। সুধীর চক্রবর্তী মশাই একটা কথিকা বলে গেলেন—'চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব সাধনা'। ওটা ডিরেক্টর সাহেব

শুনে ফেলেছেন। এখন অবশ্য আগের ডিরেক্টর নেই। উনি ছিলেন বিজ্ঞানপ্রেমী। এখন সাহিত্যপ্রেমী। মিটিং-এ অনিকেতকে বলা হল, ওই বিষয়টা নিয়ে একটা ফিচার নামিয়ে দিতে। বিকেলে লিখিত আদেশও পেল। সুতরাং এড়ানোর উপায় ছিল না।

সুধীরবাবুর টেপটা বাজিয়ে শুনল অনিকেত। 'বলরামী', 'কর্তাভজা', 'সাহেবধনী' এরকম অনেক সম্প্রদায়ের কথাই বলেছেন উনি। এ সম্পর্কিত অনেক লেখা আগেও পড়েছে অনিকেত। এই কথিকা-য় উনি 'রাতাইলিয়া' সম্প্রদায়ের কথাও বললেন—যারা সারা রাত পরিক্রমা করে, নির্জন রাস্তায়, মাঠে-বিলে কৃষ্ণনাম গায় করতাল বাজিয়ে, আর বললেন, 'মঞ্জরী সাধনা'-র কথা, যারা নিজেদের মনে করে শ্রীরাধার সখী। এই সম্প্রদায়ের পুরুষরা স্ত্রী-বেশ ধারণ করে, এবং নিজেদের নারী ভাবে। যেন ওরা বিশাখা-চপলা-চন্দ্রাবলী। এই বিষয়টা বেশ মনে ধরল অনিকেতের।

সুধীরবাবু কৃষ্ণনগরে থাকেন। ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা রেকর্ড করলেই অনেক মেটেরিয়াল পাওয়া যাবে। তারপর যদি নবদ্বীপের কোনও আখড়ায় গিয়ে এই সখি-সাধনার সখীদের পাওয়া যায়...। সঙ্গে দু'-একটা গান জুড়ে দিলেই ফিচার রেডি হয়ে যাবে। রাত্রে না-থাকলেও চলবে। শুক্লার অসুস্থতার কারণে রাত্রে কোথাও থাকতে চায় না অনিকেত। এই ফিচারটা করতে চাইছে পরির জন্য। এরা তো সখী সেজে, সখী ভেবে দিব্য আছে। ওরা তো 'এসআরএস' করাতে যাচ্ছে না, হরমোন-ও খেতে হচ্ছে না ওদের।

সুধীরবাবুর সঙ্গে কথা বলে ওঁর বাড়িতে হাজির হল অনিকেত। উদ্দেশ্য জানানোই ছিল। টেপ রেকর্ডারটা টেবিলে অন। উনি বলে যাবেন। প্লাস্টিক সার্জারি পরে।

সুধীরবাবু বলছেন, 'বৈষ্ণব সমাজে, বুঝলে, দু'টি ধারা চালু আছে। একটা উচ্চবর্গের ধারা, যাঁরা বৃন্দাবন পরিচালিত, আর একটা অবতল সমাজের, যাঁরা ততটা শাস্ত্রপরায়ণ নন, বরং সহজিয়া সাধনার পথে খানিকটা প্রতিবাদী, যা অনেকটা গুপ্ত, গুহ্য, প্রধানত গুরুবাদী। যৌনাচারও আছে।'

অনিকেতের মনে হল, আচরণগত উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ভেদ সর্বত্রই। তথাকথিত এলজিবিটি-দের দু'টো বর্গ। উচ্চবর্গে এনজিও, সেমিনার, সিনেমা, সংবিধান সংশোধন; আর নিম্নবর্গে হিজড়া, গুরুমা, লম্ভা, ঘাটু। উচ্চবর্গে এসআরএস, নিম্নবর্গে ছিন্নি। খালাসি ড্রাইভার হতে চায়, খাবার সোডা বেকিং পাউডার হতে চায়, মামলেট চায় ওমলেট হতে। ব্যবসা করে সামান্য পয়সা হাতে পাওয়া বাগদি-বাউড়ি ঘরের পুজো-আচ্চায় দেহুরির বদলে বামুন, ভদ্রলোক-ভদ্রলোক খই আর পয়সা ছিটিয়ে শবযাত্রা...। 'এই নিম্নবর্গের বৈষ্ণবরা বৈধী সাধনাকে মানেন না। এরকম প্রতিবাদী ধরনধারণের জন্য নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সমাজ, যাঁরা মঠ-মন্দির-আখড়া গড়ে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা এঁদের ভাল চোখে দেখেন না। কিন্তু অন্ত্যজ বৈষ্ণবরা ওঁদের মতো কাজ করে যান...।'

এরাও ফ্যাতাড়ু বুঝি? ওই যে সেমিনারে যখন ভাষণ-কবিতা পাঠ চলছিল, ওরা বাঁশির ছদ্মবেশে থাকা রাংতা-কাগজের পুংলিঙ্গ ফোলাচ্ছিল ফুসফুসের ফুঁয়ে, ফ্যাতাড়ু ওরাও। 'ঠিকরি'-মারা হিজড়েরাও। কাপড় তুলে ওদের প্রতিবাদ, খিস্তিতে, অ্যানার্কিতে... নিজেদের ধ্বংস করে...।

সুধীরবাবু বলছেন—

"বলরামী-সাহেবধনীদের সঙ্গে বৃন্দাবন বা গৌড়ীয় মঠের সম্পর্ক নেই। একটা সম্প্রদায় আছে, যারা গদাধরী। জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ নিতাই-গদাধরের সম্পর্কের কথা লিখেছিলেন :

একদিন নবদ্বীপে শচীঠাকুরানী
গদাধর জগদানন্দ কোলে কর‍্যা আনি।
সমুদ্রমথনে যেন লক্ষ্মীর উদয়
গৌরাঙ্গের কেবল গদাধর প্রেমময়
গৌরচন্দ্র বলেন মা গদাধরে আমি
নানা অলঙ্কার দিয়া ঘরে রাখ তুমি
শ্রীরামের সীতা যেন কৃষ্ণের রুক্মিণী
গৌরাঙ্গের গদাধর জানিও আপনি...।

চৈতন্য-অনুগামী এই সম্প্রদায় নিজেদের 'গদাধর' ভাবে। সেজে-গুজে থাকে, প্রায় নারীস্বভাবে চৈতন্য সেবা করে। কিন্তু জানো, সমন্বয়ও হয়। বাঙালি খুব সমন্বয়পন্থী। সত্যপিরের সঙ্গে নারায়ণের সমন্বয় ঘটিয়েছে, আবার চাউমিনে ধনেপাতা। দ্যাখো, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রেমের তিনটি স্বরূপ আস্বাদন করার জন্য। রাধার প্রেমমহিমা কেমন, শ্রীরাধার কেমন অনুভব প্রেমনিবেদনে; দ্বিতীয়ত, রাধার কেমন অনুভব কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনে; তৃতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণের কেমন অনুভব শ্রীরাধার নিবেদিত প্রেমমাধুর্যে? তিনটি বিষয়ের জ্ঞানপিপাসায় রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় শচীমাতার গর্ভে। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং রাধা-ভাবে কৃষ্ণকে যাচনা করেছিলেন, এরপর কি সাধারণ বৈষ্ণবদের রাধা-ভাবে ভজনা করা সাজে? চৈতন্য তিরোধানের বেশ পর, নতুন একটি ধারার উদ্ভব হল—সখী-ভাবে সাধনা করা। রাধা-ভাব নয়, সখী-ভাব। শ্রীরাধার যারা সখী ছিল, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রমুখ—এরা রাধা-কৃষ্ণ সেবা করত। এই সখী-সাধনাকে বলা হয় 'মঞ্জরী সাধনা'। উচ্চবর্গের বৈষ্ণবরাও এই সাধনা করতে লাগল, অন্যরকম ভাবে নিম্নবর্গের বৈষ্ণরাও। সুধীরবাবু বলছেন, 'আমাদের মাস্টারমশাই চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মঞ্জরী সাধনার কথা বলেছিলেন প্রথম। মঞ্জরী সাধনা যারা করে, তারা নিজেদের শুধু সখী ভাবে না। সখীদের সখী। মানে, আরও সামান্য নারী। বড় কঠিন সাধনা। শুধু মনে নয়, চলাফেরায়, কথাবার্তায় একেবারে মেয়েদের মতো লজ্জাশীলা হতে হবে। নিচুস্বরে কথা বলা, আস্তে হাঁটা, ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা...।"

অনিকেত বোঝে, এই মেয়েলিপনাও কেমন আরোপিত হয়। চাপানো। এই নিচুস্বরে কথা বলা, ঘোমটা টানা, এগুলো প্রাক্-ঔপনিবেশিক মেয়েলিত্ব। উচ্চবর্গের মেয়েলিত্ব আর নিম্নবর্গের মেয়েলিত্ব এক নয়। আদিবাসীদের মেয়েলিত্ব আর ব্রাহ্মণ্য মেয়েলিত্ব এক নয়। প্রাক্-বিশ্বযুদ্ধ আর যুদ্ধোত্তর মেয়েলিত্ব এক নয়। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'-র নসুর মেয়েলিত্বে ছিল পান সাজা, সুপুরি কাটা, রান্নার কাঠ জোগাড় করা, পিঠে-পায়েস করা, ব্রত করা; আর পরিদের মেয়েলিত্বে ভ্রু-প্লাক করা, নেলপালিশ পরা, পারলে নারীবাদী কবিতা লেখা।

সুধীরবাবু বলতে লাগলেন—চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর একটা জিজ্ঞাস্য ছিল আদি নবদ্বীপ কোথায় ছিল? নানাজনকে জিগ্যেস করে ঠিকমতো জবাব পাননি। একজন বললেন, নবদ্বীপের ললিতা সখীর কাছে চলে যান, উনি প্রমাণ দিয়ে ঠিক কথাটাই বলবেন। উনি মহাপণ্ডিত। উনি

এখন সখী-সাধনা করেন। নিজেকে একেবারে মেয়েদের মতো করে ফেলেছেন। খুব ভোরে উঠে দাঁড়িগোঁপ কামিয়ে শাড়ি পরে নেন, ঘোমটা টেনে আশ্রমে এমন ঢং-এ চলা ফেরা করেন, আর মেয়েদের মতো করে কথা বলেন যে কেউ বুঝতেই পারে না যে উনি মূলে একজন পুরুষ। ওঁর কাছে চলে যান।

চিন্তাহরণবাবু ওই আশ্রমে গেলেন। অভিলাষ জানালেন। ওই আশ্রমের একজন বললেন, ভাল দিনে এসেছেন। ললিতা সখী আজ দর্শন দেন। দর্শন পাওয়া গেল বিকেলে। রাধাকৃষ্ণের দিবানিদ্রার ব্যবস্থা করে তিনি কম্বলের আসনে বসেছেন, ঘোমটা-টানা মুখ। একজন পুরুষ, ইউনিভার্সিটিতে এমএ পর্যন্ত পড়ে গোল্ড মেডেল পেয়েছেন, তারপর ভক্তিপথে দীক্ষা। উনি মাথা নিচু করে একটা হাতের ওপর অন্য হাতটা রেখে মৃদুস্বরে জিগ্যেস করলেন, কী আপনার জিজ্ঞাস্য? স্যর জানতে চাইলেন, প্রকৃত নবদ্বীপে কোথায়, নয়খানি দ্বীপ কি ছিল? শ্রীচৈতন্য ঠিক কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন...?

উনি কম্বলের ওপর আঙুলের আঁকিবুকি কেটে মাথা নিচু করে বলেছিলেন, আমি ব্রজনারী। গোয়ালার মেয়ে। অত সব কি জানি? এই বলে উঠে গেলেন। পায়ের নূপুর বাজল।

সুধীরবাবু বললেন, এ তো আমার স্যর চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর কথা।

আমি নিজেও দেখেছি। মালদহ বইমেলায় বক্তৃতা করতে গিয়েছি, কমিটি থেকে বলল, বক্তৃতা বিকেলে, সকালে একটু ঘুরে আসুন, কাছেই রামকেলি, চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন এখানে। পথেই রাজগ্রাম, রাধা-দামোদরের মন্দির। সেখানে আশ্চর্য হয়ে যাবেন সেবাময়ীকে দেখে। সত্যিই আশ্চর্য হলাম গান গাইছেন সেবাময়ী, আর চন্দন ঘষছেন। পরনে তসরের শাড়ি, কপালে চন্দন টিপ, খালি পা, আলতা পরা, লম্বা চুল খোলা, মুখে স্নিগ্ধ হাসি, যেন বৈশাখী ভোর। ইনি নাকি পুরুষ। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় এক অধ্যাপক। উনি আমাকে দেখিয়ে বললেন, ইনি একজন অধ্যাপক। ইনি জানতে চান আজ ভোর থেকে কী-কী করলে?

কমনীয় কণ্ঠে সে বলল—আমি তো কিছুই করিনি, তাঁদের সেবাকর্ম তিনিই করিয়ে নিয়েছেন আমাকে দিয়ে। এ হল আমাদের আত্মবৎ সেবা। ভোরে করতালি দিয়ে রাধা-দামোদরকে সতর্ক করে মন্দিরে প্রবেশ করি, তারপর তাঁদের সিংহাসনে বসিয়ে ভেজাফুল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিই, বাইরে পাখির কূজন চলে, ওঁরা শোনেন, তারপর নিজে একটা কীর্তন শোনাই, তারপর একটু ক্ষীর দিই—এরকম আর কী।

আরও তো কত কী করো, দুপুরের সেবা, শয়ন, বিকেলে জাগরণ...

সেবাময়ী ছোট্ট করে জিভ কেটে বলল, সেবা-র কথা কি অত ফলাও করে বলতে হয়? আমি হলাম সখীর সখী। যতটা পারা যায় প্রচ্ছন্ন থাকতে হয়। যাকগে। একটু প্রসাদ আছে। সেবা নেবেন।

যেন বাড়ির বড় বউদি। না খাইয়ে ছাড়বে না। আমার সঙ্গের অধ্যাপকটি সহজে ছাড়ার পাত্র নন। উনি জিগ্যেস করলেন, রাধা-দামোদর'কে মাঝে-মাঝে চমকে দিতে ইচ্ছে করে না?

লাজুক হেসে বলেন, তা তো করে বইকি। যেমন ধরুন, কখনও স্নানের জলে মিশিয়ে দিলাম অগরু, রাতের শয়নে বস্ত্রে দিলাম কস্তুরী, হঠাৎ করে একদিন কয়েতবেল মাখা, মাঝেমধ্যে বেলের শরবত, কখনও মুচকুন্দ ফুলের শরবত।

—মুচকুন্দ ফুল? আফ্রোডেজিয়াক বলে খ্যাতি আছে না? অনিকেত বলে।

সুধীরবাবু বললেন, ঠিকই ধরেছ। তবে আরও কী জানো? ওই অধ্যাপক আমার কানে-কানে পরে বলেছিলেন, মাসে চারদিন সেবাময়ী মন্দিরে ঢোকে না। ঋতুচক্রে থাকে কিনা, তখন অন্য সেবাময়ীরা এই কাজগুলো করে।

সুধীরবাবুর রেকর্ডিংটার পর নবদ্বীপ গিয়েছিল অনিকেত, কোথায় 'সখী সাধনা' হয় জেনে নিয়েছিল। ওখানে এরকম কোনও সেবাময়ীর সাক্ষাৎ না-পেলেও দু'-একজন গোস্বামীকে পেয়েছিল, যাঁরা ভোগ-রাগ-আরতির সময় শাড়ি পরেন, গান ও রেকর্ড করতে পেরেছিল, 'হে রাধিকা প্রাণাধিকা আমি তব সেবিকা, এই সংসার বৃন্দাবনে সদা পাই তব দেখা।'

অনুষ্ঠানটা তৈরি করল অনিকেত। 'সখী সাধনা'। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের গানটার দু'টো লাইন ব্যবহার করে শুরু করেছিল। 'রাই জাগো রাই জাগো' গানটারও দু'লাইন, স্টক থেকে, তারপর সুধীরবাবুর কথার ফাঁকে-ফাঁকে নিজস্ব লিংকিং ন্যারেশন। মূল প্রতিপাদ্য ছিল, নারীত্ব-পুরুষত্ব মনের ব্যাপার, বাইরে কে কী লিঙ্গচিহ্ন ধারণ করে আছে, সেটা গৌণ। 'কী বা অন্তর নারী-নরে অন্তরে রয় যদি ধন।'

যেন পরি-র জন্যই।

ওর কথা ভেবেই অনুষ্ঠানটা তৈরি।

পরি-র 'মেল আইডি'-টা জোগাড় করেছিল অনিকেত। একটা চিঠি লেখে পরিকে—

স্নেহের পরি, তোমার প্রতি আমার একটা সফ্‌ট কর্নার আছে, তুমি সেটা জানো। তোমার মানসিকতা আমি অনেকটাই বুঝি। তুমি আনুষ্ঠানিক ভাবে তোমার সঙ্গীকে স্বীকৃতি দিতে চাও, এটা ভাল কথা, আমাদের সমর্থন আছে। কামনা করি, এই সঙ্গী যেন স্থায়ী জীবনসঙ্গী হয়। তুমি জানিয়েছ, এই অনুষ্ঠানটির আগে তোমার শরীরটাকে সাজিয়ে নিতে চাও। অর্থাৎ সার্জারির সাহায্য নিতে চাও। দ্যাখো পরি, এতে অনেক হ্যাজার্ড্‌স। আমি একটা ফাইল-ও 'অ্যাটাচ' করে দিচ্ছি তোমায়, 'My monolouge'। একজন 'এসআরএস'-করা লোক নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। পড়ে দেখো। সেই সঙ্গে বলি, আগামী রবিবার রাত ন'টায় কলকাতা ক-তে একটা অনুষ্ঠান শুনো। তোমার হয়তো কলকাতা 'ক' ধরার মতো রেডিও নেই। তা হলে সোমবার দিন রাত দশটায় 'এফএম রেন্‌বো' শুনো। প্লিজ শুনো। শরীর তোমার। তোমার শরীরে তোমারই অধিকার। কিন্তু ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে এমন কিছু কোরো না—যা তোমাকে নানা সমস্যায় বিড়ম্বিত করবে। মনটাই আসল। মন-ই হরমোনের নিয়ন্ত্রক। বাইরের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে ভিতরের মন। বাইরের শরীরটা ইগনোর করতে পারলে, সমস্যা নেই। একটা উপন্যাস পড়লাম, তিলোত্তমা মজুমদারের, 'চাঁদের গায়ে চাঁদ'। ওখানে নারীদেহধারী পুরুষ এবং পুরুষদেহধারী নারীর নিবিড় সম্পর্ক দেখলাম। দেহ গঠন বাধা হয়নি। তা ছাড়া, শরীর-চাহিদা আর ক'দিনের শেষকালে দেখো যেটা থাকে, সেটা ভালবাসা। বাৎসল্য হল ভালবাসার একটা উচ্চতর স্তর। যা করবে ভেবে করবে। আর ওই অনুষ্ঠানটা আমার বাড়িতেই কোরো। তোমার কাকিমা তা-ই চায়।

বাংলায় লেখা চিঠিটা স্ক্যান করে পরির মেল-এ পাঠিয়ে দিল অনিকেত।

অনিকেত যেটা লিখতে পারল না, তা হল : পায়ুমেহনেই যদি তোমাদের যৌনতা মেটে, তবে কেন মাংস কুঁদে-কেটে যোনি নির্মাণ?

পরি মেল-টা পেয়েছিল, পেয়ে ভাল লেগেছিল। ওর জন্য এতটা ভাবে অনিকেত কাকু? যা লিখেছে, অন্তর থেকেই লিখেছে। রেডিও-র ফিচারটাও শোনে, যদিও ওটা পরির মনে খুব একটা দাগ কাটে না, ওসব তো রিচুয়াল্‌স। বিশ্বাস। সুফিদের একরকম সাধনা, বাউলদের আরেকরকম। ওরা সখী-'ভাবে' সাধনা করে কৃষ্ণকে কাছে পায়, কিন্তু পরির এই ব্যাপারটা তো সাধনা নয়, বিশ্বাস নয়, সম্পূর্ণ জাগতিক কিছু পাওয়ার লড়াই। পরি আগেই ঠিক করেছিল— 'একতলা'-র কাজটা পরে করাবে, আগে 'দোতলা'-টা করে নেবে। বিয়ে করবে, সাজবে না? বডি-টা সাজাবে না? নইলে কী সমর্পণ করবে চয়নকে? কোমল, বিকশিত যৌবনের বসন্ত সমীরে কুসুম হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে, সৌরভ সুধায় করে পরান পাগল।'

স্তন, আহা স্তন, হোক সিলি সিলিকোন।

পরি উত্তর দিল, লিখল, 'আই উইল অনার ইওর সাজেশন। মে নট গো ফর মেজর সার্জারি।' তারপর ফোনও করেছিল। বলেছিল, আমার ছোট শখটুকু মেটাতে দিন কাকু।

পঞ্জিকা দেখল। শ্রাবণ মাসের শেষে কবে-কবে বিয়ের দিন আছে। ২২, ২৪ আর ২৭। ২২ শে শ্রাবণ পড়েছে ১৫ অগাস্ট। মন থেকে বেরিয়ে এল 'বন্দেমাতরম্‌' 'জয় হিন্দ' ওই দিনেই বিয়েটা সারতে হবে। দারুণ দিন। তীর্থঙ্করের সঙ্গে ঘটস্থাপনের দিনটাও ঠিক করে নিল। ২০ জুলাই।

এবার একটু বুক ধুকপুক করছে। অ্যানাস্থেসিয়া করে অপারেশন। বুকের চামড়া কেটে স্যাক ঢুকবে, তাতে সিলিকোন ঢুকবে। স্যাক বন্ধ হবে, চামড়া সেলাই হবে। নিপ্‌লের তলায় অন্য টিস্যু দিয়ে নিপ্‌ল ফুলিয়ে দেবে। চামড়া টেনে অ্যারিওলা বড় করবে। দু'-আড়াই ঘণ্টা সময়, যদি জ্ঞান না-আসে?

চয়ন কয়েকবার বলেছে, টাকা-পয়সাগুলো 'জয়েন্ট' কর, যে কোনও কারও সঙ্গে। 'সিঙ্গল অ্যাকাউন্ট' রাখা কি ঠিক? ও সোজাসুজি বলেনি ওর সঙ্গেই করতে, কিন্তু ইচ্ছেটা এরকমই। কিছু টাকা চয়নের সঙ্গে 'জয়েন্ট' করল। বলল, কিছু একটা হয়ে গেল বাবাকে দেখো। চয়ন বলেছিল, যত্ত আনসান কথা। তারপরই চয়ন বলেছিল, বাকি টাকা? পরি বলেছিল, কেন? ফিরব না নাকি? ওটা তো আনসান কথা ছিল। নিজের নামেই আছে।

তারিখ দু'টো জানাতে অনিকেত কাকুর কাছে গিয়েছিল। মিষ্টির বাক্সো নিয়ে। 'দোতলা'-র কাজটা করাবে সেটা বলবে। ওদের তো 'দোতলা'-র কাজ, 'ঘটস্থাপন' এসব বলতে পারবে না, 'বুব্‌স মেকিং'-ও নয়, 'ব্রেস্ট অগমেন্টেশন'-ই ভাল।

পরি বলল, ২৭ শ্রাবণ বিয়ের দিন ঠিক করেছি।

—তাই নাকি? শুক্লা জেঠিমা খুশি-খুশিই দেখাল। অনিকেত কাকুকে বলল, পঞ্জিকাটা দাও দেখি। পঞ্জিকা খুলে বললেন, তুমি তো খুব ভাল দিন বেছেছো গো...।

পরি 'গো' শব্দটা লক্ষ্য করে। 'বেছেছো হে' বলতেই পারতেন শুক্লা জেঠিমা। একদম গোধূলি লগ্নে বিয়ে। শুক্লপক্ষের দ্বাদশী। তার মানে সূর্যটা ডুবলেই আকাশে চাঁদ বেরুবে।

—ওই অনুষ্ঠানে কি বেশি লোকজন বলবে?

পরি বলে, না, কাকে আর বলব? অফিসের দু'-চারজন, চয়নের একটা ছোটবেলার বন্ধু আছে। ওদের বাড়ির কেউ থাকবে না। আমার বাবা, আর আমরা। সব নিয়ে দশজন, ব্যস।

—তা হলে আমার বাড়িতেই তোমরা সবাই তাড়াতাড়ি চলে এসো। আমি নিজে হাতে তো রান্নাটা করতে পারছি না এখনও, আমি করিয়ে নেব। হোম ডেলিভারি আনব না।

পরি বলে, বেশি ঝামেলা করতে যাবেন না। খুব সিম্প্‌ল আইটেম।

—তাই বলে তো কুমড়োর ছোকা আর মটরের ডাল দিয়ে তো সারা যাবে না। সে দেখা যাবে।

পরি বলল, তার আগে বিশে জুলাই আর একটা কাজ করাব। ব্রেস্টটা একটু ঠিক করিয়ে নেব।

শুক্লা বলল, অপারেশন?

পরি বলল, ছোট্ট অপারেশন। পঞ্জিকাটা আবার হাতে নেয় শুক্লা।

অনিকেত শুক্লার টেনশন কমাতে চায়। বলে, না কোনও রিস্ক নেই।

শুক্লা বলল, জানি, মডেল, অ্যাকট্রেস-রা করায়...।

আবার পঞ্জিকা দেখতে বসে শুক্লা। বলে, ওমা! ওই দিন তো আবার পৈতেরও দিন। দোসরা শ্রাবণ। ভালই তো হল। তুমি দ্বিজ হবে।

অনিকেত শুক্লাকে বুঝতে পারছে না। আজও বুঝতে পারল না। ও ভাবতেই পারেনি শুক্লা এভাবে ব্যাপারটা দেখবে।

কিছু কেনাকাটা আছে। অপারেশনটা হয়ে গেলে বেশি টাইম পাওয়া যাবে না। চার-পাঁচদিন তো পুরো শুয়েই থাকতে হবে। তারপর বেশি ঘোরাঘুরি করতে পারবে না। নিনাকে নিয়ে বেরল পরি। পারফিউম, চটি, ফুলদানি, এসব কিনল। দু'টো গেঞ্জি পছন্দ করেছিল নিনা, গেঞ্জিতে লেখা 'প্রেস' আর একটা স্মাইলি। বোঝাই যাচ্ছে এই 'প্রেস' মানে সংবাদঘটিত কিছু নয়, চাপো, চাপ দাও। প্রেস করো। প্রেস এখানে 'ভার্ব'। আর একটা গেঞ্জিতে একটা মাকড়সার ছবি ছিল। পরি বলল, এসব গেঞ্জি 'মাচো'দের মানায়। ও তো ততটা ওরকম নয়...। পরি তারপর বলল, জানো তো, কপুলেশনের পর মেয়ে মাকড়সা ছেলে মাকড়সাদের খেয়ে নেয়। মাকড়সার ছবি একদম কিনব না। আর একটা গেঞ্জির ওপর লেখা 'ককটেল'। নিনা এটাও বাছল। পরি বলল, যত সব অসভ্য লেখার দিকের নজর। শেষ অবধি গেঞ্জির ওপর দু'টো সমান্তরাল রেখা, মানে প্যারালাল লাইন আঁকা গেঞ্জিটা পছন্দ করে পরি। তলায় লেখা 'এন্ডলেস'। বলে, হরাইজেন্টাল লাইন দু'টোর জন্য ওর বুকটা আরও চওড়া দেখাবে।

নিনা বলছিল, আমার একটু বেশ চওড়া কাঁধ, ম্যাসকিউলিন ছেলেদের ভাল লাগে। কিন্তু

সলমন খান, শাহরুখ খানদের মতো ওয়াক্সি বডি ভাল লাগে না। যতই প্যাক থাক। আমার কিন্তু হেয়ারি ভাল লাগে।

পরি, আমারও।

—তীর্থঙ্করদা কি হেয়ারি রে? পরি জিগ্যেস করে ফেলে।

অ্যাই...আমার বরের দিকে নজর দিবি না...একটা কপট হুমকি দেয়। তারপর বলে ইয়েস।

পরি বলে, চয়নও তাই, কিন্তু মাসকুলার নয়, একটু গোলগাল টাইপ। আমার জিম করা ট্রিম বডি অত ভাল লাগে না। আমার ভাই মনটাই বেশি টানে। তারপর গুনগুন করে গায় এই মনটাই করে যত গোলমাল। পরি বলে শোন, তোর বর তো আমার সব দেখবে। দেখুক গে, কিন্তু বলে দিস, বুক দু'টো যেন বেশ ভাল ক'রে করে দেয়!

আজ সেইদিন। পঞ্জিকা অনুযায়ী পৈতের শুভদিন। সকাল থেকেই সুবাতাস বইছে। একটি পরবর্তী জীবনের লোভ বয়ে আনছে প্রভাত বাতাস। চয়ন এসেছে। ট্যাক্সি ডেকে এনেছে একটা। পরি ওর মায়ের ছবিতে প্রণাম করল, মা গো, দুঃখী মা, সবই তো তোমারই জন্য, জীবন নিংড়ে দিলে আমার জন্য। আমি একটা কন্যা উপহার দেব মা, যেন পারি, আশীর্বাদ করো। নির্মল জল পরির দু চোখে। বাবার পায়েও আঙুল ছোঁয়ায় পরি। ট্যাক্সিতে ওঠে। ট্যাক্সি নয়, ভেলা। গাঙুরের জলে ভাসালাম নিজেকে মা গো। অমরায় যাব।

নার্সিংহোমটার নাম অমরাবতী। চেয়ারে, বেঞ্চিতে মানুষের স্তূপ চুপ করে আছে। তীর্থঙ্করের চেম্বারে গিয়ে বলল এসে গেছি।

এর আগে কখনও হাসাপাতালে ভর্তি হতে হয়নি পরিকে। হাসপাতালের আলো, হাসপাতালের গন্ধের মধ্যে ডুবে গেল পরি, কাচের দরজার গায়ে লেখা অপারেশন থিয়েটার। কে জানে থিয়েটার লেখা থাকে কেন?

ঘরের ভিতরে নিস্তব্ধতা। ডাক্তারের গায়ে হিম সাদা অ্যাপ্রন। আরও দুজন নার্স।

তীর্থঙ্কর দুটো পাঁশুটে রঙের জিনিস একটা বাক্স খুলে বার করলেন। ডাক্তারের হাতে নেচে উঠল ও দুটো। বললেন এটা তোমার স্যাক্। বুকের তলায় প্লেস করে দেব। তারপর সিলিকোন ভরে দেব। নার্সকে বললেন—স্টেরিলাইজ করো। টেবিলে শুয়ে আছে পরি। পরির পোশাক নেই, সাদা চাদরে ঢাকা। গলা থেকে পেট পর্যন্ত ভেজা তুলোর শীতল স্পর্শ। স্টেরিলাইজ্‌ড হচ্ছে পরি। নার্স দিদিদের মুখে স্মিত হাসি। মোনালিসার মুখ থেকে ধার করা। কিছুটা রহস্য কিছুটা বিদ্রুপ মেশানো। এসির ঘড়ঘড় শব্দে ভেসে আসছে রগড় রগড়...। স্যালাইন বোতল ঝুলল। কোনও ব্যথা লাগবে না, একটু-একটু...। একটা চ্যানেল করা হল হাতে। ব্যথা। ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে, তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও। ডাকো তারে। কাঁটার পথে ধায় সে তোমার অভিসারে....। একটা ইনজেকশন। ধূসর...ধূসর...। আমার যাত্রা হল শুরু।

অপারেশন হল। জ্ঞান ফিরতেই দেখল আই লেভেল পাল্টে গিয়েছে। আগে শুয়ে শুয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দেখতে পেত, এখন পাচ্ছে না। চোখের সামনে আড়াল। মোহিনী আড়াল। নীল চাদরে ঢাকা। একটা হাতে স্যালাইন চলছে বুঝতে পারল। অন্য হাত দিয়ে একবার ছুঁতে ইচ্ছে করল এই নব স্তন। হাতটা বাঁধা। নার্স এগিয়ে এল। ছুঁতে ইচ্ছে করছে?

একদম না। এই জন্যই তো হাতটা বেঁধে রাখা হয়েছে। ছটফট করবেন না। ঘুমোন। তার আগে হাঁ করুন।

দু'চামচ জল খাইয়ে দিল।

বুকের ওপর একটা অদ্ভুত ধরনের ভার। ঘট ভরেছে। মঙ্গল ঘট। পারে না, আবার চোখ বুজে যায়। চিনচিনে ব্যথা টের পায় পাঁজরায়। এ ব্যথা ভাল ব্যথা। চোখ বোজে। আবার যখন চোখ খুলে দেওয়ালের ঘড়িতে দেখল সাড়ে চারটে। ন'টা বাজতে পাঁচে টেবিলে ওঠানো হয়েছিল। ডাক্তার তীর্থঙ্কর বলেছিল বিকেলে এসে বলবেন সন্ধের সময় ছাড়া যাবে কি না, না কি কাল সকালে।

নার্সকে ডাকল, বলল, হাতটা খুলে দিন, নাকটা চুলকোচ্ছে। নার্স বলল, আমি নাক চুলকে দিচ্ছি। একটু পর চয়ন এল। চয়ন প্রথমেই বলল, বাঃ ভাল হয়েছে তো। মাথায় হাত বোলাতে গেল। নার্স বলল, গায়ে হাত দেবেন না এখন। ডা. তীর্থঙ্কর এল। চয়নকে বাইরে যেতে বলল। চাদরটা সরাল, একটা সাদা হাউসকোট পরানো আছে, হাল্কা বাঁধনের বেল্ট খুলে দিল। চোখের সামনে আয়না একটা ধরল। পরি দেখল ওর স্তন। উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের তীরে!প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে। ডাক্তার বললেন, কী খুশি তো? হাতে একটা গ্লাভস পরে নিল ডাক্তার। একটা খুন্তির মতো জিনিস দিয়ে বুকটা নাড়াল সামান্য। হাতে ধরল না। হোক সিলিকোন, মেয়েদের বুক কিনা। বলল, বুকের তলায় সেলাই আছে। একটা দাগ থাকবে, পরে অনেকটা মিলিয়ে যাবে। এখন একটা ব্যান্ডেজ আছে। আজ এখানে থেকে যাওয়া ভাল। কাল সকালে বরং ছেড়ে দেব। তিনদিন পরে আসবেন। এখন দিন পনেরো যেন কোনও প্রেশার না পড়ে। বি কেয়ারফুল। প্রিউইক্স হলে ভালো।

হাতটা খুলে দিল। স্যালাইনটাও উঠিয়ে নিল। বলল, একদম টাচ করবেন না আজ।

ডাক্তার চলে যেতে চয়ন এল। ছুঁল না। পরি বলল, পরে, অ্যাঁ? চয়ন সুবোধের মতো ঘাড় নাড়ল। পরি বলল, বাবাকে দেখো।

পরির তো ওয়ানরুম ফ্ল্যাট। ওর বাবা থাকত ঘরে, পরি ডাইনিং স্পেস-এ ডিভানে। যখন রাতে আয়া ছিল, বাবার ঘরে। আজ আয়ার ব্যবস্থা আছে। কয়েকদিন থাকবে। চয়ন নিশ্চয়ই ও বাড়িতে কিছুক্ষণ থেকে রাতে চলে যাবে।

সাতদিনের ছুটি নিয়েছে পরি। বিশ্রাম। টিভি, বই। সঞ্চয়িতা থেকে লিপিকা আর কণিকার ছোট কবিতাগুলি পড়ছিল বারবার। এখানে একটু আটকে গেল।

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কিরে?
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে।

ওর সেই প্রথম যৌবনের বন্ধুদের মনে পড়ে। রতন...। দেবু...। ওরা নেই। ওদের ছিল ন্যাকড়া গোঁজা বুক। পরিরও তাই ছিল। এখনও কতজনের ন্যাকড়া গোঁজা বুক আছে, যারা দামী ইমপ্লান্ট নিতে পারেনি...। আমি কি হয়েছি আলাদা? পরির মনে হয়।

অনিকেত একদিন খুঁজে খুঁজে চলে এল এ বাড়িতে। এই প্রথম। ফল নিয়ে এসেছিল

অনেক। আম, জাম। পরির মুখের দিকে তাকিয়ে কখনও, অন্যদিকে তাকিয়ে কখনও কথা বলল। বুকের দিকে তাকালই না। পরি একটা ম্যাক্সি পরেছিল। পরি বলল, আমাকে ভাল দেখাচ্ছে জেঠু? অনিকেত বলল, খুব সুন্দর। তবে আর কিছু করতে যেও না। এই ঠিক আছে। পরির বাবার সঙ্গে কথা বলল কিছুক্ষণ। পরির বাবা বলল, আপনাদের আশীর্বাদে পরি চাকরি বাকরি করছে। আমার জন্য ও অনেক করেছে। আমি তো ওদের ছেড়ে গেসলুম, ও না দেখলে আমাকে রাস্তার কুকুর-শকুন ছিঁড়ে খেত।

যেন রোজই একবার করে আসে, ওর বাবার ওষুধ কিনে দিয়ে যায়, ওকেও ওষুধপত্র খেতে হয়। চয়ন নিয়ে আসে। কোনও দিন বলে তোমার দুটো ওষুধের দাম আমিই দিলাম, তোমার থেকে নিইনি। সবটাই আমারই দিতে ইচ্ছে করে, জানো? পরি টুকরো হাসি দেয়। চয়ন একদিন বলল—একটু দেখাও না পরি, যেমন হল দেখতে ইচ্ছে করে না বুঝি...। পরি হাউসকোটের বেল্ট আলগা করে। পরি দুষ্টুমি ভরা হাসি হেসে উন্মুক্ত করে, সঙ্গে সঙ্গেই ঢেকে দেয়। চয়ন বলে ছুঁই! একবার ছুঁয়ে দেখি? পরি বলে না, একদম না। ডাক্তার বলেছেন তিন সপ্তাহ কিচ্ছু না। রইলোই তো, তোমারই জন্য।

চয়ন ওর মোবাইলটা ভুল করে ফেলে গেল। আওয়াজ হল বিপ্ বিপ্। চয়নের মোবাইলে ভেসে উঠল একটা এস.এম.এস.। স্ক্রিনে ভেসে উঠল একটা শব্দ। PUJA ইনবক্স এ এক বন্ধ খামের ছবি। তলায় লেখা Amar Sathe korle keno a.....মোবাইলের open অপশনে আঙুল চলে যায় পরির। ওপেন করলে পুরে মেসেজটা দেখতে পাবে। দ্রুত আঙুল সরিয়ে নিল পরি। কে পূজা? আমার সাথে করলে কেন... কী? একটা 'a' অক্ষর পড়ে আছে। বাকিটা ভিতরে। খামের ভিতরে।

'a' দিয়ে কী হয়? আড়ি? অভিমান? অভিনয় ও তো হয়। আমার সঙ্গে করলে কেন অসভ্যতা নয়তো...আবার ভার্চুয়াল নামটা খোলার জন্য আঙুল চলে যায়। আবার সরিয়ে নেয়।

থাক। এটা চয়নের পার্সোনাল মেসেজ। খুললেই ও বুঝে যাবে। বলবে আমার মেসেজ খুললে কেন? অথচ একটু আগেই পরি খুলে দিয়েছিল ওর জামা। চয়ন, তোমার বন্ধ খাম আমার কাছে খোলোনি, অথচ আমার সব কিছু। সব কথা বলেছি তোমায়। আমি তোমার জন্যই তো কাঁটাপথে অভিসারে চলেছি। অথচ তুমি....

কে পূজা? পূজা কে?

ওর কোনও ছাত্রী এরকম মেসেজ করবে কেন? করতেও তো পারে। আমার সাথে করলে কেন অনিয়ম হতে পারে না বুঝি! ঠিক মত পড়াতে আসছে না, আমার কাছে আসতে হচ্ছে তো...। তাই যেন হয়। মেসেজ বক্সের দিকে তাকিয়ে থাকে পরি। যেটা এইমাত্র এল, সেটা খোলে না। ইনবক্স এ আরও মেসেজ আছে। পরির মেসেজও আছে। গত কালকের করা দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি। এই তো রয়েছে। এরপরই পূজার মেসেজ। 'খুব মাথা ধরেছে'। মেসেজগুলো দেখতে লাগল পরি। 'কাল ঠিক ঠাক হয়েছিল।' তিন দিন আগেকার একটা মেসেজ পেল রিলেশনশিপ্স আর লাইক বার্ডস্। ইফ ইট হোল্ড টাইটলি, দে ডাই, হোল্ড লুজলি, দে ফ্লাই। ছাত্রী? ছাত্রীর সঙ্গে রিলেশনশিপ নিয়ে কি কথা হতে পারে?

পারে। পারে। কিন্তু কাল কী ঠিক ঠাক হয়েছিল? কী? কী? কী? ট্রানস্লেশন। বাক্যরচনা। আর কিছু নয় খারাপ ভাববোনা।

এর আগেও চয়ন মোবাইল রেখে দোকানে গেছে, চা করতে গেছে, পরি কখনও ঘাঁটেনি। কোনও কৌতূহল দেখায়নি। আজ হাতে নিয়ে.... শক্ত করে মোবাইলটা চেপে ধরে। হোল্ড টাইটলি, দে উইল ডাই। মুঠি আলগা করে। উড়ে যা উড়ে যা...।

মাথা ভোঁ ভোঁ করে পরির। চয়ন, তুমিও?

চয়ন ফিরে আসে। বলে মোবাইলটা ফেলে গিয়েছিলাম।

পরি হাতে তুলে দেয়। চয়ন মোবাইলটা পকেটে নেয়। বাইরে গিয়ে মেসেজ বক্স খুলে অক্ষত যোনি, অচ্ছিন্ন সতীচ্ছদের খাম গন্ধ পূজার মেসেজটা পাবে। চয়নই খুলবে ওটা।

চয়ন চলে যায়। পরি জল খায়। খুব তৃষ্ণার্ত লাগছে।

পূজা। ও একটা মেয়ে। পূজা যোনিসম্পন্না। পূজা ভ্যাজাইনাবতী। চয়ন কি এজন্যই পূজার কাছে যায়?

চয়ন তো কতদিন বলেছে ভ্যাজাইনা ওর ভাল লাগেনি। লুজ। ও বলেছে শ'বুর গালাকে বলতা হ্যায় এক গাড়। বাজে কথা? আমিও ভ্যাজিনা বানাবো। ভ্যাজিনাবতী হব। ফুল্লকুসুমিত যোনিধারিণী হব। দেখব কোন পূজা চয়নকে কেড়ে নিতে পারে। আমার সব আছে। আমার পেছন আছে। বুক আছে, ভ্যাজিনাও বানাব। প্লাস আমার টাকা আছে। প্লাস তোমার চাকরিটাও থাকবে আমার কন্ট্রোলে। আমি পুরোপুরি হব। পরি নতুন করে সিদ্ধান্ত নির্মাণ করে। এখন পূজা টুজার কথা তুলবে না। সাতাশে শ্রাবণটা যাক।

অফিসে গেলে শোর পড়ল। রাখি বলল টাচউড, দারুণ লাগছে। 'ওয়েল কাম বেবি'-গর্গ বলল। বাপি বলল, ওহ্! সেকেন্ড ফেজ অফ লাইফ। শুঁয়োপোকা টু প্রজাপতি। চিত্রা বলল, শুঁয়োপোকা বলিস না, আগে কি ও শুঁয়োপোকা ছিল নাকি? আগেও বেশ সুন্দর ছিল। নতুন আর কী দেখলি ওর, শুধু তো...।

হ্যাঁ, ওটাই তো অনেকখানি। বাপি চোখ নাচিয়ে বলল। সেলিব্রেট! সেলিব্রেট! কেউ বলল। পরি চকলেট আনাল। অনেক কাজ জমেছে। একটা সিনেমার নাচগানের সিনে দশরকম ড্রেস। রেল লাইন, পুকুর পাড়, ময়দান, চোলাই ঠেক, বাঁশের সাঁকো, মিড ডে মিলের রান্নার আসর এরকম দশটা সিনে চাষির মেয়ের সঙ্গে বিডিওর নাচ। কাজে মন দেয়। পাথর বসানো রেল লাইনে জিরাফ দাগের ড্রেস বেশ ফিট করছে, পুকুর পাড়ে শাপলা ফুলছাপ জামা, বাঁশের সাঁকোয় নায়িকার ওড়নাটা আটকে যাবে। ওড়নাটার রং সবুজ, নাকি সাদা? এরই মাঝে বারবার প্রশ্নটা। কে পূজা?

তবু সে মাথার চারিপাশে,
তবু সে চোখের চারিপাশে,
তবু সে বুকের চারিপাশে।

গর্গের কাছে যায়। জিগ্যেস করে চয়নের চাকরি নিয়ে কথা হয়েছে কিনা। গর্গ বলে ডোন্ট ওয়ারি। তোমার বন্ধুর সিভিটা তো ভাস্করকে ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি। এগেইন, হ্যাড এ টক

উইথ হিম। ইওর ফ্রেন্ড উইল রিসিভ এ লেটার সুন ফর ইন্টারভিউ। পরি বলল, থ্যাঙ্ক ইউ স্যর, প্লিজ সি টু গেট ইট ডান হিয়ার। এখানে হলে দু'জনে...সেম ট্যাক্সি...সেম...। গর্গ বললেন, ওকে...আগে তো মিরাকেল এ জয়েন করুক, পরে দেখছি...।

তার মানে 'মিরাকেল'-এ চাকরিটা হয়ে যাবে চয়নের? সত্যি? মিরাকেলই তো। এত সহজে? এর নাম সোর্স। নিশ্চয়ই পাঁচ হাজারের চেয়ে বেশি মাইনে হবে। ওই অফিসে আবার ক'টা মেয়ে আছে কে জানে? কে জানে মেয়েগুলো কেমন? এখানে কাজটা হলে চোখে চোখে রাখা যেত।

দিন এগিয়ে আসছে। ২৭ শ্রাবণ অফিসের সবাইকে বিয়েতে বলবে না। অনিকেত জেঠুর বাড়িতে অত জায়গা কোথায়? ৩০ শ্রাবণ, মানে ১৮ অগাস্ট। এই অফিসেই একটা পার্টি দেবে। সবাইকে খাওয়াবে। ফিশ ফ্রাই, বিরিয়ানি আর আইসক্রিম। বিয়েতে শুধু নিনা আর বাপিকে বলেছে। ভাল দেখে ফাঁকা কার্ড কিনে এনে নিজে হাতে লিখেছে, একটু রং এর ছোঁয়াও। রং আছে, কিন্তু অন্তর নেই। লিখছে—আন্তরিক ভাবে চাই, কিন্তু যেন ওটা কথার কথা। পরি খুব একা। ভীষণ একাকী। এখন কার্ড লেখার সময় বেশি করে মনে হল।

তৃপ্তিকে কার্ড পাঠিয়েছিল। ফোনেও বলেছিল। তৃপ্তি একদিন এসেছিল সন্ধের পর। বলল, কী ভাল খবর। বলল, কী সেক্সি দেখাচ্ছে তোকে। ওর মামলা মেটেনি এখনও। সাসপেন্ড হয়েই আছে। বলল, তোর মতো বুক লাগিয়ে যদি কোনও মেয়ের সঙ্গে শুতাম... আমার হয়তো কিছু হয় না। একটা মেয়ে কোনও মেয়েকে নাকি ধর্ষণ করতে পারে না। কোনও ছেলেকেও নাকি আইনত পারে না। বায়োলজির বিচারে, আমি নাকি ছেলে, আমার মেডেল টেডেল গুলো কেড়ে নেবে নাকি, কে জানে। আমিও এরকম নারীত্ব কিনে নেব শালা। পয়সা দিয়ে যদি নারীত্ব কেনা যায়, তবে আইন কিছু করতে পারবে না। আবার মেয়েদের জড়িয়ে শোব।

তৃপ্তি একটু পরে বলল, পরি, প্লিজ, একটু দেখাবি? ভীষণ দেখতে কৌতূহল হচ্ছে কেমন হয়েছে। পরি বলল, শুধু দেখবি কিন্তু। তৃপ্তি বলল তাই করব। টাচ করব না। পরি খুলে দেয়। তৃপ্তি অবাক হয়ে দেখে। বলে আমার হাত বেঁধে দে পরি। আমার নিষেধ শুনছে না। কেমন করে উঠছে সারাটা শরীর। দেখ, ছোট্ট পুন্টুটা কীরকম শক্ত হয়ে গিয়েছে। তৃপ্তি দু'হাত দিয়ে স্পর্শ করে পরির স্তন। আর কিছু নয়। পরি হাউস কোটের বেল্ট বাঁধে।

একদিন গর্গ স্যর ডাকলেন বললেন সিনেমার ডিজাইনটা প্রডিউসার অ্যাডমায়ার করেছে, ওই যে গ্রিন প্রন। গ্রিন পন মানে? ওই যে সবুজ প্রাণ...। সিনপসিসে তো গ্রিন প্রন লিখেছে। গর্গ সাহেবের বোঝার সুবিধের জন্য সিনেমাওলাদের কেউ সিনপসিস লিখে দেয়। ওরা সবুজ প্রাণকে গ্রিন প্রন লিখেছে। এটা বুঝতে পারল পরি। গর্গ বললেন, ইট ইজ ইওর ক্রেডিট। তারপর বললেন, তোমার রিসেপশনে থাকতে পারব না। মুম্বই যেতে হবে। প্লিজ কাম টু মাই হোম অন ইলেভেন্থ অগাস্ট ইভিনিং। হ্যাভ ডিনার। একটা ছোট গিফ্‌ট ভি দেব। পরি পলল ডিনার করলে রাত হয়ে যাবে। বাড়িতে বাবা একা, হি ইজ নট ওয়েল। গর্গ বললেন ওকে দেন, সফ্‌ট ড্রিংকস হার্ড ড্রিংকস, চা-কফি, যা চাইবে।

গর্গের বাড়ি যায়নি কোনওদিন আগে। গর্গই সঙ্গে করে নিয়ে গেল। পাম অ্যাভিনিউতে

ওর ফ্ল্যাট। চাবি খুলল। গর্গ সাহেব নিজেই বলল, মিসেস নেই। একটা ফিনানথ্রপিকাল ওয়ার্কে গিয়েছে। কুন প্রবলেম হবে না। চা কফি আমি বানাতে পারি, অ্যান্ড আই অ্যাম শিওর—ইউ টু। এসি অন করে দিলেন গর্গ সাহেব। হাল্কা মিউজিক চালিয়ে দিলেন। বোধহয় চৌরাসিয়া। ইউ ক্যান ফ্রেশ ইওর সেলফ। টয়লেটের দিকে আঙুল। এখন ওয়াশরুম বলতে হয়। গর্গ সাহেবও অন্য একটা ওয়াশ রুম থেকে ফ্রেশ হয়ে পাজামা-ফতুয়া পরে এল।

একটা বয়াম থেকে কাজু বাদাম বার করল। বলল, ওয়াইন চলবে, রেড ওয়াইন? বাঁ হাতের দু'টো আঙুল দিয়ে পরিমাণ বোঝানোর চেষ্টা করল।

ওয়াইন খেতে মন্দ লাগে না। পরি বলল হ্যাঁ, অল্প। গর্গ সাহেব বলল, আমার কাছে ওয়াইন ফঁ-পা।

এটা ফ্যাশন জার্গন যার সঙ্গে যেটা চলে না বোঝাতে বলা হয়। যেমন পাঞ্জাবির সঙ্গে চামড়ার বেল্ট ফঁ-পা।

গর্গ বললেন, পিৎজা আছে। গরম করে দেব? চিকেন বল আছে, হাফ কুক্ড। ফ্রাই করে নিলেই হবে।

পরি বলল, দিন আমি ফ্রাই করে নিচ্ছি'

গর্গ বলল, হুইস্কিতে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল নো-নো ইউ আর মাই অনার্ড গেস্ট, এ ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্ট, আই...আই...কী বলাটা এখন ঠিক বুঝতে পারছে না গর্গ। রেসপেক্ট, অ্যাডোর, রিগার্ড? মোডটা পাল্টাল গর্গ। আই শুড নট অ্যালাও ইউ টু গো টু কিচেন।

গর্গ সাহেব হাতে গেলাসটা নিয়ে একটা পিৎজা মাইক্রো আভেন এ দিলেন, প্যানে তেল বসিয়ে ফ্রিজ থেকে একটা প্যাকেট বের করে কতগুলো বল তেলে দিলেন, বাঁশির শব্দে মিশল চিকেন ফ্রাইয়ের চিড়চিড়। ঘরের রং ক্রিস্টালের শোপিস, ছবি দেখতে দেখতে ওয়াইনটুকু শেষ করে দিয়েছিল পরি। গর্গ আর একটু ঢাললেন। নিজের গেলাসেও হুইস্কি। পরি বলল স্যার আর ইউ থিংকিং ফর মাই ফ্রেন্ড টু গেট ইনটু হিয়ার ইটসেল্ফ?

গর্গ পরির কাঁধে হাত দিয়ে বলল, আমার সব মনে আছে তো বাবা...। আগে ওখানে জয়েন করুক। সেপ্টেম্বর থেকেই কাজে লাগবে। পরে ইধারে নিয়ে নিব।

পরি বলল, এখনও ইন্টারভিউ লেটার পায়নি।

গর্গ বলল, কালকেই কথা বলব। কাঁধে মৃদু চাপড় মারলেন। যেন আশ্বস্ত করলেন। পিৎজা, চিকেন টেবিলে সাজানো। পরির ক্ষিধেও ছিল। খাচ্ছিল পরি। গর্গ বলল, ইউ আর লুকিং ভেরি চার্মিং, রিয়েলি। পরি ওর দৃষ্টির মানে বুঝতে পারছিল। গর্গ এবার ঘরে গিয়ে একটা ছোট লাল রং এর বাক্সো নিয়ে এল। বলল, তোমার জন্য আমি নিজে পসন্দ করে কিনেছি। একটা ডায়মন্ড নোজ রিং। বাক্সের ডালাটা খুলে পরির সামনে ধরলেন গর্গ।

পরি বলে আমার নাকে তো নেস্ট্রাল পিয়ার্সিং নেই। গর্গ বলে ওসব দরকার নেই। স্প্রিং মতো আছে। আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।

নাকে লাগিয়ে দেন। হিরে জ্বলে ওঠে। কাঁধে হাত দিয়ে বলে চলো আয়নায় দেখো কেমন লাগছে। ঘরে নিয়ে যায়। বেডরুম। থুতনিটা ধরে হাল্কা আদর করে। তারপর বলে, পরি, আই লাইক টু হ্যাভ এ ফুল ভিস্যুয়াল। তোমার এই নথ পরা মুখ, আর ভরা বুক একবার দেখতে

দাও, প্লিজ। পরি বলে, আমার তো চারদিন পরে বিয়ে...।

গর্গ বলে বিয়ে তো কী হ'ল, বিয়ে তো আছেই, তোমাদের এই এক্‌স্ট্রা অর্ডিনারি বিয়েটার পরে তোমার সঙ্গে কোনও এক্‌স্ট্রা ম্যারিটাল রিলেশনে যাব না। কেন যাব? আই অ্যাম নট পারভারটেড। আমার খুব ইচ্ছে করছে আর্টিফিসিয়াল বুক দেখি।

গর্গএর গলার স্বর পাল্টে যায়। আই ওয়ানা সি ইয়োর বুবস্‌...।

পরি স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। ওর হাতটা বোতামের দিকে দিয়ে নিয়ে যায়। বোতাম খোলে। ওপেন, ওপেন অল, পুরো খুলে দাও। পরি বলে—না, এইটুকুই।

গর্গ বলে আরে ইয়ার, এটা তো কভার দেয়া আছে, কভারটা খলো...। আজকাল দেখছি আসলির চেয়ে আর্টিফিসিয়াল বেশি ভালো হচ্ছে। এই প্ল্যান্টকে দেখো-পরির কাঁধে হাত দেয় গর্গ, ওটা কিন্তু প্লাস্টিকের আছে। একটা শিশু বাঁশ গাছ দেখে পরি, কাঁধ থেকে হাত নেমে আসে, ক্ষমতার হাত। এই হাতে পরির ইনক্রিয়েন্ট। এবার দুই হাত। জামাটা খুলে নেবার চেষ্টা গর্গ। পরি বলে আমি খুলছি স্যার, আমি...প্রলাপের মত বলে আর চারটে দিন পরই আমার বিয়ে স্যার, আমার বয়ফ্রেন্ডও এখনো... গর্গ বলে, আরে ইয়ে তো আসলি চিজ থোড়ি হ্যায়, আর্টিফিসিয়াল, পিয়োর আর্টিফিসিয়াল...। দশটা আঙুল পঙ্গপাল হয়ে নেমে আসে ফসলের মাঠে। পরি বলে স্যার, চয়নের চাকরিটা...। আরে হোগা..হোগা। বুকের ভিতরে মুখ ডুবিয়ে দেয় গর্গ। তছনছ, তছনছ। খসে পড়ে নকল নিপ্‌ল। শ্বেতশুভ্র মেঝেতে পড়ে গিয়ে গড়ায় কোথাও।

গর্গ ওর দু'হাতে চেপে ধরে সিলিকোন স্তন। হাতে তাঁর রোমশ উচ্ছ্বাস। পরি এবার বাধা দেয়, বলে এনাফ এনাফ। গর্গ বলে—এমন কেন করছ...গর্গের ঠোঁটের কোনায় ফেনা—আর্টিফিসিয়াল না...। গর্গের হাত বাজপাখি হয়ে যায় ফের। পরি বলে সতীত্ব নয় স্যার, ডাক্তার বলেছিল থ্রি উইক্‌স একদম যেন প্রেশার না পড়ে। গর্গ বলে—ওকে, কই বাত নেহি, সফ্‌টলি, সফ্‌টলি...। কয়েক মুহূর্ত পরই আর সফ্‌ট থাকে না হাত। পরি এবার একটা বালিশ বুকে চোপ আঁকড়ে ধরে। 'মৃত্যুর অঙ্গার মাখা স্তন তার পাখির শিশুর মতন'। গর্গ বলে ওকে, ওকে আই আন্ডারস্টুড। থ্যাংক ইউ। এবার সব লাগিয়ে যাও। মে বি আর্টিফিসিয়াল, বাট থিং ইজ ডেরি গুড। বেটার দ্যান অরিজিনাল। অ'সাম। আজকাল আস্‌লি জিনিসের চেয়ে নকলি বেটার হচ্ছে।

পরি ওর নিপ্‌ল দুটো খুঁজে নেয়। অন্তর্বাস কুড়িয়ে নেয়, বুক বাঁধে। গর্গ বলতে থাকে—আমি লাখনোর লোক। একটা কহবত আছে লাখনউ শহর গুলদস্তা লৌন্ডে মাহাঙ্গা, রেন্ডি শস্তা। তোমার মত লোকের আমাদের এরিয়ায় খুব ডিমান্ড আছে।

পরি জামার বোতাম লাগায়। তারপর নাকের নথটা খুলে ফেলে। বলে স্যার, প্লিজ নিয়ে নিন এটা। আমি ভাবতে পারিনি এরকম করবেন...। গর্গ বলে—ওঃ ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল। আমার বহুত কিওরেসিটি ছিল কি আর্টিফিসিয়াল বুব্‌স কিরকম হয়। ওকে। আই অ্যাম সরি। প্লিজ ডোন্ট রিফিউজ মাই গিফ্‌ট। আবার পরির হাতে তুলে দেয় গর্গ।

পরি বাক্সটা ব্যাগে রাখে। তারপর উদাস হাওয়ার মত ধীরে বলে চয়নের চাকরিটা...চাকরিটা দেখবেন স্যার...হাতের তালুতে চোখের জল মোছে।

জল কি তোমার ব্যথা বোঝে?

এ ঘটনা বলেনি কাউকে। চয়নকেও নয়। পূজার কথাও বলেনি কাউকে। শুধু জলের মতো ঘুরেছে বিষাদ।

১৩ অগাস্ট স্নান করার সময় পরি আয়নায় দেখল ওর ডানদিকে কাঁধের কাছে দু'টো গুটলি মতো কি যেন। ক্লিভেজের ওপরেও দু'টো মটর দানার মতো ছোট লাম্প। না, বাঁদিকে নেই। ডান দিকেই। পাঁজরার কাছেও ডান দিকে একটা গুটলি, রাজমার দানার মতো।

পরি ওর বাবার শরীরের গুটলিগুলোকে আবার ভাল করে দেখে। মনে হয় ওরও এইরকমই। বাবার কাঁধের আর বগলের তলার গুটলিগুলো আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে, টেপে, একটু সরে গেল। ওর নিজের শরীরের গুটলিগুলোও তো ওরকমই।

ওরও কি লিম্ফোমা হল? ক্যান্সার?

লিম্ফোমা কি ছোঁয়াচে? ওর বাবার থেকে হল? নাকি সিলিকোন থেকেই হল? সিলিকোন কি কার্সিনোজেনিক? কাকে দেখাবে? ওর বাবাকে যিনি দেখেন, নাকি যিনি এই ইমপ্ল্যান্টটা বসিয়েছেন?

তীর্থঙ্করকে ফোন করে পরি। সুইচ্‌ড অফ। সকাল সাড়ে ন'টা। নিশ্চয়ই অপারেশনে। বমি পাচ্ছে। বাবারও প্রায়ই বমি পায়। বমি হয়। কিন্তু অফিসে যেতেই হবে। কাজ আছে। লিম্ফোমা হলে তো এখনি কিছু হচ্ছে না, অফিস যায়। গিয়েই বমি করে বেসিনে। বেলা একটা নাগাদ তীর্থঙ্করকে ফোনে পায়। বলে বুকের চারিপাশে গুটলি তৈরি হয়েছে ডাক্তারবাবু...। তীর্থঙ্কর বলে বিকেলে চলে আসুন চেম্বারে।

তীর্থঙ্কর দেখলেন। জিগ্যেস করলেন খুব সেক্স করা হয়েছিল? পরি চুপ করে থাকে। তীর্থঙ্কর বলে বলেছিলাম তো যেন প্রেশার না পড়ে...। পরি বলে আপনি তো বলেছিলেন দশদিন যেন কোনও প্রেশার...। হয়েছে তো পরশু...। প্রায় তিন সপ্তাহ পর...।

তীর্থঙ্কর বলে আপনার বয়ফ্রেন্ড কি খুব...মানে খুব হাঙ্গরি ছিল? ভিতরের একটা স্যাক্ লিক করে গিয়েছে। একে বলে সিলিকোন ব্লিডিং...।

ব্লিড?

হ্যাঁ। সিলিকোন ব্লিডিং।

কী হবে এবার?

কী আর হবে? ফুটো তো রিপেয়ার করা যাবে না। আবার নতুন আর একটা এলাস্টোমার বসিয়ে জেল ভরতে হবে। তার আগে ছড়িয়ে পড়া জেলগুলো মাসল আর টিস্যুর ফাঁক ফোকড় থেকে চেঁচে বের করতে হবে। দু'-চারদিন পরে করলেও চলবে। এই জেল ইনার্ট। শরীরের ক্ষতি করে না। তবে লিক যখন হয়েই গিয়েছে ৩৮০ সিসি জেল তো ছড়াবে চারদিকে। নার্ভে চাপ দেবে। ব্যথা হতে পারে।

—আমার তো পরশু দিন...।

—জানি তো। মিটে যাক, তারপর হবে...।

১৫ অগাস্ট সকালবেলা পরি দেখল ডানদিকের বগলের আশেপাশেও কয়েকটা লাম্প হয়েছে। ব্লিড করছে পরি।

আস্তরণ ছিঁড়ে গিয়ে শরীরে ছড়াচ্ছে সিলিকোন। ছড়াক। আবার বানাবে। তার আগে ছড়িয়ে পড়া যৌবন-পুঁটুলিগুলো বের করে নিতে হবে। আবার অপারেশন? হোক।

'থিং ইজ ভেরি গুড, বেটার দ্যান অরিজিনাল, অ সাম'—গর্গের ওই কথাটা বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। আর্টিফিসিয়াল হলেও পুরুষের ভালোলাগে? গর্গের ভালো লেগেছিল। একটা টেস্ট তো হয়ে গেল। আর একটা অপারেশনের মূল্যে একটা পরীক্ষা। চয়নেরও ভালো লাগবে। পূজার চেয়েও নিশ্চই এটা ভালো।

না, পূজা সম্পর্কে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেনি চয়নকে। গর্গের ব্যাপারটাও না। কেউ জানে না। চয়ন তো দেখবে। বলবে এমনিই ফেটে গেছে।

সামনের মাসে আবার বাবাকে কেমোথেরাপির জন্য ভর্তি করাতে হবে। ব্লিড করছে পরি।

চয়ন সকালে এল। চয়নকে এখনও বলেনি কিছু। চয়ন ফুলশয্যায় দেখবে ওর ব্লিডেড হার্ট। ব্লিডেড হার্ট একটা ফুলের নাম। চয়নকে চুমু খেল। ওর ঘাড়ের, কাঁধের, গলার গন্ধ নিল। আসলে কোনও মেয়েলি গন্ধ খোঁজ করছিল পরি। পূজা-গন্ধ।

বিয়ের পোশাকটা চয়নের হাতে তুলে দিল পরি। দুই কাঁধে দু'টো ডানা অ্যাপ্লিক করেছে পরি, আর পাঞ্জাবিতে পাখির পালকের আভাস। পাঞ্জাবিতে অভিমান এঁকেছিল পরি। উড়ে যেয়ো, যদি মনে করো।

আজ পনেরোই আগস্ট, এক পশলা বৃষ্টি হবার পর কি মিষ্টি এ সকাল। আকাশে জলভরা মেঘ।

অনিকেতকে একটা লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছিল শুক্লা, গতকাল নিয়ে এসেছে আলপনা আঁকা পিঁড়ি, বরণডালা, শোলার মুকুট, কাজললতা, রজনীগন্ধার মালা, কলাগাছ, যুঁইফুল...

আলপনা আঁকা পিঁড়ি পায়নি, রঙিন কাগজে মোড়া পিঁড়ি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু পিঁড়ি কী হবে? বর কনে বসবে। সম্প্রদান করবে কে? শুক্লাকে জিজ্ঞাসা করেছিল অনিকেত—কে বরপক্ষ, কে কনে পক্ষ? শুক্লা বলল দু'জনেই বরপক্ষ, দু'জনেই কনেপক্ষ।

বরণ করার কুলোও কিনেছিল অনিকেত।

কুলোর গায়ে শুভবিবাহ স্টিকার মারা।

শুক্লার কিছু একটা রান্না করার ইচ্ছে হয়েছিল। মাছ ভেজেছিল বাঁ হাতেই। তারপর দই আর প্যাকেটে পাওয়া ফিশ মশলা মিশিয়ে দই রুই করল। চাটনিও। বাইরে বিরিয়ানির অর্ডার দেয়া আছে। আর সন্দেশ তো থাকবেই।

কাজের মেয়েটা সাদা ভাতও করবে। পরির বাবা বিরিয়ানি নাও খেতে পারে, শুক্লার সব দিকেই নজর আছে।

আলমারির উপরের তাকের পিছনের দিকে পড়ে থাকা বেনারসি আর সিল্কের শাড়িগুলো

বের করে দিতে বলল শুক্লা। অনিকেত চার-পাঁচটা নামিয়ে দিল। চার পাঁচটা দশক নামিয়ে দিল যেন। উই লাগা ইতিহাসের চার-পাঁচটা পাতা কিম্বা রংচটা পুরনো চার-পাঁচটা ছবি যেন শাড়ির ছদ্মবেশে আলমারির ভিতর থেকে নামল। সাজোগে সাজোগে নারী হও বেশবতী, আঁখিতে কাজল দাও ওগো কেশবতী... গরদের একটা শাড়ি টেনে নিল। অনিকেতই কিনে দিয়েছিল দশ বছর আগে। শুক্লার তখন দুর্গা বরণ করার শাড়ি ছিল না।

অনিকেত বলল এটা পরবে? বরং আর একটু গর্জাস শাড়ি পরতে পারতে তো...।

শুক্লা বলল—না, এটাই ঠিক আছে। আজ উৎসব করছে শুক্লা, আনন্দের বহিঃপ্রকাশ নেই কোন। যেন ব্রত করছে কোনও, কিম্বা প্রায়শ্চিত্য। নইলে দু-তিন বার দীর্ঘশ্বাস কেন? একবার বলল মন্টুটা যদি...

যদি...শব্দটার সামনে একজোড়া সমান্তরাল রেল লাইন অসীমের দিকে চলে গেছে। শুক্লা লিভিংপ্লেসে কলাগাছ বসিয়েছে জলের জারে। দু-মুঠো যুঁই ফুল রেখেছে পাথরের বাটিতে। কুলো সাজিয়েছে, কুলোতে ধান, দূর্বা, প্রদীপ...

শুভবিবাহ লেখা যে স্টিকারটা ছিল, তার উপর সাঁটিয়ে দিয়েছে সুখে থাকো। নিমন্ত্রিত তেমন কেউ নয় পরি আর চয়ন ছাড়া পরির অফিসের দু'জন। চয়নের বাবা, বাড়ির কাজের মেয়েটা। আর কেউ নয়। কল্পনা মৈত্রকে বলবে ভেবেছিল, বলেনি। কল্পনা মৈত্রর ঐ স্কুল এখন এখানে নেই আর, ওরা ফান্ডিং পেয়েছে, ওরা অন্যত্র। মন্টুর মৃত্যুসংবাদ শুনে সমাজকর্মী কল্পনা মৈত্র বলেছিল 'আপদ গেছে'।

কলাগাছ সাজিয়ে বসে আছে শুক্লা আর অনিকেত। বাদলভরা আকাশ খান, স্তব্ধ আছে বিয়ের গান।

ওরা আসবে।

আজ ১৫ই আগস্ট। সাতাশে শ্রাবণ। আজ লালগড়ে মিলিটারির গুলিতে চারজন গ্রামবাসী মারা গিয়েছে। বলিভিয়ায় স্বীকার করা হয়েছে আদিবাসীদের নিজস্ব শাসন। লালকেল্লায় বক্তৃতা দিয়েছেন মনমোহন সিং, বলেছেন মানুষের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই মূল লক্ষ্য। হরিয়ানার খাপ পঞ্চায়েতের নির্দেশ দুটি সমকামী তরুণকে হত্যা করা হয়েছে। ভারতের চন্দ্রযান চন্দ্রায়ণ চাঁদের দিকে ছুটেছে, পরি সাজছে। পরি জাঙ্গিয়া নয়, প্যান্টিই পরল। নতুন শায়া, বেনারসী। মায়ের হারখানি, মায়ের দুল জোড়া ছোখে কাজল, ঠোঁট রাঙানো লিপস্টিকে। পরি ব্লিড করছে।

চয়নের পোশাক পরা হয়েছে। চয়নের মেরুন পাঞ্জাবিতে ছিন্ন পালক, দুই কাঁধে অ্যাপ্লিক করা সাদা রঙের ডানা। পরির বাবাও পাজামার উপর পাঞ্জাবি পরেছে, গলায় কাজ করা।

মায়ের ছবিকে প্রণাম করল পরি। মা, মাগো, হাতের উল্টো পিঠে মুছে নিয়েছি চোখের জলের বৃথা দাগ। ফাটা দাগ ঢেকে দিয়েছি, ফাউন্ডেশনে, রুজ-পাউডারে। এখন আমি ছুটে যাই, ছিলাটান, যাত্রা শুরু করি। পরি ব্লিড করছে।

বারান্দায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল শুক্লা। হাতের লাঠিটা সরিয়ে রেখেছে আজ। ট্যাক্সি থামল। শুক্লা বলল ওগো, ওরা এসেছে। নিচে যাও।

উঃ, কতদিন পর 'ওগো' শুনল অনিকেত। অনিকেত দেখল যেন পুষ্পক রথ থেকে চয়ন নামছে, তারপর পরি, যেন অপরূপা, হাত ধরে নামাচ্ছে ওর বাবাকে।

পৃথিবীতে দু-এক টুকরো সুন্দর এভাবেই রচিত হয় বলে পৃথিবীকে মাঝে মাঝে মায়াবী নদীর পাড়ের দেশ মনে হয়। ওরা উঠল। অনিকেত পরির বাবাকে হাত ধরে উপরে ওঠাল। নিস্তব্ধ ছাদনাতলা। বাতাসে ফুলের গন্ধ আর কিসের হাহাকার।

পরির হাতে কাজললতা নেই, মোবাইল। মোবাইলে বিপ বিপ শব্দ হ'ল। মেসেজ করেছে গর্গ। উইশিং জয়ফুল এন্ড প্লেজয়রিং... পরি ব্লিড করছে। বুক থেকে সিলিকোন জেল ছড়াচ্ছে বুকের বাহিরে।

'মৃত্যুর অঙ্গার মথি স্তন তার ভিজেরসে উঠিয়াছে ভরি' একটু পরই এলো পরির অফিসের দুই কলিগ।

বাপি আর নিনা। ওদের হাতে ফুলের গুচ্ছ। ওরা এলো বলে শব্দ ঝংকার হল, কুচো কাগজের মত হাসি ছড়ালো বাড়িতে। নীনা বলল ওয়ান্ডারফুল। বাপি বলল হিস্টরি! হিস্টরি!

অনিকেত তসরের পাঞ্জাবি পরেছে। পাঞ্জাবিটা সুগন্ধ মাখা। হাসিও মেখেছিল মুখে। নীনা, বাপি এরা আসার পর ঘরেও বর্ষা এসেছে, তাই হাসিও কিছুটা বৃষ্টি। কোনও পুরোহিত নেই। কোনও পুরোহিত এরকম বিবাহ দেবে না। কোনও রেজিস্ট্রারই কোনও বিবাহ আইনে এ বিয়ে দিতে পারবে না এখনও।

শুক্লা পরির দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল একবার। বলল খুব ভালো দেখাচ্ছে। বলল, আজ যদি তোমার মা থাকতেন...। মনে কর আমিই...। শুক্লা এই বাক্য পুরোটা শেষ করতে পারলো না। এটা শুনে পরির বুকটা টনটন করে উঠল ভীষণ। যেন আর একটা স্যাক ছিঁড়ে যাবে।

শুক্লা বলল তোমরা দু'জনে পিঁড়ির উপরে বোসো। অনিকেত বলে, তোমরা দু'জনে হাত ধরো। অনিকেত বলে, দু'জনে একসঙ্গে বলো আমার হৃদয় তোমার হোক, তোমার হৃদয় আমার। বলো আমরা একসঙ্গে পথ চলব। আমার পায়ে কাঁটা ফুটলে তুমি উঠিয়ে দেবে, তোমার পায়ের কাঁটা আমি। আমরা দু'জনে সব আনন্দ ভাগ করে নেব, সব কষ্ট ও তোমার আনন্দ আমরা হোক, আমার আনন্দ তোমার...

পরি চয়নের কাঁধের ডানার দিকে তাকিয়ে এই কথা বলে।

এবার উঠে দাঁড়াও। মালা বদল করো।

মালা বদল হয়। আকাশের মেঘে মেঘে বারতা আসে। পৃথিবীর দু-কোটি ট্রানস্‌সেকসুয়াল এস এম এস পাঠায়। আকাশ জুড়ে মেঘের গুরু গুরু।

বাপি ছবি তোলে, নিনা হাততালি দেয়।

অনিকেতের মনে হয় ওই হাততালির সঙ্গে মিশছে আরও শত সহস্র হাতের তালি। চাত্তারা, ঝুমকো, ময়নারা সব ঠিকরি দিচ্ছে, ভেঁপু বাজাচ্ছে। পরির বাবার দু-চোখে বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

পরি ব্লিড করছে।

শুক্লার কুলোয় প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয় অনিকেত। শুক্লা কুলোটা ধরে রুগ্ণ দু হাতে। কুলোর

মধ্যে লেখা আছে সুখে থাকো। প্রদীপ জ্বলছে। শুক্লার হাত উপরের দিকে ওঠে না। শুক্লা চয়নকে বরণ করবে। চয়নের কপালে কুলো ঠেকাবে। শুক্লা ক্রেনের মতো কুলোটা উপরে ওঠাল। কী আশ্চর্য, উঠে গেল হাত। শুক্লা পারল। উলু দেবার চেষ্টা করছে এবার। অদ্ভুত একটা শব্দ বেরচ্ছে। উলু বাজছে না। বাজো বাজো বাজো। ঘৃণাকরি দূরে আছে যারা আজও... বন্ধ নাশিবে তারাও আসিবে... কিন্তু এলো ওরা। উলু দিল চাত্তারা, ফুলি, ময়নারা...দুলালীও। উলু দিল কলাগাছ, জুঁইফুল, বাঁশের কুলো, নিভন্ত প্রদীপ।

কাহিনি শেষ হল। এক সময় তো শেষ করতেই হয়। রূপকথার গল্পের মত এবার যদি বলা যেত তারপর তাহারা পরম সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিল...আহা। যদি বলা যেত...

তথ্যসূত্র

Human Physiology	:	Chandicharan Chatterjee
Essential Human Anatomy	:	A. K. Dutta
Diagnostic Criteria for Gender Identity Disorder	:	P. T. Karlington
Two Spirit People		Lester Brown.
A Transexual journey		Aeshia Brevard
The History of Sexuality		Michel Foucault
The Selfish Gene		Reichard Dawkins
Homo Sexuality : A new christian ethics		Eleizabeth. R. Mobert
The Invisibles		Zia Jaffrey
Fundamental Genetics		Edger Allenburg.
ভারতের হিজড়ে সমাজ		অজয় মজুমদার, নিলয় বসু
অন্তহীন, অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা		মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়
অপরাধ বিজ্ঞান		পঞ্চানন ঘোষাল
অপরাধ জগতের ভাষা		ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক
মুসলমান বাঙালীর লোকাচার		একরাম আলি
হিন্দুধর্ম		ক্ষিতিমোহন সেন
বাঙালীর ইতিহাস		নীহাররঞ্জন রায়
লোকায়ত দর্শন		দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
লোক কাব্যকাহিনীর দিক দিগন্ত		আবদুল হাফিজ
লোকসাহিত্য		আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলার চালচিত্র		আবদুল জব্বার
হিন্দু সমাজের গড়ন		নির্মলকুমার বসু
গভীর নির্জন পথে		সুধীর চক্রবর্তী
লোকায়তের অন্যবাঁকে		সুধীর চক্রবর্তী
বাঙালী জীবনে রমণী		নীরদচন্দ্র চৌধুরী
ব্রহ্মভার্গব পুরাণ		কমল চক্রবর্তী
পৌরুষ		কবিতা সিংহ
মায়ামৃদঙ্গ		সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
ঘেটুপুত্র কমলা		হুমায়ুন আহমেদ
পল্লীচিত্র		দীনেন্দ্রকুমার রায়
প্রাচীন ভারত, সমাজ, নারী		সুকুমারী ভট্টাচার্য
লোককথার ভিতর ও বাহির		মনিরুজ্জামান
লোককথার ঐতিহ্য		দিব্যজ্যোতি মজুমদার

ওয়েবসাইট

www. Tgender-net / www. ntac. org / www. transgender law. org / www. endransdicsimination. org / www. clcbio.com / www. ucl. ac. uk / www. ynamicdemo. net / www. social. jrank. org. / www. lqbt. i.e / www. gaycenler. org / www. buzzfeed. com / www. lqbt network. com / www. qayst arneys. com / www. betweenthelines.sosdg. org / www. inbanglablog. wordpress.com এছাড়া উইকিপিডিয়া।

বারুইপুর থেকে প্রকাশিত ঋত্বিক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা, অবমানব পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা উৎস মানুষ পত্রিকার পিনি দাশগুপ্তর প্রবন্ধ, সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত ধ্রুবপদ পত্রিকার 'অভিজ্ঞতা' সংখ্যার আনসারুদ্দিনের প্রতিবেদন, বোম্বেদোস্ত, প্রবর্তক, স্যাফো স্বীকৃতি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা, সানফ্রানসিস্‌কো থেকে প্রকাশিত Next পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা, অন্তরা ফাউন্ডেশনের Adolescence, বাংলাদেশের অভিজিৎ রায়ের বিভিন্ন ব্লগ থেকে তথ্য খুঁজে নিয়েছি।

জন্ম ১৯৫২। উত্তর কলকাতায়। দেশলাইয়ের সেল্সম্যান হিসেবে কর্মজীবনের শুরু বাইশ বছর বয়সে। নানা জীবিকা বদলের পর আকাশবাণীতে দীর্ঘকাল, শেষ তিন বছর ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে যুক্ত ছিলেন। গত সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে লেখালেখি শুরু। প্রথম গল্পটি অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও ছোট অবাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকাতেই উজ্জ্বল গল্পগুলির অধিকাংশ প্রকাশিত হয়েছিল। ওঁর বেশ কিছু ছোটগল্প বাংলা ছোটগল্পের গতিপথ পাল্টে দিয়েছে। তিনশোর মত ছোটগল্প লিখেছেন। প্রথম উপন্যাস *চতুষ্পাঠী* ১৯৯২ সালের শারদ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর ঔপন্যাসিক হিসেবেও নিজেকে বিশিষ্ট করেছেন। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু আলাদা এবং গবেষণা সমৃদ্ধ। বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ এবং মনোজ্ঞ কলাম কিংবা রম্যরচনাতেও তাঁর কলম সমান সাবলীল।

"হে ফ্রয়েড, ইয়ুং, পাভলভ, কেইন্‌স, ডকিন্‌স্‌... তোমরা দেখে নাও—মন-পরিবেশ, হরমোন-জিন শুধু নয়, আরও এক প্যারামিটার আছে। যেটা শুক্লা জেনেছে—সেটা স্বপ্ন"।

লিঙ্গ পরিচয়ের সংকটকে কেন্দ্র করে লেখা এই অনাস্বাদিতপূর্ব মানবিক আখ্যানটি স্নাত হয়েছে ভালোবাসার অলৌকিক জলে।

9 788129 523181